EvergreenBangla.com

সচিত্র

যৌনবিজ্ঞান

[মত ও পথ—সমস্যা ও সমাধান]

●

প্রথম খণ্ড

যৌনবিজ্ঞান, যৌন-ইন্দ্রিয়, যৌনবোধ, কাম ও প্রেম, যৌন-আচরণ
যৌনব্যাধি, বেশ্যাপ্রথা, বিবাহ, ইত্যাদি ইত্যাদি

●

স্বয়ং-সম্পূর্ণ, 'যৌনবিশ্বকোষ'-এ পরিণত, অসংখ্য নূতন নূতন তথ্যসুশোভিত
আমূল-সংশোধিত এবং বিষয়বস্তুতে দ্বিগুণাধিক পরিবর্ধিত

●

আবুল হাসানাৎ
প্রণীত
ও
ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, এম্-বি, ডি-এস্-সি
লিখিত
ভূমিকা-সম্বলিত

মূল্য বার টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ—১৯৩৬

প্রকাশক—বীরেশ্বর চক্রবর্তী
C/o. স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
৬, এণ্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫-এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

"ইহার বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহা সমাদর লাভ করিবে।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমার শ্রদ্ধাস্পদ, প্রেমাস্পদ, স্নেহাস্পদ

....কে

আমার ভক্তির, ভালবাসার, মমতার নিদর্শন স্বরূপ
এই পুস্তকখানি আন্তরিক মঙ্গল কামনায়
উপহার দিলাম।

এই পুস্তক সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ঃ "· ···কিছুকাল আগে নরম্যান হেয়াব সম্পাদিত যৌন বিশ্বকোষ পাঠ ক'রে আমার মনে এই জিজ্ঞাসা জেগেছিলো যে এই ধরণের বই বাঙ্গালীব জন্য কেন লেখা হয় না। আপনি সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন, এর জন্য আপনাকে আন্তবিক অভিনন্দন জানাই। আপনার গ্রন্থের বিশেষত্ব হইল আপনাব সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনোভাব··· · ·।"

সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীরঃ "·· বাঙ্গালা ভাষায় পূর্বে কখনও এই ধরণের বই লেখা হয়নি বলে আমার বিশ্বাস। যৌন-ব্যাপার নিয়ে বাঙ্গালা ভাষায় যা-ও বা দু'একখানি বই আছে, তার প্রায় সমস্তই অবৈজ্ঞানিক এবং ত্রুটিপূর্ণ। আপনি যে প্রত্যেকটি বিষয়ই বিজ্ঞানেব অনাবেগ ও অনাবিল দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, প্রত্যেক ব্যাপাবই বিচাব ক'রে যুক্তি দিয়ে যাচাই ক'রতে চেষ্টা ক'রছেন, সেজন্য আমার অভিনন্দম জানাচ্ছি···· ·।"

আনন্দবাজারঃ "·· বাঙ্গলা সাহিত্যে এতদিন পবে একখানি সত্যকার এবং সর্বাঙ্গসুন্দর 'যৌনবিজ্ঞান রচিত হইল, ইহা যেমন গ্রন্থকারেব পক্ষে গৌববের বিষয়, তেমনি অনুসন্ধিৎসু পাঠক-সাধারণেব পক্ষেও কল্যাণকর। দীর্ঘ দশ বছর ধরিয়া তিনি প্রাচীন ও আধুনিক কালের স্বদেশীয় বহু শাস্ত্র গ্রন্থ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানেব নির্দেশাবলী অনুসন্ধান করিয়া যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থকারেব পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। প্রাচীন হিন্দু-ভারতের সংস্কৃত কামশাস্ত্র, আরব, মিশব ও মুসলিম ভারতের যৌন-বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং আধুনিক ইউরোপের বহু পণ্ডিতের গবেষণা-ফল তিনি যেন মুষ্টিমধ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন। · ··· লেখক এই গ্রন্থে যে শক্তি, বিশ্লেষণ-বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে "যৌনবিজ্ঞান" বাঙ্গালার বিজ্ঞান সাহিত্যে নিঃসন্দেহে স্থায়ী আসন লাভ করিবে · · · ।"

শ্রীযুক্ত এন.এন. সেন, এম-এ, বি-এল, এডভোকেট, হাইকোর্টঃ
"· · · ·বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও মাত্র সত্যানুসন্ধানের সঙ্কল্প লইয়া

লিখিত যৌন-ব্যাপারেব গ্রন্থ যাহা লিখিয়াছেন তাহার তুলনা বঙ্গ-ভাষায় আর নাই। বিভিন্ন ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়ের নিয়ম ও প্রথা সমালোচনায় আপনাব ভাষা ও ভাবের সংযম এই হতভাগ্য হিন্দু মুসলমান পীড়িত দেশে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় প্রাতভাবানমনস্বী আছেন, যাঁহাবা হিন্দুও নহেন, মুসলমানও নহেন, কিন্তু উভয়েরই উর্ধ্বে, তাঁহাদের মধ্যে আপনাকে আসন পাইবাব যোগ্য কবিয়াছেন। · ”

দেশ ঃ “ ·· এই বিপুল যৌনবিজ্ঞান গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নূতন সম্পদরূপে গণ্য হইবে। যৌনজীবন ও যৌন-সমস্যার এরূপ বিস্তৃত, মনোহব এবং বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে পাঠ কবি নাই। গ্রন্থকাব দেশী, বিদেশী, আধুনিক ও পুবাতন বহুপ্রকাব কামশাস্ত্র ও যৌনগ্রন্থ দীর্ঘ দশ বৎসরকাল আলোচনা ও অধ্যয়ন করিয়া যাহা বচনা করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন তাঁহাব পাণ্ডিত্য ও পবিশ্রমেব পরিচয় দিতেছে তেমনই আবাব তাঁহাব রচনা-নৈপুণ্য এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর দখল ও গভীর অনুরক্তিও প্রকাশ কবিতেছে··· ।”

যুগান্তর ঃ “···· পুস্তকে লেখক যে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কব। বাঙ্গালা ভাষায় যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে যতগুলি নির্ভবযোগ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে আলোচ্য পুস্তকটি তাহার অন্যতম একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়·· ·।”

অমৃতবাজার পত্রিকা ঃ “·· ·The present book is a welcome venture in that respect and has been written with such unaffecred style that a father can safely hand in over to his youthful son and daughter......।”

পরিচয় ঃ “·· ·· ·বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যেব দিক দিয়া এই বই-খানিকে মূল্যবান সম্পদ-বিশেষে গণ্য করা যাইতে পারে· ··· ।”

প্রবাসী ঃ “···· ·· বিশ বৎসব পূর্বে যে আলোচনা আমাদের দেশে সভ্য সমাজে দুর্নীতিব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাহাই সমাজের পক্ষে একান্ত কল্যাণকর বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। যৌনজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচ্য পুস্তকখানিও তাহার একটি দৃষ্টান্ত ···· ।”

মাসিক মোহাম্মদী ঃ "……… ‥আলোচ্য বইখানা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া এই গ্রন্থকাব বাংলা সাহিত্যকে যৌনজ্ঞানমূলক গ্রন্থ প্রকাশের দিক দিয়া বিশ্বের উন্নতিশীল সাহিত্যসমূহের সম-শ্রেণীতে স্থাপন করিলেন। বাংলাব যৌন-সাহিত্য এজন্য চিরদিন তাঁহার কাছে ঋণী থাকিবে‥ ‥‥‥ভাষার সরলতায়, প্রকাশভঙ্গী প্রাঞ্জলতায় এবং বর্ণনাব সূক্ষ্মতায় এই জটিল যৌনতত্বও উপন্যাসেব মত মধুর হইয়াছে · · ···।"

বুলবুল ঃ "সমগ্র বইটি বর্তমান বিজ্ঞান জগতের আহরিত প্রচুব বিশ্বাস্য তথ্যে পূর্ণ। যথাযোগ্য বিষয় সন্নিবেশ এবং বিস্তাবিত নিবপেক্ষ আলোচনার দিক হইতে ইহাকে একটি সর্বাঙ্গসুন্দব বিজ্ঞান পুস্তকের স্থান দেওয়া যায় ···· ।"

সওগাত ঃ "………এই সমস্যা আলোচনায় গ্রন্থকাব যে সত্যপ্রীতি ও জ্ঞানানুশীলনের পবিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা গ্রন্থকাবকে নির্ভীক সত্যবক্তা ও নিরপেক্ষ সত্যদ্রষ্টা বলিয়া অভিনন্দিত কবিতে পাবি‥ ‥‥‥।"

নবশক্তি ঃ "‥ ‥ যে নির্বিকাব বৈজ্ঞানিক মনোভাব বইখানিব সর্বত্র পরিস্ফুট এবং যার দরুন সাধাবণ পর্যায় থেকে বইখানি অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে তাব প্রশংসা বিশেষভাবে করা দবকাব‥ · ‥।"

খেয়ালী ঃ "···· ‥একেই তো আমাদেব দেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তকেব সংখ্যা খুবই কম, তাব উপব যৌনবৃত্তি, যা এখনও গোপনীয়, বস্তুতঃ তা নিয়ে লেখক যে এমন সরল বাংলা ভাষায় সত্যেব বিবৃতি কবে সাধারণের জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করেছেন তাতে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি ‥ ···।"

বিচিত্রা ঃ "………সুমার্জিত এবং সুস্পষ্ট ভাষায় যৌনব্যাপাব সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে লেখক যে আলোচনা কবিয়াছেন তাহা শুধু মলিনতা বর্জিতই নয়, পরন্তু অতিশয় কৌতূহলজনক এবং উপকার-প্রদ। যুক্তি এবং বিচারের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা বইখানিকে প্রসাধন সম্পন্ন করিয়াছে·········।"

ভূমিকা

পুরাকালে ভারতবর্ষে কামবিদ্যা আলোচিত হইত এবং এই বিদ্যা শাস্ত্রের সম্মানলাভ করিয়াছিল অর্থাৎ যৌনব্যাপারে লোকে কামশাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়া চলিত। যে প্রকার পর্যবেক্ষণের ফলে কামশাস্ত্র বা কামবিজ্ঞান গঠিত হইতে পাবে, তাহার ধারা বহুকাল হইল এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে কামবিদ্যা বিদেশীয় পণ্ডিতগণের গবেষণাব ফল। আধুনিক কামবিদ্যার সমস্ত মৌলিক গ্রন্থই বিদেশীয় ভাষায় লিখিত। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাব সবগুলিই সঙ্কলন। এই সকল পুস্তকে কামবিদ্যাব যে আলোচনা আছে, তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে, এবং লেখকগণের মতামতও সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পক্ষপাতদোষশূন্য নহে। আলোচ্য গ্রন্থও মূলতঃ বিদেশীয় কামবিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হয়, কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে যৌনবিজ্ঞানেব সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আছে। গ্রন্থকার অশেষ পরিশ্রম কবিয়া বহু বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত কামশাস্ত্র, আরবীয় কামবিদ্যা সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত পুঁথি, ও পুস্তক ইউনানী চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি নানা প্রাচ্য জ্ঞানভাণ্ডাব অনুসন্ধান করিয়া তিনি জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ উদ্ধার করিয়াছেন। গ্রন্থকারের 'যৌনবিজ্ঞান'কে **কামসংহিতা** বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি কামবিদ্যাব বিশেষজ্ঞ না হইয়াও বহু অনায়াসলব্ধ তথ্যগুলির আলোচনায় যে **নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির** পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই **বিস্ময়কর**। যেখানে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান, সেখানে তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া সুচিন্তিত পথ-নির্দেশ করিয়াছেন। 'যৌনবিজ্ঞানে' বিজ্ঞানগ্রন্থোপযোগী সকল গুণই আছে। গ্রন্থকাবের লিখনভঙ্গী মার্জিত ও সুরুচিসম্মত; তাঁহাকে অনেক নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে হইয়াছে। পরিভাষা সকল ক্ষেত্রে সুকল্পিত না হইলেও কুত্রাপি তাহা ভাবপ্রকাশে অস্বচ্ছন্দতা আনে নাই।

গ্রন্থকারের সহিত সকল কামবিজ্ঞানী একমত হইবেন, এমন আশা করা যায় না। 'রতিকালের স্থায়িত্ব', 'জন্মনিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়া'র উপযোগিতা-বিচার

ইত্যাদি কতিপয় গুরু বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক পণ্ডিতের মতভেদ দেখা যাইবে।* এই সকল মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থের মূল বিষয় কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

'যৌনবিজ্ঞান' পাঠে সাধারণে উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি—

১৪ পার্শীবাগান, কলিকাতা — শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪২

* পরবর্তী সংস্করণসমূহে আরও যুক্তি দিয়া এগুলিকে সম্যক্ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। —গ্রন্থকার।

বর্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন

যৌনবিজ্ঞান গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ ১৯৩৬ সনে বাহির হয়। পাঠক-পাঠিকা, সংবাদপত্র ও পত্রিকা, দেশের সকল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং সাহিত্যিকেরা উহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন। এজন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মূল সংস্করণের মুখবন্ধে লিখিয়াছিলাম :

"এই গ্রন্থের একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ও সঙ্কল্প আছে। তাহার উপকরণও যোগাড় হইয়া আছে।* তথাপি দুইটি কারণে আমি বাঙলা সংস্করণ আগে প্রকাশ করিলাম। প্রথম কারণ এই যে, আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীগণকে মাতৃভাষার সাহায্যে সকল প্রকার শিক্ষা দেওয়ার দাবি আজ সর্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিবার মত পারিভাষিক শব্দ বিদ্যমান নাই বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা দূর করিবার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনীষিগণের সাধু প্রচেষ্টা আমাকে বহুলাংশে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যদিও আমাকে অল্প-বিস্তর শব্দ তৈয়ারী করিতে হইয়াছে, তথাপি আমি গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি যে, জটিল বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দের অভাব আমি আমার মাতৃভাষায় খুব বেশী অনুভব করি নাই। পারিভাষিক শব্দের অভাবে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-প্রণয়নে আমাদের মাতৃভাষার উপযোগিতায় যাঁহারা সন্দিহান, আশা করি শীঘ্রই তাঁহাদের সন্দেহের অবসান হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের শিক্ষাপীঠসমূহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্যসেবীদের চেষ্টার ফলে তাঁহাদের সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে।

---

* এই পুস্তকের প্রতি সংস্করণে বিস্তর নূতন তথ্য, মত ও পরিসংখ্যান যুক্ত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণের পাণ্ডুলিপি এক খণ্ডের জন্য স্থূলকলেবর হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রথম খণ্ডে সকলের জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য নানা বিষয় রাখা হয় ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে দম্পতিদের আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়। এই দুই খণ্ডের কোন কোন অংশ বর্জন ও কোন কোন অংশ সংক্ষেপিত করিয়া ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহাদের সরল ইংরেজী অনুবাদ All About Sex, Love and Happy Marriage প্রকাশিত হয়।

পরবর্তী সংস্করণগুলিতে আরও নূতন নূতন তথ্য সংযোজিত হইয়াছে।

"মনোবিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ গবেষক ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, এম-বি, ডি-এস্-সি মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমি আশা করি, যে আন্তরিক সদিচ্ছা লইয়া আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি, অনুরূপ সদিচ্ছা লইয়া বাঙলার পাঠকসমাজে ইহা অধ্যয়ন ও সমালোচনা করিবেন।"

মূল সংস্করণে সুসাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ সাহেব আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় নির্মলচন্দ্র দে সমগ্র বিষয়বস্তুর সমালোচনা, নূতন বিষয়ের যোজনা, দোষক্রটি-সংশোধন ইত্যাদি বিষয়ে অসামান্য সাহায্য করিয়াছেন। ইহার গভীর জ্ঞান, বিচার-বিবেচনা, প্রতি পৃষ্ঠার প্রতি বাক্যের সূক্ষ্ম যাচাই করা আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে। রাজসাহীর প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সুনীলকুমার নন্দী, এম-বি, ডি-টি-এম মহোদয়ও বহু মাল-মসলা যোগাইয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বস্তুতঃ এই সংস্করণের প্রায় প্রতি বাক্য, প্রতি অনুচ্ছেদ, প্রতি পৃষ্ঠা আমূল সংশোধিত এবং বিষয়বস্তু অসংখ্য নূতন তথ্যযোজনায়, নূতন বিষয় সন্নিবেশে দ্বিগুণেরও অধিক পরিবর্ধিত হইল। চিত্রসংখ্যাও বাড়ানো হইয়াছে।

মূল সংস্করণের উপর এতটা হস্তক্ষেপ করিতে হওয়ার কারণ বহুবিধ :

(১) যৌনজ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ও উন্নতি ;

(২) পাঠক-পাঠিকার পূর্বে আলোচিত নানা বিষয়ে আরও জানিবার আগ্রহ এবং আরও নূতন বিষয়ে জিজ্ঞাসা ,

(৩) বহু সামাজিক সমস্যার আলোচনা এবং উহাদের প্রতিষেধক এবং প্রতিকারমূলক উপায় ও উপকরণের উল্লেখ ও বিচার।

(৪) যৌন-নিষ্ঠার স্বরূপ পরিবর্তিত হওয়ায় জনসাধারণকে এ সম্বন্ধে অবহিত করিবার আবশ্যকতা ,

(৫) আমার নিজের অধ্যয়ন, আলোচনা, গবেষণার বিস্তৃতি ,

(৬) বাঙলা ভাষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একখানা সত্যকার যৌনবিশ্বকোষের অভাব থাকায় তাহা পূরণ করিবার জন্য বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ।

বস্তুতঃ এই সংস্করণ মূল সংস্করণের ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান, কিন্তু উহার উপর একেবারে নূতন গৃহ রচনারই সমতুল্য। পরিবর্ধিত সংস্করণ-

গুলি মাত্র তিন মাস, পাঁচ মাস ও এক এক বৎসরকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে পাঠক-পাঠিকা এবং আমার দেশবাসী গ্রন্থখানিকে আদর করিয়াই চলিয়াছেন। নানা কারণে দ্রুত মুদ্রণ সম্ভবপর হইতেছে না। বহু বিলম্ব ঘটিয়া যাইতেছে।

পূর্ব পূর্ব সংস্করণ যাঁহারা পড়িয়াছেন বা পড়িতেছেন, তাঁহারাও এই নূতন সংস্করণে অনেক কিছু নূতন তথ্য পাইবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

সর্বদেশের অনেক খ্যাতনামা লেখকেরও একটা কদভ্যাস এই যে, লিখিত পুস্তক একবার জনপ্রিয় হইয়া গেলে উহার পুনর্মুদ্রণ করিয়াই তাঁহারা আত্মপ্রসাদ ও অর্থ লাভ করিতে থাকেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার যে বিষয়বস্তুর সংশোধন-সংযোজন অপরিহার্য করিয়া তোলে পরিশ্রমে বিমুখ হইয়া ইহা যেন তাঁহারা ভুলিয়াই যান। এই ন্যায্য প্রাপ্তি হইতে আমি পাঠক-পাঠিকাকে বঞ্চিত করি নাই—করিবও না।

যৌনবিষয়ে পূর্বে যাহা অন্ধবিশ্বাস বা অনুমানমাত্র ছিল, অধুনা তাহা অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক তথ্যের রূপ পাইয়াছে। আবার এই তথ্যসমূহ সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের দিক হইতে জনসাধারণের ব্যবহারিক জীবনকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে বা করা উচিত তাহা লইয়া দর্শন বা ফিলোসফির প্রশ্নও উঠিতেছে। এই সমাজসমস্যামূলক বহু আলোচনায় আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আমার দেশবাসী সব ক্ষেত্রে আমার সহিত একমত না হইতে পারিলেও আমার বক্তব্যগুলি বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—এ দৃঢ় বিশ্বাস আমি পোষণ করি।

সুরুচিসম্মত বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন 'নবনারী' ও 'নতুন জীবন' মাসিক পত্রিকাদ্বয় এই পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া জনসাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন, এ জন্য তাহাদের সম্পাদকদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আলোচনার প্রসঙ্গবিশেষ (যথা, প্রণয়সাপেক্ষ পরিণয় বনাম পরিণয়সাপেক্ষ প্রণয়) বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান-পরিষদে প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত ও আলোচিত এবং নেতৃস্থানীয় কয়েকটি সংবাদপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—এইজন্য সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহোদয় এবং বিভিন্ন সম্পাদকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

সঠিক যৌনজ্ঞান বিতরণে সকল পত্রিকারই সহযোগিতা করিবার সময় আসিয়াছে, আমি এইরূপ মনে করি। এই পুস্তকের অংশবিশেষ ঋণস্বীকার-পূর্বক উদ্ধৃত করিবার অনুমতি সকলের জন্যই রহিল।

শুধু প্রচারই নহে, যৌনবিজ্ঞান তরুণ-তরুণীর শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া সভ্যজগৎ স্বীকার করিতেছে। এ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে সোশ্যাল হাইজিন এক্সপোজিশন (Social Hygiene Exposition) এর এড্ভাইজরী বোর্ডের এক সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল: বাঙলার গভর্নমেন্ট এবং কলিকাতা কর্পোরেশন বিনামূল্যে রতিজরোগসমূহের পরীক্ষা ও চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা করুন এবং ঐ রোগসমূহের উৎপত্তিস্থল ও কারণ নির্ণয় করুন। এই প্রস্তাবে ইহাও বলা হইয়াছে, শিক্ষাবিভাগ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহ প্রাথমিক যৌনবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করুন। আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। পাক-ভারতে ইহা সর্বত্র কার্যতঃ আমল দিলে আমি সুখী হইব।

জ্ঞানবিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা অফুরন্ত, সাধনার পথ অনন্ত। পাঠক-পাঠিকা নূতন প্রশ্ন, নূতন তথ্য, নূতন ভাব যোগাইয়া অন্বেষণ-অনুসন্ধানের পথে আমায় সাহায্য করিবেন কি?

আবুল হাসানাৎ

বিষয়সূচী

(প্রথম খণ্ড)

(১) যৌনবিজ্ঞানের ইতিহাস— ১৭—৩৬

যৌনবোধের স্বরূপ ১৭, নিরোধ চেষ্টা ১৭, সাহিত্যে আত্মবিকাশ ১৮, ভারতীয় পণ্ডিতগণ ১৮, লুপ্ত যৌনশাস্ত্র ১৯, অন্যান্য দেশের যৌনশাস্ত্র ২০, ওভিডের প্রেমকাব্য (The poetry of love)২১, সেবাসিনীয় সভ্যতার যৌনচর্চা ২২, মধ্যযুগে অধঃপতন ২৫, আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার গবেষণা ২৫, হ্যাভ্‌লক এলিস (Havelock Ellis) ৩১, কিন্‌সে ও সহকর্মীদের বিরাট অবদান ৩২।

(২) যৌনশাস্ত্রের যৌনবিজ্ঞানে পরিণতি— ৩৭—৪৯

প্রাচীন যৌনশাস্ত্রের ধারা ৩৭, ধর্মের প্রবর্তন ৩৭, শুক্রস্খলনে অপবিত্রতা ৩৯, ঋতুমতীর প্রতি অবজ্ঞার ভাব ৪০, বধূর কুমারিত্ব সম্বন্ধে কড়াকড়ি ৪১, কুমারীর প্রজনন ৪২, প্রকৃত ব্যাপার ৪৩, পুরাতন রতিশাস্ত্রের ধারা ৪৬, প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণার তুলনা ৪৭।

(৩) নির্ভুল যৌনবিজ্ঞানের আবশ্যকতা— ৫০—৭৮

আধুনিক পাক-ভারতে যৌনতত্ত্বের অবহেলা ৫০, ধর্মে ৫২, নীতিতে ৫৩, সমাজে ও রাষ্ট্রে ৫৩, যৌন-শিক্ষায় বিপদ ৫৪, শাসনের প্রয়োজনীয়তা ৫৫, শাসনের জটিলতা ৫৫, গোপনতা ও স্পষ্টতা ৫৬, গোপনতার কুফল ৫৭, যৌন-অজ্ঞতার স্বরূপ ৫৮, শাসনের ব্যর্থতা ৬২, বিরুদ্ধ মতবাদ ৬২, প্রকৃতির শিক্ষা ও গোপনতার অসম্ভাব্যতা ৬৪, কিংকর্তব্যম্ ৬৬, যোগ্য শিক্ষক ৬৬,শিক্ষা প্রণালী ৬৭, শিক্ষকের অভাব ৬৯, প্রকৃত যৌনশাস্ত্রের অভাব ৬৯, এই পুস্তকের উপকরণ ৭০, পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতা ৭১, অজ্ঞতা ধর্মের ভিত্তি নহে ৭২, উপযুক্ত যৌনগ্রন্থের উপহার প্রদান ৭৩, যৌন বিকল্পের প্রসার ৭৬, পূর্বসংস্কার

জ্ঞানাহরণের পরিপন্থী ৭৪, বিজ্ঞান সাধনার ক্রমবিকাশ ৭৪, মত পার্থক্য স্বাভাবিক ৭৫, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাই জ্ঞানের উৎস ৭৬, ফোবেলের কল্পিত দাম্পত্য জীবন ৭৭।

(৪) জন্ম রহস্য— ৭৯—৯১

জনসাধারণের অজ্ঞতা ৭৯, বংশবিস্তারের সহজ প্রক্রিয়া ৭৯, পক্ষীর বংশবিস্তার প্রণালী ৮১, মুরগীর ডিম ও ছানা ৮২, মানব জন্ম প্রকরণ ৮২, নারীর অবদান ৮৩, পুরুষের অবদান ৮৬, গর্ভাধান ৮৯, কোষ বিভক্তি প্রক্রিয়া ৮৯।

(৫) যৌন-ইন্দ্রিয়সমূহ— ৯২—১১১

যৌনশ্রেণী ও যৌন ইন্দ্রিয় ৯২, কেন জ্ঞান আবশ্যক ৯২, পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয়সমূহ ৯৩, নারীর যৌনঅঙ্গসমূহ ৯৭, ডিম্বস্ফোটন ও ঋতুস্রাব ১০১, ঋতুস্রাব সম্বন্ধে বিচিত্র প্রথা ১০১, যৌবন লক্ষণগুলি প্রকাশের বয়স ১০৩, বিভিন্ন প্রকার প্রজনন ১০৪, উভলিঙ্গ বা মধ্যলিঙ্গ ১০৫, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ ১০৭।

(৬) যৌনবোধের স্বরূপ : দেহের সহিত সম্বন্ধ— ১১২—১২৪

যৌনবোধ কাহাকে বলে ১১২, যৌনবোধ একটি স্বাভাবিক বৃত্তি ১১২, দেহের সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ ১১৩, যৌনপ্রদেশসমূহ ১১৪, মিলনে যৌনপ্রদেশের ক্রিয়া ১১৫, ব্যক্তিভেদে যৌনপ্রদেশের অনুভূতিশীলতার ব্যতিক্রম ১১৫, যৌনবোধ ও পঞ্চেন্দ্রিয় ১১৫, যৌনবোধ ও দর্শনেন্দ্রিয় ১১৬, যৌনবোধ ও শ্রবণেন্দ্রিয় ১১৯, যৌনবোধ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় ১২০, যৌনবোধ এবং জিহ্বা ও ত্বগিন্দ্রিয় ১২১, মিলনের দৈহিক প্রতিক্রিয়া ১২৩, ক্লান্তিনাশক নিদ্রা ১২৩।

(৭) যৌনবোধ : উহার স্বরূপ ; মনের সহিত সম্বন্ধ, কাম ও প্রেম— ১২৫—১৪৩

যৌনবোধের মানসিকতা ১২৫, যৌনবোধের প্রকৃত স্বরূপ ১৩০, কাম ও প্রেম ১৩১, প্রেমের বিশ্লেষণ ১৩৫, ইতর প্রাণীর মধ্যে প্রেম ১৩৬, বাল্য ও কৈশোর প্রেম ১৩৬, যৌবন ও প্রেম ১৩৭, প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম ১৩৮, প্রেমের কাম্য ১৩৯, বার্টন্ড দম্পতি ১৪১, প্রেমের মহিমা ১৪৩।

(৮) নর ও নারীর যৌন-প্রকৃতিভেদে— ১৪৪—১৬৪

নারী ও পুরুষের প্রকৃতিভেদ ১৪৪, কে শ্রেষ্ঠ ১৪৪, স্বাভাবিক পার্থক্য ১৪৫, নর ও নারী পরস্পরের পরিপূরক ১৪৬, পুরুষের স্বার্থপরতা ১৪৭, নারীচরিত্র চিত্রণে পুরুষের বিরুদ্ধভাব ১৪৭, নারীপুরুষের যৌনবোধের পার্থক্য ১৫০, নরনারীর যৌন সাড়ার পার্থক্য ১৫৬।

(৯) দেশ, কাল, বয়স ও পাত্রভেদে— ১৬৫—১৯১

যৌনবোধের পার্থক্য ১৬৫, যৌনবোধে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ১৬৭, আত্মঋতুর বয়সের তারতম্যের কারণ ১৭০, যৌন-অঙ্গের আকৃতি ভেদে যৌনবোধের পার্থক্য ১৭২, বয়সভেদে নারী-পুরুষের শরীর মন ও রতিপ্রকৃতি ১৭৩, ব্যক্তিভেদে যৌন-প্রকৃতির পার্থক্য ১৮১, প্রাচীন ভারতীয় মতে নর ও নারীর শ্রেণী বিভাগ ২৮২, চারি প্রকার পুরুষ ১৮২, চারি প্রকার নারী ১৮৪, মিডারের শ্রেণী বিভাগ ১৮৫, গাইওঁর শ্রেণী বিভাগ ১৮৬, নারীর যৌনবাসনার জোয়ার-ভাঁটা ১৮৭, চন্দ্রের প্রভাব ১৮৭, ঋতুস্রাবের সঙ্গে সম্বন্ধ ১৮৯।

(১০) যৌনবোধের উন্মেষ— ১৯২—১৯৯

শৈশবে দৈহিক অনুভূতি ১৯২, মানসিক অনুভূতির ক্রমবিকাশ ১৯৩, ফ্রয়েডের বিচিত্র মতবাদ: শিশুর আত্মীয় সম্ভোগলিপ্সা ১৯৩, শৈশবের যৌনআচরণ ১৯৪, যৌন উত্তেজনা: শৈশবে ১৯৮, যৌনবোধের প্রকাশ ১৯৯।

(১১) যৌনবোধের বিভিন্নমুখী প্রকাশ (১)— ২০০—২২০

স্বয়ংমৈথুন (Auto eroticism) ২০০, হস্তমৈথুন (Masturbation) ২০১, আত্মরতির অভ্যাসের সহিত স্বামীসহবাস সুখের সম্পর্ক ২০৯, নরনারীর আত্মরতি আরম্ভ করার বয়সের তুলনা ২১০, বালকদের কোন বয়সে আরম্ভ হয় ২১১, ডঃ কিন্‌সে ও সহকর্মীদের অনুসন্ধানে ২১১, ডঃ কিন্‌সে ও সহকর্মীদের গবেষণার ফল ২১৪, কি ভাবে প্রথম সূত্রপাত ২১৫, প্রক্রিয়া ভেদ ২১৬।

(১২) যৌনবোধের বিভিন্নমুখী প্রকাশ (২)— ২২১—২৩৩

জাগ্রত, অবস্থায় স্বপ্ন (Day-dreaming) ২২১, স্বাভাবিক

মিলনের কৃত্রিম অনুকরণ ২২২, স্বপ্নদোষ বা কামস্বপ্ন (Erotic dreams) ২২২, নারীদের কামস্বপ্ন ২২৭, স্বপ্নদোষের কারণ ২২৮, প্রতিকার ২৩১, স্বকাম বা আত্মপ্রেম (Narcissim) ২৩৩।

(১৩) যৌনবোধের বিভিন্নমুখী প্রকাশ (৩)— ২৩৪—২৫১

সমকাম (Homosexuality) ২৩৪, ডঃ কিন্‌সে ও তাঁহার সহকর্মীদের অনুসন্ধানে ২৩৮, বিপরীতকামী ও সমকামী ব্যক্তিদের অনুপাত ২৪১, সমকামাত্মক আকর্ষণ ও আচরণ ২৪১, পাত্র-পাত্রীর অভাব সমকামের কারণ সমূহ ২৪৩, বয়স্কদের স্থায়ী অভ্যাস ২৪৩, বালক দেহজাবী ২৪৩, সহজাত না অভ্যাসজাত ২৪৪, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির প্রভাব ২৪৫, রুচিবিকৃতি মাত্র ২৪৫ প্রতিষেধ ও প্রতিকার ২৫০, সামাজিক মনোভাব ২৫০।

(১৪) যৌনবোধের বিভিন্নমুখী প্রকাশ (৪)— ২৫২—২৭৬

যৌনবিকৃতি (Perversion) ২৫২, কেলির স্বাভাবিক বৈচিত্র্য ২৫২, গৌণ পন্থা ২৫২, যৌন-বৈপরীত্য (Transvestism or Eonism) ২৫৩, কিন্‌সেদের সিদ্ধান্ত ২৫৫, প্রতীকানুরাগ (Fetishtsm) ২৫৭, পশুগমন (Beastiality) ২৫৮, ডঃ কিন্‌সের অনুসন্ধানে ২৫৯, শিশুগমন (Infantilism) ২৬২, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার প্রতি আকর্ষণ (Gerontophilia) ২৬৩, মৃতদেহে আসক্তি (Necrophilia) ২৬৪, ধর্ষণেচ্ছা ও ধর্ষিত হইবার প্রবৃত্তি ২৬৪, প্রদর্শনকাম (Exhibitionism) ২৬৫, দর্শনপ্রবৃত্তি (Voyeurism) ২৭০, নগ্নতাচর্চা (Nudism) ২৭২।

(১৫) যৌনবোধ বিকাশের ধারা— ২৭৭—২৯৮

নরনারীর স্বীয় জীবন সম্বন্ধে বিবৃতি ২৭৭।

(১৬) যৌনবোধের স্বাভাবিক পরিণতি— ২৯৯—৩০৬

নরনারীর যৌন সম্পর্ক ২৯৯, নর ও নারীর মিলনেতর কামক্রীড়া ২৯৯, আদিযুগে কামক্রীড়া ৩০০, কলাভেদ ৩০১, প্রসার ও পৌনঃপৌনিকতা ৩০২, ফলাফল ৩০৪, সামাজিক গুরুত্ব ৩০৪।

(১৭) বিবাহেতর যৌনমিলন— ৩০৭—৩২২

উহার প্রসার ৩০৭, কারণসমূহ ৩০৭, ইতরপ্রাণীর আচরণ ৩০৮, আদি মানবজাতির মধ্যে ৩০৯, কিরূপে সংঘটিত হয় ৩১১, প্রসার ৩১১, বিবাহ-পূর্ব যৌনমিলন ৩১৪, বিবাহেতর মিলনের

প্রসারের কারণাবলী ৩১৫, ভারতবর্ষে ব্যতিক্রমের কারণ ৩১৭, যুগ যুগান্তরে ৩১৮, কারণসমূহ ৩১৯, বিবাহেতর যৌনমিলন ৩২২।

(১৮) গণিকাবৃত্তি (Prostitution) ৩২৩—৩৫০

উৎপত্তির কারণ ৩২২, ব্যাবিলনে ধর্মানুষ্ঠানরূপে ৩২৪, বেশ্যা কাহাকে বলে ৩৩০, প্রাচীন কালে এই বৃত্তি প্রসার লাভের কারণ ৩৩০, কেন নারী এই বৃত্তি অবলম্বন করে ৩৩১, গণিকার শ্রেণী-বিভাগ ৩৩৩, দেহ-ব্যবসায়ী সকর্মক পুরুষ ৩৩৪, দেহ-ব্যবসায়ী অকর্মক বালক ৩৩৫, পুংমৈথুনের ইতিহাস ও প্রসার ৩৩৫, কারণ ৩৩৬, পতিতা ও বন্ধ্যাত্ব ৩৩৬, পতিতাবৃত্তির উপকারিতা ৩৩৯, ডঃ বিনয়েদের অনুসন্ধানে ৩৪১, অপকারিতা ৩৪২, বালিকা ও নারী লইয়া ব্যবসা ৩৪৪, গণিকা উচ্ছেদে লীগ-অব-নেশন্‌স্‌ ৩৪৬, সোবিয়েতে গণিকাবৃত্তি লোপ ৩৪৭।

(১৯) যৌনবোধ ও বিকাশের মনোবিশ্লেষণ
(The Psycho analytic theory of sex)— ৩৫১—৩৬০

ফ্রয়েডের অভিমত ৩৫১, ফ্রয়েডের নূতন পদ্ধতি ৩৫২, অতি আসক্তি (Manias and Fetiches) ৩৫৩, অত্যধিক ভয়-বিতৃষ্ণা (Phobias and anti-fatiches) ৩৫৪, অবচেতন মন ৩৫৫, অদ, অহং ও পরাহং (ID,EGO and Supper-EGO) ৩৫৬, যৌনপ্রবৃত্তি ও জবরদস্তি (Sexuality and Aggression) ৩৫৬, ফ্রয়েডীয় যৌন-মনস্তত্ত্ব (Freudian Psychology of Sex)—৩৫৭, শিশুর যৌনবোধ (Infantile Sexuality) ৩৫৭, এডলার ও ইয়ুং (Adler and Jung) ৩৫৯, যৌনপ্রবৃত্তির গুরুত্ব ৩৫৯।

(২০) যৌনবোধ ও লজ্জাশীলতা (Sex and Modesty) ৩৬১—৩৬৩

সলজ্জভাব ৩৬১, লজ্জার বিশ্লেষণ ৩৬১, যৌন-ক্ষেত্রে বক্রোক্তির প্রসার ৩৬৩।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা ও সমাধান

(২১) যৌনবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ—সামাজিক সমস্যা— ৩৬৬—৩৭২

বিবাহপ্রথা: উহার সমাধান ৩৬৬, বিবাহের সংজ্ঞা ৩৬৭, বিবাহের ইতিহাস ৩৬৮, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ৩৭১।

(২২) **বিবাহের প্রয়োজনীয়তা—** ৩৭৩—৩৭৯

বিপরীত অবস্থা: যৌন যথেচ্ছাচার না ব্রহ্মচর্য ৩৭৩, যৌন নিবৃত্তির সুযোগ ৩৭৩, পুত্রকন্যা লাভ ৩৭৬, যৌন-যথেচ্ছাচারে বিপত্তি ৩৭৭।

(২৩) **বিভিন্ন বিবাহপ্রথা—** ৩৮০—৩৮৬

নানাপ্রকারের দৃষ্টান্ত ৩৮০, একপত্নীক বিবাহ ৩৮০, বহুপত্নীক বিবাহ ৩৮০, বহুস্বামী বিবাহ ৩৮৩, দলগত বিবাহ ৩৮৪।

(২৪) **বিবাহ ও বিচ্ছেদের বিভিন্ন প্রণালী—** ৩৮৭—৪০১

পদ্ধতি সার্বজনীন—৩৮৭, পুরাকালে ৩৮৭, হিন্দু সমাজে ৩৮৮, ইসলামে ৩৮৯, চীন দেশে ৩৯০, তিব্বতে ৩৯১, সাঁওতালদের মধ্যে ৩৯২, অন্যত্র ৩৯৩, বিবাহের স্থায়িত্ব ও তালাকের ব্যবস্থা ৩৯৩, তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce) ৩৯৪, বিবাহ নাকচ করা (Dissolution of marriage) ৩৯৫, আইনত পৃথকীকরণ (Judicial separation) ৩৯৫, সতীদাহ প্রথা ৩৯৬, বিধবা বিবাহ: হিন্দু-সমাজে ৩৯৭, বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা ৩৯৮, বিদ্যাসাগরের করুণ আবেদন কত প্রাণস্পর্শী ৩৯৯।

(২৫) **বিবাহের উদ্দেশ্য, উপকার ও দোষ—** ৪০১—৪১০

সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীর সাত রূপ ৪০১, বিবাহের উপকার ৪০৩, বিবাহের দোষ ৪০৬।

(২৬) **বিবাহে বিবেচ্য ও কর্তব্য বিষয়সমূহ—** ৪১০—৪৪৭

প্রণয়-সাপেক্ষ পরিণয় বনাম পরিণয়-সাপেক্ষ প্রণয় ৪১০, প্রণয়-সাপেক্ষ পরিণয় ৪১১, পরিণয়-সাপেক্ষ প্রণয় ৪১২, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রণালীর দোষগুণ ৪১৩, সমন্বয় প্রচেষ্টা ৪২০, বিবাহে বিবেচ্য বিষয় ৪২১, রক্তসম্বন্ধ ৪২১, বংশ ৪২৫, স্বাস্থ্য ৪২৬, ধর্ম-নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মতবাদ ৪২৭, রূপ ৪২৮, গুণ ৪২৯, আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা ৪৩২, বয়স ৪৩২, বাল্য বিবাহ ৪৩৩, প্রৌঢ় বিবাহ ৪৩৬, শুভাশুভ নির্ণয় ৪৩৭, ভাগ্য নির্ভরতা (Fatalism) ৪৩৮, বিবাহে ব্যয়বহুল আড়ম্বর ৪৩৯, দাম্পত্যজীবনে সুখ ৪৪০, যৌনজ্ঞান, ৪৪২, ডাঃ ফোরেলের মতে আদর্শ দাম্পত্যজীবনে ৪৪৩, বিবাহ সম্বন্ধে কর্তব্য: সারকথা ৪৪৪, আদর্শ বিবাহ ৪৪৬।

(২৭) কৈশোর ও যৌবনকালের সমস্যা— ৪৪৮—৪৫৯
ঐ সময়ের নানা উদ্বেগ ৪৪৮।
(২৮) যৌন-স্বাস্থ্য রক্ষা— ৪৬০—৪৭৫
যৌন স্বাস্থ্য রক্ষা সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার অঙ্গ ৪৬০, শিশুদের যৌন-জীবন নিয়ন্ত্রণ ৪৬০, ত্বকচ্ছেদ ৪৬১, নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস ৪৬৩, কোষ্ঠবদ্ধতা ৪৬৩, পোষাক-পরিচ্ছদ ৪৬৪, শিশুদের জন্য পৃথক বিছানা ৪৬৪, শিশুর মানসিক উন্নতি ৪৬৪, কৈশোর ও যৌবনে যৌনভাব ৪৬৬, ঋতুস্রাব ও স্বাস্থ্যরক্ষা ৪৬৭, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা ৪৭০, ব্যায়ামের দ্বারা যৌনক্ষমতা লাভ ৪৭১, কামদমন ও তাহার উন্নয়ন ৪৭১, পূর্ণ কামসংহার প্রায় অসম্ভব ৪৭৩, নিয়মিত যৌনজীবন যাপন ৪৭৪।
(২৯) রতিজ রোগসমূহ— ৪৭৫—৪৯৭
সাধারণ অজ্ঞতা ৪৭৫, গনোরিয়া বা প্রমেহ ৪৭৬, কিরূপে হয় ৪৭৭, শোচনীয় ভুল বোঝা ৪৭৭, অতিবৃদ্ধির বিপদ ৪৭৮, প্রাথমিক লক্ষণ : পুরুষের ৪৭৮, প্রাথমিক লক্ষণ : নারীর ৪৮০, শিশু ও গনোরিয়া ৪৮০, বন্ধ্যত্বের প্রধান কারণ ৪৮১, রোগ নির্ণয় ৪৮১, চিকিৎসা ৪৮২ পেনিসিলিনের আবিষ্কার ৪৮২, সফ্‌ট শ্যাঙ্কার (Soft chancre) ৪৮৩, উপদংশ বা সিফিলিস (Syphilis) ৪৮৪, কিরূপে হয় ৪৮৪, প্রথম অবস্থা (Primary stage) ৪৮৫, দ্বিতীয় অবস্থা (Secondary stage) ৪৮৬, তৃতীয় (Tertiary stage) ৪৮৭, চতুর্থ অবস্থা বা নিউরোসিফিলিস (Neuro Syphilis) ৪৮৭, শিশুর জন্মগত রোগ (congenital Syphilis) ৪৮৮, চিকিৎসা ৪৯০, রতিজ রোগগুলির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় ৪৯১, নারীর পক্ষে প্রতিষেধক ব্যবস্থা ৪৯৪, রতিজ রোগসমূহের ভয়াবহ প্রসার ৪৯৫, ভারতে ৪৯৬।
(৩০) অন্যান্য যৌন রোগ (Other Sexual Disorders)—৪৯৮—৫১৭
পুরুষের যৌনবিশৃঙ্খলা ৪৯৮, অণ্ডকোষ সংক্রান্ত ৪৯৮, এপিডিডাই-মিস সংক্রান্ত ৫০০, শুক্রকীটবাহী নল সংক্রান্ত ৫০০, পুরুষাঙ্গ বা শিশ্ন সংক্রান্ত ৫০০, প্রষ্টেট গ্রন্থিসংক্রান্ত ৫০২, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি সংক্রান্ত ৫০৩, মূত্র সংক্রান্ত ৫০৩, যৌনক্ষমতা সংক্রান্ত ৫০৪,
Uttarpara Jaikrishna Public Library
Gift No. 6113 ......Date. 21.1.07

প্রজনন ক্ষমতা সংক্রান্ত ৫০৪, নারীর যৌনবিশৃঙ্খলা ৫০৫, সতীচ্ছদ (Hymen) সংক্রান্ত ৫০৫, যোনিপথ সংক্রান্ত ৫০৫, জরায়ু সংক্রান্ত ৫০৭, ঋতুস্রাব সংক্রান্ত ৫১১, মূত্র সংক্রান্ত ৫১৫, যৌনক্ষমতা সংক্রান্ত ৫১৫, প্রজনন ক্ষমতা সংক্রান্ত ৫১৫, রক্ত সংক্রান্ত ৫১৬, ডিম্বাশয় সংক্রান্ত ৫১৬।

(৩১) সতীত্বের আদর্শ— ৫১৭—৫৫৪

যৌননিষ্ঠা ও সতীত্ব ৫১৭, সতীত্ব ও পত্নীনিষ্ঠা ৫১৯, ধর্ম ও প্রথাগত যৌন-কদাচার ৫২৩, বিভিন্ন মাপকাঠি ৫৩০, যৌননিষ্ঠার স্বরূপ বিশ্লেষণ ৫৩৩, ব্রহ্মচর্য ৫৩৪, স্ত্রীর সতীত্বের উপর পুরুষের জোর ৫৪০, প্রাগ্‌বিবাহ সতীত্ব ৫৪০, পর্দাপ্রথা ৫৪৩, পুরুষের প্রাগ্‌বিবাহ ব্রহ্মচর্য ৫৪৬, প্রকৃত পালনযোগ্য যৌননিষ্ঠা ৫৪৬, কতিপয় সামাজিক সমস্যা ও উহাদের সমাধান ৫৪৯, চরিত্ররক্ষার সামাজিক উপায় ৫৪৯, (১) সকাল সকাল বিবাহ ৫৪৯, (২) আসঙ্গ বা পরীক্ষামূলক বিবাহ ৫৫০, (৩) বিবাহিত জীবনকে সুখীকরণ ৫৫১, (৪) দম্পতির একত্র বাস ৫৫২, (৫) তালাকের অধিকার ও প্রথা ৫৫২, (৬) বৈধব্যদশার উচ্ছেদ ৫৫২, আলোচনার সারমর্ম ৫৫৩।

(৩২) সৌন্দর্য চর্চা : দেহ ও প্রসাধন— ৫৫৪—৫৭২

রূপসাধনা : ব্যায়াম ও প্রয়োজন ৫৫৬, স্থূলতার প্রতিকার ৫৫৭, কৃশতার প্রতিকার ৫৫৭, ব্যায়াম ও খেলাধূলা ৫৫৮, স্বাস্থ্যবিধি ৫৬১, প্রসাধন ৫৬১, বর্ণ ও চর্ম ৫৬২, মুখমণ্ডল ৫৬৩, দাঁত ৫৬৭, স্তনের যত্ন ৫৬৭, চুলের যত্ন ৫৬৮।

প্রমাণ পঞ্জী (প্রথম খণ্ড)

মূল্যবান কয়েকখানি পুস্তকের তালিকা। ৫৭৩

প্রশ্নমালা (প্রথম খণ্ড)

নর ও নারীর স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে
উত্তরের যোগ্য কতগুলি প্রশ্ন। ৫৭৮

প্রশ্নমালার উত্তর (১)— ৫৮৭

প্রশ্নমালার উত্তর (২)— ৬১৬

বর্ণসূচী (প্রথম খণ্ড)— ৬৬১

দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সূচী— ৬৬৫

যৌনবিজ্ঞান

(১)

যৌনবিজ্ঞানের ইতিহাস

যৌনবোধের স্বরূপ

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো যৌনবোধের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, নারী ও পুরুষ দেবতাদের অভিশাপে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার পরস্পরে মিলিত হইবার জন্য যে অবিরাম আকর্ষণ বোধ করে, সেই **আকর্ষণবোধের নামই যৌনবোধ**। উক্ত অভিমত হইতে কল্পিত দেবতাদের অভিশাপের কথা, বাদ দিয়া আমরা অবশিষ্ট অংশ মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিতে পারি। মোট কথা, **এক লিঙ্গের প্রাণী বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীর দিকে যে দৈহিক এবং মানসিক আকর্ষণবোধ করে তাহাই যৌনবোধ।** ভবিষ্যৎ বংশবিস্তার স্ত্রী-পুরুষের মিলনসাপেক্ষ বলিয়াই যৌনবোধের তীব্রতা ও তাহার তৃপ্তিতে সুখ এত বেশী। তাহা না হইলে পুরুষের আত্মকেন্দ্রীয়তা বা স্বার্থপরতা বা শরীরের অপচয়ের অহেতুক ভয় অথবা নারীর অবহেলা, কষ্টবিমুখতা, ভয়বিহ্বলতা, শালীনতাবোধ ইত্যাদি কারণে মানবজাতি অল্প সময়েই লোপ পাইয়া বসিত।

যৌনবোধের প্রকৃত ব্যাখ্যা আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে করিতেছি। এখানে শুধু এই বলিলেই চলিবে যে, যৌনবোধ মানব-মনের তীব্রতম বৃত্তির মধ্যে অন্যতম। এই বৃত্তির তীব্রতা সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কোয় দ্য কারেল (Francois de Curel) বলিয়াছেন,—সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অন্যান্য ব্যাপারে উন্নত হইলেও যৌনবৃত্তিতে তাহারা আজিও বনের হরিণ-হরিণীর মতই রহিয়া গিয়াছে।

নিরোধ-চেষ্টা

আশ্চর্য এই যে, যৌনবোধকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনা করিতে মানুষ বরাবরই একটা অহেতুক লজ্জা বোধ করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম, নীতি,

সমাজ ও রাষ্ট্র সকলে একসঙ্গে কোমর বাঁধিয়া যেন যৌনবোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। ধর্ম পরকালের নিতান্ত মনোরম সম্ভোগের লোভ ও কল্পনাতীত শাস্তির ভয় দেখাইয়াছে, সমাজ ও রাষ্ট্র কঠোর হাতে শাসন করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। সেণ্ট ভিক্টরের ধর্মমন্দিরে ধর্মযাজকগণের যৌনবোধ সংযত করিবার জন্য বৎসরে পাঁচবার তাঁহাদের রক্ত-মোক্ষণ করা হইত। পৃথিবীতে কোনও দেশে কোনও যুগেই এতাদৃশ ব্যবস্থার অভাব ছিল না। কিন্তু মানুষের যৌনবোধের তীব্রতা তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।

কিন্তু লোকসান হইয়াছে খুবই। যৌনবোধের বিরুদ্ধে এই সার্বজনীন শত্রুতা ইহাকে মানব-মন হইতে দূর করিতে না পারিলেও প্রকাশ্যভাবে ইহার আলোচনা বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যৌনবৃত্তির ন্যায় এমন তীব্র মানব-বৃত্তি সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা হইতে না পারায়, ইহা মানুষের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইতে ক্রমাগত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে মানুষ অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়াও এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে স্বীয় আদিম অকর্ষিত মনোবৃত্তির দাস হইয়াই রহিয়াছে। জগৎসৃষ্টি ও রক্ষার মূলীভূত যে বৃত্তি সে বৃত্তিকে সে অবলীলাক্রমে চাপা দিয়া গিয়াছে।

সাহিত্যে আত্মবিকাশ

কিন্তু লজ্জা বা কৃত্রিম ও বিকৃত রুচি নীতিজ্ঞান মানুষের প্রয়োজনবোধ তীব্রতাকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। ফলে নীতিবাগীশদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা ঠেলিয়াও মানুষ যৌনবোধের কৃষ্টি সাধনের প্রয়াস পাইয়াছে। সেইজন্য প্রকাশ্যভাবে না হইলেও সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে যে একটি শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার নাম **যৌনশাস্ত্র**। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতার ফলে এই শাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হইতে না পারিয়া একটু বক্র, কুটিল ও গোপনীয় গতিপথ অবলম্বন করিয়াছিল। ফলে উহা দ্বারা মানুষ আশানুরূপ ও প্রয়োজনানুযায়ী উপকৃত হয় নাই। কারণ, সমাজদৃষ্টির অন্তরালে গড়িয়া উঠায় এবং অহেতুক সমাজ-শাসন ভয়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শাস্ত্রটি সুষ্ঠুরূপ প্রাপ্ত হয় নাই।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ

যৌনশাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

করেন সর্বপ্রথম ভারতীয় পণ্ডিতগণ। গ্রীক ও মিশরীয় পণ্ডিতগণও প্রসঙ্গক্রমে যৌন-অঙ্গের পরিচয় ও সন্তান জন্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সুশৃঙ্খল ভিত্তিতে যৌনতত্ত্বের আলোচনার অনুপ্রেরণা ভারতীয় পণ্ডিতগণই দিয়াছেন। দত্তাত্রেয় নামক ঋষির বাচনে বাজীকরণ, বীর্যস্তম্ভন, বশীকরণ ইত্যাদি নানা আজগুবি ব্যবস্থা দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাৎস্যায়ন নামক এক পণ্ডিত কামসূত্র নামক একখানি সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করেন। বাৎস্যায়নের পূর্বেও প্রায় দশজন পণ্ডিত মানুষের যৌনবৃত্তিকে সূক্ষ্ম অধ্যয়নের বিষয়ীভূত করিবার উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্র প্রাচীন হইলেও উহাতে বিষয়টি এমন ধারাবাহিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহাব আলোচনার মধ্যেও যে অন্তর্দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কতকটা আধুনিক বিজ্ঞানীর মত। তবে পুবাতন পুঁথি হিসাবে যৌনতত্ত্ববিদ্‌দের নিকট আদরণীয় হইলেও সাধারণ পাঠক-পাঠিকা উহা হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন না। কারণ, পুস্তক প্রণয়নের সময়ে শরীরবিদ্যা অপূর্ণাঙ্গ ছিল এবং সেই হেতু অন্ধবিশ্বাস ও কল্পনার প্রভাবই উহাতে বেশী রহিয়া গিয়াছে।

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে আরও কতিপয় যৌন-শাস্ত্রের পুস্তক আছে। ইহাদের মধ্যে কোকা পণ্ডিতের কামশাস্ত্রই প্রধান। কোকা পণ্ডিত বেণুদত্ত নামক এক রাজার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার **রতিরহস্য** নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কোকা পণ্ডিতের উক্ত পুস্তক তদানীন্তন ভারতে ও পরবর্তী সময়ে এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, রতিশাস্ত্র বা যৌনশাস্ত্র অবশেষে কেবলমাত্র কোকশাস্ত্র নামেই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল।

সংস্কৃত ভাষায় রতিশাস্ত্রবিষয়ক শেষ পুস্তক কল্যাণমল্ল নামক এক পণ্ডিতের রচিত **অনঙ্গ-রঙ্গ**। এই পুস্তকখানি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লোদী পরিবারের কোনও এক রাজার অনুরোধে পণ্ডিত কল্যাণমল্ল কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ঋষি নাগার্জুন তাঁহার প্রিয় শিষ্য তুণ্ডিকে উপদেশ দিবার ছলে **সিদ্ধবিনোদন** নামক এক রতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে।

লুপ্ত যৌনশাস্ত্র

প্রাক্‌-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষে আরও বহু যৌনশাস্ত্রবিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে-সময়ে মুদ্রাযন্ত্র বা রক্ষা করিবার ভাল ব্যবস্থা না থাকায়, ঐ সমস্ত পণ্ডিতের কোনও পুস্তক আমাদের হস্তগত হয় নাই। ইহাতে দুইটি অশুভ ফলোদয় হইয়াছে। প্রথমতঃ ঐ সমস্ত পণ্ডিতের গবেষণার ফল হইতে আমরা বঞ্চিত রহিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত পণ্ডিতের নামে অর্থলোলুপ দায়িত্ব-জ্ঞানহীন পুস্তক বিক্রেতাগণ কতকগুলি কুরুচিপূর্ণ, বীভৎস ও অশ্লীল পুস্তক দিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কোকা পণ্ডিতের নাম করা যাইতে পারে। অনেক যৌনশাস্ত্রবিদ্ কোকা পণ্ডিতের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। কোকা পণ্ডিত বলিয়া কেহ থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁহার রচিত বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক যৌনবিষয়ক পুস্তক 'গরম পিঠা'র মত বিক্রয় হইতেছে।

অন্যান্য দেশের যৌনশাস্ত্র

মিশরীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। প্রাচীন মিশরীয় জ্ঞান-গরিমার বিষয় আমরা প্যাপাইরাস নামক কাগজে উদ্ধার-প্রাপ্ত শ্লোক বা তথ্য হইতে জানিতে পারি। যৌন-বিষয়ে প্রাচীন মিশরীয়দের জ্ঞান অতি সামান্য এবং ভ্রমাত্মক ছিল।

গ্রীস যে-যুগে তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্য দেশ ছিল, সেই যুগে সে দেশের সাহিত্যে যৌনবিজ্ঞানও খুব প্রসারলাভ করিয়াছিল। প্লেটো-অ্যারিষ্টটলের ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতগণ প্রাকাশ্যভাবে ছাত্রগণকে যৌন-বিষয়ে উপদেশ দিতেন। অ্যারিষ্টটল 'অভিজ্ঞ ধাত্রী' (Experienced Midwife) নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অ্যারিষ্টটলের পূর্বে হিপোক্রটীসও এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "স্ত্রীলোকের শারীরিক গঠন", "বন্ধ্যাত্ব" এবং "কৌমার্য" ইত্যাদি বিষয়ে রচনা এখন আর পাওয়া যাইতেছে না। "ভেনাসের আকৃতি" বিষয়ক পুস্তকসমূহে রতিপ্রক্রিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, গভীর জ্ঞানলিপ্সা সত্ত্বেও এই সকল প্রাচীন পণ্ডিত কল্পনা ও অন্ধবিশ্বাসের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রোমীয় সম্রাটগণ এ বিষয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেজন্য ক্যাটুলাস (৮৪—৫৪ খ্রীঃ পূঃ), টিবুলাস—(৫৪—১৯ খ্রীঃ পূঃ) পেট্রোনিয়াস,

মার্শাল (৪১—১০৪ খ্রীঃ), জুভেনাল (৫৫—১৪০ খ্রীঃ) প্রভৃতি বহু কবি ও পণ্ডিত কবিতায়, রসরচনায় ও প্রবন্ধে যৌনবিজ্ঞান আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

ওভিডের প্রেমকাব্য (The Poetry of Love)

এই প্রসঙ্গে ওভিডের (Ovid) নাম জগদ্বিখ্যাত। ইনি খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৩ অব্দে সলমনায় জন্মগ্রহণ করিয়া আইন ব্যবসার জন্য শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু কবিতার দিকেই ঝোঁক বেশী থাকায় তিনি কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। যৌন বিষয়ে তিনি Epistoloe বা Heroides প্রথম রচনা করেন। ইহাতে পূর্বেকার প্রসিদ্ধা প্রেমিকাদের তাঁহাদের প্রেমাস্পদের নিকট কল্পিত প্রেমপত্র ছিল। তাঁহার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Ars Amandi বা Ars Amatoria তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে নারীর প্রেম কি করিয়া জয় এবং রক্ষা করা যায় তাহার উপদেশ দিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ১ অব্দে ইহা লিখিত হয়। নানা ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।*

তিনি কিভাবে প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, তাহা বুঝা যাইবে একটি কাব্যাংশের ভাবার্থ হইতে—

"তুমি যদি প্রেমরাজ্যে জয়ী সৈনিক হইতে চাও, তাহা হইলে প্রথমতঃ কাহাকে ভালবাসিতে হইবে তাহার খোঁজ কর, তারপর কাহাকে জয় করিবে তাহা ঠিক কর এবং সর্বশেষে যাহাতে তাহার প্রেম অটুট থাকে তাহার চেষ্টা কর।

"কৌশলজাল বিস্তার করিয়া চারিদিকে বিচরণ কর এবং কেবলমাত্র যে জন তোমার সম্পূর্ণ সুখের কারণ হয়, তাহাকেই পছন্দ কর। স্বর্গ হইতে রূপসী নামিয়া আসিবে না, মর্ত্যলোকেই প্রিয়াকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

"শিকারীরা জানে কোথায় শ্রম বিফল হইবে না, কোন্ উপত্যকায় পলায়মান শূকর মারা সম্ভব হইবে, যাহারা পাখী শিকার করিয়া বেড়ায় তাহারা কোন্ গাছে পাখী বসে তাহা জানে, যাহারা মাছ ধরিয়া বেড়ায় তাহারা জানে কোথায় সবচেয়ে বেশী মাছ জড়ো হয়। তেমনি তুমিও প্রেমিক সাজিতে চাহিলে যে সব প্রমোদ-উদ্যানে রূপসীরা জড়ো হয় ও আলাপ করে সেখানে বিচরণ করিবে। ইহার জন্য খুব বেশী দূর যাইতে বা সাগর পাড়ি দিতে আমি বলি না।"

প্রেমালাপে পুরুষকেই যে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,—"প্রেয়সীই আগে প্রেমনিবেদন করিবে বা পুরুষকে মনোনয়ন করিয়া

বসিবে, এ কথা ভাবা অনর্থক। পুরুষকে অগ্রগামী হইতে হইবে এবং প্রেম ভিক্ষা করিতে হইবে, নারীজাতি মধুর ও তুষ্টিকর নিবেদন শুনিতে ভালবাসে।

"যোভ্ (ভগবান) পুরাকালে বিনয় সহকারে নারীদের প্রেমভিক্ষা করিতেন, তাঁহার অনুরোধ কোন নারীই এড়াইতে পারিত না।"

ওভিড আরও বহু কাব্য ও গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই কাব্যই সবচেয়ে সুবিদিত। ইহাকে The Poetry of Love বা 'প্রেমের কাব্য' বলা হইয়া থাকে।

এই কাব্য রসাল এবং মজার ব্যাপার হইলেও আমরা যৌনবিষয়ে যে বিজ্ঞানসম্মত তথ্যাদির বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত, তাহাদের সম্বন্ধে উহা হইতে বিশেষ মালমশলা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

ওভিডের আলোচনা অনেকটা প্রেম-অভিসারের অনুকূলে,—নারীদের মজাইবার কুচক্রজাল-বিস্তারে প্রবোচনাদায়ক, কিন্তু আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য দাম্পত্য-জীবনকে কি করিয়া মধুর ও প্রেমময় করা যায়।

সেরাসিনীয় সভ্যতায় যৌনচর্চা

সেরাসিনীয় সভ্যতার আমলে যৌনবিজ্ঞান অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে যৌনশাস্ত্র বাস্তবিকই বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। হ্যাভলক এলিস এই প্রসঙ্গে বলেন,—"The breath of Christian asceticism had passed over love; it was no longer, as in classic days, an art to be cultivated, but only a malady to be cured. The true* inheritor of the classic spirit in this, as in many other matters, was not the Christian world but the world of Islam." অর্থাৎ—খ্রীষ্টীয় বৈরাগ্যের ছাপ প্রেমকলার উপরে পড়ে—খ্রীষ্টান ধর্মে প্রেমকলাকে দমনযোগ্য মনে করা হইত। এ বিষয়, অন্যান্য বহু বিষয়ের মত, ইসলামীয় জগৎই গ্রীক-রোমীয় কৃষ্টির উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টীয় জগৎ নয়।

মুসলিম চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্গণের এমন একখানা চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক আরবী ও ফারসী ভাষায় দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহাতে অন্যান্য বিভাগের ন্যায়

*Ovid—Everyman's Library.

যৌনবিজ্ঞানও স্থান না পাইয়াছে। ফলতঃ মুসলমান হেকিমগণ যৌনবিজ্ঞানকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করিতেন।

যৌন-ব্যাপারে মুসলমানদের কোরআন-হাদিসে বহু মূল্যবান উপদেশের উল্লেখ থাকায় ঐ সমস্ত আয়াৎ ও হাদিসের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণও বিস্তৃতভাবে যৌনবিজ্ঞানসমূহের আলোচনা করিয়াছেন। হাকিম আবু আলী সিনা এবং জালালুদ্দীন সায়ুতী তাহাদের চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকে যৌনবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এমন কি দার্শনিক ইমাম গাজ্জলী তাঁহার নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ "কিমিয়া-ই-সা'দাৎ" ও "এহিয়া-উল-উলুম"-এ যৌনবিষয়ে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ যোগ করিয়াছেন। শেখ নেফযাওই নামক একজন গ্রন্থকার ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিউনিস শহরে যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি তাঁহার "সুগন্ধি কানন" (The Perfumed Garden) নামক পুস্তকের অবতারণা এইভাবে করেন: "সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য খোদাতালার—যিনি পুরুষের সর্বাধিক উপভোগের স্থল নারীর অঙ্গে এবং নারীর পরম তৃপ্তির কারণ পুরুষের অঙ্গে ন্যস্ত করিয়াছেন।"

শেখ নেফযাওইর কেতাবখানা স্যার রিচার্ড ইংরেজীতে 'দ্য পারফিউম্‌ড্‌ গার্‌ডেন' নাম দিয়া অনুবাদ করেন। লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ১৯৬৪ সালের সংস্করণ আমার সম্মুখে রহিয়াছে।

পুস্তকটি ২১ অধ্যায়ে বিভক্ত। "শুনুন হে উযির, মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির নর ও নারী আছে: উভয় শ্রেণীর মধ্যে আবার প্রশংসা ও নিন্দার যোগ্য ব্যক্তি আছে—" বলিয়া প্রথম অধ্যায় শুরু হইয়াছে। পুরুষদের মধ্যে নারীর কাম্যের মধ্যে নারীস্থলভ গাল, চুল, অর্থ, সামর্থ্য, দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ, সুগন্ধি ইত্যাদির কথা আছে।

কেচ্ছা কাহিনীর মারফতেই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নারীর মধ্যে কাম্য সরু কোমর, কান, চুল, বড় চোখ, সুগঠিত নাক, সুডৌল স্তন ইত্যাদি।

মেয়েদের মুখেই কবিতায় নারীর চপলতার কথা বলা হইয়াছে:

অবশ্য এ সব পুরুষসুলভ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট।

এই সংস্করণের অন্যত্র ও পুস্তকের ভাল ভাল কথা উদ্ধৃত করা হইবে। তবে মোটের উপর, এ পুস্তকখানি কোক শাস্ত্রজাতীয়—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লিখিত নয়।

ইসলামে বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, তালাক, স্ত্রীর সংখ্যা, স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে কোরআন সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্দেশ করিয়া দেওয়ায় ঐ সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানদের বিশেষ কোনও স্বাধীনতা ছিল না। কাজেই কোরআন-নির্দিষ্ট মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়াই মুসলমান পণ্ডিতগণ যৌনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইসলামে বৈরাগ্যের ব্যবস্থা না থাকায় স্বামী-স্ত্রীর যৌনসম্বন্ধের উপর কোনও প্রকার অনাবশ্যক বিধি-নিষিধের আরোপ করা হয় নাই। ইসলামে বিবাহেতর যৌনমিলনের বিরুদ্ধে কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান বাদশাহগণ বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত বহুসংখ্যক উপপত্নী রাখিতেন। নিজেদের ভোগলিপ্সাও ইহাদের যৌনবাসনা পূরণের জন্য স্বভাবতঃই বাদশাহগণকে অসাধারণ রতি-শক্তিসম্পন্ন হইতে হইত। সেজন্য তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসকগণকে রতিশক্তিবর্ধক ও বীর্যস্তম্ভক ঔষধের আবিষ্কারে নিয়োজিত থাকিতে হইত। এইভাবে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কাম-লালসাকে উপলক্ষ্য করিয়া কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটা কল্যাণপ্রদ দিক বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

সম্প্রতি আরবী ভাষায়ও বহু যৌনবিষয়ক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত বিশেষ গবেষণার ফল। ইহার মধ্যে 'বৃদ্ধের পুনর্যৌবন প্রাপ্তি' নামক গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বইখানিতে প্রেমকলার সম্যক্ আলোচনা আছে। রতিকৃষ্টির নানা উপায়-উপকরণ বর্ণনা ছাড়া উত্তেজক বহু গল্পের সমষ্টিও ইহাতে আছে। এতদ্ব্যতীত ফারসী হস্তলিখিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে 'খুলাসাতুল মুজারবাবাত' (পরীক্ষিত ঔষধসংগ্রহ) এবং 'কিমিয়ায়ে ইশ্রাৎ (সম্ভোগ-বিজ্ঞান) নামক গ্রন্থ দুইখানিতে রতিশক্তি-বর্ধন, বাজীকরণ ও বীর্যস্তম্ভনের বহু মূল্যবান প্রক্রিয়া ও ঔষধের উল্লেখ আছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে 'দম্পতির রতিজীবন' অধ্যায়ে আমরাও সব বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

ভারতের মুসলমান সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী, ফারসী ও উর্দুতে যৌন-বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রাচীন ভারতীয় ও আরবীয় পণ্ডিতগণের মতবাদের সংমিশ্রণমাত্র। বিখ্যাত 'লয্যত-ন্নেছা' গ্রন্থ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই রসাল নামটি অবলম্বন করিয়াও কোকশাস্ত্রের মত বহু ভালমন্দ গ্রন্থ বাজারে চলিয়া যাইতেছে। সুবিখ্যাত আরবী 'আলকিতাব' গ্রন্থখানি যৌনতত্ত্বের আধুনিক পুস্তক। আলজিরিয়ার ওমর হালবী আবু উসমান নামক জনৈক ব্যক্তি এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন

করেন। ইহার পিতা তুর্কী এবং মাতা মূর রমণী ছিলেন। গ্রন্থখানি তথ্যবহুল ও উপাদেয়।

মধ্যযুগে অধঃপতন

কিন্তু ভারতীয়, গ্রীক, রোমীয় ও সেরাসিনীয় সভ্যতাব পতনের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশীয় যৌনবিজ্ঞান স্বভাবতঃই ভোগে ইন্ধনদাতা রতিশাস্ত্রে পরিণত হইল। জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির দারিদ্র্যের অবিচ্ছেদ্য সহচররূপে মানসিক দারিদ্র্যও আত্মপ্রকাশ করে। এই সমস্ত জাতির সভ্যতা, সাম্রাজ্য ও শক্তির মধ্যাহ্নে যে সব বিষয় উহাদেব মধ্যে বিজ্ঞানরূপে, মানবকল্যাণের হেতুরূপী সত্যানুরাগরূপে, সৃষ্টিরহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনে আন্তরিক সাধনারূপে অধীত ও আলোচিত হইত, সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা লোপ পাইয়া, সেই বিজ্ঞান তাহাদেব কামচর্চা ও কামোদ্দীপনার উপাদান বতিশাস্ত্রে অবনত হইল। যে জটিল রহস্যপূর্ণ বিষয় তত্তৎকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণেব আলোচনা ও গবেষণার বিষয় ছিল, তাহা নিকর্মা, মদ্যাসক্ত পাপচাবীদেব গনিকালয়েব হাস্যপবিহাসের বিষয়ে পবিণত হইল। সুতরাং প্রাচ্য দেশেব যৌনগবেষণাব ফল স্থায়ী হইল না।

মধ্যযুগীয় ইউরোপ যৌন-অনাচারেব লীলাভূমি ছিল বটে, কিন্তু বাহিরে কৃত্রিম ধার্মিকতাব আডম্বর ষোল আনা বজায় ছিল। কাজেই সেই যুগে ইউবোপে যৌনশাস্ত্রেব শিক্ষা ও আলোচনা হওয়া দূরের কথা, নারীপুরুষেব দৈহিক মিলনকে প্রকাশ্যভাবে শয়তানেব কার্য বলিয়া নিন্দা না করিলে ভদ্র-সমাজে স্থান পাইবাব উপায় ছিল না। সমস্ত গির্জা ও মঠ বিবাহেতর অনাচারের লীলাক্ষেত্র ছিল এবং ধর্মযাজক ও মঠাধ্যক্ষগণ ঐ অনাচারের নায়ক হইলেও তাঁহারা বাহিরে চিরকৌমার্য ও ব্রহ্মচর্যের স্তুতিগানে শতমুখ ছিলেন। বিবাহকে তাঁহাবা নিতান্ত দুর্বল ও হতভাগ্য লোকের কাজ বলিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাহাতে অনুমতি দিলেও পুত্রোৎপাদন ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে যৌন-মিলনকে সকলে মিলিয়া সমস্বরে নিন্দা কবিতেন। সুতরাং ঐ আবহাওয়ার মধ্যে যৌনবিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণা হইবার কোনও উপায় ছিল না।

আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার গবেষণা

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সত্যানুসন্ধানে ও প্রকৃতির রহস্যোদঘাটনে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠা ও

সঙ্কল্প সাধনে তাঁহাদের চিত্তের দৃঢ়তা আজ সর্বজনবিদিত। এই সাধনায় কত সত্যাদর্শীকে কুসংস্কার ও অন্ধ গোঁড়ামীর যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে হইয়াছে, তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই। পাশ্চাত্য, বিশেষতঃ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চিত্তের এই দৃঢ়তা, সত্যের জন্য তাঁহাদের এই আত্মত্যাগ, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড বিদ্রোহ অন্যান্য বহু বিজ্ঞানশাখার ন্যায় যৌন-বিজ্ঞানকেও কুসংস্কারমুক্ত করিয়া জ্ঞানালোকের রাজপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফ্রান্সের ব্যালজাক (Balzac, Honore de) বহু পুস্তক লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইঁহার The Physiology of Marriage নামক চটকদার পুস্তকখানি জনপ্রিয় হইয়া পড়ে। ইহাতে নর-নারীর সম্পর্ক এবং বিবাহ সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান এবং বহু রসাল কথা আছে। ব্যালজাকের স্বীয় অভিজ্ঞতা ও তৎকালের সমাজের মনোভাব সম্বলিত এই পুস্তকে বিজ্ঞানসম্মত খুব বেশী তথ্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

ফরাসী লেখক রেনি গাইওঁ যৌনবিজ্ঞানের নানা দিক লইয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে Ethics of Sexual Acts এবং Sexual Freedom উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আরও বই ক্রমে ক্রমে ইংরেজীতে অনূদিত হইতেছে। তাঁহার জ্ঞান সুদূর-প্রসারী। ইনি থাইল্যাণ্ডের হাইকোর্টের একজন জজ।

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ওয়েষ্টারমার্ক (Westermark, Edward) তিন খণ্ডে History of Human marriage নামক একখানি বিবাহের ইতিহাসমূলক পুস্তক সমাপ্ত করেন। ইহাতে বিবাহের উৎপত্তি, প্রসার বৈচিত্র্য ইত্যাদি সম্পর্কে নানা তথ্যের সমাবেশ আছে। ১৯০৭ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত ইনি লণ্ডনে সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। বিবাহের ধারাবাহিক আলোচনায় ইঁহার মতামতের বিশেষ মূল্য আছে।

পাশ্চাত্য জগতের অন্যান্য বহু পণ্ডিত যৌনবিজ্ঞানকে একটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখারূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজনের সামান্য পরিচয় মাত্র দেওয়া এখানে সম্ভবপর। ইঁহাদের পুস্তকের ইংরেজী নামই এখানে দিতেছি।

জার্মানীর ক্রাফট্ এবিং (Kraft-Ebbing. Riehard Freiher Von) যৌনবিকৃতির নানা দিক লইয়া গবেষণা করেন। তাঁহার Psychopath'a. Sexualis একখানা মূল্যবান গ্রন্থ।

ভিয়েনার স্টেকেল (Stekel, Wilhelm) যৌনবিকৃতি, রতিজড়তা ইত্যাদি বিষয়ে বহু গবেষণা করেন। তাঁহার Impotence in the Male এবং Frigidity in Woman দুইখানি তথ্যবহুল পুস্তক।

জার্মানীর হার্শফেল্ড (Hirschfeld Magnus) আরও ব্যাপকভাবে যৌনবিজ্ঞানের চর্চা এবং উহার নানা দিক লইয়া আলোচনা করেন। ইনি নানা দেশ ঘুরিয়া বার্লিনে একটি গবেষণাগার (Museum) স্থাপন করেন এবং প্রাচ্য জগতেরও নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। হিটলারী আমলে এই মহামূল্য গবেষণাগার বহু পুস্তক, উপকরণ, চিত্র ও মূর্তিসহ ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়। হার্শফেল্ডের Sex in Human Relationships একখানি সুন্দর পুস্তক।

হল্যাণ্ডের ভেল্ডি (Van de Velde) একজন প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার। ইনি তথ্যবহুল কয়েকখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে Ideal Marriage সবচেয়ে মূল্যবান। অন্যান্য পুস্তক আলোচনার বাহুল্য দোষে কতকটা দুষ্ট।

ইতালীর মন্তেগাজ্জার (Mantegazza, Paolo) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Sex Relations of Mankind। The Art of Taking a Wife ইঁহার আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ।

সুইজারল্যাণ্ডের ফোরেল (Forel, August) অসামান্য বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাকে চিন্তাশীল যৌন-বিজ্ঞানীদের অগ্রণী বলিয়া অনেকেই শ্রদ্ধা করেন। ইঁহার The Sexual Question নামক যৌনবিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ সূক্ষ্ম আলোচনামূলক গ্রন্থখানি শুধু জ্ঞানই বিতরণ করে না, রীতিমত চিন্তার খোরাক যোগায়। এই পুস্তকখানি প্রথমবার পড়িয়া আমি বাস্তবিকই চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া পড়ি।

ভিয়েনার অধ্যাপক জগদ্বিখ্যাত ফ্রয়েড (Freud, Sigmund) মনোবিশ্লেষণের (Psycho-analysis) প্রবক্তারূপে অমর হইয়া থাকিবেন। যৌনচেতনা যে শিশুদেরও হয় এবং যৌনদমন (repression) যে সমাজবদ্ধ মানুষের নানা রোগ, বিকৃতি পাগলামী ইত্যাদির কারণ হইয়া থাকে, তিনি এরূপ অভিমত প্রকাশ ও প্রচার করেন, তাঁহার Three Contributions to the Theory of Sex নামক গবেষণার ফল সুবিদিত।

ইংলণ্ডের মারশ্যাল (Marshall, F. H. A.) যৌন-অঙ্গসমূহের ক্রিয়া ও

প্রতিক্রিয়া বিষয়ক গবেষণা করেন। ইঁহার Introduction to Sexual Physiology তথ্যবহুল গ্রন্থ। ডাক্তার হেয়ার ((Haire, Norman) যৌনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইনি নানা প্রবন্ধে, পুস্তিকা এবং পুস্তকের মারফতে যৌনবিজ্ঞান প্রচার এবং Encyclopaedia of Sexual Knowledge-Vol. 1 নামক যৌনবিশ্বকোষের সম্পাদনা করেন। Birth Control Methods নামক জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তাঁহার একখানি সুলিখিত বই আছে। তিনি ১৯৫২ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ইংলণ্ডের স্টোপস্ (Stopes, Mary) নাম্নী মহিলা। ইনি জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্লিনিক ইত্যাদি খুলিয়া জনসাধারণকে উপদেশ দেন এবং বহু সহজবোধ্য সুন্দর সুন্দর পুস্তক লিখিয়া যৌনজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হন। ইঁহার পুস্তকগুলি বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। Married Love, Enduring Passion, Wise Parenthood, Contraception, Radiant Motherhood ইত্যাদি বইগুলি সুপরিচিত। ঠিক খাঁটি বিজ্ঞানালোচনা সব ক্ষেত্রে না হইলেও কতকটা কবিত্বময় রচনা সম্বলিত হওয়ায় বোধ হয় সাধারণ পাঠক তাঁহার পুস্তকগুলিকে বেশী আদর করে।

আমেরিকার মারগারেট স্যান্জারের জীবনী বড়ই চিত্তাকর্ষক। ১৯১২ সালে একটি মোটর ড্রাইভার ইঁহাকে ও একটি ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখায়। তিনটি ছেলেমেয়েসহ এই স্ত্রীলোকটি একটি ছোট ঘরে বাস করিত। ডাক্তার ও নার্স মিসেস স্যান্জার দেখিতে পান স্ত্রীলোকটির অবস্থা শোচনীয়—সে নিজেই নিজের গর্ভপাত ঘটাইয়া বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। কয়েকদিন চিকিৎসার পর ভাল হইলে স্ত্রীলোকটি করুণ সুরে জিজ্ঞাসা করে, "ডাক্তার যে কয়টি ছেলেমেয়ে আছে তাহাদেরকেই খেতে দিতে পারি না—আর ছেলেপুলে না হয় কি করলে?" ডাক্তার উত্তর করিলেন, "আপনার স্বামীকে আলাদা শুতে বলবেন।"

মিসেস মারগারেট স্যান্জার
(Mrs. Margaret Sanger)

মিসেস স্যান্জারের মনে দরিদ্র স্ত্রীলোকটির এই করুণ জিজ্ঞাসা দারুণ

রেখাপাত করিল। তিনি তখন হইতে 'বার্থ কন্ট্রোল' কথাটার প্রচলন ও ব্যবস্থার প্রচার আরম্ভ করিলেন।

মিসেস স্যান্‌জারের স্বামীর অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। তাই তাঁহাকে নার্সের কাজ করিয়া কিছু উপরি আয় করিতে হইত। সেই সময়ে বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নারী তাঁহাকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত। তিনি উত্তর দিতে না পারিয়া মর্মাহত হইতেন। তারপর হইতে তিনি মাসের পর মাস ডাক্তারী বহি খুঁজিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের লোকেরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে জানিয়া তিনি সেখানে আসিয়া এ সম্পর্কে জ্ঞানাহরণ কবিলেন।

আমেরিকায় ফিরিয়া The Woman Rebel নামে একখানা ছোট্ট পত্রিকা বাহির করিয়া বার্থ কন্ট্রোল সম্বন্ধে প্রচার চালাইতে লাগিলেন। তারপব তাঁহাকে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইল। জেলে যাইতে তিনি ভয় কবিতেন না। ছাপাখানার মালিকেরা ভয়ে তাঁহার প্রচার পুস্তিকা Family Limitation ছাপাইতে রাজী হইলেন না। অবশেষে একজন রাতারাতি গোপনে উহা ছাপাইয়া দিলে সারা দেশময় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। মেয়েরা হাতে হাতে নকল করিয়া দেশময় ঐ পুস্তিকা ছড়াইয়া দিল এবং বাড়ীতে বাড়ীতে উহাব আলোচনা চলিতে লাগিল।

ইহার পব তিনি প্রকাশ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক খুলিতে চাহিলেন কিন্তু কোনও ডাক্তারই তাঁহার কাজে যোগদান করিতে সাহস পাইলেন না। অবশেষে তিনি ও তাঁহার ভগ্নী নার্স এথেল (Ethel) ব্রুকলিনেব (Brooklyn) একটি ছোট্ট ঘবে আমেরিকার সর্বপ্রথম বার্থ কন্ট্রোল ক্লিনিক খুলিলেন। কয়েকদিনেই বহু নারী জড়ো হইল। সঙ্গে সঙ্গেই আইনে উভয় ভগ্নীর শাস্তি হইল।

ইহার পর ডাঃ এ্যাব্রাহাম ও তদীয় স্ত্রী হ্যানা স্টোন (Dr. Abraham and Dr. Hannah Stone)-এর সহযোগিতায় ১৯২৩ সালে ইঁহারা নিউ ইয়র্কে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ব্যুরো (Clinical Research Bureau) খুলেন এবং সারা আমেরিকায় খ্যাতি লাভ করেন। নানা জায়গায় শাখা-প্রশাখা খোলা, নানা সভাসমিতিতে আলোচনা ও প্রচার হইতে থাকে।

তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও প্রাণপণ উৎসর্গ সারা জগতের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। তাঁহার লেখা My Fight For Birth Control এবং Motherhood in Bondage তাঁহারই জীবনব্রতের পরিচয় দেয়। তিনি

নানা দেশ ঘুরিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা প্রচার করেন ও ক্লিনিক, সমিতি ইত্যাদি গঠনে সহায়তা করেন। তিনি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর বোম্বাই-এ অবতরণ করিয়া জনৈক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার এক স্থলে বলেন,—পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বেচ্ছাকৃত, দায়িত্বপূর্ণ, মহান ও সগৌরব কর্তব্যে পরিণত করিতে হইলে উহাকে অন্ধ নিয়তির হাত হইতে মুক্ত করিয়া সজ্ঞান ও ইচ্ছাসাপেক্ষ কার্যে রূপান্তরিত করিতে হইবে। ইহা হইলেই প্রত্যেক সন্তান বাঞ্ছিত হইবে এবং তাহার প্রাপ্য ভালবাসা, আদর যত্ন ও আরাম পাইবে।

ডেভিস (Davis, Katherine) নামের আমেরিকার অন্য একজন মহিলা নারীর যৌবনজীবন ও মনোভাব সম্পর্কীয় নানা তথ্য আহরণ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহার Factors in the Sex Life of 2200 Women নানা তথ্যে সমৃদ্ধ।

আমেরিকার পুরুষদের মধ্যে ডাঃ ডিকিনসন (Dickinson, R. L.) জন্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং যৌনশারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার Human Sex Anatomy এবং A Thousand Marriage মূল্যবান পুস্তক। শেষোক্ত পুস্তকে বিবাহিত নরনারীর প্রকৃত যৌনজীবন হইতে আহরিত বহু মূল্যবান তথ্য আছে। ইনি কিছুকাল হইল প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ডাঃ স্টোন (Stone, Abraham) এবং তদীয় পত্নী ডাঃ হ্যানা স্টোনও যৌনবিজ্ঞান বিতরণে ও প্রচারকার্যে ব্রতী। তাঁহাদের A Marriage Manual নামে একখানা সহজবোধ্য প্রাথমিক যৌনবিজ্ঞানের পুস্তক খুব ভাল ও জনপ্রিয়।

যৌনবিজ্ঞানের একটি শাখা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ (Birth Control)। এই বিষয়েও বহু পূর্ব হইতে অধ্যয়ন ও আলোচনা চলিয়া আসিয়াছে। এই আলোচনার ইতিহাসও চিত্তাকর্ষক। এই ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে আমার তিনখানা পুস্তকে * দিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

এই পুস্তকের শেষে মূল্যবান গ্রন্থসমূহের যে তালিকা দিলাম, তাহা হইতে আরও বহু লেখক-লেখিকার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তবে যে একজন মনীষীর কথা এখানেএকটু বিস্তৃতভাবে বলা দরকার, তিনি হইলেন হ্যাভলক এলিস।

---

* জন্মনিয়ন্ত্রণ মত ও পথ (ষষ্ঠ সংস্করণ) এবং Ideal Family Planning ও Controlled Parenthood (ইংরেজী পুস্তক)।

হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis)

শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে যৌনশাস্ত্রের সূক্ষ্ম গবেষণার জন্য বর্তমান জগতে ইহার নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্ব-বিশ্রুত মনীষীর সামান্য পরিচয় মাত্র এখানে দেওয়া সম্ভব। একনিষ্ঠ

হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis)

আলোচনা হিসাবে ইহার Studies in the Psychology of Sex নামক সাত খণ্ডে সমাপ্ত সুবৃহৎ ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এলিস ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রয়ডনে জন্মগ্রহণ করিয়া কৈশোর কাল অষ্ট্রেলিয়ায় কাটান। যৌনবিষয়ে চারিদিকের কপট নীরবতা তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তোলে এবং প্রায় ষোল বৎসর বয়সেই এদিকে নির্ভুল জ্ঞানাহরণ করিবার

জন্ম তাঁহার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। শুধু জ্ঞানাহরণই নহে, তিনি জ্ঞান-বিতরণ করিবারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন,—আমি (তখন) এই বলিয়া দৃঢ় সিদ্ধান্ত করিলাম যে, সমস্ত নীতিবাগীশতা ও ভাবপ্রবণতা পরিহার করিয়া আমি আজীবন যৌন-ব্যাপাবের প্রকৃত তথ্যসমূহ উদঘাটন করিব এবং তাহা করিয়া এ বিষয়ে অজ্ঞতার দরুন আমাকে যত সব ক্লেশ ও বিমূঢ়তা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা হইতে ভবিষ্যতের যুব-সম্প্রদায়কে রেহাই দিব।

এলিস দারুণ পরিশ্রম কবিয়া যৌনবিষয়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করাও দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডের নীতিবাগীশদের বিরুদ্ধতার ভয়ে তাঁহাকে প্রথম জার্মানীতে তাঁহার গবেষণার ফল ছাপাইতে হইয়াছিল। পরবর্তী এক খণ্ড (Sexual Inversion) ইংলণ্ডে ছাপাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আইনের কঠোর হস্ত তাঁহার পুস্তক ও প্রকাশকের উপরে পড়ে। আইনে প্রকাশকের দণ্ড হয় এবং পুস্তকখণ্ড পোড়াইয়া ফেলিবার আদেশ দেওয়া হয়।

অবশেষে আমেরিকার এক প্রকাশক তাঁহার গবেষণার ফল সারা জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। ইনি ৮১ বৎসর বয়সে ১৯৩৯ সালে মারা যান।

এখন তাঁহাকে কামোদ্দীপক রতিশাস্ত্রকার বলিবার সাহস কাহারও নাই তাঁহাকে নিঃস্বার্থ সমাজসেবক, নির্ভীক সত্যদ্রষ্টা এবং অতুলনীয় গবেষক বলিয়া সারা জগৎ শ্রদ্ধা করিতেছে। তিনি পথপ্রদর্শক, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু গবেষক আরও সম্মুখে আগাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন মনীষী হারাইযাছি, কিন্তু তাঁহার কীর্তি অমর হইয়া রাহবে।

কিন্‌যে ও সহকর্মীদের বিরাট অবদান

ডঃ কিন্‌যে (Kin[illegible] ও তাঁহার সহকর্মীদের গবেষণার ফল যৌন-সাহিত্যে উল্লে[illegible] তাঁহাদের Sexual Behaviour in the Human [illegible] ও Sexual Behaviour in the Human Female [illegible] প্রায় পনর বৎসর কালের তথ্যানুসন্ধানের ফলে রচিত।

প্রথম বইটি যখন প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৪৮) তখনই সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে বাহির হওয়া মাত্র বইখানির লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হইয়াছিল। আমেরিকায় পুরুষদের যৌন-ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করিবার প্রয়াসে ডঃ কিন্‌যে এবং সমকর্মীরা পাঁচ হাজারের ঊর্ধ্বে মার্কিন পুরুষের নিকট হইতে প্রশ্নচ্ছলে তাহাদের বিভিন্নমুখী যৌন অভিজ্ঞতা ও অভিমত তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

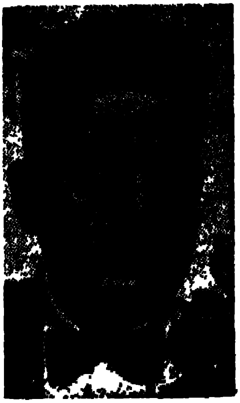

ডঃ কিন্‌যে (Kinsey)

তাঁহাদের প্রশ্নগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, বিবাহ পূর্ব এবং বিবাহোত্তর যৌন-অভিজ্ঞতা বিষয়ে।

বিবাহ-পূর্ব-যৌন-অভিজ্ঞতাকে আবার তাঁহারা দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। স্পর্শ, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি যৌন-অভিজ্ঞতা—যাহার সমষ্টিগত নাম তাঁহারা দিয়াছেন 'petting' অন্য পর্যায়ে স্বয়ংমৈথুন, সহমৈথুন ও সহবাস। প্রশ্নের জবাবে প্রকাশ পায় উত্তর-দাতা মার্কিন যুবকদের শতকরা প্রায় সকলেরই বিবাহ-পূর্ব 'petting' এর অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, শতকরা নব্বই জনের স্বয়ং-মৈথুন ও সহমৈথুনের, শতকরা অন্ততঃ পঞ্চাশ ভাগের সহবাসের। প্রায় সকল নর ও নারীর শৈশব হইতেই যৌন-চেতনা অল্পাধিক থাকে এবং উহা নানাভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে—এ তথ্যও তাহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯৫৩ সালে Sexual Behaviour in the Human Female প্রকাশিত হয়। এই বইটি অধিকতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, কারণ উপরি উক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া ডঃ কিন্‌য়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পরীক্ষিত পাঁচ হাজারের ঊর্ধ্বে বিবাহিতা মার্কিন যুবতী ও প্রৌঢ়ার মধ্যে শতকরা ৪১ জনের, বিবাহ-পূর্ব সহবাসের অভিজ্ঞতা ছিল।

এই সব তথ্য প্রকাশিত হইবার পর প্রায় সমস্ত আমেরিকা জুড়িয়া ডঃ কিন্‌যের বই দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়াছে। তাঁহাদের পুস্তক দুইটির সারাংশ দিয়া ও উহাদের সমালোচনা করিয়া কয়েকখানা গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

একদল বলিতেছেন যে, ইহারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে, যে সব নারীদের তিনি বাছিয়া লইয়াছেন সমাজের তাঁহারা বিশেষ স্তরের—অতএব তাঁহাদের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া মার্কিন নারীদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযোজ্য কোনও মতামত গঠন করা নিরাপদ নয়। পরন্তু ডঃ কিন্‌সের অনুসন্ধানের পদ্ধতি ও ফলাফলকে যদি বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবুও সেসব ফলাফল প্রকাশ কবা তাঁহাদেব পক্ষে সমীচীন হয় নাই। কারণ ইহাতে দেশের যুবসম্প্রদায়ের নৈতিকতাব উপব অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। অন্যদল এই সমস্ত আপত্তি বিজ্ঞানের বিচারে টেকসই নয় বলিয়া মত প্রচার করিতেছেন। ব্যাপারটি নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া দেখিবাব জন্য সকলের চেষ্টা করিতে হইবে।

ডঃ কিন্‌সে তাঁহাদের দুইটি পুস্তকে যেসব তথ্য সমাবেশ করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক যৌন অনুসন্ধানেব ক্ষেত্রে তাহার মূল্য সমধিক, সন্দেহ নাই। এস্থলে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষের দিকে সন্নিবেশিত প্রশ্নমালার উত্তরদাত্রীদের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেমন সঙ্গত হইবে না, তেমনি সে অভিজ্ঞতা উত্তব-দাত্রীদের দেশের অবস্থার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কচ্যুত, এ কথা বলাও নিশ্চয় বাড়াবাড়ি হইবে।

অতএব, যে সকল মার্কিন রমণীর যৌন-ব্যবহার ও অভিজ্ঞতাকে ডঃ কিন্‌সে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন তেমন অভিজ্ঞতা ও ব্যবহাব মোটামুটিভাবে অধিকাংশ মার্কিন নারীরই বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ডঃ কিন্‌সে দেখাইয়াছেন যে, শিক্ষার ব্যবধান বা সামাজিক স্তর-ভেদ যৌন-ব্যবহার বা অভিজ্ঞতাকে তেমন প্রভাবান্বিত করে না, যেমন করে ধর্মীয় মনোভাব। ১৯২০ সাল হইতে এই ধর্মীয় মনোভাব মার্কিন নারীদের ভিতব অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে; ফলে ধর্মীয় মনোভাব যে সব ক্ষেত্রে যৌন-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে তাহার সংখ্যা খুব কম।

মোটামুটি এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ডঃ কিন্‌সের বই দুইটি যৌন-ব্যবহারের তথ্য সমাবেশের দিক হইতে যৌন-সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। তাঁহার সমস্ত মতামত অবশ্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ মেয়েদের চরম-পুলক-প্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলিয়াছেন

তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে সমালোচনা করিয়াছি।

পুরুষের তুলনায় নারীর চরম-পুলক-প্রাপ্তি অনেক বিলম্বে ঘটে। এ কথা মানিয়া লইলে আরও বলিতে হয় যে, ইহার কারণ শুধু দৈহিক জড়তা নয়, মানসিক প্রত্যাশাও বটে। নারী সাধারণভাবে যৌন-ক্রিয়াকে শুধু আঙ্গিক রতিকার্য হিসাবে ধরে না। তাই আদর-আপ্যায়ন, চুম্বন, আলিঙ্গন তার এত কাম্য। এতটা সূক্ষ্মতা দেখাইতে পুরুষের সব সময় ধৈর্য থাকে না—তাই সাধারণতঃ চরম-পুলক-প্রাপ্তি উভয়ের একসঙ্গে ঘটে না।

মনে হয় এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটা ডঃ কিন্‌সে এড়াইয়া গিয়াছেন এবং যৌন অভিজ্ঞতায় মেয়েরা অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত, এই অনির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা দ্রুত রেতঃপাতকে স্বাভাবিক বলিয়া এ বিষয়ে আর বাড়াবাড়ি না করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। অথচ রতিকালের স্থায়িত্ব বাড়াইবার জন্যই রতিকলার প্রয়োজন বেশী।

খুঁটাইয়া দেখিলে বই দুইটির আরও খুঁত বাহির করা কষ্টসাধ্য নয়। তবে সমগ্রভাবে যৌন-সাহিত্যে ডঃ কিন্‌সের বই দুইটি মূল্যবান অবদান এবং পুরুষ ও নারীর যৌন-ব্যবহার ও অভিজ্ঞতার এমন বিস্তারিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিজ্ঞান-সম্মত তথ্যের সমাবেশ আর কোন বইয়ে পাওয়া যাইবে না।

আমি এই সংস্করণে ডঃ কিন্‌সের বই দুইটি হইতে তথ্য ও অভিজ্ঞতাদি গ্রহণ করিযাছি। আবার, যেখানে দরকার সমালোচনাও করিয়াছি। এই বই দুইটি প্রশ্নোত্তরের বেড়াজাল ও সংখ্যানুপাতিক ও অন্যান্য তথ্যে এত ভরা যে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পড়িবার আগ্রহ রক্ষা করিতে পারিবেন না। লেখকদের পক্ষে অবশ্য বই দুইটি অতি মূল্যবান।

ডঃ কিন্‌সে অশেষ পরিশ্রম করিয়া তথ্যানুসন্ধান করিতেন। ১৯৫৪ সনে রকফেলার ট্রাস্টের সাহায্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়েন। নানা দুয়ারে ঘুরিয়া ফিরিয়া অর্থসংগ্রহে বিফল হন। ১৯৫৬ সালের মে মাসে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তথ্যানুসন্ধানে অক্লান্ত কর্মী হিসাবে এবং যৌনবিজ্ঞানে অমূল্য তথ্য পরিবেশক হিসাবে ডঃ কিন্‌সে অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার সহকর্মীরা আর একটি খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন।

শিক্ষা ও প্রচারের ফলে পাশ্চাত্যদেশে আজ শত শত বিজ্ঞানী সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে যৌনবিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য এবং উহাকে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম উপায়ে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে শত শত গবেষণাগার স্থাপন করিয়া উহাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে সাধনায় সমাহিত হইয়া আছেন। মানুষ যদি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া থাকে তবে এই শ্রেষ্ঠ জীবের সৃষ্টিরহস্যই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ রহস্য। মানবের সাধনাকে যদি কোথাও জয়যুক্ত করার প্রয়োজন হয়, তবে তাহা এই রহস্যোদ্ঘাটনে। বস্তুত আধুনিক বিজ্ঞানীর কাছে—শুধু বিজ্ঞানীর নয়, নিতান্ত সাধারণ মানুষের কাছেও—ইহা একটি পরম বিস্ময়ের বিষয় যে, মানুষ এত বড় প্রয়োজনীয় এবং জীবন-মৃত্যু ও কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি এতকাল এমন নির্বোধ উপেক্ষা করিল কেমন করিয়া!

(২)

যৌনশাস্ত্রের যৌনবিজ্ঞানে পরিণতি

প্রাচীন যৌনশাস্ত্রের ধারা

আমরা এতক্ষণ প্রাচীন ও আধুনিক যৌনশাস্ত্রের মোটামুটি একটা ইতিহাস দিলাম। **পুরাতন প্রীতি** বলিয়া একটা মনোভাব অনেকের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে এবং যৌনবিষয়ে বহু প্রাচীন পুঁথি-পুস্তক, শাস্ত্রাদি পাওয়াও যায় বলিয়া পাঠক-পাঠিকাকে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে কোন্‌টাকে কতটা মূল্য দিতে হইবে না হইবে, এখানে তাহা বলিয়া রাখিতে চাই।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখিতে পাইব যে, মানবসৃষ্টি বা উদ্বর্তনের প্রথম হইতে নর ও নারী ইতর জন্তু ও পশু-পক্ষীদের মত যৌন-সম্পর্কের মধ্যস্থতায়ই বংশবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। এই যে বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি ইহার সম্যক্ জ্ঞানলাভ অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নহে। মানুষও বহুকাল পর্যন্ত ইহাকে একটি অজ্ঞেয় রহস্যই মনে করিত। তবে জন্ম-মৃত্যু বিষয়েও মানব মনের তীব্র কৌতূহলবোধ ও জিজ্ঞাসা একেবারে নিরস্ত হইয়া রহে নাই।

ধর্মের প্রবর্তন

সারা প্রকৃতির একজন নিয়ন্তা বা একাধিক পরিচালক যে রহিয়াছেন, এই ধারণা মানব-মনে আপনা হইতেই উদ্ভূত হইল। জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ইহাদেরই পরিচালনাধীন এবং এই হেতু ইহারা ভক্তির যোগ্য, এই মনোভাব হইতেই ধর্মমতের প্রবর্তন হইল।

জনসাধারণ সহজেই বিশ্বাস করিয়া বসিল যে, মানববুদ্ধি শক্তিশালী ও প্রখর হইলেও জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি রহস্যোদঘাটনে অক্ষম, প্রকৃত জ্ঞানের উৎস ঊর্ধ্বলোকে; সেখান হইতে জ্ঞানচ্ছটা মানব-মনে প্রতিফলিত না হইলে বহু তথ্য জানিবার আর উপায় নাই। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মেধাবী নেতারা চিন্তাধ্যান করিয়া জ্ঞানলাভে ব্রতী হইলেন এবং নিজেদের সাধনা প্রসূত জ্ঞানে নিজেরাই বিস্মিত হইয়া ঊর্ধ্বলোক হইতে তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমত সরল বিশ্বাসে শাস্ত্রের বাণী রচনা করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা নিজেরা এবং জনসাধারণ বিশ্বাস করিয়া বসিলেন যে, এরূপ জ্ঞান অলৌকিক ও অভ্রান্ত এবং তাঁহাদের প্রবর্তিত বিধিনিষেধ বিধাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী।

যৌনবিষয়ে বিধিনিষেধের দরকার বোধ হইল যৌনবৃত্তির তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া। উহাকে নিয়ন্ত্রিত না করিলে যৌন-যথেচ্ছাচার সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে বাধ্য, এ সত্য সর্বদাই প্রকট হইয়াছে। তাই ধর্মপ্রণেতা তথা সমাজগুরুরা যৌনবৃত্তি নিয়ন্ত্রণকল্পে বিবাহের প্রচলন করেন ; শুধু তাহাই নহে, বিবাহিত জীবনে কি কর্তব্য, কি নিষিদ্ধ তাহারও নির্দেশ দেন। মানব-সমাজে বিবাহ তাই নানা ধর্মের নানাভাবে বিধিনিষেধের দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

বিবাহজীবনে যৌন-আচরণ ছাড়া যৌন-বিষয়ে অন্যান্য তথ্যের বর্ণনা বা প্রশ্নের উত্তরও জনসাধারণ ধর্মগুরু বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করিত। তাঁহারা জ্ঞান-বিশ্বাস মতে ইহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে চেষ্টাও করিতেন। তাঁহাদের উক্তি বা নির্দেশ সাধারণত তখনকার জ্ঞানের স্তরের তুলনায় খুব উঁচুদরের হইত। তাঁহাদের আন্তরিকতা-পূর্ণ সরল বিশ্বাস জনসাধারণের মনে ভক্তির উদ্রেক করিত। এখনও অনেক ক্ষেত্রে উহা বাস্তবিকই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের **সকল উক্তিই অকাট, সকল তথ্যই নির্ভুল বা সকল নির্দেশই পালনযোগ্য** এ কথা মানব-মন এখন আর মানিতে চায় না। তাহার কারণ :

(১) নানা ধর্মে একই তথ্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং একই অবস্থায় বিভিন্ন নির্দেশ দেখা যায়। শুধু তাহাই নহে,—কতক মতামত আবার সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। একই উৎস হইতে এত বিভিন্নতার সৃষ্টি হইবে কি করিয়া ?

(২) একই উৎস বা কি করিয়া বলা যায় ? যুগের পর যুগ ধরিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচালকদের সংখ্যা বাড়িতে ও কমিতে থাকিল ; দেবতা, উপ-দেবতার সংখ্যার ব্যতিক্রম দেখা গেল ; ধর্মমতের ছড়াছড়ি হইতে হইতে এমন এক সময় আসিল যখন তাঁহাদের মধ্যে সংঘাত ও বিরোধ বাধিয়া গেল। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন দেবতা সকলেই আরাধ্য হন কি করিয়া ? পরস্পরবিরোধী মতবাদসমূহের সবগুলিই বিধাতার নির্দেশ বলিয়া মানা যায় কি করিয়া ?

(৩) ইহার উপরে আবার বহু তথ্য ও মত যাহা পূর্বে অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, পরবর্তী পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের ফলে অসার ও অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল। ইহাতে তথাকথিত ভগবদ্বাণী সম্বন্ধে

মানুষের সন্দেহের উদ্রেক হইল। বিধাতার জ্ঞান যদি অসীম হয়, তাহা হইলে তাঁহার উক্তিতে অসার কথার সমাবেশ থাকিবে কেন?

মোট কথা, মানুষ বুঝিতে পারিল, মানুষই জ্ঞানবুদ্ধিমতে ধ্যান-ধারণা দ্বারা বিবিধ সমস্যার সাময়িক সমাধান করিয়াছে, প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিয়াছে,—কিন্তু সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নিজেরাই ঐ সকল তথ্য ও উত্তরের উৎস উর্ধ্বলোকে আরোপ করিয়াছে, এবং অপরেও অন্ধভাবে ঐরূপ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে।*

এই সকল বুঝিয়া ও ভাবিয়া মানব-মন ক্রমশঃ যুক্তিবাদী হইতে চলিয়াছে।

কোনও কোনও **ধর্মীয় মতবাদ** যৌনজীবনে সে **কত অকল্যাণকর** আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

শুক্রস্খলনে অপবিত্রতা

বিধিসম্মত দাম্পত্যবিহারও যে অপবিত্রতার সূচনা করে এমত ধারণা অনেক ধর্ম ও শাস্ত্রেই আছে। দুঃখের বিষয়, যে প্রতিক্রিয়ার সহিত মানবসৃষ্টি-পদ্ধতিই সংযোজিত, তাহাকে না বুঝিয়া প্রাচীনকালের লোকেরা ঘৃণ্য কাজ মনে করিয়াছে এবং শাস্ত্রের সাহায্যে নিজেদের ধারণা বিধাতার বিধান বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে।

শুক্রস্খলন অনিচ্ছাসত্ত্বে বা অজ্ঞাতসারে হইলেও যে অপবিত্রতা আনে পূর্বেকার শাস্ত্রাদিতে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। বাইবেলে আছে:

"যদি পুরুষের শুক্রস্খলন হয়, তাহা হইলে সে সমস্ত শরীর জলে ধুইয়া ফেলিবে, তাহা না করা পর্যন্ত সে অপবিত্র থাকিবে। আর যে সকল কাপড় বা চামড়ায় শুক্র লাগিবে তাহা জলে ধুইয়া ফেলিবে; তাহা না করা পর্যন্ত উহা অপবিত্র থাকিবে!" হিন্দুশাস্ত্রেও কতকটা এইরূপ বিধান আছে।

ইসলামে স্নান ও ধুইবার বিধিও বোধ হয় উক্ত ব্যবস্থা হইতে গৃহীত।

বিধিসম্মত দাম্পত্যবিহারের পরেও স্নানাদি করিয়া **পবিত্র** হওয়ার বিধি অনেক ধর্মে আছে।

"Behold, I was shapen in inequity; and in sin did my mother conceive me."...অর্থাৎ "আমি পাপের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছি;

আমার মাতা আমাকে পাপের মধ্য দিয়া গর্ভে ধারণ করিয়াছেন”—বাইবেলের এই উক্তি যে জগতে কত অকল্যাণকর মনোভাবের মূলে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

“নারী-পুরুষ মিলিত হইলে উভয়ের স্নান করিতে হইবে এবং তাহা না করা পর্যন্ত উভয়েই অপবিত্র থাকিবে”—বাইবেলের এই উক্তি ইহুদী-খ্রীষ্টান ছাড়াইয়া মুসলমানদেরও শাস্ত্রবিধিতে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। ইহার উপরে খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে কুমারী প্রজননের কাহিনী প্রচলিত হওয়ায় এবং খ্রীষ্ট নিজে অবিবাহিত থাকিয়া যাওয়ায় খ্রীষ্টীয় জগতে সমস্ত যৌন-সংক্রান্ত ব্যাপারকে ঘৃণ্য মনে করা হইয়াছে।

বিজ্ঞান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য স্নানাদি সমর্থন করে, কিন্তু এইরূপ স্নানাদি করিতেই হইবে, না করিলে শরীর-মন অশুদ্ধ থাকিবে বা ধর্মকর্মে বাধা হইবে, বিজ্ঞান এমত ধারণার পক্ষপাতী নহে। স্নান না করিতে পারিলে বা চাহিলে মুছিয়া বা ধুইয়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলে দোষ নাই। ‘শুচিতা’ ‘পবিত্রতা’ ইত্যাদি মনের খেয়াল মাত্র। মানবের শরীর ও মন সকল সময়েই পবিত্র, ইহাই ধারণা করা ও রাখা উচিত।

ঋতুমতীর প্রতি অবজ্ঞার ভাব

নারীর ঋতুস্রাবের প্রকৃত কারণ না বুঝিতে পারায় উহাকে প্রকাণ্ড অশুভ ও অশুচি ব্যাপার মনে করিয়া নারীর লজ্জাবোধ ও মনঃক্ষোভ এবং পুরুষের অবজ্ঞা ও ঘৃণার উদ্রেক করিবার প্রয়াসও পুরাতন ধর্মপ্রবর্তকেরা পাইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত বিষয়ে বাইবেলের অভিমত ও বিধান মোটামুটি এইরূপ

নারীর ঋতুস্রাব হইলে তাহাকে সাতদিন পর্যন্ত আলাদা রাখিতে হইবে এবং তাহাকে যে কেহ স্পর্শ করিবে সে-ই অপবিত্র হইবে। শুধু এই নহে, ঐ নারী যে বিছানায় শুইবে বা বসিবে তাহা স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হইবে। পুরুষ একত্র শয়ন করিলে সে সাতদিন পর্যন্ত অশুচি থাকিবে। স্রাবের সময় আরও দীর্ঘ হইলে নারীকে আরও বেশীদিন আলাদা থাকিতে হইবে এবং সে অশুচি থাকিবে।

পার্শী সমাজেও এইরূপ বিধান আছে। হিন্দুশাস্ত্রেও ঋতুমতী নারী অস্পৃশ্যা ও তাহার স্পর্শে সব জিনিস অশুচি হয়।

বিনা দোষে নারীকে এইভাবে অস্পৃশ্য করিয়া দিবার মত কুসংস্কার তখনকার লোকের থাকা সম্ভব নয়; কিন্তু এখনকার লোকেরাও ঐরূপ উক্তি ও বিধান বিধাতার উপর আরোপ করিতে পারে ইহাই বিস্ময়কর।

আমি নারী হইলে এইরূপ অজ্ঞ উক্তি ও অবিচারমূলক ব্যবস্থায় বিদ্রোহ করিবার ন্যায্য কারণ দেখাইতাম এবং তথাকথিত ভগবদ্বাণী যে স্পষ্টতঃই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনুষ্যরচিত উপকথা মাত্র তাহা ঘোষণা করিতাম। আশা করি, মা-বোনেরা এইরূপ উক্তি বা ব্যবস্থাকে, সে যে ধর্মেরই থাকুক না কেন, কোন মূল্যই দিবেন না।

ঋতুস্রাবের কারণ ও উহাতে পালনযোগ্য বিধিনিষেধের আলোচনা আমি এই পুস্তকের অন্যত্র এবং আরও বিশদভাবে "মাতৃমঙ্গল" পুস্তকে করিয়াছি।

বধূর কুমারীত্ব সম্বন্ধে কড়াকড়ি

নারীর সতীচ্ছদ (hymen) প্রথম পুরুষ-সংসর্গে ছিন্ন হইয়া থাকে এ কথা এবং উহা যে অন্যান্য বহু কারণেও অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতা সত্ত্বেও ছিন্ন হইতে পারে, তাহা অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। বধূর কুমারীত্ব বজায় ছিল কিনা ইহার নির্ভুল বিচার করা প্রায় এক রকম অসাধ্য, অথচ পূর্বেকার লোকদের এ সম্বন্ধে মারাত্মক এক ব্যবস্থার উল্লেখ বাইবেলে দেখা যায়:—

"যদি কোনও পুরুষ বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সংসর্গে আসিয়া উহাকে ঘৃণা করে এবং এই বলিয়া উহার সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করে যে, উহাকে বিবাহ করার পরে সে দেখিতে পায় যে সে কুমারী ছিল না, তাহা হইলে কন্যার পিতা ও মাতা নগরের প্রধানদের সম্মুখে উহার কৌমার্যের প্রমাণ উপস্থাপিত করিবে। তাহারা বলিবে দেখুন, আমার কন্যাকে ইহার সহিত বিবাহ দিয়াছি, কিন্তু সে উহার সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করিয়া বলিতেছে যে, উহার কুমারীত্ব ছিল না, অথচ উহার কুমারীত্বের এই সকল প্রমাণ রহিয়াছে। ইহা বলিয়া তাহাদের প্রধানদের সম্মুখে কাপড় ছড়াইয়া দিবে।" (বোধ হয় প্রথম সহবাসের রক্ত-স্রাবের চিহ্নবাহী কাপড়ের কথা বলা হইতেছে।)

"ইহা করিলে প্রধানরা পুরুষটিকে ধরিয়া ধমকাইয়া দিবেন এবং তাঁহারা উহার নিকট হইতে একশত রৌপ্যমুদ্রা লইয়া কন্যার পিতাকে দিবেন, কারণ সে ইসরাইল বংশের একটি কুমারী কন্যার অখ্যাতি করিয়াছে। এবং ঐ কন্যা উহার স্ত্রীই থাকিবে এবং সারাজীবন সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।"

"আর যদি ঐরূপ অভিযোগ সত্যই হয় এবং কন্যাটির কুমারীত্বের প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে প্রধানরা উহাকে তাহার পিতার বাড়ীর সামনে আনিবে এবং ঐ নগরের লোকেরা উহাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিবে, কারণ, সে

পিত্রালয়ে বেশ্যার মত ব্যবহার করিয়াছে। এইভাবে তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে পাপ দূর করিবে।”

তখনকার লোকদের অজ্ঞতা, পুরুষদের ধৃষ্টতা ও নারীর প্রতি অবিচারের নমুনা স্বরূপ পুরাতন ব্যবস্থা ধর্মবাণী বলিয়া শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে। অথচ এইরূপ অভিমত ও ব্যবস্থা যে কত হাস্যাস্পদ ও নিষ্ঠুর তাহা সামান্য বিচার বুদ্ধিতেই প্রতীয়মান হওয়া উচিত। কন্যাটিকে পাথর দিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে, অথচ বরট সামান্য জরিমানা দিয়াই সারিবে! বরটির কুমারত্বের কোনও বিচার হইবে না? আব অসহায় পিতামাতা কি-ই বা প্রমাণ দিবে?

দুঃখের বিষয়, এখনও কোটি কোটি লোক নিজ নিজ ধর্মেব পুরাতন শাস্ত্র আওড়াইয়া বহু তথ্যের অকাট্যতা প্রমাণে ব্যস্ত, অথচ জ্ঞানবিজ্ঞান উহাদের অসারতা স্পষ্ট কবিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে।

কুমারীর প্রজনন

মানব-সমাজেও কুমারীর বা অপৈত্রিক প্রজনন সম্ভবপর এরূপ বিশ্বাস বহুকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। শুধু তাহাই নহে, এখনও ধর্মীয় উপখ্যান আশ্রয় করিয়া অসংখ্য লোক এমন অসাব সম্ভাব্যতায়ও বিশ্বাসবান। যৌন-মিলন নোংরা ও অপবিত্র বলিয়া যে ধারণার কথা একটু পূর্বেই উল্লেখ কবা গিয়াছে তাহার বশবর্তী হইয়া অথবা জারজ জন্ম ঢাকিবার উদ্দেশ্যে যীশুখ্রীষ্ট, মহাবীর ইত্যাদি বহু ধর্মপ্রবর্তক যে কুমারী প্রজননের ফল, ইত্যাকার দাবিও কবা হইয়া থাকে। জরোষ্টার (Zoroaster), টলেমী (Ptolemy), কন্‌ফুসিয়াস (Confucius), প্লেটো (Plato), জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar), আলেক্‌জাণ্ডার (Alexandar) এবং যীশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ) এইরূপভাবেই জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অলীক উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

গ্রীক, হিন্দু ইত্যাদি পুরাণে দেবতাদের মানবী স্ত্রী থাকার কথা এমন কি নানা ক্ষেত্রে বহু-নারী-সংসর্গের কথা থাকায়, এবং এমন কি বাইবেলও স্বর্গীয় জীবেরা মানবনারীর সংসর্গ করিতে পারে এইরূপ উক্তি থাকায় উক্তরূপ প্রজননের ধারণা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল!

মধ্যযুগে ইংলণ্ড এবং মধ্য-ইউরোপের অনেক দেশে ডাইনী সন্দেহ করিয়া বহু রমণীকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে। এই সকল ডাইনী নামধারী রমণীরা প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্বীকার করিয়াছে যে, স্বর্গীয় দূত শয়তান কিংবা কোনও দৈত্য-দানব বর্ণনাতীত এক অদ্ভুত জীবের আকার ধারণ করিয়া গোপনে

তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং ফলে তাহারা গর্ভবতী হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ স্বীকারোক্তিতে বিচারে তাহারা ডাইনী সাব্যস্ত হইবে এবং সেইজন্য তাহাদের বধ করা হইবে ইহা জানিয়াও তাহারা অকপটে এইরূপ অদ্ভুত কাহিনী প্রকাশ করিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের কোন এক ডাইনীর বিচারে প্রকাশিত হয় যে, ক্রমাগত তিন বৎসর ধরিয়া কোনও এক দানবের সঙ্গে সহবাসের ফলে সেই রমণী পর পর তিনটি সন্তান প্রসব কবিয়াছে।

বাস্তবিকই কি কোন অতিপ্রাকৃত জীব, ভূতপ্রেত, শয়তান, দৈত্য-দানব বা বিধাতার কোনও অশরীরী প্রতিনিধি রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়? স্বর্গ হইতে এক্ ঝলক দিব্যালোক আসিযা যীশুমাতা মেরীকে গর্ভবতী করিয়া দিল, পঞ্চপাণ্ডবের জননী কুন্তী ও মাদ্রী দেবতাদের দ্বারা সন্তানবতী হইয়াছিলেন—ইত্যাদি কাল্পনিক উদ্ভব কিভাবে হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়! ইহা ছাড়া পুরুষেব দৃষ্টিমাত্র বা স্পর্শমাত্র অথবা পুরুষের আরাম-কেদারায় বসিয়া, শয্যায শয়ন করিয়া, পরিত্যক্ত বস্ত্র পবিধান করিয়া সদ্য ঋতুমতী নারী গর্ভবতী হইয়াছে, এরূপ অলীক রূপকথা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ভারতবর্ষেও এককালে প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় এবং বৌদ্ধ জগতে অগণিত সন্ন্যাসীদের মঠ, সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিহারে লক্ষ লক্ষ কুমার-কুমারী মুক্তিসাধনায় নিরত থাকিত। পঞ্চদশ শতকে ফ্রান্সেব আশ্রমবাসিনী রমণীগণ মঠাধ্যক্ষের নিকট অভিযোগ করিত যে, স্বপ্নেব ঘোবে ভূতপ্রেত আসিয়া তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ধর্ষণ করিয়া যায়। বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যেও স্বভাবতঃই আদি-রসের পবিবেশন, প্রেম নিবেদন এবং নৈশ অভিসার চলিত। ফলে গর্ভসঞ্চার হইলে তাহা বিনাশের চেষ্টা করা হইত, আর উক্ত চেষ্টা বিফল হইলে সমস্ত দোষ চাপানো হইত ভূতপ্রেতের উপর!

প্রকৃত ব্যাপার

প্রকৃত ব্যাপারটা কি তাহা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এবার আলোচনা করা যাক:

(১) ভূতপ্রেত, শয়তান, জিন দেবতা কিংবা ঈশ্বরের প্রতিনিধি কোনদিনই মানবীকে ধর্ষণ করে না। **ইহাদের অস্তিত্বই কাল্পনিক।** বস্তুতঃ নারী **পুরুষের দ্বারাই** সন্তানবতী হইতে পারে, ইহাই বিজ্ঞানের অভিমত।

অন্ধ ভক্তেরা ভক্তির পাত্রকে বাড়াইয়া তুলিবার বা ঐশ্বরিক গুণে বিভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আজগুবি গল্পের অবতারণা ও প্রচার করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আসল পিতার নাম গোপন বা উহার ক্রিয়াকলাপকে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করা হয়।

(২) কতক ক্ষেত্রে জারজ সন্তান জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মহান হইয়া গেলে ভক্তরা তাঁহাদের পিতৃত্ব দেবতার বা ঐশ্বরিক উৎসে আরোপ করে। এরূপ ক্ষেত্রে দিব্যালোক, দূত বা ফেরেস্তার মধ্যস্থতার দাবি করা হইয়া থাকে!

(৩) পুরাতন ধর্মগ্রন্থে বা পুরাণাদিতে স্বর্গীয় জীবের বা দৈত্যদানবের মানবী সম্ভোগের কথা থাকাতে অনেক নারীর মতিভ্রম হইত বা হয়। অবিরত ঐরূপ ধ্যান-ধারণা করিতে করিতে নারীদের মস্তিষ্কবিকৃতি হয় এবং তাহারা নিজেদের ডাইনী শ্রেণীভুক্ত মনে করিয়া থাকে।

আমাদের **ভুল দেখা** অনেকটা **ভুল ভাবা-র** উপর নির্ভর করে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে ভয়ে ভয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে পথে পড়িয়া থাকা দড়িকে সাপ মনে করা ও এরূপ সাব্যস্ত করার পর বাতাসে উহা নড়িলে সাপই দৌড়াইতেছে এরূপ বোধ হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নহে। জ্যোৎস্নারাতে বাতাসে গাছের পাতা নড়িলে তাহার ছায়ার নড়া দেখিয়া প্রেতিনীর ঘোমটা নড়িতেছে মনে হইতে পারে। ইহাকে ইংরেজীতে Illusion কহে। এইরূপ ভাব মনে বদ্ধমূল হইয়া গেলে বাড়ীর বাহির হইলেন রাস্তায় সাপ দেখা ও ভয় পাওয়া বারে বারেই ঘটিতে পারে। এই অবস্থাকে Delusion বলে। একেবারে ভিত্তিহীন কল্পনাপ্রসূত দৃশ্য বা মূর্তিও ভীতিগ্রস্ত লোক দেখিতে পারে। ইহাতে চক্ষুর ভ্রম হয় মাত্র। অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানঘাটে ভূত চলাফেরা করে, এ কথা বিশ্বাস করিলে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি বিকট দৃশ্যাবলী দেখিতেও পারে। ইহাকে Hallucination কহে।

বস্তুতঃ ঐরূপ ব্যক্তি ঐরূপ দৃশ্য **দেখে না কিন্তু দেখে বলিয়া মনে** করে। ইহা চোখের ও মনের ভ্রম। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম ভাগে নায়ক শ্রীকান্তের বাজি রাখিয়া শ্মশানে যাওয়ার সময়ে নানারূপ দৃশ্য দেখা ও শোনার কথা মনে করুন। কোনও ভীরু অন্ধবিশ্বাসী লোক ঐগুলি ভূতের কাণ্ড বলিয়াই মনে করিতে পারে।

নারীরা অন্ধবিশ্বাস বশতঃ ভূতপ্রেত বা জিন-ফেরেস্তায় বিশ্বাস করিলে

উহাদের ঐরূপ ভুল দেখা কাল্পনিক সম্ভোগ হওয়া আশ্চর্য নয়। ইহাতে নারীর ভয়, বিক্ষোভ, উত্তেজনা, সুখানুভূতি এমন কি সহবাস-জনিত চরম আনন্দ-লাভও হইতে পারে। কল্পনায় ও স্বপ্নেও পুরুষের মিলন অনুভব করিয়া নারীর পুলকবোধ মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। এমন কি ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে নারী **কাল্পনিক গর্ভেরও** লক্ষণ দেখিতে পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই সম্ভব। উহার বেশী নহে। অর্থাৎ **বাস্তব গর্ভের সঞ্চার** কল্পনায়, স্বপ্নে বা ঐরূপ সম্ভোগভ্রমে হইতে পারে না। উহার **জন্য পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বের সংযোগের দরকার**। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

(৪) **বাস্তব গর্ভসঞ্চারের জন্য পুরুষ-সংসর্গ** চাই। আজকাল যে কৃত্রিম গর্ভোৎপাদনের উপায় বাহির হইয়াছে, উহাতেও পুরুষের শুক্রকীটের প্রয়োজন হয়ই। তাই যেখানে বাস্তব গর্ভসঞ্চার বা সন্তানের জন্ম হয়, সেখানে ধরিয়া লইতে হইবে: (ক) কোনও কুচক্রী পুরুষ নারীকে ঘুমন্ত বা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সম্ভোগ করিয়াছে। দৈত্য-দানবের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্ধকারে বা নিরালায় প্রতারণা করাও অসম্ভব নয়, প্রকৃত সম্ভোগ ব্যতিরেকেই ঘর্ষণাদির ফলে বা বস্ত্রখণ্ড হইতে নারীর গোপনাঙ্গে কোনও ক্রমে পুরুষের শুক্রকীট প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইলে উহা গর্ভোৎপাদন করিতে পারে। অথবা (খ) ধূর্ত নারী চালাকী করিয়া বা অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় লজ্জা গোপন করিবার জন্য নানারূপ কল্পিত কাহিনী উদ্ভাবন করতঃ সরলপ্রাণ আত্মীয়-স্বজন বা বিশ্বাসপ্রবণ সমাজের চক্ষে ধূলি দিতে চেষ্টা করিয়াছে। আধুনিক যুগেও ভূতপ্রেতের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ আচরণকে গোপন করিবার চেষ্টা করা যে না হয় এমন নহে। কোনও সুযোগে প্রেমিক-প্রেমিকার নিভৃত মিলন ঘটে, প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া বসে—তখন উপায়? অসহায়া নারী ভান করিয়া ভূতাক্রান্তা হয়।

আমাদের এত কথা বলা, দৃষ্টান্ত দেওয়ার উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপন্ন করা যে, **যৌনবিজ্ঞানের আধুনিক নির্দেশাবলী অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন ধর্মশাস্ত্রের বিপরীত হইতে বাধ্য, কারণ তখনকার লোকদের জানিবার উপায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং অন্ধবিশ্বাস সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্তিকে নিরস্ত করিত**। এখন শুধু মহাজনের উক্তির (words of wisdom) দোহাই দিলে চলিবে না, যুক্তিসঙ্গত প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিতে হইবে।

পুরাতন রতিশাস্ত্রের ধারা

ধর্মানুশাসন অবলম্বন বা অগ্রাহ্য করিয়া নারীপুরুষের প্রেম-বিনিময়, মিলন-কৌশল, রতিবাসনাব বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন লেখকগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং পুরাতন মতামত হইতে যাহা কিছু লিখিতেন, তাহাই 'রতিশাস্ত্র' বলিয়া মনে করা হইত। ধর্ম নারীপুরুষের যৌনজীবনকে সংযত কবিয়া ফেলিয়াছে, উহা বিবাহবিবি এবং বিবাহিত নরনারীর মিলন-বিধি রচনা করিয়াছে ; কিন্তু প্রেম সীমা বা শাসন মানে নাই, নারীপুরুষের যৌনবাসনা ও মিলনাকাঙ্ক্ষা তার চরিতার্থতা চাহিয়াছে। বিবাহিত জীবনে নারীপুরুষ কর্তব্য পালন করিয়া যায় মাত্র, কিন্তু প্রেম পাত্রান্তরে নিবদ্ধ হয় ইত্যাদি ধারণাই এইরূপ 'রতিশাস্ত্রে' দেওয়া হইত। ওভিডের প্রেমকাব্য সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। উহাতে যে প্রেমের কর্ষণের কথা বলা হইয়াছে তাহা স্বামী-স্ত্রীর প্রেম নয়—প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধ। নর নারীকে চাহিবে, উভয়ে উভয়ের কৌশলজাল বিস্তার করিবে, মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া একে অপরকে প্রেমাবদ্ধ করিবে, প্রেমাস্পদের মিলন সুমধুর করিবে—ইত্যাদিরই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাৎস্যায়ন, কোকা পণ্ডিত প্রভৃতিরও যৌনশাস্ত্র অনেকটা ধর্ম-নিরপেক্ষ।

এই সমস্ত শাস্ত্রের ভাল দিক হইল এই যে, **নারীপুরুষের সম্বন্ধই লেখকগণ স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়াছেন** ; আর ত্রুটি হইল যে, ধর্মমতের ধার না ধারিলেও লেখকেরা অপরের মতামত নির্বিচারে উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রচলিত প্রবাদ ও ধারণা বিনা-পরীক্ষায় মানিয়া লইয়াছেন এবং নিজেদের অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

এই সমস্ত গবেষকদের গবেষণা সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইলেও কতকগুলি দোষে দুষ্ট ছিল :

(১) যাদু, মন্ত্র-তন্ত্র এবং দৈবে বিশ্বাস।

(২) আগ্রহাতিশয্যের প্রভাব।

(৩) পক্ষপাতদোষশূন্য পরীক্ষার অভাব।

(৪) পরমত উদ্ধৃতির অভাব।

(৫) সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের যন্ত্রপাতি ও সুযোগসুবিধার অবিদ্যমানতা।

আমি এখানে এগুলি সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি কথা বলিব :

(১) যাদু, তন্ত্র, মন্ত্র, দৈব ইত্যাদিতে পূর্বেকার লোকদের বিশ্বাস একরূপ সার্বজনীনই ছিল। স্বর্গীয় দেবতা, দেবী, দৈত্য, দানব, ফেরেস্তা, জিন, পরী ইত্যাদি সম্বন্ধে কেবলমাত্র ধারণাই নহে, উহাদের কাল্পনিক নাম, শক্তি, কর্মবিভাগ, কার্যকলাপ ইত্যাদির ধারণাও প্রচলিত ছিল ও প্রচারিত হইত। এক একটি উপাখ্যানে রীতিমত ধারাবাহিক বিবরণ দিয়া মানুষের বিশ্বাস উদ্রিক্ত করা হইত। বস্তুতঃ যাহা কিছু দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় এবং আপাততঃ অতিপ্রাকৃতিক বলিয়া মনে হইত, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া মানুষের দুর্বল মন বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী রচনা করিয়া ফেলিত।

পুরাতন রতিশাস্ত্রে তাই মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা নারী-পুরুষকে **বশীকরণ,** কবচ, যাদু, দরগায় শিরনি এবং মন্দিরে ভোগ ইত্যাদি দিয়া **সন্তানলাভ,** হিজিবিজি লিখিয়া অঙ্গে ধারণ করিয়া **রতিশক্তিবৃদ্ধিকরণ** ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়।

আধুনিক শিক্ষিত মন অযৌক্তিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস হারাইয়াছে। আমার মাথার চুল অমুকে চুরি করিয়া নিয়া মন্ত্র সহকারে পোড়াইল, তাহাতে আমার কি অনিষ্ট হইতে পারে ইহা আমরা বুঝি না, বিশ্বাস করি না বলিয়া কোন অনিষ্ট হয় না।

প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণার তুলনা

আধুনিক যৌনবিজ্ঞান যাদু, মন্ত্র, তন্ত্র, দৈব ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসবান নহে। শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও জড় পদার্থের গুণাগুণের উপরই উহা নির্ভরশীল। তাই উহা কার্যপরম্পরা ও প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করিয়া প্রতিষেধ ও প্রতিকার করিবার এবং পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের পর কোন বস্তু সিদ্ধান্ত করা ও এরূপ সত্যই প্রচারের পক্ষপাতী।

(২) পূর্বেকার গবেষকদের **আগ্রহাতিশয্যের** জন্য গবেষণাফলে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। **অতিবিশ্বাসের** দরুন **সামান্য** পরীক্ষা দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া গবেষকেরা মহামূল্য আবিষ্কারের আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। বহু ক্ষেত্রে **বিভিন্ন** প্রকৃতির উপর ঐরূপ আবিষ্কারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত ধৈর্য—এবং বোধ হয় সুযোগও তাঁহাদের থাকিত না। তাই এইরূপ মনোভাব বা প্রকৃতি লইয়া তাঁহারা বহু ঔষধ, প্রক্রিয়া, তথ্য ইত্যাদি ২-৪টি ক্ষেত্রে সফল হইতে দেখিয়া ও বহু অসাফল্যের দৃষ্টান্তগুলি

অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে জোরের সঙ্গে অকাট্যতার দাবি করিয়া বসিতেন।

আধুনিক যৌনবিজ্ঞানে কোনও তথ্য বা সত্য কেহ আবিষ্কার করিলে তাহার সত্যতা যাচাই করিবার জন্য সারা পৃথিবীর গবেষকদেব আহ্বান করা হয়। বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা ঐ তথ্য নির্ভুল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অকাট্যতার দাবি কেহ করেন না। আবার পরবর্তী কালের গবেষণার ফল অন্যরূপ দাঁড়াইলে কেহ **অযথা পশ্চাৎমুখী** হইয়া রহেন না।

(৩) পূর্বেকাব গবেষকদেব **পক্ষপাতদোষ** তাঁহাদেব পরীক্ষা কার্য এবং উহার ফল-বিশ্লেষণকে অনেকটা আড়ষ্ট কবিয়া ফেলিয়াছিল। **গোপনে** প্রচারিত মতবাদের মূল্য অধিক বলিয়া অনুমিত হইত। এক একটি সূত্র বাহির করিয়া উহা সযত্নে গোপন রাখিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে চালাইয়া দিবার চেষ্টাও কম হয নাই। এইজন্যই **স্বপ্নে প্রাপ্ত, সন্ন্যাসীপ্রদত্ত** অথবা **দৈব** আখ্যাত ঔষধ বা প্রক্রিয়ায সাধারণ লোকের বিশ্বাস বেশী ছিল।

আধুনিক **বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপ্রণালী** ইহাব ঠিক বিপরীত। শত্রুকেও পরীক্ষা করিয়া মতামত প্রকাশ করিতে আমন্ত্রণ করা আজকালকার গবেষকদেব রীতি। **নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ দ্বারাই সত্য প্রচারিত হয়** এবং **তাহাই আধুনিক যৌনবিজ্ঞানের ভূষণ।**

(৪) পূর্বেকার গবেষকদেব একটা দোষ ছিল **পরমত উদ্ধৃতি**। অবশ্য আজকালও এক গবেষক অন্য গবেষকদের দোহাই দিয়া থাকেন, কিন্তু নির্বিচারে নয়। **বিচার, পরীক্ষা** ও **বিশ্লেষণ** না করিয়াই পূর্বকালে পণ্ডিতের পর পণ্ডিত বহু তথ্য ঔষধ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে **সত্য, পরীক্ষিত অভ্রান্ত, নিঃসন্দেহ** প্রভৃতি মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন *; কিন্তু **কাহার কাহার দ্বারা কত ক্ষেত্রে পরীক্ষিত বা লেখক নিজে পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা** অপবদের পরীক্ষায় ও লেখকদের নিজস্ব পরীক্ষায় ঠিক ঠিক কত ক্ষেত্রে সফলতা এবং কত ক্ষেত্রে বিফলতা লাভ হইয়াছিল সে বিষয়ে উল্লেখ না থাকায় ঐ সব মতেব মূল্য কমিয়া গিয়াছে। আধুনিক যৌনবিজ্ঞান সূক্ষ্মভাবে যাচাই করিয়া তাহার ফলাফল **লিখিয়া** না রাখিয়া এরূপ দৃঢ়তার সহিত সত্য, পরীক্ষিত প্রভৃতি মতামত প্রকাশ করে না।

(৫) সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের **যন্ত্রপাতি এবং অপর সুযোগ-সুবিধা**

* আল্লামা জালালুদ্দীন সাইয়ুতীর "কিতাবুৎ তিব্বি উন্নাল হিকমাহ্" আরবী কেতাবে ঐরূপ 'সত্য ও পরীক্ষিত' কতগুলো উক্তির অসারতা দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম।

তখনকার দিনে ছিলও কম। এজন্য গবেষকদেব বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিবার মত প্রবৃত্তি বা সামাজিক অনুমতিও এই সেদিন মাত্র হইয়াছে। **অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার না হইলে আমরা এখনও পর্যন্ত শুক্রকীট এবং ডিম্বের অস্তিত্বই ধরিতে পারিতাম না।** জন্মরহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভবপব হইয়াছে ন্যূনাধিক মাত্র একশত বৎসর পূর্বে। আধুনিক যৌনবিজ্ঞান শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, সংখ্যাবিজ্ঞান (Statistics), চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি হইতে সাহায্য লয় এবং ঐ সকল জ্ঞানশাখার বহুমূল্য তথ্যাদির দ্বারা উপকৃত হয়।

মোট কথা, **পুরাতন যৌনশাস্ত্র** ধর্ম, অধর্ম, কাহিনী, উপাখ্যান, অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি দ্বাবা প্রভাবান্বিত, এবং বিশ্লেষণ-রীতি ও পরীক্ষার ফলাফল লিখিয়া রাখিয়া তাহা প্রচারের প্রচলন না থাকায়, পরমত উদ্ধৃতির দ্বারা কণ্টকিত হইয়াছে এবং অসংলগ্ন ও অসংবদ্ধ তথ্যাবলীর সমষ্টিই রহিয়া গিয়াছে। **আধুনিক যৌনবিজ্ঞান** পূর্বমতের সত্যটুকু গ্রহণ ও অসারটুকু বর্জন করিয়া নূতনভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণাদির দ্বাবা নানা বিজ্ঞান শাখা হইতে আরও নূতন তথ্যাদি আহরণ করিযা মানবজীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিতেছে।

পাঠক-পাঠিকার নিকট নিবেদন, তাঁহাবা যেন আমার পুস্তকসমূহে আলোচিত বহু বিষয়ে নিজেদের পূর্বমত বা সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতে দেখিয়া অসন্তুষ্ট না হন। আমি **যৌনবিজ্ঞানের** আলোচনা করিতেছি; রতিশাস্ত্রের নয়।

(৩)

নির্ভুল যৌনজ্ঞানের আবশ্যকতা

আধুনিক পাক-ভারতে যৌনতত্ত্বে অবহেলা

ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া পাক্-ভারতও এই গুরুতর বিষয়ে নূতনভাবে চিন্তা করিতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা যাহা কিছু ইউরোপের তাহাই নিঃসন্দেহে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন, আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা যাহা-কিছু ইউরোপীয় তাহাই বর্জনীয় মনে করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই দুই দলের কোন দলই যৌনবিজ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্বোদ্ঘাটনে সমর্থ হইবেন না। কারণ যৌনবিজ্ঞান ফ্যাশানের বস্তু নয়, ইহা মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা সত্যকার বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের শাখা বহু। কিন্তু যৌনবিজ্ঞান **জীবন-বিজ্ঞান**। জীবনের সঙ্গে আর কোনও বিজ্ঞানশাখার বোধ হয় এমন প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। এই প্রত্যক্ষতা ও ঘনিষ্ঠতার হিসাবে অত প্রয়োজনীয় যে চিকিৎসাবিজ্ঞান, যৌনবিজ্ঞানের তুলনায় তাহাও পরোক্ষ ও কনিষ্ঠ প্রতীয়মান হইবে। কারণ, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি মানুষের **অস্বাভাবিক অবস্থা**—তাহার রোগ; আর যৌনবিজ্ঞানের ভিত্তি মানুষের সর্বাপেক্ষা **স্বাভাবিক অবস্থা**—তাহার প্রায় সমস্ত প্রবৃত্তি ও কর্মের উপর আকৈশোর সারা জীবনব্যাপী প্রভাব বিস্তারকারী, গুরুত্বানুসারে দ্বিতীয় প্রবল, সহজাত সংস্কার।*

তথাপি ভারতের সমস্ত শিক্ষামন্দিরে যৌনতত্ত্ব অসঙ্গত অনাদর ও অবহেলা পাইয়া আসিয়াছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অহরহ মনোবিজ্ঞানের কত জীবনযাত্রায় অনাবশ্যক তত্ত্বকথা মুখস্থ করিতেছে, কিন্তু যৌনবোধের মত অমন কঠোর মানসিক সত্য সম্বন্ধে কোনও কথা তাহাদের মনোবিজ্ঞানের পুস্তকে

* সর্বাপেক্ষা প্রবল সহজাত সংস্কার বা বৃত্তি বাঁচিয়া থাকার বা টিকিয়া থাকার ইচ্ছে। উদর পত্তির-বাসনা বা ক্ষুধা ইহারই একটি দিক। অপর দিক স্বার্থপরতা।

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের পাঠ্য মনোবিজ্ঞানের বিরাট বিরাট গ্রন্থের ভূমিকা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষপৃষ্ঠা পর্যন্ত গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে পাঠকের মনে হইবে, যৌনবোধ মানবমনের কোনও অংশ ত নহেই, উপরন্তু কোনও যুগেই মানুষের মনে যৌনবোধ ছিল না। অথচ সমস্ত গ্রন্থলেখক ভাল করিয়াই জানেন যে, যৌনমনোবৃত্তি মানুষের তীব্রতম মনোবৃত্তি ও যৌনস্বাস্থ্যপালন শরীবচর্যার ও সুখময় জীবনযাত্রার অন্যতম প্রধান আবশ্যকীয় কার্য। উন্নত ধরনের চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ উপদেশ পাওয়া যায় না। অনেক চিকিৎসককে দেখিয়াছি যাঁহাদের যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অতি সামান্য, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক। সাধারণ লোক তাঁহাদের নিকট হইতে উপদেশ পাইবার আশা করিতে পারে না।

পৃথিবীর ওজন কত লক্ষ টন, পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব কত লক্ষ মাইল, খ্রীষ্টপূর্ব কত শতাব্দীতে কোন্ রাজা কোন্ জঙ্গলে কত বড় প্রাসাদ নির্মাণে কত টাকা খরচ করিয়াছিলেন প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় শত কথা আমাদের শিক্ষার্থীগণকে মুখস্থ করানো হয়, পরন্তু কৈশোরে যৌবনে ও বিবাহিত জীবনে স্বাভাবিক শান্তিময় যথাযথ যৌনজীবন যাপন করিতে শিক্ষা দিবার, সন্দেহ, সংশয়, ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার, দুঃখকষ্ট ও ব্যাধিজনক ভ্রম প্রমাদপূর্ণ কার্য হইতে নিবারণ করিবার, এবং বেশ্যাগমন ও মদ্যপানে ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে উহাদিগকে অবহিত করিবার, এবং রতিজ রোগের হাত হইতে জনসাধারণকে এবং অবাঞ্ছিত সন্তান-জন্মের হাত হইতে পিতামাতাকে রক্ষা করিয়া জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর, নিয়মিত ও সুখময় করিবার কোনও শিক্ষা প্রদান, চেষ্টা বা গবেষণা হইতেছে না।

এ উপেক্ষা ও অবহেলা আমাদের সমাজে কি ঘোর কুফল প্রসব করিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। এই সমস্ত বিষয়ে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' ও 'চুপ চুপ' নীতিই চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি নিয়মের অধীন। সে কোন নিয়মই লঙ্ঘন করে না। যাহারা নিয়ম লঙ্ঘন করে, প্রকৃতি তাহাদের উপর ভীষণ প্রতিশোধ লইয়া থাকে। জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির সদ্ব্যবহার না করিলে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করিলে প্রকৃতি নির্মমভাবে আমাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিবে।

যৌন-ব্যাপার প্রকৃতির একটা বিরাট রহস্য। এ রহস্যোদ্ঘাটনে প্রকৃতির দানস্বরূপ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আমরা নিয়োজিত না করায় আমাদের ধর্মীয়,

নৈতিক, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের সমাজ-দেহের সর্বত্র অগণিত বিষ-ফোঁড়া দেখা দিয়াছে। কারণ, মানুষের জননেন্দ্রিয় তাহার রসনার ন্যায়ই দুইটি বিপরীত গুণের অধিকারী। এই দুইটি প্রত্যঙ্গই চরম শুভের মত চরম অশুভও সাধনে সমর্থ। রসনার তৃপ্তিকর আহার সম্বন্ধে আমরা যে সাবধানতা অবলম্বন করিতেছি, জননেন্দ্রিয় পরিচালনা সম্বন্ধে তাহা করিতেছি না; তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে।

ধর্মে

যেখানে রহস্য সেখানেই দৈব, অলৌকিক বা ঐশীশক্তি আরোপ করা মানুষের সাধারণ মনোবৃত্তি। যৌনক্রিয়া সাধারণ ব্যাপার হইলেও মানবসৃষ্টি একটা রহস্যপূর্ণ ঘটনা। সুতরাং যৌন-ব্যাপারে মানুষের সাধারণ অজ্ঞতার দরুন কত ভ্রান্ত ধারণা মানুষকে পীড়িত করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উদাহরণ এই অধ্যায়ের শেষার্ধে দিয়াছি। উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেক ভণ্ডতপস্বী সম্প্রদায় ধর্মের নামে যৌন-স্বৈরাচার সাধন করিয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন জাতির ধর্মমন্দিরে ধর্মের নামে যে বেশ্যাবৃত্তি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে, তাহার দ্বারা বুদ্ধিমান ভণ্ডেরা শুধু যে নিজেদেরই লালসার তৃপ্তি-সাধন করিয়াছে তাহা নহে, সাধারণ মানুষের ধর্মসম্বন্ধে ধারণাকেও নিতান্ত নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়াছে। স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত দগ্ধ করা বা জীবন্ত সমাহিত করা, শিশুকন্যাকে হত্যা করা, জামাতার কাছে প্রথমবার কন্যা পাঠাইবার পূর্বে তাহাকে গুরু বা রাজার নিকট পাঠাইয়া প্রসাদ করাইয়া লওয়া, ঈশ্বরকে দেহদানের নামে ধর্মযাজক বা মঠাধিকারী শয্যাসঙ্গিনী হওয়া, সন্তান লাভের আশায় মন্দির বিশেষে পর-পুরুষের অঙ্কশায়িনী হওয়া, অতিথির সেবার জন্য নিজ স্ত্রী বা কন্যাকে উহার শয্যায় পাঠানো, স্বামীর পদতলে স্বর্গের অবস্থিতিহেতু পুরুষের সহস্র অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ইত্যাদি সহস্র যৌন-অনাচার ধর্মের নামে চলিয়াছে।* —ইহাতে কেবল যে নারীজাতির উপরই পুরুষের অবিচার সাধিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে মানুষের অনেকখানি আধ্যাত্মিক অবনতিও ঘটিয়াছে। যে সত্য জানিবার ও বুঝিবার অধিকার সকল মানুষেরই আছে, সেই সত্যকে প্রহেলিকার আবরণে গোপন রাখার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইয়াছে যে অপেক্ষা-

---

* কাঁচুলিয়া, সহজিয়া, বিন্দুসাধক, বামমার্গী, কর্তাভজা, তান্ত্রিক প্রভৃতি সম্প্রদায় আমাদের দেশে এখনও দেখা যায়। ইহারা অন্ধবিশ্বাসী ও কুসংস্কারপন্ন এবং নানা কদাচারে লিপ্ত।

কৃত বুদ্ধিমানেরা জনসাধারণকে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। ইহারা জনসাধারণের স্বাভাবিক ধর্মপ্রাণতার সুবিধা লইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে এবং জগতের বহু অকল্যাণ সাধন কবিয়াছে।

নীতিতে

ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে নীতিজ্ঞান, যৌন-অজ্ঞতা সেই নীতিজ্ঞানকেও পরিস্ফুট হইতে দেয় নাই। মানুষের তীব্রতম অনুভূতিকে একটা কৃত্রিম আবরণের চালে পিষ্ট করিয়া রাখায় মানুষ সমাজের বহিরাবরণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ভণ্ডামি আয়ত্ত কবিয়াছে। সভা-সমিতিতে দাঁড়াইয়া মানুষ অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যে কাজটির তীব্র নিন্দা করিতে পারে, মুহূর্ত পরে লোকচক্ষুর অন্তরালে সেই কাজটিই সাধন করিতে তাহার বিবেকে বিন্দুমাত্রও বাধে না। সাহিত্য ও সমাজ-জীবনেব সর্বত্র একটা কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামিব আবহাওয়া বিরাজমান। সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের মূলভিত্তি যে সত্যবাদিতা, সবলতা, সততা, সংসাহস ও স্পষ্টবাদিতা, মানবচরিত্রের সেই মহৎ গুণসমূহ আজ বিরল হইয়া পডিয়াছে। বলা বাহুল্য, যৌনজীবনের কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামিই মানবেব কর্মজীবনেব সকল স্তবে সংক্রামিত হইয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনে ভণ্ডামি ও মিথ্যাবাদিতার এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, যে বলে সে জীবনে মিথ্যাকথা বলে নাই সে যেমন ভণ্ড, সেইরূপ যে বলে সে জীবনে ভণ্ডামি করে নাই সে তেমনই মিথ্যাবাদী।

সমাজে ও রাষ্ট্রে

সমাজ-জীবনে এই অজ্ঞতার কুফল আরও শোচনীয় আকারে দেখা দিয়াছে। দাম্পত্য অশান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ, ব্যভিচার, বলাৎকার গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা, আত্মহত্যা, গণিকাবৃত্তি, মদ্যপান, রতিজ রোগ প্রভৃতি সমাজ-অঙ্গের সহস্র প্রকারের কুফলেব এবং দুঃসাধ্য ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির প্রধান এবং অনেক স্থানে একমাত্র, নিদান **প্রকৃত যৌনবিজ্ঞানের অভাব।**

রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই অজ্ঞতার কুফল বোধহয় সর্বাপেক্ষা শোচনীয়ভাবে মারাত্মক হইয়াছে। যৌন-অজ্ঞতার ফলে দ্রুতস্খলন, ধ্বজভঙ্গ, রতিজ রোগসমূহ, নানাবিধ স্ত্রী রোগ, গর্ভিণী ও প্রসূতির বিবিধ রোগ ও মৃত্যু, সুরতে নারীর অতৃপ্তি, মাতার গনোরিয়াব পুঁজ প্রসবের সময় শিশুর চক্ষুতে লাগিয়া আঁতুড়েই তাহার

অন্ধত্ব প্রভৃতি ভয়ার্ত ব্যাধিতে সমাজদেহ জর্জরিত হইয়া গিয়াছে। মানবজাতির একটা বিপুল অংশ আজ ঐ সমস্ত বহু কুফলপ্রসূ ও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া নিজেরা ত পঙ্গু হইয়া আছেই, উপরন্তু অহরহ ঐ সমস্ত ব্যাধি বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছে। এই সমস্ত যৌনব্যাধি মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও আয়ুর উপর ভীষণভাবে ক্রিয়া করিতেছে। তরুণদের মধ্যে যৌনস্বাস্থ্য-সম্পন্ন সবল সুপুরুষ পাওয়া দুঃসাধ্য। তরুণীদের মধ্যেও তথৈবচ। এক কথায় মানবসমাজের এই ভাবী মাতাপিতার অনেকেই স্বাভাবিক স্বাস্থ্য হইতে বঞ্চিত। এই সমস্ত স্বাস্থ্যহীন ও ব্যাধিগ্রস্ত ছেলেমেয়ে ভবিষ্যতে যে সমস্ত সন্তানের জন্মদান করিবে, তাহারা স্বভাবতই দুর্বল, অল্পায়ু ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে। আমাদের দেশের শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ হারের কারণও প্রধানত ইহাই। সুতরাং বিবিধ যৌনব্যাধির ফলে মানবসমাজের যে বিরাট অংশ আজ নানাবিধ শক্তিনাশক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জগৎকে নিরানন্দ ও রাষ্ট্রকে বিপন্ন করিতেছে, তাহাদের জীবন মানবকল্যাণকামী সমাজবিজ্ঞানীগণের সম্মুখে জটিল সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। যৌনস্বাস্থ্যকর্ষণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও আইনবলে অস্ত্রোপচার দ্বারা বংশানুক্রমিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের জনন-নিরোধের কার্যক্রম লইয়া তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন। এই সমস্ত গবেষণার ফল সারা পৃথিবীতে কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত মানবজাতির কল্যাণ হইবে না।

যৌনশিক্ষায় বিপদ

আমরা যৌন-অজ্ঞতার কুফলের কথা খুব জোর গলায় বলিলাম বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌনশিক্ষা-বিস্তারের কথা ততটা জোর গলায় বলিতে পারিতেছি না। কারণ, যৌনতত্ত্বকে বিজ্ঞানরূপে আলোচনা করিবার পক্ষে কতকগুলি বাধা আছে, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মত ইহার শিক্ষাদান কার্যে তদপেক্ষাও অসুবিধা ও বিপদ আছে।

যৌনবৃত্তি মানবের দ্বিতীয় তীব্রতম বৃত্তি এ কথা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলিয়াছি। কিন্তু ঐ সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, এই বৃত্তি ক্ষুধা তৃষ্ণার মত স্বাভাবিক ও সার্বজনীন বৃত্তিও বটে। শিশুসমাজকে বাদ দিলে এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত মানুষেরই চেতন, অবচেতন, বা অচেতন মনে কোনও-না-কোন প্রকারের কামেচ্ছা বা, কাম-বাসনা এবং

যৌন-অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং এই তত্ত্বের আলোচনা হইতে এই বাসনাকে পৃথক করা একরূপ অসম্ভব।

মানুষের এই সাধারণ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সমস্ত সভ্যজাতির সাহিত্যে যৌনশাস্ত্রের নামে এবং বেনামীতে বিষাক্ত বাবিশের স্তূপ সৃষ্টি হইয়াছে। আবার যৌনবিষয়ক পুস্তকাদির উপর রাষ্ট্রসমূহের শ্যেনদৃষ্টি দর্শন করিয়া অনেক সরলপ্রাণ, ভদ্র, উত্তেজনাহীন, শান্ত, সংযত, বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনাকারী, অনুসন্ধিৎসু, জ্ঞানপিপাসু যৌনতাত্ত্বিক দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ফরাসী যৌনতাত্ত্বিক ডাঃ মাইকেল দ্য মন্তেন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"ইহা কিরূপে সম্ভব হইতেছে যে যৌনক্রিয়ার মত, স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত কার্য সম্বন্ধে কথা বলিতে আমরা লজ্জাবোধ করি এবং ঐ সম্বন্ধে আমরা গম্ভীরভাবে ও যুক্তিসঙ্গতরূপে আলোচনা করিতে পারি না। আমরা নরহত্যা, চৌর্যবৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু যৌন-ব্যাপারের ন্যায় স্বাভাবিক কার্য সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে কথা বলিতে পারি না।"

শাসনের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু এই না পারার কি ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই? আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে যৌনতত্ত্বের নামে যে সমস্ত পুস্তক স্তূপীকৃত হইয়াছে, তাহাদের শতকরা আশিটাই কি কামোদ্দীপক ও উপভোগের বিবিধ উপায় বর্ণনাকারী রতিতত্ত্ব নহে? জনহিত ও সমাজকল্যাণের সদুদ্দেশ্য হইতেই কি ঐ সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে? তাহা নহে। মানুষের স্বাভাবিক লালসায় ইন্ধন যোগাইয়া অর্থলাভের অসদুদ্দেশ্যেই এই সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই সমস্ত কামশাস্ত্র তথা রতি শাস্ত্রের কুপ্রভাব হইতে অজ্ঞ জনসাধারণকে রক্ষা করা প্রত্যেক সমাজ-কল্যাণকামীর, তথা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

শাসনের জটিলতা

কিন্তু রাষ্ট্র অর্থাৎ পুলিস ও আদালতের হাকিম, স্বভাবতই কলা ও বিজ্ঞান এবং উত্তেজক অশ্লীলতার ও বীভৎসতার পার্থক্যের সূক্ষ্ম ও নির্ভুল বিচারক নহেন। স্যার চার্লস্ হল, হ্যাভলক এলিসের বহুদিনের সাধনার ফল, তাঁহার পুস্তকখণ্ডের বিষয়ে কঠোর মন্তব্য করিয়া উহার বিক্রেতাকে আইনত দণ্ডনীয়

সাব্যস্ত করেন। হ্যাভলক এলিস সেই উপলক্ষে আক্ষেপ করিয়া বলেন,—মানুষের খাঁটি অভিপ্রায় বুঝিবার ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সমাদর করিবার মত অক্ষম লোকের হাতেই মানবমনের সাধারণ হইতে সর্বোচ্চ সৃষ্টির (অর্থাৎ প্রকৃত বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত পুস্তকের) বিচারের ভার আমরা দিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের আমরা শাস্তি দিবারও ক্ষমতা দিই। এইরূপ সৃষ্টির সহিত নিতান্ত পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সদভিপ্রায়প্রণোদিত নিরপরাধকে (অর্থাৎ মুদ্রাকর ও প্রকাশককেও) ভারী জরিমানা ও দীর্ঘ কারাবাসের আদেশ দিবার অনুমতি দিই।

এমনভাবেই আইন-সম্মার্জনীর মুখে অশ্লীলতার আগাছার সঙ্গে বহু বিজ্ঞানসম্মত সদিচ্ছাপ্রণোদিত ও সংযত আলোচনা এবং শিল্প-নিদর্শনও আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বাঞ্ছনীয় নহে। শিল্পকে যেমন বীভৎসতা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে, তেমনই যৌন-বিজ্ঞানকেও উত্তেজক রতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া বিচার করিতে হইবে। বিষয়টি খুব জটিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু মানবকল্যাণের জন্য রাষ্ট্রকে তাহার দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন করিতেই হইবে। সুতরাং যৌন-বিজ্ঞান আলোচনা বহুক্ষেত্রে কামোদ্দীপক হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বৃহত্তর অমঙ্গলের প্রতিরোধের জন্য এ বিষয়ে অনেকটা স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

গোপনতা ও স্পষ্টতা

ইহার প্রথম কারণ, বহু যৌন-বিজ্ঞানীর দৃঢ় মত এই যে, **গোপনতা অপেক্ষা স্পষ্টতা আমাদের ঢের বেশী কল্যাণ সাধন করিবে।** সাধারণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছেও কথাটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইবে। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যৌন-ব্যাপারে **কানাকানি** করিয়াই আমরা মানুষের এত সব অকল্যাণ করিয়াছি। আমরা যদি এ সব ব্যাপারে অস্পষ্ট, অর্ধ-স্পষ্ট, দ্ব্যর্থক, ছদ্মার্থক শব্দ ব্যবহার না করিয়া আন্তরিকতা, সরলতা ও স্পষ্টবাদিতা সহকারে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট অর্থযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিতাম এবং সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার মতই ইহাকে সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম, তবে এ ব্যাপারে কৃত্রিম লজ্জা ও সাধিত ভণ্ডামি আমাদের কথা ও কার্যকে অমন অর্থহীন ও সন্দেহাত্মক করিয়া তুলিতে

পারিত না। "ভালর কাছে সব ভাল" বলিয়া আমাদের দেশে যে প্রাচীন কথাটি প্রচলিত আছে, তাহা ফাঁকা কথা নহে।

অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায় যৌন-ব্যাপারের আলোচনাও অনেকটা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে করিতে হইবে। দৃঢ় সবল-চিত্তে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা না থাকিলে কেহ প্রকাশ্যভাবে এ সব ব্যাপারে স্বচ্ছন্দে কথা বলিতে পারিবে না, আশা করি সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। বলিবার ভঙ্গীতেই যত পার্থক্য। আমার এই পুস্তক যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন অনেক সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও সংবাদপত্রই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহার ভাষা ও বলিবার ভঙ্গী এত সুমার্জিত যে এই পুস্তকখানি পিতামাতা বয়স্থা কন্যাকেও নিঃসঙ্কোচে উপহার দিতে পারেন, যদিও যৌনজীবনের এমন কোনই নিগূঢ় তত্ত্ব নাই, যাহার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ইহাতে করা হয় নাই। একজনের মুখে যাহা পরম শ্লীল ও কলাপূর্ণ, অপরের মুখে তাহাই অশ্লীল ও বীভৎস। আবার যাহার মনে পবিত্রতা নাই, সে নির্লিপ্তভাবে এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারিবে না। আন্তরিকতাপূর্ণ সরল চিত্তের সুস্পষ্ট প্রকাশ যৌনতত্ত্বের যত বড় নিগূঢ় কথা বহন করুক না কেন, শ্রোতার মনে উগ্র বাসনার উদ্রেক করিবে না। বক্তার আন্তরিকতা শ্রোতার প্রাণের বীভৎস রসের সম্ভাবনাকে নিশ্চিতভাবে নিরস্ত করিয়া দিবে।

গোপনতার কুফল

পক্ষান্তরে আমাদের কানাকানি, আমাদের গোপনতা, আমাদের অস্পষ্ট ভাষা, সর্বোপরি আমাদের আন্তরিকতাবিহীন কৃত্রিম ও দুর্বল শাসন তরুণ ও জিজ্ঞাসু প্রাণে একটা সন্দেহের ছায়াপাত করিতেছে এবং তরুণ প্রাণের স্বাভাবিক কল্পনাপ্রিয়তা সেই সন্দেহের কঙ্কালকে অভিনব কাল্পনিক রূপের রক্তমাংসে সজীব করিয়া তুলিতেছে। সকলেই একদিন তরুণ ছিলেন; তারুণ্যের স্মৃতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকলেই একবার নিজের নিজের তদানীন্তন মনোভাবটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখুন, দেখিবেন তরুণ মনের সে কাল্পনিক স্মৃতি লোভনীয়তায় ও আকর্ষণীয়তায় বাস্তবকে অনেক ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই জানেন, পাপের বাস্তব রূপ অপেক্ষা তাহার কাল্পনিক রূপ অনেক বেশী লোভনীয় এবং ইহাও সকলে জানেন যে, "বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ" অনেক বেশী মারাত্মক।

যৌন-অজ্ঞতার স্বরূপ

তরুণ-তরুণীর জিজ্ঞাসু প্রাণে আমাদেব কানাকানি, গোপনতা, অস্পষ্ট ভাষার কি প্রতিক্রিয়া হয তাহা আমাদের নিজেব নিজের তদানীন্তন মনোভাবের কথা স্মরণ করিলেই অনেকটা বুঝিতে পারি। হ্যাভলক্ এলিস নিজেব অবস্থাব কথা স্মরণ কবিযা বলেন, তরুণ অবস্থায় রহস্যপূর্ণ যৌন-জীবনের কোনও তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা কবিযা তিনি কোন সদুত্তর ত পাইতেনই না, ববং অসভ্য ও অমার্জিত ব্যবহারের জন্য সকলের নির্যাতন ভোগ করিতেন। ইহা হইতেই অহেতুক গোঁডামিব প্রতি প্রবল বিরুদ্ধ-ভাব তাঁহাব যুবক-মনে বদ্ধমূল হয় এবং ভবিষ্যৎ তরুণ-তরুণীব সকল জিজ্ঞাসাব সদুত্তর যাহাতে পাওয়া সম্ভবপর হয, তিনি সেইরূপ তথ্য সংগ্রহ করিযা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবাব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। বলা বাহুল্য, ঘোব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন।

বালক-বালিকা অপেক্ষাকৃত শিশুকাল হইতেই প্রকৃতিব বহস্যোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়। 'কি কাবণে কোন্‌টা সংঘটিত হয়, কেন অন্য বকমে অমন হয় না' ইত্যাদি প্রশ্নে তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে অতিষ্ঠ কবিয়া তোলে। যৌনজীবনেব প্রাথমিক তথ্যগুলির বিষয়েও তাহাবা সবল ও আন্তবিকভাবে প্রশ্ন করে এবং সদুত্তরের প্রত্যাশা কবে।

কিভাবে হইল এবং কোথা হইতে আসিল—এই প্রশ্ন সকল দেশে সকল সময়ের ছেলেমেয়েরাই করিয়া থাকে। আব প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়া হয়, অথবা ধমক দিয়া বা কল্পিত কোন কাবণপবম্পরার কথা আওডাইয়া তাহাদিগকে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত কবা হয়।

স্ট্যানলী হল তাঁহাব Adolescence পুস্তকে এ সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা উক্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন: ভগবান স্বর্গে ছেলেমেয়েদের গড়িয়া মর্ত্যে ফেলিয়া বা নামাইযা দেন ও পিতামাতা তাহাদিগকে কুডাইযা আনেন, তাহাদিগকে কখনও কলেব পাইপে অথবা বাঁধাকপির ভিতবে পাওয়া যায়, ভগবান তাহাদিগকে জলের মধ্যে রাখিয়া দেন এবং ডাক্তার তাহাদিগকে উঠাইয়া আনিয়া প্রত্যুষে রাখিয়া যান; মাটির মধ্য হইতে খুঁড়িয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনা হয়, শিশু-বিক্রেতাদের দোকান হইতে কিনিয়া আনা হয়—ইত্যাদি নানারকম অদ্ভুত উত্তরেব প্রচলন আছে। জার্মানীতে সারস পক্ষী

শিশুকে দিয়া যায় ইত্যাদিও বলা হয়; কোথাও আবার মাতার স্তন দিয়া শিশু বাহির হইয়া আসে, অথবা গৃহের ধূম নির্গত হইবার চিমনির মধ্য দিয়া, আকাশ হইতে, ভগবান ফেলিয়া দেন এইরূপও বলা হয়।

মাতার শরীরের প্রকাশ্য অনেক জায়গাই শিশুর উৎস বলা হইয়া থাকে। তাঁহাব নাভি দিয়াই শিশু বাহির হয়, এরূপ ধারণা অনেক সময়ে ছেলেমেয়েদের কিশোর কাল বা তৎপরবর্তী কাল পর্যন্ত থাকিয়া যায়। আমাদের দেশে অনেকে মাতার গুহ্যদ্বারের কথা ভাবিয়া থাকে, কারণ বালক-বালিকার মল-নির্গম প্রক্রিয়ার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থাকে। অনেক মাতা শিশুকে তাহাদের পেট কাটিয়া বাহির কবা হইয়াছিল বলিয়া থাকেন এবং পেটে দাগ থাকিলে উহা সেলাইয়ের দাগ বলেন। জনৈক ডাক্তাব বন্ধু লিখিয়াছেন—"এ স্থলে একটা উদাহবণ দিতে পারি। জনৈকা ভদ্রমহিলার বিবাহের কিছুদিন পর পর্যন্তও (২২ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়) ধাবণা ছিল যে, প্রসব বেদনা উঠিলেই পেট কাটিয়া ছেলে বাহির করা হয়। পেট কাটিবার ভয়ে তাঁহার গর্ভধারণে অনিচ্ছা ছিল বলিয়া যৌনসংযোগ ত দূরের কথা, স্বামীর চুম্বন-আলিঙ্গনও তিনি পবিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, পুরুষ মানুষ আদর (চুম্বন, আলিঙ্গন) করিলেই মেয়েদের মাসিক বন্ধ হইয়া ছেলেমেয়ে পেটে আসে। সেই জন্য বিবাহের পূর্বে কোনও মাস মাসিকের দুই একদিন দেরি হইলেই তাঁহার ভাবনার অবধি থাকিত না।

"২২ বৎসব বয়স হওয়া সত্ত্বে ও স্বামীস্ত্রীর শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে কোনও ধারণাই ছিল না। সৌভাগ্যেব বিষয় স্বামী **যৌনশাস্ত্র অভিজ্ঞ সদ্বিবেচক ও অসীম ধৈর্যশালী** ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কোনও অশান্তির উদয় হয় নাই। স্ত্রীকে ধৈর্য সহকারে শিক্ষা দিয়া বুঝাইয়া তৈয়ার কবিযা লইয়া বিবাহেব প্রায় দুই মাস পবে তাঁহাদেব পূর্ণ সহবাস হয়। এখন স্ত্রী বুঝিতে পাবিয়াছেন যে, তাঁহাব দিকে চাহিয়া তাহার স্বামী কতটা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন। স্বামীকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করেন এবং স্বামীর কোনও আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেন না। তাঁহাদের ন্যায় সুখী দম্পতি দেখা যায় না। স্বামীর যৌনজ্ঞান ও ধৈর্য না থাকিলে তাঁহাদের জীবনে যে কি অশান্তি হইত তাহা বলা যায় না।"

ফ্রয়েড সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ বিষয়ে প্রধানত তিন প্রকারের ধারণা দেখা যায়। প্রথমত, বালক ও

বালিকার মধ্যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিক দিয়া কোন ব্যবধানই নাই। বালিকার পুরুষাঙ্গের অভাব লক্ষ্য করিলেও বালক মনে করে, হয়ত ভবিষ্যতে উহার আবির্ভাব হইবে; বালিকাও অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ আশা করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, তাহারা মাতা হইতে উদ্ভূত এ কথা জানিতে পারিলেও তাহারা মলমূত্রত্যাগের পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়া উহার সহিত সন্তান-জন্ম-পদ্ধতির সামঞ্জস্য ধরিয়া লয়। তৃতীয়ত, শিশু মনে করে যে, তাহার পিতাও তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং পিতা ও মাতা খানিকটা হৈচড়াহৈচড়ি করিয়াই তাহাকে লাভ করিয়াছেন। বিবাহ অর্থে সে বোঝে তাহার পিতা ও মাতার এইরূপে আপোসে কাজ করিবার অধিকার পাওয়া।

আবার অনেক সময় ছেলেমেয়েরা গুরুজনের মন্তব্যের কঠোর সমালোচনাও করিয়া থাকে। একটি তিন বৎসরের ছেলে একদিন তাহার মাতাকে বলিয়া বসে—এখন আমি জানি ছেলেমেয়েরা মায়ের পেটের মধ্যে জন্মায়। তুমি মনে করেছ আমি পুকুরের তলায় হয়েছি, একথা বিশ্বাস করি? তা নয়; তা হলে ত আমার সর্দি হয়ে যেত। সারস পাখী আবার কেমন ক'রে আমায় আনল? তুমি বলেছ ও আমায় চিমনি দিয়ে ফেলে দিয়েছে! তা হ'লে ত আমার সারা গা ময়লা হয়ে যেত আর পড়ে গিয়ে আমি ভা—রী আঘাত পেতুম!

অন্য একটি মেয়ে তাহার মাতার এক বান্ধবীর সন্তান হইবার প্রাক্কালে তাহার অবস্থা ও সকলের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করে—সত্যি বল মা সারস পাখীর কথা ঠিক, না পেট? মাতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, মাতার পেটেই সন্তান জন্মায়। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া মন্তব্য করিল,—এখন ঠিক বুঝলুম, কিন্তু এটা ত বুঝলুম না তুমি আগে গিলেছিলে কি করে?

দুই এক ক্ষেত্রে **শিশুরা** আসল কথা জানিয়া লইবার চেষ্টা করিলেও মোটের উপরে সর্বত্রই **সদুত্তরের অভাবে তাহারা ভুল ধারণাই** পায় ও পোষণ করে।* অবশেষে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

নিতাইচন্দ্র বসু লেখেন:

* পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের শৈশবের ধারণা সম্বন্ধে লিখিবেন। শেষের প্রশ্নমালা দেখুন।

· ...“প্রায় ১২।১৩ বৎসর অবধি ধারণা ছিল যে, বিবাহের আগে সঙ্গম করিলে ছেলে হয় আর বিবাহ হইলে সঙ্গম করিতে হয় না।—উহা বিবাহের সময়ে যে মন্ত্র পাঠ হয় তাহারই ফলাফল। তারপর ১৫।১৬ বৎসবে ধারণা হয় যে, না, প্রথমে একবার সঙ্গম কবিতে হয় এবং মেয়েদের পেটে একটা থলি আছে তাহা হইতে ক্রমান্বয়ে সন্তান হইতে থাকে। যেমন গাছ রোপণ করিয়া প্রথমে একটু জল দিতে হয়, পরে সে মাটি হইতে আপনা-আপনি রস শোষণ কবিয়া বাড়িতে থাকে। আবও একটা কারণ যে, কাহারও কাহাবও অনেক বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হয়—তখন কি আর কেউ সঙ্গম করে? কাবণ তখন চাবিদিকে বড় বড় ছেলেরা ও মেয়েবা ঘোরাফেরা করিতে থাকে। আমাব এই বদ্ধমূল ধাবণা আমার এক বন্ধু ভাঙিয়া দেয়।...’

আশ্চর্যেব কথা নয়! বেচাবা বুদ্ধি খাটাইয়া আব কি করিবে?

গর্ভপ্রকবণ সম্বন্ধে জ্ঞানেব অভাব এবং কুসংস্কারেব প্রভাব আমি আমার **‘মাতৃমঙ্গল, জন্ম-বিজ্ঞান ও সুসন্তানলাভ’** নামক পুস্তকে উল্লেখ কবিয়াছি। ঐ আলোচনা হইতে বুঝিতে পাবা যাইবে যে, যে মাতা সন্তানের উৎস, যাঁহার শাবীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের এবং ব্যবহারিক পবিচর্যার সহিত সন্তানেব স্বাস্থ্য ও পরিণতি এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই তিনি কত অজ্ঞ, কত কুসংস্কারাচ্ছন্ন! বিবাহোত্তর কর্তব্য সম্বন্ধেও ভবিষ্যৎ মাতার অজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই শোচনীয়।

বহু পাঠক-পাঠিকার গোপনীয় পত্রালাপ হইতে আমি বলিতে বাধ্য যে, অনেকেরই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য শারীরিক সম্বন্ধের বিষয়ে ধারণা অদ্ভুত রকমের ছিল। আমার এক বন্ধুর স্ত্রী সম্পূর্ণ সাবালিকা থাকা সত্ত্বেও বিবাহের পরে অন্তত ছয় মাসের মধ্যে মিলনের প্রস্তাবটি পর্যন্ত শুনিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে নাকি বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল পাশাপাশি শুইবার ব্যবস্থামাত্র।*

* একজন প্রবীণ ডাক্তারের স্বীকারোক্তি হইতে জানিতে পারি, তিনি এম, বি, পাস করিয়া বিবাহ করেন কিন্তু বৎসর খানেকের মধ্যেও স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন হয় নাই। তাঁহার ভাবী সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে নাকি তিরস্কার সহ উপদেশ দেন।

হ্যাভ্‌লক এলিস্‌ বলেন যে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে যৌনজ্ঞানের অভাব এত বেশী যে, কেহ কেহ স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকেন। কাহারও ধারণায় মিলনের পদ্ধতি পাশাপাশি শুইবার ব্যবস্থা মাত্র, কাহারও বিশ্বাস থাকে যে, যৌনমিলন তাঁহাদের নাভি দিয়া হয়, কাহাবও বিশ্বাস ঐ কার্য সারা বাত্রিব্যাপী চলে।

এলিস্‌ তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকে বহু নবনাবীর যে স্বীকারোক্তি প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহা হইতে এই রকম বহু অদ্ভুত ধাবণার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মেরী স্টোপ্‌স একটি শিক্ষিতা যুবতীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রিয়জনের চুম্বনের পরেই তিনি ধবিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভসঞ্চাব হইযা পডিয়াছে। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিযা তিনি রাত্রিদিন অত্যন্ত উদ্বেগ ও অস্বস্তিতে পডিয়া ছিলেন।

এলিস্‌ মন্তব্য করিয়াছেন—সভ্যসমাজে এখনও প্রায়ই বালিকাবা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়—বিবাহজীবনেব প্রাথমিক কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জানিয়া, অথবা ভুল ধারণা লইয়া। এড্‌ওয়ার্ড কার্পেণ্টারও এইরূপ অভিমত কবেন।

শাসনের ব্যর্থতা

দ্বিতীয় কারণ, আইন ও সামাজিক দমননীতি দ্বারা অশ্লীল শিল্প ও সাহিত্যকে নির্মূল করা অসম্ভব। দমননীতির উদ্দেশ্য ত তাহাতে সফল হইবেই না, বরঞ্চ আইন ও সমাজকে ফাঁকি দিয়া উহা অধিকতর বীভৎস হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। 'নিষিদ্ধ ফল'-এর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক লোভ উহার মূল্য এবং বিক্রয় অসম্ভব ও আশাতীত রূপে বাড়াইয়া দিবে মাত্র। অশ্লীলতা দূরীকরণের জন্য অত্যুৎসাহী প্রবক্তাগণের অসহিষ্ণুতা আমাদের উদ্দেশ্যের সাফল্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। শ্লীলতাবাদীগণ বোধ হয় মনে করেন যে, অশ্লীল আর্ট ও সাহিত্য শয়তানের সৃষ্টি, ঐ সমস্ত আর্ট ও সাহিত্যকে অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিলেই স্বয়ং শয়তানকে ভস্মীভূত করা হইল। কিন্তু মানুষের যৌনক্ষুধার জন্য অশ্লীল সাহিত্যকে দায়ী করা, দুনিয়ার রোগবৃদ্ধিব জন্য চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকাবলী ও ডাক্তারের আধিক্যকে, অপরাধ-বৃদ্ধির জন্য দণ্ডবিধি আইনের পুস্তকাবলী এবং আদালত ও উকিলের আধিক্যকে এবং মানুষের বার্ধক্যের জন্য ঘড়ির আধিক্যকে দায়ী করার মতই ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক।

ফলতঃ অশ্লীল আর্টিষ্ট ও সাহিত্যিককে জেলে পুরিয়া বা অশ্লীল আর্ট ও সাহিত্যকে অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিয়া দেশ হইতে অশ্লীলতা দূর করা সম্ভব হইবে না। সে উদ্দেশ্য সফল কবিতে হইলে মূলের সংস্কার করিতে হইবে, অশ্লীল আর্ট ও সাহিত্য যে-অগ্নির ইন্ধনমাত্র সেই অগ্নি সংযত করিতে হইবে। **সমাজের ভ্রূকুটি বা পুলিসের লাঠির সাহায্যে চারিদিকে ,চুপ চুপ' চীৎকার করিয়া মানুষের প্রকৃতিকে দমন করা সম্ভব হইবে না। সুশিক্ষার দ্বারা যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের মনকে শুদ্ধ৹প্রবুদ্ধ নির্মল ও জ্ঞানবান করিতে হইবে।** যৌন-ব্যাপাবেব প্রতি কুটিল ও বক্রদৃষ্টিপা:তের পবিবর্তে **সোজা সরল দৃষ্টিপাত** করিবার মত **মানসিক সরলতা** মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করিতে হইবে।

যে সমস্ত জাতিব মধ্যে নারীর জন্য অবরোধ-প্রথা প্রচলিত আছে, সেই সমস্ত জাতির পুরুষেরা নারীর মুখের দিকে সহজ সরল দৃষ্টি দিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাদের বক্রদৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য সহচর কামলালসা। কিন্তু যে জাতির মধ্যে নাবীর অববোধ-প্রথা নাই, সে জাতির পুরুষেবা অনেকটা নিষ্কাম ও নির্লিপ্তভাবে শুধু পরস্ত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত নয়, তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে এবং তাহাদের গাত্রস্পর্শও করিতে পারে।

এ সমস্ত ব্যাপাব স্বতঃই শিক্ষা ও অভ্যাসের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যৌন-ব্যাপারেও তাহাই। অধ্যাপক মিচেল্স্ সত্যই বলিয়াছেন—মানুষ যদি আশৈশব এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যে, যৌন-ব্যাপাব তাহাব অন্যান্য দৈহিক ব্যাপাবের মতই নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপাব, তবে উহাতে অন্যায় আচরণের অহেতুক প্রবৃত্তি কম হইবাব কথা।

বিরুদ্ধ মতবাদ

কিন্তু আশৈশব শিক্ষাদ্বারা যৌনশিক্ষাকে সহজ ও যৌন-ব্যাপারকে স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিতে প্রবল প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রহিয়াছে; কারণ, শিশুকে যৌন-শিক্ষা দিবার চেষ্টা আগুন লইয়া খেলা কবার সমান। জার্মান চিকিৎসাবিদ্ ডাঃ হান্স্ ডানবার্গ বলিয়াছেন—"শিশুকে মিষ্টান্নের দোকানে বসাইয়া রাখিয়া তাহাকে মিষ্টান্ন না দেওয়া যেরূপ বিপজ্জনক, তাহাকে যৌনতত্ত্ব শিখাইবার চেষ্টাও সেইরূপ বিপজ্জনক। লোভনীয় বস্তুকে শিশুর দৃষ্টিপথের অন্তরালে

রাখাই নিরাপদ। অজ্ঞতাজনিত ভীরুতা মানুষকে অনেক অকল্যাণের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।”

ডাঃ ডানবার্গের এই কথা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। পক্ষান্তরে ক্যাথারিন ডেভিস গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, **সুখী দম্পতিসমূহের শতকরা সাতান্ন জনই শৈশবে যৌন-ব্যাপারে উপদেশ লাভ করিয়াছিল।** ডাঃ হ্যামিল্টনের গবেষণার ফল এই যে, **তাহাদের শতকরা পঁয়ষট্টি জনই শৈশবে যৌন-বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছিল।**

প্রকৃতির শিক্ষা ও গোপনতার অসম্ভাব্যতা

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়াও আমাদের সাধারণ জ্ঞানলভ্য একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। **যৌন-ব্যাপারটা আমরা শিশুদের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে পারি না।** গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীসমূহ শিশুদের সম্মুখেই অহরহ মিলিত হইতেছে এবং তাহার ফলে সন্তান প্রসবও শিশুদের চক্ষুর সম্মুখেই হইতেছে। শিশুদের দৃষ্টিপথ হইতে এই সমস্ত ব্যাপার গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত বালকদের মধ্যে অতি অল্পবয়সেই লিঙ্গোদ্রেক হইয়া থাকে। যৌন-প্রদেশে তাহারা সময়ে সময়ে যে একটা অভিনব অনুভূতি বোধ করিয়া থাকে, ইহাও সত্য কথা। সুতরাং স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যৌন-ব্যাপারটা শিশুমন হইতে একেবারে গোপন রাখা সম্ভব নহে।

এখন প্রশ্ন এই যে, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যৌন-ব্যাপার যদি শিশুদের নিকট প্রকাশিত হইয়াই পড়ে, তবে ঐ সম্বন্ধে সরলভাবে সুশিক্ষা দিয়া শিশুদিগের সত্য ও প্রকৃত ব্যাপার জানিতে দেওয়াই উচিত, না ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া শিশুগণকে নিজ বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি-প্রসূত সিদ্ধান্ত করিতে দেওয়া উচিত? কোন্‌টা **মানবকল্যাণের মাপকাঠিতে** অধিকতর গ্রহণীয়? মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজন যদি এইসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া যান, যদি শিশুর সরল প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে ধমকাইয়া দেন, তবে হয় শিশুকে নিজের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, নয়ত ভ্রমজ্ঞানপূর্ণ ও কদর্য রুচি সম্পন্ন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সঙ্গীর নিকট হইতে হাসি, তামাশা ও ইয়াকির মারফত ভ্রান্ত ধারণাসমূহ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীর নিকট হইতে কোমলমতি বালক-বালিকাগণ এসব ব্যাপারে

অশ্লীলভাবে যে বিকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে, নানারূপ কদর্য অভ্যাস সেই বিকৃত শিক্ষারই বিষময় ফল।*

যে সকল মাতাপিতা মনে করেন, ছেলেমেয়েদের যতদিন পর্যন্ত পারা যায়, যৌনজ্ঞান না দেওয়াই উচিত, এবং আশা করেন, তাহা হইলেই তাহারা নিষ্পাপ কোমল স্বভাব বজায় রাখিয়া চলিবে, তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা যে বাল্যকালেই উহা সংগ্রহ করিয়া লয় নাই তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। বার্লিন ইনষ্টিটিউট অফ্ সেক্সলজী কতকগুলি তথ্য প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, **ছেলেমেয়েরা এদিক ওদিক হইতে এই সব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিয়াই থাকে।**

ঐ সকল গবেষকদের মতে সংগৃহীত বহুক্ষেত্রে, **ছেলেদের যৌনজ্ঞান-লাভ** (যতই আংশিক ও অপরিপূর্ণ হউক না কেন) ৬০% ক্ষেত্রে ১০ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে, ১৫% ক্ষেত্রে ৭ হইতে ৯ বৎসরের মধ্যে, ২০% ক্ষেত্রে ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে এবং ৫% ক্ষেত্রে ৬ বৎসরের পূর্বে এবং ১৬ বৎসরের পরে হইয়াছিল। **মেয়েদের** বেলায় সাধারণত এক বৎসর পরে পরে মোটামুটি ঐ অনুপাতে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। ৩% ক্ষেত্রে বিবাহের প্রাক্কালে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল এবং ৬% ক্ষেত্রে একেবারেই হয় নাই।

কিভাবে এইরূপ জ্ঞানলাভ হইয়াছিল তাহার হিসাব আরও চমকপ্রদ। মাত্র শতকরা একটি ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মাতা বা পিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন, ৭০% ক্ষেত্রেই তাহার সমপাঠী বন্ধু, খেলার সাথী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগ্নী, বারনারী, দাসী, নার্স, হোটেলের চাকরাণী প্রভৃতির নিকট হইতে শিখিয়াছিল, ১৮% ক্ষেত্রে পুস্তকাদি পড়িয়া জানিতে পারিয়াছিল, এবং ২% ক্ষেত্রে পশুপক্ষীর মৈথুনক্রিয়া দেখিয়া শিখিয়াছিল। অনেক ছেলেমেয়ে ইহাও স্বীকার করিয়াছিল যে, অত্যন্ত জঘন্য ও নোংরা গোছের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই তাহাদিগকে যৌনজ্ঞান আংশিকভাবে লাভ করিতে হইয়াছিল॥

আমাদের দেশেও বোধ হয় এইরূপই হইবে, বরং গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া একটু **সকাল সকাল** হইবারই কথা।

* কেহ যদি বলেন যে, ছেলেমেয়েরা যখন এ সম্বন্ধে যে কোনও প্রকারে জানিয়াই লইবে তখন আর অভিভাবক বা শিক্ষকের উহাদিগকে উপদেশ দিবার দরকার নাই, তবে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে যেহেতু গ্রাম ও শহরবাসীরা রাস্তার ধারের ডোবা হইতেই জল পান করিতে পারে, তখন শহরে আর বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করিবার প্রয়োজন নাই।

এইরূপে প্রাপ্ত জ্ঞান ভ্রান্ত, অপূর্ণ, অসন্তোষজনক, এমন কি ক্ষতিকর হইতে বাধ্য। যাহারা শিক্ষাদাতা তাহাদের নিজেদেরই বিদ্যা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তাহার উপরে আবার গোপনে, কুটিল ও বক্র ভাষা প্রয়োগে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়, শিষ্যেরাও চঞ্চল ও মুচকি হাসির সহিত মজার ব্যাপার মনে করিয়া উপভোগ করে। কোন পক্ষই বিষয়টিকে অত্যাবশ্যক, জ্ঞানগত বিষয় হিসাবে শিক্ষণীয় মনে করে না।

কিং কর্তব্যম্

নীরবতা ও অশিক্ষার বিষময় ফলের সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলসমূহ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে শিশুগণকে যৌনশিক্ষা দান করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। পক্ষান্তরে ডাঃ ডানবার্গের সতর্কবাণীও বিস্মৃত হইবার উপায় নাই। শিশুগণকে যৌন-ব্যাপারে শিক্ষাদান করিতে গেলে তাহাদের দৃষ্টি ও মন যৌন-ব্যাপারের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় নিবদ্ধ হইয়া যাইবার এবং লব্ধজ্ঞান যাচাই ও কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবার আশঙ্কা অনেক বেশী। সুতরাং এইখানে উভয়সঙ্কট। এবং সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃতির নিয়মানুসারে শিশুদের নিকট যৌন-ব্যাপারে যখন গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই, তখন শিশুগণকে যৌন-ব্যাপারে শিক্ষাদান করিব কি না, আসল সমস্যা তাহা নহে, উহা হইতেছে এই যে, **কি ভাবে শিশুগণকে যৌন শিক্ষা দান করিলে তাহাদিগকে তাহাদের অলীক কল্পনা ভ্রান্ত বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীদের হাত হইতে রক্ষা করা যায়,** এবং তাহারা যৌন-ব্যাপারের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় মনোযোগী হইয়া রহস্যময় নতুন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া না বসে, তাহারই বা কি ব্যবস্থা করা যায়।

যোগ্য শিক্ষক

এই দুইটি দিকই বিচার করিয়া যৌনশিক্ষা দান করা সম্ভব কি না ডাঃ ফোরেল, এলিস্, অধ্যাপক মিচেল্স প্রভৃতি নানা চিন্তাশীল সমাজ-কল্যাণকামী সে বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কন্যাদের কেবলমাত্র **মাতা** এবং পুত্রদের **পিতা** ও **মাতা** উভয়েই এবং বালক ও বালিকা উভয়ের ক্ষেত্রে যৌনবিদ্ সহানুভূতি-

সম্পন্ন সুকৌশলী চিকিৎসক অথবা ঐরূপ সুযোগ্য শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যৌন-জ্ঞান-শিক্ষক হইতে পারেন, অন্য কেহ নহে।

ম্যাডাম স্মিথ জেগার একজন ফরাসী মহিলা। তিনি বহু সন্তানের মাতা ও আদর্শ গৃহিণী। তিনি তাঁহার "L' education sociale de no filles" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন,—যদি আমরা আমাদের সন্তানগণকে যৌন-বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিতে চাই। যদি তাহাদিগকে বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীর, বাড়ীর চাকর-চাকরাণীর ও অশ্লীল পুস্তকাদির কবল হইতে রক্ষা করিতে চাই, তবে দুর্বোধ্য নীতিকথা বলিয়া বা কৃত্রিম লজ্জা দেখাইয়া উদ্দেশ্য সফল হইবে না। সন্তানগণকে স্নেহ ও সরলতার দ্বারা সহজভাবে সত্যের সম্মুখীন করিতে হইবে। বালকের বেলা পিতা বা শিক্ষক এবং বালিকার বেলা মাতা বা শিক্ষয়িত্রীই যৌন-ব্যাপারে উপযুক্ত-উপদেষ্টা।

শিক্ষা প্রণালী

শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে ফ্রয়েড, ফোরেল, মিচেল্স ও এলিস সকলেই মোটামুটি একমত। প্রকৃতিই শিশুগণকে শিক্ষা দিবে, শিক্ষকের কর্তব্য হইবে শুধু সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা করা। প্রকৃতি শিশুর মনে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করিয়া দিবে, শিশু সরলভাবে পিতামাতার কাছে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর চাহিবে। পিতামাতা যদি স্নেহভরে শিশুর সেই জিজ্ঞাসার উত্তরটুকু সংক্ষেপে তাহার বয়সোপযোগী **সরলভাবে** দেন, তবেই তাঁহাদের উপদেষ্টা হিসাবে কর্তব্য সমাপ্ত হইল।

ডাঃ ডানবার্গ শিশুকে যৌনশিক্ষা দিবার নামে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যৌনশিক্ষা অর্থে তিনি সম্ভবত বুঝিয়াছিলেন যে, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মতই যৌন-ব্যাপারকেও কতকগুলি পাঠে বিভক্ত করিয়া শিশুগণকে ধারাবাহিকভাবে সেই পাঠ দেওয়া হইবে। কিন্তু সেইভাবে যৌনশিক্ষা দিবার কথা কেহ বলে না। **যৌনশিক্ষার অর্থ হইতেছে, যৌন ব্যাপারে শিশুদের স্বাভাবিক কৌতুহলের সত্য সরল উত্তর দেওয়া।** প্রকৃতি যতদিন যে শিশুর মধ্যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা জাগ্রত না করিবে ততদিন সেই শিশুকে সেই বিষয়ের কোনও শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে প্রকৃতির দ্বারা জাগ্রত কোনও কৌতূহলকে দমনও করিতে নাই। শিশুর সরল প্রশ্নের উত্তরে **এমন সরলভাবে ব্যাপারটি বুঝাইবার চেষ্টা।**

করিতে হইবে যাহাতে তাহার মন একদিকে যেমন যৌন-ব্যাপারের গভীর ও সূক্ষ্ম-তত্ত্বের দিকে নিবদ্ধ হইবে না, পক্ষান্তরে তেমনই তাহার শিশু-মনের কৌতূহল নিবৃত্তি লাভ করিবে। উত্তর শিশুকে দেওয়া হইবে, তাহা যেন কুসংস্কার সৃষ্টিকারক কোনও মিথ্যা স্তোকবাক্য না হয়। মনে রাখা উচিত যে, মিথ্যা কথা শিশুর কাছে ধরা পড়িয়াই যাইবে। কারণ, শিশুকে সত্য কথা শিক্ষা দিবার জন্য এক দিকে প্রকৃতি অপর দিকে সঙ্গী প্রভৃতি সর্বদাই ব্যস্ত। পিতামাতা যদি সে সত্য গোপন করিবার জন্য শিশুকে কোনও ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেন তবে শিশু শীঘ্রই সেই মিথ্যা ধরিয়া ফেলিবে ও পিতামাতার সততায় বিশ্বাস হারাইবে। তাহাব ফলে, সে আর সেরূপ কোনো কথা তাহাদের জিজ্ঞাসা না করিয়া সঙ্গী প্রভৃতিদেবই জিজ্ঞাসা করিবে। পিতামাতাব প্রতি এই আস্থাহীনতা শুধু যৌন-ব্যাপাবে নহে, সাংসারিক আরও বহু-ব্যাপাবে শিশুর ভবিষ্যৎ অমঙ্গলেব কাবণ হইবে। আবাব পিতা-মাতার কোন মিথ্যা কথা ধরা না পড়িলেও যৌন-ব্যাপারে কুসংস্কারেব সৃষ্টি কবিয়াও তাহারা শিশুর কল্যাণের চেয়ে ঢেব বেশী অকল্যাণ করিবেন।

মোট কথা শিশুমনে শৈশব হইতেই যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে এমন ধারণা সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে শিশু এই ব্যাপারকে অতি সরল-ভাবে গ্রহণ ও সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। সমস্তই অভ্যাসেব উপর নির্ভর করে। পিতামাতার শিক্ষাগুণে এমন অনেক ছেলে-মেয়ে দেখা যায যাহাদিগকে পিতা অথবা মাতা ডাকিয়া সকালে পায়খানা কেমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাবা অম্লানবদনে বাহ্য শক্ত কি নরম কি রং ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছে। পক্ষান্তরে এমন ছেলেমেয়েও দেখা যায়, যাহারা কিছুতেই মলমূত্র সম্বন্ধে কোন উত্তর দেয় না ; লজ্জায় মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শৈশবকাল হইতে মলমূত্র সম্বন্ধে এই সহজ স্বাভাবিক সরলতা যৌবনে যৌন-ব্যাপারে সরলতায় পরিণত হইতে পারে। মলমূত্র সম্বন্ধে সরলতা যদি সম্ভব হয়, তবে ঋতুস্রাব ও শুক্রস্রাব সম্বন্ধেই বা সম্ভব হইবে না কেন ?

সুতরাং বালক-বালিকার যৌনশিক্ষা শৈশবেই আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও প্রণালী নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। এ শিক্ষা স্বভাবতই শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসা ও শিক্ষকের যোগ্যতার উপর নির্ভর

করিবে। কিন্তু মোটের উপর এ কথা খুব দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষা-প্রণালী যতই ত্রুটপূর্ণ হউক না কেন, সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সরলতার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহা সর্বত্রই গোপনতা অপেক্ষা সুফল প্রদান করিবে।

শিক্ষকের অভাব

কিন্তু মুশকিল হইবে পিতামাতাকে লইয়া। **পিতামাতা যে শিক্ষা ও সংস্কার লইয়া বড় হইয়াছেন** তাহাতে নিজেদের যৌবনপ্রাপ্ত সন্তানের ঋতুস্রাব বা শুক্রস্রাব সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করা ত দূরের কথা, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের শিশুসন্তানকেও এ বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারিবেন না। বর্তমান মতবাদ ও ধারণা এমনই যে, যৌবনপ্রাপ্ত সন্তানদিগকে যৌন-ব্যাপারে কোনও কথা বলা পিতামাতার পক্ষে প্রকৃতই অসম্ভব।

পক্ষান্তরে, শিক্ষাব দিক হইতেও, শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনেক বিপদ আছে। শৈশব হইতেই বিষয়েব পব বিষয়, সত্যের পর সত্য, ক্রমে যদি শিশুমনে বিকাশ লাভ না করে, যৌন-ব্যাপারে প্রাকৃতিক রহস্য যদি ধীবে ধীবে ক্রমে ক্রমে শিশুমনেব নিকট নিজেকে প্রকট না করে, তবে তাহার ফল বিষময় হইযা থাকে। ঐ অবস্থায হয় শিশুমন সম্পূর্ণ অজ্ঞতাব অন্ধকাবে নিমজ্জিত থাকে, অন্যথায় কুসংসর্গের ফলে বিকৃত ধারণায় ভ্রান্ত থাকে। এই উভয় অবস্থাতেই যৌবনাগমে সহসা সত্যেব বিকাশে তাহাব মনেব উপব একটা অবাঞ্ছনীয় বিপর্যয ঘটিয়া থাকে। যৌন-জ্ঞানলাভেব এই আকস্মিকতা মানুষের বহু বিসদৃশ চিন্তা ও আচবণ এবং শাবীবিক ও মানসিক ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, **যৌবনাগমে যৌন শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও গভীর করা যাইতে পারে।** হ্যাভলক এলিস বলেন, এই সময়ে মাতা যে উপদেশ দিতে পারেন বা দিতে চাহেন, তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও পবিপূর্ণ উপদেশ দিতে হইবে। সুখের বিষয়, তখন মাতা **সুনির্বাচিত ও সুলিখিত যৌনসাহিত্য** ছেলে বা মেয়েকে অনায়াসে পড়িতে দিতে পারেন। লেখাপড়া না জানিলে অবশ্য মৌখিক উপদেশেব উপব নির্ভর করিতে হইবে। এই পুস্তকের শেষে কতকগুলি প্রামাণ্য যৌনগ্রন্থের উল্লেখ কবা হইয়াছে।

প্রকৃত যৌনশাস্ত্রের অভাব

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যভাণ্ডার অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেও, এই অতি প্রয়োজনীয়

ব্যাপারটির দিকে লোকেব দৃষ্টি ততটা আকৃষ্ট হয় নাই। যে দুই-একজন এ কাজে হাত দিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানত দুই সীমারেখা হইতে তাহা করিয়াছেন, বিষয়টির মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। এক শ্রেণীর লেখক যুবকদের যৌনচাঞ্চল্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্থোপাজন করিবাব মানসে, কুরুচিপূর্ণ পুস্তিকা রচনা কবিয়াছেন। এই সমস্ত লেখা কোনও সমাজ-হিতৈষীব হইতে পাবে না, কাবণ, মাতৃভাষার সেবাবৃত্তিকে এমন জঘন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবাব প্রবৃত্তি কোনও সমাজ-সেবকেব হইতে পাবে না বলিযা আমি ধরিয়া লইয়াছি। পুলিস ও আদালত এই শ্রেণীব পুস্তকেব উপব নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত-রূপেই আক্রমণ চালাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অন্য এক শ্রেণীর পুস্তক আছে, যাহাতে লেখকগণ শালীনতা বক্ষা কবিতে গিয়া যৌন-ব্যাপাবে দার্শনিক বক্তৃতা করিয়াই কর্তব্য সমাধা কবিয়াছেন, প্রকৃত সমস্যাটির সম্মুখীন হন নাই।

এই দুই শ্রেণীর পুস্তক ছাড়া আব এক শ্রেণীব পুস্তক আছে, যাহা যৌনশাস্ত্র নামেই চলিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ধাত্রীবিদ্যার পুস্তক মাত্র। এই সমস্ত পুস্তক পাঠে আমাদেব মনে হয যে, লেখকগণ যৌনবিজ্ঞান ও ধাত্রীবিদ্যার পার্থক্য ধরিতে পাবেন নাই। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমাব বসু, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডাঃ রুদ্রেন্দ্র পাল, ডাঃ মদন বাণা প্রমুখের প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি। তবে দুই-একজন লেখকেব চেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রেব ও শিক্ষণীয় বিষয়েব বিস্তৃতি ও বহুলতার দিক হইতে কত নগণ্য তাহা পাশ্চাত্য যৌনবিদ্‌দের প্রচেষ্টাব বিশালতা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীযমান হইবে।

এই পুস্তকের উপকরণ

ধাত্রীবিদ্যা সকলেব সমস্যা নয়, কবিত্বপূর্ণ শ্লীলতা দ্বাবা যৌন-সমস্যাকে ঢাকিয়া বাখাও প্রকৃত সমাধান নয়। আর যৌন-উত্তেজনাব সৃষ্টি করিয়া তরুণ-তরুণীদের চঞ্চল বৃত্তিকে আরও চঞ্চল কবিয়া তোলাও দস্তবমত অপরাধ।

আমাদের সাহিত্যে আন্তরিকতার সহিত **যৌনসমস্যার আলোচনার নিতান্তই অভাব,** একথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। এই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই আমি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। বিষয়টির গুরুত্ব এবং আশুপ্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিই আমাকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে আমি কোকা পণ্ডিত, ঋষি বাৎস্যায়ন,

মহর্ষি সিদ্ধ নাগার্জুন ও পণ্ডিত কল্যাণমল্ল প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় যৌন-শাস্ত্রবিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া আরব, পারস্য ও মিশর দেশীয় পণ্ডিতগণের এবং ডাঃ ফ্রয়েড, ডাঃ ফোরেল, এলিস, ক্রাফট্ এবিং, ওয়েষ্টারমার্ক, ক্যাথারিন ডেভিস, মেরী স্টোপস্, ডাঃ ভেল্ডি, স্কট, ফিল্ডিং, অধ্যাপক মিচেল্স, ডাঃ মার্শাল, কিন্‌যে প্রভৃতি বহু আধুনিক যৌনবিজ্ঞানীগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি। ধাত্রীবিদ্যা-বিভাগে আমি বহু আধুনিক প্রামাণ্য পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়াছি। জন্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে আমি ফিল্ডিং, স্কট, ডাঃ নরম্যান হেয়ার, স্টোপস্, ডাঃ ডিকিনসন, ডাঃ আব্রাহাম স্টোন ও তদজায়া ডাঃ হ্যানা স্টোন প্রভৃতির মতবাদ বিচার করিয়াছি। কিন্তু পাঠকের বিরক্তির জন্য আমি পুস্তক উদ্ধৃতির দ্বারা কণ্টকিত করি নাই। উদ্ধৃত না করিলেও আমি যেখানে যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি, পরম সততার সহিত তাঁহার মতবাদের উল্লেখ করিয়াছি।

এই স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আলোচনার উপযোগী নির্ভরযোগ্য উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনার যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য বহুবৎসরকাল আমাকে এ বিষয়ে আরবী ও ফারসী হস্তলিপি এবং সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে; ইংরাজ, ফরাসী ও জার্মান পণ্ডিতগণের পুস্তক ও পত্রিকায় এ বিষয়ে যে সমস্ত গবেষণাসূত্র পাওয়া যায়, ভারতীয় মাপকাঠিতে তাহা প্রযুক্ত হইতেছে, কি না, তাহা নির্ধারণের জন্য বহু ভারতীয় ডাক্তার, কবিরাজ ও হেকিমের সহিত আমাকে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইয়াছে।

পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতা

প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পর হইতেই দেশসুদ্ধ লোকের আগ্রহবাণী, উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা পাইবার সুযোগ আমার হইয়াছে। পরবর্তী আলোচনা ও অধ্যয়নের ফলে আমার এই সংস্করণটি বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আমার প্রত্যেক সংস্করণে পূর্ববর্তী তথ্যসমূহের আমূল সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিয়া আসিতেছি। কারণ, বিজ্ঞান নিত্য নূতন তথ্যের সন্ধান দিতেছে। অথচ বহু লেখক, এমন কি পাশ্চাত্য দেশের লেখকও একখানি বহি লিখিয়া উহাকেই বৎসরের পর বৎসর একইভাবে ছাপাইয়া অর্থোপার্জন করিয়া চলিয়াছেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণের যে সকল মতামতকে ভিত্তি করিয়া আমি এই পুস্তকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সেগুলি প্রতীচ্য জগতে নির্ভুল বলিয়া গৃহীত হইলেও আমাদের দেশে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হইতে পারে, এ জ্ঞানও আমার আছে। ভারতীয় পাত্রে এগুলি প্রয়োগ করিবার যে চেষ্টা আমি করিয়াছি, তাহার প্রয়োগক্ষেত্র অতিশয় সীমাবদ্ধ। সুতরাং পাঠক-পাঠিকার নিকট আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা আলোচিত বিষয়গুলিকে নিজ নিজ দেহ ও মনের সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের মতামত আমাকে জানাইবেন। যাঁহারা ইতিমধ্যে তাঁহাদের মতামত জানাইয়াছেন, তাঁহাদের মতামত অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং দৃঢ়ভাবে সে গোপনীয়তা রক্ষা করা হইবে, একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য ইহা যে কত প্রয়োজনীয়, আশা করি প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকা তাহা স্বীকার করিবেন। এই উদ্দেশ্যে এই সংস্করণের শেষেও একটি **প্রশ্নমালা** সন্নিবেশিত হইল।

অজ্ঞতা ধর্মের ভিত্তি নহে

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যৌন ব্যাপারকে সরলভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া যথারীতি অধ্যয়নের দ্বারা **মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ** সাধিত হইবে। যৌনবিষয়ে আলোচনায় তরলমতি বালক-বালিকা পথভ্রষ্ট হইবে বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের ভ্রমপূর্ণ মনোভাবের ও যুক্তির অসারতা আমি বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি। আমি আবার তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, **অজ্ঞতা কস্মিন্‌কালেও নীতির রক্ষাকবচ নহে।** যৌন-ব্যাপারে মানুষকে অজ্ঞ রাখা অসম্ভব, কারণ প্রকৃতিই তাহার শিক্ষাদাত্রী। সুতরাং সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া সুশিক্ষার ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কার্য।

আমাদের শুনিয়া বোধ হয় আশ্চর্য লাগিবে যে, আমেরিকার অসংখ্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে **'বিবাহ'** বিষয়টিকে পাঠ্য বলিয়া পড়ানো হয়। প্রায় আট বৎসর পূর্বে সর্বপ্রথম মিশৌরীতে একটি মেয়ে-কলেজে এবং তাহার পরেই আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্তরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাহার পরে দ্রুতগতিতে ঐরূপ ব্যবস্থা অন্যত্র করা হয়।

বিবাহের প্রাক্কালে এবং তাহার পর বিবাহেচ্ছু যুবতীকে যে যে বিষয়ে

অবহিত এবং সাবধান হইতে হয়, তাহার সমস্তই তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত শিক্ষাতালিকা হইতে বিষয়গুলি প্রতীয়মান হইবে:

(১) বিবাহবদ্ধ হইবার নানাবিধ কারণ: (২) বিবাহের স্বাভাবিকতা; (৩) যৌন অংশীদার নির্বাচন, (৪) কোর্টশীপ বা পূর্ব-সাহচর্য, (৫) উদ্বাহ-বন্ধন; (৬) প্রকৃত বিবাহ, (৭) দাম্পত্য জীবন-যাপন, (৮) বিবাহ-জীবনকে সুখী কবিবাব উপকরণ; (৯) পরিবাবে আয়-ব্যয়, (১০) বিবা[illegible]ত নারীদের আয়ের সংস্থান, (১১) স[illegible]ান-ধাবণ ও পালন এবং (১২) অবসব-বি[illegible]াদন।

ভবিষ্যতে স্কুল ও কলেজে অনুরূপ পাঠ্য প্রবর্তনের চেষ্টাও হইতেছে। পাক-ভারতেও ঐরূপ ব্যবস্থা কবা আমবা সর্বান্তঃকবণে সমর্থন কবি।

উপযুক্ত যৌনগ্রন্থের উপহার প্রদান

তবে এইরূপ ব্যবস্থা কবা হইলেও আমাদের যুবক-যুবতীর বিরাট সংখ্যার মাত্র অতি অল্পজনেই ইহাব সুযোগ গ্রহণ করিবাব সৌভাগ্য হইবে। তাই, বলা বাহুল্য, **মাতা-পিতা, গুরুজন, আত্মীয়-স্বজন,** এমন কি হিতাকাঙ্ক্ষী **বন্ধু-বান্ধবীদের** সকলেব কর্তব্য **বিবাহের প্রাক্কালে** অথবা **সঙ্গে সঙ্গে বর ও বধূ** তাহাদেব **দাম্পত্য জীবন-যাপনের** উপযোগী জ্ঞানলাভ কবিযাছে কিনা তাহা নির্ণয় কবা, এবং উহা কবে নাই বা শুধু অসম্পূর্ণভাবে কবিযাছে জানিতে পারিলে, উহাদেব হাতে দুই চারিখানি **প্রামাণ্য যৌন-গ্রন্থ** দেওযা—যাহাতে তাহারা নিজেদের পথ বাছিযা লইয়া চলিতে পারে। তাহা না করিলে তাহাদিগকে শুধু আদব-আহ্লাদ দিযা, টাকাপয়সা খরচ করিযা, বেশভূষা পবাইয়া একটি বিপদসঙ্কুল রাস্তায় আগাইয়া দেওয়া হইবে মাত্র। সকল উপহাবেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপহার হইবে—যাহাতে তাহারা পথ চলিবার মত জ্ঞান ও উপদেশ পায় এমন ব্যবস্থা করা।

অন্যান্য ভাষায় কত শত-সহস্র পুস্তক-পুস্তিকার সাহায্য বর ও বধূ পাইতে পাবে, তাহার আভাষ এই পুস্তকে আলোচিত এবং প্রমাণপঞ্জীতে উল্লিখিত যৌনসাহিত্যেব বিরাট তালিকা হইতেই পাওয়া যাইবে। বাংলাভাষা এ বিষযে অত্যন্ত দীন।

যৌন-বিকল্পের প্রসার

প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমি যৌন-বিকল্পের এমন বিস্তৃত আলোচনা করায় উহাতে বালক-বালিকা বিপথগামী হইতে পারে কি না। আমি বলিব, এ

ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। যাহা অহরহ ঘটিতেছে, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। লিপিবদ্ধ অধিকাংশ বিষয়ই বিভিন্ন বিজ্ঞানীর দীর্ঘদিনের নৈষ্ঠিক সাধনা ও অনুসন্ধানের ফল। সরলমনা পাঠক-পাঠিকা হয়ত মনে করিতেছেন যে, এই পুস্তকপাঠে তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ এই সমস্ত যৌনবিকল্প শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু একটু পর্যবেক্ষণ সহকারে লক্ষ্য করিলে তাঁহারা জানিয়া বিস্মিত হইবেন যে, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত এবং সঙ্গী প্রভৃতিদের শিক্ষাগুণে ঐ সমস্ত অভ্যাস বোধ হয় ইতিপূর্বেই মূল বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং কি হইবে, তাহা প্রশ্ন নয়, যাহা হইয়াছে, তাহার সংস্কার কিভাবে করা যায় তাহাই আসল সমস্যা। এ সমস্ত অভ্যাস দূর করিবার জন্য আমরা ব্রহ্মচর্য, মনশ্চিকিৎসা, ইচ্ছাশক্তি-সাধনা প্রভৃতি প্রতিকারোপায় নির্দেশ করিয়াছি। হইতে পারে, বিশেষ বিশেষ পাঠক এই পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশই অধিক মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। কিন্তু আমি সমস্ত বিষয়টিকে জ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড় করাইয়া বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছি এবং সেই ভাবেই পাঠকের সম্মুখে উহা উপস্থাপিত করিয়াছি।

পূর্বসংস্কার জ্ঞানাহরণের পরিপন্থী

পাঠক-পাঠিকাগণকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যৌনবিজ্ঞানের ন্যায় জটিল বিষয় অধ্যয়ন করিতে গেলে জ্ঞানাহরণের তীব্র ক্ষুধা লইয়াই করিতে হইবে। বাল্যকালে শ্রুত ও দৃষ্ট বস্তুসমূহ হইতে উৎপন্ন ধারণা **ধর্ম, সমাজ, নীতি, দেশ, কাল** এই সমস্ত পূর্বসংস্কার কোন বিষয়েই আমাদিগকে স্বাধীনভাবে জ্ঞানাহরণ করিতে দেয় না। বর্তমান বিষয়ের আলোচনায় আমি সকল ব্যাপারে **সংস্কারবর্জিত** হইয়া **নিরপেক্ষভাবে** বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত বিষয়টি দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতটা সাফল্যলাভ করিয়াছি, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহার বিচার করিবেন। কিন্তু আমার নিবেদন এই যে, কেবলমাত্র সত্যানুসন্ধিৎসা ও সমাজ-কল্যাণই আমাকে এ কার্যে পরিচালিত করিয়াছে।

বিজ্ঞানসাধনার ক্রমবিকাশ

আমি স্বীকার করি, সকল বিষয়ে হয়ত আমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে সত্যের রূপ দর্শন করিতে পারি নাই। কিন্তু সে দোষ আমার বা কোন ব্যক্তি-

বিশেষের নহে। দেহতত্ত্ব, শরীর বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গ্রন্থি-রসতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, বংশগতি, সৌজাত্যবিদ্যা, প্রভৃতি যে সমস্ত বিজ্ঞানের উপর যৌনবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই সমস্ত বিজ্ঞান নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল নয়। সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাই মানব-মনের একটা অফুরন্ত জিজ্ঞাসা। এ সাধনা, এ গবেষণা অনন্তকাল চলিবে। যৌনবিজ্ঞানও এই ত্রুটিমুক্ত নয়। সুতরাং আমি বর্তমান গ্রন্থে শুধু সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অভিমতই গ্রহণ করিয়াছি, যাহা ভবিষ্যতে নূতন আবিষ্কারের আলোকে পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বর্তমানে **অধিকাংশ বিজ্ঞানী কর্তৃক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে।** যে সমস্ত মতবাদকে এককালে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ধর্মীয় তত্ত্বকথারূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, সে সমস্তেরও বহু সংস্কার ও রদ-বদল হইয়াছে। ইহাই দেখাইবার জন্য আমি বর্তমান গ্রন্থে প্রাচীন মতবাদের উল্লেখ করিয়া তাহার সঙ্গে আধুনিক মতবাদের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে ত্রুটি করি নাই। এমন কি, পূর্ব সংস্করণের কতক মতবাদও সংশোধিত করিয়া এই সংস্করণে উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

মত-পার্থক্য স্বাভাবিক

কোনও বিষয় সম্বন্ধেই সকলের একমত হওয়া সম্ভবপর নহে। যৌন-বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল মতবাদ আছে এবং থাকিবেই। কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্যানুসন্ধান যাঁহারা করেন, মতভেদের জন্য তাঁহারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা হারান না। সত্যের সঙ্গে স্বার্থের এইটুকুই পার্থক্য। বহু বিভিন্ন মতের মধ্য হইতে আমি একটি মাত্র মত গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া অন্য মতগুলিকে আমার অশ্রদ্ধা আছে, তাহা নহে। আমি একটি মত গ্রহণ করিয়াছি এইজন্য যে, সত্যানুসন্ধানে এককালীন একটির বেশী মত গ্রহণ করিয়াছি এবং অপর সকল মতের সঙ্গে আমার মতভেদ সশ্রদ্ধভাবে প্রকাশ করিয়াছি।

আশা করি আমার পাঠক-পাঠিকাগণও আমার প্রতি অনুরূপ সদয় ব্যবহার করিবেন। গ্রন্থকার একা, পাঠক-পাঠিকা বহু। সকলকে সন্তুষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কাহারও পক্ষেই নয়। পাঠকের নিকট অনুরোধ, বক্তব্য পাঠ না করিয়াই তাঁহারা যেন কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত না হন।

সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাই জ্ঞানের উৎস

পর-মত-সহিষ্ণুতার অভাব আমাদিগকে জ্ঞানান্বেষণে প্রতি পদে বাধা দিতেছে। আমরা সংস্কারমুক্তভাবে জ্ঞানাহরণের চেষ্টা করিতেছি না। আমরা আমাদের জরাজীর্ণ সংস্কারগুলিকে যক্ষের মত পাহারা দিতেছি। আমি আমার পাঠক-পাঠিকাকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের সমস্ত মতবাদই জ্ঞানানুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত? তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে আমার প্রচারিত কোন মত গ্রহণ বা বর্জন করিবার পূর্বে আমি তাঁহাদিগকে জ্ঞান ও বিচারের নিক্তিতে সমস্ত ব্যাপারকে ওজন করিবার অনুরোধ করিতেছি। কোনও একটি বিষয় প্রথম দৃষ্টিতে যতই **অসম্ভব** ও **অযৌক্তিক** মনে হউক না কেন, **যতই বিপ্লবমূলক** বোধ হউক না কেন, আমাদের চিরপোষিত ধারণার যত বিরোধীই হউক না কেন, তাহাকে (পূর্ব ধারণার বিরুদ্ধ বলিয়া) এক কথায় **বিনাবিচারে** অগ্রাহ্য করিবেন না। তাহা যদি করেন, দুনিয়ার অনেক সত্য হইতেই আপনি বঞ্চিত থাকিবেন। আর সত্য আসিয়া যখন সম্মুখে দাঁড়াইবে, সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করিবেন। **সত্য গ্রহণে** সংস্কারবর্জিত মুক্ত বুদ্ধি, খোলা মন, নিরপেক্ষ ভাব, বিচার বুদ্ধি, যুক্তি-নিষ্ঠতা ও **সাহস** চাই বলিয়াই আমি এ কথা বলিতেছি। সত্য কাহারও মুখাপেক্ষী নয়—সে সত্যই, আপনি চাহিলেও সে সত্য, আপনি না চাহিলেও সে সত্যই। এ কথা পাঠক-পাঠিকাকে স্মরণ করাইয়া দিবার বিশেষ কারণ এই যে, মানুষ তাহার পূর্ব-সংস্কারের অনুকূল মতগুলিকে যত সহজে গ্রহণ করে, উহার বিরুদ্ধ মতগুলিকে ঠিক তত সহজেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। অগ্রাহ্য করিবেন করুন, কিন্তু বিরুদ্ধ মতের প্রচারকে বিনাবিচারে নিন্দা করিবার মত অসহিষ্ণু হওয়া কি উচিত?

আমরা জানি এবং দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাসও করি, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না। কিন্তু কোন বিজ্ঞানী যদি মরা মানুষ বাঁচাইবার জন্য গবেষণা করেন, তবে তাহাতে আমাদের ক্রুদ্ধ হইবার কোন কারণই নাই। যদি তিনি বিফল-মনোরথ হন, তাহাতে কাহারও কোনও লোকসান হইবে না; কিন্তু যদি সফলকাম হন, তাহা হইলে সকলেই একটা নূতন সত্যের সন্ধান পাইব।

আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে আমার পাঠক-পাঠিকার মধ্যে এমনও অনেক আছেন, যাঁহারা জ্ঞানের কষ্টিপাথরে সমস্ত বিষয়ই 'যাচাই' করিয়া থাকেন। আমি জানি, তাঁহারা আমার এ উদ্যমের প্রশংসা করিয়াছেন। আমার এ

সাধনায় অনেকে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, আমার এ গ্রন্থের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূরীকরণে তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলভাগী করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সহযোগিতার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। এই জটিল বিজ্ঞানালোচনায় পাঠক-পাঠিকা যখন যে পরামর্শ দিবেন, আমি পরবর্তী সংস্করণের সংস্কারের জন্য সে পরামর্শ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব।

উপসংহারে আমার নিবেদন এই যে, আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি, শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা লইয়া এ বিষয়ে অধ্যয়ন করিলে বাঙালীর পারিবারিক জীবন সুখের আকর হইবে, বাংলার দম্পতিরা আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা হইবেন, ব্যভিচার ও যৌনবিকল্প বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হইতে দূরীভূত হইবে, **যৌনসুখের সন্ধানে যাহারা বিবাহ-প্রথার উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছে, তাহারা বুঝিতে পারিবে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা বিবাহিত জীবনকেই চরম সুখের কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব।** আমি উপসংহারে দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে ডাঃ ফোরেলের ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিতেছি।

ফোরেলের কল্পিত দাম্পত্য জীবন

ফোরেল লিখিয়াছেন—ভবিষ্যতের মানুষ শৈশব হইতেই যৌনবিজ্ঞান ও উহার বিভিন্ন দিকের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হইবে। মানুষ মদ্য পান বা কোনও প্রকার নেশা করিবে না। মানুষ কাঞ্চনকৌলীন্যে বিশ্বাসী থাকিবে না, সহস্র লোকের রক্ত শোষণ করিয়া এক ব্যক্তি ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে না, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের কামলালসার ইন্ধন যোগাইবার জন্য সহস্র প্রেমিকের প্রাণ ও সহস্র নারীর সতীত্ব বিসর্জন দিতে হইবে না। মানুষ বিলাসী থাকিবে না; শিল্পকলা ও ললিতকলা সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন হইবে। মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের বাহুল্য থাকিবে না। স্বাস্থ্যসম্মত, স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ পোষাকে মানুষ তৃপ্ত থাকিবে। আড়ম্বর ও বিলাসিতা যে শিল্পকলা নহে, একথা মানুষ হৃদয়ঙ্গম করিবে। সুতরাং মানুষের আবাসভবন আড়ম্বরপূর্ণ ইষ্টক স্তূপ মাত্র থাকিবে না, তাহা মানুষের বাসোপযোগী কবিত্বময়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শিল্পকলার নিদর্শন হইবে। মানুষ ভণ্ডামি ভুলিয়া যাইবে; সত্যকথা সত্য করিয়া জোরের সঙ্গে বলিবার অভ্যাস করিবে।

যৌন-বিষয়ে অভিজ্ঞ তরুণ-তরুণী অন্যান্য দশ বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় নিজেদের যৌন উপযোগিতা আলোচনা ও বিচার করিবে। তাহারা পয়সার হিসাব করিতে যেমন ভুল করে না, যৌন-ব্যাপারে কিংবা অংশীদার নির্বাচনেও তেমনি ভুল করিবে না। নারীপুরুষ উভয়েরই তালাকের অধিকার থাকিবে, কিন্তু তালাকের প্রয়োজন থাকিবে না।

জন্ম-রহস্য

জনসাধারণের অজ্ঞতা

মানবজন্মরহস্য চিরকাল মানব মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া আসিয়াছে। এ সম্পর্কে নানা মতবাদ ও ভুল ধারণার ছড়াছড়ি নানা দেশে ও নানা যুগে চলিয়া আসিতেছে। জন্মরহস্যের বিস্তৃত আলোচনা আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে করিয়াছি। এখানে মোটামুটি একটা ধারণা মাত্র দেওয়া যাইতেছে। জীবজগতে যৌন-আচরণের মূল উদ্দেশ্যই বংশবিস্তার। সুতরাং ঐ বংশবিস্তারের সঠিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সর্বপ্রথমেই পাঠক-পাঠিকাকে অবহিত করা উচিত।

বংশবিস্তারের সহজ প্রক্রিয়া

জীবজগতে নানা বিচিত্র উপায়ের জন্ম প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক জীবজন্তুর নামের তালিকা ইতিমধ্যেই জীব-বিজ্ঞানীরা করিয়া ফেলিয়াছেন—আরও নূতন নূতন জীবজন্তুর আবিষ্কার হইয়াই চলিয়াছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রত্যেকেই নিজ নিজ আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট জন্ম দিয়া চলিয়াছে। যেন বৈচিত্র্যের অবধি নাই।

জীবজন্তুর শরীরের সূক্ষ্মতম অংশের নাম **জীবকোষ** (Cell)। জীবকোষ এত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে উহা দেখা প্রায় অসম্ভব। বেশীর ভাগ জীবকোষই এত ক্ষুদ্র যে উহাদের প্রায় ১০০ গুণ বর্ধিত প্রতিকৃতি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে নজরে পড়ে।

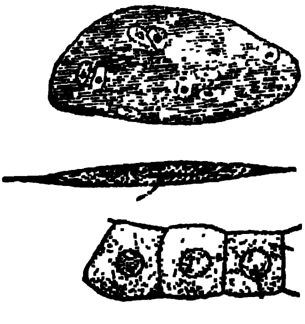

(৪নং চিত্র)

অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বর্ধিত প্রকৃতির জীবকোষ দেখিতে ততটা কৌতূহলোদ্দীপক নয়। ইহা যৎসামান্য নরম পরিষ্কার জেলীর মত দেখা যায়—কখন কখন চারিপাশে খানিকটা বেষ্টনীর মত, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই মধ্যভাগে একটু ঘন বিন্দুর মত দৃষ্টিগোচর হয়। এই মধ্যভাগের ঘন অংশই জীবকোষের **মূলকেন্দ্র** (Nucleus)।

জীবকোষ নানা আকার ও প্রকারের হইয়া থাকে। ৪নং চিত্রে কয়েক রকমের জীবকোষ দেখুন। মানুষ, হাতী বা বানরের মত জীব ও জন্তুর দেহ এইরূপ কোটি কোটি জীবকোষের সমষ্টি। অন্যদিকে আবার অসংখ্য জীবাণু শুধু একটি মাত্র জীবকোষ লইয়াই গঠিত। ইহাদিগকে এককোষবিশিষ্ট (Unicellular Organism) জীব বলে। এমিবা (Amoeba) এই প্রকারের একটি জীবাণু। ইহা খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা এবং বংশবিস্তার সমস্ত শরীরটুকু দিয়াই করে। ইহার বংশবিস্তারের পদ্ধতি সরল ও বৈচিত্র্য বিহীন। আস্তে আস্তে সমস্ত দেহটিকে প্রসারণ করিতে করিতে ইহা

(৫নং চিত্র)

দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুইটি বিভিন্ন এমিবায় পরিণত হয়। ৫নং চিত্রে এই বিভাগ পদ্ধতি দেখুন। এই পদ্ধতিতে মূল জীবটির মৃত্যু হয় না—উহা সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চির বিরাজমান। কেবল মাত্র যে এককোষবিশিষ্ট জীবের বেলায়ই এই ধরনের বংশবৃদ্ধি হয় তাহা নয়। বহুকোষবিশিষ্ট নানা সামুদ্রিক জীব (Sea anemones) এবং পোকাও (Worms) এইভাবে বংশবিস্তার করে। অপর এক পদ্ধতিতে জীবের দেহের খানিকটা মাত্র নূতন জীবের আকার ধারণ করে। ইহাতে মূল জীব তাহার স্বাতন্ত্র্য হারায় না—কিন্তু কিছুকাল পরে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার দেহাংশ মাত্র নূতন জীবে বিরাজ করে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এমিবার মত নিম্নস্তরের জীবাণুর বংশবৃদ্ধির ব্যাপাব যৌন-সম্পর্ক-বিহীন। সুবিধাজনক পরিবেশে তাহাই বটে, তবে কখনও কখনও দেখা যায় যে ক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বংশবিস্তারের প্রবণতা স্তিমিত হইয়া আসে। তখন দুইটি জীব পাশাপাশি আসিয়া বা একে অপরে সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রাণবস্তুর বিনিময় করে। তাহার পর হইতেই আবার উভয়ে উদ্দীপিত হইয়া বংশবিস্তার করিতে আরম্ভ করে। দুইটি জীবাণুর এইরূপ সংযোগই যৌন সম্পর্কেব সূচনা কিনা তাহা বলা কঠিন কিন্তু উচ্চস্তরের জীব-জন্তুব মধ্যে যৌন সমাবেশের বৈচিত্র্যময় লীলা দেখা যায়।

পক্ষীর বংশ-বিস্তার প্রণালী

স্ত্রী-পক্ষীব ডিম্বকোষে ডিম সঞ্চিত থাকে। ইহার সঙ্গে সংযুক্ত একটা সরু এবং ক্ষুদ্র নল অন্ত্রেব শেষ প্রান্তে—যেখানে বাহ্যদ্বাব অবস্থিত তাব অতি সন্নিকটে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পক্ষীর বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে এই ডিম্বগুলিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং কালক্রমে অঙ্কুরিত হইবার মত পক্ক হইয়া উঠে।

পুরুষ পক্ষীব জীবনে জন্মদানেব শুভ মুহূর্তেব আবির্ভাব নানাভাবে সূচিত হয়, যথা—সুন্দব পালক-সজ্জা এবং সঙ্গীতেব নেশা। স্ত্রী পক্ষীর সঙ্গে মিলিত হইবার একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তখন পুরুষ পক্ষীর মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে। যৌবনাগমের একটা জাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পক্ষীকুল তখন যেন মিলন প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া থাকে এবং বাসা নির্মাণে মনোযোগ দেয়। স্ত্রী পক্ষী সেখানে ডিম পাড়ে। এই ডিম কোথা হইতে আসে?

পুরুষ পক্ষীর শুক্রকীটেব সংস্পর্শে আসিয়া স্ত্রী পক্ষীর ডিম্ব প্রাণবন্ত এবং অঙ্কুরিত হয়। প্রকৃতি সকল জীবেব মধ্যে বংশবক্ষা ও দৈহিক মিলনজাত আনন্দলাভের একটা সহজাত সংস্কারেব জন্ম দিয়াছে। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ পক্ষী এমনভাবে মিলিত হয় যে, পুরুষ দেহ-নিঃসৃত শুক্রকীট স্ত্রী পক্ষীর ডিম্বের সংস্পর্শে আসিবাব সুযোগ পায়।* ফলে যথাসময়ে স্ত্রী পক্ষী ডিম পাড়ে। ক্রমাগত উত্তাপ দান করিতে করিতে নির্দিষ্ট সময়ে এই ডিম হইতে পক্ষী শাবক ফুটিয়া বাহির হয়।

* সাধারণতঃ পুরুষ পক্ষীর লিঙ্গ থাকে না। পুরুষ ও স্ত্রী পক্ষীর মলদ্বার, মূত্রদ্বার, শুক্রপথ ও যোনিমুখের একই মাত্র ছিদ্র (cloaca) ঘর্ষিত হইলেই শুক্রকীট স্ত্রীদেহে প্রবেশ করে।

মুরগীর ডিম ও ছানা

মোরগ ও মুরগী গৃহপালিত পক্ষী। সচরাচর উহাদিগকে দেখিবার সুযোগ আমাদের খুবই ঘটে। মুরগীর ডিম্বাশয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ডিম অবস্থিত থাকে। এই ডিম্ব ক্রমে পরিপক্ক হইয়া ডিম্ববাহী নলের ভিতর দিয়া একটি একটি করিয়া বাহির হইয়া আসে। আঙ্গিক মিলনের ফলে মোরগের শুক্র-

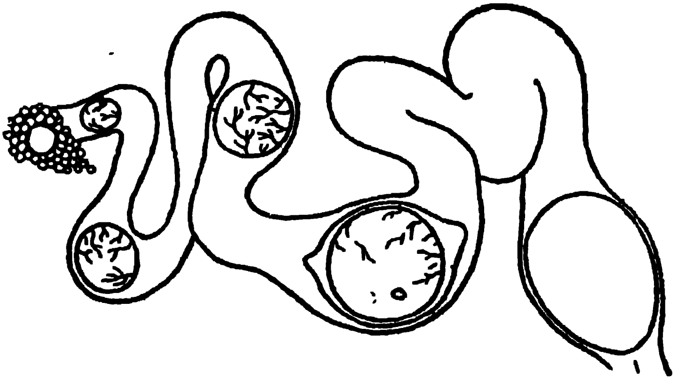

(৬নং চিত্র)

কীট মুরগীর ডিমগুলিকে প্রাণবন্ত করে। ৬নং ছবিতে ডিম্বের ক্রম-পক্কতা ও একটির পর একটির বড় হইয়া বাহির হইয়া আসিবার দৃশ্য দেখানো হইয়াছে।

মুরগীর ডিমের খোসা প্রথমে নরম থাকে। বাহিরের আলো বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই উহা কঠিন হইয়া যায়। ডিমের বিশেষত্ব এই যে উহাতে ভবিষ্যৎ ছানার গ্রহণোপযোগী সকল মাল-মসলাই পুরোপুরিভাবে থাকে। পিতা-মাতার সাহায্য ব্যতিরেকেও উহা হইতে মুরগীর ছানা জন্মিতে পারে। ইনকিউবেটর (Incubator) যন্ত্রে এক সঙ্গে বহু ডিম্ব নিয়মিত ও পরিমিত ভাবে উত্তাপ দিয়া ফুটানো যায়। ৭নং ছবিতে মুরগীর ডিমের ভিতরকার ক্রম-পরিবর্তন ও ছানার রূপ-পরিগ্রহণ ইত্যাদি দেখানো হইয়াছে। অপরাপর জীবজন্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জন্মপ্রকরণ চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা আমি আমার 'মাতৃমঙ্গল' পুস্তকে করিয়াছি। এখানে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নাই।

মানব-জন্ম-প্রকরণ

সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা সবাই বুঝিতে পারে যে মানবজাতির মধ্যে নারী ও পুরুষের সমবায়ে বংশবৃদ্ধি হয়। মনু নানা জৈবিক পদার্থ মিলাইয়া নর ও নারী

সৃজন করিয়া বা খোদা আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়া উহাদের যৌনসম্পর্কে মানবজাতির বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এরূপ অলীক কাহিনী আজিও প্রচলিত আছে। জীব-বিজ্ঞানীরা কিন্তু মানবজাতির মধ্যে অপরাপর জীবজন্তুর মত একই পদ্ধতির সন্ধান পান—বিশেষ কোনও সুবিধাজনক বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজিয়া পান না। নর ও নারীর যে দুইটি বিশিষ্ট জীবকোষের

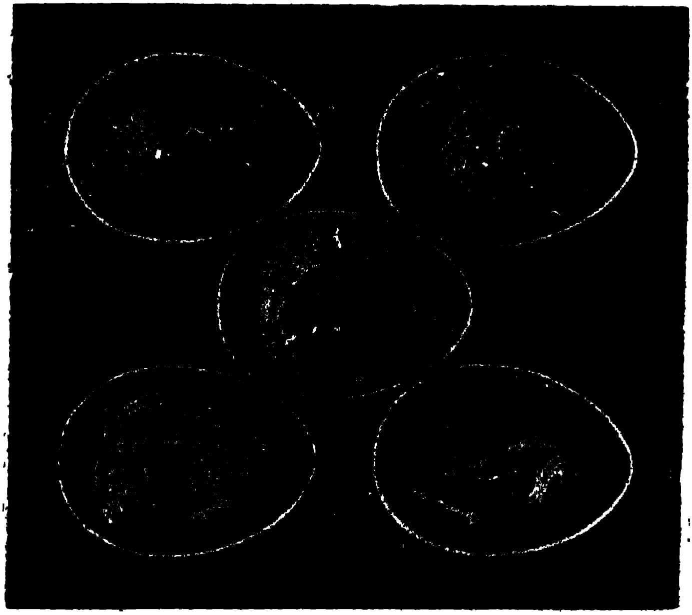

৭নং চিত্র

সংযোগে সন্তানের উৎপত্তি হয় তাহাদের নাম—শুক্রকীট ও ডিম্ব। নারীই সন্তানের আধার এই হিসাবে নারীর অবদানের কথাই আমরা আগে বলিব।

[illegible]রীর [illegible]দান

নারীর ডিম্ব শুক্রকীট[illegible] বহুগুণ বড় হইলেও আকারে উহারা এত ছোট যে উহা নজরেই [illegible]। নারীর ঋতুস্রাবের সঙ্গে ডিম্বস্ফোটনের সম্বন্ধ আছে। সাধারণতঃ [illegible]স্রাবের মধ্যবর্তী সময়েই ডিম্বস্ফোটন হইয়া থাকে। উনবিংশ শ[illegible] ধারণা ছিল যে, মাসিক স্রাবের পরেই ডিম্বস্ফোটন হয় এবং গর্ভ[illegible]র উপযোগী উর্বরকাল আরম্ভ হয়।

এই **ডিম্বই** সন্তানের প্রথম উপাদান। নারীর ডিম্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাচীনকালের লোকদের ধারণাই ছিল না। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভন হেলার (Von Haller) ভেড়ীর উপর পরীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে **ডিম্বকোষ** (Ovary) হইতে **কোনও একটা কিছু জরায়ুতে** আগমন করিবার ফলেই তথায় ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। ইহার পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে **ভন বেয়ার** (Von Baer) সর্বপ্রথম নারীর ডিম্ব আবিষ্কার করেন।

নারীর ডিম্ব এত ক্ষুদ্র যে তাহা সহজে দৃষ্টি হয় না। ৮নং চিত্রে নারীর ডিম্ব হাঁস এবং মুরগীর ডিম্বের পরিণত আকারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কত ক্ষুদ্র তাহাই তুলনামূলকভাবে দেখানো হইয়াছে।

৮নং চিত্র

(১) মুরগীর ডিম্ব, (৩) হাঁসের ডিম্ব, (২) নারীর ডিম্ব (ছয়গুণ বর্ধিত)।

(১) এবং (৩) যথাক্রমে মুরগী এবং হাঁ[illegible] পূর্ণতাপ্রাপ্ত ডিম্বের প্রকৃত আকার এবং (২) চিহ্নিত স্থানের নিম্নে কা[illegible]ের সাদা বিন্দুটি নারীর ডিম্বের ছয়গুণ বর্ধিত প্রতিকৃতি।

নারীর ডিম্বের গঠন ও প্রতিকৃতি ৯নং [illegible] বুঝা যাইবে। মনে রাখিতে হইবে চিত্রটি প্রকৃত আকারের [illegible] বর্ধিত। ডিম্বের ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চির ১২০ ভাগের ১ ভাগ। [illegible]

নারীর ডিম্ব কোথায় উৎপন্ন হয় এবং কি ভাবে বাহির হইয়া আসে সে সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়-সমূহের অবস্থিতির কথা জানিতে হইবে। ২৪নং চিত্রে ইহাদের প্রতিকৃতি দেখুন।

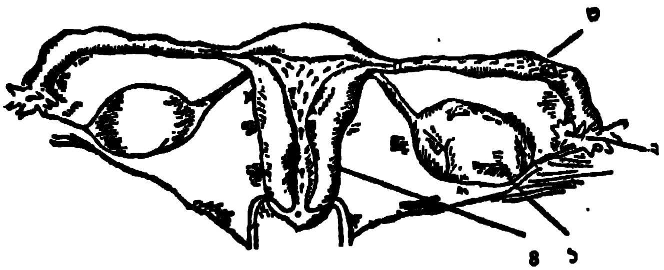

৯নং চিত্র

(১) ডিম্বকোষ (২) ডিম্ববাহী নলের মুখ (৩) ডিম্বনলের ভিতর ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলন (৪) জরায়ু।

নারীর জরায়ুর (৯নং চিত্র) ঊর্দ্ধাংশে দুই কোণে ফ্যালোপিয়ান নল (Fallopian Tubes) আছে। এতদ্ব্যতীত জরায়ুর দুই পার্শ্বে প্রশস্ত বন্ধনীদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগে দুইটি ডিম্বকোষ (Ovary) অবস্থিত। এক একটি ডিম্বকোষে শিশুর জন্মের সহিতই প্রায় দুই লক্ষ করিয়া ফলিক্‌ল (Follicle) অর্থাৎ ডিম্ব ও উহার পার্শ্বে একটি বেষ্টনী-কোষ অতি প্রাথমিক অবস্থায় থাকে। যৌবন আগমনের সময় ৭,৫০০ হইতে ১৮,০০০ পর্যন্ত থাকে। ৪৫-৫০ বৎসর বয়সে ঋতু একেবারে বন্ধ (ঋতুসংহার) হইবার পর প্রায় সবগুলিই নষ্ট হইয়া যায়।

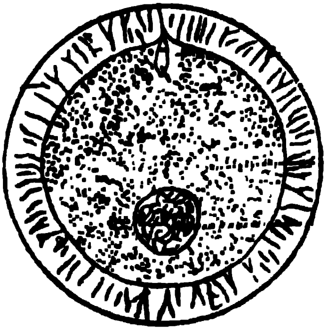

১০নং চিত্র

ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলন।

সাধারণতঃ প্রতি ২৮ দিনে দক্ষিণ বা বাম ডিম্বকোষের একটি ডিম্ব পরিপুষ্ট হয়। তখন তাহার উপরিস্থিত আবরণ ফাটিয়া যায় এবং ডিম্ববাহী নলের ঝালর সদৃশ মুখ ডিম্বকোষের উপর পতিত হইয়া পরিপুষ্ট ডিম্বটি গ্রহণ করে। (১১নং চিত্র)। ঐ ডিম্ব ডিম্বনলের মধ্য দিয়া জরায়ু অভিমুখে চলিতে

থাকে। ৯নং চিত্রে একটি ডিম্ব কি করিয়া বাহির হইয়া আসে তাহা দেখানো হইয়াছে। যদি পথের মধ্যে পুরুষের শুক্রকীট দ্বারা প্রাণবন্ত না হয় তবে উহা জরায়ুর ভিতর আসিয়া যোনিপথে বাহির হইয়া যায়। আর যদি তাহা হয় তবে গর্ভাধান (একটি ভ্রূণের জন্ম) হয়। ৯নং চিত্রের ব্যাখ্যা দেখুন। ১০নং চিত্রে শুক্রকীট ডিম্বে প্রবিষ্ট হইতেছে (খুব বড় করিয়া) দেখানো হইয়াছে। গর্ভস্থ সন্তান পুরুষ অথবা স্ত্রী হইবে তাহাও সেই মুহূর্তেই নির্দিষ্ট হইয়া যায়। কারণ পুরুষ-সৃষ্টি-কারী শুক্রকীট ডিম্বে প্রবিষ্ট হইলে পুরুষ জন্মায়, আর স্ত্রী-জন্মদানকারী শুক্রকীট হইলে স্ত্রী জন্মায়। পরে আর কোনও প্রকারেই ভ্রূণের লিঙ্গ পরিবর্তিত হয় না। পূর্বে মনে করা হইত যে, এক মাসে একটি ডিম্বকোষ হইতে এবং অপর মাসে অপরটি হইতে পর্যায়ক্রমে ডিম্ব বাহির হয়। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, এই পর্যায়ক্রমতার কোনও নিশ্চয়তা নাই। কখনও কখনও একই ডিম্বকোষ হইতে কয়েক মাস পর্যন্ত ডিম্বস্ফোটন হইতে পারে। আবার নাও হইতে পারে।

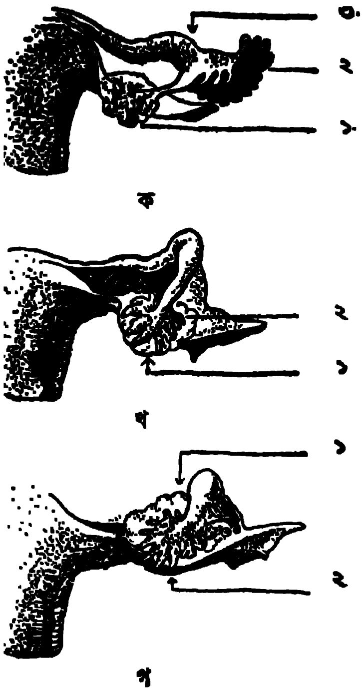

১১নং চিত্র
ডিম্বস্ফোটনের তিন অবস্থা।
১। ডিম্বকোষ। ২। ডিম্বনলের মুখ। ৩। ডিম্ববাহী নল।

পুরুষের অবদান

পুরুষের শুক্রকীট নারীর ডিম্বকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। শুক্রকীট পুরুষের শুক্রের তরল অংশে ভাসিয়া বেড়ায়। শুক্র শ্বেতবর্ণ-ঘন, আঠালো রস বিশেষ। শুক্র সম্বন্ধে আধুনিক অভিমত এই যে, উহা অণ্ডকোষ, শুক্রকোষ,

প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থিনিঃসৃত রস ও **শুক্রকীটের সমষ্টি।** অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক বিন্দু শুক্র পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বিদ্যমান। ইহার এক একটি কীট প্রায় ১।৫০০ ইঞ্চি লম্বা। কীট-দেহ মস্তক মধ্যভাগ ও লেজ, এই তিনভাগে বিভক্ত। ইহারা দেখিতে কতকটা বেঙাচির মত। লেজটিই সমস্ত কীটের ৯।১০ ভাগ। শরীরের অনুপাতে বেঙাচির মাথা অপেক্ষা শুক্রকীটের মাথা সরু এবং তাহার লেজ বেঙাচির লেজ অপেক্ষা লম্বা।

১২নং চিত্র
বহুগুণ বর্ধিত শুক্রকীটের প্রতিকৃতি
১। মস্তক ২। গ্রীবা ৩। মধ্যভাগ ৪। লেজ ৫। শেষাংশ।

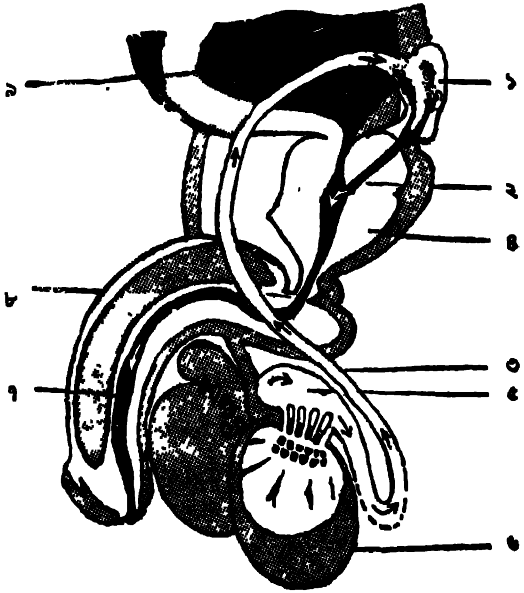

১৩নং চিত্র
১। শুক্রকোষ, ২-৩। শুক্রবাহী শিরা, ৪। প্রষ্টেট গ্রন্থি, ৫। এপিডিডাইমিস,
৬। অণ্ডকোষ, ৭। মূত্রনালী, ৮। লিঙ্গ, ৯। মূত্রাশয়।
(তীর চিহ্ন দ্বারা শুক্রকীটের গতিপথ দেখানো হইয়াছে)

উহারা লেজের সাহায্যে চলিয়া থাকে। পুরুষের এক-একবারের স্খলনে গড়ে প্রায় তিন ঘন সেন্টিমিটার (চা-চামচের প্রায় এক চামচ) পরিমাণ

বহির্গত হইয়া থাকে। প্রত্যেক শুক্রস্খলনে ২০ হইতে ৫০ কোটি শুক্রকীট বহির্গত হয়। **শুক্রকীটের অবস্থিতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।** প্রাচীন ধর্মপ্রবর্তকেরা, পণ্ডিতেরা ও চিকিৎসাবিদ্‌গণ ইহার বিষয় অবগত ছিলেন না।

শুক্রকীট অণ্ডকোষের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে উৎপন্ন হইয়া উপরের দিকে ধাবিত হয় এবং শুক্রকোষে গিয়া সঞ্চিত থাকে। ১৩নং চিত্র দেখুন। বীর্য স্খলনের সময় শুক্রকোষ হইতে প্রষ্টেট গ্রন্থির ভিতর দিয়া মূত্রনালী বাহিয়া উহারা চলার পথে শুক্রকোষ, প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি প্রভৃতি নিঃসৃত রসের সহিত মিলিয়া বাহির হইয়া থাকে। শুক্রকীট ঐ সকল রস-সমষ্টিতে ভাসমান অবস্থায় চলে।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষের শুক্রকীট এবং নারীর ডিম—এই উভয়ের মিলনে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই মিলন নর বা নারীর **ইচ্ছা** বা **অনিচ্ছার** উপর মোটেই নির্ভর করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শুক্রকীট কি করিয়া জরায়ু এবং ফ্যালোপিয়ান নলে বিচরণ করিতে থাকে, ১০নং চিত্রে তাহা দেখানো হইয়াছে।

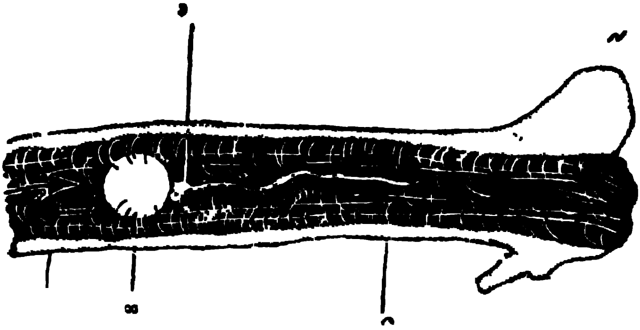

১৪নং চিত্র

ডিম্বনলের অভ্যন্তরে ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলন।

১। ২। ডিম্ববাহী নল ৩। ডিম্বনলের অভ্যন্তরস্থ লোমসমূহ

৪। ডিম্বাণু ৫। শুক্রকীট

পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুমুখে পতিত হইলে শুক্রকীটগুলি লেজ নাড়িয়া চলিতে চলিতে জরায়ুতে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ উক্ত নলের (এবং খুব কম ক্ষেত্রে জরায়ুর) মধ্যে শুক্রকীট ডিম্বের সহিত মিলিত হইলেই ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। শুক্রকীট ও ডিম্বের সাক্ষাৎ হইলেই শুক্রকীটগুলি ডিম্বকে ঘিরিয়া ফেলে। এই সমস্ত শুক্রকীটের মধ্যে **সর্বাগ্রগামী** শুক্রকীট ডিম্বগাত্রে মাথা

প্রবেশ করাইয়া দেয়। (১৪নং চিত্র) বীর্যমধ্যস্থ হায়ালিউরনিডেজ (Hyaluronidase) নামক জারক রসে (enzyme-এ) ডিম্বাণুর গাত্রাবরণটি গলাইয়া শুক্রকীটের প্রবেশের সুবিধা করিয়া দেয়। কীটের লম্বা লেজটি বাহির হইয়া থাকে। ক্রমে ঐ লেজটি নিস্তেজ ও অচল হইয়া লোপপ্রাপ্ত হয়। এই সংযোগ হইয়া গেলেই ডিম্বের চারিদিকে একটি আবরণ জন্মায় এবং অন্য শুক্রকীট আর উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। ৯নং চিত্র দেখুন।

পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্ব এই উভয়ের সংস্পর্শেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যৌনমিলনে এই সংস্পর্শের সুযোগ হয়।

গর্ভাধান

প্রত্যেক নারী সাধারণতঃ প্রতি ২৮ দিনে একটিমাত্র ডিম্ব স্খলন করিয়া থাকে। ডিম্ব ও শুক্রকীট-স্খলনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুরুষের শুক্রকীট যৌন-আবেগের সময় শুক্রের সহিত নিঃসারিত হইয়া থাকে, **কিন্তু নারীর ডিম্বস্খলনের সহিত রতিক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ** নাই। ডিম্বকোষস্থ যে ডিম্বটি যখন পরিপক্ক ও পরিপুষ্ট হয় তখনই সে ডিম্বটি ফ্যালোপিয়ান নলের ভিতর দিয়া পূর্ববর্তী ১০নং চিত্রে প্রদর্শিত পথে জরায়ুতে প্রবেশ করে।

১৫নং চিত্র

এখান হইতে কেবলমাত্র চিত্রের সাহায্যে ভ্রূণের ক্রম-পরিণতি ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতিকৃতি দেখানো যাইতেছে।

কোষ-বিভক্তি প্রক্রিয়া

শুক্রকীট ও ডিম্ব একত্রে মিলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বটি বহিরাবরণের মধ্যেই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ দুইভাগ চারিভাগে, চারিভাগ ষোল ভাগে এবং এইভাবে (জ্যামিতিক বিভাগক্রমে) ডিম্বটি অসংখ্য ভাগে পরিণত হয়। এইভাবে বিভক্ত হইতে হইতে, ১৫নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে, ডিম্বটি ডিম্ববাহী নলের মধ্য দিয়া প্রায় **এক সপ্তাহকালের মধ্যে জরায়ুর মধ্যে**

আসিয়া পড়ে। ততদিনে ইহা প্রায় শতশত কোষের সমষ্টিবদ্ধ একটি ক্ষুদ্র পিণ্ডের মত হইয়া পড়ে। শুধু ইহা বহুধা-বিভক্তই হয় না; ইহার কোষগুলি আপনা-আপনিই বিন্যস্ত হইয়া গিয়া (১৬, ১৭, ১৮নং চিত্রে প্রদর্শিত মতে) একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করে।

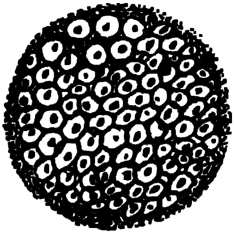

১৬নং চিত্র

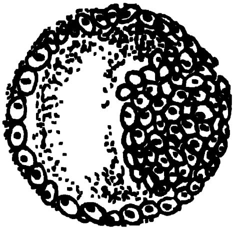

১৭নং চিত্র

১৮নং চিত্র
কোষসমূহ বিন্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

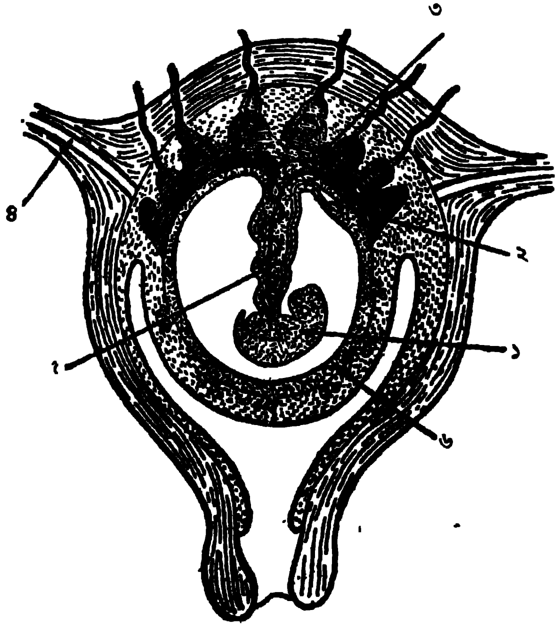

১৯নং চিত্র
জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের অবস্থান

১। ভ্রূণ
২। ডিম্ব-কুসুমের থলি
৩। গর্ভ-ফুল
৪। ডিম্ববাহী নল
৫। নাভিরজ্জু
৬। কোরিয়ান

জরায়ুর মধ্যে আসিয়া ইহা জরায়ুর গাত্রে প্রোথিত হইয়া যায় এবং ইহার কোষগুলি বিভিন্ন কোষবিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ভ্রূণটি মানবদেহে পরিণত হয়।

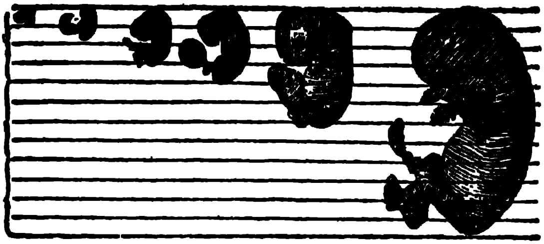

২০নং চিত্র

ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি

প্রতি ১৫ দিন পর পর এক একটি দাগ কাটা হইয়াছে। বৃহত্তম ভ্রূণটি ৬ মাসের।

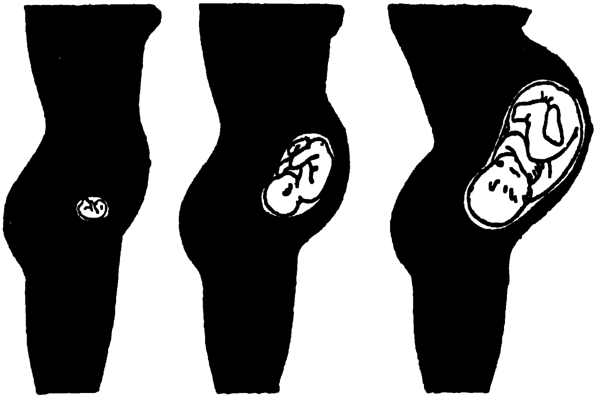

২১নং চিত্র

গর্ভাবস্থায় নারীর ক্রমবর্ধমান জরায়ু ও তলপেট।

এখানে জন্মরহস্যের মাত্র মোটামুটি একটা বিবরণ দেওয়া গেল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং আমার অপর পুস্তক 'মাতৃমঙ্গলে' করা হইয়াছে।

জীবজগতে জন্মরহস্য যে কত বড় রহস্য তাহা এই সামান্য আলোচনা হইতেই পাঠক-পাঠিকা বুঝিতে পারিবেন।

যৌন-ইন্দ্রিয়সমূহ

যৌন-শ্রেণী ও যৌন-ইন্দ্রিয়

প্রাণিজগতের প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই পুরুষ ও নারী এই দুইটি যৌনশ্রেণী বিদ্যমান আছে। এই দুই শ্রেণীর সহযোগিতাতে সৃষ্টিকার্য চলিয়া আসিতেছে। পুরুষ ও নারী চিনিবার উপায় প্রধানতঃ তাহাদের বাহ্য যৌন-ইন্দ্রিয় সকল। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষের মধ্যেও যৌন-ইন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলের সুবিধার জন্য আমরা এই অধ্যায়ে যৌন-ইন্দ্রিয় সমূহের মোটামুটি পরিচয় প্রদান করিতেছি।*

পাঠক-পাঠিকার এ সকল বিষয়ে নিজস্ব কতকটা জ্ঞান আছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়সমূহের বিষযে সম্যক্ জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নহে, কারণ, উহারা বাহ্যতঃ দৃশ্যমান নহে।†

কেন জ্ঞান আবশ্যক ?

কথা হইতে পারে, প্রকৃতিই ইন্দ্রিয়সমূহ দান করিয়াছে, তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মেই নিয়ত আপন আপন কর্তব্য সমাধা করিতেছে, মনুষ্য, গরু, মহিষ, বিড়াল, ইঁদুর সকলেই নিজ নিজ বংশ বিস্তার করিতেছে, তবে আর এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভের প্রয়োজন কি ?

আমরা বলিব, মানুষ নিজের কার্যপরম্পরার বিষয় জানিতে চায়। ইতর জন্তুর চেয়ে তাহার বুদ্ধিই তাহার গৌরবের কারণ। **উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবেই সে এতকাল অন্ধ কুসংস্কারে ডুবিয়া রহিয়াছে; নানা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া অহেতুক বিধিনিষেধের আড়ম্বর করিয়াছে; সুস্থ যৌনজীবন-যাপন ব্যাপারে বহুবিধ বাধা ও কণ্টকের সৃষ্টি করিয়াছে।** আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে আমরা উহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হইতে পারি এবং কোন

* এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি আমার ইংরেজী পুস্তক All about Sex, Love and Happy Marriage পুস্তকে করিয়াছি।

† "No man should marry before he has studied anatomy or dissected the body of a woman."—*Balzac.*

কারণে- কোন ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য বা দৌর্বল্য উপস্থিত হইলে চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি।

পুরুষের যৌন-ইন্দ্রিয়সমূহ

পুরুষের যৌন-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে **লিঙ্গ** (পেনিস) ও **অণ্ডকোষই** (টেস্টিক্লস্) প্রধান। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ভিন্ন আবার প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি, শুক্রকোষ প্রভৃতি কতিপয় উপাঙ্গ আছে। নিম্নে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, উহা নরদেহের জননেন্দ্রিয়ের প্রধান অংশের লম্বমানভাবে ছেদিত অংশ। উহাতে পুরুষের যৌন-অঙ্গসমূহের পারস্পরিক অবস্থিতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইবে। স্ত্রী এবং পুরুষের আভ্যন্তরীণ যৌন-গঠনপ্রণালীর পার্থক্য কত, তাহা এই ছবির সহিত নারীর যৌন-অঙ্গের তুলনা করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

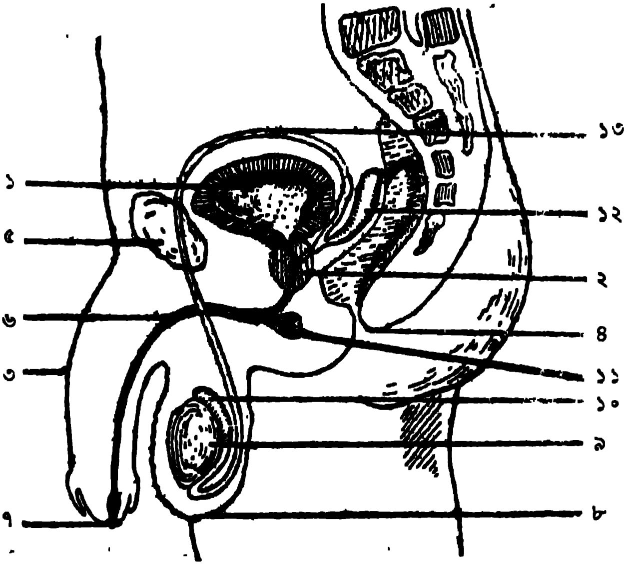

২২নং চিত্র

১। মূত্রাধার। ২। প্রষ্টেট গ্রন্থি। ৩। লিঙ্গ। ৪। গুহ্যদ্বার। ৫। অস্থি। ৬। মূত্রনালী। ৭। মূত্রনালীর মুখ। ৮। অণ্ডকোষের থলি। ৯। অণ্ডকোষ। ১০। এপিডিডাইমিস। ১১। কাউপার গ্রন্থি। ১২। শুক্রকোষ (২ দিকে দুইটি)। ১৩। শুক্রবাহী নল।

পুরুষের **লিঙ্গ** প্রস্রাব নির্গমের পথ হইলেও ইহা প্রধানত **সঙ্গমযন্ত্র**। সঙ্গমের উপযোগী করিয়াই প্রকৃতি ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে।

উহা গড়পড়তা স্বাভাবিক অবস্থায় দুই হইতে তিন ইঞ্চি লম্বা এবং এক হইতে সোয়া এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। তখন ইহা শিথিলভাবে ঝুলিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোনও অস্থি না থাকায় ইহা অতিশয় কোমল। ইহা প্রধানত শিরা, উপশিরা, তন্তু ও স্নায়ুর দ্বারা গঠিত। নিম্নে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, উহা আড়াআড়িভাবে ছেদিত লিঙ্গের ছবি।

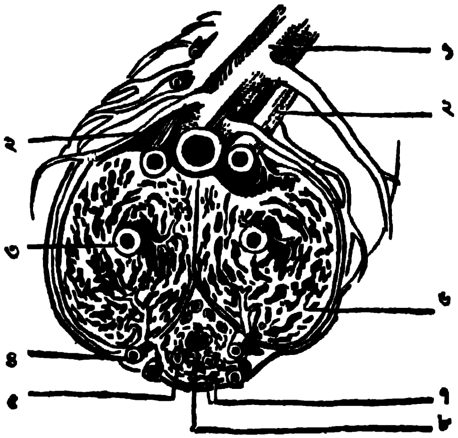

১। পৃষ্ঠাবলম্বী লিঙ্গশিরা
২। পৃষ্ঠাবলম্বী ধমনী ও স্নায়ু
৩। রক্তবাহী নলমধ্যস্থ শিরা
৪। ৫। মূত্রনালী, বেষ্টক শিরাসমূহ
৬। রক্তবাহী নলসমষ্টি
৭। মূত্রনালী বেষ্টক রক্তবাহী নলসমষ্টি
৮। মূত্রনালী

২৩নং চিত্র

উহাতে দেখা যাইবে যে, লিঙ্গের অভ্যন্তরভাগ তিনটি কুঠরিতে বিভক্ত। এই তিনটি কুঠরিই রক্তবাহী উপাদানসমূহের সমষ্টি মাত্র। উপরিভাগে স্পঞ্জের ন্যায় যে দুইটি যুক্তকুঠরি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহারা প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য রক্তবাহী নলিকার সমষ্টি মাত্র। উহারা সংকোচন-সম্প্রসারণশীল কতকগুলি স্নায়বিক ও পৈশিক তন্তু দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। উহাদের নিম্নে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি স্পঞ্জসদৃশ যে কুঠরিটি দৃষ্ট হইতেছে, উহাও রক্তনালীর সমষ্টি মাত্র। উহার মধ্যস্থলে যে ছিদ্রটি দেখা যাইতেছে তাহাই মূত্রনালী। **শুক্রও এই পথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়।**

উত্তেজনার সময় লিঙ্গের অসংখ্য রক্তবাহী নলিকাসমূহে শোণিত সঞ্চার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গের আয়তন ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। লিঙ্গমূলের পেশী লিঙ্গের এই উত্থান দৃঢ়তা সংরক্ষিত করে। উত্থানাবস্থায় লিঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ চার হইতে সাত ইঞ্চি এবং ব্যাস দেড় হইতে দুই ইঞ্চি হইয়া থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে (যথা নিগ্রোদের) এই অবস্থায় কাহারও নয় ইঞ্চি

হইতে বার ইঞ্চি পরিমাণ লিঙ্গের কথা ডাক্তারেরা বলিয়াছেন। ইহার আগাগোড়া আয়তন প্রায় সমান, তবে অগ্র ও পশ্চাদ্‌ভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত মোটা ও দৃঢ় হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় লিঙ্গের দৃশ্যমান অংশ দৈর্ঘ্যে গড়ে মাত্র তিন-চারি আঙুল হইলেও সমগ্রভাবে উহা অনেক বেশী লম্বা। উহা পশ্চাদ্দিকে ৪·৫ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়া গুহ্যদ্বারের দিকে গিয়া শেষ হইয়াছে।

লিঙ্গের অগ্রভাগকে **লিঙ্গাগ্র** কহে। ইহা শৈশবে ত্বক (Fore-skin) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ত্বক (অগ্রচ্ছদা) ক্রমে ঈষৎ উপরে উঠিয়া যায়। যখন লিঙ্গাগ্র স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণ বা অংশত আবৃত, এবং উত্তেজিত অবস্থায় সম্পূর্ণ বা অংশত উন্মুক্ত থাকে। লিঙ্গাগ্রভাগ অতিশয় অনুভূতিশীল কোমল তন্তুসমষ্টি দ্বারা গঠিত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ন্যায় কোমল ও মসৃণ ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত। ইহা ঈষৎ গোলাকার।

লিঙ্গাগ্রভাগের মস্তকের ছিদ্রটি মূত্র ও শুক্র নির্গমের পথ। লিঙ্গ মুণ্ডের এক ইঞ্চি পশ্চাতে ঈষৎ সরু হইয়া লিঙ্গাবরক ত্বকের সহিত মিশিয়া আবার মোটা হইয়াছে। এই সরু অংশের নাম **লিঙ্গগ্রীবা**। গ্রীবার অগ্রভাগে লিঙ্গের মুণ্ড সর্বাপেক্ষা অধিক পরিধিবিশিষ্ট এবং বর্তুলাকার। ইহাই লিঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনুভূতিশীল স্থান এবং উঁচু বলিয়া রতিক্রিয়ার সময়ে ইহার সহিতই যোনিগাত্রের বেশি ঘর্ষণ হওয়াতে গভীর সুখানুভূতি হয়।

লিঙ্গের দৈর্ঘ্য বা আয়তন পুরুষের রতিক্ষমতার নির্ভুল পরিচায়ক নহে। উহার সহিত সন্তানোৎপাদন ক্ষমতারও বিশেষ সম্বন্ধ নাই। লিঙ্গের মূলদেশের নিম্নে একটি চামড়ার থলি আছে (২২নং চিত্রের নং ৮)। এই থলির মধ্যে দুইটি ঈষৎ গোলাকার মাংসগ্রন্থি আছে। এই মাংসগ্রন্থিদ্বয়কে **অণ্ডকোষ** বলা হইয়া থাকে। অণ্ডকোষদ্বয়ের প্রত্যেকটি স্বভাবতঃ গড়পড়তা দেড় ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি প্রশস্ত ও আড়াই ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট। ইহা অপেক্ষা বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অণ্ডকোষ সাধারণতঃ সুস্থতার পরিচায়ক নহে। স্বাভাবিক অবস্থায় অণ্ডকোষদ্বয় থলির মধ্যে দুই আড়াই ইঞ্চি ঝুলিয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগিলে থলিটি সঙ্কুচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাম অণ্ডকোষটি দক্ষিণ অণ্ডকোষ হইতে বড় হয় এবং একটু বেশী ঝুলিয়া থাকে। ইহাতে ভীত হইবার কারণ নাই।

স্থূলদৃষ্টিতে এই অণ্ডকোষদ্বয় মানুষের শরীরের পক্ষে অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অণ্ডকোষদ্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অসামান্য।

অণ্ডকোষদ্বয় অসংখ্য রক্তবাহী শিরা ও নলিকা দ্বারা গঠিত। **এই সমস্ত নলিকায় শুক্রকীট জন্মগ্রহণ করে।** শুক্রকীট সৃষ্ট হইয়া শুক্রকীটবাহী নল বাহিয়া উপরিস্থিত দুইটি থলিতে চলিয়া আসে। এই থলিদ্বয়কে **শুক্রকোষ** বলে। ফলত অণ্ডকোষদ্বয়ই শুক্রোৎপাদনের উৎস। পুরুষের অণ্ডকোষদ্বয়কে নারীর ডিম্বকোষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই অণ্ডকোষদ্বয় স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে অথবা দেহমধ্য হইতে না নামিয়া আসিলে শুক্রের অল্পতা, সুতরাং সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার অল্পতা বা অভাব সূচিত হইবে।

অণ্ডকোষদ্বয়ে ইহা ছাড়া আব একবকম বিশেষ রস সৃষ্ট হয়। ইহাকে গ্রন্থিরস বা **হরমোন** বলে। এই রস সোজাসুজি রক্তে মিশিয়া শরীবেব পুষ্টিসাধন করে, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে, এবং শরীবে ও মনে পুরুষালি ভাব আনে। ইহা শুক্রেব সহিত, অথবা অপর কোনও ভাবে বাহির হয় না।

নাভির তলদেশে উরুদ্বয়ের সংযোগস্থলে যেখানে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ সংলগ্ন হইয়াছে, সেই স্থানকে **বস্তিপ্রদেশ** বলা হয়। যৌবনাগমে ঐ স্থানে লোম বাহির হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অণ্ডকোষে শুক্রকীট উৎপন্ন হইয়া ঊর্ধ্বদেশে উত্থিত হয় এবং **শুক্রকোষ** (২২নং চিত্র) নামক কোষদ্বয়ে আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই কোষদ্বয় মূত্রাধারের নিম্নে উহার গা ঘেঁষিয়া অবস্থিত। এই কোষদ্বয়ে শুক্র সঞ্চিত থাকা ব্যতীত এক প্রকার তরল রসও উৎপন্ন হয়। এই রস ঈষৎ পিচ্ছিল বলিয়া উহার সহিত শুক্র মিশ্রিত হইয়া শুক্রও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

মূত্রাধারের নিম্নে শুক্রকোষের সমান্তরালে মূত্রনালীর অপর পার্শ্বে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দেড় ইঞ্চি লম্বা আর একটি গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থির নাম মূত্রশায়ী গ্রন্থি বা **প্রষ্টেট গ্রন্থি** (২২নং চিত্র)। ইহার অবস্থিতি শুক্র নির্গমন রোধ করে বলিয়া শুক্রস্খলনে পুরুষ এতটা পুলকাবেগ অনুভব করে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থি হইতে একপ্রকার শ্বেত রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। ঐ রস মূত্রনালীকে পিচ্ছিল করিয়া দেয় বলিয়া শুক্র নির্গমনে সুবিধা হয় এবং শুক্রকীটও এই রসে উদ্দীপিত হয়। এই রসই শুক্রের বিশিষ্ট গন্ধের কারণ।

মূত্রনালীর নির্গম-পথের সম্মুখে বাদামের মত ক্ষুদ্রাকৃতি যে দুইটি গ্রন্থি

অবস্থিত, উহাদিগকে **কাউপার গ্রন্থি** (২২নং চিত্র) বলা হয়। এই গ্রন্থিদ্বয় হইতেও প্রষ্টেট রস ও শুক্রকোষ-নিস্রাবের ন্যায় এক প্রকার তরল স্রাব নির্গত হয়। ইহাও শুক্র নির্গমনের সুবিধার জন্যই হইয়া থাকে। কামোত্তেজনার সময় ইহার রস মূত্রনালী দিয়া নির্গত হয়। এই রস পাতলা, বর্ণ ও গন্ধহীন ও চট্‌চটে। ইহা পিচ্ছিল হওয়ায় সঙ্গমকে সহজ ও বেদনাহীন করে।

নারীর যৌন-অঙ্গসমূহ

স্ত্রীলোকের যৌন-ইন্দ্রিয়কে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: ভগ, যোনি, জরায়ু, ডিম্ববাহী নল ও ডিম্বকোষ। নিম্নে যে ছবি দেওয়া হইল, উহা নারীর যৌনপ্রধান দেহাংশের লম্ববান ছেদিত অংশ। এই ছবি হইতে নারী-দেহের যৌন-অঙ্গসমূহের আভ্যন্তরিক অবস্থিতির পারম্পরিকতা বুঝা যাইবে।

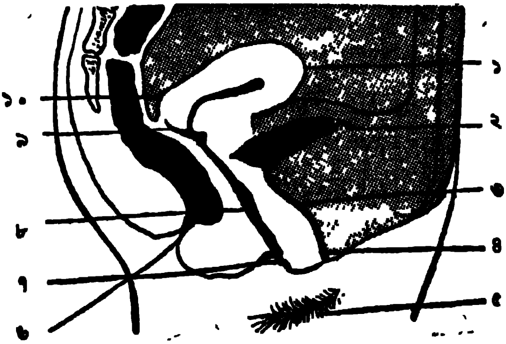

২৪নং চিত্র

১। জরায়ু ২। মূত্রাধার ৩। মূত্রনালী ৪। মূত্রনালীর মুখ ৫। বৃহদোষ্ঠ
৬। গুহ্যদ্বার ৭। যোনিমুখ ৮। যোনিপথ ৯। জরায়ুমুখ ১০। জরায়ুগ্রীবা।

উরুদ্বয় ও উদর যেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে সেই ত্রিকোণাকৃতি স্থান-টুকু **যোনিপ্রদেশ**। উহা উপর হইতে ক্রমশ সরু হইয়া নীচের দিকে **মলদ্বার** পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। উহার নাম **ভগ**। ভগের দুই দিকেই একটি করিয়া খাঁজ (কুঁচকি) দেখা যায়। উপরে যেখানে যোনিপ্রদেশ সবচেয়ে স্ফীত ও চওড়া তাহাকে **কামাদ্রি** বলে। এই স্থান জুড়িয়া কৈশোরে লোম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে কিছু চর্বি জমা থাকে বলিয়া উহাকে অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উঁচু দেখায়।

কামাদ্রির নীচেই ঠিক মাঝখান হইতে দুইধারে দুইটি চামড়ার ভাঁজ ঠোঁটের মত হইয়া নামিয়া আসিয়া মলদ্বারের দিকে গিয়াছে। ইহাদের নাম **বৃহদোষ্ঠ**। উপরের দিকে এই ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত থাকে, কিন্তু নীচের দিকে পাতলা হইয়া নামিয়া যায়। ইহাদের উপরেও কৈশোরে কেশোদগম হয়। কামাদ্রির ও বৃহদোষ্ঠের চামড়ার মধ্যে বহু তৈলনিঃসারক এবং ঘর্মনিঃসারক গ্রন্থি আছে। রস নিঃসরণের ফলে সাধারণতঃ অভ্যন্তরভাগে ভিজা থাকে। বৃহদোষ্ঠ স্ত্রীলোকের সমস্ত যোনিপথটি ঢাকিয়া রহিয়াছে। বৃহদোষ্ঠের জন্যই স্ত্রীলোক স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াইলে তাহার যোনিমুখ দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃহদোষ্ঠের ভিতরে পুনরায় দুইটি ক্ষুদ্র চামড়ার ঠোঁট দ্বারা যোনিমুখ আবৃত থাকে। এই দুইটি ঠোঁটকে **ক্ষুদ্রোষ্ঠ** বলা হয়। ক্ষুদ্রোষ্ঠের ভিতরেও বহুসংখ্যক তৈলনিঃসারক গ্রন্থি আছে।

ভগের ফাটলের প্রারম্ভেই ক্ষুদ্রোষ্ঠের সংযোগস্থলে যে মাংসাঙ্কুর আছে, উহাকে **ভগাঙ্কুর** বলা হয়। স্ত্রীলোকের ভগাঙ্কুরের গঠন ও প্রকৃতির সহিত পুরুষের লিঙ্গের অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তবে স্নায়ুর আধিক্যহেতু ইহার শীর্ষদেশ পুরুষের শিশ্নাগ্রের অপেক্ষা অনেক বেশী স্পর্শানুভবী ও উত্তেজনাশীল। নিগ্রো স্ত্রীলোকের ভগাঙ্কুর অপেক্ষাকৃত বড় হয় বলিয়া প্রকাশ।

মূত্রনালীর মুখ ভগাঙ্কুরের নীচে এবং যোনিপথের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই পথটি মূত্রাধার হইতে নামিয়া আসিয়াছে। (২৪নং চিত্রে দেখুন)।

মূত্রনালীর মুখের একটু নীচেই এবং অল্প পিছনে **যোনিমুখ** অবস্থিত। অনেক লোকেই **ভুল বুঝিয়া মনে করে যে, পুরুষের মত স্ত্রীলোকের মূত্রনালী ও যোনিপথ এক**। ইহা ঠিক নহে। মূত্রনালী ও যোনিপথ ভিন্ন।

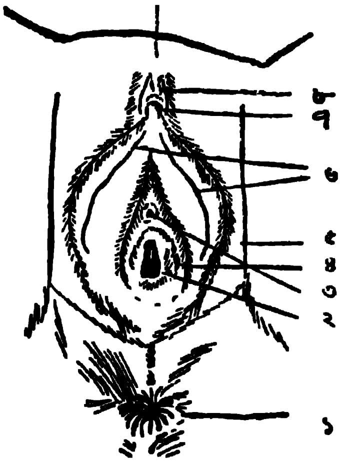

২৫নং চিত্র

১। মলদ্বার ২। যোনিমুখ। ৩। মূত্রনালীমুখ ৪। সতীচ্ছদ ৫। বৃহদোষ্ঠ ৬। ক্ষুদ্রোষ্ঠ ৭। ভগাঙ্কুর ৮। ভগাঙ্কুরের অগ্রচ্ছদা ৯। রতিশৈল।

ওষ্ঠদ্বয় ফাঁক করিলে স্ত্রীলোকের **যোনিমুখ** দৃষ্ট হয়। যোনিমুখ হইতে জরায়ুমুখ পর্যন্ত ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট যে একটি নল আছে এই নলটিকেই **যোনিপথ** বলা হইয়া থাকে। এই নলটি সংকোচন-প্রসারণশীল পেশীসমূহ দ্বারা এমনভাবে গঠিত যে, ইহাকে চাপ দিয়া অনেকখানি বড় করা যাইতে পারে। সন্তান প্রসবের সময় ইহা পরিধিতে প্রায় ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত হইতে পারে। যোনিপথ জরায়ুতে গিয়া শেষ হইয়াছে। **যোনিপথেই পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুতে গমন করে এবং সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।**

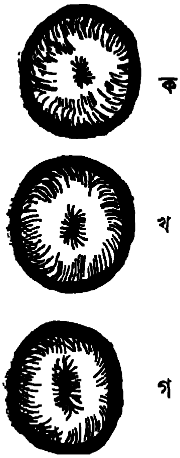

২৬নং চিত্র
(ক) নির্গর্ভা (খ) এক-গর্ভা (গ) বহুগর্ভা নারীর জরায়ুমুখ।

জরায়ু বস্তিকোটরে ঝুলায়মান একটি থলে। ইহার আকার অনেকটা পেঁপের মত। ইহার গলা সরু এবং পেট মোটা। ইহার মুখ নিম্নদিকে যোনিপথের সহিত মিশিয়াছে। ইহা প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া। ইহা এমন সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীল তন্তুদ্বারা গঠিত যে, গর্ভাবস্থায় ইহা স্বাভাবিক অবস্থার ছয় হইতে আট গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (২১ নং চিত্র)। কিন্তু প্রসবের পরে প্রায় ৪০ দিনের মধ্যে ইহার আবার স্বাভাবিক আকারপ্রাপ্ত হয়; তবে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রসবের পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। জরায়ুর ভিতরভাগের গাত্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত।

জরায়ুর উভয় পার্শ্বে ঈষৎ উচ্চে দুইটি গ্রন্থি আছে। ইহাদের আকার দুইটি বৃহৎ বাদামের মত, দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চির বেশী হইবে না। ইহাদিগকে **ডিম্বকোষ** বলা হয়। এই ডিম্বকোষদ্বয়ের অনতিদূরে দুইটি নল দুইদিক হইতে জরায়ুতে মিলিত হইয়াছে। ডিম্বকোষের নিকট ইহাদের মুখ প্রস্ফুটিত ফুলের মুখের মত শাখাবিশিষ্ট এবং ইহারা দৈর্ঘ্যে চারি ইঞ্চির অধিক হইবে না। ইহাদিগকে **ডিম্ববাহী নল** বা ফ্যালোপিয়ান টিউব বলা হয়।

যোনিমুখের সামান্য পশ্চাতে একটি পাতলা ঝিল্লী দ্বারা যোনিমুখ অনেকটা আবৃত থাকে। প্রধানত প্রথম সঙ্গমের দ্বারা, কিংবা কদাচিৎ অন্য কোনও কারণে ইহা ছিঁড়িয়া যায়। ইহাকে **সতীচ্ছদ** বলা হয়। ইহার নাম সতীচ্ছদ দিবার কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্ব্বকালে এই পর্দাকে সতীত্বের নিদর্শন মনে করা হইত। এই পর্দা দ্বারা যোনিমুখ অনেকটা আবৃত থাকে, তবে রক্তস্রাব বাহির

হইবার জন্য বিভিন্ন আকারের ও মাপের একটি (কদাচিৎ একাধিক) ছিদ্র থাকে।* এই আবরণ ছিন্ন না করিয়া পুরুষের লিঙ্গ কিছুতেই নারীর যোনির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং কোনও নারীর সতীচ্ছদ ছেঁড়া থাকিলে সে পুরুষের সহিত সঙ্গম করিয়াছে, এমন মনে করা একেবারে অন্যায় নহে। তবে কথা এই যে, পুরুষের লিঙ্গ প্রবেশ ব্যতীত অন্য কারণেও সতীচ্ছদ ছিন্ন হইতে পারে এবং কদাচিৎ হইয়াও থাকে। যাহাদের সতীচ্ছদ খুব পাতলা, মাতার বা নিজের অঙ্গুলি দ্বারা পরিষ্কার করাব বা চুলকাইবার উৎসাহে তাহাদের পর্দা ছিঁড়িয়া যায়। খেলাধূলা বা লাফালাফিব ফলে ইহা ছিন্ন হয় না। শৈশবে অজ্ঞাতসারে (কৃমি প্রবেশ প্রভৃতি কারণে) যোনি চুলকাইতে চুলকাইতে বালিকাদের সতীচ্ছদ ছিন্ন হইতে পাবে। **সতীচ্ছদের অবিদ্যমানতা নারীর অসতীত্বের সুস্পষ্ট লক্ষণ ধরিয়া লওয়া নিতান্ত অসঙ্গত।** আবার কোনও কোনও নারীব সতীচ্ছদ এত পুরু ও শক্ত যে পুরুষ সহবাসেও তাহা কিছুতেই ছিন্ন হয না; সকলক্ষেত্রে পূর্ণ সঙ্গম কবাও সম্ভব হয় না। সেজন্য অস্ত্রপ্রয়োগেব দ্বারা তাহাদেব সতীচ্ছদ ছিন্ন করিয়া স্বামী সহবাসের সুবিধা করিয়া লইতে হয। সুতবাং সতীচ্ছদ অছিন্ন থাকা (অক্ষত যোনি) সতীত্বের অকাট্য প্রমাণ নয।

রতিক্রিয়ার সহিত স্ত্রীলোকেব স্তন প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে, স্ত্রীলোকের স্তনকে যৌন-অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যৌবনাগমের পূর্বে স্ত্রীলোকের ও পুরুষের স্তনেব মধ্যে আকারগত কোন পার্থক্য থাকে না। যৌবনাগমে স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় অর্ধ-বর্তুলাকার, দৃঢ অথচ কোমলস্পর্শ দুইটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। গর্ভাবস্থায় এই স্তন সর্বাপেক্ষা উন্নত ও বৃহৎ হয়। এই সময়ে স্তনে দুগ্ধ জন্মে এবং বোঁটার চারিপার্শ্বে বৃত্তাকারে কাল দাগ পড়ে। সাধারণতঃ সন্তানের জননী হইবার পর দুগ্ধের ভারে এবং স্তনের স্নায়ুসমূহ দুর্বল হইয়া স্তন শিথিল হইয়া হেলিয়া পডে। স্তনদ্বয় বক্ষের উভয় পার্শ্বের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ৬ষ্ঠ ও পঞ্জরাস্থি আবৃত করিয়া উত্থিত হইয়া থাকে। ইহাদের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ নিঃসারক গ্রন্থি বিদ্যমান থাকে। স্তনদ্বয়

*কাহারও আবার সতীচ্ছদে কোন ছিদ্র থাকে না (Imperforate hymen)। সেক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের রক্ত বাহিরে আসিতে পারে না। ডাক্তারের সাহায্যে উহার অস্ত্রোপচার করাইয়া লইতে হয়।

(বিশেষ করিয়া উহাদের বোঁটা) খুব অনুভূতিশীল বলিয়া পুরুষের স্পর্শন, মর্দন-চোষণে নারীর সুখানুভূতি এবং যৌনলালসা উদ্দীপিত হয়।

ডিম্বস্ফোটন ও ঋতুস্রাব

খুব অল্প কিছুদিন আগেও ডিম্বস্ফোটন প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের কিছুই জানা ছিল না কিন্তু ঋতুস্রাব সম্বন্ধে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মানুষ নানা বিধিনিষেধের জাল বুনিয়াছিল। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীলোককে অপবিত্র বিবেচনা করা হইয়াছে। **জোরোস্ট্রীয়ানদের** (ভারতের পার্শিদের) ধর্মশাস্ত্র অনুসারে ঋতুমতী নারী যে শুধু অপবিত্রা তাহা নহে, পরন্তু সে ভূতের প্রভাবাধীন। **হিন্দুশাস্ত্রমতে** ঋতুস্রাবকালে পুরুষ যাহাতে স্ত্রীলোকের সাথে একই শয্যা গ্রহণ না করে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। কোরানে ঋতুস্রাবকে পীড়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই সময়ে স্ত্রী-সহবাসকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

ঋতুস্রাব সম্বন্ধে বিচিত্র প্রথা

পশ্চিম আফ্রিকার আসিনি (Assini) প্রদেশে রজঃস্বলা রমণীকে নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইতে দেওয়া হয় না। আরব দেশের রমণীরা ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়া মাত্র সর্ববিধ ধর্ম-কর্ম হইতে বিরত থাকে। কোনও এক আদিম **অষ্ট্রেলিয়াবাসী** তাহার কম্বল স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া তদীয় ঋতুমতী স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল। **এশিয়া ও ইউরোপের অনেক স্থানে** রমণীরা ইহা আরম্ভ হইলে যে বস্ত্রখণ্ডে রক্ত শোষণ করিয়া লয় তাহা স্রাবকালে আর পরিবর্তন করে না। তাহারা মনে করে যে নূতন বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করিলে স্রাব নূতনভাবে দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হইতে পারে। **ভারতীয়** রমণীরা কেহ কেহ এই সময়ে পুষ্প সম্ভবা চারা গাছের নিকট গমন করে না। কারণ তাহা হইলে উক্ত গাছ শুকাইয়া মরিয়া যাইতে পারে। তাহারা ফলের বাগানে কিংবা শস্যপূর্ণ মাঠে গমন করে না, যদি করে তাহা হইলে নাকি ফলমূল এবং শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। প্রাচীনকালে **জার্মানীতে** এই ধারণা ও নিষেধ ছিল। **রেড্ ইণ্ডিয়ানরা** ঋতুমতী নারীকে পুরুষের ব্যবহৃত কোনও বিছানা-পত্র বা কাপড়-চোপড় ব্যবহার করিতে, কিংবা রান্না করিতে কিংবা বাহিরের কোন পুরুষের মুখ দেখিতে দেয় না। এই ধরনের

কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিধিনিষেধ পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই বিভিন্ন যুগে স্থান পাইয়াছে।

বর্তমানে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ডিম্বকোষের কার্য-কলাপের দরুনই এই ঋতুস্রাব সংঘটিত হয়। ঋতুস্রাবের মুখ্য উপাদান-গুলি জরায়ু হইতে আসে। প্রতিমাসে ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব নির্গমের সময়ে জরায়ু গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত হয়। প্রাণবন্ত ডিম্বকে জায়গা দিয়া উহার বৃদ্ধির সাহায্য করিতে জরায়ুর ভিতরে যে উদ্যোগ ও আযোজন হয় তাহাতে জরায়ুর ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বেশ পুরু হইয়া উঠে ও ইহাব ভিতরকাব গ্রন্থিগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তাব করে। ডিম্বকোষে প্রস্তুত এক প্রকার হরমোনেব প্রভাবেই এরকম হয়। গর্ভোৎপাদন না হইলে অর্থাৎ নারীব ডিম্বের সহিত পুরুষের শুক্রকীটেব সংস্পর্শ না ঘটিলে ঐ ঝিল্লীব অধিকাংশ রক্তস্রাবেব সহিত নির্গত হইয়া যায়। এবং উহার স্থলে অবশিষ্ট ঝিল্লী হইতে নূতন ঝিল্লী গঠিত হয়। প্রতিমাসে এইরূপে গর্ভ গ্রহণেব জন্য জরায়ু প্রস্তুত হয় এবং গর্ভাধান না হইলে ঋতুস্রাবও মাসে মাসে হয়। ঋতুস্রাব (ইংরেজী Menstruation) শব্দটিব উৎপত্তি ল্যাটিন মেনসিস অর্থাৎ মাস হইতে। মাসে মাসে ইহা ঘটে বলিয়া বিভিন্ন ভাষায় ইহাকে 'মাসিক' বলা হইয়া থাকে।

ডিম্ব পরিপক্ক হইয়া ডিম্বকোষ হইতে নির্গত হইয়া আসাকে ডিম্বস্ফোটন বা (ওভিউলেশন) বলে। এই ডিম্বস্ফোটন ও ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় কৈশোরে এবং ৪০-৫০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রথমে কয়েক মাস অনিয়মিত স্রাব হইয়া পরে চিরকালের মত ঋতু বন্ধ (ঋতু সংহার) হয়। ইহার প্রায় এক বৎসর পবে নারীর সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার অবসান হয়।

পূর্বকালের বিশ্বাস ছিল যে, ডিম্বস্ফোটন ও স্রাব একই সময়ে হইয়া থাকে কিন্তু অধুনা ইহা সুনিশ্চিতভাবেই জানা গিয়াছে যে রক্তস্রাব ডিম্ব-স্ফোটনের অনুবর্তী। দুই ঋতুর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে (পরবর্তী স্রাব আরম্ভ হইবার ১৪ দিন পূর্বে) ডিম্বস্ফোটন হয়। সাধারণ সুস্থ নারীর (শতকরা ৮০ হইতে ৯০ জন) 'মাসিক স্রাব' নিয়মিতভাবে ঋতুমতী হইলে ২৬ হইতে ৩২ দিনের মধ্যে দেখা যায়। প্রতি মাসে কোন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হওয়া অতীব বিরল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ২০-২১ দিন অন্তর ঋতুস্রাব হয়। কদাচিৎ ৪১ দিনেরও ব্যবধান দেখা যায়। ইহার

স্বাভাবিক নিয়মই অনিয়মিত হওয়া। এই ঋতুস্রাব সাধারণতঃ ৩ হইতে ৫ দিন স্থায়ী হয়। এবং ৫ দিনের বেশী হইলে রোগ জ্ঞান করিয়া তাহার চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

সংস্কারমুক্ত মন লইয়া বিচার করিলে বুঝা যায়, ঋতুস্রাবকে ঘৃণার চক্ষে দেখার কোন যুক্তি নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। ঋতুস্রাবের দরুন উদ্বেগের কিছু নাই। বরং যদি ঋতুস্রাব না হয় কিংবা অনিয়মিত হয় তখনই কেবল উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ থাকে। অনেকে মনে করেন যে, এই স্রাবে বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এই ধারণা ভুল।

ঋতুস্রাবে গোলযোগ ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে তথ্যাদি ৩০ অধ্যায়ে এবং পালনযোগ্য বিধিনিষেধ ২৮ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

যৌবন লক্ষণগুলি প্রকাশের বয়স

কিন্‌যে প্রভৃতির গবেষণায় নিম্নলিখিত বয়সগুলিতে শতকরা কতজনের স্তন, বস্তিলোম ও ঋতুস্রাব দেখা গিয়াছে তাহার হিসাব—ইহা আমেরিকার মেয়েদের মধ্যকার হিসাব। আমাদের দেশে একটু সকাল সকালই এই সকল প্রকাশ পায়।

বয়স	শতকরা কত জনের দেখা গিয়াছে		
	বস্তিলোম	স্তন	ঋতু
৮— ৯	—	—	
৯—১০	৩	৩	১
১০—১১	১৬	১৪	৪
১১—১২	৪০	৩৭	২১
১২—১৩	৭২	৬৭	৫০
১৩—১৪	৯১	৮৭	৭৯
১৪—১৫	৯৮	৯৫	৯২
১৫—১৬	১০০	৯৮	৯৭
১৬—১৭	,,	৯৯	৯৯
১৭—১৮	,,	১০০	১০০
১৮—১৯	,,	,,	,,

গড়পড়তা বস্তিলোম প্রথম প্রকাশের বয়স ১২.৩, স্তনের ১২.৪ ও ঋতুস্রাবের ১৩ বৎসর। গড়পড়তা বস্তিলোম ও স্তন প্রকাশের প্রায় সাড়ে ৮ মাস পরে আদ্য ঋতু আরম্ভ হয়।

বিভিন্ন প্রকার প্রজনন

প্রজননে যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোচনার পরে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং কোন্ কোন্ দিক হইতে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মিল ও গরমিল রহিয়াছে। সংক্ষেপে এ বিষয়ে কয়েকটি সাধারণ কথা বলা যাইতেছে।

প্রজনন জীবনের একটি মৌলিক গুণ। প্রজনন থামিয়া গেলে জীবনের পরিসমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই প্রজননের প্রক্রিয়া একই রকমের নহে। ইহা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

১। প্রজননের সর্বাপেক্ষা সরল প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয় এমিবা ও ব্যাক্‌টিরিয়া জাতীয় জীবনের আদিম আকৃতির মধ্যে। যখনই এমিবা একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে তখনই ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। প্রতি অংশই আবার পূর্ণতা পায় ও আবার দুইভাগে বিভক্ত হয়। এই রকম ভাবে এক রকম পোকা (Flat worm) কতগুলি অংশে বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রতিটি অংশই পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। এই রকমের প্রজনন প্রতিক্রিয়াকেই **অযৌন-প্রজনন** (Asexual Reproduction) আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সর্বাপেক্ষা নিম্নতম শ্রেণীর জীব এই পদ্ধতিতেই জন্মায়। ইহারা এই ভাবেই বংশ বিস্তার করিয়া আসিতেছে। (৫নং চিত্র দেখুন)

২। উপরোক্ত জীবের মধ্যেও দেখা যায়, দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বংশ বিস্তারের ব্যাপার চলিতে চলিতে যেন শ্রান্তির কোনও কারণ আসিয়া পড়ে। তখন দুইটি ভিন্ন জীব একত্রে মিশিয়া বা মিলিয়া আবার ভিন্ন হইয়া যায়। এরূপ সংযোজনের দ্বারা ইহারা যেন পরস্পরের মধ্যে কতক পদার্থ বিনিময় করতঃ পুনর্বার উদ্দীপ্ত বোধ করে। ঐ দুইটি পূর্বের মতই দেহ বিভাগ প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করে। এই ভাবেই বোধ হয় জীব-জগতে যৌন-মিলনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

৩। পরবর্তী ধাপে দেখা যায় দেহের নির্দিষ্ট কতগুলি কোষ প্রজননের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতেছে। স্বতন্ত্র অঙ্কুর, কোষ, শুক্র এবং ডিম্ব গঠিত হইয়া দুইটির মিলনে একটি নূতন জীবের উৎপত্তি হইতেছে। এইরূপে জীব কোষের মধ্যে শ্রম-বিভাগ (Division of Labour) দৃষ্ট হয়।

উভলিঙ্গ ও মধ্যলিঙ্গ

(Hermaphroditism and Inter-sex)

উভলিঙ্গ জীবের দৃষ্টান্ত শামুক ও কেঁচোর মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা এমন এক অবস্থা যাহাতে একই প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যৌন-অঙ্গ ও গ্রন্থিসমূহ দৃষ্ট হয় এবং সে স্ত্রীলোক না পুরুষ বলা দুষ্কর হয়। মানুষের মধ্যেও যে একই ব্যক্তি স্ত্রীলোক ও পুরুষের মতই যৌন-কার্য সমাধা করিতে পারে চিকিৎসা-শাস্ত্রে তার সামান্য কয়েকটা দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

প্রকৃত উভলিঙ্গ প্রাণীর শরীরের মধ্যে পুরুষ ও নারীর যৌন-গ্রন্থি (sexgland) দুইটিই (অর্থাৎ অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ) দৃষ্ট হয়। এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তবে এরূপ হয় যে, একই ব্যক্তি অণ্ডকোষ অথবা ডিম্বকোষের অধিকারী হয় (উভয়ের নহে), কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের নানা লক্ষণ ও প্রভাব তাহার মধ্যে দেখা যায়। এইরূপ স্থলে মূলতঃ (প্রকৃত) পুরুষকে স্ত্রীলোকের মত দেখায় এবং সে স্ত্রীলোকের মত ব্যবহার করে, আর স্ত্রীলোককে পুরুষের মত দেখায় এবং সে পুরুষের মত ব্যবহার করিয়া থাকে।

এই রকমের ঘটনাকে আন্তঃলিঙ্গ (Intermediate sex) ব্যাপার বলিয়াও অভিহিত করা হয় এবং সময় সময় সাময়িক পত্র-পত্রিকায় এরূপ ধরনের ঘটনার উল্লেখে চাঞ্চল্যের সৃষ্টিও হয়। ডাক্তার জেমস্ পারসন্স্ (James Persons) এ রকমের দৃষ্টান্ত তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। কোনও কোনও প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যৌন-মিলনের মারফত বা গৌণভাবে শুক্র প্রেরণের ফলে জীবনের সৃষ্টি হয়। ব্যাঙের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষ-ব্যাঙ দৃঢভাবে নারী-ব্যাঙের পৃষ্ঠে বসিয়া উহাকে সামনের পদদ্বয় দ্বারা আঁটিয়া ধরিয়াছে। এইভাবে চার থেকে দশ দিন পর্যন্ত চলিতে থাকে। অতঃপর নারী-ব্যাঙ ডিম্ব ছাড়ে এবং পুরুষ-ব্যাঙ শুক্র পরিত্যাগ করে। এক্ষেত্রে পুরুষ-ব্যাঙের যৌনাঙ্গ নারী ব্যাঙের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করানো হয় না। কেবলমাত্র একে অপরকে স্পর্শের দ্বারা উত্তেজিত করে, ফলে উভয়ের যৌন-ক্রিয়া সমাধা হয়; প্রজননের কাজও চলে। এক রকমের শুক্তি দেখা যায় যাহাদের পুরুষ-শুক্তির শুক্রবীজাণু জলে ছাড়ার পরে যখন কোন নারী শুক্তির সান্নিধ্যে আসে তখনই উহার যোনি পথে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়।

৫। মাছের মধ্যে মৈথুন ক্রিয়া ব্যতিরেকে বংশ বিস্তার হয়। স্ত্রী-মৎস্য

জলের উপরে ডিম্ব ছাড়ে। ডিম্বের গন্ধ বা দৃষ্টি পুং-মৎস্যকে আকৃষ্ট করে। তখন উহা শুক্র পরিত্যাগ করিয়া ভাসমান ডিম্বকে প্রাণবন্ত করিয়া দেয়। দুই মৎস্যের দৈহিক মিলনের কোনও প্রয়োজন হয় না।

৬। আর এক ধাপ উপরে আসিয়া দেখা যায় স্ত্রী ও পুরুষ লিঙ্গের প্রকৃত মৈথুন ছাড়াও কেবলমাত্র উহাদের সংস্পর্শের দ্বারা শুক্রকে যথাস্থানে স্থাপন করার মধ্য দিয়া গর্ভোৎপাদন করা হয়। পাখীর মধ্যে ইহা সচরাচর হয়। পুং ও স্ত্রী পাখী পরস্পরের যৌন-নলকে সান্নিধ্যে রাখিলেই শুক্র বাহির হইয়া স্ত্রীপক্ষীর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

৭। মাকড়সা জাতীয় কীটাদি নিঃসরণ যন্ত্রকে মৈথুন-যন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সংজনন ক্রিয়া চালাইয়া যায়।

৮। শাবকবাহী জন্তু ও বৃশ্চিক যৌন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে কাঁটার মত জননেন্দ্রিয়ের সাহায্যে।

৯। সর্বশেষে আমরা দেখিতে পাই জননেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মৈথুন ক্রিয়া। স্তন্যপায়ী জীবেরা, যেমন মানুষ ও অপরাপর কয়েক শ্রেণীর প্রাণীরা মৈথুন-যন্ত্রের সাহায্যে শুক্র প্রেরণের দ্বারা গর্ভসঞ্চার করিয়া থাকে।

উন্নত ধরনের জীবের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের দেহাভ্যন্তরে ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলন সংঘটিত হয়। ইহার জন্য দৈহিক মিলনের প্রয়োজন। এইরূপ মিলনের সময় পুরুষের শুক্র স্ত্রীলোকের যৌন-অঙ্গে স্থাপন করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে শুক্রস্থাপন কার্য (Insemination) বলা হয়। ভেড়া, হরিণ জাতীয় যে সকল প্রাণীর মৈথুন অঙ্গের সাথে শুক্রকে সরাসরি ঠিক জরায়ু গর্ভে প্রেরণের জন্য এক রকমের সূতার মত সাদা উপাঙ্গ থাকে সেই সকল ক্ষেত্রে শুক্র সরাসরি জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভোৎপাদন করে। কিন্তু অপরাপর ক্ষেত্রে যেমন মানুষের বেলায়, শুক্র যোনিপথের শেষ প্রান্তে জমা হয়। সেখান হইতে উহা ক্রমে ক্রমে জরায়ু ও ফ্যালোপিয়ান টিউবে উপস্থিত হয়। সমস্ত শুক্রকীট বাহিয়া উপরে উঠিতে পারে না। অসংখ্য শুক্রকীট যোনিপথের এসিড নিঃসরণের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায়।

এইভাবে শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলনের ফলে যে প্রজনন ক্রিয়া চলে তাহার বিশেষত্ব হইল যে দুইটি ভিন্ন জীবের দোষ ও গুণের সমন্বয়ে বংশধরেরা খানিকটা ভিন্ন আকার ও প্রকৃতির হয়। উন্নতি ও অবনতি বিবর্তনেরই ধারা।

মানুষ বুদ্ধিবলে গৃহপালিত পশু ও পক্ষীর মধ্যে উন্নত ধরনের জীবের কর্ষণ

করিতে পারে। জীববিজ্ঞান মানুষকে এতদূর ক্ষমতা দিয়াছে। মানুষের মধ্যেও উৎকর্ষ সাধনের পদ্ধতি ইউজেনিক মতবাদে রহিয়াছে।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহ

জীবদেহের বিপাকীয় প্রক্রিয়া-ঘটিত পরিবর্তন এবং বৃদ্ধির কার্যে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি **অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি** আছে। ইহাদের ভিতর হইতে যে রস নির্গত হয় তাহার ফলে বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটে। এই সকল গ্রন্থির শিরার মধ্য দিয়া যখন রক্ত চলাচল করে, তখন উক্ত রস কোনও নালীর মধ্য দিয়া না নামিয়া সোজাসুজি রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। এই সব গ্রন্থির নালী নাই। তাই ইহাদিগকে নির্ণালী গ্রন্থি (Ductless Glands) বলে।

থাইরয়েড (Thyroid), প্যারাথাইরয়েড (Parathyroid), এ্যাড্রিন্যাল (Adrenal), পিটুইটারী (Pituitary) অণ্ডকোষদ্বয় (Testes), ডিম্বকোষদ্বয় (Ovaries) প্রধান অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। ১৭ নং চিত্রে নারীদের এইরূপ প্রধান কয়েকটি গ্রন্থি দেখানো হইয়াছে। পুরুষের মধ্যেও শেষোক্ত দুইটি ব্যতীত অপরগুলি আছে।

২৭নং চিত্র

১। পিনিয়াল (Pineal)
২। পিটুইটারী
৩-৪। থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড
৫; থাইমাস (Thymus)
৬। অগ্ন্যাশয় বা প্যান্ক্রিয়াস (Pancreas)
৭। এ্যাড্রিন্যাল বা সুপ্রারেন্যাল (Suprarenal)
৮। ডিম্বকোষ বা ডিম্বাশয়
৯। প্ল্যাসেণ্টা (Placenta)

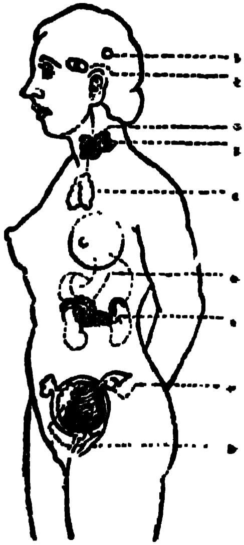

এই সকল নির্ণালী গ্রন্থি হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহাকে বলা হয় **হরমোন** (Hormone)। হরমোন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশেষকে উত্তেজিত এবং উদ্দীপিত করিয়া তাহাদের যথাযথভাবে কর্মক্ষম করে।

চিত্রে সকলের উপরে দেখানো পিনিয়েল গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত পিটুইটারীর উপরে পিছনে অবস্থিত। ইহার কাজ এ্যাড্রিন্যালের বিপরীত। ইহা যৌন অঙ্গসমূহের অকালের পরিপক্কতা নিবারণ করে। ওজনে ইহা এক আউন্সের দু'শ তিরিশ ভাগের এক ভাগ।

পিটুইটারী গ্রন্থি—মূত্র প্রবাহ এবং যৌনবোধ নিয়ন্ত্রিত করে। ইহা ওজনে এক আউন্সের ৬০ ভাগ। মানব দেহের উপর এই গ্রন্থির আশ্চর্য প্রভাব। **ইহার কার্য অল্প মাত্রায় হইলে** মানুষ খর্বকায় হয় এবং যৌনবোধ পুরা মাত্রায় জাগ্রত হয় না। আবার কিশোর অবস্থায় অতি মাত্রায় ইহার কার্য চলিলে মানুষ অতি দীর্ঘাকার হইয়া পড়ে। ইহা হইতে খুব অল্প মাত্রায় রস নির্গত হইলে মানুষ নিদ্রাকাতর হয়। এই সব নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত এই গ্রন্থির প্রভাব সাধারণভাবে অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির উপরও রহিয়াছে। এজন্য ইহাকে 'Master Gland' বা Conductor of the Endocrine Orchestra' বলা হয়।

পিটুইটারী গ্রন্থির প্রভাবে নারীদেহে প্রথম যৌবনের সূচনা লক্ষিত হয় এবং নারীত্বের অন্যান্য চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে তখন এই পিটুইটারীর প্রভাবেই উহা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে জরায়ুর সঙ্কোচন এবং প্রসারণ আরম্ভ হয় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। **পিটুইটারীর কার্যকারিতা** নানা কারণে **হ্রাস পাইয়া গেলে** মানবদেহ ও মনের অত্যন্ত ক্ষতি সাধিত হয়। পুরুষের দাড়ি ভালভাবে গজায় না, পুরুষ দেখিতে অনেকটা মেয়েলী ধরনের হয়, বুদ্ধি শক্তির বিকাশও তেমন হয় না। এই পিটুইটারী স্ত্রী ও পুরুষের সমস্ত যৌনযন্ত্রসমূহের গতি-সঞ্চালন ও কার্য তৎপরকারক।

থাইরয়েড গ্রন্থি ওজনে প্রায় ২ আউন্সের মত। থাইরক্সিন নামক হরমোন নিঃসরণ করে এবং দেহমধ্যে নানা সজীব উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। কৃত্রিম উপায়ে থাইরক্সিন তৈরি করা চলে। প্যারা-থাইরয়েড থাইরয়েডেরই অতি সান্নিধ্যে। ইহারা কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থির সমষ্টি। ইহারা প্যারাথরমোন (Parathormone) নামক হরমোন উৎপাদন করে ও রক্তের মধ্যের ক্যালসিয়াম বা চুনের নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার একটু নীচে থাইমাস (Thymus) গ্রন্থি। ইহাকে "শৈশবকালীন গ্রন্থি" বলা হয়। কারণ পরবর্তী জীবনে ইহা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ছবিতে পরবর্তী প্যান্‌ক্রিয়াস গ্রন্থি অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী দুই গ্রন্থিরই কাজ করে। ইনসুলিন (Insulin) নামক হরমোন, যাহা ইদানীং সফলতার সহিত বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা এই প্যান্‌ক্রিয়াসে নিহিত কতকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবকোষের দ্বারা সৃষ্ট।

এ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থি মূত্রাশয়েব উপরে অবস্থিত। ইহা হইতে এ্যাড্রিন্যলিন নামক হরমোন নিঃসৃত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে উদ্দীপ্ত করে। উহাকে 'উচ্ছ্বাস গ্রন্থিও' বলা হয়। কারণ সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ভাবোচ্ছ্বাস ও যৌন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যখনই আমাদেব শারীবিক ভারসাম্য ভয়, ক্রোধ ও বেদনাব প্রভাবে পর্যুদস্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে আমাদের রক্তে ইহা বেশী পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। নারী-দেহ অভ্যন্তরে নারীত্বেব প্রধান চিহ্ন তাহার ডিম্বকোষ। ইষ্ট্রিন (Oestrin or Estrin) বা এষ্ট্রোজেন (Estrogoen) নামক ইহার হবমোনেব কার্যক্ষমতার দরুনই নাবীদেহে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া উঠে। যৌবনের ভরা জোয়ার নারীর দেহমনকে আলোড়িত এবং সচকিত কবিয়া তোলে। অস্ত্রোপচার দ্বারা ডিম্বকোষ বাদ দিযা দেখা গিযাছে তাহাব ফলে পেটের মাংসপেশীসমূহ ও ভগ শুকাইযা যায়, কখনও কখনও মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং নারী গর্ভধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, মোটা ও কতকটা পুরুষালী হইয়া পড়ে।

ডিম্বকোষেব প্রধান কাজ হইল ইহার মধ্যস্থ অসংখ্য ডিম্বাণুদের মধ্যে প্রায় প্রতি মাসে একটিকে বিকশিত করিয়া তোলা। ইহা ছাড়া, ইহার অন্তর্গত ডিম্বাণুগুলির প্রত্যেকটি যে থাপের (তাহাদের আবিষ্কারক গ্রাফের নামধারী গ্রাফিয়ান ফলিক্ল—Graffian follicle-এর) মধ্যে থাকে সেই ফলিক্ল ইষ্ট্রিন (oestrin) নামক হরমোহন ক্ষরিত করে। তাই ইহাকে **ফলিকিউল্যর** হরমোনও বলে। ইহা হইতে এষ্ট্রোজন (Eastrogen) নামক স্ত্রী হরমোহন প্রস্তুত হয়। ইহা জননেন্দ্রিয় ও লিঙ্গ-নির্দেশক গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। নাবালক প্রাণীর ডিম্বকোষ তাহার উদর কাটিয়া বাহির করিয়া দিলে জননেন্দ্রিয়গুলি সচরাচর বিকাশ লাভ করে না, স্তনগুলি ছোট থাকিয়া যায় এবং চেহারা উভলিঙ্গের মত থাকে। প্রায় সকল রকম প্রাণীর সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। উক্ত ফলিক্ল হইতে ডিম্বাণু নির্গত হইয়া ডিম্ববাহীনলে প্রবেশ করার পর ফলিক্লটি শুকাইতে

থাকে ও তাহার মধ্যে একটি পীতবর্ণ বস্তু কর্প্যাস লুটিয়াম (Corpus Luteum—এই ল্যাটিন শব্দেরও অর্থ **পীতবর্ণ** শরীর) প্রস্তুত হয়। গর্ভাধান না হইলে ইহা শুকাইয়া যায়, হইলে ইহা আবার প্রজেষ্টেরন (Progesterone) নামক হরমোন ক্ষরণ করে। ইহার ক্রিয়া-ফলে গর্ভাবস্থায় ডিম্বস্ফোটন ও (তজ্জনিত) **ঋতুস্রাব** বন্ধ থাকে এবং **গর্ভরক্ষা** হয়। যদি গর্ভকালে উক্ত **পীত** বস্তু নষ্ট করা হয় তাহা হইলে ভ্রূণ মরিয়া যায়।

চিত্রে সকলের শেষে **প্ল্যাসেণ্টা** বা গর্ভ ফুলের অবস্থান। গর্ভ ধারণ কালে ইহা জরায়ুতে বিকাশ লাভ করিয়া ভ্রূণ ও মায়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে জরায়ু হইতে ইহা বাহির হইয়া আসে বলিয়া ইহাকে Afterbirth বলা হয়। ইহা কয়েক প্রকারের হরমোন উৎপন্ন করে।

পুরুষের গ্রন্থিসমূহের সাথে স্ত্রীলোকের গ্রন্থিগুলির পার্থক্য এই যে পুরুষের বেলায় উপরে বর্ণিত স্ত্রীলোকের গ্রন্থিসমূহের মধ্যে ডিম্বকোষ ও প্ল্যাসেণ্টা ছাড়া সবই এক রকমের এবং স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষের অনুরূপ রহিয়াছে অণ্ডকোষ।

পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে নিঃসৃত রস টেষ্টোষ্টেরন (Testosterone) হরমোন নামক দেহের রক্তধারার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পুরুষের দেহে ও মনে পৌরুষের সঞ্চার করে। অণ্ডকোষের ভিতরে অসংখ্য শুক্রকীট সৃষ্ট হয় এবং ইহা হইতে উক্ত হরমোন নিঃসৃত হয়। ইহার ফলেই লিঙ্গ-নির্দেশক গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিস্ফুটন হইয়া থাকে। যৌনবোধ জাগ্রত হইবার পূর্বে অস্ত্রোপচার দ্বারা **বালকের অণ্ডকোষ বাদ দিয়া দেখা গিয়াছে** যে, যৌবনেও প্রজনন অঙ্গসমূহ ও যৌনবোধ যথাযথভাবে পরিস্ফুট ও তেমন ক্ষমতাশালী হয় না, যৌনকেশ ও দাড়িগোঁফ দেখা দেয় না—মেয়েদের মতন পাতলা গঠন, গলার স্বর এবং ভাবভঙ্গী হয়। যৌনগ্রন্থি নিষ্কাশিত করিলে, নরনারীর শরীর ও মন তাহাদের বিশেষত্ব, সাহস ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

মোরগের অণ্ডকোষ কাটিয়া ফেলিলে সে আর মুরগীর পিছনে ধাওয়া করে না, উচ্চৈঃস্বরে ডাকে না, উহার মাথার মুকুট ক্ষুদ্রতর, বিকৃত ও বিশ্রী হইয়া যায়। পাঁঠাকেও 'খাসী' করার পর এরূপ ভাবান্তর ঘটে।

লেখকের মস্ত বড় একটা ঘোড়া ছিল। ইহাকে যখন কেনা হইয়াছিল তখন ইহার বয়স খুব কম ছিল, তখন মস্ত বড় আকারের হইলেও মাদী ঘোড়ার দিকে সে মোটেই আকৃষ্ট হইত না। তখনও যৌন-আকর্ষণের প্রভাব

ইহার উপর পড়ে নাই। কিছুদিন পর হইতেই ইহার মধ্যে যৌন-চাঞ্চল্য দেখা দিল। তখন মাদী ঘোড়ার পিছনে ধাওয়া করিবার অদম্য প্রবৃত্তি দেখিয়া ইহার অণ্ডকোষ ছেদনের ব্যবস্থা করা হইল। পশু-ডাক্তারেরা ইহার অণ্ডকোষ দুইটি না কাটিয়া ফেলিয়া শুধু বাহির হইতে সাঁড়াশী দিয়া চাপিয়া অণ্ডকোষ হইতে যে সকল শিরা-উপশিরা উপরের দিকে গিয়াছে তাহা পিষ্ট করিয়া দিলেন। ইহাতে অণ্ডকোষের অন্তস্রাবী রস-স্খলনের ব্যাঘাত ঘটিল এবং ঐ রসের চলাচল বন্ধ হইল। ঘোড়াটি ইহার পর আর মাদী ঘোড়ার দিকে আকর্ষণ বোধ করিত না। শরীর ও স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও যৌন-হরমোনের অভাব ঘটায় তাহার পুরুষোচিত যৌনাকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হইয়া গেল। অপর জন্তুদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

নরনারীর যৌনবোধ যে তাহাদের শুধু যৌন-অঙ্গসমূহেই সীমাবদ্ধ নহে, উহা যে তাহার সারাদেহ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই সকল অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির প্রভাব। এই সকল গ্রন্থির কার্যপ্রণালী ও প্রভাব সম্বন্ধে শরীরতত্ত্ব-বিদ্‌দের গবেষণার পূর্বে লোকের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

অধুনা এ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা চলিতেছে।

যৌনবোধের স্বরূপ ঃ দেহের সহিত সম্বন্ধ

যৌনবোধ কাহাকে বলে

যৌনবোধের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন যৌনবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে যৌনবোধের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাহা (Prague) বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক ডাঃ কিশ বলিয়াছেন যে, **নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে দৈহিক মিলনের যে বাসনা অনুভব করে, তাহার নাম যৌনবোধ**। শৈশবে এই বোধ নিদ্রিত থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা স্ফুরিত হইযা যৌবনে পূর্ণজাগ্রত এবং বার্ধক্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

অধ্যাপক কিশের এই ব্যাখ্যা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হইলেও উহার সামান্য ত্রুটি এই যে, এই ব্যাখ্যায় মানুষের যৌনবাসনাকে অনাবশ্যকরূপে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। কারণ নারীপুরুষ যে কেবল বিপরীত লিঙ্গের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করে তাহা সত্য নহে, সমলিঙ্গ ব্যক্তির প্রতিও মানুষের যে যৌন-আকর্ষণ তাহাকে অন্যমুখী (deviation), বিকল্প (Substitution), অথবা বিকৃতি (perversion) আখ্যা দিলেও উহা যে যৌনবোধের অন্তর্গত, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যৌনবোধ একটি স্বাভাবিক বৃত্তি

প্রাণীজগতে **যৌনবোধ** একটি **সহজাত বৃত্তি। সহজাত বৃত্তি** বলিতে আমরা কি বুঝি? মাকড়সা জাল বুনে, পাখী বাসা নির্মাণ করে, মৌমাছি মৌচাক গড়ে—এইগুলি উহাদের **সহজাত বৃত্তি। যে স্বাভাবিক প্রবণতার বশবর্তী হইয়া প্রাণীরা কোন এক সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে বংশপরম্পরায় কোন কার্য সমাধা করিতে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাকেই মোটামুটি সহজাত বৃত্তি বলা যায়।**

প্রাণীর সহজাত বৃত্তির লক্ষণ: **(১) একইরূপ কার্যকলাপ; (২) সেই শ্রেণীর সব প্রাণীরই ঐরূপ কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ হওয়া; (৩) অন্যের বিনা পরামর্শে বা শিক্ষায় আপনা হইতেই ঐরূপ কার্যকলাপের ক্ষমতা ও প্রবণতা থাকা।**

মাকড়সা একটা বয়সের সীমানায় উপনীত হইলেই জাল বুনিতে থাকিবে। এই জাল বুনিতে তাহার পূর্বশিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। অন্য মাকড়সা সাধারণতঃ যেরূপ জাল বুনিয়া থাকে, এই মাকড়সাটিও তেমনই করিবে।

ইনকিউবেটরে কৃত্রিম তাপ দিয়া ডিম ফুটানো হইলেও ডিম হইতে ছানা বাহির হইয়াই, যে জাতীয় ডিম সেইরূপ—হাঁসের ডিম হইলে হাঁসের মত, মুরগীর ডিম হইলে মোরগ-মুরগীর মতই—ব্যবহার করিতে থাকে।

অভ্যাস এবং **বৃত্তির** মধ্যে পার্থক্য এই যে, অভ্যাসের বেলায় ব্যক্তি-বিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তি কোন বিশেষ অভ্যাসের দাস হইতে পারে, বৃত্তির বেলায় এক জাতির সমস্ত প্রাণীর বংশানুক্রমে একইরূপে বোধ করে বা কাজ করে। যৌনবোধও প্রাণীজগতে অন্যান্য সহজাত বৃত্তির মত একটি বৃত্তি। ইনকিউবেটরে ফুটানো ডিম্বপ্রসূত একটি মোরগ ও মুরগীকে, একেবারে পৃথক রাখিয়া পালন করিলেও, যথাসময়ে উহারা এই বৃত্তির তাড়নায়, যৌনমিলনে ব্রতী হইবে, ইহা দেখা যায়।

তেমনই মানুষেরও যৌনবোধ সহজাত বলিয়া, অন্যের বিনা ইঙ্গিতে বা অজানা অচেনা সত্ত্বেও নর ও নারী পরস্পরের প্রতি আপনা হইতেই যৌন-আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং বাধাপ্রাপ্ত না হইলে পরস্পর দৈহিক মিলনেও ব্রতী হইবে।* তবে পার্থক্য এই যে, উচ্চশ্রেণীর প্রাণী (বানর ও মনুষ্য) যৌন-আকর্ষণ অনুভব করিলেও সহসাই সন্তোষজনকভাবে দৈহিক মিলনে সমর্থ হইবে না—পরস্পরের আগ্রহে ও চেষ্টায় অবশেষে মিলনের প্রকৃত পদ্ধতি হয়ত আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে। অথচ নিম্নশ্রেণীর প্রাণী সহজেই ঐ প্রক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ফেলিবে। আবার, মনুষ্য সাধারণতঃ অন্য প্রাণীর বা অন্য লোকের মৈথুনক্রিয়া দেখিয়া বা অন্যের মুখে শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া প্রকৃত রতিক্রিয়ার পদ্ধতি শিক্ষা করে।

দেহের সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ

মানুষের মধ্যে এই বৃত্তিটি ক্ষুৎ-পিপাসার মতই শক্তিশালী। কর্ষণ ও অভ্যাসের দ্বারা অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এই বৃত্তিটিকেই কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হইলেও সে নিয়ন্ত্রণ দেহ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক।

*সেক্সপিয়ার-সৃষ্ট চরিত্র মিরাণ্ডা ও বঙ্কিমচন্দ্র-সৃষ্ট কপালকুণ্ডলার দৃষ্টান্ত।

ক্রোধ, লোভ ও মোহ, কামের মতই বৃত্তি বটে, কিন্তু কামবৃত্তি আমাদের দেহের উপর যতটা ক্রিয়া করে, ক্রোধ, লোভ বা মোহ ততটা করে না। এক ব্যক্তি ঘন ঘন রাগ করিলে বা লোভ করিলে তদ্বারা তাহার শরীরের উপর যতটা ক্রিয়া হইবে, একজন ঘন ঘন কামোত্তেজিত হইলে, অথবা কামবৃত্তি চরিতার্থ করিলে, তদ্বারা তাহার শরীরের উপর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্রিয়া হইবে। কারণ, মানুষের যৌনবৃত্তি চরিতার্থ হয় প্রধানত যৌন-অঙ্গ সমূহের দ্বারা এবং প্রকারান্তরে প্রায় সারা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রক্ত-চলাচল, স্নায়ুমণ্ডলী ইত্যাদির উপরে উহার প্রতিক্রিয়া হয়।

যৌনপ্রদেশসমূহ

যৌনবোধ দেহের দিক দিয়া প্রধানত স্নায়ুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। মানুষের দেহে স্নায়ুপ্রধান যে সমস্ত স্থান আছে, সেখানে যৌন অনুভূতি অতিশয় প্রবল। এই সমস্ত স্থান যৌনবোধের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে, ইহাদিগকে যৌনস্থান বা কামাঞ্চল বলা যাইতে পারে। এই সমস্ত স্থানের স্নায়ুসমূহ যৌন-বোধের সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মানুষের মনে কোনও কারণে যৌনবাসনার স্ফুরণ হইলে প্রাথমিক যৌনপ্রদেশসমূহে উক্ত অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ হয়, আবার ঐ সকল স্থানেই স্পর্শ বা ঘর্ষণের দ্বারাও যৌন-অনুভূতির সৃষ্টি হয়। গুরুত্ব হিসাবে যৌনপ্রদেশসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল :—

স্ত্রীলোকের—(১) ভগাঙ্কুর (২) ক্ষুদ্রোষ্ঠ (৩) ভেষ্টিবিউল* (৪) বৃহদোষ্ঠ (৫) স্তন, বিশেষত স্তনের বোঁটা (৬) যোনির উপর দিকের দেয়াল (৭) উরুদেশ (৮) নিতম্ব (৯) গুহ্যদ্বার (১০) ঠোঁট (১১) গাল।

পুরুষের—(১) শিশ্নমুণ্ড (২) বাকি লিঙ্গ (৩) অণ্ডকোষ (৪) বস্তিপ্রদেশ (৫) স্তনের বোঁটা (৬) উরুদেশ (৭) নিতম্ব (৮) গুহ্যদ্বার (৯) ঠোঁট (১০) গাল।

এই সকল স্থানের প্রভাব-ভেদ আমরা ২য় খণ্ডের 'মিলনের বিভিন্ন স্তর' অধ্যায়ের প্রথম কয়েক অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি।

ইহা ছাড়া স্থান কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের শরীরের প্রায় সর্বত্রই যৌনবোধ সৃষ্টি করা যায়। বিশেষত, দেহের যে যে স্থানে চর্ম ও শ্লৈষ্মিক

* ভগাঙ্কুর উপরের দিকে ক্ষুদ্রোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান।

বিন্নী সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানেই যৌনবোধ অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে। তবে উপরে যে সমস্ত স্থানের নাম করা গেল সেই সমস্তের সহিত যৌনবোধের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সমস্ত স্থান নিজের অথবা অপরের হস্ত দ্বারা, বিশেষত বিপরীত-লিঙ্গের হস্ত, জিহ্বা, ওষ্ঠ বা অনুরূপ অঙ্গ দ্বারা ঘর্ষিত বা স্পর্শিত হইলে সুখানুভূতি ও যৌনবৃত্তি জাগ্রত হয়। আবার অপরের ঐ সব অঙ্গের সেবা করিলেও নিজের কাম জাগ্রত হয়।

মিলনে যৌনপ্রদেশের ক্রিয়া

সেইজন্য মিলনের সময় স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের ঐ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানা-প্রকার সংযোগ চিরকাল মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেবল নিদ্রিত কামাভাবকে জাগ্রত করিবার জন্যই যে ঐ সমস্ত যৌনপ্রদেশের ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা নহে; স্বামী-স্ত্রীর আরদ্ধ ক্রিয়াকে অধিকতর সুখদায়ক করিবার উদ্দেশ্যে এবং পরস্পরের প্রতি অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করিবার জন্যও সমস্ত প্রদেশে সুড়সুড়ি, চুম্বন ও মর্দন অথবা চোষণ, লেহন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্য বলিয়া চিরকাল স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।* ঐ সমস্ত অঙ্গের কোন কোনটা এত তীব্র অনুভূতিশীল যে, মানুষ নিজে নিজেও ঐ সমস্ত স্থানে যৌন অনুভব করিতে পারে। হস্তমৈথুন, উরুমৈথুন প্রভৃতি মানুষ যৌনপ্রদেশের অনুভূতিশীলতার জন্যই করিয়া থাকে।

ব্যক্তিভেদে যৌনপ্রদেশের অনুভূতিশীলতার ব্যতিক্রম

বলা বাহুল্য, ব্যক্তিভেদে উপরোক্ত স্থানসমূহের অনুভূতিশীলতার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। পুস্তকপাঠে এই সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম ধরিবার কোনও সাধারণ সূত্র জানিবার উপায় নাই। স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে পরস্পরের যৌনপ্রদেশসমূহের অনুভূতিশীলতার আবিষ্কার এবং সঙ্গমের পূর্বে ও সঙ্গমের সময়ে ঐ সমস্ত প্রদেশের সম্যক্ ব্যবহার করিতে পারেন, অন্যথায় যৌনসম্মিলন বিশেষ সুখের হয় না।

যৌনবোধ ও পঞ্চেন্দ্রিয়

মানুষ তাহার যৌনপ্রদেশসমূহের অনুভূতি ইন্দ্রিয়সমূহের ভিতর দিয়াই করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পুরুষ চক্ষু দ্বারা কোনও

* দ্বিতীয় খণ্ডের 'রতি কৌশল সম্পর্কে মতামত ও তথ্য' অধ্যায় দেখুন।

সুন্দরী রমণীর সুগঠিত দেহ দর্শন করিলে বা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে তাহার যৌনপ্রদেশসমূহে অনুভূতি জাগ্রত হয়। মানুষ পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সকলেরই সাহায্যে যৌন-অনুভূতি লাভ করিয়া থাকে। যথা—চক্ষু দিয়া দর্শন, কর্ণ দিয়া শ্রবণ জিহ্বা দ্বারা চোষণ, লেহন ও চুম্বন, নাসিকা দিয়া ঘ্রাণ এবং ত্বক দিয়া স্পর্শন।

যৌনবোধ ও দর্শনেন্দ্রিয়

আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ের কথাই সর্বাগ্রে বলিব। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, এখানে মনশ্চক্ষুকেও আমবা চক্ষুর অন্তর্গত ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিব। কারণ, আমধা কল্পনাতেও অনেক রকম দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন কবিয়া থাকি।

মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এত বাডিয়া যাইতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে চক্ষুই বর্তমানে আমাদেব জ্ঞানাহবণের সর্বপ্রধান ইন্দ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যৌনবৃত্তির দিক হইতেও চক্ষুই সর্বপ্রধান ইন্দ্রিয়। মানুষ তাহাব মানসনেত্রেই তাহাব চিরপুবাতন স্বপ্নময়ী ও স্বপ্নচারিণী রূপসী মানস-প্রতিমাব এবং কল্পলোকের সুন্দর নায়কের রূপ ধ্যান করিয়া আসিতেছে। 'সুন্দর' ও 'সুন্দরী', 'রূপবান' ও 'রূপসী', প্রভৃতি প্রেমের পরিকল্পনাগুলি সমস্ত দর্শন-সাপেক্ষ।

প্রধানত চক্ষুদ্বারাই আমাদের যৌনক্ষুধা জাগ্রত ও তৃপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের কবিগণ 'সুন্দরের' যে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে যৌন-বোধ জড়িত ছিল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আমরা যদি নর বা নারী-দর্শনে শিরায় একটা পুলকের ঝঙ্কার অনুভব করি তবে আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, একথা সত্য যে অন্ততঃ বিপরীত লিঙ্গের সৌন্দর্যের উপলব্ধি ও তাহার প্রতি আকর্ষণের মধ্যে যৌনবোধ লুক্কায়িত আছেই আছে। কারণ, 'সুন্দর' কথাটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইতে পারে না। আমার যাহাকে ভাল লাগে, সেই আমার নিকট সুন্দর। আমার এই ভাল লাগারও একটা মাপকাঠি আছে। সুতরাং সত্যকার 'সুন্দর' জিনিস এ জগতে খুব কমই আছে যাহার সঙ্গে যৌনবোধ জড়িত নাই।

মানবদেহে সৌন্দর্য উপলব্ধির অনেকখানিই যৌনবোধ, তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের আদর্শ খুঁজিয়া বেড়াই। পুরুষের কাছে নারীর সৌন্দর্যের আদর্শ এবং নারীর কাছে

পুরুষই সৌন্দর্যের আকর। আবার পুরুষের কাছে নারীদেহের মধ্যে তাহার যৌনপ্রদেশসমূহই সৌন্দর্যের চরম নিদর্শন।

আদিকালে নারীপুরুষের সৌন্দর্য বিচার হইত তাহাদের যৌনপ্রদেশের সৌন্দর্য দিয়া। সেই জন্য পুরুষ ও নারী পরস্পরের নিকট লোভনীয় করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের যৌনপ্রদেশসমূহ কৃত্রিম উপায়ে দর্শনীয় করিয়া রাখিত। নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, আদিম যুগের বিবস্ত্র নরনারীরা প্রথমে কেবল মাত্র তাহাদের যৌনাঙ্গগুলি (তৃণ পত্রাদি দ্বারা) আচ্ছাদন করিতে আরম্ভ করে, লজ্জাবশতঃ নয়, বরং সেগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। বর্বর যুগে নারী ও পুরুষ যৌনবৃত্তি জাগ্রত ও পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দলে দলে নৃত্য করিত এবং ঐ নৃত্যে সকলেই নিজ নিজ যৌনপ্রদেশসমূহ আড়ম্বর সহকারে প্রদর্শন করিত। নৃত্যের সময় এখনও বস্ত্রপরিহিত আফ্রিকার নারীরা তাহাদের নিতম্ব-দেশ বিশেষভাবে সঞ্চালন ও ঘূর্ণন করে। ভারত প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসীদের নৃত্যও এইরূপ হওয়া সম্ভব। এমনকি মধ্যযুগেও ইওরোপে উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা এমন কায়দায় পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, যাহাতে তাহাদের যৌন-অবয়বসমূহ বিপরীত লিঙ্গের লোকের আকর্ষণ করিতে পারে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও সেখানকার মেয়েরা কৃত্রিম উপায়ে বক্ষ ও নিতম্ব উচ্চ এবং কোমর সরু করিয়া বাহির হইতেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেও বাঙালী মেয়েদের মধ্যে পাছাপাড় শাড়ী এবং নিতম্বের উপর গোট, চন্দ্রহার প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত। আধুনিক উচ্চশ্রেণীর বাঙালী মহিলাদের মধ্যে বক্ষ উন্নতকারী আঁটসাঁট বডিস, কাঁচুলী বা ব্রেসিয়ার ব্যবহার (বিশেষত বাড়ীর বাহিরে) ঐ উদ্দেশ্যেই করা হয়। অনেকে সযত্ন অবহেলায়, দক্ষিণ দিকের অঞ্চল সরাইয়া সৌন্দর্যের মন্দির উন্মুক্ত রাখেন। কেহ কেহ উভয় দিকেরই। পৃথিবীর কোনও কোনও স্থানে এখনও পর্যন্ত স্ত্রীলোকেরা কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের যৌন-প্রদেশ বৃহত্তর করতঃ রাস্তায় ভ্রমণ ও নৃত্যাদি করিয়া পুরুষের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। জাপানে আজিও যৌনসম্মিলনের যে সমস্ত চিত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহাতে স্ত্রীপুরুষের যৌনঅঙ্গসমূহকে অস্বাভাবিকরূপে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। এইভাবে প্রাধান্য দিতে দিতে এবং সৃষ্টির সহায় ও প্রতীকরূপে লিঙ্গকে দেবতার শ্রেণীতে উন্নীত করা হইয়াছিল। লিঙ্গপূজা পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও রোমীয়দের মধ্যে আজিও লিঙ্গপূজা বিদ্যমান।

শালীনতাবোধের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যৌনঅঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়া হইতে বিরত হইতেছে। কতকটা বাধ্য হইয়াও মানুষকে ইহা করিতে হইয়াছে। কারণ, প্রাথমিক যৌনপ্রদেশসমূহ (অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রী-লোকের যোনি) অতিশয় কোমল অঙ্গ। সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত অঙ্গ প্রদর্শন করিয়া বেড়াইলে উহারা প্রয়োজনানুরূপে সুরক্ষিত থাকিতে পারে না। সমস্ত কোমল অঙ্গ সুরক্ষিত রাখিতে হইলে আবরণ অপরিহার্য। এইজন্য এবং শালীনতার জন্যও মানুষ প্রাথমিক যৌনপ্রদেশসমূহ আর আগেকার মত প্রদর্শন করিয়া বেড়ায় না।

কিন্তু মানুষের চক্ষুর ক্ষুধা মিটাইবার, তথা কামতৃপ্তি চরিতার্থের উপকরণ চাই। তাই বাজারে পুলিসের সতর্ক চক্ষুকেও ফাঁকি দিয়া হাজার হাজার অশ্লীল ছবি বিক্রয় হইতেছে। ইন্দ্রিয়ভোগে যাহারা সতত লিপ্ত ও তৃপ্ত তাহারাও এই সমস্ত ফটো দর্শন করিতে ভালবাসে এবং দর্শন করিয়া কল্পনায় সুখ অনুভব করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে নিজের আঙ্গিক মিলন মানব সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পায় না এবং অপরের দেখার সুযোগ অতীব বিরল।

কিন্তু ছবিতেও মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না। গৃহকোণে নির্জনে চক্ষুর ক্ষুন্নিবৃত্তি শত হইলেও আংশিক তৃপ্তি মাত্র। সেইজন্য মানুষ শালীনতার মুখ রক্ষা করিয়া প্রাথমিক যৌন-অঙ্গসমূহ পরিত্যাগ করতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীব যৌন-অঙ্গসমূহকে প্রাধান্য দিতে লাগিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর যৌন-অঙ্গের মধ্যে স্ত্রীলোকের নিতম্ব ও স্তনই প্রধান, এতদ্ব্যতীত পুরুষের শ্মশ্রু-গুম্ফ ও স্ত্রীলোকের কেশও অপর পক্ষের যৌনবোধ জাগ্রত ও তৃপ্ত কবিয়া থাকে।

ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার আর্য, সেমেটিক ও অন্যান্য সকল জাতিব মধ্যেই স্ত্রীলোকের প্রশস্ত নিতম্ব সৌন্দর্যের লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। নিতম্ব দুলাইয়া পুরুষের মন আকর্ষণ করিয়া গজেন্দ্র গমনে চলিতে পারা নারীর একটা বিশেষ গুণ বলিয়া বিভিন্ন জাতির কবিতায় স্থান পাইয়াছে। আমাদেব দেশে মনোরম চন্দ্রহার ও বিছাহার প্রভৃতি অলঙ্কার ও পাছাপাড শাড়ী দ্বাবা নিতম্বকে লোভনীয় করার প্রথা আজিও গ্রামাঞ্চলে, ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শহরেও, বিদ্যমান আছে। ইউরোপীয় সুসভ্যজাতিসমূহের মধ্যেও আঁটা ফ্রক পরিধান করিয়া সুঠিত নিতম্বকে ফুটাইয়া তোলা নারীজাতির সৌন্দর্যবিকাশের অন্যতম উপায় দাঁড়াইয়াছে।

নিতম্বের পরেই স্ত্রীজাতির স্তনের স্থান। যৌনতৃপ্তির উপকরণ হিসাবে

স্তনকে নিতম্বের উপরে স্থান দিতে হয়। কিন্তু স্তনের দোষ এই যে, ইহার আয়ু অতি ক্ষণস্থায়ী। নারীর অন্যান্য অঙ্গে যখন ভরা যৌবন থাকে, তখনই তাহার স্তনে বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ নারীর স্তন যৌবনের প্রারম্ভে ৫-৬ বৎসরের অধিক সুগঠিত, দৃঢ়, সুগোল ও উন্নত থাকে না। তাই, নারী-সৌন্দর্য-বিবেচকেরা স্তনকে নিতম্বের নিম্নে স্থান দিয়াছেন।

সমস্ত জাতির সাহিত্যই নারীর স্তনের অশেষ গুণকীর্তন করিয়াছে। সিক্তবসনা নারীর স্তনের স্তুতিগানে বাঙলার কবিরা অসংখ্য কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় নারীরা 'টাইট্‌ব্রেষ্ট' প্রভৃতি কৃত্রিম উপকরণ অবলম্বনে উন্নত স্তন অর্ধাবৃত রাখাকে সৌন্দর্যের নিদর্শন মনে করিয়া থাকেন।

পুরুষের দাড়ি-গোঁফ ও স্ত্রীলোকের কেশও সৌন্দর্যের নিদর্শন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই সমস্তের আদর ও কদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্বকালে সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যেই ইহা খুব ছিল। ভারতবর্ষে এবং প্রায় সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলিতে স্ত্রীজাতির কেশের মূল্য কিন্তু আজিও কমে নাই। হ্যাভলক এলিসের মতে দেশ ও কাল ভেদে কেশের প্রতি নারীপুরুষের আকর্ষণের তীব্রতাভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমাদের যৌনবোধ অনেকখানি জাগ্রত ও তৃপ্ত হয়। আমাদের অধিকাংশ সৌন্দর্যবোধের অন্তরালে যৌনবোধ লুক্কাইত রহিয়াছে। আমাদের চক্ষুর যৌনক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যই ভাস্কর্য চিত্রবিদ্যা ও সিনেমা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যৌনবোধ ও শ্রবণেন্দ্রিয়

মিলনে শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থানও যে নগণ্য নহে তাহার প্রমাণ এই যে, সঙ্গীত যৌনবৃত্তির জাগরণ ও বৃদ্ধির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। একথা প্রায় অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্‌ই স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষের যৌনবোধের অনেকখানিই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জাগ্রত হয়।

সঙ্গীত যে সাধারণভাবে আমাদের মনোবৃত্তির উপর বিশেষ-ক্রিয়াশীল, সে কথা এক রকম বিনাপ্রতিবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রিয়জনের নিতান্ত সাধারণ, অসংলগ্ন বা অর্থহীন কথাবার্তাও আমাদের মনকে স্পর্শ করে, নাড়া দেয় ও আমাদের আনন্দ বর্ধন করে। সঙ্গীত ব্যতীত বক্তৃতা, উচ্ছ্বাস, দীর্ঘনিঃশ্বাস, এমন কি গালাগালি আমাদের বিভিন্ন মনোবৃত্তির উপর কতখানি

প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সে কথা অধিকাংশ পাঠকই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিতে পারেন।

সুইডেনের ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্প্যর্বার (Sperber) বলিয়াছেন যে প্রাণিজগতে দুইটি অভাব পূরণের জন্য ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে: একটি—মায়ের নিকট সন্তানের ক্ষুধা নিবেদনের জন্য, অপরটি—প্রেমিকার নিকট প্রেমিকের যৌনক্ষুধা নিবেদনের জন্য। এ কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য থাকিতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সত্য একেবারেই নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না।

আমরা শুধু যে প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর শুনিতে ভালবাসি, তাহাই নহে, প্রিয়জনের মুখে প্রেমকথা, এমন কি যৌনবোধাত্মক কথা—যাহাকে সাধারণতঃ অশ্লীল কথা বলা হইয়া থাকে—তাহাও শুনিতে ভালবাসি। যৌনবোধ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এতটা তৃপ্তি চায় যে, প্রিয়জন ছাড়া অপর লোকের মুখেও অশ্লীল কথা ও গীত শুনিতে আনন্দ বোধ করি। ফলতঃ যৌন-কার্যাদি দর্শন-লালসা যেমন চক্ষুর একটা সাধারণ ক্ষুধা, সেইরূপ যৌনভাবের বাক্যাদি শ্রবণ-আকাঙ্ক্ষাও কর্ণের একটা সাধারণ ক্ষুধা।

তবে বিজ্ঞানীগণের অভিমত এই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পুরুষ অপেক্ষা নারীর উপরই বেশী। ইহার কারণ এই যে, যৌবনাগমে পুরুষের কণ্ঠস্বর হঠাৎ এমন পরিবর্তিত হয় যে, নারীর কর্ণে সে পরিবর্তন এক অপূর্ব সুধা ঢালিয়া দেয়। যৌবনাগমে নারীর কণ্ঠে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন আসে না। সেইজন্য নারীর কর্ণে পুরুষের কণ্ঠস্বর বিশেষ আনন্দদায়ক।

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ" —এটা শুধু নারীতেই সম্ভব। ইহার কারণ, হ্যাভ্লক এলিসের ভাষায়—পুরুষের কণ্ঠে যতটা পৌরুষ আছে, নারীর কণ্ঠে ততটা নারীত্ব নাই। ইহার অর্থ এই যৌবনাগমে পুরুষের কণ্ঠে যে পরিবর্তন আসে, নারীর কণ্ঠে সেরূপ আসে না।

যৌনবোধ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়

এমন অনেক প্রাণী আছে, যাহাদের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ইন্দ্রিয়। তাহাদের এই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় অপর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির পূর্বেই জীবদেহে বিকশিত হইয়াছিল। মানুষের মধ্যেও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থান নগণ্য

নয়। ইহার কারণ এই যে, মস্তিষ্কের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আমাদের মনোবৃত্তি তথা শরীরের উপর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভাব কতটুকু তাহা আমরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সুগন্ধ হইতে আমাদের মানসিক প্রফুল্লতা এবং দুর্গন্ধ হইতে আমাদের মানসিক বিষণ্ণতা এবং এই উভয় হইতে আমাদের শারীরিক পরিবর্তন, ইত্যাদি হইতে আমরা শরীর ও মনের উপর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভাবের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারি। মন ও শরীরের উপর ঘ্রাণশক্তির এই প্রভাব বশতঃই আমাদের যৌনবোধের উপর উহার প্রভাব অতি সহজ হইয়াছে। ঘ্রাণশক্তি দ্বারা যৌনবোধকে প্রভাবান্বিত করা প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়। গ্রীসদেশের হিপোক্রেটিস্ (Hippocratis) এবং মনিন (Monin) ও ভেঞ্চুরীর (Venturi) অভিমত এই যে, মানুষের ঘ্রাণশক্তি, তাহার শরীরের গন্ধ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে; এবং মানুষের যৌনবোধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিপরীত লিঙ্গের যৌনশক্তির সন্ধান পাইয়া থাকে।

এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে অতিশয়োক্তি বা সংকীর্ণতা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার কোনও বিজ্ঞানসম্মত কারণ নাই যে, নাসিকার সহিত যৌনবোধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। অনেক চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পুরুষ মিথুনীভুক্ত হইবার পূর্বে স্ত্রী জাতির যোনির ঘ্রাণ লয়। ইহার দৈহিক কারণ এই যে, নাসিকার সহিত মস্তিষ্কের তথা সমস্ত স্নায়ু মণ্ডলীর ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। অবশ্য যৌন-ব্যাপারে, অন্যান্য প্রাণীর ন্যায়, মানুষ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ততটা প্রভাবান্বিত নহে। তথাপি আমরা উহা সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, এমন অনেক গন্ধদ্রব্য আছে যাহার দ্বারা আমাদের যৌনবোধের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যখন আমরা দেখিতে পাই যে, প্রিয়জনের শরীর ও পোষাকের গন্ধ আমাদের যেমন প্রিয়, অপ্রিয়জনের শরীর ও পোষাকের গন্ধ তেমনি অপ্রিয়, তখন আমরা একথা মানিয়া লইতে বাধ্য যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত আমাদের যৌনবোধের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে।

যৌনবোধ এবং জিহ্বা ও ত্বগিন্দ্রিয়

যৌনবোধের আর একটি প্রধান ইন্দ্রিয় আমাদের ত্বক। রতিক্রিয়া আমাদিগকে যে এতখানি আনন্দ দান করিতে পারে, সে কেবল আমাদের ত্বকের অনুভূতিশীলতার জন্যই।

প্রধানত ত্বকের উপরই আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বকই সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ স্পর্শযুক্ত। পশুপক্ষীর মধ্যে প্রধানত এই ত্বকের ভিতর দিয়াই যৌনবৃত্তি উন্মেষ লাভ করিয়া থাকে।

শৈশব হইতেই এই স্পর্শসুখানুভূতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। **কিশোরীদের মধ্যে যখন সর্বপ্রথম যৌন-অনুভূতি** জাগ্রত হয়, তখন প্রধানত তাহা স্পর্শসুখানুভূতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাহারা চুম্বন, আলিঙ্গন, ঘর্ষণ ও মর্দনেই তৃপ্ত হয়। প্রকৃত সঙ্গম ক্রিয়াকে তাহারা ভীতির চক্ষে দেখে।

সুড়সুড়ি ও মর্দন প্রভৃতি হাতের এবং চুম্বন, চোষণ, লেহন ও দংশন প্রভৃতি ওষ্ঠ, জিহ্বা ও দাঁতের ক্রিয়া ঐ সমস্তই ত্বগিন্দ্রিয়ের অনুভূতির তৃপ্তিসাধক। যে সব ব্যক্তি স্পর্শকাতর হয় (প্রায় সমস্ত নারীগণ) তাহাদের সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু প্রায় অসহ্য বোধ হয়। এই জন্য স্ত্রীলোকের যৌনপ্রদেশসমূহ কোমল বলিয়া ঐ সব স্থানে সুড়সুড়িবোধ খুব বেশী। কাজেই হঠাৎ কেহ ঐ সমস্ত স্থান স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাতে স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষা হয়। কিন্তু যৌনকার্যে ঐ সুড়সুড়ি আবার সমস্ত যৌনচেতনাকে উন্মুখ করিয়া দেয়। এই সুড়সুড়ির বর্ধিত মাত্রাই মর্দন। যে সমস্ত অঙ্গে সুড়সুড়ি দিলে যৌনচেতনা জাগ্রত হয়, যৌনচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত স্থানে প্রচাপনের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য নারীর যৌনপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির সময় সে তাহার যৌন-অঙ্গসমূহে পুরুষহস্তের স্পর্শন ও মর্দন আকাঙ্ক্ষা করে।

চুম্বন ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শানুভূতির আর একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আমাদের অধরোষ্ঠ অতিশয় চেতনাশীল অঙ্গ। ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সীমারেখা হাওয়ায় ইহা স্পর্শগুণে অত্যন্ত অনুভূতিশীল। ইহার সঙ্গে অধিকতর চেতনাশীল জিহ্বার সহযোগিতা থাকায় ইহা আমাদের যৌনচেতনা বৃদ্ধির পরিপোষক। জিহ্বা ও ঠোঁট এতটা চেতনাশীল বলিয়াই আমাদের যৌনবোধে ইহারা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। চুম্বনের প্রথা সমস্ত সভ্যদেশেই প্রচলিত আছে।

চুম্বনের বর্ধিত মাত্রার নাম চোষণ, লেহন ও দংশন। যে সমস্ত স্থানে চুম্বন করিলে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, যৌনপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সেই সমস্ত স্থানে চোষণ, লেহন ও কোমল দংশনও প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

আলিঙ্গন আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শানুভূতির অপর নিদর্শন। যৌনকার্যে এই আলিঙ্গন অতীব প্রয়োজনীয় অংশ।

সুড়সুড়ি বা মর্দন, চুম্বন, চোষণ বা দংশন, লেহন ও আলিঙ্গন আমাদের

যৌন-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অংশ। হ্যাভলক এলিস্ প্রভৃতি যৌনবিজ্ঞানবিদ্‌গণের অভিমত এই যে, যৌনপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য এ সমস্ত কার্য অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু শুধু ইহাদের দ্বারা শুক্রস্খলনোদ্দেশ্যে এবং স্ত্রীলোকের চরম তৃপ্তি আনয়ন উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কার্যই দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে থাকিলে উহা স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায় এবং তখনই কেবল উহা যৌন-বিকারে পর্যবসিত হয়।

মিলনের দৈহিক প্রতিক্রিয়া

যৌনবোধ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিভাবে জাগ্রত ও বর্ধিত হয় তাহা বলিলাম। উহার প্রত্যক্ষ তৃপ্তি হয় কিন্তু নর ও নারীর দৈহিক মিলনে। এই মিলনের সহিত ব্যক্তিগত সুখ ও তৃপ্তি, পারিবারিক বন্ধন ও প্রীতি, জাতিগত উৎকর্ষ ও বংশবৃদ্ধি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

নর ও নারীর মিলনে প্রধানত দুই প্রকারের দৈহিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। ইহার একটি রক্তসঞ্চালন-ঘটিত, অপরটি শ্বাসপ্রশ্বাস-ঘটিত। এই সময়ে, বিশেষ করিয়া উত্তেজনার চরম মুহূর্তে শ্বাসপ্রশ্বাস অনেকখানি রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পুরুষদেহে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়, শিরাসমূহ ফুলিয়া উঠে, দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়ভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রসক্ষরণ হইতে থাকে।

নারী-অঙ্গেও অনুরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে। জরায়ুর মুখ খানিকটা উন্মুক্ত হইয়া উহা বস্তি-প্রদেশে খানিক দূরে নামিয়া আসে। যোনি-প্রাচীরের বিভিন্ন রসগ্রন্থি হইতে ক্রমাগত রসক্ষরণ হইতে থাকে। ভগাঙ্কুর উত্তেজিত ও উত্থিত হয়।

নারী অপেক্ষা পুরুষের মধ্যেই এই বিপর্যয় অধিকতর সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার কারণ যৌন-উত্তেজনা পুরুষের মধ্যে যেমন ঝড়ের বেগে আসিয়া থাকে, তেমনিই ঝড়ের বেগে তিরোহিত হয়। ফলে পুরুষের স্নায়ুমণ্ডলে যৌন-উত্তেজনা যতখানি বিপ্লব সৃষ্টি করে নারীর ততখানি করে না।

ক্লান্তিনাশক নিদ্রা

যৌন-উত্তেজনার এই সমস্ত প্রাকৃতিক ও অবশ্যম্ভাবী দৈহিক শ্রান্তি, ক্লান্তি ও গ্লানি মোচন করিবার জন্যই স্বয়ং প্রকৃতিই এক সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা নিদ্রা, রতিক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে সুরতকদ্বয়ের উভয়ে এক দুর্নিবার

অথচ সুখদায়ক সুষুপ্তি অনুভব করিয়া থাকে। **স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুরতক-দ্বয়ের বিশেষত পুরুষের, এই সুষুপ্তির নিকট আত্মসমর্পণ করা অত্যাবশ্যক।** কারণ সুরতক্রিয়ার পরবর্তী এই নিদ্রা অবসাদনাশক মহৌষধি বিশেষ।

যৌনমিলন সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের সপ্তম হইতে উনবিংশ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। যৌনবোধের দৈহিক পরিণতি নর ও নারীর মিলন এবং উহাতে উভয়ের দেহে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহাই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

(৭)

যৌনবোধ ঃ উহার স্বরূপ ; মনের সহিত উহার সম্বন্ধ ; কাম ও প্রেম

পূর্ব অধ্যায়ে যৌনবোধ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে ইহার **দৈহিকতা** সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। যৌন-বোধের **মানসিক রূপও** উপেক্ষণীয় নহে। **মনের** সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ উহার দৈহিক সম্বন্ধের মতই ঘনিষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমরা এখানে মনোবিজ্ঞানের কতিপয় তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি।

যৌনবোধের মানসিকতা

যৌনবোধের 'বোধ' শব্দটি হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহা প্রধানত **মানসিক ব্যাপার** ; আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিসমূহ স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে উপনীত হইলে উহারা জ্ঞানে পরিণত হয়। যৌন-ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি সম্বন্ধেও অবিকল উহাই সত্য। তাহা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কে উপনীত হইলে আমরা পুলক অনুভব করিয়া থাকি। মস্তিষ্কই আমাদের মনের পীঠস্থান। সম্ভবত মস্তিষ্কের ক্রিয়াসমষ্টিরই নাম মন। মন বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুতরাং আমাদের **যৌনবোধ মূলত মানসিক।**

নিম্নস্তরের প্রাণিজগতেও ইহা কতকটা সত্য। যদিও উহাদের মধ্যে মিলনে মন অপেক্ষা শরীরের কার্য অধিকতর সুস্পষ্ট, তথাপি পশুপক্ষীর মধ্যেও নারীর পশ্চাতে পুরুষকে ঘুরিতে ফিরিতে ও একই নারীর জন্য একাধিককে সংগ্রাম করিতে দেখা যায় এবং একত্র বাস, চলাফেরা ও পরস্পরের জন্য মমতাবোধের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেইজন্য উহাদের যৌনবোধকে কোনও মতেই নিছক দৈহিক ব্যাপার মাত্র বলা যাইতে পারে না।

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, মানুষের যৌনবোধ যেমন দৈহিক তেমনি মানসিক। সুতরাং ইহার প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াও দৈহিক এবং মানসিক উভয়-বিধই হইয়া থাকে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে,

প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আমাদের মনের মধ্যে কোন না-কোনও প্রকারের উপলব্ধি বা সংবেদনসৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আমাদের **প্রিয়** এবং কতকগুলি **অপ্রিয়**। প্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদিগকে আনন্দ এবং অপ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বিরক্তি দান করিয়া থাকে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা শুধু ঘটনার সময়েই নহে, উহাদের স্মৃতিও আমাদিগকে আনন্দ ও বিরক্তি দান করিয়া থাকে। কারণ **মানুষের মন স্মৃতিফলকবিশেষ**। এই ফলকে ইন্দ্রিয়-গৃহীত সমস্ত অভিজ্ঞতা খোদিত থাকে। দুঃখের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আনন্দের অভিজ্ঞতা স্বভাবত অধিকতর সুস্পষ্টভাবে আমাদের মনের স্মৃতিফলকে লিপিবদ্ধ থাকে।

যৌন-অভিজ্ঞতা আমাদের আনন্দ-অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে তীব্রতম। সুতরাং মনের উপর উহার ছাপও সর্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট। এইভাবে আনন্দের স্মৃতি যেমন আমাদের মানস চক্ষের সম্মুখে আনন্দদায়ক ক্রিয়াসমূহকে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়া তোলে, তেমনই আনন্দদায়ক ক্রিয়াবিশেষের চাক্ষুষ দর্শনও আমাদের মনের পূর্বলব্ধ আনন্দ-অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত রসের উদ্রেক করিয়া থাকে। **এই রসবোধের জাগরণ আমাদিগকে সেই আনন্দদায়ক কার্য পুনঃ সম্পাদনে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে।**

কিন্তু আমাদের আনন্দবোধ আমাদের ইন্দ্রিয়-গৃহীত অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ নহে। তাহা হইলে আমাদের আনন্দবোধও অতিশয় সীমাবদ্ধ হইত। মানুষের মন **শুধু আনন্দভোক্তা নয়, আনন্দস্রষ্টাও বটে।** লব্ধ অভিজ্ঞতার তুলনা সমালোচনা, সংযোজন দ্বারা মানব-মন কল্পনায় নিত্য নূতন আনন্দচ্ছবি অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয়। এই সৃষ্টি নৈপুণ্যবলে মানব-মন নিত্য নূতন আনন্দপ্রক্রিয়ার আবিষ্কার করতঃ ভোগের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিতেছে।

যৌনজীবনেও মনের এই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, যৌনজীবন যদিও মানুষের ভোগজীবনের সবটুকু নহে, তথাপি ইহা ভোগ-জীবনের প্রধানতম অংশ। যৌনজীবনের ভোগপ্রক্রিয়া-সমূহের অনেকগুলিকে নীতিবাদীরা যৌন-বিকার (Perversion) বলিয়া নিন্দা করিলেও উহা যে মানুষের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত প্রক্রিয়া মানব-মনের এমন এক তীব্র বাসনার ফল যে, নানাপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা দ্বারাও ঐ সমস্ত আচরণ দূর করা সম্ভব হয় নাই।

ইহার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, মানুষের যৌনবোধ তীব্র মানসিক ব্যাপার এবং

ইহাও সত্য যে বহির্জাগতিক প্রভাব বিস্তারের দ্বারা মনোজগতের কার্য নিয়ন্ত্রণ করা একরূপ অসম্ভব। অসম্ভব বলিয়াই ধর্মের চোখ-রাঙানি, বিবেকের দোহাই, শাসনের ভীতি, কিছুই মানব-মনের স্বাভাবিক কামোপভোগের বিবিধ অসামাজিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি নৈপুণ্যকে পঙ্গু করিতে পারে নাই। কিন্তু **মনকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে কেবল মনই।** মানুষ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা তাহার সমস্ত বৃত্তিকে কতক পরিমাণে সংযত ও সুপরিচালিত করিতে পারে। মানুষের যৌনবোধ তাহার মানসিক বৃত্তি, সুতরাং তাহার এই বৃত্তিকেও সংযত ও সুপরিচালিত করিতে হইবে তাহারই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা—বাহ্য বা দৈহিক শাসনের দ্বারা নহে। শারীরিক বলপ্রয়োগে মানুষের অনেক মানসিক বৃত্তিকে আমরা শৃঙ্খলিত রাখিতে পারি; কিন্তু শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা এক কথা, আর সুপরিচালিত করা সম্পূর্ণ আর এক কথা। আমরা **শাসনের পক্ষপাতী নহি,** আমরা **নিয়ন্ত্রণেরই পক্ষপাতী।** আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের মধ্যে কোন বৃত্তিই অনাবশ্যকরূপে সৃষ্ট হয় নাই।

আমাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় করিতে হইলে যৌনবোধের মানসিকতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ, যৌনক্রিয়ার বিবিধ পর্যায় দম্পতির মনের উপর কিভাবে ক্রিয়া করিবে, উভয়েরই সেই জ্ঞান সম্যক্‌ভাবে থাকা প্রয়োজন।

তাহা হইলে যৌনবোধের প্রকৃত স্বরূপ কি?—**ইহা প্রধানত শারীরিক, না মানসিক?**

যৌনবোধের প্রকৃত স্বরূপ লইয়া বহু মতামতের ছড়াছড়ি দেখা যায়। হ্যাভলক এলিস্ তাহার বিখ্যাত পুস্তকে (Studies in the Psychology of Sex-এর অন্তর্গত The Sexual Impulse) এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাহার স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ রীতি অনুযায়ী বহু পণ্ডিতের মতামত উদ্ধৃত করিয়া যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

প্রথমত পণ্ডিতেরা যৌনবোধকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং **মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজনের মতই একটা দৈহিক প্রয়োজন** বলিয়া মনে করিতেন। প্রোটেষ্টাণ্ট ক্রিশ্চান ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক জার্মানীর মার্টিন লুথারও বলিয়াছেন যে, বিবাহের প্রয়োজন শুধু মূত্রত্যাগের মতই।

যৌনলালসা চরিতার্থ করিতে পারিলে একটা অব্যক্ত আনন্দানুভূতির শিহরণ সমস্ত দেহমনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। মলমূত্রত্যাগ একটি অতি

স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, ইহাতেও শারীরিক এবং মানসিক আনন্দানুভূতির অভিজ্ঞতা ঘটে ; কিন্তু তবুও উভয়কে কখনও একই পর্যায়ে ফেলা যায় না।

মলমূত্রত্যাগ একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার। ইহাতে অপ্রয়োজনীয় ও অনিষ্টকর পদার্থসমূহ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। পুরুষের শুক্রস্খলন হওয়ায় শরীর অপেক্ষাকৃত হালকা হয় বটে, কিন্তু শুক্রসঞ্চয়ের পূর্বেও বালক ও কিশোরের যৌনবোধ থাকে। আবার স্ত্রীলোকের ত শুক্রস্খলন হয় না। শুক্রস্খলনে যে সামান্য রস নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহার তুলনায় যৌনমিলনে শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় তাহাদের তীব্রতা ও ফলাফলের মাত্রা অত্যধিক।

অধিকতর যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধিৎসু ইহার পর ধারণা করিল যে, **যৌনবোধ মানুষের সৃষ্টি বাসনার নামান্তর মাত্র।** দার্শনিক সোপেন হাওয়ারের মতে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত এবং মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে সন্তানোৎপাদন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধারণাও পরিত্যক্ত হইয়াছে—উচ্চস্তরের প্রাণিজগতে মিলনের সঙ্গে প্রজননের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখা যায় কিন্তু অতি নিম্নস্তরের অনেক প্রাণীর বংশবৃদ্ধি যৌনসম্বন্ধ-নিরপেক্ষ।* যৌনবৃত্তির পরিতৃপ্তির ফলে সচরাচর সন্তান উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ইহা উহার লক্ষ্যও নয় কিংবা অবশ্যম্ভাবী ফলও নয়। যৌনবোধ সন্তান-লাভেচ্ছার পূর্বে আত্মপ্রকাশ করে। যৌনলালসা পরিতৃপ্ত করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নরনারীর মধ্যে প্রায় সকল সময়েই জাগরূক থাকে, কিন্তু সন্তানলাভেচ্ছা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে আদৌ না থাকিতে পারে অথবা সামান্য মাত্রায় থাকিতে পারে।

সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষার সহিত যৌনবোধের মুখ্য যোগ থাকিলে নারী গর্ভবতী হইবার পর তাহার যৌনলালসা নির্বাপিত না হইয়া বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও উদ্দীপিত হয় কেন? নারীর সন্তানধারণের বয়স পার হইয়া গেলেও যৌন-আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত হয় না কেন? পুরুষ বা নারীকে কৃত্রিমভাবে সন্তান জন্মদানের অযোগ্য করিয়া ফেলিলেও তাহাদের কাম-লালসা বর্তমান থাকে কেন? চিরবন্ধ্যা নারীও রতিক্রিয়ায় উন্মুখ হয় কেন?

* এ সম্বন্ধে আলোচনা এবং উদাহরণের উল্লেখ আমি এই পুস্তকের 'যৌন-ইন্দ্রিয়সমূহ' অধ্যায়ের 'বিভিন্ন প্রকার প্রজনন' অনুচ্ছেদে এবং আমার 'মাতৃমঙ্গল', জন্মবিজ্ঞান' ও 'সুসন্তান লাভ' পুস্তকের 'প্রজনন প্রক্রিয়া' শীর্ষক অধ্যায়ে করিয়াছি।

সুরতিক্রিয়ায় (অসমর্থ ধ্বজভঙ্গ পুরুষত্বহীন) লোকেরও কামেচ্ছা থাকে কেন?

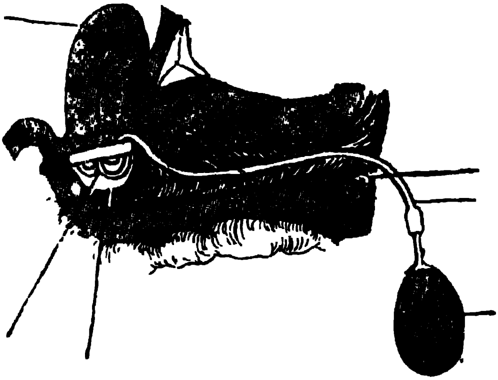

২৮নং চিত্র

কৃত্রিম গর্ভাধান। কৃত্রিম উপায়ে শুক্র জরায়ুতে স্থাপন করা হইতেছে। ১। জরায়ু, ২। জরায়ু মুখ, ৩। সার্ভিক্যাল ক্যাপ, ৪। যোনিনালী, ৫। টিউব, ৬। বালবর শুক্র।

সৃষ্টির জন্য মানুষের যৌনকামনার প্রয়োজন হয় না। পুরুষের শুক্রকীট যে কোন প্রকারে স্ত্রীলোকের ডিম্বের সহিত যথাস্থানে মিলিত হইতে পারিলেই ভ্রূণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সহবাস-প্রণালী ব্যতিরেকেও শুক্র পিচকারীর বা টিউবের সাহায্যে নারীর শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া (Artificial insemination) সন্তানের জন্মদান করা যায়। (২৮নং চিত্র)।

তবুও মনে হয়, যৌনবোধের তীব্রতা জাগ্রত রাখিয়া বংশবিস্তারের সহায়তা করাই প্রকৃতির অন্যতম উদ্দেশ্য। ঘৃণা, বিরক্তি, শ্রম বা অবহেলা স্ত্রী-পুরুষের মিলন কার্যকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না বলিয়াই বংশবিস্তার সম্ভবপর হইয়াছে। যৌনবোধে সাধারণত নরনারীর **দেহে ও মনে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা** বর্তমান থাকে। যৌনলালসার তৃপ্তি হইলে ঐ **উত্তেজনা ও উদ্দীপনা প্রশমিত** হয়। এই প্রশমন আনন্দদায়ক, তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যকর।

যৌনবোধের প্রকৃত স্বরূপ

মোটের উপর, মানুষের **যৌনবোধ গোড়াতে মানসিক, মধ্যভাগে শারীরিক ও উপসংহারে বিশেষাঙ্গিক।*** এ কথা বলিবার কারণ এই যে, গোড়াতে সে কোনও বিশেষ স্থানে বা অঙ্গে ঐ বোধের স্থান নির্দেশ করিতে পারে না। অথচ সে বোধটা কতই না তীব্র! তৎপরে ক্রমে যখন তাহার সমস্ত শরীরে উত্তেজনা আসে, যখন বিপরীত লিঙ্গের আসঙ্গলিপ্সা তাহার মনে তীব্র হয়, তখন তাহার যৌন-অঙ্গও উত্তেজিত হয়। সেই উত্তেজনা হেতু তখনকার অনুভূতিকে শারীরিক অনুভূতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহা তখনও সুনির্দিষ্টভাবে আঙ্গিক নহে। পরবর্তী আঙ্গিক-মিলন হেতু যখন উভয়ের উত্তেজনা বাড়িতে থাকে, তখন স্নায়বিক ও মানসিক সমস্ত যৌনবোধ শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হয়। রতিক্রিয়ার সহিত ত্বকের বিশেষ সংস্রব এইখানেই প্রকটিত হয়। যৌনবোধ গোড়াতে মানসিক বলিয়াই রতি-ক্রিয়ার আয়োজন শৃঙ্গারের দ্বারা করিতে হয়। উভয়ের মনকে রতিক্রিয়ায় নিবিষ্ট করিয়া উভয়ের দেহকে উক্ত কার্যের উপযোগী করিবার প্রক্রিয়াকে শৃঙ্গার, প্রেমক্রীড়া বা কামকেলি (physical courtship) বলা হয়। শৃঙ্গার সম্ভোগের ভূমিকামাত্র, এ বিষয়ে ২য় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।†

* ডঃ কিন্‌সেের মন্তব্য: "Erotic stimulation, whatever its source, effects a series of physiologic changes, which, as far as we yet know, appear to involve adrenal secretion, typically autonomic reactions, increased pulse rate, increased blood pressure, an increase in peripheral circulation and a consequent rise in the temperature of the body; a flow of blood into such distensible organs as the eyes, the lips, the lobes of the ears, the nipples of the breast, the penis of the male, and the clitoris, the genital labia, and the vaginal walls of the female; a partial but often considerable loss of perceptive capacity (sight, hearing, touch, taste, smell); an increase in so-called nervous tension, some degree of rigidity of some part or of the whole of the body at the moment of maximum tension; and then a sudden release which produces local spasms or more extensive or all consuming convulsions. The moment of sudden release is the point commonly recognised among biologists as orgasm."

† উদ্দীপনাকে Tumescence বলা হয় আর প্রশমন ও নিবৃত্তিকে Detumescence। হ্যাভলক এলিসের কথায়:—

কাম ও প্রেম

কাম যৌনবোধের দৈহিক পরিণতি, কিন্তু উহা মনের সহিতও সংশ্লিষ্ট থাকায় মানুষের মধ্যে আরও উন্নত এক অনুভূতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ইহাকে **প্রেম** বলিব।

পাশ্চাত্য মতে, **প্রেম ও প্রণয়ই** বিবাহের ভিত্তি হওয়া উচিত। এলেন কী (Ellen Key) বলেন, সত্যকারের বিবাহের একটি মাত্র শর্ত থাকিবে— **যাহারা পরস্পরকে ভালবাসে তাহারাই স্বামী-স্ত্রী।**

এখানে প্রণয় ও প্রেম একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে ; **প্রণয়ের ঘনীভূত অবস্থার নামই প্রেম।** এই প্রণয় বা প্রেম কি ? প্রেমের ব্যাখ্যা করা কষ্টকর। বন্‌ষ্টেটেন (Bonstetten) বলেন—"প্রেম কথাটার মত বহু ব্যবহৃত শব্দ আর নাই ; তথাপি ইহার মত রহস্যময় বিষয়ও আবার নাই। আমরা যাহার প্রভাব সব চেয়ে বেশী বোধ করি, তাহার সম্বন্ধে জানিও ততই কম। আমরা তারকারাজির গতিবিধির পরিমাপ করি, কিন্তু কি করিয়া প্রেমে পড়ি, তাহাই জানি না।" আমরা উহাকে কখনও ক্ষুৎ-পিপাসার মত প্রয়োজন মনে করি ; কখনও মনে করি উহা বিদ্যুতের মত শক্তিবিশেষ ; কখনও মনে করি উহা চুম্বকের মত আকর্ষক। বস্তুতঃ নানা রূপকের বর্ণনায় আমরা উহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাই।

হার্বার্ট স্পেন্সার **প্রেমের স্বরূপ** ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহা **দেহ ও মনের** বহু সূক্ষ্ম উপকরণ লইয়া গঠিত, যথা :—(১) দৈহিক যৌন-বৃত্তি। (২) সৌন্দর্য উপভোগবৃত্তি। (৩) মায়া-মমতা। (৪) সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ (৫) অনুমোদন ভিক্ষা। (৬) আত্মসম্মানবোধ। নিজস্ব মনে করা। (৮) ব্যক্তিত্বের বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ার কর্মস্বাধীনতা। (৯) সহানুভূতি-সূচক মনোবৃত্তিসমূহের উন্নয়ন।

আমি পূর্ব-পূর্ব অনুচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, **যৌনবোধ জন্মগত শারীরিক ও মানসিক** একটি **প্রবল** বৃত্তি। ইহার শারীরিক উৎস

"Tumescence is the piling on of the fuel, detumescence is the leaping out of the devouring flame whence is lighted the torch of life, to be handed on from generation to generation. In tumescence the organism is slowly wound up and force is accumulated ; in the act of detumescence the accumulated force is let go, and by its liberation the sperm-bearing instrument is driven home."

যৌন-ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃস্রাবী যৌনগ্রন্থিসমূহের রস। ইহাদের প্রকৃতিদত্ত কার্যই হইতেছে **শরীরে যৌন-ক্ষমতা ও উত্তেজনার সৃষ্টি** করা এবং ঐ ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য **শরীরকে প্রস্তুত** এবং **উন্মুখ** করা। **শারীরিক উত্তেজনা শারীরিক তৃপ্তিতে** পর্যবসিত হইতে চায়। আত্মরতির যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় নর বা নারী স্বীয় উত্তেজনা প্রমাণিত করে, তাহার আলোচনা আমরা পরে করিতেছি। ইহাতেও যে তৃপ্তি বোধ হয় উহাতেই মনের সম্বন্ধ আসিয়া যায়। কারণ, আমাদের **ভাল লাগা বা না লাগার** বিচার মনের কাছে। ক্লোরোফর্ম-প্রয়োগে কাহাকেও অজ্ঞান করিয়া তাহার রেতঃস্খলন করিয়া স্নায়বিক তৃপ্তি আনিয়া যৌনযন্ত্রসমূহের উত্তেজনা লঘু করা গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু উহাতে তাহার মানসিক তৃপ্তিবোধ হইবে না।

যৌনবোধ **শারীরিক** ও **মানসিক** পরস্পর-সম্পর্কিত বলিয়া শরীর এবং মন উভয়ের সহিত **যৌনতৃপ্তিরও** সম্বন্ধ থাকিবে। তবে শরীর ও মনের তৃপ্তির তারতম্য হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রেমহীন ও সহানুভূতিহীন সাধারণ বেশ্যাগমনে পুরুষের **শারীরিক তৃপ্তিই** বেশী হয়, মানসিক তৃপ্তি না হইবারই কথা। তবে দুই-চারি ক্ষেত্রে যে প্রেমের স্ফুরণও হইতে পারে, এ কথা বলিয়া রাখা ভাল। সাময়িকভাবে **পাত্রনির্বিশেষে** ঐরূপ যৌনতৃপ্তির কথাই আমরা এখানে বলিতেছি। ঐরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ '**কাম** (lust) কথাটার ব্যবহার হইয়া থাকে। **প্রেম** (love) কথাটা একটু উন্নত ধরনের।*

ফ্রয়েড ও তাঁহার বহু অনুবর্তীর মতে, সকল প্রেমরই উৎস **কাম**; এমন কি পিতামাতার প্রতি শিশু যে প্রেমের পরিচয় দেয় তাহাও কামভাবসঞ্জাত। ডাঃ ফোরেলও বলেন, প্রেমকে অন্য কথায় **আদি কামবৃত্তি** বলা যায়। বয়ার (Bauer) প্রমুখের মতে, প্রেম শব্দটার পরিবর্তে মনে করিতে হইবে কতকগুলি **প্রবল প্রেরণার** কথা যাহাদের প্রভাব নর ও নারী পরস্পরে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে অনুভব করিয়া থাকে।

কামবর্জিত প্রেম (Platonic Love) কথার কথা মাত্র। বস্তুতঃ

*ফোরেল বলেন, "Love in the primitive sense of word is the sex-instinct guided by the brain, that organ of the soul."

সুস্থ ও স্বাভাবিক নর ও নারীর মধ্যে ঐরূপ প্রেম অতি বিরল যে, উহা হইতে পারে না ধরিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বস্তুতঃ, কাম ক্রিয়াগত আসক্তি, প্রেমপাত্রগত আসক্তি। কাম সম্পূর্ণ দৈহিক; প্রেম অনেকাংশে মানসিক। কাম অন্ধ; উহা পাত্রনির্বিশেষে তৃপ্তি চায়. প্রেম সজাগ, উহা পাত্রবিশেষে নিবদ্ধ হয়। কাম পাশবিক; প্রেম মানবীয়। কামুক নিজের তৃপ্তি চায়। প্রেমিক প্রেমাস্পদের তৃপ্তিই বেশী চায়। কামুক স্বার্থান্বেষী, প্রেমিক প্রেমাস্পদের জন্য ত্যাগেই আনন্দ পায়।

কাম ও প্রেমের ব্যাখ্যা এবং ইহাদের বিশ্লেষণ ও পার্থক্য নির্ণয় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে করিয়াছেন: "মনের অনেকগুলি ভাব আছে তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের বিসর্জন করিতে স্বতঃপ্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। স্বতঃপ্রস্তুত হই, অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানে বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগ লালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনই কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য কবিরা 'মদনশরজ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্ত সহায় হইয়া মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন (কবি কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্য দেখুন—লেখক), যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদের গাত্রে গাত্র-কণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মের মৃণাল ভাঙিয়া দিতেছে (কবি কালিদাসের ঋতু-সংহার-এ বসন্ত বর্ণনা দেখুন—লেখক)—এ সেই রূপজ মোহ মাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিত, ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে এবং ইহা-সর্বজীব-মুগ্ধকরী। কালিদাস, বায়রন, জয়দেব ইহার কবি—বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট ও সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধরের সংসর্গলিপ্সা তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। এই যথার্থ প্রণয় সেক্সপিয়ার, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি, ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গুণ গ্রহণ, গুণ গ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা

সফল হইলে সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্তপক্ষে স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়, অন্য ভালবাসার মূল এইরূপ, তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। নিতান্তপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন স্থায়ী হয় না, রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপ-দর্শনজনিত যে সকল চিত্ত-বিকৃতি তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রাস হয় অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্ত জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেননা রূপ এক—প্রত্যহই তাহার একরূপই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে—কেননা উভয়ের দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে। যদি উভয় একত্র হয়, তবে প্রণয় শীঘ্র জন্মে. কিন্তু একবার প্রণয়-সংসর্গ-ফল বদ্ধমূল হইলে, রূপ থাকা না থাকা সমান। রূপবান ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণস্থল।

"গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে, কিন্তু গুণ চিনিতে সময় লাগে। এইজন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান হয় না—ক্রমে সঞ্চাবিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—ইহা স্থায়ী প্রণয় কি না জানিবাব শক্তি থাকে না। অনন্তকাল স্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা করা হয়। ভালবাসার কখনও অযত্ন কবিবে না। কেননা ভালবাসাতেই মানুষেব একমাত্র নির্মল ও অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পবে ভালবাসিলে আব মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।"*

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, শিশুরা জ্ঞান উন্মেষেব সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাত কারণে নিজেদের **প্রিয়জন** নির্ধারিত করিয়া ফেলে। কাহারও পিতাকে ভাল লাগে, কাহারও মাতাকে। এই ভাল লাগাই পরে ব্যাপ্ত হইয়া অন্যেব সংস্পর্শে গিয়া অপব ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হয়। এই **ভাল লাগা** বা **মৃদু তৃপ্তির ঘনীভূত অবস্থাই** প্রেম। এই প্রেম বা ঘনীভূত প্রণয় মানবজীবনে যে-কোনও সময়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে। তবে সাধারণতঃ **যৌবনের**

* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে 'বিষবৃক্ষের ফল' শীর্ষক দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায় নগেন্দ্রের প্রতি হরদেব ঘোষালের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

প্রাক্কালই উহার উন্মেষের **প্রশস্ত** সময়। উহা লিঙ্গনির্বিশেষে যে কোনও ব্যক্তিতে নিবদ্ধ হইতে পারে, তবে **বিপরীত লিঙ্গ** হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রেমের বিশ্লেষণ

প্রেম **পাত্রভেদে ভিন্ন নাম ও প্রকৃতি** পরিগ্রহ করে। পিতা ও মাতার প্রতি সশ্রদ্ধ ভালবাসাকে আমরা পিতৃভক্তি বলি, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি ভালবাসাকে যথাক্রমে ভক্তি ও স্নেহ বলি, সমশ্রেণীর অপর লোকের প্রতি ভালবাসাকে (friendship) আখ্যা দিয়া থাকি। প্রকৃতি হিসাবে ঐরূপ প্রণয়ে সাধারণতঃ কামভাবের প্রভাব থাকে অতি সামান্য এবং প্রচ্ছন্ন। জাপানীদের মধ্যে নারী স্বামীর প্রতি যাহা বোধ করে তাহা সাধারণতঃ প্রেম নয় —কর্তব্য, বশ্যতা, মমতা মাত্র।

প্রেম কথাটার প্রয়োগ হয় **সাধারণতঃ যৌনগন্ধযুক্ত ভালবাসার** ক্ষেত্রে। কামগন্ধহীন প্রেমকে **বন্ধুত্ব** আখ্যা দিয়া আমরা উক্ত অর্থেই ইহার ব্যবহার করিব। প্রেমের বিশেষত্ব হইল—(১) **পাত্র নির্দিষ্ট হওয়া,** (২) **সাময়িকভাবে হইলেও ঐ পাত্রে সম্পূর্ণ আসক্ত হওয়া,** (৩) **যৌনপ্রভাব বিদ্যমান থাকা।**

বন্ধুত্ব, ভক্তি, স্নেহ ব্যাপকভাবে অনুভূত হইতে পারে ও হইয়া থাকে। একজনের একাধিক বন্ধু, ভক্তির পাত্র, স্নেহাস্পদ থাকিতে পারে। কিন্তু **যৌনপ্রণয়ের** যে **ঘনীভূত** অবস্থাকে **প্রেম** বলা হয় উহা একই সময়ে একাধিক পাত্রে নিবদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই সাধারণ কথা। প্রেমিক-প্রেমিকার একে অপরকে **সমস্ত মন দিয়া ভালবাসিবার নামই প্রেম।***

অবশ্য সময়বিশেষে প্রেমের পাত্র বদলাইতে পারে। প্রেমাস্পদের অবহেলা উপেক্ষা, প্রত্যাখ্যান বা অন্য প্রেমিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সহসাই প্রেমকে বিষময় ঘৃণা বা রোষে পরিণত করা মোটেই বিচিত্র নহে। দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে ভুলিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু যতক্ষণ **প্রেম** বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ প্রেমিকের হৃদয়ের যাবতীয় তন্ত্রী প্রেমাস্পদের কামনাতেই ঝঙ্কৃত থাকে। প্রেমাস্পদের সহিত দৈহিক মিলন-আকাঙ্ক্ষাই সাধারণতঃ যৌনপ্রভাব সঞ্জাত। উহাকে স্মরণ, উহার সম্বন্ধে আলোচনা, উহাকে পত্র

* "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"—জ্ঞানদাস

লিখন, উহার পত্র বা অপর কোনও লেখা বার বার পাঠ, উহার নাম বার বা লেখা, উহার উদ্দেশ্যে কবিতা অথবা উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য ডায়েরী প্রভৃতিতে লেখ উহাকে উপহার পাঠানো অথবা স্বহস্তে দান, উহার ফটো বা উহাকে দর্শন উহার সহিত যে কোনও বিষয়ে কথোপকথন, উহাকে বিদ্যা, সঙ্গীত চিত্রাঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষাদান, ভাবভঙ্গী ও কথায় প্রণয় জ্ঞাপন, নানাভাবে তাহার সেবা নানা ছলে তাহার দেহ স্পর্শ, চুম্বন, আলিঙ্গন, ক্রোড়ে ধারণ এবং উহা মধ্যস্থতায় দৃশ্যত বা অদৃশ্যত যৌনতৃপ্তিসাধনও **প্রেমলীলার** অন্তর্ভুক্ত।

ইতর প্রাণীর মধ্যে প্রেম

আমরা একটু পূর্বেই বলিয়াছি: কাম **পাশবিক**, প্রেম **মানবীয়**। ইহ মোটামুটি সত্য মাত্র। অপর প্রাণীদের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেমের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়, শুধু তাহাই নহে। প্রেমের মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্তও দেখা যায় কপোত-কপোতী বা চকোর-চকোরী প্রভৃতি যে সকল পাখী জোড়া বাঁধিয় অবস্থান করে, উহাদের মধ্যে প্রেমের নিদর্শনই শুধু নহে, প্রেমের গভীরত দেখিয়াও অবাক হইতে হয়।

শিকার-প্রমত্ততায় নদীসৈকতে চখা-চখীর একটিকে মারিয়া ফেলার পর অপরটিরও শোকতপ্ত করুণ বিলাপ লক্ষ্য করিয়া অনেক ক্ষেত্রে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি, মনে হইয়াছে, হায়, কি করিলাম!

ব্যক্তিগত আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। বিভিন্ন জাতীয় কবুতর পালিবার আমার খুব সখ ছিল। গুণাবলীর কথা সন্তানে বর্তে ইহা দেখিবার জন্য বহুদিন পরীক্ষা চালাইয়াছিলাম। একটি পুরুষ-কবুতরের সহিত অপর শ্রেণীর একটি মেয়ে-কবুতরকে খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। উহাদের পূর্ববর্তী সঙ্গী ও সঙ্গিনী প্রতিদিন খাঁচার চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজ নিজ যৌন-অংশীদার ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে যে আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিত তাহা দেখিয়া শুধু আশ্চর্যবোধ করি নাই, রীতিমত অনুশোচনা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে যে দৈহিক সম্পর্কই ছিল, প্রেমের লেশমাত্র ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারে?

বাল্য ও কৈশোর প্রেম

আমরা সমমৈথুনের আলোচনা-প্রসঙ্গে বালক-বালিকা ও কিশোরকিশোরীর সমলিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি প্রেমের উল্লেখ পরে করিতেছি। সাধারণতঃ এইরূপ প্রেম

উহাদের সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র। বিপরীত লিঙ্গ ব্যক্তির সাহচর্যলাভ হইলেই উহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফুরাইয়া যায়। সহপাঠ ও মিলিবার মিশিবার সুযোগ হেতুই স্কুল-কলেজের বালক-বালিকা ও কিশোরকিশোরীদের সমশ্রেণীর প্রতি আকৃষ্ট হইবার কারণ। এই সাহচর্য হইতে তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে প্রণয়ের সূত্রপাত হওয়া বিচিত্র নহে।

বস্তুতঃ পুরাকালে গ্রীকদের মধ্যে আদর্শ প্রেমের নিদর্শনও ছিল সমপ্রেম (Homosexual love)। স্ত্রীজাতিকে কামতৃপ্তি এবং সন্তান জন্মদানের যন্ত্রবিশেষ মনে করা হইত।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সমপ্রেমের এমন সমস্ত **বিচিত্র বিকাশ** দেখা যায়, যাহাকে দস্তরমত রোমান্টিক ভালবাসা বলিতে পারি। ইহারা দেবতা সাক্ষী রাখিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে; পরস্পরের বিশ্বাস রক্ষা করিবে, জীবনে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না, শারীরিক ও মানসিক নিষ্ঠা সারাজীবন জাগ্রত রাখিবে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা-জ্ঞাপক ভাবের আদান প্রদানও করে। ইহারা একের অভাবে অপরে নিদারুণ বেদনা অনুভব করে। ইহাদের বিদায়ের দৃশ্য নাটকীয়-দৃশ্যকেও পরাভূত করে, ইহারা প্রেমপত্র লিখিয়া লিখিয়া বিরহ-কাতরতা জ্ঞাপন করে।

স্কুল-কলেজের মেয়েদের মধ্যে এইরূপ প্রেমকে 'Flame' বলে। ইহাতে প্রেমিকা প্রেমাস্পদা ছাত্রী অথবা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি যৌন-অনুরাগের মতই প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। অনেক ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনায়, মেলামেশায় প্রেম গড়িয়া উঠে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শুধু "প্রথম দৃষ্টিতে" একজন অপরজনের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য, হাঁটিবার বা বলিবার ভঙ্গী কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিগত গুণ একজনকে মুগ্ধ করিয়া বসে, তখন হইতেই প্রেমাবদ্ধ বালিকা প্রেমাস্পদার ধ্যানে মুগ্ধ ও আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহার পরে নাটকীয় প্রেমপত্র-বিনিময়, একত্র আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে শয়ন, আদর, সোহাগ ইত্যাদিও হইতে থাকে। মান, অভিমান, অভিযোগ, অভিশাপ, ঈর্ষা, ক্রোধ ইত্যাদির পালাও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে।

যৌবন ও প্রেম

এই সমস্ত বয়সের সাময়িক প্রেমকে স্বাভাবিক প্রেমের পূর্বাভাস মনে করিয়া আমরা বলিব, **যৌবনই প্রেমের প্রশস্ত সময়** এবং **নর ও নারীর**

মধ্যেই তাহার **স্বাভাবিক বিকাশ**। যৌবনের প্রাক্কালে নর ও নারীর সমস্ত মন উন্মুখ হইয়া থাকে মানস প্রতিমার খোঁজে, নিজের নিজের দেহ ও মনকে তাহারা প্রস্তুত করে উপযুক্ত পাত্রে বিলাইয়া দিবার জন্য।

আশা প্রত্যাশার এই যে গভীর অনুভূতি, আদান-প্রদানের এই যে প্রবৃত্তি ইহা প্রকৃতিরই এক অপূর্ব রহস্যময় ব্যবস্থা। অনেকে তাই এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রেম একটা **স্বাভাবিক উন্মাদনা,** একটা **সাময়িক মোহ** হইলেও ব্যক্তি ইহা **জাতির** স্বার্থেই অনুভব করে। তাই একটি যুবক যখন কোন যুবতীর মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া পরস্পরে উপগত হয়, তখন তাহাকে আত্মসুখ মনে করিলেও তাহারা যে (অনিচ্ছায় হইলেও) **জাতির দাবি মিটাইতেছে** তাহা মনে করিতে হইবে, ইহাদ্বারা পরোক্ষভাবে অনাগত বংশধরের সূচনা সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।*

প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম

একটা অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা যুবক-যুবতীর মনে তৃপ্তিকর অন্ধ অনুভূতি সৃষ্টি করে। উহারা ক্রমাগত অসংখ্য নর ও নারীর মধ্যে নিজেদের মানস-প্রতিমা খুঁজিয়া বেড়ায়। অনেকে গল্প, নাটক, নভেল, জীবনী ইত্যাদি হইতে কল্পনায় জোড়াতালি দিয়া নিজেদের কল্পপ্রেমাস্পদ গড়িয়া তোলে। ইহার পরে ঐ **কল্পিত প্রতিমার** অনুরূপ কাহাকেও দেখিয়া উহার সহিত প্রেমে পড়ে। ফ্রয়েড ও তাহার শিষ্যবৃন্দ বলেন যে, বালিকারা সাধারণতঃ তাহাদের পিতাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। কৈশোর বা যৌবনে তাঁহার মত কাহাকেও দেখিলে স্বভাবতই তাহার প্রতি আকৃষ্টা হয়। অনেক স্থলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঐরূপ মনে মনে পূজা করে ও তাঁহার মত স্বামী কামনা করে। এইরূপ মানসিক অবস্থা হইতেই আমরা যাহাকে **'প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম'** (Love at first sight) বলি, তাহা সংঘটিত হয়। সাধারণতঃ প্রথম দৃষ্টিতে এইরূপ হইলেও শুধু যে **সহসা অকারণে** উহা সংঘটিত হইল, তাহা নহে। যে ব্যক্তির সহিত নর বা নারী প্রেমনিবদ্ধ হইল, পূর্বেই তাহার প্রতিমূর্তি তাহার মনে

*"I am for you, and you are for me,
Not only for our own sake, but for others' sakes,
Envelop'd in you sleep greater heroes and bards,
They refuse to awake at the touch of any man but me."
Walt Whitman.

অঙ্কিত হইয়াছিল। ঐ মূর্তির পূজা মনে মনে কতবারই সে করিয়াছে। শুধু বাস্তব মিলনের অপেক্ষা করা হইয়াছিল মাত্র।

প্রেমের কাম্য

নারী তাহার বাঞ্ছিত আদর্শকে খুঁজে বেড়ায় **শক্তিমান তেজোদীপ্ত** পুরুষের মধ্যে, পুরুষ তাহার বাঞ্ছিতাকে কামনা করে **সুন্দরী মমতাময়ী নমনীয়া** নারীর মধ্যে। পুরুষের শৌর্য, বীর্য, সাহস, সুনাম প্রতিপত্তি নারীকে মুগ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব, খেলাধূলায় শ্রেষ্ঠত্ব, বক্তৃতায় সফলতা, রচনায় মাধুর্য ইত্যাদি গুণে মুগ্ধ হইয়া নারী সেই সেই পুরুষকে দেখিবার পূর্বেই ভালবাসিয়া ফেলিতে পারে। লেডি হ্যামিল্টন নেলসনের বিজয়ের বার্তা শুনিয়া আত্মহারা হইয়া উঠিতেন। সাধুসমাজে নিন্দনীয় বিবেচিত হইয়া থাকিলেও উঁহাদের মধ্যে সত্যকার প্রেম বিদ্যমান ছিল। বিখ্যাত অভিনেত্রী ও অভিনেতাদের প্রতি বহু নরনারী আকৃষ্ট হয়। লেখকের লেখা পড়িয়া বা সুখ্যাতি শুনিয়া অনেক নারীর তাঁহার প্রেমে পড়িবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বায়রনের দৈহিক বিকৃতি অনেকের মনে ঘৃণার উদ্রেক করিত, কিন্তু তাঁহার কবিত্বের সুখ্যাতিতে বহু নারী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। **রবার্ট এবং এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর পরিণয়ের উপাখ্যান** মধুর।

এলিজাবেথ শৈশব হইতেই রুগ্না ছিলেন। ঘরের মাঝে রোগশয্যায় থাকিয়া থাকিয়াই তিনি মনের উচ্ছ্বাসে কবিতা লিখিতেন এবং এইরূপ কতকগুলি কবিতা প্রকাশিতও হয়। তাঁহার একটি কবিতায় রবার্ট ব্রাউনিং-এর একখানি গ্রন্থের সুখ্যাতি করা হয়। ব্রাউনিং ইহাতে মুগ্ধ হইয়া পত্রালাপ শুরু করেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমের সূচনা হয়। উভয় কবি দেখাসাক্ষাতের পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু এলিজাবেথের পিতা প্রচণ্ডভাবে বাধা দেন। পিতার অনুপস্থিতিতে এলিজাবেথ গীর্জায় গিয়া ব্রাউনিং-এর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং দেশ ছাড়িয়া ফ্রান্স হইয়া ইতালীতে গিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। উভয়েই কবিতা-চর্চা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এলিজাবেথের রোগের উপশম ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং ১৫ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য সুখ অতিবাহিত করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এলিজাবেথের সংস্পর্শে ও সাহচর্যে ব্রাউনিং-এর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়।

নিজে লিখি বলিয়াই যে সুলিখিত কথার প্রভাব ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে কম অনুভব করি তাহা নহে। অনেক লেখকেরই কথার লালিত্যে সম্মোহিত হইয়া ভাবি, "শিল্পী, কি মোহিনী জান তুমি, কি মধুর তোমার বচনাভঙ্গী।" চিন্তাশীল অনেক লেখকেরই জ্ঞানবিকিরণের ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলি, "গুণি! কি গভীর তোমার জ্ঞান, কি অপূর্ব তোমাব প্রকাশেব শক্তি।" এইরূপ মনোমুগ্ধকর অনুভূতির সন্ধান আজীবনই করিব।

সৌন্দর্যের আদর্শ গড়িয়া তুলিয়া ঐরূপ ব্যক্তিব অপেক্ষাতেও অনেক নরনারী বসিয়া থাকে। সৌন্দর্যের উপকবণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইয়া থাকে। সুন্দরেব পরিকল্পনা যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হইতে পাবে, তাহা আমি চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ কবিয়াছি। পুরুষ ও নারীব পক্ষে সৌন্দর্যেব পূর্ণতাই হইল ইহাদের **পৌরুষ ও নারীত্ব**। সেইজন্য শরীবে ও মনে পুরুষালীভাব প্রধান পুরুষই মেয়েদেব, এবং মেয়েলীভাবাপন্না মেয়ে পুরুষদের আকৃষ্ট করে এবং বিপরীত ধবনেব ব্যক্তিব বিবক্তি ও ঘৃণাব উদ্রেক করে।

অনেক ক্ষেত্রে শৈশবে বাল্যে বা কৈশোরে কাহারও কোনও শারীরিক বিশেষত্ব বা ভঙ্গী অস্বাভাবিক মনঃপূত হইয়া পড়িয়া উহা মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় (Infantile fixation), ঐরূপ বিশেষত্ব-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে যৌবনে দেখিতে পাইলেই উহাব প্রতি মন অনুরক্ত হইয়া পড়িতে পারে।

মনের **পূর্ব প্রস্তুতি** (mental predisposition) নর ও নারীকে প্রেমে পড়িতে উন্মুখ করিয়া রাখে। ইহার পরই **উপযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে** উহাব প্রকৃত সূচনা দেখা যায়। এই সাক্ষাৎকাব সম্পূর্ণ দৈব বা আকস্মিক হইতে পাবে। পার্টিতে বসিয়া দৃষ্টি বিনিময়, পথিপার্শ্বে বাক্যবিনিময়—এইরূপ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেও প্রেমের সূচনা হইতে পাবে ও হইয়া থাকে। "মেয়েটি ভারী সুন্দর—আমার দিকে তাব বক্র চাহনিব মানে কি?" "ছেলেটি ভারী সুশ্রী—কথার ভঙ্গীও কি মধুর!"—বিদ্যুৎচমকেব মত এইরূপ ক্ষণিক ভাবাবেশে পরবর্তীকালে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম সূচিত হইবার পরে প্রেমিকের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন এবং মন মুগ্ধ হইয়া যায়। প্রেমাস্পদের অনুপস্থিতিতেও তাহার কল্পনায় উহার মন ভরিয়া উঠে। সকল রূপের প্রতীক এই

ইনি, সকল গুণের অধিকারী এই—ইনি সকল পবিত্রতা মাধুর্য, গরিমা, মহিমা, যেন একত্রীভূত এই ইঁহাতে।*

বার্টন দম্পতি

সংস্কৃত 'কামসূত্র' আরবী 'আরব্য উপন্যাস' ও 'সুগন্ধি কানন' ইত্যাদির অনুবাদক বিখ্যাত স্যার রিচার্ড বার্টন (Sir Richard Burton) হার্টফোর্ড-শায়ারে ১৮২১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অক্সফোর্ডে শিক্ষাকালে আরবী আয়ত্ত করেন। সৈন্য বিভাগে ভর্তি হইয়া ১৮৪২ সালে বোম্বে আসেন ও হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা করেন। প্রাচ্যদেশীয় বণিক এবং পরে হজ-যাত্রী সাজিয়া তিনি মক্কায় পর্যন্ত প্রবেশ করেন। কেউ তাঁহার সঠিক পরিচয় পায় নাই।

তিনি নানা দেশে পরিভ্রমণ করেন এবং বুলোন (Boulogne) শহরে তাঁহার সঙ্গে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারী মিস ইসাবেলের (Isabel) সাক্ষাৎ ঘটে। এই নারীর 'মনের মানুষটি ইনিই' বলিয়া মনে হয় এবং শুধু একবার দেখিয়াই তিনি তাঁহার ভগ্নীকে বলেন, "এই ভদ্র লোকটি আমাকে বিয়ে করবেন।" পরের দিন বার্টন সাহেব দেখা দিয়া দেওয়ালে খড়িমাটি দিয়া লিখিয়া নিবেদন করিলেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?" উনি জবাবে লিখিলেন, "না, মা রাগ করবেন।" মা লেখা দেখিয়া রাগও করিয়াছিলেন!

পরে বন্ধুবান্ধবীর সহযোগিতায় উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে এবং অল্প পরিচয়ের পরেই ইসাবেলকে বুলোন ছাড়িয়া যাইতে হয়। তিনি ভাবেন, "আর কি দেখা হবে?"

এর পরে বার্টন সাহেব মক্কা, মদিনা ভ্রমণ করিয়া ভারতে আসেন। তার পরে সোমালিল্যাণ্ড অভিযানে আহত হইয়া বিলাতে ফিরেন। কিছু দিন পরে আবার ক্রিমিয়ান যুদ্ধে যোগদান করেন। বেচারী ইসাবেল বছরের পর বছর অপেক্ষায় থাকেন।

*"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুন্দর, সকল সাধের সাধনা।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।"

অবশেষে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে এবং কয়েক দিন পরেই বার্টন সাহেব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বলেন, "এক্ষুনিই উত্তর দিতে হবে না, ভেবে বলবেন।"

এবার প্রেমিকা'র উদ্দীপ্ত উত্তর শুনুন :

"I do not want to think it over—I have been thinking it over for six years, ever since I first saw you at Boulogne. I have prayed for you every morning and night, I have followowed your career minutely, I have read every word you ever wrote, and I would rather have a crust and a tent with you than be queen of all the world ; and so I say now, 'yes, yes, yes, !" অর্থাৎ 'আমার ভাববার দরকার নেই—আপনাকে দেখার পর থেকেই ছয় বছর যাবৎ ভেবে আসছি। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আপনাকে পাবার প্রার্থনা করেছি, আপনার জীবনযাত্রার প্রতি ধাপ লক্ষ্য করে এসেছি, আপনার লেখা প্রত্যেকটি শব্দ পড়েছি—আর আপনার সঙ্গে এক টুকরো রুটি আর তাঁবুই হবে আমার সারা দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী হবার চেয়ে বেশী কাম্য! তাই আমি এক্ষুনি বলছি : হ্যাঁ, হ্যাঁগো, হ্যাঁ। আমি রাজী !!"

বলুন ত! কি আত্মসমর্পণ !!

তবুও নানা বাধাবিপত্তির দরুন আরও ৪ বছর পর তাঁহাদের বিবাহ হয়। তাঁহাদের প্রেম সারা জীবন অটুট, অক্ষয় থাকে।

লায়লীর কুকুরকে জড়াইয়া ধরিয়া মজনুর আত্মনিবেদন অপরের কাছে হাস্যকর মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রেমাস্পদের সাহচর্যলাভ করিয়াছিল বলিয়াই কুকুরও তাহার কাছে প্রিয়। মজনুকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—লায়লীর দেহে এত রূপ কোথায়? সে উত্তর করিয়াছিল—লায়লীর রূপ উপভোগ করতে চাইলে আমার চোখ দিয়া দেখ।

প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদের চেহারার মলিনতা উবিয়া যায়, তাহার চরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি উড়িয়া যায়। প্রেমিক তাহাকে **সর্বাঙ্গসুন্দর** মনে করিতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে Crystallization বা Idealization বলে। এই অবস্থায় প্রেমাস্পদ **প্রকৃত সত্তা হারাইয়া, প্রেমিকের স্বকল্পিত এক আদর্শ জীবে পরিণত হয়।** তাহার দোষ-ত্রুটি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রেমিকের চোখে পড়েই না। প্রেমাস্পদের পক্ষ হইতে স্বীকৃতি,

সম্মতি, অনুমোদন প্রেমিকের মনে অনির্বচনীয় আনন্দ ঢালিয়া দেয়; তাহার বিরাগ ও বিতৃষ্ণা দারুণ উদ্বেগের বিষয় হইয়া পড়ে।

প্রেমের মহিমা

উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রেমের প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে উভয়ে উভয়কেই আবাধ্য মনে করে। **এই অবস্থা মানবজীবনে সর্বাপেক্ষা তৃপ্তিকর। সর্বতোভাবে দেহমনের সুখ, শান্তি ও উন্নতির কারণ।** এইরূপ প্রেমিক-প্রেমাস্পদের জীবন ধন্য; **প্রেম পরশমণি।** ইহা নীচকে মহৎ, নিষ্ঠুরকে সহৃদয়, স্বার্থপরকে ত্যাগী ও ভীরুকে সাহসী করে।

এই প্রেমের সুর কাব্যে, সাহিত্যে, ধর্মে ঝঙ্কৃত। এই প্রেমের মহিমা সকল দেশে সকল সুরে গীত। হেলেন, জোলেখা, লায়লী, শিঁরী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, জগতে অমর। চণ্ডীদাসের নিবেদন,—"শুন রজকিনী রামী, ও দু'টি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি" সকলেরই মর্মস্পর্শী।

প্রেমের খাতিরে অর্থ, প্রতিপত্তি, এমন কি সিংহাসন ছাড়িয়া দেওয়াও বিচিত্র নহে। এই সেদিন ইংলণ্ডের রাজা এডওয়ার্ডের পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর থাকিবার সাধও হেলায় ছাড়িবার কারণ প্রেমাস্পদের মিলন-কামনা। প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিক সর্বপ্রকার দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে সর্বদাই প্রস্তুত।*

*প্রেমিক বলেন—

"আমি জনমে জনমে হব ধূলিকণা, তুমি ধূলি পরে-চলে যেও হে

রাঙা চরণ পরশে পারিবে বুঝিতে হৃদয়ে কত যে বেদনা"

(৮)

নর ও নারীর যৌন-প্রকৃতিভেদ

নারী ও পুরুষের প্রকৃতিভেদ

পুরুষ ও নারীর দৈহিক বিভিন্নতা হইতে মানসিক ও প্রাকৃতিক বিভিন্নতার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণের একটা সার্বজনীন বিশেষত্ব। প্রাচীনকালের সভ্য ও অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই এই মতবাদ দৃষ্ট হয় যে, **পুরুষ সকল দিক দিয়াই নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।** পুরুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া নারীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালের শরীরতত্ত্ববিদগণের মধ্যেও অনেকের মত এই যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর মস্তিষ্কের পরিমাণ অনেক কম। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে নারীপুরুষের প্রকৃতির তুলনামূলক অনেক গবেষণা হইয়াছে। প্রাগৈস্‌লামিক যুগে ইউরোপে নারীর আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা হইত না। ইসলাম নারীজাতিকে অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার দিয়াছে কিন্তু তবুও পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভারতে নারীর আত্মার অস্তিত্ব বরাবর স্বীকার করা হইত। বৈদিক যুগে নরনারীর সমান অধিকার ছিল। পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রাক-মুসলিম ভারতে পর্দা প্রথা ছিল না। নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও গভীরতা ছিল এবং স্বয়ম্বর প্রথা ছিল।*

কে শ্রেষ্ঠ ?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের সমসময়ে সমগ্র ইউরোপে নারী সম্বন্ধে নূতন চেতনার সঞ্চার হয়। এই সময়ে কেহ কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি দয়াশীল হইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, নারী পুরুষে জন্মগত কোনও পার্থক্য নাই, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই পরবর্তী জীবনে শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতা আনয়ন করিয়া থাকে এবং নারী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা পাইলে সকল কাজে, জীবনের সকল স্তরে, পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারিত। রাসকিন (Ruskin) বলিয়াছেন—"সমবয়স্ক একটি বালক ও একটি বালিকা যতদিন ধূলাখেলা করে, ততদিন তাহাদের মধ্যে

*Sex Life in Ancient India by Meyrs (1930) এবং Women in Ancient India by Altekar দেখুন।

কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। হঠাৎ একদিন একজনকে ধরিয়া শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের উজ্জ্বল আলোকময় রাজপথে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং অপরটিকে ধূলাখেলারই নামান্তর রান্নাঘরের অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ করা হয়। এই অবস্থায় তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা যে প্রকৃতিগত বা জন্মগত, তাহা ন্যায়ত কিরূপে বলা যাইতে পারে?"

স্বাভাবিক পার্থক্য

আধুনিক পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মেধা, মানসিক ক্ষমতা বা প্রতিভার দিক হইতে বিচার করিলে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা প্রকৃতি-গত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য শুধু সুযোগ-সুবিধার অভাব নহে। ডাঃ কোরা কাস্‌ল (Cora Castle) একজন মহিলা। তিনি নারী-জাতির প্রতিভার গবেষণা করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত মাত্র ৮৬৩ জন মহিলা পুরুষের সমকক্ষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রতিভা স্বভাবজাত। ইহা সুযোগ-সুবিধার ধার ধারে না। পৃথিবীতে ধর্মনৈতিক রাজনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক যত মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে সুযোগ-সুবিধা ত পানই নাই, উপরন্তু নির্যাতিত হইয়াছেন। সুতরাং নারী-জাতির মধ্যে অসাধারণ মনীষা থাকিলে তাহাও সমস্ত বিরুদ্ধতা ঠেলিয়া আত্ম-প্রকাশ করিত।

বর্তমানে নারীজাতি সকল ব্যাপারে পুরুষের প্রায় সমান সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে সহশিক্ষারও প্রচলন হইয়াছে। প্রাচীনকালে নারীকে এতটা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নাই। তবু ঐ সময়ে যত নারী মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বর্তমানে তাহার চেয়ে অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই; বরঞ্চ নারী যেন দিন দিন অধিক মাত্রায় খেলার পুতুলে পরিণত হইতেছে। মিঃ এইচ জি. ওয়েল্‌স তাঁহার "The Work, Wealth and Happiness of Man-kind" নামক পুস্তকে অধ্যাপক মেশ্‌নিকফকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, **নারীপুরুষে প্রকৃতি ও প্রতিভাগত বিভিন্নতা** বিদ্যমান আছে।

কিন্তু আমেরিকা ও জার্মানীর গবেষকগণের সকলে এ বিষয়ে একমত যে পুরুষের চেয়ে **অনেক কম বয়সে** নারীর জ্ঞান বিকশিত হয়। ডাঃ হেম্যান্‌স প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, **স্মৃতিশক্তি ভাব-প্রবণতায়** নারীজাতি পুরুষের চেয়ে অনেকখানি শ্রেষ্ঠ।

দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, সেবা প্রভৃতিতে নারী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যত্বের দিক দিয়া এগুলি পুরুষের শারীরিক শক্তি, বুদ্ধি, মেধা, চিন্তাশীলতা ইত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গুণ। সৃজনী প্রতিভায় নারীর ন্যূন হইবার কারণ সম্ভবত এই যে সন্তান প্রজনন ও পালনে তাহার অধিকাংশ সৃষ্টি ক্ষমতা নিঃশেষিত হওয়ায় মানসিক সৃষ্টির ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস হয়। কিন্তু গড়পড়তা নিঃসন্তান নারীদেরও সৃজনী প্রতিভা অপরদেরই মত, অর্থাৎ গড়পড়তা পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

এই সমস্ত গবেষণার ফলে বর্তমানে নারীপুরুষের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের স্পৃহা কতকটা লোপ পাইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকে 'নারী শ্রেষ্ঠ' কি পুরুষ 'শ্রেষ্ঠ'—এই দুইটি মতবাদের একটি যুক্তিসঙ্গত মধ্য-পথ বাছিয়া লইয়াছেন।

নর ও নারী পরস্পরের পরিপূরক

ইঁহাদের মত এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা **প্রকৃতিগত বিভিন্নতা** আছে। কিন্তু উহাকে **তুলনামূলক শ্রেষ্ঠতা** বলা অন্যায় হইবে। স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যে উভয়েই শ্রেষ্ঠ। **নারীপুরুষ পরস্পরের পরিপূরক, একজন ব্যতীত অন্য জন পূর্ণ নয়।** সেইজন্য আমাদের ভাষায় স্ত্রীকে 'অর্ধাঙ্গিনী'* বলা হইয়াছে। ডাঃ কিশ্ (Kish) এ বিষয়ে অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে নারী-স্বাধীনতা আন্দোলন নারীকে পুরুষ-নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন করিতে চায়, তাহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, এ আন্দোলনের প্রবক্তরা নারীকে তাহার প্রকৃতিদত্ত দায়িত্ব বহনে অস্বীকৃত হইতে শিক্ষা দেন। কিন্তু নারী মাতৃত্ব, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও নিঃস্বার্থপরতা এড়াইবার যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে কিছুতেই স্বীয় নারীত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

এই সিদ্ধান্তই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। জীবনযাপনে নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বলিয়াই উভয়ে সমান মনীষাসম্পন্ন না হইলেও মানুষ মোটের উপর ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

* হয়ত এই জন্যই হিন্দু পুরাণে অর্ধনারীশ্বর (একই দেহে এক পার্শ্বের অর্ধেক শিব ও অর্ধেক শক্তি) মূর্তির কল্পনা দেখা যায়।

পুরুষের স্বার্থপরতা

নারী ও পুরুষ কেহই একে অন্য ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গ নহে—ইহাই প্রকৃতির বিধান। শুধু মানুষের মধ্যেই যে এই কথা খাটে তাহা নহে, সমস্ত জীবজগতেই এই নিয়ম বিদ্যমান। নরনারী পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থায় পদক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে, তাহাদেব কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন হইয়া আসিয়াছে। তবে পুরুষ যে কোন কারণেই হউক এ যাবৎ প্রভুত্ব ও অধিকার পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে নাবী ও পুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তর্ক করা, জাঁতার দুই পাটের মধ্যে যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তর্ক করার মতই নিষ্ফল ও হাস্যকর। আমবা পূর্বেই বলিয়াছি, নিজ নিজ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বেব সূচনা করে না, এবং করে না বলিয়াই **এক শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব করিবার কোনও অধিকার অপর শ্রেণীর নাই।** বিপুল প্রকৃতিব আব কোনও ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষেব এই পার্থক্য বিদ্যমান নাই, এবং আব কোথাও নারীর উপব পুরুষের এই অন্যায় এবং অনিষ্টকারী প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।

নারীচরিত্র চিত্রণে পুরুষের বিরুদ্ধভাব

বহু প্রাচীনকাল হইতে পুরুষ স্বীয় বাহুবলে নারীকে পদানত করিয়া বাখিয়াছে। ইহাব উপবে আবার শিক্ষাব আলোক বঞ্চিতা নাবী নিজের সম্বন্ধে যতটুকু লিখুক আর না-ই লিখুক, পুরুষ তাহাকে লইয়া হরদম কলম চালাইয়াছে। ধর্মমতের প্রবর্তকগণ সকলেই পুরুষ হওয়ায় নারীকে পদমর্যাদা দিবার বেলায় অনেকটা কার্পণ্য করিয়াছেন।

নাবাকে শুধু অবনত বাখিয়াই পুরুষ ক্ষান্ত হয় নাই। ইহাব প্রতি অবিচার-মূলক মতবাদ প্রচাবও কম করে নাই। বাইবেলেব মানবসৃষ্টি সম্বন্ধীয় বিভাগে (Book of Genesis) নারীকে হেয় করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে, নায়িকা হেলেনের চবিত্রকে খাটো করিয়া প্রাচীন গ্রীক কবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াড (Iliad) রচিত হইয়াছে, পুরাতন পুঁথি-পুস্তকে নাবীকে অবলা অসহায় যত-না বলা হইয়াছে তাহাব চেয়ে বেশী বলা হইয়াছে কুটিলা, কুচতুরা ও স্বার্থান্বেষিণী।

পুরাতন পুঁথি-পুস্তকের এক শ্রেণীর আলোচ্য বিষয় ছিল নারী-চরিত্রের খারাপ দিকটা। তখনকার মনোভাবের অনুকূলে মজাদাব গল্প-উপন্যাস সাজাইয়া

নারীকে অবিশ্বাস্য প্রতিপন্ন করা, পুরুষকে নারীর কুহক হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশ দেওয়া, অথবা লেখকের দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও দুষ্টা নারীর সংসর্গ করিয়া তিক্ত হইয়া সমগ্র নারীজাতিকেই আক্রমণ করা—ইত্যাদি লইয়া নারীজাতির বিপক্ষে এক প্রকার সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শঙ্করাচার্য তাঁহার 'মোহমুদগর'-এ লিখিয়াছেন "নরকের দ্বার কি? নারী"। চাণক্য শ্লোকে নারী, নদী, নখী (নখরধারী পশু) ও রাজাদের বিশ্বাস করিতে বারণ করা হইয়াছে। একটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীজাতির চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য দেবতারাও জানেন না। অপর এক উদ্ভট শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, নারী পুরুষ অপেক্ষা ভোজনে চতুর্গুণ, কলহে ষড়গুণ ও কামে অষ্টগুণ।

ইসলাম নারী জাতিকে অনেকটা স্বাধীনতা ও সম্মান দিয়াছে, তবুও বাল্যবিবাহ, দাসী উপভোগের ব্যবস্থা, বহু বিবাহ, তালাকের সহজ পন্থা ও পুরুষ প্রাধান্য ইত্যাদি সভ্য-মত-বিরুদ্ধ। আইন করিয়া মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এ সবের প্রতিকার করিতেছেন। আমরা এ প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। প্রাচ্য দেশের আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, 'বাহার দানেশ' ইত্যাদি পড়িলে মনে হইবে, নারীজাতি কুচক্রী, খামখেয়ালী, শঠতাপূর্ণ।

বস্তুতঃ বিখ্যাত আরবী 'আল্‌ফ লায়লা' (সহস্র রজনী বা 'আরব্য উপন্যাস') নামক পুস্তকের গোড়ার উপাখ্যানই এই যে, কোনও রাজা তাঁহার এক স্ত্রীর চরিত্রহীনতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে, তিনি আর তাঁহার স্পৃষ্টা নারীকে অন্য পুরুষের দ্বারা প্রলুব্ধ হইবার অবকাশই দিবেন না, তাঁহার শয্যাশায়িনী নারীকে প্রত্যুষেই মারিয়া ফেলা হইবে। এই অবিচার-মূলক হত্যাকাণ্ড হইতে তাঁহাকে বিরত করিলেন অবশেষে তাঁহার মন্ত্রীর কন্যা। ইনি রাজাকে মনোজ্ঞ গল্প শুনাইয়া এবং সুকৌশলে গল্পগুলিকে অসমাপ্ত রাখিয়া রাখিয়া এক হাজার এক রাত্রি পার করিয়া দিলেন।

রাজাদের অসংখ্য স্ত্রীলোক রাখিয়া, তাহাদের সকলের যৌনজীবনকে নিষ্ঠুর-ভাবে দলিত করার অপরাধের তুলনায় কোন কোন হতভাগিনীর পদস্খলন নগণ্য নয় কি?

১২৭৪ সালে ম্যাহিউ লে বিগামি (Mahieu Le Bigame) নামক একজন ফরাসী লেখক কতকগুলি অনুশোচনাত্মক উক্তি (Lamentations) প্রকাশ করেন। ইনি একজন বিধবাকে বিবাহ করেন এবং এই কারণে তাঁহাকে

পাদ্রীগোষ্ঠী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।* দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার স্ত্রীটি রুক্ষস্বভাবের ছিল এবং তাঁহার সামাজিক অধঃপতন এবং মানসিক অশান্তির কারণ এই নারীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতে গিয়া তিনি সমগ্র নারীজাতিকেই আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন।

ইহাছাড়া এক প্রকার শ্লোকগাথা (Fabliaux) প্রচলিত আছে। সেগুলিতে ছোট ছোট ছড়ায় নারীজাতিকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। Jean de Meun-এর Roman de la Rose এই শ্রেণীর একখানি কাব্যগ্রন্থ। এই কবির মতে, নারী গর্বিতা, খেলো, কুচক্রী—পাপ এবং স্বেচ্ছাচার আসক্তা। ইহা ছাড়া তিনি একজন হতাশ প্রেমিকের মুখ দিয়া নারীজাতির প্রতি জঘন্য এই উক্তি করান:

"All women are, will be, or were,
Indeed or in desire, base whores."

অর্থাৎ সকল নারীই কার্যতঃ বা বাসনায় হেয় বেশ্যা ছিল, আছে বা হইবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আঁতোনে দে লা সেল (Antoine da la Sale) নামক একজন ফরাসী লেখক Quinze Joyes (Fifteen Joys of Marriage—বিবাহের পনরটি সুখ) নামে একখানা মজাদার বই লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতেও বিবাহ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর হাতে পুরুষ কিরূপ বিব্রত, লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হয় তাহা বেশ রসিকতার সহিত বর্ণনা করা হইয়াছে। Balzac-এর Physiology of Marriage অনেকটা নারীর অবমাননাকর। তিনি খুব বিজ্ঞের মত গম্ভীরভাবে তাঁহার মতামত চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যুগযুগান্তরে দখলীস্বার্থের মোহে হয়ত নারীর অধিকার দাবির আন্দোলন সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারিবে না, কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু পুরুষ যদি নিজেকে স্ত্রীলোকের অবস্থায় কল্পনা করিয়া একবার ধীরভাবে বিষয়টা পর্যালোচনা করিতে পারে, আমাদের মনে হয়, তবেই অধিকারের মোহ-কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইয়া তাহার অন্তর ন্যায় ও সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

* রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ও অপরাপর ধর্মের সন্ন্যাসীদের (monks or fathers) আজীবন কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। এই ব্যবস্থা নিছক কুসংস্কার প্রণোদিত এবং সভ্য জগৎকে আইন করিয়া সতীদাহ বা নির্যাতনের মত ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে।

আমরা জানি, ভুক্তিত অধিকারের মোহ সহজে ঘোচে না। আমরা ইহাও জানি, অন্যায় অধিকারভোগীর ভোগস্পৃহা বাহ্যতঃ সঙ্গত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম, নীতি ও সভ্যতার নামে যুগে যুগে কত শাসক কোটি কোটি মানবসন্তানের উপর অন্যায় অনধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের ভোগলালসায় ইন্ধন যোগাইয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। আধুনিক যুগেও দেশ, জাতি, বর্ণ ও আবহাওয়ার নিতান্ত প্রাকৃতিক বিভিন্নতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক জাতি অপর জাতির উপর অন্যায়ভাবে প্রাধান্য করিতেছে। অধিকারের এই মোহ, আভিজাত্যের এই অভিমান, বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের এই অহমিকা, সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, বড় বড় সত্যানুরাগী সাধক পণ্ডিতেরও সত্যদৃষ্টিকে কতটা মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উদাহরণ ডাঃ ফোরেল। অন্যান্য বহু বিষয়ে সত্যানুরাগী হওয়া সত্বেও তিনি তাঁহার The Sexual Question গ্রন্থে প্রাচ্যজাতিসমূহের বিশেষত চীনা ও কাফ্রীদের জন্মের হার দর্শনে ইউরোপীয় সভ্যতার বিপদ কল্পনা করিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইউরোপের সোনার মাটিতে জন্মগ্রহণ করিবার প্রশংসা যেমন ডাঃ ফোরেলের প্রাপ্য নহে, তেমনই প্রাচ্যের মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করিবার দুর্ভাগ্যের জন্য চীনা বা কাফ্রী দায়ী নহে। ফলতঃ **জন্ম, বর্ণ, শ্রেণী বা আবহাওয়ার জন্য নিন্দা বা প্রশংসার অধিকারী মানুষ নহে**—দৈব ও প্রকৃতি। সুতরাং **মানবতা ও সভ্যতায়** সকলের অধিকার সমান।* এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় আমরা যে **সত্যানুরাগ** ও **মুক্তবুদ্ধির** কথা বলিয়াছি, সেই দুইটি গুণ ব্যতীত আমরা এ বিষয়ে সত্যোপলব্ধি করিতে পারিব না।

নারীপুরুষের যৌনবোধের পার্থক্য

নারীপুরুষের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা যৌনব্যাপারেও প্রযোজ্য কি না তাহা লইয়াও পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক গবেষণা হইয়াছে। **যৌনবাসনায় নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা ধীরগামী**! মূলতঃ এই বিভিন্নতার দ্বারাই তাহাদের যৌনজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের "দম্পতির রতিজীবন" শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা এই পার্থক্যের আরও ব্যাখ্যা করিয়াছি।

* এই প্রসঙ্গে আমার ইংরেজী Art of Discipline, Management and Leadership ও Farewell to Bloodshed ও বাংলা 'মানব মনের আযাদি' পুস্তকগুলিতে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) **পুরুষ সকর্মক**—শারীরিক গঠনপার্থক্য ও মিলনে কর্তব্যের বিভিন্নতাহেতু নারীপুরুষের মধ্যে যৌনবোধের পার্থক্য আছে। ডা: ফোরেল বলিয়াছেন, যৌনমিলনে পুরুষ **সকর্মক**। সেজন্য উহার গোড়াতে পুরুষের বাসনা খুব তীব্র। পুরুষের এই বাসনা স্বতঃস্ফূর্ত এবং জন্মদাতা হিসাবে ইহাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

"The Primary Functional Characters and Fecundation —It is generally accepted that was we may term sexual hunger or the dynamic drive of one sex towards the other is stronger in the male than it is in the female. All the world over it is the male who seeks and fights for the possession of the female. To the female the male is a means to an end, for the male she is an end in herself. The male seeks for the female as a means of satisfying his sexual urge; the female submits to him because by doing so she will achieve her maternal aim. The instinctive drive of the male towards the female is therefore more blind and compelling than that of the female towards the male. Not only in the animal, but also in the human world it is the male who searches for the female, just as in the cellular origins of multicellular life it is the spermatozoon that seeks for the ovum." Kenneth Walker

যৌনবোধ নারীজীবনে যতটা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, পুরুষজীবনে ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তবু বিহারে পুরুষের এই সকর্মকতা তাহার মনের উপর বিপুল ক্রিয়া করিয়া থাকে।

(২) **যৌনমিলনে পুরুষের প্রাধান্য—সকর্মকতাই** পুরুষের যৌনবোধকে নারীর যৌনবোধ হইতে সুস্পষ্টরূপে পৃথক করিয়াছে। সুরতক্রিয়া নারী অপেক্ষা পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে অনেক বেশী। উহাতে পুরুষের ইচ্ছা ও শক্তি প্রয়োজন, নারীর ইচ্ছা বা শক্তির ততটা প্রয়োজন নাই। সাধারণত **যৌনবোধ যৌনক্ষমতার উপরই অনেকখানি নির্ভর করে**। অবশ্য খুব শক্তিশালী পুরুষেরও বাসনার তীব্রতা না থাকিতে পারে এবং ধ্বজভঙ্গ রোগীরও তীব্র বাসনা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা সাধারণ অবস্থা নহে। সঙ্গমে পুরুষের এই সকর্মকতা তাহার কামনাকে খুব তীব্র করে বটে, কিন্তু শুক্রস্খলনের পরই তাহার উত্তেজনার হঠাৎ নিবৃত্তি হয় বলিয়া পুরুষের বাসনা যেমন **ঝড়ের বেগে জাগ্রত হয়, তেমনই ঝড়ের বেগেই তিরোহিত হয়**। পক্ষান্তরে নারীর বাসনা সহজে ও সহসা জাগ্রত হয় না। মৃদুভাবে আরম্ভ হইয়া ধীরে

ধীরে তীব্র হয় এবং সুরত শেষে (পরমানন্দ লাভের পর) ধীরে ধীরে কমিতে থাকে।*

(৩) **শুক্রসঞ্চয় ও শুক্রস্খলন**—পুরুষের যৌন-বাসনার দৈহিক প্রকাশের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। পুরুষের শুক্রকোষ শুক্র সঞ্চিত হইলে তাহার বাসনা তীব্র হয় এবং শুক্রস্খলিত হইবামাত্রই উহা প্রশমিত হয়। অবশ্য শুক্রকোষে শুক্র সঞ্চিত হইবামাত্রই সব সময়ে পুরুষের উত্তেজনা হয় না, সেজন্য নারীর স্পর্শ বা অনুরূপ কামোদ্রেককারী কোনও ঘটনার প্রয়োজন। তথাপি পুরুষের বাসনা যে একদিকে শুক্রসঞ্চয় ও অপর দিকে শুক্রস্খলন দ্বারা সীমাবদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪) **নরনারীর যৌনবোধের প্রকাশভেদ**—পুরুষের যৌনবাসনার দ্বিতীয় বিশেষত্ব ইহার **প্রকাশভঙ্গী**। মুখমণ্ডলের পৈশিক ভঙ্গি হইতে আমার তাহা কখনও কখনও বুঝিতে পারি। তাহার অন্তরের তীব্র বাসনা স্নায়ু-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া গতিবাহী স্নায়ু মণ্ডলীর সাহায্যে সমস্ত দেহে বিক্ষিপ্ত হয়, তবে জননেন্দ্রিয়মণ্ডলেই উহার ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী। বস্তুতঃ পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের ঘোর পরিবর্তনই নারী ও পুরুষের যৌনবোধ প্রকাশের সুস্পষ্ট পার্থক্য। বলা বাহুল্য, পুরুষের লিঙ্গোত্থানের ন্যায় এতটা সুস্পষ্ট দৈহিক পরিবর্তন নারীর মধ্যে হয় না, যদিও তীব্র কামের সময় তাহার ভগাঙ্কুর ও স্তনবৃন্ত অল্প দৃঢ় ও উত্থিত হয়।

(৫) **পুরুষের বহু-ভোগ বাসনা**—পুরুষের যৌনবাসনার তৃতীয় বিশেষত্ব তাহার **একে-অতৃপ্তি**। মিলনে পুরুষের কোনও দৈহিক দায়িত্ব নাই—সন্তান ধারণ করিতে হয় না বলিয়া পুরুষের বহু নারীভোগের প্রাকৃতিক সুবিধা আছে। এই সুবিধাবোধ হইতে তাহার বহুনারীভোগের বাসনা স্ফুরিত হইয়াছে। রতিক্রিয়ায় সকর্মকত্ব তাহাকে নারীর উপর যে প্রাধান্য দান করিয়াছে, সেই প্রাধান্যবোধ ও সহজলভ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রতি মানবমনের স্বাভাবিক উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা—এই দুইটি মনোবৃত্তি পুরুষকে নিত্য নূতন নারীভোগে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। পুরুষের এই নিত্যনূতন ভোগ-স্পৃহা বহুপত্নীত্ব ও গণিকাবৃত্তি প্রভৃতি বহু সামাজিক অকল্যাণের মূলীভূত

*এই বৈষম্যই দাম্পত্যির মিলন সুখের প্রধান অন্তরায়। ইহাকে "The Greatest Marital Problem" বলিতে পারি। এই নামে ইংরেজীতে একটি বইও লিখিয়াছি। এই পুস্তকের ২য় খণ্ডেও এ সমস্যার সমাধানের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

কারণ। পত্নীপ্রেম, অপত্যস্নেহ প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত কোমলবৃত্তি এবং দুর্নাম ও রোগের ভয় পুরুষের এই বহুভোগের বাসনাকে কতকটা সংযত রাখে। আত্মসংযম সাধনার দ্বারাও পুরুষ তাহার এই বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এই দিক হইতে নারীমনোবৃত্তি পুরুষমনোবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নারী সাধারণত এক পতিতেই তৃপ্ত।

(৬) **নারী অকর্মক**—মিলনে নারীর অংশ অল্পবিস্তর অকর্মক অবে উত্তেজিত হইবার পরে উহারও সকর্মকতা প্রকাশ পায়, পাছে স্বামী কামুকী বা বেহায়া মনে করেন এই ভয়ে কেহ কেহ তাহা চাপিয়া রাখে। নারীর যৌনবোধ পুরুষের যৌন-উত্তেজনার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং তীব্র নহে। তাহার কামকেন্দ্রগুলি **বিস্তৃত ও ব্যাপক**। পুরুষের যৌনবোধ যেমন তাহার যৌন-অঙ্গে সীমাবদ্ধ, নারীর যৌনবোধ তেমন নহে। সত্য বটে পুরুষের লিঙ্গের ন্যায় নারীর ভগাঙ্কুর ও স্তনবৃন্ত বাসনায় উত্তেজিত হয়, সত্য বটে তাহার স্তনাগ্র তাহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কামকেন্দ্র, তথাপি তাহার কাম-বাসনাকে পুরুষের ন্যায় বিশেষাঙ্গিক বলা যাইতে পারে না।

(৭) **পার্থক্যের দৈহিক কারণ**—পুরুষের যৌনবাসনা হইতে নারীর যৌনবাসনার এই পার্থক্যের কতকগুলি দৈহিক কারণ আছে—(ক) নারীর শুক্রকোষ নাই সুতরাং শুক্রসঞ্চয়জাত যে উত্তেজনা পুরুষের হয়, নারীর তাহা হয় না। এইজন্য নারীর বাসনা উত্তেজনার কারণ ঘটার পর কিছু বিলম্বে জাগ্রত হয় এবং ধীরে ধীরে বাড়ে। শুক্র না থাকায় কোনও বিশেষ মুহূর্তে পুরুষের শুক্রস্খলনের ন্যায় নারীর কোনও পুলকপ্রদ রসক্ষরণ হয় না, সুতরাং নারীর উত্তেজিত বাসনা অন্তর্হিত হয়ও ধীরে ধীরে। সেইজন্য মিলনের গোড়াতে নারীকে সাধারণতঃ যেমন অনুত্তেজিত, উদাসীন, এমন কি অনিচ্ছুক বোধ হয়, উহার উপসংহারে তাহাকে তেমনি অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট দেখা যাইতে পারে। পুরুষ সংযম, নানা প্রকার প্রেমক্রীড়া ও আসন কৌশল অবলম্বন করিয়া অতি সহজেই যে এই অসামঞ্জস্য দূর করিতে পারে, এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি। (খ) নারী ডিম্ব স্বয়ং অকর্মক, পক্ষান্তরে পুরুষের শুক্রকীট অতিশয় সকর্মক ও গতিশীল। তাই ডিম্বের আধার নারীদেহে ও শুক্রকীটের আধার নরদেহে যথাক্রমে নিষ্ক্রিয়তা ও চঞ্চলতা দেখা যায়।

(৮) **নারীর যৌনবাসনার বৈচিত্র্য**—রতিক্রিয়ায় নারীর এই অকর্ম-

অকর্মকতাহেতু তাহার বাসনা একটু বিচিত্র। মিলনে দৃশ্যতঃ তাহাকে অনিচ্ছুক অথবা উদাসীন দেখা গেলেও, এ কার্যে পুরুষের নিকট সে খানিকটা জবরদস্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। অধ্যাপক রবার্ট মিচেল্‌স নারীর এই যৌনভাবকে **দ্বৈত মনোভাব** নাম দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নারীর বাসনার এই দ্বৈতভাব কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়েরই আকর। অকল্যাণের হেতু এইজন্য যে রতিক্রিয়ায় নারী বাহ্যত এমন দৃঢ় অসম্মতি প্রদর্শন করিয়া থাকে যে, সুবিবেচক প্রেমিক পুরুষ ঐ অসম্মতি উপেক্ষা করিতে পারে না, কারণ স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিলনকে সে পাশবিকতা বলিয়া মনে করে। অথচ নারীর **কৃত্রিম অনিচ্ছা** ঠেলিয়া স্বামী যদি তাহার সঙ্গে মিলিত না হয়, তবে স্ত্রী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এই অসন্তোষের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হইতে পারে। হ্যাভলক এলিস এ বিষয়ে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ জ্যানেট একদা তাঁহার এক রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি আপনার স্বামীকে পছন্দ করেন না কেন?" তালাককামী স্ত্রী উত্তর দিয়াছিলেন—"পছন্দ করিব কি, তিনি বিন্দুমাত্র বলপ্রয়োগ জানেন না।" আবার রতিক্রিয়ায় নারীজাতি যে খানিকটা কৃত্রিম অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে, একথা জানিয়াও নিস্তার নাই। অনেক সময় স্ত্রী হয়ত সত্য-সত্যই শরীর বা মনের বৈকল্যহেতু অনিচ্ছুক হইতে পারে। বিবেচক প্রেমিক স্বামী কৃত্রিম ও অকৃত্রিম অনিচ্ছার পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া সংশয়ে পতিত হয় এবং অনেক সময়ে সেইজন্য দাম্পত্য অপ্রীতির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৯) **ধর্ষিতা হওয়ার বাসনা**—কিন্তু নারীর এই কৃত্রিম অনিচ্ছা পুরুষের কল্যাণও করিয়া থাকে। নারীর এই কৃত্রিম অনিচ্ছা—যাহাকে গ্রাম্য ভাষায় 'ছিনালী' বলা হইয়া থাকে—শৃঙ্গার কার্যের (প্রেমক্রীড়ার) বিশেষ আবশ্যক অংশ। পরিণামে ধরা দিবার জন্যই এই পলায়ন,—পুরুষের আগ্রহবৃদ্ধির জন্যই এই অসম্মতি। ইহা নারীর প্রকৃতির একটা উপাদেয় বিশেষত্ব। নারীর এই গুণই পুরুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নারী স্বভাবতই পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হইতে চায়। অধ্যাপক মিচেল্‌স একজন সুশিক্ষিত অভিজাত বংশের মহিলার কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, উক্ত মহিলা তাঁহার নিকট বলিয়াছেন, "যে পুরুষকে ভালবাসি তাহার দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার ন্যায় আনন্দ আর কিছুতেই নাই।" বস্তুত ইহা নারীর যৌনবোধের গূঢ় কথা। মিচেল্‌স বলিয়াছেন, ধর্ষণেই নারীর রতি-তন্ময়তা অধিক হইয়া থাকে।

(১০) **নারীর দায়িত্ব**—গর্ভধারণ, সন্তানপালন, স্তন্যদান ইত্যাদি দৈহিক কারণেই নারীর বাসনা কোন বিশেষ অঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। গর্ভধারণের ভয়ে নারীর রতিবাসনা কতকটা সংযত হইয়া থাকে।

(১১) **নারী সংস্কার ও অভ্যাসের দাস**—অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় যৌন-ব্যাপারেও নারী পুরুষ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে সংস্কার ও অভ্যাসের দাস। নারীজাতি পুরুষের মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা ও গোঁয়ার্তুমি পছন্দ করিয়া থাকে এবং ভীরুতা কাপুরুষতা ও অতিবিবেচকতা ('মেনিমুখো' ও 'ল্যাবা' পুরুষকে) ঘৃণা করিয়া থাকে। এই প্রকৃতি নারীর সংস্কারপ্রিয়তার পরিচায়ক। নারীর উপর অভ্যাসের প্রভাবের একটা উদাহরণ এই যে, যে নারী স্বভাবত এক স্বামীতে সন্তুষ্ট, লজ্জা যে নারীর প্রকৃতিগত, সেই নারীই রূপোপজীবিনী হইলে অভ্যাসের চরম নির্লজ্জতা আয়ত্ত করিতে পারে।

(১২) **সৃষ্টিবাসনা**—নারীর যৌনবোধে সন্তান কামনা পুরুষের অপেক্ষা তীব্র। কিন্তু উভয়ের সৃষ্টিবাসনার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে। পুরুষের সৃষ্টিবাসনা অবচেতন মনে আত্মবিস্তারের ক্ষুধা মাত্র; কিন্তু নারীর সৃষ্টিকামনায় ঘনিষ্ঠতর দৈহিক সম্পর্কহেতু সৃষ্টিতে নারীর বেশী মমত্ববোধ আছে।*

(১৩) **পারস্পরিক দৈহিক আকর্ষণ**—নারী ও পুরুষের যৌনবোধে এই সমস্ত বড় বড় পার্থক্য ছাড়াও আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে। নারীদেহ, বিশেষত সুগঠিত যৌবনদীপ্ত নারীদেহ দর্শনে যেমন পুরুষের বাসনা উদ্দীপ্ত হয়, পুরুষের ঐরূপ দেহদর্শনে নারীর ততটা হয় না। নারী সংস্কারবশে পুরুষকে ভোক্তা ও নিজেকে ভোগ্যা মনে করিয়া থাকে বলিয়া পুরুষের দৈহিক রূপ তাহার তত বড় একটা বিবেচনার বিষয় নহে।

(১৪) **নারী নিষ্ঠাবতী**—দাম্পত্যজীবনে নারী সাধারণতঃ নিষ্ঠাবতী। সে নিরুদ্বেগে অনায়াসে এক স্বামী লইয়া ঘর করিতে পারে। জননীত্ব তাহার জীবনে প্রধান পরিচালক বৃত্তি বলিয়া সে একাধিক পুরুষের প্রয়োজনই বোধ করে না। আজীবন কুমারী থাকিয়া যাওয়াও নারীর পক্ষে কম কষ্টদায়ক। অথচ পুরুষ এ বিষয়ে নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ডাঃ ফোরেলের মতে "সাধারণ পুরুষ প্রত্যহ যতজন অ-কুশ্রী ও অ-বৃদ্ধা নারী দর্শন করে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিতই তাহার মিলনের ইচ্ছা হয়।"

* "She experiences an inclination towards Sexual life only to utilize the man as a detour towards a maternel end."—Maranon,

(১৫) নারী সমমৈথুনক—নারী ও পুরুষের উভয়েই খানিকটা সমমৈথুনক বটে। কিন্তু নারীর সমমৈথুন স্বাভাবিক ও পুরুষের যৌন-বিকল্প। কারণ, পুরুষের সমমৈথুন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বয়সের একটা বৃত্তি এবং স্বাভাবিক ক্রিয়ার নিতান্ত দীন অনুকল্প মাত্র। কিন্তু নারীর সমমৈথুন সার্বজনীন—বিশেষ বয়সের ক্রিয়া নহে, স্বাভাবিক ক্রিয়ার স্থলবর্তীও নহে; কারণ ইহার দৈহিক কোনও পরিণতি নাই। দুইটি যুবতী নারী একত্রে শয়ন করিয়া পরস্পরকে চুম্বন করিয়া এবং মা সন্তানকে কোলে জড়াইয়া যে আনন্দ পাইবে, ঐ আনন্দ যৌবনবোধজাত, কিন্তু নারীর পক্ষে উহা যৌনবিকল্প নহে; কারণ, এ বোধ মূলতঃ শারীরিক নহে—মানসিক।

(১৬) পুরুষের যৌন দ্বৈতভাব—আমরা নারীর যৌনবোধের দ্বৈতভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পুরুষেরও একপ্রকার যৌন দ্বৈতভাব আছে, যাহা নারীর চক্ষে নিতান্ত অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সে দ্বৈতভাব এই যে, পুরুষ তাহার স্ত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা এবং তাহার সহিত মিলনে পরম তৃপ্তি লাভ করা সত্ত্বেও অনায়াসে এবং স্ত্রীর প্রতি অবিচার করিতেছে ইহা অনুভব না করিয়া, পরনারী কিংবা বেশ্যাগমন করিতে পারে। নারীর পক্ষে সাধারণতঃ ইহা সম্ভব নহে। নারী যাহাকে ভালবাসে না, সাধারণতঃ তাহার সহিত স্বেচ্ছায় সহবাস করিতে পারে না। অবশ্য বেশ্যাদের কথা স্বতন্ত্র, তাহারা শুধু অর্থের জন্যই দেহদান করিয়া থাকে।

নরনারীর যৌন-সাড়ার পার্থক্য

ডঃ কিন্‌সে প্রমুখ যৌনতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণা অনুযায়ী নানা প্রকার মানসিক উত্তেজনায় নারী ও পুরুষের যৌন-সাড়ার পার্থক্য সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করিতেছি।

যৌন-সাড়া ও আচরণ—বিস্তর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে, মোটের উপর গড়পড়তা পুরুষের যৌন-সাড়া ও আচরণ নারীর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় এই সব মানসিক ব্যাপার দ্বারা: (ক) তাহার পূর্ব যৌন-অভিজ্ঞতা, (খ) সেই পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলির সহিত যে সমস্ত বস্তুর সংযোগ ছিল তাহাদের স্মরণ বা দর্শন, (গ) অপরের যৌন-অভিজ্ঞতা দেখিয়া বা শুনিয়া তাহার আনন্দের অংশ গ্রহণ, (ঘ) অপরের যৌন-সাড়ার প্রতি সহানুভূতিসূচক মনোভাব প্রভৃতি।

স্বমেহনের সময় রতিসুখের বা প্রণয়পাত্রের কল্পনা—প্রায় সমস্ত পুরুষই এইরূপ কল্পনা করে, কিন্তু বিস্তর নারী করে না।

কামস্বপ্ন দেখা—প্রায় সমস্ত পুরুষই এইরূপ স্বপ্ন দেখে, বিস্তর নারী দেখে না।

মানসিক উত্তেজনায় সাড়া দিবার বিষয়ে বৈচিত্র্য—পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের অনেক অধিক।

উপরোক্ত সত্যগুলির দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানগুলিতে পাওয়া যাইবে—

(১) অপর শ্রেণীর ব্যক্তিকে দেখিয়া যৌনভাব জাগা—মোট ৫৭৭২ জন নারী ও ৪২২৬ জন পুরুষ গবেষণার পাত্রের মধ্যে স্পষ্টভাবে কিংবা প্রায়ই সাড়া জাগিয়াছে নারী ১৭%, পুরুষ ৩২%; সামান্য জাগিয়াছে নারী ৪১%, পুরুষ ৪০%, মোটেই জাগে নাই—নারী ৪২%, পুরুষ ২৮%।

নারীদের দেখিয়া এই সকল পুরুষদের যৌন-সাড়ায় তাহাদের অঙ্গের দৃঢ়তা ও উত্থান প্রভৃতি শারীরিক পরিবর্তন প্রায়ই হয় এবং তাহারা শারীরিক সংযোগের জন্য নারীদের নিকটবর্তী হয়। কতক নারীদের মধ্যে পুরুষদের অনুরূপ সাড়া (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋতুকালে) জাগিয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ নারীদেরই স্পষ্টভাবে কোনও শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

(২) স্বশ্রেণীর ব্যক্তিদের দেখিয়া যৌন সাড়া—মোট ৫৭৫৪ জন নারী ও ৪২২০ জন পুরুষের মধ্যে স্পষ্টভাবে সাড়া জাগিয়াছে—নারী ৩%, পুরুষ ৭%; সামান্য জাগিয়াছে—নারী ৯%, পুরুষ ৯%; আদৌ জাগে নাই—নারী ৮৮%, পুরুষ ৮৪%।

(৩) অপর শ্রেণীর বিবস্ত্র চিত্র দর্শনে যৌন সাড়া—৫৬৯৮ জন নারী ও ৪১৯১ জন পুরুষ গবেষণার পাত্রের মধ্যে স্পষ্টভাবে সাড়া জাগিয়াছে—নারী ৩%, পুরুষ ১৮%; সামান্য জাগিয়াছে—নারী ৯%, পুরুষ ৩৬%; আদৌ জাগে নাই—নারী ৮৮%, পুরুষ ৪৬%।

কোনও পুরুষ যখন দেখে যে তাহার স্ত্রী বা প্রণয়িনীর মনে তাহার বিবস্ত্র চিত্র দর্শনে সাড়া জাগে না তখন মনে করে যে, সে আর তাহাকে ভালবাসে না। এ ধারণা ভ্রান্ত।

(৪) নগ্ন ও উত্তেজক চিত্রের শিল্পী—বিবস্ত্র চিত্রে যদি কোন যৌনাঙ্গ অথবা যৌনক্রিয়ার আভাস নাও দেখানো হয় তথাপি তাহা এমনভাবে অঙ্কিত হইতে পারে যাহা শিল্পীর নিজের এবং অধিকাংশ পুরুষ দর্শকের পক্ষে

চিত্ত-চাঞ্চল্যকারী হইবে। মিকেল আঞ্জেলো, লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, র‍্যাফায়েল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পুরুষ চিত্রকর, রুবাঁ, রোদ্যাঁ, মেইঅল প্রভৃতি পুরুষ ভাস্কর কদাচিৎ এমন বিবস্ত্র নবনারী সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের মধ্যে পুষ্পধনুর শরসন্ধান (erotic element) নাই। সমালোচকদের মতে ইউরোপ ও আমেরিকায় আধ ডজনেরও কম প্রতিভাশালী পুরুষ শিল্পী আছেন যাহারা কামোত্তেজনাকারী নয় এরূপ বিবস্ত্র চিত্র বা মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কয়েক শত নারী শিল্পীর মধ্যে আট জন মাত্র দেখা গিয়াছে যাহাদের চিত্র বা মূর্তি মদনধর্মী (erotic)।

(৫) **অপর শ্রেণীর যৌনাঙ্গ দর্শনে যৌনভাব জাগা**—৬১৭ জন নারীর মধ্যে স্পষ্টভাবে সাড়া জাগিয়াছে মাত্র ২১%, কতক পরিমাণে ২৭%, একেবারে জাগে নাই ৫২%। কিন্তু পুরুষদের বেলা ইহার বিপরীত।

(৬) **নিজের যৌনাঙ্গ দর্শনে যৌন সাড়া**—স্পষ্টভাবে সাড়া জাগিয়াছে—নারী ১%, পুরুষ ২৫%, কতক পরিমাণে জাগিয়াছে নারী ৮%, পুরুষ ৩১%, আদৌ জাগে নাই—নারী ৯১% পুরুষ ৪৪%। গবেষণা-পাত্রের সংখ্যা নারী ও পুরুষ যথাক্রমে ৫৭২৫ ও ৩৩৩২ জন।

(৭) **যৌনাঙ্গে কামক্রীড়া ভাল লাগা**—অধিকাংশ পুরুষ রতিক্রিয়ার পূর্বে নারীর যৌনাঙ্গ দেখিতে ও নিজের অঙ্গ দেখাইতে ভালবাসে। কিন্তু, অধিকাংশ নারী যৌনাঙ্গ ঘাঁটাঘাঁটির পূর্বে তাহাদের শরীরের নানা স্থানে স্পর্শন ঘর্ষণ, চাপন, চুম্বন প্রভৃতি কামনা করে।

অধিকাংশ সমকামী পুরুষদের যৌনক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্বে পুরুষাঙ্গ দর্শন-প্রদর্শন ও ঘাঁটাঘাঁটি হয়। সমকামী নারীদের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া শরীরের নানা স্থানে উত্তেজনার আদান-প্রদান শুধু চলিতে থাকে।

(৮) **আদি রসাত্মক সিনেমা দর্শনে যৌন সাড়া**—মোট ৫৪১১ জন নারী ও ৩২৩১ জন পুরুষের মধ্যে স্পষ্টভাবে সাড়া জাগিয়াছে—নারী ৯%, পুরুষ ৬%, কতক পরিমাণে জাগিয়াছে নারী ৩৯%, পুরুষ ৩০%, আদৌ জাগে নাই—নারী ৫৩%, পুরুষ ৬৪%।

যে সকল মানসিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে পুরুষদের অপেক্ষা নারীদের নিকট অধিক ফলপ্রসূ, ইহা তাহার মধ্যে একটি।

(৯) **সুরতক্রিয়া দর্শনে**—অধিকাংশ পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য হয়, কিন্তু নারীদের কদাচিৎ। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই দৃশ্যে উদাসীন থাকে।

(১০) **যৌনক্রিয়ার চিত্র দর্শনে যৌন সাড়া**—সকল দেশেই এইরূপ বিস্তর ছবি তৈরী হয়। ইহাদের ক্রেতা ও দর্শক প্রধানত পুরুষরাই।

২২৪২ জন নারী ও ৩৮৬৮ জন পুরুষের মধ্যে উক্ত চিত্র দর্শনে স্পষ্টভাবে সাড়া জাগিয়াছে—নারী ১৪%, পুরুষ ৪২%, অল্পমাত্রায় জাগিয়াছে—নারী ১৮%, পুরুষ ৩৫%, আদৌ জাগে নাই—নারী ৬৮%, পুরুষ ২৩%।

অধিকাংশ পুরুষেরা তাহাদের স্ত্রীদের অথবা প্রণয়ীদের এরূপ চিত্র এই আশায় দেখায় যে, তাহারাও তাহাদের মত উহা দর্শনে আনন্দিত ও উত্তেজিত হইবে। কিন্তু যখন দেখে যে তাহা হইল না, তখন তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। পক্ষান্তরে স্ত্রীরাও বুঝিতে পারে না যে, স্বামী তাহার সহিত যৌন-সম্পর্কে তৃপ্ত, তিনি আবার কেন এরূপ চিত্রদর্শন দ্বারা আরও উত্তেজনা লাভের চেষ্টা করেন। কতক স্ত্রী স্বামীর এরূপ চিত্র রাখা ও দেখাকে অবিশ্বাসের কার্য মনে করেন। কেহ কেহ এই জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের নালিশ পযন্ত করিয়াছে।

(১১) **জন্তুদের মদনলীলা দর্শনে**—স্পষ্টভাবে যৌন-সাড়া জাগিয়াছে—নারী ৫%, পুরুষ ১১%, কতক পরিমাণে জাগিয়াছে—নারী ১১%, পুরুষ ২১%, জাগে নাই—নারী ৮৪%, পুরুষ ৬৮%। গবেষণার পাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৫২৫০ জন ও ৪০৮৩ জন নারী ও পুরুষ।

(১২) **আলোতে সম্ভোগ পছন্দ করা**—২০৪২ জন নারী ও ৭৯৮ পুরুষের মধ্যে আলোতে পছন্দ করেন—নারী ৮%, পুরুষ ২১%, কতকটা আলো পছন্দ করেন—নারী ১১%, পুরুষ ১৯%, অন্ধকারই পছন্দ করেন—নারী ৫৫%, পুরুষ ৩৫%, পছন্দ-অপছন্দ নাই—নারী ২৬%, পুরুষ ২৫%।

এই পার্থক্যের কারণ—পুরুষেরা পারস্পরিক যৌনাঙ্গ ও কামক্রিয়ার দৃশ্য দর্শন-প্রদর্শনে তৃপ্তিলাভ করে এবং আলোতেই তাহা সম্ভব। অধিকাংশ নারী-চরিত্র ইহার বিপরীত।

(১৩) **অপর শ্রেণী সম্বন্ধে চিন্তায় উত্তেজনা**—যে সমস্ত পুরুষ সম্পূর্ণভাবে সমকামী নয় তাহারা প্রায় সকলেই কোন বিশেষ নারী অথবা সাধারণভাবে নারীজাতির সম্বন্ধে চিন্তা দ্বারা উত্তেজিত হয়। কিন্তু প্রায় এক তৃতীয়াংশ নারী কোন পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তায়, এমন কি, তাঁহাদের স্বামী বা প্রণয়ীর চিন্তাতেও উত্তেজিতা হন নাই।

৫১৭২ জন নারী ও ৪২১৪ জন পুরুষের মধ্যে স্পষ্টভাবে যৌন-সাড়া

জাগিয়াছে নারী—নারী ২২%, পুরুষ ৩৭%, কতক পরিমাণে সাড়া জাগিয়াছে—নারী ৪৭%, পুরুষ ৪৭%, আদৌ জাগে নাই—নারী ৩১%, পুরুষ ১৬%।

এই পার্থক্যের কারণ এই যে, নারীগণ অপেক্ষা পুরুষেরা অধিক প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট যৌন অভিজ্ঞতা কামনা করে। এই জন্যই পুরুষেরা সুরতের পূর্বেই (তাহার প্রত্যাশা, কল্পনা ও চিন্তায়) তীব্রভাবে উত্তেজিত হয়।

(১৪) **কাব্য ও উপন্যাসাদি পাঠে উত্তেজনা**—ইহা পাঠ্যবিষয়, ভাষা, আদি ও শৃঙ্গার রসাত্মক বর্ণনা ও দৃশ্যের উপর নির্ভর করে। পাঠক-পাঠিকা অনুকল্পভাবে নায়ক-নায়িকার মনোভাব ও উপভোগের অংশ গ্রহণ করে। উত্তেজনা লাভের ক্ষমতার মাত্রা অনুসারে তাঁহাদের মনে এই লেখার বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। গবেষণায় দেখা যায়—৫৬৯৯ জন নারী ও ৩৯৬২ জন পুরুষের মধ্যে স্পষ্ট সাড়া—নারী ১৬%, পুরুষ ২১%, আংশিক সাড়া—নারী ৪৪%, পুরুষ ৩৮%, আদৌ সাড়া জাগে নাই—নারী ৪০%, পুরুষ ৪১%। এক্ষেত্রে প্রায় সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষ উত্তেজনা লাভ করিয়াছে।

(১৫) **কেবলমাত্র কামোদ্দীপনার জন্য লেখা গল্প, কবিতা প্রভৃতি এবং অঙ্কিত চিত্র**—ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশিত অসংখ্য এই ধরনের লেখার মধ্যে সম্ভবত ২-৩টির অধিক **নারীর লেখা নাই**! পুরুষেরাই নিজ নামে বা নারীর বেনামীতে এ ধরনের লেখা লিখিয়া থাকে। এই সমস্ত লেখার মধ্যে পুরুষের যৌনাঙ্গের ক্রিয়ার বর্ণনা এবং নারীর যৌন-সাড়ার তীব্রতা ও অপূরণীয় বাসনার উজ্জ্বল চিত্র থাকে। পুরুষ লেখক ও পাঠক এতাদৃশ লেখায় যৌনানন্দ লাভ করে।

(১৬) **দেওয়ালে লেখা**—অপেক্ষাকৃত অনেক কম স্ত্রীলোক শৌচগার প্রভৃতি জনসাধারণের অবিগম্য স্থানের দেওয়ালে লিখে এবং তাহার মধ্যে আদি রসাত্মক ও কামোদ্দীপক লেখা খুব কম। আমরা এরূপ কয়েক শত লেখা সংগ্রহ করিয়াছি। **পুরুষদের শৌচাগারে** ৮৬% লেখাই যৌন-বিষয়ক। তাহাদের বিষয়বস্তু প্রধানত (১) নারীর যৌনাঙ্গ (২) যৌনাঙ্গের ক্রিয়া (৩) যৌন-উদ্দীপক অশ্লীল শব্দাবলী। পক্ষান্তরে, **নারীদের শৌচাগারে** অধিকাংশ লেখা প্রেম বিষয়ক, প্রণয়ী-যুগলের নাম অথবা হৃৎপিণ্ডের চিত্র।

(১৭) **কামকল্পনায় চরমানন্দলাভ**—কতক নারী যেমন অধিকাংশ পুরুষের মত পাণিমেহনের সময় প্রণয়ীর মূর্তি চিত্তপটে আঁকে ও কল্পনায় তাহার অঙ্গসুখ ভোগ করে, তেমনি দিবাভাগে শৃঙ্গার রসাত্মক কল্পনায় এতদূর

মগ্ন হইতে পারে যে, শরীরের কোন স্থানে উত্তেজনা প্রদান ব্যতীতই তাহারা চরম তৃপ্তিলাভ করে। পক্ষান্তরে হাজারে একজন পুরুষ শুধু কামচিন্তার ফলেই রেতঃস্খলন করিতে পারে।

(১৮) **যৌন-ব্যাপারের আলোচনা**—করিয়া অধিকাংশ পুরুষ আনন্দ ও উত্তেজনা লাভ করে, কিন্তু গড়পড়তা রমণীদের সেরূপ কিছুই হয় না। এইজন্য পুরুষদের মধ্যে কাম-বিষয়ক আলোচনা করিবার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু নারীর ঐরূপ ইচ্ছা বা আগ্রহ দেখা যায় না।

(১৯) **নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়া উত্তেজনা**—কতক লোক নিষ্ঠুরতা, চাবুক মারা, যন্ত্রণা দেওয়া প্রভৃতির কথা শুনিয়া বা চিন্তা করিয়া যৌন-উত্তেজনা লাভ করে। গবেষণায় প্রকাশ, ২৮৮০ জন নারী ও ১০১৬ জন পুরুষের মধ্যে নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনিয়া স্পষ্টভাবে যৌন-সাড়া লাভ করিয়াছে—নারী ৩%, পুরুষ ১০%, কতকটা সাড়া লাভ করিয়াছে—নারী ৯%, পুরুষ ১২%, মোটেই সাড়া জাগে নাই—নারী ৮৮%, পুরুষ ৭৮%। এই পার্থক্যের কারণ—ঐরূপ কাহিনী শুনিবার ফলে যে মনোভাব হয় তাহা শ্রোতার কল্পনা ও উক্তরূপ ঘটনার সহিত জড়িত থাকার উপর নির্ভর করে।

(২০) **দংশিত হওয়ায় মনের সাড়া**—দংশন ও নির্যাতনে যে সাড়া জাগে তাহার মধ্যে কতকটা শারীরিক, কতকটা মানসিক, কতকটা নির্যাতন ও যৌনতার সম্পর্কের মানসিক যোগসূত্র এবং কতকটা যৌনসাথীর কাছে নতি স্বীকারে সন্তোষ। কামকেলি এবং স্তবতের সময়ে এবং সমকামমূলক আচরণের মধ্যে নির্যাতনের সাড়ার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ যৌনসাথীর নানাস্থানে মৃদু অথবা সজোর দংশনে। প্রায় সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে ইহা দেখা যায়। মনুষ্যের মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তি যতটা মনে করে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যাপক।

গবেষণায় দেখা যায় ২২০০ নারী ও ৫৬৭ পুরুষের মধ্যে স্পষ্টভাবে সাড়া জাগিয়াছে—নারী ২৬%, পুরুষ ২৬%; সামান্য সাড়া জাগিয়াছে—নারী ২৯%, পুরুষ ২৪%; মোটেই সাড়া জাগে নাই—নারী ৪৫%, পুরুষ ৫০%।

যত পুরুষ ও নারী নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়া যৌন-সাড়া দিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ পুরুষ ও চতুর্গুণাধিক নারী দংশিত হওয়ায় যৌন-উত্তেজনা অনুভব করিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, **পুরুষেরা শারীরিক ও**

মানসিক উভয় প্রকার দীপক দ্বারা যৌনভাবে সাড়া দেয়। কিন্তু অধিকাংশ নারী শুধু শারীরিক দীপকেই সাড়া দেয়।

(২১) **যৌন-আচরণের ধারাবাহিকতা**—নারীর যৌন-আচরণ প্রায়শঃ ধারাবাহিকতা বিহীন। এই কথা আত্মরতি, চরমানন্দ আনয়নকারী কামস্বপ্ন, বিবাহ-পূর্ব কামকেলি, বিবাহপূর্ণ সহবাস, বিবাহেতর সঙ্গম এবং সমকামী আচরণ সম্বন্ধে খাটে। কতক নারী যাহাদের কোনও কোনও সময় সমগ্র যৌন-আচরণের পরিমাণ ও সংখ্যা অধিক ছিল তাহাদের হয়ত আবার কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস, অথবা কয়েক বৎসর যাবৎ খুব কম ছিল অথবা কিছুই ছিল না। কিন্তু এরূপ যৌনকর্মহীন সময়ের পরে আবার হয়ত তাদৃশ আচরণ পূর্ববৎ অধিকতর হইতে পারে। পক্ষান্তরে সমস্ত প্রকার যৌনক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়া **পুরুষদের** কদাচিৎ হয়।

(২২) **যৌন-যথেচ্ছাচার বা অজাচার** (Promiscuiaty)। সকলেই মনে করে যে **পুরুষ নারী অপেক্ষা বহুকামী ও বহুগামী।** ইহার কারণ (১) একনিষ্ঠ থাকিবার ক্ষমতা নারীর সমধিক, (২) সে পুরুষ অপেক্ষা ঘর বাঁধিবার এবং সন্তানদের যত্ন করিবার জন্য অধিক দায়ী, এবং (৩) সে সাধারণত তাহার যৌন-আচরণ নীতিসম্মত কিনা এ সম্বন্ধে অধিক বিবেচনাশীল।

পুরুষের অজাচারের ও নারীর অপেক্ষাকৃত সতীত্বের প্রকৃত কারণ (১) পুরুষ তাহার সম্ভাব্য যৌন-অংশীদারকে (অর্থাৎ শয্যাসঙ্গিনীকে) দেখিয়া উত্তেজিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ নারী এরূপ হয় না। (২) পুরুষ স্বীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে, অভ্যাসবশতঃ, পূর্বঘটনার সহিত সম্পর্কিত অবস্থা ও বস্তুসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয় বলিয়া তৎসমূহ দ্বারা উত্তেজিত হয়, অধিকাংশ নারী এরূপ হয় না। (৩) পুরুষ (ক) নূতন ধরনের অভিজ্ঞতার, (খ) নূতন ধরনের যৌন-অংশীদার লাভের, (গ) নূতন নারীর সহিত সম্পর্কে নূতন স্তরের তৃপ্তি-লাভের, (ঘ) সম্ভোগের নূতন নূতন কলাকৌশল পরীক্ষা করিবার সুযোগের (ঙ) ইতিপূর্বে যেরূপ তৃপ্তিলাভ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের তৃপ্তি লাভের আশায় উত্তেজিত হয়। (চ) বিপরীত কাম ও সমকাম এই উভয়বিধ সম্পর্কেই পুরুষ বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন যৌন-অংশীদারের উপভোগ্য অঙ্গের গঠন বৈচিত্র্যের, (ছ) মিলনের বিভিন্ন কলাকৌশলের, (জ) বিভিন্ন অংশীদারদের বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ক্রিয়ার এবং (ঝ) **নূতন নূতন নায়িকাকে নিজ চেষ্টায় জয় করিবার আনন্দের প্রত্যাশায়** বহুকামী ও বহুভোগী হয়।

কিন্তু গড়পড়তা নারীর কাছে ইহাদের মধ্যে কোনও বিষয়ই তাদৃশ গুরুত্বপূর্ণ নহে। অধিকাংশ পুরুষ যে অজাচারী তাহার প্রমাণ এই যে, সে অধিকসংখ্যক প্রণয়িনীর সহিত বিবাহের পূর্বে ও পরে কামকেলি ও সহবাস এবং সমকামী ক্রিয়া করিয়া থাকে। নীচের তালিকা হইতে তাহা দেখা যাইবে।

(২৩) **বিবাহে কামতৃপ্তি সন্ধান**—অধিকাংশ নারী বিবাহ করে ঘর বাঁধিবার জন্য, একজনের সহিত দীর্ঘকাল প্রণয় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং সন্তান লাভ করিয়া যথাসাধ্য তাহাদের সুখ-সুবিধা বিধান করিবার জন্য। অধিকাংশ পুরুষ বিবাহ করে স্ত্রীর সহিত নিয়মিত রমণ-সুখ ভোগ করিবার প্রত্যাশায়।

অংশীদারের সংখ্যা	বিবাহপূর্ব শৃঙ্গার		বিবাহপূর্ব সঙ্গম		সমকামী সংযোগ		বিবাহেতর সঙ্গম	
	নারী%	নর%	নারী%	নর%	নারী%	নর%	নারী%	নর%
১	১০	৬	৫৩	২৭	৫১	৩৫	৪১	২২
২—৫	৩২	২০	৩৪	৩৩	৩৮	৩৫	৪০	৩৪
৬—১০	২৩	১৬	৭	১৭	৭	৮	১১	২৩
১১—২০	১৬	২১	৪	১১	৩	৬	৫	১৪
২১—৩০	৮	১০	১	৪	১	২	১	৫
৩১—৫০	৬	১১	১	৩	—	৩	—	১
৫১—১০০	৪	৮	—	৪	—	৩	২	—
১০০ এর বেশী	১	৮	—	১	—	৮	—	১
গবেষণার পাত্র সংখ্যা	২৪১৫	১২৩৭	১২২০	৯০৬	৫৯১	১৪০২	৫১৪	৮১৭

বিবাহের মূল্য সম্বন্ধে নরনারীর আদর্শের এই পার্থক্যের কারণ এই যে, **নারীর অপেক্ষা পুরুষের নিয়মিত ও ঘন ঘন কামতৃপ্তির আবশ্যকতা।**

সারমর্ম ও নরনারীর তুলনা—(ক) নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। (খ) সে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষেত্রে

অনুকম্পে অপরদের যৌন-অভিজ্ঞতার ভাগ গ্রহণ করে। (গ) তাহার মন অপরদের যৌন-ক্রিয়াকলাপ দেখিলে নারী অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতিসূচক সাড়া দেয়। (ঘ) কোনও বিশেষ ধরনের কামমূলক আচরণের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব নারী অপেক্ষা অধিক। (ঙ) নিজেদের পূর্ব মদনলীলার সম্পৃক্ত বস্তু দেখিয়া, শুনিয়া, ঘ্রাণ বা আস্বাদন করিয়া নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিকতর উদ্দীপিত হয়।

পূর্বোল্লিখিত ব্যাপারগুলির মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি ব্যাপারের দ্বারা নারী পুরুষের সমান সংখ্যক বা পুরুষ অপেক্ষা কিছু অধিক প্রভাবিত হয়। সেগুলি হইল সিনেমার ছবি দেখা, প্রণয়সাহিত্য পাঠ এবং দংশিত হওয়া। কতকগুলি মানসিক ব্যাপারে প্রভাবিত নারীর অনুপাত পুরুষদের প্রায় কাছাকাছি।

পার্থক্যের কারণ—(ক) নরনারীর মানস প্রকৃতিও যৌন-আচরণের এই সকল পার্থক্যের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন কাল হইতেই লোক-সমাজে বিদিত আছে। তাহাদের নানারূপ কারণ অনুমান করা হইয়াছে। যথা—(১) নরনারীর দেহের স্নায়বিক সংস্থানের প্রাচুর্য বা অবস্থানের বিস্তৃতির পার্থক্য। (২) সুরত ক্রিয়ায় নরনারীর বিভিন্ন অংশ। (৩) নরনারীর রতিবাসনার তীব্রতায় পার্থক্য। (৪) তাহাদের প্রকৃতিগত নৈতিক আদর্শ ও ক্ষমতা। (৫) তাহাদের চরমানন্দ লাভ করিবার শারীরিক ব্যবস্থায় মূলগত পার্থক্য।

(খ) **কিন্‌সেদের গবেষণার ফল**—(১) নরনারীর যৌন-সাড়া ও তৃপ্তি সম্বন্ধে শারীরিক ব্যবস্থায় এমন কোনও পার্থক্য নাই যাহা তাহাদের বিভিন্ন প্রকার যৌন-সাড়ার কারণ হইতে পারে। (২) স্পর্শজনিত দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হইবার এবং তাহার ফলে চরম তৃপ্তি লাভ করিবার ক্ষমতা উভয়েরই সমান। (৩) পুরুষ অপেক্ষা নারীর যৌন-সাড়া মন্দগতি নয় যদি যথেষ্টভাবে ক্রমাগত অবিচ্ছিন্নভাবে স্পর্শজনিত দীপক প্রয়োগ করা হয়। (৪) সাধারণ নারীর চরমানন্দের শারীরিক ধরণ এবং তাহা হইতে সে যেরূপ শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি লাভ করে তাহা সাধারণ পুরুষের অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকার নহে। (৫) কিন্তু, সাধারণ নারীর যৌন-ভাব উদ্দীপক ব্যাপারে সাড়া দিবার ক্ষমতা পুরুষ হইতে ভিন্নরূপ।

(৯)

দেশ, কাল, বয়স ও পাত্রভেদে যৌনবোধের পার্থক্য

প্রাদেশিক প্রভাব—মানুষের শরীর ও মনের উপর প্রাদেশিক প্রভাবও সকল দেশের সকল যুগের যৌনবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে প্রভাব মানুষের যৌনপ্রবৃত্তিকে কতটা প্রভাবান্বিত করিয়াছে, সে সম্বন্ধে যৌন-বিজ্ঞানীগণ একমত নহেন। আবার এই প্রাদেশিক প্রভাব নারীপুরুষভেদে কতটা বিভিন্ন, সে সম্বন্ধে কোনও বিশেষ মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া আজও নিরাপদ নহে বলিয়াই মনে হয়।

এ বিষয়ে ভারতীয় যৌনশাস্ত্রকারগণ একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। **বাৎস্যায়ন ও কোকা** পণ্ডিত তদানীন্তন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নারীগণের যৌনবাসনার তীব্রতার একটা পরিমাপ করিয়াছেন। **ইঁহাদের মতে**—পাঞ্জাব, সিন্ধু ও চেনাব প্রদেশের নারীগণের বাসনা অতি প্রবল এবং তাহারা প্রেমক্রীড়ারূপে চিমটি কাটা, আলিঙ্গন ও পুরুষের কোলে উঠা অতিশয় ভালবাসে। ইহারা সাধারণতঃ কোমলাঙ্গী হইয়া থাকে এবং সঙ্গমে পরিতোষ লাভ করিয়া থাকে। দেওগড়ের নারী অতিশয় কোমলাঙ্গী হইয়া থাকে। ইহারা রতি-বিষয়ক বহু কৌশল জানে। বদাউন প্রভৃতি অঞ্চলের নারীরা চতুরা, বাক্‌পটু মিষ্টভাষিণী ও কৌশলপরায়ণা হইয়া থাকে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত অঞ্চলের নারীরা প্রত্যহ অভিনব উপায়ে সঙ্গম করিতে ভালবাসে এবং নিজেরা প্রত্যহ নূতন কৌশল আবিষ্কার করে, কিন্তু তাহারা চিমটি কাটা ও দংশন পছন্দ করে না। উহারা নিজেদের স্তনকে উন্নত ও সুগোল রাখিবার জন্য সযত্নে চেষ্টা করিয়া থাকে। গুজরাটের নারীরা অতিশয় কৌতুকপ্রিয় রমণবিলাসী হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র প্রদেশের নারীরা সাধারণত, (বিশেষত রতিক্রিয়ার সময়ে) অশ্লীল বাক্য উচ্চারণে বিশেষ পটু। পুরুষও তাহাদিগকে অশ্লীল গালি দিক ইহা তাহারা পছন্দ করে। পাটলীপুত্রের নারীগণও অশ্লীল কথা খুব ভালবাসে, কিন্তু মহারাষ্ট্রের নারী-গণের ন্যায় প্রকাশ্যভাবে অশ্লীল কথা বলিতে পারে না, কেবলমাত্র রতি-কার্যের সময় মুখরা হইয়া থাকে। দ্রাবিড় অঞ্চলের নারীগণকে পরিতুষ্ট করা

অতিশয় কঠিন কার্য। বাঁশাবল্লী অঞ্চলের নারীরা মোটেই কামাতুরা নহে, তবে পুরুষ করিতে চাহিলে উহাতে বাধা দেয় না। তাহারা অতিমাত্রায় লজ্জাশীলা বলিয়া বিহারে সকর্মক হয় না। অবন্তী প্রদেশের নারীরা রতি-ক্রিয়ার বহু কৌশল জানে, কিন্তু চুম্বন ও চিমটি কাটা মোটেই পছন্দ করে না। মালব প্রদেশের নারীরা আলিঙ্গন ও চুম্বন খুব বেশী পছন্দ করে। অযোধ্যা প্রদেশের নারীরা অতিশয় কামাতুরা। অঙ্গ প্রদেশের নারীরা অতিশয় কোমলাঙ্গী। ইত্যাদি, ইত্যাদি!

প্রদেশভেদে নারীর যে বিভিন্ন রতিপ্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইল, বহুদিন পূর্বের বলিয়া উহার **ঐতিহাসিক মূল্য** ব্যতীত আর কোনও মূল্য নাই। ঐতিহাসিক মূল্যও যে উহার কতটুকু, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কারণ, **সুবর্ণলতা** প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাচীন পণ্ডিতের অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া বাৎস্যায়ন ঐ সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান প্রণালী কতদূর নির্ভরযোগ্য ছিল, তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব।

ইউরোপীয় যৌনবিজ্ঞানীগণের অনেকে দেশভেদে নারীপুরুষের যৌন-প্রকৃতি লইয়া গবেষণা করিয়াছে। তাঁহাদের পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, বিভিন্ন দেশের নারী পুরুষ, বিশেষত নারীরা, বিভিন্ন উপায়ে রতিক্রিয়া করিতে ভালবাসে। ক্রিয়াপ্রণালী মূলতঃ অভিন্ন হইলেও এক-এক দেশের নারীর প্রকৃতিভেদে তাহা এক-এক দিকে বিকাশ লাভ করে। অধ্যাপক রবার্ট **মিচেল্‌স** তদীয় "সেক্সুয়াল এথিক্‌স্" নামক পুস্তকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নারী-পুরুষের, বিশেষ করিয়া নারীর, যৌনজীবনের গবেষণার ফলের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ঐ সমস্ত দেশের নারীজাতির যৌনপ্রকৃতি সম্বন্ধে মতামত ঐ ঐ দেশের গণিকাদের যৌনপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়াই গঠন করিয়াছেন। বেশ্যাদের যৌনপ্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ দ্বারা গৃহস্থ নারীর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা খুব নিরাপদ না হইলেও উহা দ্বারা যে বিভিন্ন দেশের নারীর রুচি, পছন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ডাঃ ক্রাফট্ এবিং ও হ্যাভলক এলিস্—তাঁহাদের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফলে নারীজীবনের যে সমস্ত বিচিত্র যৌন-বিকল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের নারী বিভিন্ন উপায়ে স্ব স্ব বাসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা কুকুর, বিড়াল, শূকর রাজহাঁস, এমন কি সাপ পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে।

এ সমস্ত তথ্যের মধ্যে কতটা প্রকৃত এবং কতটা জনশ্রুতি তাহা বলা যায় না। এই সমস্ত বিশিষ্ট প্রণালীকে জাতিগত বা আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়া উহাদিগকে দেশবিশেষের নারীজাতির সাধারণ ও সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বলা বোধ হয় ঠিক হইবে না।

যৌনবোধে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

এই সমস্ত গবেষণায় একটা সত্য আমাদের চক্ষে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে—তাহা নারী পুরুষের, বিশেষ করিয়া নারীর যৌনজীবনের উপর পারিপার্শ্বিকতার, বিশেষত **আবহাওয়ার** প্রভাব। অধিকাংশ পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত যে :—

(১) আবহাওয়ার প্রভাবটা এত সুস্পষ্ট যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নারীর ঋতুস্রাব শীতপ্রধান দেশের নারীর অপেক্ষা কম বয়সে হইয়া থাকে,

(২) বংশ ও কায়িক গঠনপ্রণালী যৌনজীবন অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে,

(৩) জীবনযাপনপ্রণালী, আবাসস্থল, সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা যৌন-জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, এবং

(৪) যৌনপ্রকৃতির উপর পিতামাতা ও বংশের প্রভাবও বিদ্যমান।

যৌনবৃত্তির উপর আবহাওয়ার প্রভাব আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গড়ে বালিকাদের ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়সে, নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ১৩ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে, এবং শীতপ্রধান দেশে ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়সে ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়। অর্থাৎ যে দেশের আবহাওয়া যত উষ্ণ, সেই দেশের নারীরা তত অল্প বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জার্মানীর প্লস ও বার্টেল্স (Ploss and Bartels) বিভিন্ন দেশের নারী-জাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে কোন্ দেশে কত বৎসর বয়সে মেয়েদের ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়, তাহা দেখা যায় :

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ		আদ্য ঋতুর বয়স	**শীতপ্রধান দেশ**		আদ্য ঋতুর বয়স
আলজিরিয়ায়	...	৯-১০	ইংলণ্ডে	...	১৫
প্যালেষ্টাইনে	...	১০	ফ্রান্সে	...	১৬
সিরিয়ায়	...	১২	জার্মানীতে	...	১৫
পারস্যে	..	১০-১৪	ল্যাপ্ল্যাণ্ডে	...	১৮
ভারতবর্ষে	...	১২-১৩	কোপেনহেগে	...	১৬
কলিকাতায়	....	১২½	জাপানে	...	১৩-১৪

অনেক পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন, আবহাওয়ায় উষ্ণতাহেতু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীদের শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তিসমূহ অকালে পরিপক্ক হইয়া যায় এবং সেইজন্যই সেখানকার বালক-বালিকাদের মধ্যে যৌনবোধ অতি অল্প বয়সেই জাগ্রত হয়। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিত বাল্যবিবাহ সমর্থন করিয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীগণ একমত নহেন। ডাঃ **কিশ্‌** আবহাওয়ার উষ্ণতাহেতু দেহের পরিপক্কতাকেই ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ **ফোরেল** বলেন, শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদিগকে জীবনধারণের জন্য যতটা কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোককে ততটা পরিশ্রম করিতে হয় না; সেজন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীগণের বাজে চিন্তা করিবার সময় যথেষ্ট। এই কারণেই তাহাদের মধ্যে সকাল সকাল যৌনবোধ পরিস্ফুট হয়। এই দুই মতের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা না গেলেও আমাদের মনে হয়, ডাঃ কিশের মত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব—নরনারীর যৌনবোধ-স্ফুরণে জাতিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ কিশের মতে সেমিটিক নারীর আর্য নারীর অপেক্ষা অনেক অল্প বয়সেই ঋতুস্রাব হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা দৈহিক গঠনের পার্থক্যের উপরই নির্ভর করে।* যে জাতির নারীদের দেহ বলিষ্ঠ ও সুগঠিত, সেই জাতিতেই এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে, স্বাস্থ্যবতী, সুগঠিত, ঘনকৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণলোচন শ্যামাঙ্গীর যত শীঘ্র ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়, স্বাস্থ্যহীন, অপূর্ণদেহ, পিঙ্গলকেশ, কোমলচর্ম, নীলচক্ষুবিশিষ্ট গৌরাঙ্গীর তত সকালে হয় না।

সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাপন-প্রণালীর প্রভাব—যৌনবোধের উপর সামাজিক পরিস্থিতি ও জীবনযাপন-প্রণালীর প্রভাব সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। প্রচুর অবসরভোগী, বিলাসী, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যত অল্প বয়সে ঋতুস্রাব হয়, কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তত সকালে ঋতুস্রাব হয় না। ঠিক এই কারণেই বড় বড় নগরীতে যত অল্পবয়সে নারীর রজোদর্শন হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র শহরে ও পল্লীগ্রামে তত অল্পবয়সে হয় না। বড়লোকের মধ্যে অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা থাকায়, অলস ও বিলাসী জীবনযাপনের এবং যৌনচিন্তার প্রচুর অবসর থাকার দরুনই এইরূপ হইয়া থাকে।

* ইহাকে ৭।৮।৯ বৎসর বয়সের স্তনবতী ইহুদী, আরব ও কুর্দ বালিকা অনেক দেখা যায়।

বংশের প্রভাব—যৌনবোধের উপর পিতামাতার প্রভাবও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যে মাতা সকালে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কন্যাগণও সাধারণতঃ সকালেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়। ইহা সর্বত্র সত্য না হইতে পারে, কিন্তু যৌনবোধের উপর একটা সহজাত প্রভাব বিদ্যমান আছে, ইহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

একজন চিন্তাশীল পাঠক লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "যৌন-জাগরণ ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বয়সে যৌন-জাগবণের কারণ দর্শাইতে গিয়া গ্রন্থকাব ডাঃ কিশ ও ডাঃ ফোরেলের মতামত সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমার মনে হয় উহা ঠিক নহে। এইভাবে পরিবেশ ও পাবিপার্শ্বিকতার প্রভাব অপেক্ষা আবহাওয়ার প্রভাবকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে। উহাতে নিশ্চেষ্টতা আনিয়া সমাজজীবনেব অধোগতিই করিবে। পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও আবহাওয়ার প্রভাব, দুই-ই পরস্পর আপেক্ষিক। বরং আবহাওয়াব প্রভাব অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রভাব অধিক। অনুশীলনের ফলেই অকালে যৌনপরিপক্বতা আসে। একই আবহাওয়ায় মানুষ দুইটি বিভিন্ন সমাজের ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়। যৌনপরিপক্বতা আবহাওয়া, খাদ্যের প্রাচুর্য ও পারিপার্শ্বিকতাব উপর যেমন নির্ভর করে, ততোধিক নির্ভব করে প্রচুর অবসব ও মনের গতি প্রকৃতি ও শিক্ষার উপর। অনুশীলনের ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অনেকে ইঁচড়ে পাকে। চেষ্টাব ফলে এই যৌনবোধের বয়সকে যখন কমানো-বাড়ানো চলে, তখন আবহাওয়াব প্রভাবকে শ্রেষ্ঠত্ব দিই কি করিয়া?

কয়েকটি মেয়ের ৯-১০ বৎসর বয়সে এই প্রবৃত্তি জাগবণ এবং ১৩ বৎসব বয়সে তাহাব বেগ উদ্দাম হইয়াছিল। কয়েকটি ছেলের ১২-১৩ বৎসর বয়সে যৌন-জাগরণের পরিচয় পাওয়া যায়। খবরের কাগজে একটি ১২ বৎসরের বালক একটি ৬-৭ বৎসরের বালিকাব উপর পাশবিক অত্যাচার করায় বেত্র-দণ্ড ও সংশোধনাগাবে প্রেবণের কথা পড়িয়াছিলাম। একটি ছেলের কথা জানি, অধ্যাপকের পুত্র, ধীশক্তিসম্পন্ন—২০-২১ বৎসর বয়সেও যৌনধারণা ক্ষীণ। তাহাকে কোনদিন যৌন-আলোচনা করিতে দেখি নাই বা মুখে যৌন-সমাগমের চিহ্ন বয়স-ফোঁড়া বা অন্য কোন দাগ দেখি নাই। একটি ১৪ বৎসরের ছেলে দেখিয়াছি, ফাজিলের চূড়ান্ত। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি, একটি মেয়ের ৮ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ১০ বৎসর বয়সে সন্তান-সম্ভবা হইয়া সে বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসে। আর একটি মেয়ে ১১ বৎসর বয়সে সন্তান-সম্ভবা

হয়। একটি মেয়ের ১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। তখন তাহার যৌন-ধারণা অস্ফুট। বিবাহরাত্রে স্বামীকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। একই আব-হাওয়ায় এই বিভিন্নতা দেখিয়া আমার মনে হয়, মন আয়ত্ত হইলে আবহাওয়াকে অতিক্রম করা যায়।"

অনেক পাঠকের মনে এইরূপ সমালোচনা উদিত হইতে পারে বলিয়া এখানে পত্রখানি উদ্ধৃত করা হইল। বাস্তবিকপক্ষে শ্রদ্ধেয় পাঠকের উক্তি অনেকাংশে সত্য। তবে আমরা যে প্রভাবের কথা আলোচনা করিতেছি, উহা ব্যাপক ও স্থানবিশেষের সমস্ত নরনারীর **সার্বজনীন প্রবণতার** (tendency) কথা। ব্যক্তিবিশেষে ব্যতিক্রম হইবেই এবং ঐরূপ ব্যতিক্রমের কারণ উল্লিখিত কারণসমূহের এক বা একাধিকের প্রভাব। শীতপ্রধান দেশের মেয়েদের **গড়ের** তুলনায় উষ্ণপ্রধান দেশের মেয়েদের গড়ে সকাল সকাল যৌনবোধের স্ফুরণ সহজেই পরিলক্ষিত হয়। তবে **অন্যান্য কারণের প্রভাবে বা অভাবে** শীতপ্রধান দেশের মেয়েদের মধ্যেও কতক ক্ষেত্রে সকাল এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মেয়েদের মধ্যে কতক ক্ষেত্রে বিলম্বে যৌন-জাগরণ হওয়া বিচিত্র নহে।

তাহা ছাড়া আমরা **স্বভাবজাত যৌনজাগরণের** কথাই বলিতেছি। **সঙ্গদুষ্ট বা প্রচেষ্টা-প্রসূত** অকালপক্কতার কথা স্বতন্ত্র।

উপরোক্ত কারণসমূহে বালিকাগণের মনে একটা **অস্পষ্ট প্রেরণা সকাল সকাল জাগ্রত হইতে পারে বটে, বাহির হইতে কোনও উত্তেজক প্রেরণা** না পাওয়া পর্যন্ত উহা চাপা থাকে। সংসর্গ, মানুষের বা জীবজন্তুর মিলন দর্শন, বায়স্কোপ, থিয়েটার, অশ্লীল ছবি ও গান, কুসঙ্গ প্রভৃতি বহির্জাগতিক ব্যাপারসমূহ বালক-বালিকাগণকে যৌনমিলন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ও ঐ কার্যে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে।

আদ্য ঋতুর বয়সের তারতম্যের কারণ

এই প্রচলিত ধারণা ভুল যে, অসভ্য, বন্য, আদিম অনুন্নত সমাজে অথবা গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে বালিকারা সুসভ্য, অর্ধসভ্য জাতিদের অথবা শীতপ্রধান দেশবাসীদের অপেক্ষা শীঘ্র ঋতুমতী হয়। এই প্রাচীন **ভ্রান্ত ধারণার কারণ** এই যে, (১) আদিম ও অসভ্য জাতির বালিকাদের প্রকৃত বয়স

নির্ণয় করা কঠিন এবং (২) ঐরূপ অনেক অনুন্নত সমাজে আদ্যঋতুর পূর্বেই বিবাহ হইয়া যায়।

অত্যাধুনিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, **প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত সমাজ অপেক্ষা সুসভ্য সমাজে বালক-বালিকাদের বয়োপ্রাপ্তি বা কৈশোর (puberty) শীঘ্রতর আসে।** কারণ—পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা, জীবনযাত্রাব উন্নত উপায ও উপকরণ প্রভৃতির জন্যই দবিদ্র ও অশিক্ষিত সমাজেব অপেক্ষা ধনী ও শিক্ষিত সমাজের বালিকাদের ঋতু পূর্বে আরম্ভ হয়। **ইতরপ্রাণী এবং উদ্ভিদ জগতেও** এই ব্যাপাব দেখা যায়। পশুপালকেরা বহুকাল পূর্ব হইতেই জানে যে, যে সমস্ত জন্তুবা উত্তম আহাব ও যত্ন পায় তাহাবা অযত্নপালিত, অল্প ও কুখাদ্য ভোজীদেব অপেক্ষা শীঘ্র পরিণত হয়। এইরূপ অভিজ্ঞ কৃষকেরাও জানে যে. যে সমস্ত গাছ উত্তম জমিতে জন্মায়, উত্তম সাব, জল ও যত্ন পায় সেগুলি অধিক শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও মুকুলিত হয।

একই দেশের তিন পুরুষের নারীদের আদ্যঋতুর বয়সের তুলনামুলক প্রমাণ--আমেরিকাব সিন্‌সিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মিল্‌স তাঁহাব প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে বর্তমানে পিতামহী মাতামহীদের বয়সী নারীদের ১৫ বৎসব বয়সে অথবা তাহারও পর আদ্যঋতু হইয়াছিল। বর্তমানে মা, মাসী. পিসীদেব প্রায় চতুর্দশ বৎসবে এবং বর্তমানে বিংশ বর্ষীয়াদের প্রায় ত্রয়োদশ বৎসরে হইয়াছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও জনসমাজ সম্বন্ধে লিখিত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, বর্তমানকালে আমেরিকার বালিকাদের বয়োপ্রাপ্তিব বয়স গড়ে ১৩ বৎসব কিন্তু এক পুরুষ আগে ১৪ বৎসর ছিল। জার্মানীতে রক্ষিত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, সেখানে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে (১৭৯৫ সালে) বালিকাদের বয়োপ্রাপ্তি (আদ্যঋতু) প্রায় সার্ধ ষোড়শ বৎসর বয়সে হইত।

ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম—অবশ্য গড়পড়তা ঋতুর বয়স অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ বালিকাদের উক্ত বয়সের অনেক তারতম্য দেখা যায। কোনও কোনও আমেরিকান বালিকা ৯-১০ বৎসরে, কেহ কেহ ১৬ বৎসরে বয়োপ্রাপ্ত হয়।

কারণ—(১) বংশগতি। যে সমস্ত বালিকার মাতা, মাতামহী প্রভৃতির আদ্যঋতু গড়ে যে বয়সে হইয়াছিল, তাহাদেরও প্রায় সে বয়সে হয়। (২) **পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা আবেষ্টনী** বয়োপ্রাপ্তির যে সমস্ত গুণবীজ (gene)

শিশুর মধ্যে থাকে, আবেষ্টনী তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের বিকাশের সুবিধা অথবা অসুবিধা ঘটাইবার ফলে আত্মঋতু শীঘ্র অথবা বিলম্বে হয়।

যৌন-অঙ্গের আকৃতিভেদে যৌনবোধের পার্থক্য

প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে নারীপুরুষের যৌন-অঙ্গের আকৃতির সহিত তাহাদের কামেচ্ছার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোকা পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, স্ত্রী-অঙ্গ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে—বার আঙুল, নয় আঙুল, ছয় আঙুল লম্বা। 'লুয্‌যতন্নেসা'তেও যোনিকে এইভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। পুরুষের লিঙ্গকেও উক্ত পণ্ডিত দৈর্ঘ্য অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে নারীর যোনি বা পুরুষের লিঙ্গ যত লম্বা, তাহার কামভাবও সেই পরিমাণে অধিক বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ছয়-নয়-বার আঙুলের মতবাদকে সম্পূর্ণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া না মানিলেও যৌন-অঙ্গকে হ্রস্ব, মধ্যম ও দীর্ঘ—এই তিন শ্রেণীতে বিনা দ্বিধায় ভাগ করা যাইতে পারে। যাহার অঙ্গ যত দীর্ঘ ও বৃহৎ হইবে, তাহার স্পৃহা তত বেশী হইবে অসম্ভব না হইলেও এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সকল ক্ষেত্রেই সত্য হইবে বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। ক্ষেত্র-বিশেষে হ্রস্ব লিঙ্গ-বিশিষ্ট নর এবং ক্ষুদ্র যোনি নারীও অতীব কামপ্রবণ হইতে পারে।

তবে এই কথা সত্য যে, গভীর অঙ্গ-বিশিষ্টা নারীকে যদি হ্রস্ব-লিঙ্গ-বিশিষ্ট পুরুষের সঙ্গ করিতে হয়, তবে সে মিলনে নারীর সম্যক্ তৃপ্তি হইতে পারে না এবং সে ক্ষেত্রে নারীকে অত্যন্ত অধিক কামাতুর বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে দীর্ঘলিঙ্গ-বিশিষ্ট পুরুষকে যদি হ্রস্বযোনি বিশিষ্টা নারীর সঙ্গে সহবাস করিতে হয়, তদবস্থায় উক্ত পুরুষকে উক্ত নারীর কাছে বিশেষ কামাতুর বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইহা ব্যতীত **জননেন্দ্রিয়ের হ্রস্ব-দীর্ঘতার সহিত কামভাবের অল্পাধিক্যের যে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ আছে তাহা মনে হয় না।**

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকের অভিমত এই যে, নারীর জননেন্দ্রিয়ের

মধ্যে একমাত্র ভগাঙ্কুরই বাসনার পরিমাপক, অর্থাৎ যে নারীর ভগাঙ্কুর যত বড় হইবে, সে নারী তত কামাতুরা হইবে। পক্ষান্তরে বাৎস্যায়ন, কোকা পণ্ডিত প্রভৃতি ভারতীয় যৌনশাস্ত্রকারগণ লিঙ্গের আকৃতি ও যৌনরুচিভেদে পুরুষকে শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব, এবং নারীকে পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

বয়সভেদে নারী-পুরুষের শরীর, মন ও রতি প্রকৃতি

ব্যক্তি, স্থান ও আবহাওয়াভেদে যেমন নারীপুরুষের রতিপ্রকৃতির বিভিন্নতা হইয়া থাকে তেমনই বয়সভেদে একই ব্যক্তির রতিপ্রকৃতির বিভিন্নতা হইয়া থাকে। বয়সভেদে সমস্ত দেশ ও সমস্ত সাহিত্যই মানুষকে শিশু, কিশোর যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ—এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছে। মানব-জীবনের এই পাঁচ অধ্যায়ে মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্নরূপ বিকাশ হইয়া থাকে। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় যৌনবৃত্তিও যে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন পরিমাণে বিকশিত হইয়া থাকে ইহা বলাই বাহুল্য। তবে যৌনবৃত্তির বিকাশ সম্বন্ধে সমস্ত বিশেষজ্ঞ একমত নহেন। আমরা বিতর্কমূলক বিষয়ে অধিক সময়ক্ষেপ না করিয়া অধিকাংশ পণ্ডিতদের গৃহীত মতই এখানে লিপিবদ্ধ করিব।

শৈশবে—প্রসিদ্ধ যৌনবিজ্ঞানবিদ্ হ্যাভলক্ এলিস বলেন যে, শৈশবে মানুষের যৌনবোধ সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। সেইজন্য এই সময়ে যৌনবোধ নিশ্চিতরূপে বিপরীত-লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ হয় না। ডাঃ ম্যাকস্ ডেসার বলেন যে, চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক ও বালিকাদের যৌন-রোগের প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ডাঃ ফ্রয়েড, উইলিয়ম জেম্‌স্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণেরও মোটামুটি এই মত। ইঁহারা বলেন যে, শৈশবে ও কৈশোরে মানুষের যৌনবোধ সাধারণতঃ সমলৈঙ্গিক হইয়া থাকে। ডাঃ হিপের অভিমত এই যে, কোনও প্রাণীই নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র স্ত্রী বা পুরুষ নহে। **সকল স্ত্রীর মধ্যেই কিছুটা পুরুষপ্রকৃতি এবং সকল পুরুষের মধ্যেই কিছুটা স্ত্রীপ্রকৃতি বিদ্যমান।** সেইজন্য বাল্যে পুরুষের মধ্যে পুরুষপ্রকৃতি ও স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রীপ্রকৃতি বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া না উঠা পর্যন্ত উক্ত উভয় প্রকৃতি সমানভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে বলিতেন মানুষের মধ্যে শৈশবে কোন যৌনবোধ থাকে না, সেই মত অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যৌনবোধের স্ফুরণ—শিশুদের লিঙ্গোত্থান সচরাচরই হইয়া থাকে। কিন্তু উহা শুধু দৈহিক, না উহাতে যৌনবোধরূপ মানসিক চৈতন্য বিদ্যমান আছে, সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কারণ, শৈশবে ঐ অবস্থায় কিরূপ মনোভাব হয়, তাহা স্মরণ রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যতদিনের চৈতন্য মানুষের স্মৃতিপটে জাগ্রত আছে, ততদিনকার স্মৃতি হাতড়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, শৈশবে লিঙ্গোদ্রেকের সহিত একটা অব্যক্ত পুলকের অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সকল মানুষের মধ্যেই শৈশবে অল্পবিস্তর যৌনবোধ বিরাজমান থাকে।

অনেক পুরুষেরই স্মরণ থাকিতে পারে যে, শুক্রসঞ্চয়ের পূর্বেও আত্মরতির ফলে একটা পুলক অনুভূত হইত এবং উহার শেষ হইত একটা স্নায়বিক ঝাঁকানি বা বিস্ফোরণের মত হইয়া। তাহা না হইলে শুক্রসম্পন্ন হইবার পূর্বে বালকদের এবং ঋতুমতী হইবার পূর্বে বালিকাদের মধ্যে স্বয়ং-মৈথুনের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শৈশবে যৌনবোধ অনেকখানি বিক্ষিপ্ত থাকে। দেহের দিক দিয়া শিশুর যৌন-অঙ্গ তখনও পরিপুষ্ট হয় নাই, আর মনের দিক দিয়া শিশুর মনের দৃষ্টি তখনও বিপরীতলিঙ্গের প্রতি নিবদ্ধ হয় নাই। কাজেই এই বয়সে বালকের যৌনবোধের স্পষ্টতম বহিঃপ্রকাশ হয় হস্তমৈথুন। বাল্যে আরব্ধ হইলেও ইহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে বাল্য, যৌবন, এমন কি প্রৌঢ়ত্বেও অনেকে এই অভ্যাসের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সাধারণতঃ এই অভ্যাস বাল্যে আবদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধলিঙ্গ সহবাসের সুযোগ পাওয়ার সময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। এই অধ্যায়ে আমাদের এইটুকু মাত্র প্রতিপাদ্য যে, শৈশবে মানুষের যৌনবোধ সর্বপ্রথম আত্মবিকাশ করিয়া থাকে হস্তমৈথুনে।

দ্বিতীয়ত, শৈশবে যৌনবোধ সমকামেও বিকাশলাভ করিয়া থাকে। সমলিঙ্গ দুই ব্যক্তির মধ্যে যৌন-আকর্ষণের নাম **সমকাম** এবং আঙ্গিক ঘর্ষণ ও মর্দনে যৌনবোধ জাগ্রত ও তৃপ্ত করার নাম সমমৈথুন। এ সম্বন্ধেও পরে আলোচনা করিব বলিয়া এখানে উহার উল্লেখমাত্র করিলাম। এই অভ্যাস শৈশব ছাড়াইয়া যৌবনেও গড়াইতে পারে। কিন্তু সাধারণত বিপরীত লিঙ্গের সাহচর্যের সুযোগ লাভের পর এই অভ্যাস থাকে না।

কৈশোরে—শৈশবের পর কৈশোর। বালকের ১৩ ও বালিকার ১১

বৎসর বয়সে ইহা আরম্ভ হয়। এই বয়সে নারীপুরুষ উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত যৌনভাব জাগ্রত হয়। এই বয়সে তাহারা নিজেদের যৌন-অঙ্গসমূহের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরিতে শিখে এবং তাহাদের ও বিপরীতলিঙ্গ ব্যক্তিগণের ঐ সমস্ত অঙ্গের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে। এই পার্থক্যচেতনা হইতে তাহাদের বিশেষত বালকদের প্রাণে বিপরীতলিঙ্গ ব্যক্তিগণের যৌনপ্রদেশসমূহ দর্শন ও স্পর্শনের জন্য একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। যে যে সমাজে নারীপুরুষের অবাধ মিলনের প্রথা আছে, সেই সেই সমাজের কিশোর-কিশোরীরা এই সময়ে যৌন-অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইতে পারে।

বিভিন্ন বয়সে বালক-বালিকার সম্পর্ক—সাধারণতঃ ৭ ৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকারা বালিকা ও বালকদের সঙ্গী হিসাবে সমান চক্ষে দেখে। অর্থাৎ কোন বিশেষ শ্রেণীকে বেশী পছন্দ করে না। প্রায় ৮ বৎসর বয়স হইতে বালক-বালিকারা স্বশ্রেণীর সহিতই খেলাধুলা করিতে ভালবাসে কখনও কখনও অধিক বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তাহাদের আকর্ষণ দেখা যায়। কৌতুকের বিষয় এই যে, বালকেরা কোনও অধিক বয়স্ক ভ্রাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান হয়। কিন্তু বালিকারা সেই মত জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রতি ততটা আকৃষ্ট হয় না। ববং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিই হয়। ১০ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকারা পরস্পরের প্রতি উদাসীন থাকে অথবা শত্রুভাবাপন্ন হয়। এই বিরুদ্ধভাব বালকদের মধ্যে অধিক দেখা যায়। কোন কোন মনঃসমীক্ষক বলেন যে, বাহ্য শত্রুভাব বাস্তব পক্ষে অন্তর্নিহিত উদীয়মান আকর্ষণের বিপরীত মূর্তি, বালক-বালিকারা যত বেশী স্বতন্ত্র হইয়া যায় প্রকৃতপক্ষে তত বেশী তাহারা একত্র হইতে পাবে।

১৩ হইতে ১৪ বৎসর বয়সে বালিকাদের বয়ঃসন্ধি (Puberty) আসে। তখন তাহারা বালকদিগের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ বয়সের বালকেরা বয়োপ্রাপ্ত হয় না এবং বালিকাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতেই চায়।

কৈশোরে দৈহিক পরিবর্তন—কৈশোরে পদার্পণ করিতেই নারীপুরুষের কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তন হয়; এই সময়ে বালকের কণ্ঠস্বরে একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে, তাহার কণ্ঠস্বর মোটা হইয়া যায়, এবং গলদেশে কণ্ঠের অস্থি ঈষৎ বাহির হইয়া পড়ে। স্তনদ্বয়ের বোঁটা উন্নত হয়। মুখে দাড়ি-

গোঁফ গজাইতে আরম্ভ করে। সমস্ত শরীরে বিশেষত মুখে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি দেখা দেয়। সমস্ত অঙ্গ বিশেষত নিতম্ব একটু স্থূল হইয়া পড়ে।

বালিকার শরীরে অধিকতর পরিবর্তন দেখা দেয়। তাহার কণ্ঠস্বরে কোনও পরিবর্তন আসে না বটে, কিন্তু তাহার স্তনমূল শক্ত হইয়া উহা সুডৌল মাংসপিণ্ডের ন্যায় বর্ধিত হইতে থাকে। তাহার নিতম্বযুগল উন্নত ও প্রশস্ত হয়। সমস্ত শরীরের ত্বকে একটা চমৎকার আভা দৃষ্ট হয়। তাহার চক্ষে লজ্জা আসে এবং তাহা হরিণীর চক্ষুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

বালক ও বালিকার এই সমস্ত দৈহিক পরিবর্তনের লক্ষণসমূহ বাহির হইতে দেখা যায়। দৃষ্টির অগোচরে উভয়ের অঙ্গের আরও পরিবর্তন আসে। উভয়ের কামাদ্রিতে ও বগলে কেশ গজাইতে থাকে। নিজ নিজ যৌনপ্রদেশে দৈহিক ও মানসিক বিপুল পরিবর্তনের জোয়ার দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হয় এবং নিজ নিজ যৌনপ্রদেশে একটা অপূর্ব চাঞ্চল্য এবং ভালবাসার পাত্রের বা পাত্রীর আদর ও সোহাগ-স্পর্শে সর্বশরীরে পুলক শিহরণ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্‌সের গবেষণা অনুযায়ী বালিকাদের বস্তিলোম ও স্তন প্রায় একই সময়ে উদ্গত হয়। কিন্তু কতক ক্ষেত্রে বস্তিলোম কিছু পূর্বে। গড়পড়তা আমেরিকার মেয়েদের বস্তিলোম ১২.৩ বৎসর বয়সে ও স্তন ১২.৪ বৎসর বয়সে উদ্গত হয়। গড়ে ইহার সাড়ে আট মাস পরে প্রায় ১৩ বৎসর বয়সে আদ্য ঋতু হয়। আমাদের দেশে সম্পন্ন পরিবারের বালিকাদের ঐরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবারে এই সমস্ত ২-১ বৎসর বিলম্বে হয়।

যৌবনে—বালকেরা ১৮ এবং বালিকারা ১৬ বৎসর বয়সে যৌবনে পদক্ষেপ করে, এবং এই সময়ে কিশোরীরা দৈহিক অন্যান্য পরিবর্তন ব্যতীত যে আর একটি বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া থাকে তাহা হইতেছে মাসিক **ঋতুস্রাব**। যে সকল বালিকা ইতিপূর্বে যৌনজ্ঞান লাভ করে নাই, তাহারা ঋতুস্রাবের সময় হইতে নিজেদের যৌনঅঙ্গসমূহ সম্বন্ধে অস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে থাকে।

যুবক-যুবতীর এই সমস্ত বাহ্য দৈহিক পরিবর্তন পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহারা অপরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে **যুবকদের** মধ্যে শক্তির প্রাচুর্য থাকিলেও এই সময়ে তাহারা সঙ্গমে ততটা সমর্থ হয় না, যতটা হয় যৌবনের মধ্যাহ্নে। বস্তুত শক্তির প্রাচুর্যহেতুই হউক, আর অনভ্যাসের দরুনই হউক যৌবনের প্রারম্ভে

যুবকেরা অতি-ব্যস্ততাবশে প্রায়ই উহাতে কৃতকার্য হয় না। যৌবনের মধ্যভাগে চাঞ্চল্যের অবসানে যখন তাহাদের সকল কার্যে স্থৈর্য আসে, তখনই তাহারা সম্যক্‌রূপে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথম যৌবনে শক্তির প্রাচুর্য হেতু অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্য বা আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা যৌনবোধের তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শারীরিক পরিপুষ্টির সহায়তা করাই যুবকযুবতীর কর্তব্য। **ভবিষ্যতে দাম্পত্য জীবনের সুখ দুঃখের, শান্তি-অশান্তির অনেকখানি এই সময়কার সদাচার অত্যাচারের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।**

যুবক সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, **যুবতী** সম্বন্ধে তাহা অধিকতর প্রযোজ্য। নারীদেহের গঠনবৈশিষ্ট্যহেতু যৌবনের প্রারম্ভে যুবতীরা ভয়, লজ্জার আধিক্য এবং অভিজ্ঞতা ও সুখানুভূতির স্বল্পতাহেতু সঙ্গমে তেমন পটু হইতে পারে না এবং আনন্দলাভ বা আনন্দদান করিতে পারে না। **নারীর প্রকৃত রতিজীবন আরম্ভ হয় কিছুকালের অভিজ্ঞতার পর, এমন কি দুই-একটি সন্তান প্রসব করিবার পর হইতে।** অনেক অনভিজ্ঞ পুরুষের ধারণা যে সন্তান-প্রসবের দ্বারা নারীর যোনিনালী প্রশস্ত হইয়া যাওয়ার ফলে সে তৃপ্তিদায়ক মিলনের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। এ ধারণা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রমাত্মক। নারীর যোনিনালী এমন সঙ্কোচন-প্রসারণশীল তন্তু দ্বারা গঠিত যে, প্রসবের পর প্রায় দেড় মাসের মধ্যে উহা প্রায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সন্তান-প্রসবের দ্বারা ঐ সমস্ত তন্তুর সঙ্কোচন-প্রসারণশীলতা বৃদ্ধি পাইয়া মিলনের অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে।

প্রৌঢ়ত্বে নারী—অনেকের বিশ্বাস, প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিলে নারীর যৌনবোধ ও রতিক্রিয়াশক্তি কমিয়া যায়। এ কথা সত্য নহে। ব্যক্তিভেদে নারীর সৌন্দর্যের ধারণা পৃথক বটে, কিন্তু বহু বিশেষজ্ঞের দৃঢ় অভিমত এই যে, নারীদেহের স্বাস্থ্যের নিয়মপালন, ব্যায়াম, যত্ন ও স্বাভাবিক প্রসাধনের সাহায্যে একটু গোছানো রাখিলেই বুঝা যাইবে নারীর সৌন্দর্য যৌবনের অবসানে প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে অম্লান থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই সময় নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ায় তাহার দেহ একটা ক্ষয়ের হাত হইতে রক্ষা পায়। দ্বিতীয়ত, এই ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ায় নারীকে এই সময় সন্তানধারণের ও প্রসবের ন্যায় একটা বিরাট ঝুঁকি সহ্য করিতে হয় না। কাজেই নারীদেহ এই সময় সকল দিক দিয়া পরিপুষ্ট থাকে। আমাদের দেশে প্রৌঢ় নারী নিজেকে, কিংবা

তাহার স্বামী ও অন্য কেহই তাহাকে যত্নের উপযুক্ত মনে করে না বলিয়াই কতকটা অযত্নে, কতকটা সজ্জার অভাবে শীঘ্রই সে বার্ধক্যের কোঠায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু হ্যাভলক্ এলিস, ডাঃ ফিন্ডিং, ডাঃ হুফ্‌ষ্টেটর প্রভৃতির অভিমত এই যে, প্রৌঢ়ত্বেও নারীদেহ কতক ক্ষেত্রে যৌবন অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও লোভনীয় হইয়া থাকে।

ইহা ত গেল দেহের দিককার কথা। মন ও যৌনবোধের দিক দিয়াও এই কথাই সত্য। প্রৌঢ়ত্বে নারীদেহের সৌন্দর্য যদি বজায় থাকে, তবে সে পুরুষের যৌনবোধকেও নিশ্চয়ই জাগ্রত করিতে পারে। সে নিজেও এই সময় তীব্র-ভাবে রতিবাসনা অনুভব করিতে পারে। চিরকুমারী এবং যাহাদের দাম্পত্য জীবনে রতিসুখ লাভ হয় না তাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে খাটে। প্রৌঢ়ত্বের শেষভাগে ঋতুস্রাব না থাকায় সন্তান-ধারণের ভীতিও তাহার থাকে না। এই নিরাপদ ভীতিহীনতা তাহাকে রতিক্রিয়ায় অধিকতর উৎসাহী ও শক্তিশালিনী করিয়া থাকে। এই কারণেই ৪০ হইতে ৫০ বৎসরের অনেক ইউরোপীয় বিধবাকে পুনর্বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইতে এবং তদভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করিতে দেখা যায়।

ইহার বিপরীতও যে হয় না, তাহা নহে। বরঞ্চ অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীর ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ায় এবং স্বামীর শক্তি হ্রাস হওয়ার পর সত্যকার ভাল-বাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময় উভয়ের মধ্যে কামভাবের প্রাধান্য না থাকায় সে সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস ও লালসাহীন প্রেমে পরিণত হয়। এই সময়েই আমাদের ভারতীয় পবিত্র আদর্শে স্ত্রী স্বামীর সত্যকার সহধর্মিণী হইয়া থাকে। এই সময় ধর্মনৈতিক, সমাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সাধনায় এবং লোকহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে স্বামীস্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করিবার অবসর পায়। পুরুষের দিক হইতে যাহাই হউক না কেন, নারীর দিক হইতে এ কথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত নারী ধর্মে, রাষ্ট্রে, সাহিত্য বা লোকহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ইতিহাসবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিয়াই তাহা করিয়াছেন।

বার্ধক্যে নারীর কাম—প্রৌঢ়ত্বের পরে বার্ধক্য আসে। বার্ধক্যের আগমনে নারীদেহে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এতদ্‌সহ যে মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা আরও আকস্মিক। হঠাৎ নারী একদিন নিজেকে সমস্ত দৈহিক ভোগের অযোগ্য অবস্থায় দর্শন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে এবং কতক

স্থলে নারীর মনে শেষবারের মত যৌনক্ষুধা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বহু চির-কুমারী, বিধবা (বিশেষত সন্তানহীনা), সন্ন্যাসিনী ও মঠবাসিনী নারীকে বৃদ্ধ বয়সে পদস্খলিত হইতে দেখা গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই বা সাধারণতই যে এইরূপ হইয়া থাকে তাহা বলা যায় না। কারণ, বহু সন্তানবতী ও যৌনজীবনে সন্তুষ্ট বৃদ্ধা নিজের বার্ধক্যকে প্রকৃতির দুর্নিবার বিধান বলিয়া প্রশান্ত অন্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অতীত যৌবনেব ক্রটি, বিচ্যুতি ও পদস্খলনের জন্য ধীরভাবে মানসিক প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হয়।

পুরুষের রতিশক্তি—রতিশক্তির দিক হইতে বিচার করিলে পুরুষকে প্রৌঢ় অবস্থাতেই বৃদ্ধ বলা যাইতে পারে। সত্য বটে পুরুষ অধিকাংশ স্থলে শেষ বয়স পর্যন্ত সন্তানোৎপাদনের উপযুক্ত থাকে, কিন্তু সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা এক কথা, রতিশক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। সতেজ ও যথেষ্ট সংখ্যক শুক্রকীট কোন কোন স্থলে অতিবৃদ্ধের শুক্রেও বিদ্যমান থাকে। ইহা কোন প্রকারে উৎপাদিকা-শক্তিসম্পন্ন নারীব যোনিমুখে তাহার ডিম্বস্ফোটনের দিন, তাহার ২-১ দিন আগে অথবা ১ দিন পরে পতিত হইয়া জরায়ুমুখে প্রবেশ করিলেই সন্তানোৎপাদনের সম্ভাবনা হয়। তজ্জন্য বিশেষ রতিশক্তি অর্থাৎ লিঙ্গোত্থান ও কিছুক্ষণ সঙ্গম-ক্ষমতা থাকিবার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং কোনও বৃদ্ধের শুক্রে সন্তানোৎপাদন হইলেই মনে করা উচিত নহে যে, তাহার রতিশক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। ফলতঃ পুরুষ প্রৌঢ়ত্বের মধ্যসীমা অতিক্রম করিবার পর সাধারণতঃ রতিশক্তিতে **আংশিক অসমর্থ** হইয়া পড়ে। অনেক শরীরবিজ্ঞানবিদের মতানুসারে **পঞ্চান্ন বৎসর** বয়সে পুরুষের এই অবস্থা দৃষ্ট হয়। অনেকের আবার মত এই যে, উহার অনেক পুর্বে—চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেই পুরুষের রতিশক্তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে।

বার্ধক্যে পুরুষের কাম—বার্ধক্যে পুরুষ তাহার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহার বাসনার হ্রাস হয় না, বরং রতিশক্তিহীনতা কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার প্রাণে বাসনার **তীব্রতা** বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পুরুষদের মধ্যে যাহারা যৌবনে যথেষ্ট পরিমাণে নারী ভোগ করিয়াছে, কেবল তাহারাই যে বার্ধক্যে রতি-উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহা নহে ; এমনও দেখা গিয়াছে যে, যৌবনে সংযমী, চিরকুমার পুরুষ হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে অত্যধিক মাত্রায় কামোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমার এক ডাক্তার বন্ধু যৌবনেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার প্রেমাস্পদ স্ত্রীকে হারাইয়া ফেলেন। তারপর প্রায় ৫০ বৎসর পর্যন্ত পুনর্বিবাহ

ত করেনই নাই, আর করিবাব মত ইচ্ছাও একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন এইরূপ প্রকাশ করেন। হঠাৎ তাঁহার মত পরিবর্তন হয়—১৩ বৎসরের একটি বালিকার প্রেমে পড়িয়া উহাকে বিবাহ কবিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন! অবশেষে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের চিহ্নবাহী সন্তানও জন্মগ্রহণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষেব বতিশক্তি এই বয়সে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সমস্ত অঙ্গেব শীর্ণতা ও সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লিঙ্গও সেই অনুপাতে ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় তাহারা কিরূপে বর্ধিত বাসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে? হ্যাভলক এলিস, ল্যাপম্যান্ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা এই যে, বর্ধিতকাম বৃদ্ধেরা এই সময় প্রধানতঃ দর্শন, প্রদর্শন ও স্পর্শের দ্বারাই নিজেদের বাসনার তৃপ্তিসাধন করিযা থাকে।

জার্মান বিজ্ঞানী ক্রাফট্ এবিং-এব মত এই যে, বার্ধক্যে এই বর্ধিত যৌন-স্পৃহা অস্বাভাবিক নহে এবং বৃদ্ধদের উপরিলিখিত কার্যাবলীও অস্বাভা-বিকত্বের নিদর্শন নহে। আমাদের বিবেচনায় এগুলি বার্ধক্যের অস্বাভাবিক অবস্থা ছাড়া আর কিছু নহে, এবং কদাচিৎ ঐরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও বার্ধক্যে যৌনস্পৃহা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও সুস্থ দৈহিক ও মানসিক অবস্থায় পুরুষ সে স্পৃহাকে সংযত রাখিতে পারে। অন্ততঃ আমাদের দেশে ঐরূপ কেলেঙ্কারী সচরাচর ঘটিতে দেখা যায় না।

নারীর যৌনতার বিকাশ সম্বন্ধে ডাঃ কিশের মত—ডাঃ কিশ মধ্য ইউরোপের নারীজীবনের যৌনচেতনার ক্রমবিকাশ ও হ্রাসবৃদ্ধির একটি গ্রাফ্ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পণ্ডিতদের গবেষণায় জার্মানী ও পার্শ্ববর্তী দেশ-সমূহের নারীদের দৈহিক পরিণতি ও অবনতির গড় যেভাবে দাঁড়াইয়াছে, পরবর্তী পৃষ্ঠার গ্রাফে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত চিত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বালিকাদের সাবালকত্বের পর হইতে তাহাদের দৈহিক পরিণতি ও যৌনচেতনা দ্রুতবেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। বিবাহের পরে এত দ্রুত না হইলেও অনুরূপ পরিণতি হইতে হইতে প্রায় ৩১-৩২ বৎসর বয়সে উহারা যৌনজীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়। ইহার পর ধীরে ধীরে তাহাদের যৌনজীবনের ক্রমাবনতি প্রকাশ পাইতে থাকে। ৪৬-৪৭ বৎসর বয়স হইতে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের

যৌনচেতনা এবং দৈহিক পরিণতি অতি দ্রুতবেগে হ্রাস পাইতে থাকে। এই স্তর হইতেই নারীর বার্ধক্য আরম্ভ হয়।

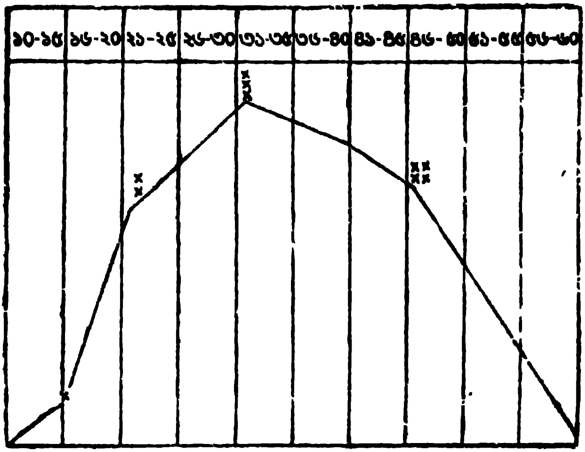

৩০নং চিত্র

× প্রথম ঋতু দর্শন—১৫।১৬ বৎসর।
× × বিবাহ—২১।২২ বৎসর।
× × × যৌনজীবনের সর্বোচ্চ স্তর—৩১।৩২ বৎসর।
× × × × ঋতু বন্ধ হওয়া—৪৬।৪৭ বৎসর।

পাক-ভারতের রমণীদের সম্বন্ধে আমাদের মত—ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত এইরূপ কোন গবেষণা হয় নাই। কারণ, এখানে নির্ভরযোগ্য কোন হিসাব বা সূত্র পাওয়া যায় না। আমাদের মতে এদেশ সম্বন্ধে ঐরূপ বর্ণনা দিতে হইলে উক্ত চিহ্নগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, যথা :—

× —১২-১৩ বৎসরে প্রথম ঋতুদর্শন। × × —১৫-১৬ বৎসরে বিবাহ।

× × × —২৬-২৭ বৎসরে যৌনজীবনের সর্বোচ্চ স্তর।

× × × × —৪২-৪৩ বৎসরে ঋতু বন্ধ হওয়া।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সার্দা আইন প্রচলিত হওয়ায় বিবাহ বয়সের গড় এখন ক্রমে বাড়িতে থাকিবে ধরিয়া লওয়া যায়। বাল্যবিবাহই আমাদের দেশে অকালবার্ধক্যের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ব্যক্তিভেদে যৌনপ্রকৃতির পার্থক্য

দেশগত, জাতিগত ও আবহাওয়াগতভাবে এবং শ্রেণী হিসাবে নারী-পুরুষের মধ্যে যৌনপ্রকৃতির যে পার্থক্য আছে, বিভিন্ন ব্যক্তির ঐ প্রকৃতির

পার্থক্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও তীব্র। পৃথিবীর অধিকাংশ যৌন-বিজ্ঞানী এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ ফোরেল প্রমুখ বলিয়াছেন যে ব্যক্তিগত রতিপ্রকৃতির পার্থক্য **পুরুষ অপেক্ষা নারীজাতির মধ্যে অনেক বেশী।**

ভারতীয় ও আরবীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিস্তৃত ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ইউরোপীয় যৌনবিজ্ঞানীগণের মধ্যে মিডাব এ বিষয়ে গবেষণার সূচনা করেন।

প্রাচীন ভারতীয় মতে নর ও নারীর শ্রেণীবিভাগ

ভারতীয় পণ্ডিতগণ নারীপুরুষের বাসনার তীব্রতা ও অঙ্গের আকৃতিভেদে পুরুষকে শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব এবং নারীকে পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগ তাহাদের সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতির জন্য আমাদের নিকট অবৈজ্ঞানিক মনে হয়। উহার মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণের অনুমানে সত্য নির্ণয় ও তাহা প্রচারের অভ্যাস দেখিতে পাই। অনেক বৈদেশিকের ধারণা শাস্ত্র-পীড়িত প্রাচীন ভারতে মানুষের সমস্ত দোষগুণকে বর্ণ ও শ্রেণীবৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করা হইত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রাচীন ভারতে একেবারে ছিল না। সেই প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কতটা স্বীকৃত হইয়াছিল এই শ্রেণীবিভাগই তাহার প্রমাণ। শ্রেণী, সমাজ ও বর্ণের উর্ধ্বেও যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বহু গুণাগুণের অধিকারী হইতে পারে, এই শ্রেণীবিভাগে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য কোনও কারণে না হইলেও শুধু এই কারণে এই শ্রেণীবিভাগ ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ উপরোক্ত চারি শ্রেণীর পুরুষ ও চারি শ্রেণীর নারীর দৈহিক ও মানসিক বিবরণ দিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণ যদি সত্য বলিয়া ধরিয়াও লওয়া যায়, **তবু এক শ্রেণীর সমস্ত দোষগুণ সেই শ্রেণীর সমস্ত ব্যক্তিতে দেখা যায় না বলিয়া উহাদের মূল্য খুব বেশী নহে।**

চারি প্রকার পুরুষ

শশক—শশকের কামপ্রবৃত্তি খুব কম বলিয়া অনুরূপ পুরুষকে শশক নাম দেওয়া হইয়াছে। সহবাসে শশক এত দুর্বল যে, ঐ কর্মের পর শশক ভূপতিত হয়। সেইরূপ শশকজাতীয় পুরুষ সুরতে খুব অপটু এবং ঐ ক্রিয়াকে

বিশেষ পরিশ্রমের কার্য বলিয়া মনে করে এবং ইহাতে বিরক্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। শশকজাতীয় পুরুষের লিঙ্গ ক্ষুদ্র। এই শ্রেণীরপুরুষ মধ্যমাকৃতি, দেখিতে সুশ্রী, ভগবানে ও গুরুজনে ভক্তিপরায়ণ, দয়ার্দ্রচিত্ত এবং মিষ্টভাষী হইয়া থাকে। তাহারা সর্বদা সাধুসঙ্গে কালযাপন করিয়া থাকে এবং অল্পভোজী হয়।

মৃগ—মৃগ খুব দ্রুতগামী ও কর্মঠ জীব বটে কিন্তু সঙ্গমে ততদূর পটু নহে। সেই জন্য অনুরূপ গুণবিশিষ্ট পুরুষকে মৃগ বলা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর পুরুষের দেহ দীর্ঘায়ত ও সুগঠিত হইয়া থাকে। সে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে হাঁটিয়া থাকে, সর্বদা হাসিমুখে থাকে, ভগবদ্ভক্তি সূচক গান গাহিতে ভালবাসে এবং খুব বেশী খাইতে পারে।

বৃষ—এই শ্রেণীর লোক ষাঁড়ের মত যৌনক্ষুধার্ত। ষাঁড় যেমন রতিবাসনা পূরণের জন্য গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত নহে সেইরূপ বৃষজাতীয় পুরুষ তাহার অভিলষিত নারীর জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। এই জাতীয় পুরুষ বেঁটে, মোটাসোটা। তাহার বক্ষ প্রশস্ত, বাহু পেশীবহুল ও মাথা খুব বড় হয়। তাহার গায়ের চামড়া অতিশয় পুরু, প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও মেজাজ কড়া, জিহ্বা খুব লম্বা। সে খাইতে পারে খুব বেশী। কেবলই মেয়েদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকে।

অশ্ব—এই জাতীয় পুরুষ বিহারে অশ্বের মত শক্তিশালী বলিয়া ইহাদিগকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের অঙ্গ অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ। ইহাদের বর্ণ সাধারণতঃ কৃষ্ণ হয়। ইহাদের কর্ণ দীর্ঘ, শরীর দীর্ঘ ও মোটা, বুক প্রশস্ত, বাহু অতিশয় দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের ঘুম খুব কম হয়। মিথ্যা বলা ইহাদের অভ্যাস। পরনিন্দাতে ইহারা খুব পটু। রতিক্রিয়ায় ইহারা রুচিশীল নহে; যে-কোন প্রকারের নারী হইলেই ইহারা সন্তুষ্ট। ইহারা সাধারণতঃ উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, এক শ্রেণীর সমস্ত গুণ একই ব্যক্তির মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। একই ব্যক্তির মধ্যে আমরা সচরাচর হয়ত মৃগের এক গুণ, শশকের আর এক গুণ, বৃষের অপর গুণ এবং অশ্বের এক গুণ দেখিয়া থাকি। কিংবা একজনের মধ্যে কতক মৃগের, কতক বৃষের—এইরূপে এক শ্রেণীর বেশী, এক শ্রেণীর কম গুণাবলী দেখিয়া থাকি। **তাই এই শ্রেণীবিভাগের বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই।**

চারি প্রকার নারী

পদ্মিনী—পদ্মিনী নারী দেখিতে খুব সুন্দর। তাহার দেহ সুগঠিত, দীর্ঘ। তাহার চক্ষু পদ্মের ন্যায় প্রশস্ত ও দীর্ঘায়ত। তাহার শরীর সর্ষপ কুসুমের ন্যায় কোমল। পদ্মিনী নারীর চর্ম কখনও কৃষ্ণবর্ণ হইবে না। তাহার স্তন সুঠাম, সুগঠিত ও উন্নত। তাহার নাসিকা সুগঠিত ও ঋজু, গলা মধ্যমাকৃতি, ভগ পদ্মের পাপড়িসদৃশ ও সুগন্ধি। তাহার গমনভঙ্গী মরালসদৃশ, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। সে অল্পাহারী। তাহার ঘুম খুব পাতলা। সে খুব বুদ্ধিমতী ও ধর্মপরায়ণা। সে সর্বদা সুরুচিসম্মত মূল্যবান সাদা পোষাক পরিতে ভালবাসে।

চিত্রাণী—চিত্রাণী নারী মধ্যমাকৃতি, ক্ষীণাঙ্গী, দেখিতে অতিশয় সুশ্রী। তাহার গ্রীবা গোলাকার ও সুগঠিত শঙ্খের মত। তাহার ওষ্ঠ সুগঠিত ও ঈষৎ উন্নত। তাহার চক্ষু মৃগচক্ষুর ন্যায় চঞ্চল। তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ তীব্র। তাহার গতিভঙ্গী হস্তীর ন্যায় মন্থর। তাহার পয়োধর পীনোন্নত ও সুগঠিত, নিতম্ব ও ঊরু অতিশয় সুদৃশ্য, কিন্তু পদদ্বয় সরু। তাহার যৌনকেশ অতিশয় পাতলা। তাহার কামাদ্রি ও ভগদেশ মাংসল, গোলাকার। সে স্বভাবত নৃত্যগীতপ্রিয়। সে চুম্বন, আলিঙ্গন, মর্দনাদি শৃঙ্গারক্রিয়ায় অত্যন্ত আসক্ত। বাদ্যযন্ত্র, চিত্র, সুন্দর সুন্দর পোষাক ও সুগন্ধি বিলাসদ্রব্য তাহার অতিশয় প্রিয়। সে সম্ভোগে অতিশয় আসক্ত নহে।

শঙ্খিনী—শঙ্খিনী নারী তন্বী, তাহার মস্তিষ্কে বিপুল কেশরাজি, ললাট প্রশস্ত ও উন্নত। তাহার হস্তদ্বয় দীর্ঘ ও নিতম্ব বৃহদাকার। তাহার স্তনদ্বয় শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত মানানসই নহে—হয় খুব বড়, নয় অতিশয় ক্ষুদ্র তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় উচ্চ ও কর্কশ। তাহার নাসিকা অতিশয় লম্বা। সে লালফুল ও লাল পোষাক অত্যন্ত ভালবাসে। তাহার কামাদ্রি ও ভগদেশ ঈষৎ নিম্নাভিমুখে ঝুলায়মান, ঘন ও মোটা কেশে আবৃত। সে অতিশয় কামুক এবং রতিক্রিয়ার সময় পুরুষকে দংশন করিয়া বা অন্য উপায়ে বিক্ষত করিয়া থাকে।

হস্তিনী—হস্তিনী নারী অতিশয় মোটা ও বেঁটে। তাহার ঘাড় অতিশয় মোটা। পদাঙ্গুলি ঈষৎ বক্রাকৃতি। তাহার নিতম্ব ও ঊরু অতিশয় বৃহৎ ও মাংসল। তাহার চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহা হইতে কামভাব ও লোভ বিচ্ছুরিত

হইতে থাকে। তাহার ঠোঁট মোটা ও কম্পমান। তাহার মাথার কেশ পিঙ্গলবর্ণ। সে স্বভাবত নির্লজ্জ, শরীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢাকিয়া রাখা ব্যাপারে সে ইচ্ছা করিয়াই আলস্যবতী। তাহাব কণ্ঠস্বব কর্কশ ও উচ্চ। সে ঝাল ও টক খাইতে ভালবাসে। তাহার যোনি অতিশয় প্রশস্ত ও গভীর।* তাহার কামাদ্রি সমুন্নত ও ভগপ্রদেশ বিস্তৃত।

শ্রেণীবিভাগে দোষ—উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগে মোটামুটি বহুদর্শন, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আনুমানিক কল্পনাব পরিচয় আছে। কিন্তু এই প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে একটা অবৈজ্ঞানিক দোষ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যৌনবোধের স্বল্পতা আতিশয্যের সঙ্গে চরিত্রগত অন্যান্য দোষগুণকে মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। ভাবতীয় যৌনশাস্ত্রকারগণ যেন এই পূর্বসংস্কার দ্বারা পবিচালিত হইয়াছেন যে, কাম বা বতিশক্তি যেন জঘন্যবৃত্তি, এইগুলি যে পুরুষ বা নারীর মধ্যে বেশী থাকিবে, তাহার মধ্যে অন্য সদ্‌গুণ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত **ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক। যৌনবাসনার স্বল্পতা ও আতিশয্য দ্বারা মানুষের নৈতিক চরিত্র পরিমাপ করা উচিত হইবে না।** বস্তুত শক্তি ও বাসনা কম থাকিলেই মানুষ ধার্মিক হইবে, আর তাহা বেশী থাকিলেই অধার্মিক হইবে, ইহা কোনও কাজেবই কথা নহে। বরং অধিক বতিশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই জগতে অনেক বিষয়ে নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। হজবত মোহাম্মদের শক্তি অসাধাবণ ছিল। ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে নেতৃত্ব কবিয়াছেন এমন বহু লোকেবই অনুরূপ সামর্থ্যেব কথা জানা গিয়াছে।

মিভারের শ্রেণীবিভাগ

রতিপ্রকৃতিভেদে কতকটা ভারতীয় পণ্ডিতগণেব অনুসৃত অনুরূপ নীতিতে নারী জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কবিবার চেষ্টা ইউরোপেও হইয়াছে। যৌনবিজ্ঞানী মিভার মনোবিশ্লেষক নীতিতে নারীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাব মতে নাবীজাতি মোটামুটি দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী সচ্চবিত্রা, ধর্মপরায়ণা, পতিব্রতা ও অল্পে তুষ্টা, ইহাবা সম্ভোগে বিশেষ আগ্রহশীলা বা পটু নহে, স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং সন্তানোৎপাদনের জন্যই ইহারা স্বামী-সহবাস করিয়া থাকে। এই দুই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও

* অনেক দেশে এই কুসংস্কার আছে যে, প্রত্যেক নারীর ভগের কাটল তাহার মুখের দুই ঠোঁটের মিলনাস্থলের মত বড় এবং মুখের হাঁ যত বড় যোনিমুখও তত বড়।

কারণে উহাতে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শন করাকে ইহারা নারীর পক্ষে অশোভন বেহায়াপনা মনে করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর নারীকে মিডার **জরায়ু প্রধান নারী** নামে আখ্যায়িত করিয়াছে।

ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর নারী আছে, যাহারা বিলাসিনী ও সম্ভোগ-প্রিয়া। ইহারা সর্বদা রতিকার্যে লিপ্ত থাকিতে ভালবাসে। নিজেকে পুরুষের চক্ষে মনোহারিণী করিবার জন্য ইহারা সাজ-সজ্জার বিশেষ পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকে। এক শ্রেণীর নারীকে মিডার **ভগাঙ্কুরপ্রধান নারী** নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। মিডারের এই শ্রেণীবিভাগ কতক মনোবিশ্লেষক যৌন-বিজ্ঞানী কর্তৃক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ফরাসী যৌনবিজ্ঞানী লমোনিয়ের (Laumonier) এবং রেনে গাইওঁ (Rene Guyon) মিডারের মতবাদকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। তবে গাইওঁ উক্ত শ্রেণীবিভাগকে নারীজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া পুরুষেরও উপর প্রয়োগের সমর্থন করিয়াছেন।

মিডারের এই শ্রেণীবিভাগ ভারতীয় পণ্ডিতগণের শ্রেণীবিভাগের ন্যায় ততটা সূক্ষ্ম নয় এবং ইহাতেও অনাবশ্যকভাবে বাসনার আধিক্যের সহিত নানা দোষের এবং অল্পতার সহিত নানাসদ্‌গুণের একত্র অবস্থান কল্পনা করা হইয়াছে।

গাইওঁর শ্রেণীবিভাগ

রেনে গাইওঁ মিডারের শ্রেণীবিভাগের অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিয়া পুরুষকেও এই প্রকৃতি অনুসারে যে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, তাহা আজও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন না করিলেও এবং সকল শ্রেণীর যৌনবিজ্ঞানী কর্তৃক গৃহীত না হইলেও, এ-স্থলে উহার উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। গাইওঁ পুরুষকে **শিরাপ্রধান** ও **লিঙ্গপ্রধান** এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। শিরাপ্রধান পুরুষ জরায়ুপ্রধান নারীর ন্যায় অল্পে তুষ্ট। সে রতিক্রিয়ায় খুব বেশী আসক্ত নহে। মাঝে মাঝে কোন প্রকার শুক্রস্খালন করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। সে নিষ্ঠাবান স্বামী, স্নেহময় পিতা, ঘোর সংসারী। আর লিঙ্গপ্রধান পুরুষ ভগাঙ্কুরপ্রধান নারীর ন্যায় অতিশয় রতিকামী। সে এক নারীতে তৃপ্ত নয়, সর্বদা শৃঙ্গার ও ভোগচিন্তায় মগ্ন।

বলা বাহুল্য, ভারতীয় পণ্ডিতগণের শ্রেণীবিভাগে যেমন অনাবশ্যক সূক্ষ্মতা দৃষ্ট হয়, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের শ্রেণীবিভাগে তেমনই অতিরিক্ত মাত্রায় স্থূলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। **উভয় দলই একই ভুল করিয়া বসিয়াছেন এই**

ধরিয়া যে, অল্প সুরতে তুষ্ট নর ও নারী সদ্‌গুণ বিভূষিত, এবং বেশী রতিপ্রিয় লোকেরা বহু দোষের আকর।

নারীর যৌন-বাসনার জোয়ার-ভাঁটা

বাৎস্যায়ন, কোকা পণ্ডিত, কল্যাণমল্ল প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতগণ **নারীর রতিবাসনার উপর চন্দ্রের প্রভাবের** কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ আলোচনা অনেকটা অনুমান ও পূর্বসংস্কারজনিত বলিয়া মনে হয়। পুরাকালের ধারণা ও মতামত হিসাবে ইহা আমাদেব কৌতূহলেব উদ্রেক কবিতে পারে, সেজন্য উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত কবিলাম।

চন্দ্রের প্রভাব

ভাবতীয় ও আববীয় যৌনবিজ্ঞানবিদ্‌দেব অভিমত এই যে, চন্দ্রেব উত্থান-পতনেব সঙ্গে নাবীব যৌনবোধ তাহার শরীবে মাথা হইতে পা পর্যন্ত উঠানামা কবে। শুক্লপক্ষেব প্রথম তিথিতে স্ত্রীলোকেব বাসনা তাহাব দক্ষিণ পা হইতে দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া উত্থিত হইয়া ক্রমে পাযেব পাতা, খোড়া, পা, উরু, জঙ্ঘা, কটি, কোমব, নাভি, স্তন, ঘাড়, চিবুক, গাল, ঠোঁট, চক্ষু ও কপাল ভ্রমণ করিয়া পঞ্চদশ দিবসে মস্তকোপরি আবোহন করিয়া কৃষ্ণপক্ষে ঠিক ঐরূপে বামপার্শ্ব দিয়া আবার পায়ে অবতবণ করিয়া থাকে।

'লয্‌যতন্নিসা' নামক সেকালে বহু প্রচলিত যৌনশাস্ত্রেব মতে নারীর বাসনা চান্দ্রমাসের ১ম দিনে ডান কানে, ২য় দিনে বগলে, ৩য় দিনে বাহুতে, ৪র্থ দিনে পৃষ্ঠে, ৫ম দিনে স্তনে, ৬ষ্ঠ দিনে নাভিতে, ৭ম দিনে বাম কানে, ৮ম দিনে গলায়, ৯ম দিনে ডান উরুতে, ১০ম দিনে দক্ষিণ জানুতে, ১১শ দিনে চিবুকে, ১২শ দিনে বাম কাঁধে, ১৩শ দিনে ডান কাঁধে, ১৪শ দিনে কোমরে, ১৫শ দিনে পায়েব পাতায অবস্থিত থাকে। উভয মতেব পণ্ডিতগণই বলিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট তারিখে বর্ণিত স্থানে চুম্বন, মর্দন, ঘর্ষণ ও লেহন করিলে নারীর কামেচ্ছা উদ্দীপিত হইয়া থাকে। **এই সমস্ত মতবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।**

আরব দেশেও চন্দ্রের উত্থান ও পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে মানুষের যৌনবোধ তীব্র হইয়া উঠে এই ধারণা প্রচলিত ছিল। পূর্ণিমার দুই দিন পূর্ব হইতে ইহা চরমে উঠে বলিয়া মনে করা হইত। এই তিন দিনকে 'আয়াম বীজ' বা 'শুক্র'

দিন' বলা হইত। মানুষের বাসনাকে সংযত রাখিবার জন্য ঐ তিন দিন 'রোজা' (উপবাস) রাখার ইঙ্গিত ও পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

ঠিক এই সময়ে সকল নারীর ঋতুস্রাব হইলে অবশ্য নারীর বাসনার উপর চন্দ্রের প্রভাব আছে কিনা তাহা প্রত্যক্ষত ধরা পড়িত। কিন্তু তাহা হয় না। আবার চান্দ্রমাসের মত প্রায় ২৮ দিন পর কতক নারীর ঋতুস্রাব হইয়া থাকে একথা ঠিক। ইহা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীরা বোধ হয় চন্দ্রের প্রভাবে এই ভাবে প্রভাবান্বিত হইত।*

গার্সন (Gerson) এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, বোধ হয় আমাদের বহু-পূর্বপুরুষেরা দলবদ্ধভাবে থাকিত এবং চন্দ্রালোকের সুবিধা গ্রহণ করিয়া ঘোরাফেরা করিতে করিতে এক দল আর এক দলের সাক্ষাৎ পাইত। এই সময়েই তাই এক দলের পুরুষেরা অন্য দলের নারীদের সঙ্গ-লাভের সুযোগ পাইত। অসভ্য জাতিরা এখনও চন্দ্রালোকে নৃত্য-অভিসারের আয়োজন করে। মালিনোস্কি (Malinowski) নিউগিনির আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই প্রথা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, উহাদের আমোদ-উৎসবের আড়ম্বর বাড়িতে পূর্ণিমার কাছাকাছি সব চেয়ে বেশী হয়।

গার্সনের অভিমত পড়িয়া মনে হয় যে, তাঁহার ধারণা ঋতুস্রাব মানব-জাতির মধ্যেই প্রথম প্রকাশ পায় এবং মানব জাতিতেই উহা সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইদানীং প্রকাশ পাইয়াছে যে, বানর জাতির মধ্যেও উহা মাসে মাসে সূচিত হয়। তাই অভিব্যক্তিবাদের (Evolution) সূত্র অনুসারে আমাদের মানবেতর পূর্বপুরুষের মধ্যেও প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মেরী ষ্টোপ্স এ বিষয়ে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নারীর বাসনার সহিত তাহার ঋতুস্রাবের কোন সংস্রব নাই। তাঁহার গবেষণার ফল এই যে, সমস্ত প্রাণিজগতেই বৎসরের ঋতুবিশেষে

*হ্যাভলক এলিস লিখিয়াছেন: "Bearing in mind the influence exerted on both the habits and the emotions even of animals by the brightness of moon light nights, it is perhaps not extravagant to suppose that, in organisms already ancestrally predisposed to the influence of rhythm in general and of cosmic rhythm in particular, the preodical recurring full moon, not merely by its stimulation of the nervous system, but possibly by the special opportunities waich it gave for the exercise of the sexual functions served to impart a lunar rhythm on menstruation."

যে গর্ভাধান ও প্রজনন কার্য হইয়া থাকে, তাহার অর্থ এই যে, ঐ সময় সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কামনা তীব্র হয়। মানবের মধ্যেও চান্দ্রমাসের সময় বিশেষবাসনা তীব্র হয়। বিভিন্ন নারীতে চান্দ্রমাসের বিভিন্ন কামনা জাগ্রত হইতে পারে, কিন্তু মাসে মাসে নিয়মিতভাবে উহা জাগ্রত হইবেই। ষ্টোপসের মতে প্রত্যেক দুই সপ্তাহ অন্তর নারীর এই বাসনা জাগ্রত হয়। ফলে ২৮ দিনের প্রত্যেক চন্দ্রমাসে প্রত্যেক নারী দুইবার ইহার তীব্রতা অনুভব করে। ক্লেশ ও ক্লান্তি, মানসিক বিপ্লব, বর্তমান সভ্যতা প্রসূত নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্য নানাপ্রকারে নারীপুরুষের বাসনার স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত ও বর্ধিত করিয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে নরনারীর কামনার হ্রাসবৃদ্ধির কারণ বা নিয়ম সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার অসুবিধার কথা মেরী ষ্টোপস্‌ও স্বীকার করিয়াছেন।

অবশ্য মেরী ষ্টোপসের পূর্বেও মার্শাল, সেল্‌হিম, ফন্ ওট্, হ্যাভলক এলিস প্রভৃতি অনেক যৌনতাত্ত্বিক চন্দ্রের সহিত নারীর রতিবাসনার সম্বন্ধ থাকার সম্ভাব্যতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ঋতুস্রাবের সঙ্গে সম্বন্ধ

ঋতুস্রাবের ২-৩ পূর্ব হইতে ঋতুস্রাবের দিন পর্যন্ত এবং ঋতুস্রাবের পরে ৪-৫ দিন নারীর বাসনা তীব্র হয়। ইহাদের মধ্যে মার্শাল আবার তাঁহার Physiology of Reproduction পুস্তকে স্পষ্টই বলিয়াছেন— "The period of most acute sexual feeling is generally just after the close of the menstrual period," অর্থাৎ ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পরের কয়েকদিনই নারীর কামনা সর্বাপেক্ষা তীব্র হয়। এলিস ঋতুস্রাবের **অব্যবহিত পূর্ব ও অব্যবহিত পরের** কয়েক দিনের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ইহারা সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে, নারীর বাসনা ঋতুস্রাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। লণ্ডনের রয়াল-সোসাইটি অব মেডিসিন ১৯১৬'র কার্য বিবরণীতেও এই মতবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের মতে, ঋতুস্রাবের **পূর্ব, মধ্য ও পরের** তীব্রতার কথা ঠিক বলিয়া মনে হয়। এই তথ্য সম্বন্ধে নারীদের নিকট হইতে অভিমত পাওয়া সহজ। কারণ, সাধারণভাবে লক্ষ্য করিলেই তাঁহারা তাঁহাদের অনুভূতি সম্বন্ধে বুঝিতে পারেন।

টারম্যান কামনার বৃদ্ধি সম্পর্কে কয়েকশত নারীকে জিজ্ঞাসা করেন:

"আপনার সাধারণ যৌনকামনা কি ঋতুর পূর্বে বা উহার সময়ে বৃদ্ধি পায়? কয়েকদিন পূর্বে—অব্যবহিত পূর্বে—উহার মধ্যে—অব্যবহিত পরে—কয়েকদিন পরে—দুই ঋতুর মধ্যবর্তীকালে? না, কোনও বৃদ্ধির টের পান না?"

১২২ জন কোন বৃদ্ধিই টের পান না বলেন। ৪৭ জন ঋতুর কয়েকদিন পূর্বে, ৯৫ জন অব্যবহিত পূর্বে, ১৮ জন মধ্যে, ২১৪ জন অব্যবহিত পরে, ৪৮ জন কয়েকদিন পরে এবং ১৬ জন দুই ঋতুর মধ্যবর্তীকালে কামনার বৃদ্ধি টের পান বলিয়া বলেন।

ডাঃ হ্যামিলটন তাঁহাব A Research In Marriage গ্রন্থে বলেন যে, ১০০ জন বিবাহিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি নিম্নমত তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন:

২৫ জন শুধু ঋতুব ঠিক পরেই এবং ১৪ জন শুধু ঋতুর ঠিক আগেই কাম-জোয়ার অনুভব করেন। ২১ জনের ঋতুর ঠিক আগে ও ঠিক পরে এবং ১১ জনের ঋতুর ঠিক আগে, ঠিক পরে এবং ঋতুর সময়েও কাম-জোয়াব অনুভূত হয়। কোনও সময়ে বিশেষ জোয়ার বা ভাঁটা লক্ষ্য করেন নাই মোট ২৯ জন।

১২০০ অবিবাহিতা নারীর (ইহাদের অধিকাংশই ৪ বৎসরের অধিক পুরাতন গ্র্যাজুয়েট) নিকট হইতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত, তাঁহাদের যৌন-জীবন সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর হইতে, ক্যাথারিন ডেভিস্ তাঁহার Factors In The Sex Life of Twenty Two Hundred Women গ্রন্থে নিম্নলিখিত তথ্য সংকলন করিয়াছেন:—

১২০০ অবিবাহিতদের মধ্যে যৌন-আবেগ বা বাসনার অনুভূতি স্বীকার করেন ৮০৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৭ ভাগ। ইহাদের মধ্যে:—

(১) বাসনার নিয়মিত জোয়ার-ভাঁটা (periodicity) লক্ষ্য করিয়াছেন ২৭২ জন অর্থাৎ শতকরা ৩৪ ভাগ। (২) বাসনার অনিয়মিত জোয়ার-ভাঁটা লক্ষ্য করিয়াছেন ২৯৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৩৭ ভাগ। (৩) বাসনার কোন জোয়ার-ভাঁটা লক্ষ্য করেন নাই ২৩৮ জন অর্থাৎ শতকরা ২৯ ভাগ।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাঁহারা বাসনার কোন পর্যায় লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহাদের অনুপাত, ডাঃ হ্যামিল্টন্ ও ক্যাথারিন ডেভিসের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গবেষণার ফল অবিকল একই—অর্থাৎ ২৯%।

ডাক্তার কেনেথ ওয়াকার তাঁহার Physiology of Sex গ্রন্থে (pelican

Series) বলেন যে, ক্যাথারিন ডেভিসের মতে দুই হাজারের অধিক নারীদের **অধিকাংশ ঋতু আরম্ভের দুইদিন পুর্বে ও ঋতুবন্ধ হইবার এক সপ্তাহ পর পর্যন্ত অত্যাধিক কামজোয়ার অনুভব করেন।**

জননেন্দ্রিয়সমূহে একটা পরিবর্তন আসিবার প্রাক্কালে, সমসময়ে এবং পরে খানিকটা অনুভূতির তীব্রতা হওয়াই সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋতুস্রাবের সময়ে নারীর পুরুষ-সংসর্গ কয়েকদিন বন্ধ থাকে বলিয়া **ঋতুস্রাবের পরে** আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাওয়াও আশ্চর্য নয়।

হ্যাভলক্ এলিস মেরী ষ্টোপসের অভিমতের সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কয়েকটি নারীর স্বপ্নদোষ ও হস্তমৈথুনের পর্যায়ক্রম ও পৌনঃপুনিকতা লক্ষ্য করিয়া মেরী ষ্টোপসের অভিমতের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রতি ঋতুমাসে নারীর রতিবাসনার একটা জোয়ার আসে এবং এই জোয়ার **দুইবার** চরমে উঠে।

মেরী ষ্টোপস নিজে নারী। তিনি নারীদের মনোবৃত্তি লইয়া খুবই অনুশীলন করিয়াছেন। তাই তাঁহার কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময়েই সাধারণতঃ ডিম্বস্ফোটন হইয়া থাকে। এইজন্য তখনও কাহারও কাহারও অত্যাধিক কামাবেগ আসিতে পারে।

(১০)

যৌনবোধের উন্মেষ

শৈশবে দৈহিক অনুভূতি

যৌনবিজ্ঞানী, মনোবিশ্লেষক ও শিশুমনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের অনেক বাদ-বিতণ্ডা ও গবেষণার ফলে বর্তমানে ইহা প্রায় **সর্ববাদিসম্মতরূপে** স্বীকৃত হইয়াছে যে, মানুষের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় **যৌনবৃত্তিও** তাহার মধ্যে **শৈশবেই সুপ্ত** থাকে, বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়চেতনার ফলে উহা ক্রমবিকাশ লাভ করে মাত্র। ফ্রয়েড বলেন—In reality the new-born infant brings sexuality with it into the world, sexual sensations accompany it through the days of lactation and childhood, and very few children can fail to experience sexual activities and feeling before the period to puberty." অর্থাৎ সদ্যপ্রসূত সন্তান যৌনবোধ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সে দুগ্ধপান করিবার কালে এবং শৈশবে যৌন-অনুভূতি বোধ করে এবং প্রায় সকল ছেলেমেয়েই বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই যৌন-অনুভূতি লাভ করে এবং ঐ ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

পূর্বে অনেকের মত ছিল, শৈশবে মানুষের মধ্যে যৌনবোধ বিদ্যমান থাকার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, অতি শৈশবেই শিশুকেই স্বীয় জননেন্দ্রিয় লইয়া খেলা করিতে দেখা যায়। ফ্রয়েড ও এলিস শিশুচরিত্রের এই দিকটা উপেক্ষা করেন নাই, তবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অনেক শিশুকে জননেন্দ্রিয় লইয়া খেলা করিতে দেখিয়াই উহাকে যৌনবোধের লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ভুল হইবে; কারণ, অনেক শিশুকে তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা তর্জনী লইয়া খেলা করিতেও দেখা যায়। এ সম্বন্ধে যে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে তাহা এই যে, জননেন্দ্রিয়, হস্তাঙ্গুলি বা পদাঙ্গুলি—এ সমস্তই শিশুর নিকট কৌতূহলোদ্দীপক ক্রীড়নক মাত্র। এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ক্রীড়া করিতে করিতে শিশু ক্রমে একপ্রকার পুলক অনুভব করে। **এই পুলকানুভূতি হইতেই তাহার মানসিক চেতনা সর্বাপেক্ষা পুলকপ্রদ প্রত্যঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয়।** ইহাই যৌনবোধের প্রথম প্রকাশ।

যে সমস্ত অঙ্গের স্পর্শনে বা ঘর্ষণে এই পুলকানুভূতির সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে জননেন্দ্রিয়, মুখ ও গুহ্যদ্বারই প্রধান।

আমরা শিশুকে মাতৃস্তন্যের অভাবে অনেক সময় নিজের হস্তাঙ্গুলি চুষিতে দেখিয়া থাকি। শিশুজীবনে ইহা প্রাত্যহিক ঘটনা। মাতৃস্তন্য পানে শিশুর সর্বপ্রথম পুলকানুভূতি ঘটিয়া থাকে। এই অনুভূতি হইতেই শিশু মায়ের স্তনের অভাবে নিজের হস্তাঙ্গুলি চুষিয়া থাকে। বহু যৌনবিজ্ঞানীর অভিমত এই যে, এই অনুভূতিই শিশুদিগকে পরবর্তী জীবনে আত্মরতি শিক্ষা দিয়া থাকে।

গুহ্যদ্বার সম্বন্ধেও এই কথা। যতদিন মল সবল ও স্বাভাবিক হইতে থাকে, ততদিন শিশু খুবসম্ভব নিজের গুহ্যদ্বারের অস্তিত্বই বুঝিতে পারে না। কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে কিংবা কোনও চর্মরোগের আবির্ভাবে অথবা কৃমির প্রকোপে গুহ্যদ্বারে চুলকানি হইলেই শিশু নিজের গুহ্যদ্বারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার এবং চুলকাইবার পরে সে গুহ্যদ্বারে যে পুলক অনুভব করে, উহাই ক্রমে যৌনানুভূতিতে পর্যবসিত হয়।

বালকশিশুর গুহ্যদ্বারের সম্বন্ধে যে কথা সত্য, বালিকাশিশুর উহা ব্যতীত বৃহদোষ্ঠ, ভগাঙ্কুর, যোনিনালী ও মূত্রনালীর সম্বন্ধেও সেই কথাই সত্য। এই সকল স্থানের সহিত অঙ্গুলি প্রভৃতি ঘর্ষণে যে পুলকানুভূতির সৃষ্টি হয়, উহা হইতেই বালিকা হস্তমৈথুন শিক্ষা করিয়া থাকে। ডাঃ হ্যামিল্টন সুদীর্ঘকালের গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শতকরা ২১ জন পুরুষ ও শতকরা ১৬ জন স্ত্রীলোক শৈশবে মলমূত্র নিষ্কাশনের সময়েই গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয় লইয়া খেলা করিয়া থাকে।

মানসিক অনুভূতির ক্রমবিকাশ

এই সমস্ত দৈহিক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে একটা মানসিক ক্রমবিকাশও লক্ষিত হইয়া থাকে। শিশুমনে এই সময়ে **চুম্বন ও আলিঙ্গন** করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। বিস্ময়ের বিষয় হইলেও ইহা সত্য যে, ভালবাসা আদর-যত্ন ও প্রয়োজন সিদ্ধির মাপকাঠিতে শিশু নিজের প্রিয় ও অপ্রিয়জন নির্ধারিত করিয়া ফেলে।

ফ্রয়েডের বিচিত্র মতবাদ—শিশুর আত্মীয়সম্ভোগ-লিপ্সা

শিশুমনে যৌনচেতনার উন্মেষের একটি প্রধান পথ যে **আত্মীয়সম্ভোগ-লিপ্সা** (Incestuous love), ইহা **ফ্রয়েডের** অভিনব মত। এই মতবাদ

লইয়া ফ্রয়েড একাদিক্রমে অনেক পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শিশুমনে এই আত্মীয়সম্ভোগ-বৃত্তি এত প্রবল ও সুস্পষ্ট যে, বালকশিশু মায়ের প্রতি ও বালিকাশিশু পিতার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে। মালিনোস্কিও ফ্রয়েডের মত সমর্থন করিয়াছেন। ডাঃ হ্যামিল্টন দীর্ঘদিনের গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, শতকরা ১৪ জন বালকশিশুই আত্মীয়সম্ভোগ-বাসনার পরিচয় দিয়া থাকে। ইহার মধ্যে শতকরা ১০ জন মায়ের প্রতি এবং ২৮ জন ভগিনীর প্রতি তীব্র আকর্ষণের পরিচয় দিয়াছে। পক্ষান্তরে আবার ওয়েস্টারমার্কের অভিমত এই যে, অতি ঘনিষ্ঠতার জন্য আত্মীয়সম্ভোগের প্রতি উদাসীনতা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

এলিস এই সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী দুই মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, **আত্মীয়স্বজনের প্রতি শিশুর যে যৌন-আকর্ষণ** হয়, তাহা যে আত্মীয় বলিয়াই হয় তাহা নহে, **তাহাদের ছাড়া অন্য কোন সংসর্গ সে পায় না** বলিয়া। শিশু যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পায়, তাহাদের প্রতিই তাহার ঐরূপ আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এলিসের মতে, বিশেষ করিয়া আত্মীয়সম্ভোগ করিবার বৃত্তি বলিয়া কোনও বৃত্তি নাই ; এ সমস্তই **সংসর্গের** ফল, অন্য কোনও বিশেষ বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ নয়। ফ্রয়েডের মতবাদ সম্বন্ধে আমরা সুদীর্ঘ আলোচনা একটু পরেই করিতেছি।

শৈশবের যৌন-আচরণ

শিশুদের যৌনবোধের স্ফুরণ কখন হয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, **অতি শৈশবেই** কখনও কখনও যৌনতৃপ্তিলাভের চেষ্টা বালক-বালিকাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

জার্মান পণ্ডিত হৈকেল বলেন যে, সাধারণতঃ শিশুরা স্বীয় জননেন্দ্রিয় স্পর্শ বা ঘর্ষণ করে। ইহা ছাড়া উরু বা পদদ্বয়ের সঙ্কোচন হইতেও অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, শিশু আত্মরতির প্রাথমিক পুলক লাভ করিতেছে।

পিতামাতার সঙ্গে এক বিছানায় বা এক ঘরে শয়নকালে পিতামাতার মিলন লক্ষ্য করিয়া শিশুরা নানাভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কাহার মনে বিরক্তি, কাহারও **ঈর্ষা**, কাহারও বা **উত্তেজনা** হইয়া থাকে। শিশুদের **অনুকরণ-প্রিয়তা** আবার উহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে সমবয়সীদের সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার করিতে প্রলুব্ধ করে। শেষোক্তভাবেই ইউরোপ আমেরিকায় "বাপ-মা" এবং

বাংলাদেশে "বৌ বৌ" খেলা করিবার কৌতূহল শিশুরা অনুভব করিয়া থাকে। এই ধরনের খেলা সাধারণতঃ সমবয়সীদের সঙ্গে, এমন কি ভাই-বোন, ভাই-ভাই, বোন-বোনের ক্ষেত্রেও আপোসে হইয়া থাকে।

"বাপ-মা" খেলায় একজন বাবা ও অপরজন মা সাজিয়া পিতামাতার দাম্পত্য ব্যবহারের অনেকটা পুনরাভিনয় করিয়া থাকে। পিতামাতার বা অপর কাহাদেরও যৌন-কার্যবিধি, পশুপক্ষীর মিলনপ্রক্রিয়া বা বয়স্ক ছেলেমেয়েদের উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিয়াই ছেলেমেয়েরা এই অভিনয় করিয়া থাকে। নিছক অনুকরণপ্রিয়তায় প্রণোদিত হইয়া ঐরূপ করিলেও পুলকলাভে সমর্থ হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহারা আরও ঘনিষ্ঠতর কার্যকলাপে ব্রতী হইতে পারে।

ডাঃ গ্রাসেল বলেন: "ছেলেমেয়েদের যৌনজীবন পাড়াগাঁয়ে খুব সকাল সকালই আরম্ভ হয়, সাধারণতঃ বৎসর তিনেকের সময় হইতে। এক জোড়া পক্ষীর দৈহিক মিলন ছেলেমেয়েদের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া বসিতে পারে। কুকুর, গরু ইত্যাদির মিলনের উদাহরণ উহাদের আরও প্ররোচিত করে। ইহার উপরে স্নানের বা অন্য সময়ে খেলার সাথীর বা ছোট বোনের উলঙ্গ শরীর দর্শন উহাদের আরও চিন্তার ও উত্তেজনার কারণ হয়। পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়েরা, তাহা ভদ্র পরিবারের হইলেও তিন-চার বৎসর বয়সেই অনেক সময় দেখা যায় 'বাপ-মা' খেলা করিয়া থাকে।

লিপম্যান আর একটি ছাত্রের উক্তি হইতে উদ্ধৃত করেন:

"আমরা পাঁচ ভাইবোন ছিলাম। বোনটিই সকলের ছোট। আমি দ্বিতীয় সন্তান। আমার বড় ভাই আমার দুই বৎসরের বড় ছিলেন। আমরা এই দুই ভাই শৈশবে প্রায় স্বাধীনভাবেই বাড়িয়া উঠি। মায়ের সময় অপর তিন জনের দেখাশুনা করিতেই কাটিয়া যাইত। আমার নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কোনও শাসনাধীনে থাকিতে হইত না। কেবল সন্ধ্যা ৮টার পূর্বে বাড়ী ফিরিলেই হইত। রবিবারে সারাদিন রাস্তাঘাটে খেলা করিয়া রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বাহিরে থাকিতে পারিতাম।

"আমার চার বৎসর বয়সে প্রথম যৌন-অভিজ্ঞতার সুযোগ লাভ করি। বড় ভাই তখন ছয় বৎসরের। তিনি প্রতিবেশিনী একটি ছয় বৎসর বয়স্কা মেয়ের যৌন-অঙ্গসমূহ স্পর্শ করিতেন। এইরূপ কার্যকলাপ অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যেও খুবই প্রচলিত ছিল। আমরা ইহাকে "বাবা-মা" খেলা বলিতাম। ঐ

মেয়েটির ইহাতে সম্মতি ছিল—এমন কি উহাব যেন সুখবোধ হইত বলিয়াই আমাদের মনে হইত।

"ব্যাপারটি এক সন্ধ্যায় মেয়েটির মাতাব দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ সে নিজের ফ্রকের বোতাম খুলিতে বা বন্ধ কবিতে পারিত না। মেয়েটির মাতা সন্দেহ করিয়া উহার কাছে অনুসন্ধান করেন এবং ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া আমাদেব মায়েব নিকট আসিয়া নালিশ কবেন। আমাদের প্রচণ্ড শাস্তি দেওয়া হয়। ইহাতে আমরা মেয়েটির উপর খুব বাগান্বিত হই। ইহার পরে আমাব বড ভাই অন্যান্য মেয়ের সঙ্গে ঐরূপ খেলা করিতে থাকেন এবং মাত্র চৌদ্দ কি পনব বৎসর বয়সে প্রকৃত যৌনক্রিয়া সম্পাদন কবেন।

"আমাদেব মাতাপিতা এ সম্পর্কে জানিতে পাবিলেই আমাদেব খুব শাস্তি দিতেন। কিন্তু ব্যাপারটি বন্ধ হইল না। আমি শাস্তিব ভয়ে ঐ কার্য হইতে বিরত হইলাম। উহাতে আমাদের স্পর্শসুখ ছাডা আব কোন উদ্দেশ্য ছিল না —অঙ্গুলীতে খুব আরাম বোধ কবিতাম। অন্যেবাও এই রকম প্রায়ই কবে বলিয়া আমরাও করিতাম।

"আমি বলিতে বাধ্য যে, এই রকম যৌনখেলা পাড়াগাঁয়ে খুবই প্রচলিত। কয়েকদিন পূর্বে আমি একজন সাত বৎসরের ছেলে ও পাঁচ বৎসরেব মেয়েকে গুদামের সিঁড়িতে ঐরূপ কবিতে দেখি। আমি জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা বলে তাহারা শুধু খেলা করিতেছে। এইরূপ করা অন্যায় এবং তাহাদের পিতামাতা জানিলে ভয়ানক শাস্তি দিবেন—আমি এই কথা বলিলে ছেলেটি খুব সাহসেব সঙ্গে উত্তর দেয় যে, তাহার পিতা ইহাব জন্য কিছু মনে করিতে পারেন না, কারণ তিনি নিজে তাহার মাতার সহিত ঐরূপ কবেন। তাহার পিতা একজন শ্রমিক ও কডা লোক, আমার মনে হয় না যে তিনি ছেলেটিব সম্মুখে অত খোলাখুলিভাবে দাম্পত্য ব্যবহার করেন।"

সাধারণতঃ ইহাতে যৌনবোধ বা ভালবাসা না থাকিলেও অনেকক্ষেত্রে কামভাব বা প্রেমের স্ফুরণ হইতে দেখা যায়। বালসুলভ প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে সাধারণতঃ আলিঙ্গন, চুম্বন, পরস্পবের কাছাকাছি বসা, প্রেমসম্ভাষণ, কোলে রাখা, বিরহে কাতরতা, উপহার আদানপ্রদান ইত্যাদির ভিতর দিয়া। মেয়েরা বরং ছেলেদের চেয়ে এ সব বিষয়ে অগ্রগামী হয়, কিন্তু ৭-৮ বৎসর বয়স পার হইলেই তাহাদের মধ্যে ধরা পড়ার ভয় ও গোপনতার আগ্রহ আসিয়া পড়ে।

কলেজের একটি সতর বৎসরের ছেলে অকপটে যে বিবৃতি দিয়াছে তাহা খুব শিক্ষাপ্রদ। আমি ছেলেটিব নাম দিলাম সুকুমার। পাঠক-পাঠিকার স্মরণ রাখিতে সুবিধা হইবে। সে লিখিয়াছে :

"এখন আমার বয়স ১৭ বৎসর, আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। যখন আমার বয়স ১০ বৎসব, তখন একদিন কোন এক উপায়ে (এখন মনে নাই) হস্তমৈথুন শিক্ষা করি। তখন আমাব বীর্য নির্গত হইত না, কিন্তু বেশ পুলক অনুভব করিতাম। প্রথম প্রথম প্রত্যহই এইরূপ কবিতাম। তার মাস খানেক পব হইতে আমাব এ অভ্যাস আপনিই প্রশমিত হইতে লাগিল। তখন কোন সপ্তাহে দুইদিন বা একদিনই যথেষ্ট ছিল। **তখন কিন্তু যৌনব্যাপার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না।**

"বৎসর খানেক পরে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলাম। সম্ভবত তাহা স্কুলেব সহপাঠীদের কথোপকথনে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তখন একরূপ উদাসীন ছিলাম।

"ইহার দুইমাস পরে আমি আমাব মাতুলালয়ে যাই। আমার নিজেব কোন ভাই বা ভগ্নী নাই। আমাব তিনজন মামাত বোন (প্রায় আমার সমবয়সী) আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। আমরা প্রত্যহ দ্বিপ্রহবে 'স্বামী-স্ত্রী' খেলা কবিতাম। এইরূপ কয়েকদিন কবার পর আমাব মন তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বলিতে পাবিতাম না।

"আবও কযেকদিন পবে দুপুরে বাড়ীব সকলে ঘুমাইলে আমার ভগ্নী তিনজনেব একজন আমাকে সহবাসে প্রবোচিত করে। প্রথমত খেলার ছলে তাহারা বলে, 'রাত হয়েছে, শোবে চল'। অতঃপর সকলে শুইলে একজন আমাকে যৌনকার্যে লিপ্ত হইতে বলে। আমিও বিনা দ্বিধায় তাহা সম্পাদন করি। এইরূপে একাদিক্রমে তিনজনের সঙ্গে আমাকে এইরূপ করিতে হয়। এইরূপ প্রত্যহই কবিতাম। তাহারা বিশেষ আনন্দবোধ করিত, কিন্তু আমাব মানসিক অবস্থা তন্মুহূর্তের জন্য অত্যন্ত খারাপ হইত। আবার ঠিক হইয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে আমার শারীরিক কোন অনিষ্ট হয় নাই। তখন আমার বীর্য নির্গত হইত কিনা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তার তিনমাস পবেও হস্তমৈথুনে বীর্য নির্গত হইত না। এখন বুঝিতে পারিতেছি না উপগত হইলে কিরূপে পুলক লাভ হইত।"

ইহা হইতে বুঝা উচিত যে, ছেলেদের ও মেয়েদের গুরুজনের অসাক্ষাতে

একত্রে খেলা করিতে দিলে শৈশবসুলভ নিঃসঙ্কোচভাবে তাহারা যৌনখেলায় ব্রতী হইতে পারে। বিশেষ করিয়া অসাবধান পিতামাতা উহাদের দেখিবার সুযোগ দিয়া দাম্পত্য ব্যবহার করিলে উহারা অনুরূপ কার্যে প্রেরণা পাইয়া থাকে। **যত ছোটই হউক না কেন, ছেলেমেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন বিছানায় শুইবার ব্যবস্থা করা উচিত।**

অল্পবয়সে সাধারণতঃ যৌন-অঙ্গসমূহে উত্তেজনা তত অধিক হয় না, যতটা হয় মনে ও স্নায়ুমণ্ডলে। তৃপ্তিও আবার হইয়া থাকে বেশীর ভাগে **মানসিক ও স্নায়বিক।**

হ্যাভলক্ এলিস **যৌনবৃত্তির স্বতঃস্ফুরণ শীর্ষক** আলোচনায় বহু তথ্য আহরণ করিয়াছেন। অন্যান্য বহু যৌনতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতও এই রহস্যময় ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যৌন-উত্তেজনা—শৈশবে

পূর্বকার যৌনবিজ্ঞানীদের, বিশেষ করিয়া, ফ্রয়েডের মতবাদে শিশুদের যৌন-চেতনা ও তৃপ্তি সম্বন্ধে উক্তি সাধারণ লোকেরা যে সন্দেহের চোখে দেখিত ডঃ কিন্‌সে ও তাঁহার সহকর্মীদের তথ্যানুসন্ধানের ফলে সে সন্দেহের অবসান ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মূল্যবান দুইটি গবেষণা-পুস্তকেই (Sexual Behaviour In The Human Male ও Sexual Behaviour In The Human Female) শৈশবে যৌন-চেতনা ও তৃপ্তির প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া ইঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতিটি শিশুই দৈহিক কতগুলি অনুভূতিশীলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাই জন্মের পর হইতেই সংস্পর্শ, শব্দ, আলো, উত্তাপ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক শিশুতেই দেখা যায়। এই সকল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যৌন-উদ্দীপনাও এক প্রকার।

যৌন-উদ্দীপিত মানবে দৈহিক ও মানসিক যে সকল পরিবর্তন দেখা যায় সে সম্পর্কে আমরা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই হইবে যে যৌন-উদ্দীপিত মানবের শরীরে ও মনে যে সকল অনুভূতি দেখা যায় তাহার প্রায় সকলগুলিই শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায়। **যৌনবোধের উন্মেষ, সুখানুভূতি, উত্তেজনা ও পরিশেষে তৃপ্তি পর্যায়ক্রমে শিশুদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়**

কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের মধ্যে যে রকম অনুভূতিশীলতার ব্যতিক্রম দেখা যায়, শিশুদের মধ্যেও অনেকটা সেইরকম। কোনও কোনও শিশু (উভয় লিঙ্গেরই) খুব দ্রুত উত্তেজিত হয়, কোনও কোনও শিশুর হয় ধীরে। বালকদের অবশ্য শুক্র না থাকায় স্খলন হয় না কিন্তু বালক-বালিকার উভয়েরই উত্তেজনা চরমে উঠিয়া সহসা স্তিমিত হয়।

ডঃ কিন্‌সে ও তাহার সহকর্মীদের অনুসন্ধানে মাত্র কয়েকমাসের শিশুদেরও যৌন-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং কতক বয়স্ক নর ও নারী অকপটে ৩-৪ বৎসর বয়সে তাহাদের যৌন-চেতনার কথা স্বীকার করিয়াছেন।

এইরূপ অনুভূতি শিশু নিজেই উপলব্ধি করিতে পারে আবার বয়স্কদের দেখাদেখি বা হাতে-কলমে শিক্ষার দরুনও হইতে পারে। যেভাবেই হউক এইরূপ আনন্দানুভূতিই আস্তে আস্তে যৌন-অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

আমার একাধিক বন্ধু ছোটকালে কোলে উঠিয়া অপরের শরীরের সংস্পর্শে যৌন-চেতনা বোধ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করেন, কেহ কেহ আবার অপরের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পুলকলাভ করিয়াছিলেন।*

যৌনবোধের প্রকাশ

শৈশব হইতে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত নর ও নারীর যৌনবোধের প্রকাশ নানা-ভাবে হয়, ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান :

(১) হস্তমৈথুন, (২) স্বপ্নদোষ, (৩) বিপরীতলিঙ্গের সহিত ক্রীড়া কৌতুক শৃঙ্গারাদি, (৪) রতিক্রিয়া, (৫) সমলৈঙ্গিক যৌনক্রিয়া, (৬) পশু মৈথুন। এই সকল প্রক্রিয়ায় উত্তেজনার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ঘটে। ইহা ছাড়া শুধু খানিকটা উত্তেজনা বহু প্রকারেই সাধিত হইয়া থাকে।

এই কয় প্রকারের এক বা একাধিক প্রধান উপায়ে নর ও নারী যৌন-আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। সময়, সুযোগ, রুচি ও পাত্রভেদে—উপায়ের ব্যতিক্রম হয়। কখনও কখনও একই ব্যক্তি একই প্রকারের উপায়ের পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অভিনবত্বের দরুন অন্য বা অন্যান্য উপায়ে আনন্দলাভ করিয়া থাকে।

---

*ডঃ কিন্‌সের অনুসন্ধানের ফল :In pre-adolescent and early adolescent boys, erection and orgasm are easily aroused. They are more easily aroused than in older males. Erection may occur immediately after birth, and, as many observant mothers (and few scientist) know, it is practically a daily matter for all small boys, from earliest infancy and up in age (Halverson 1940). Slight physical stimulaiton of the genitalia, general body tensions, and generalised emotional situations bring immediate erection, even when there is no specifically sexual situation involved"

(১১)

যৌনবোধের বিভিন্নমুখী প্রকাশ (১)

স্বয়ংমৈথুন (Auto-eroticism)

হ্যাভলক্ এলিস 'Auto-eroticism' নামে যে অভিব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহাকে **স্বয়ংমৈথুন** বলিব। তিনি বলেন, **"অপর কাহারও অবর্তমানে বা সমবায় ব্যতিরেকে যৌনবৃত্তি জাগ্রত, উত্তেজিত ও চরিতার্থ করাকে আমি স্বয়ংমৈথুন বলিব।"**

কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বয়ংমৈথুনের প্রক্রিয়াগুলি বালক-বালিকারা সহজাত বুদ্ধিবলে আবিষ্কার করিয়া ফেলে, অপরের প্ররোচনা ব্যতিরেকে নিজ হইতেই এই সমস্ত পুলকের ধারা তাহারা বাহির করিয়া লয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সংসর্গ হইতেই শেখে।

মানুষের মধ্যেই যে স্বয়ংমৈথুন বা উহার প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ তাহা নহে। ইতর প্রাণীর মধ্যেও উহার প্রচলন দেখা যায়। অবশ্য বন্য পশু লক্ষ্য করিবার সুযোগ দেয় না। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ঘোড়া নিজের পেটের উপর জননেন্দ্রিয় ঘর্ষণ করিয়া রেতঃস্খলন করে, ষাঁড় ও পাঁঠা পাছা উঁচু বা নিচু করিয়া সামনের পায়ের সহায়তায় বীর্যপাত করে। এমন কি পাঁঠা নিজের মুখে লিঙ্গ রাখিয়া তৃপ্তি পায়। হরিণ উত্তেজনার মুহূর্তে গাছের গায়ে ঘর্ষণ করিয়া উহা প্রশমিত করে। হাতী পিছনের পা দুখানির মধ্যে চাপিয়া নিবৃত্তি লাভ করে। পুরুষ বানরেরা দস্তুরমত মানুষের মত হস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে।

মানুষের মধ্যে সভ্য, অসভ্য, বন্য বা আদিম সকল জাতির সকল স্তরের মধ্যেই স্বয়ংমৈথুন দেখা যায়। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে হস্তমৈথুন সম্বন্ধে কোন লজ্জার ভাব পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ইহা খোলাখুলিভাবে প্রচলিত ছিল, মেয়েদের মধ্যে ইহা ছাড়া কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ-ব্যবহারের প্রথা ছিল। বলীদ্বীপেও ঐরূপ প্রথা দেখা গিয়াছে; সেখানে মোমের কৃত্রিম লিঙ্গের প্রচলন আছে, বস্তুত পৃথিবীর সর্বত্রই স্বয়ংমৈথুন দেখা যায়। অবশ্য সুসভ্য সমাজে মানুষ স্বাভাবিক যৌনলালসা চরিতার্থতায় নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া উহার প্রকোপ আরও প্রকট। তবে গোপন চর্চা ছাড়া উপায় নাই।

হস্তমৈথুন (Masturbation)

শিশুর যৌনচেতনা দৈহিক ক্রিয়ার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে হস্তমৈথুনে। হস্তের সাহায্যে যৌনবৃত্তি জাগ্রত ও পরিতৃপ্ত করার নাম হস্তমৈথুন। সাধারণভাবে হস্তের সাহায্যে যে-কোনও উপায়ে যৌনানন্দলাভ করাকেই হস্তমৈথুন বলা যাইতে পারে।

বালক-বালিকাদের মধ্যে অতি অল্পবয়সেই এই অভ্যাস দেখা দিয়া থাকে। ডাঃ গানিয়ার এ বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়া বহু তথ্য যোগাড় করিয়াছেন। এক বৎসর বয়সের শিশুকেও তিনি হস্তমৈথুন করিতে দেখিয়াছেন। ডাঃ গানিয়ারের পরে ডাঃ ফ্রয়েডও এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তবে তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ শিশুদের তিন বৎসর বয়সে লিঙ্গোদ্রেক হইয়া থাকে এবং ঐ সময় হইতেই তাহারা ইহা আরম্ভ করে। বেনে গাইওঁ-ও এই মতের সমর্থক।

বালকের পক্ষে ইহাতে হাতের যতটা প্রয়োজনীয়তা আছে, বালিকার পক্ষে ততটা নাই। তবু বালিকারা কামাদ্রি, ভগদেশ, ক্ষুদ্রোষ্ঠ ও ভগাঙ্কুর মর্দন করিতে হাতের ব্যবহার করিয়া থাকে। হস্তের সাহায্য ব্যতিরেকেও বালক ও বালিকারা অনেক উপায়ে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। বালকদের পক্ষে ছিদ্র করা বালিশ, পাঁউরুটি, রবারের টিউব বা অন্য যে-কোন প্রকার জিনিসের ছিদ্রে অঙ্গ প্রবেশ করাইয়া এবং বালিকাদের পক্ষে চেয়ার বা দেরাজের হাতল টেবিলের কোণ ইত্যাদিতে ভগদেশ ঘর্ষণ করিয়া কিংবা কলা, শশা, বেগুন, কাঁচের শিশি বা টিউব, মোমবাতি, পেন্সিল ইত্যাদি যে কোন সহজলভ্য জিনিস যোনিপথে বা যোনিমুখে প্রবেশ করাইয়া যৌনতৃপ্তি লাভ করা সাধারণ ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত উরুদ্বয়ের ফাঁকে লিঙ্গকে সজোরে চাপিয়া শুক্রস্খলন বা উহার চেষ্টা করা বালকদের পক্ষে এবং কেবলমাত্র উরুদ্বয়ের ঘর্ষণে তৃপ্তিলাভ করা বালিকাদের পক্ষে অতীব সহজসাধ্য। এইগুলিতে বিশেষ করিয়া হাতেরও কোন প্রয়োজন নাই। যে উপায়েই বালক-বালিকাদের এই জ্ঞানলাভ হউক না কেন এই অভ্যাস তাহাদের মধ্যে একরূপ সার্বজনীন।

ডাঃ ক্যাথারিন ডেভিস পাশ্চাত্য বালিকাদের স্বয়ংমৈথুন-ব্যাপারে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার Factors In The Sex Life of Twenty Two Hundred Women গ্রন্থে ১২০০ অবিবাহিতা ও ১০০০ বিবাহিতা নারীর লিখিত উত্তর হইতে এই বিষয়ে বিবিধ ও বিচিত্র

সংখ্যা তালিকায় নানা তথ্যের সমাবেশ ও তাহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতক তথ্য সঙ্কলন করিয়া দিলাম:—

(ক) ১২০০ অবিবাহিতার মধ্যে যথাক্রমে বয়স আত্মরতি কখনও করেন নাই, আত্মরতি ত্যাগ করিয়াছেন এবং এখনও যাহারা করিতেছেন তাহার শতকরা হিসাব নিম্নরূপ:—

২০—২৯ বৎসর	—৩৬%,	৩৬%,	২৮%
৩০—৩৯ „	—৩৪%,	৩০%,	৩৬%
৪০—৪৯ „	—৩৪%,	২৯%,	৩৭%
৫০—৫৯ „	—৩৯%,	২৯%,	৩২%
৬০—৬৯ „	—৩০%,	৬১%,	৯%

(খ) যে অবিবাহিতারা এখনও করিতেছেন ও যাঁহারা ছাড়িয়াছেন তাঁহাদের **আরম্ভ করার ও প্রথমবার চরমানন্দ লাভের বয়স**:—

বয়স	এখনও করিতেছেন (শতকরা)	ছাড়িয়াছেন (শতকরা)	প্রথম চরমানন্দ ও তৃপ্তি লাভ	
			করিতেছেন (শতকরা)	ছাড়িয়াছেন (শতকরা)
৩—১০ বৎসর	৪০	৪৩	১২	১৯
১১—১৫ „	১৭	২০	১৮	২৫
১৬—২২ „	১৫	১৪	২০	২১
২৩—২৯ „	১৮	১৬	৩১	২৪
৩০—৩৯ „	৮	৬	১৭	১০
৪০—৪৯ „	২	১	২	১

(গ) **অভ্যাসের প্রসার**:—১০০০ জন বর্তমানে **বিবাহিতার** মধ্যে অর্ধেকের কিছু কম (প্রায় ৪০০ জন অর্থাৎ শতকরা ৪০ জন) আত্মরতি করিয়াছেন অথবা করেন। অর্ধেকের কিছু বেশী (প্রায় ৬০০ জন অর্থাৎ শতকরা ৬০ জন) কখনও করেন নাই বলেন।

(ঘ) ঐ শতকরা ৪০ জনের (প্রকৃত সংখ্যা ৩৮১ জনের) ইহা **আরম্ভ করার বয়স**:—(১) বালিকা বয়সে (In girlhood) অর্থাৎ ৩—১৪ বৎসরের

মধ্যে ২২৭ জন (প্রায় ৬৪%)। (২) যুবতী বয়সে (In womanhood) অর্থাৎ ১৫—৩৪ বৎসরের মধ্যে মোট ১২৩ জন (প্রায় ৩৩%)। বয়স মনে নাই কিংবা উত্তর দেন নাই মোট ৩১ জন।

উপরোক্ত তথ্যসমূহ ছাড়াও ডাঃ ক্যাথাবিন ডেভিসের গবেষণায় অন্য যে সব তথ্য প্রকাশ পায় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

(ঙ) ১২০০ অবিবাহিতার মধ্যে যাহাবা আত্মরতি কবিয়াছেন বা করিতে-ছেন তাহাদের ইহা শিক্ষার সূত্র হইল:—(১) দৈবাৎ আবিষ্কার; (২) অপব ব্যক্তির কাছে শেখা. (৩) বড় হইয়া স্বেচ্ছায় আবম্ভ করা।

দৈবাৎ আবিষ্কারের হেতু—দৈবাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন মোট ২০৯ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। তাহাদেব আবিষ্কারের হেতু নিম্নরূপ:

১। গোপনাঙ্গে দৈবাৎ চাপ লাগা; ২। চুলকানি অথবা irritation-এর জন্য বগডানো বা চুলকানো, ৩। সুড়সুড়ি (Irritation) সম্ভবতঃ কৃমির জন্য, ৪। স্নানেব সময় জলেব ধাবা (Spray) লাগা, ৫। কৌতূহলবশতঃ পবীক্ষা; ৬। বিশেষভাবে চেয়াব অথবা টেবিল প্রভৃতির সম্পর্কে অবস্থান (Position of furniture), ৭। শয্যায় অর্ধজাগ্রত অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়; ৮। বৃক্ষে আরোহণ অথবা অববোহণের সময় ঘর্ষণে, ৯। ছেলেবেলায় পুরুষের হস্তার্পণে, ১০। হাঁটু অথবা পা বসা অথবা শোওয়া অবস্থায় একটির উপর অপরটি বাখা (crossed), ১১। প্রেমিক কর্তৃক আলিঙ্গন প্রভৃতি, ১২। ডুশ ব্যবহাবে পুলকলাভ. ১৩। পুস্তক পাঠে, ১৪। ঘোডায় অথবা বাই-সিকেলে চড়া।

অপর ব্যক্তিব কাছে যাহাবা শিখিয়াছেন তাহাদেব সংখ্যা মোট ১৫৮ জন। ইঁহাদের অধিকাংশ অপর মেয়েব কাছ হইতে শিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া বড় ভগিনী, সম্পর্কিত ভগিনী, বাড়ীর নার্স, ছেলেবয়সের বান্ধবী, ভাই, অপর বালক-বালিকা এবং পুরুষ বন্ধুর কাছ হইতেও কেহ কেহ শিখিয়াছেন।

বড় হইয়া স্বেচ্ছায় আরম্ভ করিয়াছেন মোট ৪৯ জন। ইহাদের অধিকাংশ ইহা অবলম্বন করিয়াছেন পুস্তকপাঠের ফলে। তাহা ছাড়া পরীক্ষাচ্ছলে, স্নায়বিক অস্বস্তি হইতে শান্তিলাভের জন্য, ডাক্তারের পরামর্শে, কামচিন্তা হইতে নিষ্কৃতিলাভেব জন্য, বাসনার তৃপ্তির জন্য, কোন বিশেষ পুরুষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিবারণের জন্য এবং সহবাসের পর উত্তেজনায় শান্তিলাভের জন্যও কেহ কেহ ইহা অবলম্বন করিয়াছেন।

(চ) উপরোক্ত অবিবাহিতাদের জবানবন্দীতে মোটামুটিভাবে অমেহন

করিবার এই **কারণসমূহ** প্রকাশ পায়—(১) সুখের জন্য, (২) শারীরিক অস্বস্তি নিবারণ, (৩) পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা (spooning), নাচ, পাঠ ইত্যাদি, (৪) অদম্য আবেগ ও উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষা, (৫) কৌতূহল, প্রেমচিন্তা বা মনোবিলাস, স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি।

(ছ) ১২০০ অবিবাহিতাদের যাহারা আত্মরতির অভ্যাস ছাড়িয়াছেন, তাহাদের ছাড়িবার কারণ :—(১) কুফলের ভয় (শতকরা ৩৫ জনের), (২) বাসনা কমিয়া যাওয়ায় অনাবশ্যক, (৩) লজ্জা ও ঘৃণা, (৪) উহা মন্দ বলিয়া অনুভব, (৫) উহার পরিবর্তে অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ ও মনোযোগ, (৬) উত্তেজনার হেতু দূর হওয়া।

(জ) অবিবাহিতাদের মধ্যে ৩০৮ জন এখনও আত্মরতি করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে ৬১ জনের মতে ইহার ফল ভাল, ৮৩ জন মনে করেন ইহার ফল মন্দ; ভাল ও মন্দ দুই-ই এ রকম মন্তব্য করেন ১৪ জন, ফলাফল যাহাদের কাছে অস্পষ্ট, তাহারা সংখ্যায় ১২৪ জন। ২৬ জন এ সম্পর্কে কোন জবাব দেন নাই।

উপরোক্ত ৩০৮ জনের মধ্যে ১৪৬ জন ইহাকে অনিষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কেহ কেহ আগে মনে করিতেন অনিষ্টকর এখন নয়। কাহারও কাহারও মতে—যদি খুব বেশী কিংবা শৈশবে হয় তবে ইহা অনিষ্টকর।

(ঝ) **কেন ভাল।** ১২০০ অবিবাহিতাদের মধ্যে ৩০৮ জন এখনও **করিতেছেন** এবং ৬১ জন ইহার **ফল ভাল মনে করেন।** তাঁহাদের কতকগুলি মন্তব্য :—

১। স্নায়বিক চাঞ্চল্য হইতে নিষ্কৃতি। কতক ক্ষেত্রে, ইহা ছাড়া, কাজে চিত্ত একাগ্র করিবার সমধিক ক্ষমতা, অপরদের (অর্থাৎ অভ্যাসযুক্তদের এবং চরিত্রহীনাদের—গ্রন্থকার) দুর্বলতার প্রতি সমধিক সহানুভূতি ও তাহাদের বেশী বুঝিতে পারা। ২। মানসিক অবসাদ ও হতাশ ভাব দূর হওয়া। ৩। মেজাজ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিরঃপীড়া দূর হইল। ৪। অধিক সন্তোষলাভ। ৫। বদ মেজাজ কমিয়াছে। ৬। ভালবাসিবার ও ভালবাসা পাইবার ইচ্ছা তৃপ্ত করে (satisfies emotional craving)। ৭। ধৈর্য ও স্থৈর্য আনিয়াছে। ৮। অপরদের সম্বন্ধে বেশী সহিষ্ণু করিয়াছে। ৯। শক্তিদায়ী ও তাজাকারী (stimulating & refreshing)। ১০। অনিদ্রা দূর হইয়াছে। ১১। যৌন-ব্যাপারে বুঝিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে। ১২।

যৌন-উত্তেজনা নিবৃত্তির উত্তম পথ। ১৩। ইহার জন্য বেশী স্বাভাবিক ভাব।

(ঞ) **কেন মন্দ।** যে **৮৩ জন মনে করেন** যে ইহার **ফল মন্দ** হইয়াছে, তাঁহাদের কতিপয় মন্তব্য :—

১। আত্মসম্মান হানিকর, আত্মগ্লানি ও অনুতাপ ঘটায়। ২। বিবাহ হইলে (স্বামীর কাছে—গ্রন্থকার) স্বীকার করিতে হইবে, বহু বৎসর যাবৎ এই ভয়। ৩। স্বাভাবিক সহবাস অরুচিকর হইবে এই সন্দেহ। ৪। উন্মত্ততার ও আধ্যাত্মিক শাস্তির ভয়। ৫। গুরুতর দুর্ভাবনা। ৬। ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা। ৭। কাম-চিন্তা বৃদ্ধি। ৮। মনের সতেজভাব নষ্ট করিয়াছে। ৯। দক্ষতার হানি। ১০। মন একাগ্র করার অক্ষমতা। ১১। স্মৃতিশক্তির হানি। ১২। অস্থিরতা জন্মাইল, অথবা বৃদ্ধি করিল। ১৩। শারীরিক দৌর্বল্যকর। ১৪। মনের অবনতিকর ও সম্ভবত অনিয়মিত ঋতু ঘটাইয়াছে। ১৫। মানসিক শক্তি হ্রাস করিয়াছে, ইহার ফলে সক্ষম হইয়াছে। ১৬। চরিত্র দুর্বল ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিয়াছে। ১৭। শারীরিক অবসাদ, বুদ্ধি, সৌন্দর্য জ্ঞান ও বিচার ক্ষমতার (Asthetic and critical sense) হানি ঘটাইয়াছে। ১৮। নার্ভাস ভাব, ধরা পড়িবার বিষম ভয়। ১৯। নৈতিক দুর্বলতা ও শিরঃপীড়া।

(ট) যাঁহারা ইহার ফল **ভাল** ও **মন্দ উভয় প্রকার** মনে করেন তাঁহাদের মন্তব্য :—

১। কখনও কখনও উত্তেজক আবার কখনও শান্তিকর ও নিদ্রা আনয়নকারী। ২। ক্লান্তিকর, আত্মগ্লানিজনক, কিন্তু অন্তত অতটুকু যৌন-উপভোগ হওয়ায় আনন্দিত। ২। দৌর্বল্য ও অবসাদকর কিন্তু বালিকাদের বুঝিতে সাহায্য করে। ৪। সংযমের অভাবে আত্মসম্মান হ্রাস করিয়াছে, কিন্তু পাপীদের প্রতি সমধিক সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছি। ৫। অনিদ্রা ও অস্থিরতা ঘটাইয়াছে, কিন্তু মেয়েদের (দুর্বলতা, স্খলন ও পতন—গ্রন্থকার) সমধিক বুঝিতে পারিতেছি (জনৈক M.D. ডাক্তার)। ৬। সংযমে লজ্জাজনক অসাফল্য, কিন্তু শারীরিক আরাম এবং কর্মে মনোযোগের ক্ষমতা বাড়িয়াছে ইত্যাদি।

(ঠ) উপরোক্তদের আত্মরতির ফল সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মন্তব্য যেগুলি **ভাল বা মন্দ ইহাদের কোন কোঠায় ফেলা যায় না** (unclassified) :—

১। যৌন-ব্যাপারে আগ্রহ জানাইলে। ২। বুঝিলাম যে আমি কামশীতল নই, কিন্তু অবদমিত মাত্র। ৩। আগে (৩১ বৎসর বয়সের পূর্বে) যৌন-আবেগ সম্বন্ধে কিছু বুঝিতাম না, এখন যৌন-উত্তেজনার ব্যাপারে বেশী নাড়া দিতে পাবি। ৪। পুরুষেরা আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে। ৫। বিবাহের ইচ্ছা জাগিয়াছে। ৬। এখন নারীর সহিত প্রণয় করিতে ভয় হয় (ইনি পারস্পরিক হস্তমৈথুন করিয়াছেন—গ্রন্থকার)। ৭। মানসিক বা নৈতিক ক্ষতি হয় নাই।

(ড) অবিবাহিতাদের মধ্যে যাহারা আত্মরতি ত্যাগ করিয়াছেন (মোট ২৯৫ জন) ইহার ফলাফল সম্পর্কে তাহাদের মতামত:—২৫ জন ইহাকে ভাল মনে করেন: ৮৫ জনের মতে ইহা মন্দ; ভাল ও মন্দ দুইই এরূপ মন্তব্য করেন ২ জন, যাহাদের কাছে ইহার ফলাফল অস্পষ্ট তাহারা সংখ্যায় ১০৯ জন এবং ৭৪ জন এ সম্পর্কে নিরুত্তর।

(ঢ) স্বাস্থ্য—সমগ্র ১২০০ জনের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন, এখনও যাহারা করিতেছেন তাহাদের ৮১%, যাহারা ত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের ৭১%, যাহারা কখনও করেন নাই তাহাদের ৭৭% এর স্বাস্থ্য চমৎকার বা ভাল। অবশিষ্টাংশের স্বাস্থ্য মাঝারি বা মন্দ।

(ণ) **শিক্ষা সম্পর্কে আত্মরতির অভ্যাস (বিবাহিতাদের)—**

অভ্যাস	সমগ্র ১০০০ বিবাহিতাদের মধ্যে শতকরা	গ্রাজুয়েটদের মধ্যে শতকরা	কলেজী শিক্ষা-হীনাদের মধ্যে শতকরা
করিয়াছেন	৪০	৪১	৩৮
অস্বীকার করেন	৬০	৫৯	৬২

(ত) **গ্রাজুয়েট ও অপরদের আরম্ভ করার বয়স:—**

আরম্ভ করার বয়স	সমগ্র দলের শতকরা	অবিবাহিতাদের মধ্যে শতকরা	বিবাহিতাদের মধ্যে শতকরা	
			গ্রাজুয়েট	অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতা
একাদশের মধ্যে	৫০	৪৮	৪৬	৬১
১২—১৪	১৯	১২	২০	১৬
১৫—১৭	৯	৪	৯	৯
১৮ ও তাহার পর	২২	৩৬	২৫	১৪

(থ) ১০০০ জন বর্তমানে বিবাহিতাদের মধ্যে ৩৮১ জন কোন না কোন সময়ে আত্মরতি করিয়াছেন, তাহারা কিরূপে শিখিলেন:—

(১) যাঁহারা (২৪৬ জন) **ছেলে বয়সে আরম্ভ করিয়াছেন :—**

	শিক্ষার উপায়	সংখ্যা	শতকরা
১।	দৈবাৎ—নিজে নিজে	১২৮	৫২
২।	অপরের কাছে	১০২	৪১
৩।	মনে নাই	১৬	৭

(২) যাঁহারা (১৩৫ জন) **কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়াছেন :—**

	শিক্ষার উপায়	সংখ্যা	শতকরা
১।	দৈবাৎ—নিজে নিজে	৫২	৩৯
২।	অপরের পরামর্শে	১৯	১৪
৩।	নিজের বাসনা ও কৌতূহল	৩৭	২৮
৪।	প্রণয়ীর চিন্তা ও প্রণয় চিন্তা	১৯	১৪
৫।	উত্তেজক পুস্তক পাঠ	৬	৪
৬।	নৃত্য ও পুরুষের সান্নিধ্য	২	১

(দ) এই (২৪৬+১৩৫) মোট ৩৮১ জন **বর্তমানে বিবাহিতাদের মধ্যে এই অভ্যাস কালের দৈর্ঘ্য :—**

অভ্যাসকালের দৈর্ঘ্য	ছেলে বয়সে আরম্ভকারিণী	কৈশোরের পর আরম্ভকারিণী
লিখিবার সময় অবধি (বিবাহিতা অবস্থায়)	২৪	৯
বিহাহের পূর্ব পর্যন্ত	২৪	২৯
বাগ্‌দানের পূর্ব পর্যন্ত	৩	২
বাগ্‌দানের সময় পর্যন্ত	—	২
বহু বৎসব	১৪	৬
সাবা বালিকা বয়স	২	—
২০ হইতে ৩০ বৎসর	৫	
১৪—১৫ বৎসর	৮	—
৮—১৩ বৎসর	২০	৪
৩—৭ বৎসর	৩৯	২৫
১—২ বৎসর	২৮	১৬

কয়েক মাস	৩	১৩
কয়েক সপ্তাহ	৯	—
অল্প দিন	২৮	১৫
২।১ বার	১	৩
মনে নাই উত্তর দেন নাই	৩৮	১১
মোট	২৪৬	১৩৫

(ধ) ১৯০ জন বর্তমানে বিবাহিতাদের উপর ইহার **ফলাফল ঃ**

ফলাফল	সংখ্যা	শতকরা
কিছুই না	৬০	৩২
সুফল ঃ—		
১। স্নায়বিক অস্থিরতায় শান্তি	৪	
২। মনের শান্তি	১	
৩। প্রলোভন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হওয়ায় সমধিক সহানুভূতিপূর্ণ (পাপীদের প্রতি—গ্রন্থকার) ও সহায়	২৯	
৪। অভ্যাস দমনের চেষ্টায় চরিত্রবল বৃদ্ধি	৬	
সুফল লাভ—মোট	৪০	২১
অনিষ্টকর ঃ—		
১। আত্মগ্লানি, অবদমিত, নার্ভাস ও অসুস্থ	৩৬	
২। শারীরিক ও নৈতিক দুর্বলতা	১৯	
৩। পরবর্তী অনুভূতির (স্বামী সহবাস সুখের—গ্রন্থকার) ক্ষতি ও বাসনার হ্রাস	৫	
৪। ইচ্ছাশক্তি দৌর্বল্য	৬	
৫। হতাশ ভাব ও দুঃখবাদ আনিয়াছে	২	
৬। কামের বৃদ্ধি	১	
৭। কোন্ কুফল তাহা লেখেন নাই	২১	
(**মোট পূর্ণ** যাহারা **অনিষ্টকর বলেন**)—	৯০	৪৭

যাহারা স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন তাঁহারা সংখ্যায় ১৯০ জন। উত্তর দেন না মোট ৮২ জন। "জানি না" বলিয়াছেন এবং অসংলগ্ন (Irrelevant) ও অস্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন মোট ১২২ জন।

(ন) **স্বাস্থ্য।** ১০০০ জন বর্তমানে বিবাহিতাদের সমগ্র দলের স্বাস্থ্যের সহিত তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কখনও আত্মরতিতে লিপ্ত হইয়াছেন ও যাঁহারা কখনও হন নাই তাঁহাদের স্বাস্থ্যের তুলনা :—

স্বাস্থ্যের অবস্থা	সমগ্র দল (শতকবা)	কবিয়াছেন (শতকরা)	কবেন নাই (শতকরা)	নিরুত্তর (শতকরা)
চমৎকার	৩[illegible]	৩০	৩৫	৪১
ভাল	৪২	৪৩	৪২	৩৭
মাঝারি (fair)	১৭	১৬	১৮	১৪
বরাবরই ক্ষীণ (delicate)	৪	৬	৪	৬
মন্দ (poor)	৪	৫	১	২

আত্মরতির অভ্যাসের সহিত স্বামীসহবাস সুখের সম্পর্ক

যাহাদেব সাবা বিবাহিত জীবনে স্বামীসহবাস সুখময় বোধ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যাহাবা আত্মবতি করিয়াছেন ও যাহাবা কখনও করেন নাই এই দুই দলেব দাম্পত্য জীবনের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দলেব শতকবা অনুপাত দেওয়া হইল :—

দাম্পত্য জীবনেব দৈর্ঘ্য	ববাবর সুখ অনুভবকারিণীদের শতকবা অনুপাত	
	আত্মবতি করিয়াছেন	করেন নাই
১ হইতে ৫ বৎসব	৪৫	২৮
৬ " ১০ "	২২	২৭
১১ " ১৫ "	১৮	১৮
১৬ " ২০ "	৮	১১
২১ " ২৫ "	৪	৬
২৬ " ৩০ "	১	৬
৩১ " ৩৫ "	১	১
৩৬ " ৪০ "	—	২
৪১ " ৪৫ "	১	—
৪৬ " ৫০ "	—	১
৫১ ও বেশী "	—	—

হস্তমৈথুনের প্রসার বালিকা অপেক্ষা বালকদের মধ্যে বেশী। এলিসের গবেষণার ফল এই যে, শতকরা ৯০ জন পুরুষই নিজের জীবনের কোন-না কোন সময়ে ইহাতে লিপ্ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের রাগ্‌বী স্কুলের চিকিৎসক ডাঃ ডিউক্‌স্‌ লিখিয়াছেন যে, ঐ স্কুলের শতকরা ৯৫ জন বালক কোন-না-কোন প্রকারে ইহা করিয়া থাকে। জার্মানীর ডাঃ জুলিয়ান মার্কিউস্‌ ও ডাঃ রোহেল্ডার বলেন যে, জার্মানীতে শতকরা ৯২ জনের উপর ইহা করিয়া থাকে। আমেরিকাতে ডাঃ সিয়ারলির গবেষণার সময় দেখিয়াছেন যে, ছাত্রদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬ জন করে নাই। ডাঃ ব্রকম্যান বলিয়াছেন যে, এমন যে সাত্ত্বিক শিক্ষাক্ষেত্র পাদ্রী স্কুল সেখানকারও শতকরা ৫৬ জন ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা কোনও প্রকার স্বয়ংমৈথুন না করিয়া থাকিতে পারে না। মস্কোর ডাঃ শ্লেনফ বলিয়াছেন যে, তাঁহার দেশে শতকরা ৬০ জন ছাত্র স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছে যে, তাহারা ইহাতে লিপ্ত আছে।

কোনও গবেষক ভারতবর্ষের এই বিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করেন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোনও তথ্যের উল্লেখ করা সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু মানব প্রকৃতি সর্বত্রই এক, এই মূলসূত্র হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, **ভারতবর্ষের অবস্থাও মোটামুটি ঐরূপ।**

অনেকের মতে **শতকরা একশত জনই হস্তমৈথুন করে, করিয়াছে বা করিবে।** বার্জার বলেন, "হস্তমৈথুনের অভ্যাস সার্বজনীন—ইহাতে শতকরা ৯৯ জন যুবক-যুবতী কোন-না-কোন সময়ে ব্রতী হয়ই; বাকী একজনও যাহাকে হয়ত আমরা 'পবিত্র' বা 'সাধু' বলিয়া থাকি, স্বীকার করে না মাত্র।

স্টেকেল বলেন, **প্রত্যেকেই হস্তমৈথুন করে।**

নরম্যান হাইম্‌স্‌ বলেন, এই অভ্যাস ছেলেদের এবং যুবকদের মধ্যে খুব ব্যাপক। প্রায় প্রত্যেক স্বাভাবিক অবস্থার বালক কোন-না-কোন কালে সপ্তাহে এক হইতে চারিবার উহা করিয়াই থাকে।

নরনারীর আত্মরতি আরম্ভ করার বয়সের তুলনা

অনূর্ধ্ব ১১ বৎসর	—	পুরুষ	২১%,	নারী	৪৯%
১২—১৪ বৎসরে	—	পুরুষ	৪৪%,	নারী	১৫%
১৫—১৭ বৎসরে	—	পুরুষ	৩০%,	নারী	৬%
১৮ এবং তদূর্ধ্ব	—	পুরুষ	৫%,	নারী	৩০%

কোন্ বয়সে এই অভ্যাসের প্রকোপ কত বেশী তাহা লইয়াও বহু গবেষণা হইয়াছে। বালকদের কোন্ সময়ে হস্তমৈথুন প্রথম আরম্ভ হয় ডাঃ হার্সফেল্ড তাহাব একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন :

বালকদের কোন্ বয়সে আরম্ভ হয়

বৎসব বয়সে	শতকবা	বৎসর বয়সে	শতকরা
৪	০ ২৫	১২	১৫'০
৫	১'৮	১৩	১৩ ৭
৬	১'৮	১৪	১৫'৫
৭	২'৩	১৫	১১'৪
৮	২ ৮	১৬	৯ ৮
৯	৩'২	১৭	৪'৬
১০	৫'৩	১৮	২'৫
১১	৫'৪	১৯-২০	২'৫

[illegible]

ডঃ কিন্‌সে ও সহকর্মীদের অনুসন্ধানেও ২-৩ বৎসর হইতে কয়েক মাসের নবশিশুকে পর্যন্ত স্বমেহনের চেষ্টা করিতে দেখা গিয়াছে কিন্তু ইহাদের বিশৃঙ্খল চেষ্টায় বোধ হয় খুব বেশী আনন্দ বোধ না হওয়ায় ইহারা আর কিছুকাল পুনর্বাব চেষ্টা কবে না। অবশ্য অপর কেহ দেখাইয়া শিখাইয়া দিলে উহার কথা স্বতন্ত্র। তখন হইতে অবশ্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাকা স্বাভাবিক।

অত ছোটবেলাব কথা মনে সব সময়ে নাও থাকিতে পারে। তাই বয়স্কদের স্মৃতিকথাব ভিত্তিতে যতটা পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে শৈশবে হস্তমৈথুনের প্রকৃত অবস্থা আবও কতটা বেশী হইবে। এইজন্য ডঃ কিন্‌সেরা ধরিয়া লইয়াছেন যে আমেরিকায় প্রায় ১০% বালক ৯ বৎসব বয়সের পূর্বেই এবং ১৬%বালক ১০ বৎসরের পূর্বেই আত্মরতি করিয়া থাকে।

তবে পুরুষের জীবনে ইহার সবচেয়ে বেশী প্রকোপ হয় ১৬ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত বয়সে। এই সময়ে প্রায় ৮৮% ইহাতে অভ্যস্ত থাকে। ইহার পর হইতে প্রকোপ কমিতে থাকে।

আমাদের মতে উষ্ণপ্রধান পাক-ভারতে যৌনবোধ আরও সকাল সকাল জাগ্রত হয় বলিয়া ১০ হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে **প্রায় সকল বালকের ঐ**

অভ্যাস আরম্ভ হইয়া যায়। অবশ্য ইতিমধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হইয়া বসিলে উহার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম হইবারই কথা।

সকলেই কোন-না-কোন সময়ে এই অভ্যাসের সাময়িক দাস হইলেও ব্যক্তিভেদে উহার প্রকোপের ব্যতিক্রম হয়। কেহ কেহ দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪-৫ বারও করে। দুই-এক ক্ষেত্রে অবশ্য ইহার বেশী বারও হইয়া থাকে। তবে **সাধারণতঃ দৈনিক ২-৩ বার হইতে মাসে ২-৩** বার পর্যন্ত দেখা যায়। স্বভাবতই যাহাদের কাম বেশী এবং খেলাধূলা, ব্যায়াম বা সমাজসেবা ক'রে না, লোকের সঙ্গে বেশী মিশে না, বাড়ীতেই অধিকাংশ সময় থাকে তাহারাই বেশী করিয়া থাকে। সচরাচর স্বাভাবিক ও সুস্থ বালক-বালিকা ইহাতে বাড়াবাড়ি করে না।

শিশুদের মধ্যে **কি করিয়া** প্রথমে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়, তাহা লইয়াও অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেলাধূলা বা প্রস্রাবের সময়ে হস্তের সংস্পর্শে পুলকানুভূতির সৃষ্টি হয়। ডাক্তার ফ্রয়েডের অনুবর্তী পণ্ডিতেরা বলেন, ধুইবার কালে পিতামাতা, নার্স বা অপরের হাত লাগায় হঠাৎ সুখানুভূতি হইতেও শিশুমনে ঐরূপ কার্যের পুনরাবৃত্তি করিবার স্পৃহা জন্মে। খেলার বা পড়ার সাথী হইতে শিখিয়া লওয়ার কথা বলা ত বাহুল্য মাত্র।

কি করিয়া এই ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, ইহার উত্তরেও যৌন-বিজ্ঞানীগণ বহু তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। **পুরুষের** বেলায় মুষ্টির মধ্যে অঙ্গ ধরিয়া অগ্রপশ্চাৎ হস্তচালন করা হয়। **শুক্রসঞ্চয়ের পূর্বে** বালকেরা মেয়েদের মত শুধু তৃপ্তি ও ক্রিয়াশেষে মূলাধারে এক রকম ঝাঁকানি এবং সর্বশরীরে স্নায়বিক বিস্ফোরণজনিত কম্পন ও শিহরণ অনুভব করে। বেশীর ভাগ পুরুষই খুব শীঘ্র শীঘ্র চরমতৃপ্তি লাভ করে; কেহ কেহ আনন্দানুভূতি বেশীক্ষণ উপভোগ করিবার জন্য কয়েক মিনিট হইতে অর্ধ ঘণ্টাকাল পর্যন্ত প্রক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে অতি অল্প সংখ্যক শুক্রস্খলনের পূর্বেই বিরত হয়।

বালকদের **বিছানায়, নিভৃত স্থানে, তৈলমর্দন ও যৌনকেশ মুণ্ডনের সময়ে; স্নানাগারে স্নানের পূর্বে এবং পায়খানায়** মলমূত্র ত্যাগের সময়ে **সবচেয়ে বেশী** সুযোগ ও সুবিধা হয়। অভ্যস্তদের উচিত এই সমস্ত সময়ে ইচ্ছা করিলে মনকে অন্য চিন্তায় ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি অন্য লোকের সমক্ষে বাহির হইয়া আসা।

মেয়েদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গুলির ব্যবহার ঘৃণাজনক বোধ হয়। তাহাদের যৌনপ্রদেশের মধ্যে কেহ ভগদেশ, ক্ষুদ্রোষ্ঠ অথবা ভগাঙ্কুর তালে তালে ও ছন্দে ছন্দে ঘর্ষণ ও মর্দন করিয়াই ক্রিয়া শেষ করে। বিশেষতঃ সতীচ্ছদ অক্ষত অবস্থায় বর্তমান থাকা পর্যন্ত যোনিপথে কিছু করিবার মত সুযোগ হয় না। কুমারীদের সে ইচ্ছাও সাধারণতঃ হয় না। বিবাহিতা স্ত্রীলোক বা বেশ্যারা অবশ্য সমস্ত যোনিপথে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে ও করিয়া থাকে। অঙ্গুলির অনুরূপ নানারকম জিনিস ব্যবহার করার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

বালক ও বালিকাদের মধ্যে স্বয়ংমৈথুনের অভ্যাস কাহাদের বেশী, এই লইয়া গবেষকগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, দশ বৎসর বয়সের পূর্বে বালিকাদের মধ্যে এবং তৎপরে বালকদের মধ্যে এই অভ্যাস অধিক দৃষ্ট হয়। এলিসের মত ইহার ঠিক বিপরীত। তিনি বলেন যে, **বালিকাদের মধ্যে যৌনবোধ বিলম্বে জাগ্রত হয়** বলিয়া কৈশোরের পূর্বে বালিকা অপেক্ষা বালকদের মধ্যে ইহার অভ্যাস বেশী। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া পুরুষেরা যে সব উপায়ে যৌনবৃত্তির তৃপ্তিসাধন করিতে পারে, মেয়েদের সে সমস্ত সুযোগ সহজলভ্য নহে বলিয়া যুবক অপেক্ষা যুবতীদের মধ্যে ইহা বেশী। এলিসের চিকিৎসাধীনেই কোন কোন যুবতীকে পুরুষাঙ্গের অনুরূপ তরি-তরকারী, পেন্সিল, মোমবাতি, কর্ক, কাচের টিউব, রবারের নল, ক্লাব প্রভৃতি দ্বারা স্বয়ংমৈথুন করিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার মতে, অধিক বয়সের সময় পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের মধ্যেই এই অভ্যাস বেশী। তবে আমাদের দেশে অজ্ঞতা, অত্যধিক লজ্জার ভাব, ধর্মের ভয়, ইত্যাদি কারণে মেয়েদের মধ্যে ইহার প্রসার পাশ্চাত্যদেশের মত নাও হইতে পারে।

পুরুষের স্বয়ংমৈথুন যেমন সর্ববাদীসম্মত, মেয়েদের স্বয়ংমৈথুন (বা সমমৈথুন) সেরূপ নহে। এ সম্বন্ধে অনেকেরই বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। অবিবাহিতা নারী ও অরমিতা কুমারীরা সাধারণতঃ ভগাঙ্কুর, লঘুভগৌষ্ঠ অথবা সমগ্র ভগদেশ ঘর্ষণ বা হস্তদ্বারা মর্দন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। কেহ কেহ বা এক উরুর উপর অন্য উরু চাপিয়া পরস্পরের ঘর্ষণ দ্বারা ভগাঙ্কুর নিপীড়িত করিয়া চরমানন্দ আনয়ন করে। ইহাদের সাধারণতঃ যোনিনালীকে উত্তেজিত করিবার স্পৃহা জাগে না, তাহার কারণ সতীচ্ছদ অক্ষত অবস্থায়

বর্তমান থাকা নহে (কতকের সতীচ্ছদ থাকে না, কোন কারণে ছিন্ন হইয়া যায় অথবা অত্যন্ত সম্প্রসারণশীল থাকে—তাহাদের ঐ পথে অঙ্গুলি বা অনুরূপ বস্তু ব্যবহারে কোন বাধা নাই), তাহাদের যোনিনালীর অভ্যন্তরে কোন অনুভূতি জাগে না। যাহাদের কৌতূহল বা অনুভূতির জন্য সেরূপ ইচ্ছা হয় তাহারা আর সতীচ্ছদের বাধা মানে না, অঙ্গুলি বা লিঙ্গানুরূপ কিছু ব্যবহার করিয়া সতীচ্ছদ ছিন্ন করিয়া লয়। বিবাহিতা বা পুরুষ-সংসর্গে অভ্যস্ত রমণীরাই যোনিনালীতে উত্তেজনা সৃষ্টি না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, কারণ তাহাদের কামকেন্দ্র কতকটা যোনিপথ ও জরায়ুমুখে কেন্দ্রীভূত হয়, সেই জন্য তাহাদের অঙ্গুলি বা লিঙ্গানুরূপ কোন পদার্থ ব্যবহার করিতে হয়।

পূর্বোক্ত স্বেচ্ছাকৃত **আত্মরতি ব্যতীত** আরও বহু উপায়ে স্বয়ংমৈথুন সংঘটিত হইতে পারে। ব্যায়াম করা, ফল পাড়িবার জন্য ঘর্ষণপূর্বক গাছে উঠা বা নামা, সাইকেল কিংবা অশ্বে আরোহণ করা, সেলাইয়ের পা-কল চালনা করা ইত্যাদি কার্যকালে শুধুমাত্র অঙ্গের ঘর্ষণ ও কম্পনে অকস্মাৎ অত্যন্ত পুলক সহকারে তৃপ্তিলাভ হইতে পারে।*

ডঃ কিন্‌সে ও সহকর্মীদের গবেষণাফল

পূর্বোক্ত আলোচনায় বহু যৌন-বিজ্ঞানীরই গবেষণার ফল উদ্ধৃত করা হইল। সম্প্রতি ডঃ কিন্‌সে প্রমুখ গবেষকদের অনুসন্ধানক্ষেত্র আমেরিকার হাজার হাজার নর ও নারী। হস্তমৈথুনের সংজ্ঞা দিতে গিয়া ইঁহারা **ইচ্ছাকৃত যৌন-আনন্দলাভের** কথা বলিয়াছেন।

যৌন-আনন্দলাভের যে প্রধান ছয়টি প্রক্রিয়ার কথা আমরা একটু আগে বলিয়াছি, তাহার মধ্যে হস্তমৈথুনের স্থান অতি উচ্চে অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার প্রসার অতি সাধারণ। বালকদের মধ্যে ইহা প্রায় সার্বজনীন, মেয়েদের বেলায়ও ইহার প্রসার ব্যাপক।

---

* জনৈক ডাক্তার-বন্ধু এই সম্বন্ধে বলেন—"বক্ষ ঘর্ষণ বা প্রচাপন দ্বারা যৌনতৃপ্তি নারীর মধ্যে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। বহু যুবতী বা বালিকাকে ছাদে বা বারান্দায় দাঁড়াইবার সময়ে রেলিংয়ে বুক চাপিয়া দাঁড়াইতে দেখা যায়। টুলে বা চেয়ারের কিনারায় বসিয়া সেলাইয়ের পা-কল চালাইবার সময় যৌনাঙ্গে ঘর্ষণ ও তজ্জন্য পুলকলাভের সম্ভাবনা পুরুষ অপেক্ষা রমণীদের মধ্যেই অনেক বেশী। অনেকক্ষণ বসিয়া পা কল চালাইলে Bartholin's glands-এ চাপ পড়িবার ফলে (এবং যোনির ঘর্ষণজনিত উত্তেজনার ফলেও) যোনি রসসিক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।"

ডঃ কিন্‌সে ও তাঁহার সহকর্মীরা বলেন যে, শতকরা ১০০ জন বালকই যে এই অভ্যাসে রত এমন সাধারণ উক্তি বহু জায়গায় দেখা গেলেও তাঁহারা এ কথার পূর্ণ সমর্থন পান নাই। কম হইলেও কিছুসংখ্যক বালক এমন আছে যাহারা নানা কারণে করে না। যথা—যৌন-চেতনা তত প্রবল না হওয়া, বিপরীত লিঙ্গের সংস্পর্শের অবাধ সুযোগ পাওয়া, হস্তমৈথুন চেষ্টার প্রকৃত আনন্দলাভ করিতে না পারা, প্রভৃতি। বালিকাদের মধ্যে বালকদের চেয়েও হস্তমৈথুন একেবারে না করার দৃষ্টান্ত আরও বেশী।

কিশোরদের ⅔ অংশের প্রথম শুক্রস্খলনই হস্তমৈথুনের দরুন হইয়া থাকে; বাকী কিশোরদের বেশীর ভাগ শুক্রস্খলন হয় প্রথম প্রথম স্বপ্নদোষে বা নারী সংসর্গে। মেয়েদের বেলায় বিবাহের পূর্বে পুরুষের সহিত প্রেমক্রীড়া (পূর্ণ-মিলন নহে) বিবাহের পরে পুরুষের সহিত রতিক্রিয়া—এই দুই প্রক্রিয়ায় যৌন-আনন্দলাভের পরেই হস্তমৈথুনে আনন্দলাভ হয় বেশী ক্ষেত্রে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, **নারীদের সকল প্রকার যৌন-ব্যবহারের মধ্যে হস্তমৈথুনেই বেশীর ভাগ চরম-পুলক-লাভ হইয়া থাকে।** ইহার একটি বড় কারণ পুরুষের সহবাসে দ্রুতস্খলন। হস্তমৈথুন নিজেদের ইচ্ছাধীন, চরম-পুলক-লাভ না হওয়া পর্যন্ত তাহারা উত্তেজনা স্থায়ী করিতে পারে—পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

পুরুষেরা প্রায় সকলেই হস্তমৈথুন করে বলিয়া তাহাদের ধারণায় নারীরাও ঐরূপ সার্বজনীনভাবে উহা করে বলিয়া ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। নারীর দৈহিক ও স্নায়বিক অনুভূতিশীলতা ঠিক হুবহু পুরুষের মত নয়।

ইচ্ছাকৃত যৌন উত্তেজনা সম্পাদনকে হস্তমৈথুন আখ্যা দিলেও নারীর বেলায় ঠিক হাতের ব্যবহার হইতেই হইবে এমন কথা নাই। বক্ষ প্রচাপন, উরু-ঘর্ষণ, শরীরে যৌনপ্রদেশে মর্দন ইত্যাদি করিয়া আনন্দ লাভ করাকেও হস্তমৈথুন পর্যায়ে ফেলা হয়।

কিভাবে প্রথম সূত্রপাত হয়

বালকদের মধ্যে সাধারণতঃ অপরের কাছে শুনিয়া ও অপরকে করিতে দেখিয়াই বেশীর ভাগ শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। নিজে নিজে আবিষ্কার করিবার উদাহরণও বহু। বালিকাদের মধ্যে কিন্তু অপরের কথা ও কাজ শুনিবার দেখিবার সুযোগ কম হয়। তাহারা নিজেরাই আনন্দের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া

ফেলে। নিজেদের যৌনপ্রদেশ বা অঙ্গ **লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি** বা স্পর্শন মর্দনে সুখানুভূতি হওয়া স্বাভাবিক।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জিজ্ঞাসিত নারীদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ বা ত্রিশের কোঠায় পা দিবার পূর্বে হস্তমৈথুন করে নাই এবং তার পরে করিয়াছে তাহাও নিজে নিজে আবিষ্কার করিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নারীদের মধ্যে এ বিষয়ে কতটা অজ্ঞতা রহিয়া যায় বিশেষ করিয়া যখন ঐ বয়সের অপরাপর নারীদের মধ্যে ইহার প্রসার ব্যাপক। তাহাদের তালিকার শতকরা ২৮ জন বালক নিজে নিজে এ সম্পর্কে আবিষ্কার করে কিন্তু শতকরা প্রায় ৭৫ জনই অপরের নিকট শুনিতে পায়, ৪০ জন অপরের অনুরূপ ক্রিয়া-কলাপ দেখে এবং ৯ জন অপরের দ্বারা প্ররোচিত হয়। ইহা হইতে **স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, কম বা বেশী বয়সের নারীদের মধ্যে পুরুষের মত খোলাখুলিভাবে যৌন-বিষয়ে আলোচনা হয় না।**

অবশ্য এখন যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকে যে খোলাখুলি আলোচনা হইয়া থাকে তাহা দেখিয়া বহু কিশোর-কিশোরীই এই সম্পর্কে জানিতে পাবে। এই জানিতে পারাটা আপত্তিজনক মনে করেন এই ভাবিয়া যে বোধ হয় তাহা না হইলে আর ইহারা এই পথের পথিক হইতেন না!

বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু এই জানাটা ক্ষতির চেয়ে লাভেরই বেশী কারণ। হস্তমৈথুনের মত প্রায় সার্বজনীন অভ্যাসেও না জানিয়া বা ভুল ভয় পাইয়া নর ও নারী সর্বদা শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত বোধ করে। ডঃ কিন্‌যে ও সহকর্মীরা যে তাঁহাদের প্রকাশিত ২য় খণ্ডে এ সম্পর্কে বহু তথ্য, চার্ট ও সংখ্যানুপাতের অবতারণা করিয়াছেন তাহা প্রশংসারই যোগ্য। আমাদের আলোচনাও যে সদুদ্দেশ্যে—ভুল ভাঙাইবার জন্য—সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রক্রিয়া ভেদ

পুরুষের মধ্যে হস্তদ্বারা মর্দন অধিকতর সহজসাধ্য বলিয়া হস্তমৈথুনের প্রক্রিয়াভেদ বিশেষ নাই। নারীদের মধ্যে কিন্তু উহা নানাভাবে সাধিত হয়। ডঃ কিন্‌যেদের অনুসন্ধানে প্রায় ৬-৭ প্রকার অভ্যাসের তথ্য মিলিয়াছে।

ভগাঙ্কুর ও ক্ষুদ্রোষ্ঠের সাহায্যে—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটি বা দুইটি মৃদুভাবে ও তালে তালে ভগাঙ্কুর কিংবা ক্ষুদ্রোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে ঘর্ষণে তাহা সাধিত হয়। ক্ষুদ্রোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গুলি এভাবে চালনা করা হয় যে প্রত্যেকবার

তাহা ভগাঙ্কুর স্পর্শ করে। কখনও বা উহারা নিয়মিতভাবে ছন্দে ছন্দে কয়েকটি অঙ্গুলি অথবা সমগ্র করতল দ্বারা চাপ দেয়। কখনও গোড়ালি অথবা অপর কোনও বস্তুদ্বারা সেখানে ঐ ভাবে চাপ দেওয়া হয়। কখনও বা ক্ষুদ্রোষ্ঠ-দ্বয়কে মৃদুভাবে ও তালে তালে আকর্ষণ করে। সে গুলির উর্ধ্বসীমা ভগাঙ্কুরের সহিত যুক্ত থাকায় তাহাও উত্তেজিত হয়। ৮৪% নারীই এই প্রক্রিয়ার কথা স্বীকাব করিয়াছে। নারীর এই দুইটি দেহাংশেই অতি অনুভূতিশীল। বৃহদোষ্ঠ প্রচাপনে আনন্দলাভের দৃষ্টান্তও আছে কিন্তু বিরল।

উরু প্রচাপন—প্রায় ১০% জিজ্ঞাসিত নারী উরুদ্বয় প্রচাপন ও ঘর্ষণ করিয়া সমগ্র যোনিপ্রদেশের উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এইভাবে ভগাঙ্কুর, বৃহদোষ্ঠ, ক্ষুদ্রোষ্ঠও প্রভাবিত হয়। উরু-ঘর্ষণেব সহিত যোনিপ্রদেশে হস্ত-সঞ্চালনও হইতে পারে।

পেশী সঞ্চালন—উপুড় হইয়া শুইয়া অথবা সেই অবস্থাতেই জানুদ্বয় পেটের নীচে আনিয়া নিতম্বের এবং উরুর মাংসপেশীসমূহ প্রকম্পন-সম্প্রসারণ করিবার প্রক্রিয়াও কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় বিছানায় রক্ষিত বালিশ বা অন্য কিছু দ্বারা ভগদেশ চাপিবাব কথাও কেহ কেহ বলে। ডঃ কিন্‌সেরা এই প্রক্রিয়াকে জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ বলেন। এই প্রক্রিয়ায় পুরুষের রতিক্রিয়ার অনুরূপ ক্রিয়াকলাপের নকল করা হয়। ইহাতে মনে হয় যৌন-উত্তেজনায় যে দৈহিক ও স্নায়বিক অনুভূতির পর্যায়ক্রম রহিয়াছে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া যৌনতৃপ্তি আসে।

বক্ষের সাহায্যে—নারীর বক্ষ বিশেষত স্তনবৃন্ত অতিশয় অনুভূতিশীল। শুধু উহা চাপিয়া বা তাহাতে সুড়সুড়ি দিয়া অতি অল্পসংখ্যক নারী চরম-পুলক লাভ করে। সাধারণতঃ উক্ত ক্রিয়ার সহিত যৌন-অঙ্গও স্পর্শন-ঘর্ষণে প্রায় ১১% নারী উত্তেজনা লাভ করে।

যোনিপথে—প্রায় ২০% নারী যোনিনালীতে অঙ্গুলি, বা অনুরূপ অন্য কিছু প্রবেশ করাইবার কথা স্বীকার করে। (এ জন্য ব্যবহৃত সকল সাধারণ দ্রব্যের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি)।

যাহারা এ কথা বলে তাহাদেব মধ্যে অনেকেই ভগাঙ্কুরের উর্ধ্বে অবস্থিত স্বল্পপরিসর স্থানকে (যাহাতে প্রচুর উত্তেজনাশীল ও সুখদায়ক স্নায়ু প্রান্ত-সমূহ আছে) যোনি বলিয়া ভ্রম করে। যোনিতে উক্তরূপ স্নায়ুপ্রান্ত ১৪% নারীর আছে, বাকী ৮০% এর আদৌ নাই। অনেক সময় রমণী নিজ অঙ্গুলি যোনি-

মুখের ভিতর শুধু ততটাই প্রবিষ্ট করে যাহাতে তাহার হস্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে। ইহাতে সে তাহার অঙ্গের বহির্ভাগ উত্তেজিত করে। অধিকাংশ পুরুষ সহবাসের দৃষ্টান্তে কল্পনা করে যে, নারীগণও পুরুষদেরই মত স্বমেহনের সময় সঙ্গমের অনুকরণে যোনির গভীরে অঙ্গুলি অথবা অপর কোন তৎসদৃশ বস্তু বার বার প্রবেশ করায়। এইজন্য অনেক পুরুষ কামকেলির সময় উহাতে নিজের অঙ্গুলি দিয়া নাড়াচাড়া করে এবং পুরুষদের লেখা পুস্তকসমূহে কৃত্রিম পুরুষাঙ্গের বর্ণনা দেখা যায়। কিন্তু কিন্‌সেরা যে সহস্র সহস্র রমণীর স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, নানা কারণে কতক স্ত্রীলোক (প্রায় ২০%) অঙ্গুলি অথবা অপর কিছু ঐজন্য ব্যবহার করে, যথা:—(১) কতক নারীর (১৪%) যোনিপথে সুখদায়ক স্নায়ুপ্রান্ত সমূহ থাকায় তাহারা বাস্তবিকই ঐভাবে রতিসুখ লাভ করে। (২) মনে মনে সুরত ও যোনিপথে কিছু প্রবেশের সম্পর্ক বোধ থাকায় মানসিক তৃপ্তিলাভ। (৩) কোনও পুরুষ বন্ধু অথবা পুরুষ বা নারী চিকিৎসক, যাহার সহবাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, ঐরূপ ক্রিয়ার পরামর্শ দিয়াছে। (৪) সুরতে বহুদিন অভ্যস্ত থাকিবার পর আত্মরতি চেষ্টা করিয়াছে, সেই জন্য সুরতের অনুকরণের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এরূপ বহুক্ষেত্রে নিজ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অবস্থান এবং যৌন সাড়ার উৎস সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান-লাভ করিবার পর ঐ নিষ্ফল ক্রিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। (৫) তাহাদের প্রণয়ীরা ঐ ক্রিয়া দেখিয়া উত্তেজনা ও আনন্দ পায় বলিয়া তাহাদের সুখী করিবার জন্যই করিয়াছে।

যোনিনালীর গভীর প্রদেশ রমিত হইলে যে সব কারণে কোনও কোনও নারীর তৃপ্তিবোধ হয় তাহা দ্বিতীয় খণ্ডের অঙ্গের পরিমাপ ও কার্যকারিতা অধ্যায়ে আছে।

কেবলমাত্র রতিক্রিয়ার কল্পনা করিয়া চরমপুলক* লাভ শুধু ২% নারীর হইয়াছে। পুরুষের এইভাবে পূর্ণ শুক্রস্খলন হওয়ার দৃষ্টান্ত আরও কম।

ডঃ কিন্‌সেদের উক্ত অনুসন্ধান-লব্ধ তথ্যসমূহ হুবহু অন্য দেশে বা সমাজ-ব্যবস্থায় ঠিক নাও হইতে পারে তবে মানুষের শারীরিক ও স্নায়বিক সংগঠন ও ক্রিয়াপদ্ধতি এক এই হেতু অনেকটা সত্য হইতে বাধ্য।

ডঃ কিন্‌যেদের তালিকায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে **স্বমেহন সম্পর্কে** তুলনামূলক নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করিবার যোগ্য :

মানব ও মানবেতর জন্তুসমূহ	নারীদের মধ্যে	নরদের মধ্যে
উক্ত অভ্যাস মানবেতর জন্তুসমূহে	কতক শ্রেণীতে	বহু শ্রেণীতে
,, ,, চরমপুলকলাভ পর্যন্ত	জানা যায় নাই	কতক ক্ষেত্রে
,, ,, আদিম মানব সমাজে	তথ্য কম	তথ্য কিছু

শিখিবার প্রণালী	নারী	নর
নিজে নিজে আবিষ্কারে	৫৭%	২৮%
মৌখিক বা লিখিত সমাচারে	৪৩%	৭৫%
চুম্বন, আলিঙ্গন, মর্দনাদির ফলে	১২%	—
চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দেখায়	১১%	৪০%
সমকামমূলক সংযোগে	৩%	৯%

বয়স ও বিবাহের সঙ্গে সম্পর্ক		
অভিজ্ঞতার সমষ্টি	৬২%	৯৩%
চরমপুলকলাভের সমষ্টি	৫৮%	৯২%
বয়সে—বার বৎসর পর্যন্ত	১২%	২১%
—পনর বৎসর পর্যন্ত	২০%	৮২%
—বিশ বৎসর পর্যন্ত	৩৩%	৯২%

প্রক্রিয়া		
যৌনাঙ্গে হস্তদ্বারা	৮৪%	৯৫%
উরু-প্রচাপন	১০%	বিরল
নিতম্বাদির মাংসপেশী সঙ্কোচন-প্রসারণ	৫%	বিরল
যোনিনালীতে কিছু প্রবিষ্ট করাইয়া	২০%	—
কেবল মাত্র কল্পনা করিয়া	২%	বিরল

দৈহিক ফলাফল	নারী	নর
আনন্দানুভূতি হয়	হাঁ	হাঁ
দৈহিক প্রয়োজন মিটায়	হাঁ	হাঁ
শারীরিক অনিষ্ট	কিছুই না	কিছুই না

মানসিক ফলাফল		
মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য আনে	হাঁ	হাঁ
কদাচিৎ উৎকণ্ঠা ঘটায়	৪৭%	বেশীর ভাগের

হস্তমৈথুনের কুফল সম্পর্কে পুরাতন বহিপুস্তক, হেকিমী, কবিরাজী শাস্ত্র ও পঞ্জিকাদি এত জোরে প্রচারণা চালাইয়া আসিতেছে যে, বালকবালিকা, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী সাধারণতঃ খুবই উদ্বিগ্ন থাকে। এ উদ্বেগ কুসংস্কারমূলক। ২৭ অধ্যায়ে আলোচনা দেখুন।

(১২)

যৌনবোধের বিভিন্নমুখী প্রকাশ (২)

জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন (Day dreaming)

শুধু কল্পনার সাহায্যে যৌনলালসার উদ্রেক ও চরিতার্থও একপ্রকার আত্মরতি। যুবক-যুবতী অনেক ক্ষেত্রে প্রিয়জনের কল্পনা করিয়া তাহার সহিত কল্পনায় মিলন-সুখ ভোগ করিয়া যৌনলালসাব নিবৃত্তি লাভ করে। যুবক অপেক্ষা যুবতীদের মধ্যে ইহার প্রসার অধিক।

কৈশোরে বা যৌবনে **প্রেমাত্মক নাটক নভেল** পড়িয়া **অশ্লীল চিত্র বা দৃশ্য দেখিয়া প্রিয়জনের সংস্পর্শে** আসিয়া অথবা অন্য কোন উত্তেজনার কারণ হইলেই কেহ কেহ কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিয়া যৌনসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাতে সাময়িক তৃপ্তি এবং এমন কি কদাচিৎ পুরুষদের রেতঃস্খলন এবং মেয়েদের চরমপুলক-লাভও হইতে পারে। ইহাকে **দিবাস্বপ্ন** (Day Dreams) বা **জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন** বলা হয়।

অনেক কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী ঘুমাইবার পূর্বে কতক্ষণ এইরূপ কল্পনা করে এবং অনেকে আবার আকাঙ্ক্ষা করে এমন মন্ত্র বা ব্যবস্থার যাহা দিয়া স্বপ্নে বাঞ্ছিত নায়ক বা নায়িকার সহিত মিলিত হইতে পারে।

কবি, শিল্পী প্রভৃতি যাঁহারা অধিকাংশ সময়ে কল্পনারাজ্যে বিচরণ করেন, বিশেষত যাঁহারা রতিক্রিয়ায় বিশেষ লিপ্ত হন না, তাঁহাদের মধ্যেই ইহার অধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়। ইহারা নিজেদের জীবনে কৃত বা দৃষ্ট কোনও অভিজ্ঞতার সূত্র ধরিয়া কল্পনার সাহায্যে একটি মনোরম নাটক সৃষ্টি করেন এবং সেই নাটকে স্বয়ং নায়ক বা নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইহাতেই তাঁহারা রতিজাত আনন্দ ও পুলক লাভ করেন।*

স্কুল-কলেজের বালিকাদের মধ্যেও এই জাগ্রত স্বপ্নের অভ্যাস অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পাণিমেহন করিবার সময়ে মনে মনে রতিক্রিয়ার কল্পনা করাটাও অনেকের বেলায়ই স্বাভাবিক।

---

* পুরুষের পক্ষে প্রায়ই উত্তেজনা ও রসক্ষরণ হইলেও হস্তমৈথুন বা অন্য কোন উপায়ে শেষ করিতে হয়। কল্পনার সাহায্যে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ খুব কম ক্ষেত্রেই হয়। মেয়েদের পক্ষে কল্পনায় চরমপুলক লাভের অনুপাত বেশী।

স্বাভাবিক মিলনের কৃত্রিম অনুকরণ

স্বাভাবিক রতিক্রিয়ার কৃত্রিম অনুকরণ করিয়া অনেকে যৌনতৃপ্তি লাভ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে নানা জিনিসের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। ইহাতে নানারূপ অদ্ভুত প্রণালী আবিষ্কৃত হয়।

পুরুষ বিছানা বা বালিশে ছিদ্র করিয়া লইয়া থাকে; রবারের থাপ, নানা প্রকার ফল, এমন কি রুটি মাখনের ব্যবহারও দেখা যায়। ডাঃ হার্সফেল্ড ও এলিস বহু উদ্ভট প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন।

মেয়েদের বেলায় কৃত্রিম রবারের লিঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া শশা, কলা, বেগুন, মোমবাতি, পেন্সিল, টুথব্রাস ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায় বলিয়া পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কৃত্রিম লিঙ্গের ব্যবহার বহু পুরাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ব্যাবিলনের পুরাতন চিত্রাদিতে উহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, বাইবেলে উহার উল্লেখ আছে। অ্যারিষ্টোফেনস্ মাইলেসিয়ার নারীদের মধ্যে চামড়ার কৃত্রিম লিঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্যযুগের নানা পুস্তকে নানা দেশে বিধবা, সধবা, সন্ন্যাসিনী প্রভৃতি কর্তৃক ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

রবারের তৈয়ারী জিনিসে আবার গরম জল বা দুধ রাখিয়া পুরুষাঙ্গের অবিকল নকল করিবার এবং কতক ক্ষেত্রে অণ্ডকোষেব মত থলি যোগ করিয়া আরও সাদৃশ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাও হইয়াছে।

ফ্রান্সে রবারের তৈয়ারী স্ত্রী-অঙ্গও পাওয়া যায়। অর্ডার পাইলে পুরুষের পছন্দমত মাপের ও অবয়বের তৈয়ারী করা হয়। অবিবাহিত যুবকেরা বা ভ্রমণ-কারী সৌখীন লোকেরা ইহা ব্যবহাব করিয়া তৃপ্তি পায়।

স্বপ্নদোষ বা কামস্বপ্ন (Erotic dreams)

স্বপ্নদোষে বিষমলিঙ্গ বা সমলিঙ্গের কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির সংস্রবের প্রয়োজন হয় না। স্বপ্নে সঙ্গম বা অনুরূপ ক্রিয়া করা এবং তাহার ফলে উত্তেজনা বা শুক্রস্খলন হওয়াকে **স্বপ্নদোষ** বলে।

নারী অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে স্বপ্নদোষের অধিক প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। নারী যে স্বপ্নে মৈথুন করে না, তাহা নয়। তবে উহাতে শুক্রস্খলন হয় না বলিয়া জাগরণে উহার কথা অধিকাংশ স্থলেই মনে থাকে না।

পুরুষ স্বপ্নে কোনও নারী বা পুরুষের সহিত প্রেমক্রীড়া অথবা সহবাস করে এবং তাহাতে পুলক বোধ করে। এই পুলকানুভূতি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হইলেও ইহা শরীরেব উপর ক্রিয়া করে এবং সত্যসত্যই শুক্রস্খলিত হইয়া যায়। শুক্র-স্খলনের সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ জাগ্রত হইয়া যায়। দুই চারি ক্ষেত্রে স্বপ্নের কথা মনে নাও থাকিতে পারে। সাধারণতঃ পরিচিতার চেয়ে অপরিচিতা নারী সংসর্গই স্বপ্নে বেশী দেখা যায়।

দেহের উপর স্বপ্নের ক্রিয়া আজকাল অধিকাংশ বিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। স্বপ্নে ক্রন্দন করিলে আমরা সত্যই ক্রন্দন করি, স্বপ্নে পরিশ্রম করিয়া ঘর্মাক্ত হইলে আমরা সত্যসত্যই ঘর্মাক্ত হইয়া থাকি, স্বপ্নে কথা বলিলে সত্য-সত্যই আমাদের বাক্যস্ফুট হয় ইত্যাদি দৈহিক অবস্থা হইতে ইদানীং অধিকাংশ পণ্ডিতই স্বপ্নেব দৈহিক ভিত্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

স্বপ্নে শুক্রস্খলন হইলে সত্যকারের শুক্র স্খলিত হইবে ইহা একরূপ অবধারিত। কিন্তু শৈশবে আমরা স্বপ্নের যে একটা দৈহিক নিদর্শন দেখিয়া থাকি, যৌবনে তাহা আব দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহা এই যে শৈশবে আমরা স্বপ্নে মল বা মূত্র ত্যাগ করিলে তাহার দৈহিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। ফলত অনেক সময় শিশুর শয্যামূত্রের কারণ স্বপ্নে মূত্রত্যাগ। কিন্তু যৌবনে যখন আমাদের স্বপ্নে শুক্রস্খলনের দৈহিক ক্রিয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, ঠিক সেই সময়ে আমরা স্বপ্নে হাজার মলমূত্র ত্যাগ করিলেও তাহার দৈহিক ক্রিয়া হয় না। ইহার কারণ এই যে, ঐ বয়সে মলমূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করিতে করিতে আমবা ক্ষমতাবান হইয়া গিয়াছি; তাই মূত্র স্খলিত হইবার পূর্বেই আমরা জাগ্রত হইয়া পড়ি। স্বপ্নের স্বাভাবিকতা ও দৈহিকতা লইয়া বিজ্ঞানীতে বিজ্ঞানীতে যত প্রকার মতভেদই থাকুক না কেন, যৌনবিজ্ঞানের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, স্বপ্নমৈথুনের সহিত দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

স্বপ্নদোষ হয় কেন—গোঁড়া ধার্মিক ও নীতিবাদীগণের অভিমত এই যে, দুষ্ক্রিয়াসক্ত অপবিত্রমনা লোকেরই স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে। এই জন্যই হয়ত স্বপ্নে মৈথুনক্রিয়া দর্শন বা উপভোগ করার নাম **স্বপ্নদোষ** রাখা হইয়াছে। দোষ কথাটার এখন আর কোন অর্থ হয় না। ইহুদিরা স্বপ্নদোষকে অপবিত্র মনে করিতেন, এবং খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মেও এই ধারণা (pollution) সংক্রমিত হইয়াছে। ইসলামে বালকদের সাবালকত্বের নিদর্শন স্বপ্নদোষ হওয়া। বালিকাদের বেলায় অবশ্য ঋতুস্রাবের প্রারম্ভ।

লুথার প্রভৃতি মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণ, এমন কি, ডাঃ মোল ও হউলেনবুর্গ প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণও স্বপ্নদোষকে একটি ভয়াবহ রোগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা-শাস্ত্রেও স্বপ্নদোষকে একটি ব্যাধি বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে মিঃ এলিস, প্যাগেট, ব্রানটন, হ্যামণ্ড ও হ্যামিণ্টন প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানবিদ্ স্বপ্নদোষকে **নিতান্ত স্বাভাবিক দৈহিক ঘটনা** বলিযা অভিহিত করিয়াছেন। **'স্বপ্নদোষ'** শব্দটি'ই ভ্রমাত্মক, যেহেতু (১) নিদ্রাবস্থায় কখনও কখনও বিনাস্বপ্নেই বেতঃস্খলন হইয়া থাকে এবং (২) ইহা আদৌ কোনও দোষ নয়। কেবলমাত্র পুরুষের ক্ষেত্র হইলে ইহাকে **'সুপ্তিস্খলন'** বলাই ঠিক। কিন্তু নরনারী উভযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবার. উপযুক্ত শব্দ **'কামস্বপ্ন'**।

পুরুষের কামস্বপ্নের কারণ—পুরুষেব যৌন-অঙ্গসমূহে শুক্র তৈয়ারী হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। উহা ব্যয় হইবাব সঙ্গে সঙ্গেই আবার উহাবা নূতন বা আবও শুক্র তৈয়াবীব কাজে লাগিয়া যায়। সুস্থ সবল যুবক প্রতিদিন সঙ্গম কবিলেও ঐ যন্ত্রসমূহ আবাব শুক্র উৎপাদন করিয়া পূর্ণ কবিয়া রাখে। প্রতিদিন সঙ্গম না কবিয়া সপ্তাহে দুই-তিন বাব করিলে শুক্রস্খলনেব পরিমাণ ঐ অনুপাতে বেশী হইবে। স্বাভাবিক রতিক্রিয়ায় শুক্রস্খলন না হইলে যুবকেব এপিডিডাইমিসে এবং শুক্রকোষে শুক্র সঞ্চিত হইযা উহাবা একেবারে ভবপুর হইয়া থাকিবে। তাহা সত্ত্বেও কতক কতক যৌনগ্রন্থি আরও রসস্খলন করিতে থাকে। ইহারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদোষ হইয়া গিয়া শুক্রভার লাঘব হয়। ইহা না হইলে জাগ্রত অবস্থায়ও সাময়িক উত্তেজনা আসিয়া শুক্র বাহির হইয়া যাইতে পারে। প্রস্রাবের সহিতও ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে।

ডঃ কিন্‌সেরা এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, শুক্রকীট যোগানই অণ্ডকোষের কাজ, শুক্রের বেশীর ভাগ প্রোস্টেটগ্রন্থি ও শুক্রকোষের রসের সমষ্টি। স্বপ্নদোষে অণ্ডকোষের বেশী প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় না; প্রোস্টেট বা শুক্রকোষের প্রচাপের ফলে ইহা হইলেও এ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের মতে এখন নির্ভুল অভিমত দেওয়া যায় না।

আত্মরতিতে অভ্যস্ত লোকদের বেশী স্বপ্নদোষ হইবে এ কথা ঠিক নহে। বরং কম হইবার কথা,—কারণ, শুক্রভাণ্ডারের ভরপুর হইয়া উপচাইয়া পড়িবার মত ব্যবস্থা হয় না।*

স্বপ্নদোষের পৌনঃপুনিকতার দ্বারা ইহার স্বাভাবিকতার পরিমাপ করিলে উহা সঠিক হইবে না। কারণ, এক ব্যক্তির পক্ষে যেমন সপ্তাহে তিন-চার বার স্বাভাবিক হইতে পারে, অপর ব্যক্তির পক্ষে আবার উহা স্বাস্থ্যহানিকর হইতে পারে। সুতরাং স্বপ্নদোষেও বার দেখিয়া উহার স্বাভাবিকতা বিচার করিলে চলিবে না। স্বপ্নদোষের স্বাভাবিকতা বিচার করিবার একমাত্র মাপকাঠি ব্যক্তির দেহে ও মনে ইহার ফলাফল। ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধানে ইহার স্বাভাবিকতা, পৌনঃপুনিকতা, তারতম্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে।

যাহারা স্বভাবত একটু সংযমী, কিংবা যাহারা বিবাহিত বা রতিক্রিয়াসক্ত হইয়াও সাময়িকভাবে স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে আছে, কিংবা যাহারা রতিশক্তিসম্পন্ন যুবক হইয়াও এ পর্যন্ত বিবাহ করে নাই, সপ্তাহে একাধিকবার স্বপ্নে শুক্রস্খলন হওয়া তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তেমনই উপকারী। এমন কি যদি উপর্যুপরি প্রত্যহ কয়েক দিন স্বপ্নদোষ হইয়া গিয়া কয়েক দিন বিরতির পর আবার ঐরূপ হইতে থাকে এবং তাহাতে যদি শারীরিক কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না হয়, তাহা হইলেও দুশ্চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই।

ডাঃ প্যাগেটের অভিমত এই যে, পুরুষের সপ্তাহে ঊর্ধ্ব সংখ্যায় দুইবার এবং তিন মাসে কমপক্ষে একবার সুপ্তিস্খলন হওয়া স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আত্মরতি বা রতিক্রিয়া ব্যতিরেকে কোনও ব্যক্তির যদি তিন মাসের মধ্যে একবারও না হয়, তবে তাহার রতিশক্তি খুব কম ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। অনেকের আবার দুই-তিন মাস পরে একেবারে উপর্যুপরি দুই-তিন রাত্রি হইয়া আবার দুই-তিন মাস বন্ধ থাকে। ডাঃ ব্রান্টন ও রোহেলডার এই অবস্থাকেও স্বাভাবিক বলিয়াছেন। আবার এরূপও দেখা যায় যে, কাহারও সারা জীবনে মোটেই স্বপ্নদোষ হয় নাই। অবশ্য এরূপ লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। ডাঃ হ্যামিল্টন গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, শতকরা

---

* ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন,—"হস্তমৈথুনকারীদের স্বপ্নদোষ কম হইতে বাধ্য। যাহারা বাল্যকাল হইতে নিয়মিতভাবে স্বল্পকাল ব্যবধানে হস্তমৈথুন করিয়া থাকে, তাহারা অনেক সময়

মাত্র দুইজন লোক এমন দৃষ্ট হয়, যাহাদের স্বাভাবিক রতিশক্তি থাকা সত্বেও ইহা হয় না। **তবে যৌবনের প্রাক্কালেই বিবাহ হইয়া থাকিলে এবং স্বাভাবিক মিলন হইতে থাকায় ইহা না হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।**

ইটালীর ডাঃ গোয়ালিনো এই সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গভীর গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার পাত্র ছিলেন ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক। ডাঃ মারেও অনুরূপ গবেষণা করিয়াছেন। উভয়ের অভিমত এই যে, যৌবনাগমের দুই-এক মাস আগে হইতেই স্বপ্নদোষ আরম্ভ হয়। যাহারা জাগ্রত অবস্থায় আত্মরতি, সহবাস বা অন্য কোনও রূপে শুক্রস্খলন করিয়াছে, কেবল তাহাদেরই যে স্বপ্নদোষ হয় তাহা নহে, সঙ্গম বা অন্য কোনও রূপ শুক্রস্খলনের যাহাদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদেরও হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের **স্বপ্নের বিষয়-বস্তুতে** পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি নারীদেহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নহে, সে কদাচ স্বপ্নে ঘনিষ্ঠভাবে নারীসংসর্গ করিতে পারে না। দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতির স্বপ্নেই তাহার স্খলিত হইয়া থাকে।

ইহা আরম্ভ হইবার পূর্বেই বালকেরা অন্যান্য উপায়ে যৌনতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। খুব কম ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষেই **প্রথম তৃপ্তি** হয়।

কামস্বপ্নের বিশেষত্ব—সচরাচর অপরিচিত নারী বা পুরুষের সহিত সংসর্গের দ্বারা শুক্রস্খলন হইয়া থাকে, প্রিয়জনের সহিত কদাচিৎ স্বপ্নমৈথুন হইয়া থাকে। এমন কি প্রেমিকার কথা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেও অথবা স্ত্রীর সহিত জাগ্রত অবস্থায় চুম্বনাদি শৃঙ্গার করিবার পর যৌন-উত্তেজনা-সহ নিদ্রিত হইলেও যাহার সঙ্গে স্বপ্নমৈথুন হইবে, যে প্রেমিকা নহে—সম্পূর্ণ অপরিচিতা, এমন কি সময় সময় এক কুৎসিত নারী। ডাঃ গোয়ালিনো, লাওয়েনফেল্ড প্রভৃতির মত এই যে, আমাদের জাগ্রত জীবনে ভাবাবেশসমূহ

কোনদিনই স্বপ্নদোষের অভিজ্ঞতা লাভ করে না। আমার এক হস্তমৈথুনকারী রোগী তাহার জীবনে (১৪-১৫ বৎসরে হস্তমৈথুন আরম্ভ হয়, বর্তমানে ২৯ বৎসর বয়স—২ বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, হস্তমৈথুনের অভ্যাস অরবিত্তর এখনও বর্তমান আছে) মাত্র দুইবার স্বপ্নদোষের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। স্বপ্নে শুক্রস্খলন খুবই পুলকপ্রদ বোধ হওয়াতে পুনরায় এই পুলকলাভের জন্য অনেক চেষ্টা (শয়নের পূর্বে রতিচিন্তা, কামোত্তেজক পুস্তক পাঠ বা চিত্রদর্শন) সত্বেও আর কোনদিন স্বপ্নদোষ হয় নাই। কারণ, হস্তমৈথুন না করিয়া সে কিছুতেই একাদিক্রমে দুই-তিন দিনের বেশী থাকিতে পারিত না, প্রত্যহ এক বা একাধিকবার হস্তমৈথুন করিত। বিবাহের পর অবশ্য এ অভ্যাস অনেক কমিয়াছে।

অনুসন্ধানেও মোটামুটি এইরূপ পাওয়া গিয়াছে। যাহারা জাগ্রত অবস্থায় বিপরীত লিঙ্গের সংস্পর্শ বা প্রভাবই বেশী পায় তাহারা স্বপ্নাবেশে বিপরীত-লিঙ্গ মৈথুন আর সমলিঙ্গ-ভাবাপন্ন লোকেরা সমমৈথুন বেশী দেখিতে পায়।

পুরুষ ও নারী উভয়েরই প্রতি কামভাবাপন্ন লোকের একবার একটি আর একবার অপরটি বা একই স্বপ্নে দুই রকম ক্রিয়াই দেখিতে পায়। কেহ কেহ পুরুষাঙ্গ-ভূষিতা নারীর সংসর্গ করে। স্বপ্নে হস্তমৈথুন করা দেখিবারও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কেহ কেহ শুক্রস্খলন হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া পড়ে, কেহ কেহ স্বপ্নের মধ্যে শুক্রস্খলন করে।

নারীদের কামস্বপ্ন

এতক্ষণ আমরা স্বপ্নদোষ সম্বন্ধে যে সব তথ্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহা পূর্ব পূর্ব গবেষকদের অভিমত। সম্প্রতি (১৯৫৩ সালে) ডঃ কিন্‌সে ও সহকর্মীরা এ সম্পর্কে আরও আলোকপাত করিয়াছেন।

ইঁহাদের অনুসন্ধানের ফল এই যে, পুরুষের মধ্যে সুপ্তিস্খলন প্রায় সার্বজনীন বলিয়া এবং পুরুষই প্রায় সমস্ত যৌনশাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে নারীদেরও একই প্রকার স্বপ্নদোষ হয়। তাই অ্যারিষ্টটল, গ্যালেন, হ্যাভলক্ এলিস, রোহেল্‌ডার, মল, কেলী প্রমুখ বহু লেখকই এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুসন্ধান ক্ষেত্রে নারীদের কামমূলক স্বপ্নে চরমতৃপ্তি লাভের দৃষ্টান্ত খুব কম পাওয়া গিয়াছে।

কেন এ রকম হইয়াছে তাহা লইয়া ডঃ কিন্‌সেরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। কারণ, এ সম্পর্কে তথ্যাহরণ ততটা শক্ত নয়। নারীরা অনেকটা পুরুষের মতই স্বপ্নের কথা স্মরণ করিতে পারে এবং গোপনীয়তার সম্পূর্ণ আশ্বাস পাইলে আধুনিকাদের এ সম্পর্কে স্বীকার করিতেও বিশেষ সঙ্কোচ নাই। পুরুষদের শুক্রস্খলনজনিত পুলকাবেগের মত নারীরা চরমপুলক লাভের আবেগে অনেক সময়ে জাগিয়ে পড়ে—ইহাদের যোনি তেমনই রসসিক্ত হয়। অনেক সময়ে নারীর স্বপ্নদোষে দৈহিক আবেগ ও কম্পন পার্শ্বে শায়িত স্বামী বা অপর কেহ লক্ষ্য করিতে পারে।

ডঃ কিন্‌সেদের মতে নারীরা স্বমেহন বা কামস্বপ্ন—এই দুই প্রকারেই যৌন আনন্দ বেশী লাভ করে। কারণ ইহা ছাড়া অপর সকল প্রক্রিয়াই অপর ব্যক্তি

ও সুযোগ, ইচ্ছা, সামর্থ্য ইত্যাদি সাপেক্ষ। ডঃ কিন্‌সেদের জিজ্ঞাসিত নারীদের মধ্যে প্রায় ⅔ অংশ (বা ৬৫%) স্বপ্নদোষের কথা স্বীকার করিয়াছেন। ২০% ক্ষেত্রে চরমপুলক লাভ পর্যন্ত গড়াইয়াছে। যদিও মাঝে মাঝে উহা ছাড়াও স্বপ্নদোষ হইয়াছে। ৪৫% ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ মদনস্বপ্ন দেখিয়াছেন। পুরুষের মত কখনও কখনও নারীরও চরমপুলক লাভের ঠিক পূর্বে ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে।

স্বপ্নদোষের কারণ

ডঃ কিন্‌সেরা বলেন যে মানুষের দেহাংশের স্পর্শন-মর্দনে বা মানসিক উত্তেজনায় মস্তিষ্কের মাধ্যমে যৌনবোধের চেতনা হইলেও প্রধানত মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে অবস্থিত স্নায়বিক কেন্দ্রের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মারফতেই সারা শরীরে অনুভূতি ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে মাংসপেশীসমূহের ছন্দে ছন্দে সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয় এবং চরমপুলকলাভের সময় সারা দেহে বা দেহাংশবিশেষে প্রচাপ ও প্রকম্পনও হয়। জাগ্রত অবস্থায় বা স্বপ্নাবেশে যৌন-উত্তেজনায় একই অবস্থা দৃষ্ট হয়। পার্থক্যের মধ্যে এই হয় জাগ্রত অবস্থায় মানুষ কতকগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ ও তথাকথিত শালীনতাজাত বাধা-বিবেচনা মানিয়া চলে—স্বপ্নাবেশে সে বিধিনিষেধের ধার ধারে না। তাই পুরুষেরা জাগ্রতাবস্থায় যে সমস্ত কর্ম করিবে না এরূপ বহু ব্যাপার স্বপ্নাবেশে দেখে। যথা—শিশু সংসর্গ, নিকট আত্মীয়া মৈথুন, দলগত মৈথুন, অস্বাভাবিক বা অসম্ভব প্রক্রিয়ায় সম্ভোগ, যৌনাঙ্গ প্রদর্শন ইত্যাদি। একটি বিশেষ কথা এই যে স্বপ্নাবেশে অপেক্ষাকৃত ধীরগামী পুরুষ বা নারীও অতি দ্রুত চরমপুলকলাভ করিতে পারে ও করিয়া থাকে।

স্বপ্নদোষের শারীরিক কারণের মধ্যে রাত্রে গুরুভোজন, পোষাক-পরিচ্ছদের প্রচাপ, বিছানার কোমলতা ও উষ্ণতা, পার্শ্ববর্তী কাহারও শরীরের সংস্পর্শ, গ্রন্থি রসের প্রভাব, স্বাস্থ্যের অবস্থা, ক্লান্তি ইত্যাদি প্রধান। মানসিক কারণই মুখ্য। নিদ্রাবেশে যেন অনুভূতিশীলতা বাড়িয়া যায়, তাই জাগ্রত অবস্থায় যতটুকু যৌন-উত্তেজনা সম্পাদনে অপারগ হইত স্বপ্নে তাহা করিতে পারে।

নর ও নারীর কামস্বপ্ন সম্পর্কে ডঃ কিন্‌ষেদের তুলনামূলক তালিকায় লক্ষ্য করিবার বিষয়ঃ

উৎপত্তি	নারী	নর
দৈহিক উত্তেজনা	হাঁ	হাঁ
মানসিক উত্তেজনা	হাঁ	হাঁ
নিদ্রায় বিধিনিষেধের হ্রাস	কখনও	বেশীর ভাগে
গ্রন্থি-প্রচাপ	না	প্রমাণ নাই
স্নায়বিক গোলযোগ	বিরল	বিরল
মানবেতব জন্তু হইতে বিবর্তন	খুব কম তথ্য	কম তথ্য
আদিম লোকেব মধ্যে প্রমাণ পাওয়া	খুব কম	কম
প্রকোপ		
চরমপুলকলাভ হউক বা না হউক	৭০%	প্রায় ১০০%
চরমপুলকলাভসহ,		
(৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত)	৩৭%	৮৩%
চমকপুলকলাভ ব্যতীত	৩৩%	১৭%এর কম
সবচেয়ে বেশী	৪০এব কোঠায়	১৩-২৯ বৎসর বয়সে
পৌনঃপুনিকতা		
কম বয়সেব গড়পড়তা (বৎসবে)	৩-৪ বার	৪-১১ বার
অধিক „ „ „	ঐ	৩-৫ বার
(বয়সেব পঞ্চবার্ষিক কালগুলিতে নিয়মিত)		
বৎসবে ৫ বারের বেশী	৮%	৪৮%
মাসে ২ „ „	৩%	১৪%
সপ্তাহে ১ „ „	১%	৫%
তারতম্যের পরিমাণ	অল্প	অনেক বেশী
বয়স ও দাম্পত্য অবস্থার সম্পর্ক		
(৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত চরম তৃপ্তিসহ)		
অবিবাহিতদের	২২%	৬০%
বিবাহিতদের	২৮%	৪৮%

	নারী	নর
পূর্বে বিবাহিতদের	৩৮%	৫৪%
চরম তৃপ্তিসহ পৌনঃপুনিকতা	দাম্পত্য অবস্থার সহিত সম্পর্ক নাই	কুমারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক

অন্যান্য সম্পর্ক

শিক্ষার স্তরের সঙ্গে সম্পর্কে	নাই	কলেজীদলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক
পিতামাতার পেশার সহিত সম্পর্ক	নাই	নাই
কৈশোরে পদার্পণ করিবার বয়সের সঙ্গে সম্পর্ক	নাই	সামান্য
ধর্মভাবের সহিত সম্পর্ক	ভক্তিমতীদের মধ্যে কম	সম্পর্ক নাই

কামতৃপ্তির অপর উপায়গুলির সঙ্গে সম্পর্ক

কামস্বপ্ন অপর উপায়গুলির অভাব পূরণ করে	১৪%	কতক ক্ষেত্রে
ক্ষতিপূরণ হিসাবে যথেষ্ট নয়	হাঁ	হাঁ
অপর যৌনক্রিয়ার সহিত সম্পর্কে	৭%	কতক ক্ষেত্রে
যৌন-ব্যাপারে সাড়া দিবার ক্ষমতার সহিত সম্বন্ধ	হাঁ	—
কামস্বপ্ন ও আত্মরতির সম্বন্ধ	কতকটা	—
কামস্বপ্ন ও আত্মরতির সময় কামকল্পনার সম্বন্ধে	"	—

স্বপ্নে দৃষ্ট

কে বা কাহারা মনে না থাকা	১%	—
অভিজ্ঞতার পুনরাভিনয়	প্রায়ই	প্রায়ই
বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা	কখনও	মাঝে মাঝে

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, নিদ্রাবস্থায় পুরুষের শুক্রস্খলন এবং নারীর চরমপুলকলাভ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। যদি উহা অতিমাত্রায় এবং রাত্রির মত **দিনের বেলায়ও** হইতে থাকে তবুও বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। আমরা নিম্নে প্রতিকারের কথা বলিতেছি। একটু পূর্বেই যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে উহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, নারীদের ৭০% এবং পুরুষদের মধ্যে প্রায় ১০০% ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষ হয়। কাহারও কাহারও জীবনে মাত্র কয়েকবার হইতে কাহারও কাহারও প্রায় প্রত্যেক নিদ্রাবেশে উহা হয়। তাই এ সম্পর্কে অযথা শঙ্কিত হইতে নাই। বিবাহের পূর্বেই স্বপ্নদোষ বেশী হয়। আয়ুর্বেদ ও ইউনানী শাস্ত্রের মতে এই ধরনের স্বপ্নদোষের অর্থ এই যে, শুক্রতারল্য ব্যতীত ঐরূপ ঘটিতে পারে না! **ঘন ঘন** স্বপ্নদোষ *হইলেই* বুঝিতে হইবে—শুক্রতারল্য ঘটিয়াছে, এই ধারণা ভুল।

প্রতিকার

নানা কারণ বা শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন অবস্থার ফলে সুপ্তিস্খলনের তারতম্য হইতে পারে। যথা—

(১) অতিরিক্ত মদ্যপান। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ, বিশেষতঃ ডিম, সস, ঝিনুক, শেলফিস, যকৃৎ, গরম মসলা ইত্যাদি উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ। (সকল প্রকার স্বপ্নদর্শনের অন্যতম কারণ রাত্রির আহার ভাল হজম না হওয়ায় পেট গরম হওয়া)।

(২) অতিরিক্ত কামচিন্তা। প্রেমাত্মক নাটক ও গল্পের বই পড়িয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করিলে উহা হস্তমৈথুন বা অন্য কোন প্রতিক্রিয়ায় প্রশমিত না হইলে স্বপ্নদোষ হইয়া যাইতে পারে।

(৩) জাগ্রত অবস্থায় অতিমাত্রায় শৃঙ্গার। কামপাত্রের সহিত যৌন-বিষয়ক গল্প-গুজব, হাসি-তামাশা বা ছোঁয়াছুঁয়ি অথবা পাশ্চাত্য প্রথায় নৃত্য বা আমোদজনক ক্রীড়াকৌতুকজনিত উত্তেজনার নিবৃত্তি প্রায়ই, স্বাভাবিক-ভাবে না হইলে, স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে।

(৪) গরম বা কোমল শয্যায় শয়ন।

(৫) [illegible] চিত হইয়া শয়ন। (এই অভ্যাস দূর করিতে হইলে একটি

গামছায় দুইটি গেরো দিয়া একটি পেটের ও অপরটি পিঠের উপর রাখিয়া গামছা শরীরে বাঁধিয়া শুইবেন)।

(৬) যৌনপ্রদেশে গরম কাপড় বা লেপের দরুন উষ্ণতা সঞ্চার।

(৭) মূত্রাধারের পরিপূর্ণ অবস্থা। মূত্রাধার পূর্ণ হইলে শুক্রকোষে চাপ লাগে। এই জন্য শেষরাত্রে সচরাচরই লিঙ্গোদ্রেক হইয়া থাকে। (শুইবার পূর্বে এবং মধ্যরাত্রে উঠিয়া প্রস্রাব করা ভাল)।

(৮) শুক্রকোষের উত্তেজনা (Irritation)।

(৯) রাত্রে বেশী দেরিতে খাওয়া, উত্তেজক জিনিস খাওয়া।

(১০) লিঙ্গমুণ্ড বা যোনিদেশ অপরিষ্কার রাখা। (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার জন্য নিয়মিতভাবে ঐ সকল ধৌত করা উচিত। ত্বক-ছেদ (circumcision) করিলে বালকদের লিঙ্গমুণ্ড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে)।

উপরোক্ত কারণসমূহ জানা থাকিলে অনেকে নিজে নিজেই স্বপ্নদোষ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন। নিজের বেলায় উপরোক্ত কারণসমূহের কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি ক্রিয়া করিতেছে, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলেই ঐ কারণ বা কারণসমূহের প্রতিরোধ করিতে পারা যাইবে। যথা—

খাদ্য বা মদ্যপানজনিত উত্তেজনার প্রতিষেধক হইবে মিতাহার, লঘুপাক হাল্কা জিনিস খাওয়া। রতিচিন্তার প্রতিষেধক হইবে প্রেমাত্মক পুস্তক, সিনেমা, সঙ্গীত প্রভৃতি বর্জন এবং কোন গুরুতর বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট রাখা ও সংসঙ্গ করা। একজন বেশ্যা রুসোকে (Rousseau) উপদেশ দিয়াছিল—"আপনি মেয়েদের সংস্রব ছেড়ে অঙ্কশাস্ত্রে মনোনিবেশ করুন।"

রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বে কনুই অবধি হাত, হাঁটু অবধি পা, মুখ, চোখ, ঘাড, কান প্রভৃতি (মুসলমানদের 'ওজু' করার মত) ঠাণ্ডা জলে ধোওয়া-মোছা এবং লিঙ্গদেশ বা যোনিপ্রদেশে ঠাণ্ডা জল কিছুক্ষণ ঢালা ভাল। শুইবার পূর্বে কোনও সৎ, মহৎ ইষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করা ভাল।

বিবাহিত জীবনের **পরিমিত দাম্পত্য সংসর্গে** স্বপ্নদোষ আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে, ইহা একরূপ অবধারিত সত্য। সুতরাং এ সম্পর্কে অযথা ভয় পাইবার কিছু নাই। নারীজীবনের স্বপ্নদোষের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সঙ্গমক্রিয়ায় বিশেষ অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত না হইলে তাহারা সম্ভোগের স্বপ্ন দেখে না।

স্বকাম বা আত্মপ্রেম (Narcissism)

গ্রীক বীর Narcissus নাকি তাঁহার নিজের চেহারা নদীর জলে প্রতিফলিত দেখিয়া উহার প্রেমে পড়েন। তাই স্বকামের নাম Narcissism রাখা হইয়াছে। এইরূপ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট নর বা নারী নিজেদের শরীরের প্রতিচ্ছবি এবং বুদ্ধির দিকে একরকম প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। ইহারা আয়নায় নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আরাম বোধ করে, এমন কি আদরসোহাগ ও প্রেম-নিবেদন পর্যন্ত করে। নানারকম সাজ-পরিচ্ছদে সজ্জিত নিজেদের দেহ-সৌষ্ঠবের প্রতিচ্ছবি উপভোগ করে, কখনও নগ্ন দেহ পর্যবেক্ষণ করিয়া আনন্দ পায়। নিজেদের ফটো দেখিয়া আত্মহারা হয়। পুরুষদের মধ্যে অনেকে স্বকামেই বেশী আমোদ পায়।

নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে আত্মপ্রেমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আত্মপ্রেম অল্পবিস্তর সকলেরই আছে কিন্তু উহা বিকৃতির আকার ধারণ করে তখনই যখন বিপরীত-লিঙ্গ সংসর্গের চেয়েও আত্মপ্রেম মধুর মনে হয়। এই অবস্থায় প্রতিষেধক বিপরীত-লিঙ্গ ব্যক্তিদের সাহচর্য। তাঁহাদের প্রতি প্রেমই স্বকামের সংশোধক।

যৌনবোধের বিভিন্নমুখী প্রকাশ (৩)

সমকাম (Homosexuality)

সংজ্ঞা—নারী নারীর এবং পুরুষ পুরুষের দেহ দ্বারা নিজ কামের তৃপ্তি সাধন করিলে উহাকে সমকাম বলে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুরুষ পুরুষে উপগত হওয়াকে পুংমৈথুন বলা হইয়া থাকে। কিন্তু পুংমৈথুন কথাটি পরিষ্কার অর্থজ্ঞাপক নহে। পুরুষে পুরুষে মৈথুন এই অর্থে পুংমৈথুন বলিলে ভাষাকে নিরর্থক সংকীর্ণ করা হয়। পুংমৈথুনের বিপরীতার্থক শব্দ যদি 'স্ত্রীমৈথুন' হয়, তবে 'মৈথুনে'র কর্তা কেবল পুরুষই হয়। কিন্তু তাহা সত্য নহে। **স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকেও** মৈথুন হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কাজেই আমরা সমলিঙ্গ মানবের পরস্পরের দেহ উপভোগকে 'সমকাম' বলিব।

প্রকারভেদ—'পুংমৈথুন' বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা ব্যতীত নানা স্থানে পারস্পরিক চুম্বন ও হাত বুলানো, আলিঙ্গন, সাথীর হস্তমৈথুন, উরু-মৈথুন, মুখমৈথুন প্রভৃতি বহু উপায়ে পুরুষে পুরুষে উপগত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ঐরকম ভাবে এবং পরস্পরের স্তন ও যোনিদেশে হস্তস্পর্শ, যোনিদেশ ঘর্ষণ, লেহন, একজনের ভগাঙ্কুর অপরের যোনি-মধ্যে স্থাপন ইত্যাদি করিয়া মৈথুন হইয়া থাকে। বস্তুত সমকামের বিশেষত্ব **পাত্রে, ক্রিয়ায়** নহে। স্বামী তাহার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার ব্যবহার করিলেও উহাকে সমকাম বলা যায় না।

কারণ—এই সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিক, সহজাত, ব্যাধি কিংবা বিপরীত শ্রেণীর অভাববশত সাময়িক উচ্ছ্বাস—এ বিষয়ে শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও যৌনবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণের মধ্যে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট মতভেদ আছে। হ্যাভলক্ এলিস্, হ্যামিলটন ও জকারম্যানের মত উদ্ধৃত করিয়া বিভিন্ন জন্তুর প্রকৃতির ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সভ্য-মানুষের বিবেচনায় সমমৈথুন দোষণীয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক এবং প্রাণি-জগতের বিভিন্ন স্তরে আবহমানকাল হইতে বিদ্যমান।

ইতর প্রাণীদের মধ্যে সমমৈথুনের বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যায়। পুরুষ-কবুতরের অভাবে দুইটি মেয়ে-কবুতর একে অন্যে উপগত হয়, অ্যারিষ্টটল ইহা

লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাফন (Buffon) লক্ষ্য করেন যে, একই লিঙ্গের পাখী—মুরগী, ঘুঘু, কবুতর ইত্যাদি একসঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কিছুকাল পরেই উহারা পরস্পরে উপগত হয়। **পুরুষ পাখী মেয়ে-পাখী অপেক্ষা অনেক তাড়াতাড়ি এইরূপ করে।** ষাঁড়ে ষাঁড়ে গাভীতে গাভীতে, কুকুরে কুকুরে, ইঁদুরে ইঁদুরে (বিষমলিঙ্গের অভাবে) অহরহ সমমৈথুন হইয়া থাকে। ফ্রাঙ্কফোর্ট চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ ডঃ সীট্জ (Seitz) ইতর প্রাণীর মধ্যে সমমৈথুনের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। **এইসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রকৃত কামপাত্রের বা পাত্রীর অভাবে উহার সমতুল্য বা কাছাকাছি কিছু দিয়া উত্তেজনার নিবৃত্তি করা হয় মাত্র।** বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গী পাইলে আর এই সব কার্যকলাপের দরকার হয় না। মানুষের সম্বন্ধেও সাধারণতঃ এই কথা খাটে, তবে খুব কম দুই-এক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ আকর্ষণ, ভিন্ন লিঙ্গ প্রাণী সহজ প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যমান থাকে।

প্রসার—ইহা ছাড়া মানুষের মধ্যে সমকাম বিষয়ে ইতিহাসে বহু নজীর আছে। সিরিয়া এবং মিশরের অধিবাসীদেরও মধ্যে সমমৈথুনের এত বাহুল্য ছিল যে, তাহাদের পূজনীয় দেবতাদেরও ইহাই ছিল শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। হোরাস ও সেট নামক দুইজন সমমৈথুনক দেবতা মিশরীয়গণের দ্বারা পূজিত হইত। কার্থেজের অধিবাসীদের মধ্যে বীরত্বের লক্ষণ বলিয়া প্রশংসিত হইত। ডরিয়ান, সিদিয়ান ও রোমানদের মধ্যে ইহা বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন ছিল। গ্রীক জাতির চরম উন্নতির সময়ে ইহাকে যে তাহারা কেবল বীর ও দেবতার গুণ বলিয়াই গণ্য করিত তাহা নহে, ইহা কৃষ্টি, কলা ও সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচায়ক ছিল। সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি মনীষিগণের সকলেই সমকামী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। মধ্যযুগীয় ইউরোপে এই অভ্যাসের বহুল প্রচলন ত ছিলই, **রেনেসাঁর (Renaissance)*** পরে ইউরোপে ইহার প্রচলন যে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইউরোপের সাহিত্যেই তাহারই সাক্ষী। দান্তের পুস্তক-জানা যায় যে, তাঁহার শিক্ষক ল্যাটিনের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরও এই অভ্যাস শেক্‌স্‌পিয়ার, মারে (Maret), মিকেল আঞ্জেলো (Michael Angelo)

* পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের নবজাগরণ হইয়া

মার্লো (Marlowe), বেকন (Bacon), অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde) প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতগণের এই অভ্যাস ছিল বলিয়া জানা যায়।

আরব পারস্য ও আফগানিস্থানে এই অভ্যাসের এত প্রচলন ছিল যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর কঠোর হস্তে উহা দমনের চেষ্টা হইতে দেখা গিয়াছে।

ইহা ত গেল ঐতিহাসিক যুগের কথা। বর্তমান সভ্যতার যুগেও পৃথিবীর সর্বত্র এই অভ্যাস বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভ্যাসের কিছুমাত্র হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইহা অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ, প্রভৃতি দেশের আইন ইহার বিরুদ্ধে অতীব কঠোর ; তথাপি ইহা এই সমস্ত দেশ হইতে দূর হয় নাই।*

ইহুদী, খ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মে সমমৈথুনকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়। বাইবেলে ও কোরানে সডম ও গমোরা (Sodom and Gomorah) নামক দুইটি শহরের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উল্লেখ আছে। ইহাদের অধিবাসীদের এই অভ্যাস নাকি এত বদ্ধমূল ছিল যে, পুরুষেরা নারী উপেক্ষা করিয়া পুরুষের পশ্চাতে ধাবিত হইত। জেহোভা (খোদা) নাকি ক্রুদ্ধ হইয়া এই দুইটি শহর ধ্বংস করে।

আগ্নেয়গিরির উৎপাতে প্রাকৃতিক ভাবেই উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু অধিবাসীদের এই প্রবৃত্তির শাস্তিস্বরূপ মানুষ উহার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে। বিহারের ভূমিকম্পের বহু নরনারী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মহাত্মা গান্ধী উহাকে ভগবানের আক্রোশমূলক ব্যবস্থা বলিয়া প্রকাশ করেন। এ রকম উক্তি কুসংস্কারমূলক ও ভগবানের (খোদার) পক্ষে মানহানিজনক।

যাহা হউক, ঐ Sodom নগরীর কথাটা হইতেই Sodomy (পুংমৈথুন) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

সুতরাং সমকাম যে যৌনবৃত্তির একটা নিতান্ত আকস্মিক অঘটন নহে, পরন্তু **বহু প্রচলিত একটি সাধারণ অভ্যাস,** এ কথা স্বীকার করিতে হইবে ইহার বহুল প্রচার দেখিয়া বহু বিজ্ঞানী, বিশেষত উলরীক্‌স (Ulrichs) ও হার্সফেল্ড (Hirschfeld) প্রভৃতি জার্মান ডাক্তারগণ ইহাকে অন্যান্য যৌন-

*কতক ব্যক্তি রতিজ রোগের ভয়ে সমমৈথুনে সামরিক উত্তেজনার নিবৃত্তি করে, কেহ কেহ স্বাভাবিক সঙ্গমের সুবিধা না থাকায় উহা করে কতক ঐ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, কোনও [illegible] তাহাতে তৃপ্ত হয় না বলিয়া, অথবা সঙ্গদোষে কিংবা শুধু বৈচিত্র্যের অভিলাষে সমমৈথুনে প্রবৃত্ত হয়।

ক্রিয়ার ন্যায় স্বাভাবিক ক্রিয়া বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমমৈথুনবৃত্তি মানুষের; ব্যাধি নহে, উহা কামনার একটা স্বাভাবিক দিকমাত্র।* কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের যৌনবিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ ফোরেল, ইংলণ্ডের ডাঃ মার্শাল, জার্মানীর ডাঃ ক্রাফট্ এবিং এই অভ্যাসকে দস্তুরমত ব্যাধি আখ্যা দিয়াছেন এবং সমমৈথুনকদিগকে চিকিৎসিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

এই দুই বিরুদ্ধমতাবলম্বীর মধ্যে একদল মধ্যপন্থী আছেন। এলিস্ এই দলের মধ্যে প্রধান। তিনি বলেন যে, সমমৈথুনবৃত্তি স্বাভাবিক বৃত্তিও নহে, উহাকে একটা ব্যাধিও বলা যাইতে পারে না। উহা মানুষের একটা বহু-প্রচলিত মানসিক বিশৃঙ্খলা বা ছিট মাত্র।

কিন্তু আমাদেব মনে হয়, সমকামীদের প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করিলে অনায়াসেই এই বিতর্কের অনেকখানি অবসান হইয়া যাইবে। এক শ্রেণীর **প্রবৃত্তি নিতান্তই সাময়িক**। ইহারা যতদিন বিপরীতলিঙ্গের সংসর্গের সুযোগ না পায়, ততদিনই ইহাতে লিপ্ত থাকে; উহা পাইলেই ইহারা ক্রমে ক্রমে ইহা ত্যাগ করে। এই শ্রেণী সাধারণতঃ বালক, বালিকা, কিশোর, কিশোরী, জেলের কয়েদী, মঠের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী, নাবিক ইত্যাদি দ্বারাই গঠিত।

স্কুল-কলেজেব হোষ্টেলের বালক-বালিকারা একদিকে যেমন বিষমলিঙ্গেব লোকের সহিত অধিক মিশিবার সুযোগ পায় না, পক্ষান্তরে তেমনি সমশ্রেণীব সহিত অবাধে ক্রীড়াকৌতুক, স্নান ও শয়ন-উপবেশন করিবার সুবিধা পায়। একই প্রকোষ্ঠে শিক্ষক বা অন্য কোনও গুরুজনের দৃষ্টির আড়ালে পাশাপাশি শয্যায় ইহারা রাত্রি যাপন করে বলিয়া ইহাদের মধ্যে এই অভ্যাস প্রসার লাভ করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণের মধ্যে ইহার প্রসার এত বেশী যে, আমেরিকার ডাঃ পেক বোষ্টনের কলেজের শতকরা ২৫ জনকে ইহাতে লিপ্ত দেখিয়াছেন। ডাঃ হ্যামিল্টন শতকরা ৪৫ জন নারী ও ৩৬ জন পুরুষকে ইহাতে নিযুক্ত দেখিয়াছেন। ক্যাথারিন ডেভিস শতকরা প্রায় ৩২ জন নারীকে এই অভ্যাসের দাসত্ব করিতে দেখিয়াছেন।* কিন্তু তিনি ইহাও

*নারীদের মধ্যে সমমৈথুনের প্রসার সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ বলিয়া উহাদের একত্র থাকাটা আমাদের ততটা সন্দেহ উদ্রেক করে না। দুইটি মেয়ে একত্র শুইলে কাহারও আপত্তি বা সন্দেহ হয় না। দুইটি মেয়ে একঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া স্নান, গল্প-তামাশা করিলেও ততটা সন্দেহ হয় না।

বলিয়াছেন যে, শতকরা ৪৮ জন সমকামী নারী যৌবনে এই অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছেন।

ডঃ কিন্‌সে ও তাঁহার সহকর্মীদের অনুসন্ধানে

ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধানেও সমকাম সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। ইঁহারা সমকাম অর্থে নর নরে ও নারী নারীতে উপগত হইয়া কাম-চরিতার্থ করা বুঝেন—সে যে ভাবেই বা যে প্রক্রিয়াতেই হউক না কেন। 'সমকামী' বলিয়া কোনও ব্যক্তিকে বুঝানো উচিত নয়, কারণ একই ব্যক্তি সময় ও সুযোগ মত সমকামে লিপ্ত হইতে পারে আবার বিপরীত লিঙ্গের সংস্পর্শে তাহার স্বাভাবিক যৌন-ব্যবহার পরিলক্ষিত হইতে পারে।

নানাভাবে ভুল বুঝিবার দরুন পূর্ববর্তী বহু পণ্ডিতের গবেষণায় যে কতটা ভুল রহিয়া গিয়াছে ডঃ কিন্‌সেরা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ সম্পর্ক স্বীকার করার সংকোচের দরুনও তথ্যানুসন্ধানে বিঘ্ন উপস্থিত হয় বলিয়া ইঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া, সৈন্য ও নাবিকদের এরূপ স্বভাব, অভ্যাস বা প্রবণতাকে কর্তৃপক্ষেরা বিষম রোষের সহিত দেখেন বলিয়া তথ্যানুসন্ধানে খুবই অসুবিধা হয়।

একই লিঙ্গের দুই ব্যক্তির মধ্যে আলাপে, আদরে কামভাব জাগ্রত ও আংশিক তৃপ্ত হইলেও ইঁহারা চরমতৃপ্তি না হইলে আর উহাকে ধর্তব্য মনে করেন নাই, তাই ইঁহারা যে সংখ্যানুপাত দিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে সমকামের প্রসার আরও বেশী ধরিয়া লওয়া যায়।

তাঁহাদের হিসাবে (অর্থাৎ চরমতৃপ্তি পর্যন্ত ধরিলে), শতকরা কমপক্ষে ৩৭ জন পুরুষ কৈশোর হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত সময়ে সময়ে সমকামে লিপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ আমেরিকায় প্রতি ৩ জনের একজন সমকাম চরিতার্থ করিয়াছে। ৩৫ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিত পুরুষদের মধ্যে এই অনুপাত প্রায় শতকরা পঞ্চাশে উঠিবে। কাহারও এক বা একাধিক অভিজ্ঞতা হইতে কাহারও বহুকাল পর্যন্ত নিয়মিত অভিজ্ঞতা থাকে।

এই সংখ্যানুপাতে ডঃ কিন্‌সেরা বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এমন যে হইবে তাহা বিশ্বাসই করেন নাই। তাই তাঁহারা নানা ভাবে, নানা জায়গায়, নানা পরিবেশে এই সংখ্যানুপাত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করিয়াছেন। তাহাতেও ফল প্রায় একইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের মতেও ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। নীতিবাগিশেরা চোখ বুজিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু নর ও নারীর যৌন-ব্যবহার যে এক অদম্য সহজাত বৃত্তির তাড়নার ফল ইহা ভুলিয়া যান। ডঃ কিন্‌সেরা মন্তব্য করেন যে, **এই সংখ্যানুপাত যে পূর্ব পূর্ব যুগের চেয়ে বেশী বা কম ব্যাপক তাহা মনে করিবার কোনই হেতু নাই।** অবশ্য সময়, সুযোগ, পাত্র ইত্যাদির অভাবে সমকামচরিতার্থতার পৌনঃপুনিকতা খুব বেশী নয়। সমাজের ভ্রূকুটি, ঘৃণা ইত্যাদি ও উহার গোপন সম্ভাব্যতা পোষণ করে।*

ডঃ কিন্‌সেরা **সমকামী ও বিপরীতকামী নর ও নারীর অনুপাত** শীর্ষক এক সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, সমকামী ও বিপরীতকামী এই দুই শ্রেণীর লোক আছে বলিয়া সাধারণ লোকও বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক ভুল ধারণা চলিয়া আসিয়াছে। এই ধারণায় ব্যক্তিমাত্রই হয় এক না হয় অপর শ্রেণীর এবং উহার জন্মের পরে আর পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। এইরূপ অমূলক ভাগাভাগির জের-হিসাবে বহু কথা বলা হইয়া থাকে। সমকামীদের চেহারা, আচরণ ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া নাকি বলা যায় ইহারা ঐ শ্রেণীর। সমকামী পুরুষ নাকি সুগঠিত হয় না, আচরণে নাকি ইহারা কোমল-পন্থী, ইহাদের গতি ও কর্মপ্রবণতা নাকি নিস্তেজ, খেলাধূলায় নাকি ইহাদের আসক্তি হয় না ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমকামী নারীদের সম্পর্কেও বহু বাজে কথা বলা হয়। ডঃ কিন্‌সেরা এ সম্বন্ধে মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন, "পুরুষ-জাতি-সমকামী ও বিপরীতকামী বলিয়া কোনও দুইটি শ্রেণীবিশেষে বিভক্ত নয়। দুনিয়াকে সাদা ও কালোয় বিভাগ করার কোনও সার্থকতা নাই। প্রকৃতি সীমাবদ্ধ শ্রেণীবিভাগে অভ্যস্ত নয়, মানুষ এই সকল আবিষ্কার করে ও প্রকৃতির উপর চাপায় মাত্র।"

অনেক সময়ে মাত্র একবার চেষ্টায়ই ধরা পড়িয়া বা জানাজানি হইয়া গেলে নর ও নারীকে সমকামী আখ্যা দেওয়া হয় এবং কঠোর শাস্তি পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

---

* ডাঃ ক্লিফোর্ড এ্যালেন, লণ্ডন, বলেন : "From the work of Davis, and now from Kiusey's confirmation. it is possible that as much as a third of the population of America have broken the law by the time adult age is reached and could be imprisoned. It is unlikely that things are any different in England—no matter how much we might wish them to be."

সারা দুনিয়ার লোককে দুই শ্রেণীতে ভাগাভাগির করার চেষ্টা বৃথা। তবে মোটামুটি পরবর্তী-চিত্রে প্রদর্শিত হারাহারি আমেরিকার বেলায় খাটে। অপর অপর দেশেও অনেকটা এই রকমই হইবে। সামাজিক; ধর্মীয়, শিক্ষাগত, সংস্কারগত ইত্যাদি কারণ তারতম্যে উনিশ-বিশ হইতে পারে মাত্র।

সমকামী নর ও নারীর শারীরিক কোনও বৈচিত্র্য আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মানসিক ছিট বা বৈকল্যের কথাও প্রকাশ পায় নাই। তবে কতক কতক সমকামী নর ও নারী এমন ছিটগ্রস্ত দেখা যায় যে, তাহারা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া ধরা পড়ে। সে কথা মানিয়া লইয়া একথাও বলা যায় যে, ছিটগ্রস্ত বিপরীতকামীও ত দেখা যায়। আমাদের সমাজের অনুশাসন বা ফ্যাশান কাপড়-চোপড়, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, ইত্যাদি অনেক কিছুতেই আছে কিন্তু আবার ব্যক্তিবিশেষে রুচিভেদেও একেবারে কম নয়।

গোল্ডস্মিড (Goldschmidt) অনেক অনুসন্ধান করিয়া ভুল বুঝিবার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, সমকামীদের বোধ হয় বংশগত কোনও দোষ আছে। এ কথার কোনও সমর্থন পাওয়া যাইতেছে না।

ডঃ কিন্‌সেদের অভিমতে একেবারে সমকামী বা বিপরীতকামী অল্পসংখ্যক লোক (নর ও নারী) থাকিলেও থাকিতে পারে—বেশীর ভাগই—এদিক ওদিক দুই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে ও পড়িতে পারে। এই সংখ্যানুপাত তাঁহারা বুঝাইয়াছেন নিম্নের চিত্রে।

৩১নং চিত্র

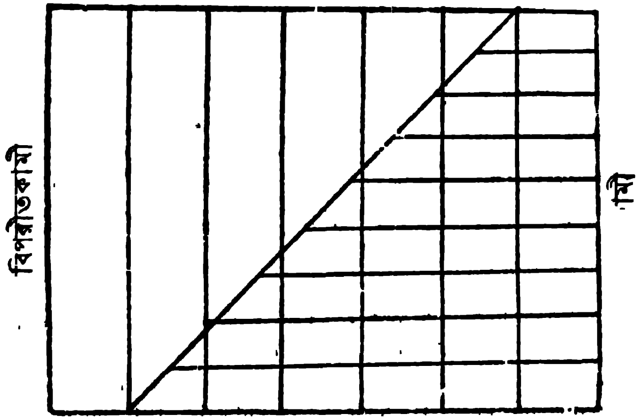

বিপরীতকামী এবং সমকামী ব্যক্তিদের অনুপাত

০—একেবারে বিপরীতকামী।

১—বেশীর ভাগেই বিপরীতকামী, অল্পমাত্রায় সমকামী।

২—বেশীর ভাগেই বিপরীতকামী, তবে মাঝে মাঝে সমকামী।

৩—সমানভাবে বিপরীত ও সমকামী।

৪—বেশীর ভাগেই সমকামী, মাঝে মাঝে বিপরীতকামী।

৫—বেশীর ভাগেই সমকামী, অল্পমাত্রায় বিপরীতকামী।

৬—একেবারে সমকামী।

ডঃ কিন্‌সেদের নর ও নারীর সমকামের তুলনামূলক তথ্যাদি হইতে নিম্নলিখিত তথ্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য :

সমকামাত্মক আকর্ষণ ও আচরণ

শারীরিক ও মানসিক ভিত্তিতে	নারীতে	নরে
যথোচিত উত্তেজনায় সাড়া দিবার ক্ষমতা	আছে	আছে
মানসিক কারণ পরম্পরায় সমলিঙ্গের সম্বন্ধে কামানুভূতির বিকাশ	আছে	আছে
মানবেতর জন্তুতে সমকামের ব্যাপক প্রকোপ	আছে	আছে
আদিম মানবসমাজে		
সমকাম সম্পর্কীয় তথ্যাদি	খুব কম	কিছু
বিপরীতকাম সকল সমাজে বেশী গ্রাহ্য	হাঁ	হাঁ
সমকামে কদাচিৎ অনুমতি দেওয়া হইত	হাঁ	হাঁ
সমকাম সম্পর্কে সমাজের উৎকণ্ঠা	কম	বেশী
প্রকোপ ও প্রসার		
সমকামানুভূতি, (৪৫ বৎসর পর্যন্ত)	২৮%	৫০%
সমকামবিহার, চরমপুলকলাভ পর্যন্ত	১৩%	৩৭%
দাম্পত্য অবস্থা		
অবিবাহিত	২৬%	৫০%
বিবাহিত	৩%	১০%
পূর্বে বিবাহিত	১০%	—

সমকামের কলাকৌশল	নারীতে	নরে
বিপরীত শ্রেণীর সহিত প্রেমক্রীড়ারই মত	হাঁ	হাঁ
চুম্বন ও সাধারণভাবে শারীরিক সংস্পর্শ	প্রচুর	অল্প
যৌনাঙ্গে উত্তেজনা প্রদান	কিছুদিন পরে বা কখনও না	প্রারম্ভেই ও বরাবর

বালকবালিকার সমকামের ধরণ—বাল্যকালে বা যৌবনের প্রারম্ভে সমকামের অভ্যাস দেখিয়াই মানুষকে ব্যাধিগ্রস্ত, যৌন-বিকল্পী বা দুরাত্মা আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না। সত্য বটে, ছাত্রজীবনে এই প্রবৃত্তিতে স্বাভাবিক বৃত্তির (বিপরীত কামের) **সমস্ত বৈশিষ্ট্য** এরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে যে, তাহাকে উৎকট বিকল্প আখ্যা দেওয়া যায়। এক বালক/বালিকা অপর বালক/বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এমন সব বিচিত্র ব্যবহার করে বা ভাবপ্রবণতা দেখায় যে তাহাকে দস্তুরমত রোমাণ্টিক ভালবাসা বলা যাইতে পারে। ইহারা দেবতা সাক্ষী করিয়া পরস্পরকে ভালবাসে, ইহাদের একজনের অভাবে অন্যজন অত্যধিক বেদনা বোধ করে। গ্রীষ্ম বা পূজার দীর্ঘ বিদায়ের দিনের বিদায়দৃশ্য যে-কোন নাটকীয় দৃশ্যকে পরাভূত করিতে পারে। এই বিচ্ছেদের যাতনার লাঘব করে ইহারা পরস্পরের নিকট দীর্ঘ পত্র লিখিয়া। প্রণয়ে বাধাপ্রাপ্ত হইলে অনেক সময়ে অভিমান, কান্নাকাটি, রাগ, ঈর্ষা, বিবাদ ও রক্তপাত পর্যন্ত হইতে দেখা যায়।

কিন্তু এ সমস্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাময়িক। **বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিবাহ হইয়া গেলে এই সমস্ত তরল চাঞ্চল্য আপনা আপনি বিদুরিত হয়,** কাহারও উপদেশ বা পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এই সাময়িক বালসুলভ চপলতাকে একটা স্থায়ী মনোবৃত্তি কল্পনা করিয়া ইহাদিগকে যৌনবিকল্পী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। শৈশবের সাময়িক প্রণয়লীলা অনেক ক্ষেত্রেই বালক-বালিকার বিশেষ কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। কারণ, যথাসময়ে ইহা বিনা চেষ্টায় দূর হইয়া যায়। স্নেহমমতা ও সহানুভূতির দ্বারা এবং **বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গলাভের সুযোগ দিয়া** বালক-বালিকাদের এই দোষ দূর করা যত সহজ, শাসনের দ্বারা তত নহে।

পাত্র-পাত্রীর অভাব সমকামের কারণসমূহ :

কতক বয়স্কদের ও সমমৈথুনকদের এই সাময়িক পর্যায়ে ফেলা যায়। যেখানে বিপরীত লিঙ্গের পাত্রপাত্রীর একেবারে অভাব, অথচ বহুদিন ধরিয়া নর বা নারীকে অবস্থান করিতে হয়, সেখানেই সাধারণতঃ সমমৈথুনের বহুল প্রসার পরিলক্ষিত হয়। সৈনিকদের মধ্যে ইহার প্রসারের কারণ তাহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অভাব। জাহাজের নাবিক, খালাসী, জেলখানার কয়েদী এবং হোস্টেল, কনভেণ্ট বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে একই লিঙ্গের লোকের দীর্ঘকাল একত্রে অবস্থান এবং ভিন্ন-লিঙ্গের লোকের অভাবের দরুন এইরূপ সাময়িক সমমৈথুনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

নর ও নারীদের এই অভ্যাসের সূচনা হয় পারস্পরিক আলাপ, সম্ভাষণ বা একত্র অবস্থানে। অনুরূপ অবস্থার পরিবর্তনে আবার ঐরূপ অভ্যাস পরিত্যক্ত হয়। তবে কতক ক্ষেত্রে এই সকল অভ্যাস থাকিয়াও যায়।

বয়স্কদের স্থায়ী অভ্যাস

অল্প কতক ক্ষেত্রে এই অভ্যাস বা প্রবৃত্তি বয়সকালেও অটুট থাকে। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াও কেহ কেহ বিষমলিঙ্গের সহবাসে আসক্ত হয় না। বরং বাল্যের দৃঢ়মূল অভ্যাস অনুযায়ী সমলিঙ্গের সহিত সকর্মক বা অকর্মক ভাবে যৌনতৃপ্তি খুঁজে। এমন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, নারীসংসর্গে যাহারা অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, অথচ সুশ্রী পুরুষ দেখিলেই তাহাদের লালসা ও বাসনা উন্মত্ত হইয়া উঠে। ইহাদিগকে যৌনবিকল্পী এবং ইহাদের মনোবৃত্তিকে অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে।

বালক দেহজীবী

বহু দেশে পুরুষবেশ্যার অস্তিত্বই সমমৈথুনের প্রসারের বড় নিদর্শন। যৌনবিজ্ঞানী ডাঃ হার্সফেল্ড (Dr. Hirschfeld) সমমৈথুন সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলিয়াছেন যে, এক বার্লিন নগরীতেই এক হাজার পুরুষ-বেশ্যা ব্যবসায় করিত। ওয়ার্নার পিক্টনের (Warner Picton) মতও তাহাই। শুধু জার্মানী নহে, পৃথিবীর বহুস্থানে নারীর স্থলাভিষিক্ত পুরুষবেশ্যা বিদ্যমান আছে। তবে জার্মানীতে যেমন উহারা সনদ লইয়া প্রকাশ্যভাবে ব্যবসা করিতে পারে, অন্যান্য সকল দেশে সেরূপ আইনের অনুমোদন পায়

না। সেই জন্য আমাদের দেশে এরূপ পুরুষবেশ্যার কোনও সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতের কোনও কোনও শহরে, বিশেষতঃ লক্ষ্মৌ, রামপুর প্রভৃতি ভূতপূর্ব নবাবদের রাজধানীতে যে বালকবেশ্যারা দক্ষতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই।* উত্তর প্রদেশে প্রবাদ আছে—'লখনউ শ্যহর গুলদস্তা, লৌণ্ডে ম্যহঁগে র‍্যণ্ডি সস্তা' অর্থাৎ লখনউ শহর ফুলদানির মত, যেখানে বালক মহার্ঘ কিন্তু গণিকা সস্তা। যে সকল স্থানে পর্দার কড়াকড়ি বশতঃ পুরুষ অতি নিকট-আত্মীয়া ব্যতীত অপর নারীর নয়ন-মনের আনন্দবর্ধক রূপ দেখিতে পায় না, এমন কি কর্ণ-রসায়ন কামিনী কণ্ঠস্বরও শুনিতে পায় না, তাহাদের ঐসব স্বাভাবিক পিপাসা কথঞ্চিৎ নিবারণের জন্য সেখানেই গণিকাবৃত্তি ও বালকদের দেহ-ব্যবসায়ের অধিক প্রসার দেখা যায়।

সহজাত না অভ্যাসজাত

এই বৃত্তি **সহজাত কি অভ্যাসজাত,** ইহা লইয়াও বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। ডাঃ ক্রাফট্ এবিং, ডাঃ ফোরেল, ডাঃ উলরীক্স্ প্রভৃতি অধিকাংশ বিজ্ঞানীগণের অভিমত এই যে, সমমৈথুনবৃত্তি অন্যান্য যৌনবিকৃতির ন্যায় সহজাত। পক্ষান্তরে, বহু যৌন-বিজ্ঞানী ইহাকে অভ্যাসজাত বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হ্যাভলক্ এলিস্ এখানেও ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সাময়িক বৃত্তিকে **অভ্যাসজাত** এবং স্থায়ী বৃত্তিকে **সহজাত** আখ্যা দিয়াছেন। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বহু সমকামী সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়-সমমৈথুনে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, তাহারা পরবর্তী জীবনে বহু চেষ্টা করিয়াও এই কু-অভ্যাসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এরূপ স্থলে অভ্যাসজাত ও সহজাত বৃত্তির মধ্যে সীমারেখা টানা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে এ সম্পর্কে খুব গবেষণা হইয়া গিয়াছে। নামকরা অভ্যস্তদের আত্মীয়-স্বজনাদির মধ্যে খোঁজাখুঁজি করিয়াও সহজাত

*উত্তর-ভারতের তথাকথিত হিজড়ারা (আসলে অধিকাংশই গোঁফ কামানো স্ত্রীবেশী পুরুষ) প্রকাশ্যে বিবাহ, জন্ম, পর্ব ইত্যাদি উপলক্ষে নাচ-গান করিয়া উপার্জন করে, কিন্তু উহাদের মধ্যে অনেকেই গোপনে পুংমৈথুনে নিষ্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আরও উপার্জন করে।

বৃত্তি বলিয়া ওরকম কিছু পাওয়া যায় নাই। যমজ (অভিন্ন) ভাই বোনদের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করিয়াও বিশেষ কিছু পাবার সম্ভাবনা কম। তবে বিভিন্ন প্রণালীতে প্রতিপালিত বহু সংখ্যক অভিন্ন যমজদের মধ্যে এই প্রবৃত্তি পাওয়া গেলে উহার সহজাতত্ব সম্পর্কে কতকটা আশ্বস্ত হওয়া যাইত।

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির প্রভাব

কেহ কেহ মনে করেন, ওরকম প্রবৃত্তি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের প্রভাবের দরুন জন্মে। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এ কথা ঠিক নহে। প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া বিশেষ কোনও তারতম্য পাওয়া যায় নাই। এমন কি, মেয়েদের গ্রন্থিরস ব্যবহারের ফলে অণ্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের শিথিলতা ও অকর্মকতা আসিতে পারে কিন্তু কাহাকেও সমকামী হইতে দেখা যায় নাই।

রুচিবিকৃতি মাত্র

আমাদের খাদ্যাখাদ্যের রুচি কতকটা জন্মগত—বেশীর ভাগ অনুকরণ-জনিত বা অভ্যাসগত। বহু কাজ আমরা এভাবে সে-ভাবে ও অপর ভাবে করিতে পারি। এ সব ক্ষেত্রে অপরের দেখাদেখি, অপরের প্রভাবে, বাল্য-কালের দুর্ঘটনা বা দুর্বিপাকের দরুন, সুযোগের অভাবে, দুর্যোগের প্রচাপে আমাদের আচরণ বিভিন্নমুখী হইয়া উঠে।

স্থায়ী সমকামের বেলায়ও আমরা রুচি বিকৃতি হইয়াছে বলিতে পারি। হিন্দুর কাছে গোমাংস, মুসলমানের কাছে শূয়োরের মাংস ঘৃণার উদ্রেক করে অথচ মাংসের প্রতি ঝোঁক প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু মুসলমানেরা ও খ্রীষ্টানেরা যথাক্রমে গোমাংস ও শূয়োরের মাংসভক্ষণ করিয়া থাকে।

ছোট বেলাকার ঘটনা, দুর্ঘটনা, বাবা-মার দুর্ব্যবহার বা অজ্ঞানতা কি করিয়া মানুষের রুচি বিকৃতি ঘটায় তাহার একটা করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নের দৃষ্টান্তটিতে।

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইরিশ কেমিষ্ট তাঁহার অকপট লম্বা বিবৃতিতে যে তথ্যপূর্ণ স্বীকারোক্তি করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার এ রকম :

ইনি ডাবলিন ইউনিভারসিটি হইতে অঙ্ক ও রসায়ন শাস্ত্রে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্য ভাল ; ছোটকালে বিশেষ কোনও জটিল রোগ হয় নাই, পরে গনোরিয়া হইয়াছিল তবে পেনিসিলিন ও সালফা ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য

লাভ হয়। বিবাহ করেন নাই। বয়স ৩৬ বছর। ইনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎও করিয়াছেন।

বাবা-মা ও প্রতিবেশীদের 'চুপ, 'চুপ' ভাব, পাদ্রীদের উপদেশের ছড়াছড়ি (ইনি রোমান ক্যাথলিক) ও পাপাচারের ভয় ও উৎকণ্ঠায় ইনি যৌনচর্চা দূরে থাকুক, কল্পনাও 'পাপচিন্তা' বলিয়া মনে করিতেন। ওঁর বাবা-মা বলেন, ওঁকে একটি বাঁধাকপির নীচে পাওয়া গিয়াছিল। পরে হাসপাতাল হইতে আনা হইয়াছিল, আবার তারও পবে, ওঁকে একটা ফেরিশতা ওঁর মার নিকট নিয়া আসেন বলিয়া প্রকাশ কবেন!! (বলুন ত! তিন রকম বিবৃতিতে ছেলেমেয়ে বাবা-মায়ের সততায় আস্থা রাখিতে পারে?)

যৌনবোধের উন্মেষের কথা মনে কবিতে গিয়া উনি লিখেন, ওঁর প্রায় নয় বৎসর বয়সে উনি একদিন সন্ধ্যাব পবে ২টি বালিকা ও তিন চারটি বালকের সঙ্গে খেলা করিতে থাকেন। ১১-১২ বৎসরের একটি বালক হঠাৎ প্রস্তাব করে, সবাই নিকটস্থ একটা মদেব কাবখানায় গিয়া খেলা করি। ওখানে গিয়া ও বলে, এস আমরা 'পেন্সিল' 'পেন্সিল' খেলি। বালিকারা হাসিতে থাকে। পবে দেখেন, বালকেবা সবাই নিজ নিজ প্যাণ্ট খুলিয়া অঙ্গ প্রদর্শন কবে। মেয়েবা স্পর্শ করে, আবাব ওদের পীড়াপীড়িতে নিজেদের অঙ্গ দেখায়। ওরাও হাত দিয়া স্পর্শ কবে কিন্তু এব বেশী আর কিছু ঘটে না।

এর পরে একদিন একটি মেয়েকে ধরিয়া নিয়া উনি খেলাচ্ছলে উপভোগ করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হন না। হঠাৎ ওঁর মা দেখিয়া ফেলেন আর যার পব নাই রাগ করেন। উনি ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান। ওঁব বড় ভাই (১১ বৎসরেব) ওকে আশ্বাস দিয়া বাড়ী নিয়া যায়, কিন্তু মা ওঁকে কুকুর মারার চামড়ার চাবুক দিয়া এত মারেন যে, ওঁর শরীবে জখম হয় ও শরীর হইতে রক্তপাত হইতে থাকে। তিনি ওঁকে বলেন, ও তাঁর ছেলে নন, ও জারজ সন্তান এবং শয়তানের ঔরসে! ওঁর ভাই বোনেরা বহু অনুরোধ, উপরোধ করায়ও মা নিরস্ত হন না এবং বাবাও চুপ করিয়া দেখিতে থাকেন। (এইরূপ কুসংস্কারমূলক অত্যাচার ছেলেমেয়েদের মনে গভীর রেখাপাত করে ও ওদের মানসিক বিকৃতির কারণ হয়।)

ও সব দেখিয়া শুনিয়া ওঁর সামান্য মাত্র যৌনজ্ঞান হয় এবং ১৩ বৎসর বয়সে উনি নানা রকম যৌনশাস্ত্রের বহিপুস্তক পড়িতে থাকেন। তখন ওঁর বন্ধুত্ব ছাড়া আর কোনও ভাব মনে জাগিত না।

অপর কয়েকটি ঘটনা আবার ওঁর বাল্য জীবনে খুব রেখাপাত করে।

প্রত্যেক রবিবার ওঁর বাবা ওঁর ভাইদের ও বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলিতেন। ওঁর যখন বয়স ৫-৬ বৎসর, তখন ওঁর বাবা ওঁকে কোলে বসাইয়া খেলিতেন। ওঁর বাবার শক্ত অঙ্গ ওঁর পেছনে লাগিত এবং তিনি হাত দিয়া ওঁর উলঙ্গ উরু দুটি মলিয়া দিতেন। ওঁর ইহাতে ভাল লাগিত। এর উপরে আবার ওঁর মা ওঁকে শাস্তি দিতে হইলে ওঁর হাফপ্যান্ট খুলিয়া ওঁকে ওঁর ভগ্নীর ফ্রক পরাইয়া দিতেন আর ওঁকে দরজার সিঁড়ির ওপর বসাইয়া রাখিতেন। 'বাইরে গেলেই সবাই ওঁর যৌনাঙ্গ দেখিতে চাইবে বলিয়া শাসানো হইত। এভাবে সারাদিন বসিয়া থাকিয়া তিনি সন্ধ্যার পর মদের আখড়ায় যাইতেন আর ওখানকার লোকেরা ওঁকে ধরিয়া কোলে বসাইয়া ওঁর অঙ্গ ও পাছা স্পর্শ করিত। ইহাতে ওঁর ভাল লাগিত, আবার উনি ওখানে যাইতেন। এক রাত্রিতে একজন লোক ওঁর প্যান্ট খুলিয়া ওঁর উরুদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গ স্থাপন ও চালনা করে। মাকে ওঁর শরীরে ও কাপড়ে লাগা আঠালো জিনিস দেখাইয়া উনি বলেন যে, বাসে আসিবার সময় কোনও যাত্রীর থুথু লাগিয়া গিয়াছে। মা ওঁকে বাহিরে যাইতে শক্ত নিষেধ করেন কিন্তু ওঁর যাতায়াত চলিতে থাকে। একদিন হঠাৎ মা গিয়া দেখেন, উনি একজন পুরুষের কোলে বসিয়া আছেন। তিনি ওঁকে তৎক্ষণাৎ মারিতে শুরু করেন আর লোকটিকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করেন। এর পরে ওখানে যাওয়া বন্ধ হয়। কিন্তু বৎসর খানেক পরে একদিন এক মেলায় মেশিনে পয়সা দিয়া খেলিবার সময় ওঁদের একজন ওঁর পেছনে দাঁড়াইয়া ওঁর কোমরে অঙ্গ চালনা করিতে থাকে এবং পুলক লাভ করিবার পর—ওঁকে পয়সাকড়ি দিয়া যায়। তখন ওঁরও কিছু আনন্দ লাভ হইত।

দশ বৎসর বয়সে উনি কোনও পায়খানায় প্রস্রাব করিতে গেলে একজন যুবক ওঁকে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ ও মর্দন করিতে বলে এবং ওঁর হাতেই শুক্রপাত করিয়া ফেলে। ইহাতে উনি বিরক্তি বোধ করেন।

বার বৎসর বয়স পর্যন্ত এরূপ ব্যবহার পাইতে থাকেন এবং তারপরে কয়েকজন লোক ওঁরই অঙ্গ স্পর্শ, মর্দন, এমন কি চোষণ পর্যন্ত করে এবং একজন ওঁকে মৈথুনে প্রবৃত্ত করায়। উনি অক্ষম হইলেও ওঁর আনন্দ বোধ হইতে থাকে।

পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন, কি করিয়া বাল্যজীবনে বিপরীত লিঙ্গের

সঙ্গ একবার মাত্র ইনি পাইয়াছিলেন আর পুরুষ সংসর্গ বহুবার! ওঁর মার প্রহারের ফলে অপর বালিকাদের সংসর্গ একেবারে ছাড়িয়া দেন। এর ফলে ওঁর রুচিবিকৃতি আশ্চর্যের কথা নয়!

বার বৎসর বয়সে উনি স্কুলে উপরের ক্লাসে উঠেন এবং একজন বন্ধুর সাহচর্য পান। ইনি বয়সে এক বৎসরের মাত্র বড় ছিলেন। এরই কাছে উনি জানিতে পারেন যে পুরুষের অঙ্গনিঃসৃত রস জীবের বীজ আর উহাই মেয়েদের শরীরে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, মেয়েদের বীজের সঙ্গে মিশিয়া উহা সন্তানের আকার পাইতে থাকে ও পরে স্ত্রী-অঙ্গ দিয়া ঐ সন্তান বাহির হইয়া আসে (তখনও গুহ্যদ্বার বা যোনিদ্বার কোন্‌টা বুঝিতে পারে নাই)। এই কথা জানিয়া তিনি সারাদিন ঘৃণা ও উদ্বেগ বোধ করেন। (দেখুন ত! কি প্রতিক্রিয়া?)

ইহার পরে একদিন ধর্মশিক্ষা লইবার কালে ঐ ছেলেটি টেবিলের তলা দিয়া ওঁর অঙ্গ স্পর্শন, ঘর্ষণ করাইয়া পুলক লাভ করাইয়া দেয়।

তখন শুক্রপাত হইল না তবে পুলকলাভের শিহরণ বোঝা গেল। ওঁর ত্বকচ্ছেদ করা ছিল না। এর পর হইতে ঐ বন্ধুর সঙ্গে পারস্পরিক হস্তমৈথুন রোজ রোজ চলিতে লাগিল। (হস্তমৈথুনের প্রক্রিয়া সঙ্গীর প্রভাবে কি করিয়া সূত্রপাত হয় তাহার দৃষ্টান্ত এখানে।)

উনি বিশ্বাস করিতেন, এসব কাজ পাপজনক এবং ওঁকে এজন্য নরকে যাইতেই হইবে; কারণ, এ রকম ধারণাই ওঁকে দেওয়া হইত কিন্তু উনি তবুও বিরত থাকিতে পারিতেন না। (কুসংস্কারমূলক ভয়ভীতি দেখাইবার রীতি সব দেশেই আছে। ধর্মমতও এজন্য অনেকাংশে দায়ী। ইহাতে ছেলেমেয়েরা বিরত ত হয়ই না বরং মানসিক উদ্বেগের শিকার হইয়া পড়ে।)

ইহার পরে ওঁরা স্কুলের অন্যান্য ছেলেকে ওঁদের দলভুক্ত করেন। একজন ছেলে খুব সুন্দর চেহারার ছিল। ওঁর সঙ্গে সমমৈথুনেই উনি বেশী আসক্ত হন। উনি মনে করিতে থাকেন, উনি অস্বাভাবিক বৃত্তিগ্রস্ত! (বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গ না পাইবার ফলেই বোধ হয় ওঁর রুচিবিকার ঘটে!) পরে বইপত্র পড়িয়া নারীদের যৌনাঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন কিন্তু বহু পুরুষের সংসর্গ করিয়া করিয়া ওদের দিকে আর আকৃষ্ট হন না।

শুধু তাহাই নহে। উনি বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গলাভ করিবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। স্কুলের ছেলেদের ছাড়াও যুবকদের সঙ্গ কামনা

করেন। বার বৎসর বয়সে উনি একজন টাউন আর্কিটেক্টকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। এঁর বয়স প্রায় ৩০ বৎসর; অবিবাহিত; বাপ-মায়ের সঙ্গে থাকিতেন। উনি ওঁকে দেখে মৃদু হাসিতেন। একবার ওঁকে ইনি স্কুল হইতে নিজের মোটরে বাড়ী পোঁছাইয়া দেন। উনি এঁকে বলেন, আজ সন্ধ্যায় উনি সিনেমায় যাইবেন কিন্তু ইনিও প্রচ্ছন্ন নিমন্ত্রণে সাড়া দেন না। আর একদিন সন্ধ্যায় এঁর গ্যারেজে গিয়া মোটর পরিষ্কার করিয়া দিবেন বলিয়া প্রস্তাব দিলে ইনি রাজী হইলেন। উনি পরিচ্ছন্ন, পোষাক পরিয়া চুল বাঁধিতে লাগিলে ওঁর মা বলিয়া উঠেন, 'তুমি যে রকম সাজগোজ করছ তাতে করে মনে হয় তুমি কোনও মেয়ের মনোরঞ্জন করতে যাচ্ছ।' উনি কিন্তু ময়লা মোটর পরিষ্কার করিতে যাইতেছিলেন! গ্যারেজে গিয়া গাড়ী ধুইবার ছলে উনিই এঁকে যৌন অভিসারে নিমন্ত্রণ করেন আর ইনি সাড়া দেন। (এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতারই বেশী আগ্রহ ছিল।) এর পরে ওঁরা দু'জন অনুরক্ত হইয়া পড়েন আর একত্র বিহার, ভ্রমণ, সিনেমা দেখা, সাঁতরানো, পিকনিক করা পুরোদস্তর চলে। আরও দু'টি কিশোর বন্ধুকেও উনি এ দলে ভর্তি করেন এবং চারজন মিলিয়া যৌন সম্ভোগে লিপ্ত থাকেন। উনি এঁর প্রতি এতটা আকৃষ্ট হন যে মোটরে একত্রে যাইবার সময়ে উনি স্বেচ্ছায় উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন আর ইনি উদ্বিগ্ন হইতেন পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে!

ওঁর যৌন আচরণের পূর্ণ বিবৃতিতে আরও বহু আজগুবি ব্যাপার আছে। সবগুলিই ছেলেদের বা যুবকদের নিয়া।* কাকেও উনি বহু বৎসর পর্যন্ত ভালবাসেন, কেউ ওঁকে ওরকম করেন। দু'জন মাত্র ওঁর কাছে টাকা পয়সা চায়, অপরগুলির সকলেই শুধু যৌনকামনা প্রকাশ করে।

এখন ওঁর বয়স প্রায় চল্লিশের উপরে। উনি সাক্ষাৎ করিয়া আমার পরামর্শ চান, কেন সুন্দরী নারীও ওঁকে আকর্ষণ করিতে পারে না, অথচ অসুন্দর বালক, কিশোর, যুবকও পারে! এ ক্ষেত্রে ওঁর জন্মগত কোনও ব্যাধি নাই, রয়েছে বাল্যকালে বাবা, মা, সঙ্গীদের আচরণের ফলে এক অস্বাভাবিক রুচিবিকৃতি! ওঁর অকপট কথনে সমবেদনা বোধ করি কিন্তু উপায়? ওঁর জীবন বোধ হয় এভাবেই কাটিবে! বেচারা!!

* "I suppose I have had homosexual exepriences with about 250 men and boys, including one priest and one protestant boy preacher...This chronicle could go on for ever!"

এখানকার একজন ধনী ও পদস্থ ব্যক্তির রুচিবিকৃতির কথা শোনা যায়। বার বার বিবাহ করিয়াও নাকি তাঁহার পুরুষলিপ্সা বজায় রহিয়াছে; ওঁর স্ত্রীরা যৌন অবহেলার বোঝা বহিতে বহিতে সরিয়া পড়েন আর উনি নাকি ঐ আইরিশ কেমিষ্টের মতই পুরুষ সংসর্গেই মশগুল! ওঁর রুচিবিকৃতির পেছনেও হয়ত করুণ কোনও ইতিহাস আছে!

প্রতিষেধ ও প্রতিকার

বাল্যকাল হইতেই বাবা-মায়ের ছেলেদের ও মেয়েদের আচরণ লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে। স্বাভাবিক পারিবারিক পরিস্থিতিতে লালিত-পালিত শিশুদের রুচিবিকৃতির কারণ থাকে না।

অস্বাভাবিক বাতিকগ্রস্ত চাকর-বাকর, নার্স, মাষ্টার, সঙ্গীদের সাহচর্য হইতে ইহাদের দূরে রাখিতে হইবে। বালক-বালিকাকে একত্র খেলাধূলা করিতে দিতে হইবে। ঐরূপ মেলামেশা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইলে সমশ্রেণীতে যৌনাকর্ষণ নিবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। স্কুল কলেজে সহ-শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত। পর্দা-প্রথা উভয় লিঙ্গের জন্য ক্ষতিকারক। নারী-পুরুষের মিলিত পার্টিতে যাতায়াত উভয়ের জন্য ভাল।

সকাল সকাল বিবাহ করা উচিত। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এখন কার্যকরী— তাই 'বিয়ে করলে পুত্রকন্যা—আসে যেমন প্রবল বন্যা'—এ ভয় আর এখন নাই।

মনোচিকিৎসায় অনেক ক্ষেত্রে ফল পাওয়া গিয়াছে। সুন্দরী নারীর সাহচর্য কতকক্ষেত্রে ভালবাসার সূত্রপাত করাইয়া অভ্যাস ফিরাইতে পারে।

সামাজিক মনোভাব

সমকাম সম্পর্কে প্রায় সকল সমাজেরই জোর বিদ্বেষ। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা সডম ও গমোরা ধ্বংসের কাল্পনিক আজগুবী কাহিনী হইতে ইহাকে মহাপাপ ও খোদার ক্রোধের কারণ বলিয়া মনে করেন। খোদার ক্রুদ্ধ হইবার কারণ থাকুক বা নাই থাকুক, ইহাতে যে বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হইতে পারে এবং ইহা যে যৌন-আচরণের প্রকৃত পন্থার পরিপন্থী এই সকল কারণ দর্শাইয়াও সমাজ ইহাকে দণ্ডনীয় বলিয়া মনে করে। ইহাতে পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা আসিতে পারে সমাজ তাহাও ভয় করে।

পক্ষান্তরে মানব সমাজের জন্মাবধি ইহা দেখা যায়। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইহার বিপুল প্রকোপ আছে, বংশবৃদ্ধি ধ্বংস পাইবার ভয় খুব কমই আছে বরং জন্মনিয়ন্ত্রণই জগতে এখন বেশী কাম্য, অসংখ্য নর ও নারী উপযুক্ত বয়সেও বিবাহ করিতে পারে না, উপযুক্ত বয়সের দুইটি ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্যের অপকার না করিয়া নিজেদের কামনা তৃপ্ত করিতে সমকামের আশ্রয় লইলে অপরের বলিবার কিছুই থাকা উচিত নহে, ইহাতে রতিজ রোগ হইবার আশঙ্কা খুব কম, অবৈধ গর্ভের সম্ভাবনা আদৌ নাই, দুর্নাম, অর্থনাশ, ও দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় ঘটিবার ঝুঁকি, ব্যভিচার ও গণিকাগমন অপেক্ষা অনেক কম ইত্যাদি কথা ভাবিলে সমকামীদেব প্রতি মনের ভাব অনুকূল না হইলেও সহানুভূতিপূর্ণ হইতে বাধ্য।

যৌনবোধের বিভিন্নমুখী প্রকাশ (৪)

যৌনবিকৃতি (Perversions)

আমরা যৌনবোধের উন্মেষের যে ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করিয়াছি, তাহাই সাধারণ ধারা। কারণ, ঐ সমস্ত লক্ষণের অধিকাংশই মানসিক এবং উহাদের কোন একটি বা অধিকাংশের স্বল্পতা বা আধিক্যের জন্য মানুষ স্বাভাবিক যৌন জীবনের বৈশিষ্ট্যচ্যুত হয় না। সুতরাং পূর্ববর্ণিত লক্ষণসমূহ স্বাভাবিক।

পূর্বকালে লোকের ধারণা ছিল যে, মানুষের যৌন-ক্রিয়ার রূপ ও প্রণালী একটি মাত্র। যৌনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের সকল শ্রেণীর যুবক ইহা অনুমান করিয়া লইত এবং প্রকৃতি তাহাকে যতটা শিক্ষা দিত, তাহার পক্ষে তদপেক্ষা অধিক শিক্ষা পাইবার কোনও সম্ভবনা ছিল না, কারণ পিতামাতা ও গুরুজন এ বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ নিরুত্তর। কিন্তু ইদানীং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে, বাহ্যত স্বীকার না করিলেও ভিতরে ভিতরে অনেকেই সম্ভোগের বহু প্রণালী আবিষ্কার ও অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। ইহাদের যত প্রকার অবস্থান ও ক্রিয়ার বিভিন্নতাই বিদ্যমান থাকুক না কেন, সে সমস্তকে অস্বাভাবিক বলা উচিত হইবে না।

কেলির স্বাভাবিক বৈচিত্র্য

স্বাভাবিক রতিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে, উত্তেজনা সাধন করিবার জন্য যত প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহার সবগুলিই কৃষ্টি ও সুরুচিসম্পন্ন লোকের রুচিসঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু যেহেতু ঐ সমস্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য স্বাভাবিক সঙ্গম করিবার যোগ্যতা ও শক্তি লাভ করা, সেইজন্যই উহাদের উক্ত পণ্ডিতগণ অস্বাভাবিক বলেন নাই।

গৌণ পন্থা

কোনও প্রক্রিয়ার সহিত যদি নারীপুরুষের স্বাভাবিক মিলনের সুস্পষ্ট বিরোধ বিদ্যমান থাকে এবং কোন স্তরেই যদি উহার সহিত প্রজনন-ক্রিয়ার কোনও সম্পর্ক না থাকে, তবে তাহা যতই দৈহিক ও মানসিক আনন্দদায়ক

হউক না কেন, উহাকে স্বাভাবিক মিলন বলা যাইতে পারে না। এই সমস্ত ক্রিয়াকে যৌনবিকৃতি না বলিয়া কামচরিতার্থতার গৌণ পন্থা বলা যাইতে পারে।

যে সমস্ত ক্রিয়াকে কোনও রূপেই স্বাভাবিক অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের সহিত যৌনক্রিয়াব অবস্থাবিশেষ, আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না, উহা বাস্তব যৌন-ক্ষুধার তৃপ্তির উদ্দেশ্যেই সাধিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আত্মরতি, সমমৈথুন, প্রভৃতি। এই সমস্ত ক্রিয়া কোনও অবস্থাতেই প্রজনন-ক্রিয়ার সহায়ক হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ইহাদেব সহিত স্বাভাবিক নারীপুরুষ সঙ্গমের কোন সম্বন্ধ নাই। তথাপি এই সমস্ত ক্রিয়া মানুষ উত্তেজনা বর্ধন ও প্রশমনেব জন্যই কবিয়া থাকে।

যৌন-বৈপরীত্য (Transvestism or Eonism)

সংজ্ঞা—বিপরীত-লিঙ্গেব আচার ব্যবহার ও বিশেষত্ব পরিগ্রহ করার নাম যৌন-বৈপরীত্য। Trans (অর্থাৎ Transference) এবং Vesta (অর্থাৎ clothing) শব্দেব যোগে Transvestism শব্দের উৎপত্তি। কতক নারী পুরুষের মত ও কতক পুরুষ নারীব মত পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে আগ্রহ দেখাইয়া থাকে। Chevalier d' Eon নামক এক ব্যক্তির নাম হইতে এই প্রবৃত্তির নাম Eonism রাখা হয়। এই লোকটিব জীবনের ৪৯ বৎসর পুরুষ হিসাবে এবং ৩৪ বৎসর নারী হিসাবে কাটে। মৃত্যুর পর পরীক্ষায় তাহার প্রকৃত লিঙ্গ যে নর ছিল তাহা প্রকাশ পায়।

প্রসার—এইরূপ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোক একেবারে বিরল নহে, তবে অনেকে নিজের স্বরূপ চেষ্টা করিয়া গোপন রাখে। সামান্য ঝোঁক সামলাইয়া যাওয়া কঠিন নহে। মেয়েলী ধরনের পুরুষ এবং পুরুষালী ধরনের নারী মাঝে মাঝে দেখা যায়। তবে উগ্র প্রকৃতির ঝোঁক প্রকাশ হইয়াই পড়ে।

সমধিক মাত্রা—উগ্রপ্রকৃতির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া হার্সফেল্ড জনৈক ৪০ বৎসর বয়স্ক লোকের কথা লিখিয়াছেন। ইনি বার্লিনের একটি বড় হোটেলে রান্নার কাজ করিতেন। ছয় বৎসর বয়সে ইহাকে বালকের মত পোষাক পরাইতে পিতামাতার বিষম বেগ পাইতে হয়; তিনি তাঁহার পুরুষাঙ্গ বাঁধিয়া রাখিয়া প্রকাশ করেন যে, ঐ অঙ্গটি তাঁহার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। ইহার পর হইতে তিনি নিজের ভগ্নীদের কাপড়-চোপড় পরিয়া মেয়েদের মত বেড়াইতেন

ভালবাসেন। তিনি লেখাপড়ায় বালকের মত কৃতিত্ব অর্জন করেন, কিন্তু ১৪ বৎসর বয়সে তাঁহাতে সমকামের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া নারীর বেশে জীবন যাপন কবিতে থাকেন। পুরুষাঙ্গকে নারীর অঙ্গে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। ১৯২১ সালে তিনি অস্ত্রোপচাবে অণ্ডকোষ ছেদন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি অস্ত্রোপচারে পুরুষাঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেন এবং পরে কৃত্রিম নারী অঙ্গ সংযোগ করিলেন। কিছুদিন পূর্বে ডেন্‌মার্কের শিল্পী Einer Wegener নিজের অণ্ডকোষ ব পুরুষাঙ্গ অস্ত্রোপ্রচারে ছেদন করাইয়া, ডিম্বকোষ ও কৃত্রিম স্ত্রী-অঙ্গ স্থাপন করিবার প্রচেষ্টায় মারা যান।

যেখানে পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের চরিত্রগত ও দেহগত বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে এবং তদনুসারে রতিকার্য সম্পন্ন করে বা ঐরূপ চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে যৌন-বৈপরীত্য বলা যাইতে পারে। কতকক্ষেত্রে ঐরূপ আচার-ব্যবহারের আজীবন চেষ্টা, আবার কতকক্ষেত্রে সাময়িক বা কিছুকাল স্থায়ী প্রবণতা দেখা যায। পুরুষের মধ্যেই এই অভ্যাসের প্রচলন বেশী থাকিলেও নারীর মধ্যেও উহার প্রচলন নিতান্ত কম নহে। বড় বড় যৌন-বিজ্ঞানবিদ্‌ উহার বহুল প্রচার দর্শনে ইহাকে অস্বাভাবিক বলিতে সাহস করেন নাই। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষেব যাহা সাধারণ অভ্যাস, তাহাকে অস্বাভাবিক বলা যায় কিরূপে? **সমমেহন** উক্ত কাবণে অস্বাভাবিক নাও হইতে পারে, কিন্তু উহা যে **প্রকৃতিবিরুদ্ধ**, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ, দৈহিক গঠনপ্রণালী হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সমকাম প্রকৃতির অভিপ্রেত ত নহেই, বরং প্রকৃতির নির্দেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই-জন্য পুরুষের অকর্মক ও নারীর সকর্মক স্থায়ী সমমৈথুনকে আমরা যৌন-বৈপরীত্য বলিব।

অবশ্য সাময়িক সমকামের কথা স্বতন্ত্র। উহা স্বাভাবিক মিলন বা কাম-চরিতার্থতার সুযোগের অভাবে প্রকাশ পায় মাত্র। কতকক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, নর বা নারী তাহার নিজের শ্রেণীর উপর এত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া পড়ে যে, অপর শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করিতে চায়। কতকক্ষেত্রে অপর শ্রেণীর কাপড়-চোপড়ের প্রতীকানুরাগ এইরূপ যৌন-বিকল্পে প্রকাশ পায়। ধর্ষণ করিবার বা ধর্ষিত হইবার বাতিকও এই বিকল্পে রূপান্তরিত হয়।

কিন্‌সেদের সিদ্ধান্ত

ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় পুরুষের মধ্যে নারী অপেক্ষা এই বাতিক বেশী।

অভিনয় নয়—কোনও বিশেষ ব্যাপারে (যথা, মুখোশধারী নৃত্য, নাটকাভিনয় প্রভৃতিতে) বিপরীত শ্রেণীর পরিচ্ছদ পবিধান করাকে যৌন-বৈপরীত্য বলা যায় না। সমাজে বিপরীত শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবার বাসনাকেই প্রকৃত যৌন-বৈপরীত্য বলা যায়।

কোনও কোনও মনোরোগ চিকিৎসক সমস্ত যৌন-বৈপরীত্যকে সমকাম মনে করেন। ইহা ঠিক নয়। এই দুইটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যাপার। যৌন-বিপরীত ব্যক্তিদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই তাহাদের শারীরিক সম্পর্কে সমকামী।

সমকামীর ছদ্মবেশ—অবশ্য কতক সমকামী পুরুষ নারীবেশ ধারণ ও নারীর চালচলন অনুকরণ এই জন্য করে যে তাহারা ঐ ভাবে অপর পুরুষদের আকর্ষণ করিতে পারিবে। অল্প কতকক্ষেত্রে বিপরীত শ্রেণীর পরিচ্ছদের প্রতি প্রতীকানুরাগ থাকায় যৌন-বৈপরীত্য গড়িয়া উঠে। কিন্তু বিপরীত শ্রেণীর পোষাক পরিলেই কাহারও মূল যৌন-প্রকৃতি—বিপরীতকাম বা সমকাম পরিবর্তিত হইয়া যায় না।

লম্পটের ছদ্মবেশ—কখনও কখনও কোনও সম্পূর্ণ বিপরীত-কামী পুরুষ স্ত্রীবেশ এইজন্য ধারণ করিয়া থাকে যে, প্রতিবেশীরা তাহাকে নারী ভাবিলে সে কাহারও কোন সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া প্রণয়িনীর সহিত বাস করিতে পারিবে এবং সুবিধা হইলে অপব রমণীদেবও উপভোগ করিতে পারিবে।

সমলিঙ্গের প্রতি ঘৃণা—কখনও কখনও কোন ব্যক্তি নিজ শ্রেণীর প্রতি ঘোর বিদ্বেষবশত বিপরীত শ্রেণীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। বিপরীত শ্রেণীর প্রতি তাহার যৌন-আকর্ষণ হইতেও পারে নাও হইতে পারে।

নারীপূজা—কখনও কখনও কোন পুরুষ মনে মনে নারীকে এত উচ্চাসন দেয় যে, সে তাহাদের সহিত কামসম্পর্ক স্থাপনের চিন্তাতে বিরক্ত হয়। আবার নিজ শ্রেণীকে অপছন্দ করার জন্য তাহাদের সহিতও কাম সম্পর্ক স্থাপন করে না। এই ভাবে তাহার কামোপভোগের কোন সুযোগই থাকে না।

ধর্ষণকামীর ছদ্মবেশ—অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষিত হইবার বাসনাসম্পন্ন পুরুষ (ধর্ষণকামী—Masochist) নারীবেশ ধারণ এইজন্য করে যে, অপর পুরুষ

তাহাকে নারী ভাবিয়া নারীদের যেরূপ অধীনস্থ (Subjugate) করে, তাহাকেও সেইরূপ করিবে।

ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোনও ব্যক্তির মানসিক ব্যাপারে বিশেষ ভাব গঠনের ক্ষমতার উপব যৌন-বৈপবীত্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

নরনারীর পার্থক্য—প্রতি ১০০ জন যৌন-বিপরীত পুরুষের স্থলে ২, ৩ অথবা বড়জোর ৬ জন ঐরূপ নারী যৌন-বৈপবীত্য এই সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, পুরুষেবা নাবী অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষেত্রে ও অধিক পরিমাণে মানসিক উত্তেজনা দ্বারা মনোভাব গঠন করে। যে পুরুষেরা নারী বলিয়া গণ্য হইতে চাহে, তাহাবা প্রকৃতপক্ষে কোনও মনোভাবে অভ্যস্ত হইবার ক্ষমতায় খুবই পুরুষালী।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সমস্ত যৌন-বিকল্পেব মধ্যে সহজাত ও অভ্যাস-জাত বলিয়া কোনও সুস্পষ্ট সীমাবেখা টানা সম্ভব নহে। কাবণ, মানবের সহজাত ও অভ্যাসজাত গুণসমূহেব অধিকাংশ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, উহার কোন্‌টার কতখানি সহজাত এবং কোন্‌টার কতখানি অভ্যাসজাত তাহা বলা কঠিন। মানবের অন্যান্য বৃত্তিব ন্যায় যৌনবৃত্তিসমূহেবও কোন্‌টা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে সহজাত এবং কোন্‌টা অভ্যাসজাত তাহা বলা আরও কঠিন।

ডাঃ বাডিন ও ডাঃ ফোবেল মানবেব অধিকাংশ যৌন-বিকল্পকে সহজাত বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ডাঃ হার্শফেল্ড ও উলবীকৃস্ অধিকাংশ বিকল্পকে অভ্যাসজাত বলিয়াছেন এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদেব চিকিৎসক-জীবনের দুই-একটা অভিজ্ঞতাবও উল্লেখ কবিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের এ পুস্তক সাধারণ পাঠকের জন্যই লিখিত, সেই জন্য আমরা অসাধারণ সূত্রের দ্বারা কোনও সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষপাতী নহি। সুতরাং যৌনবিকল্পসমূহকে অভ্যাসজাত ও সহজাত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত না করিয়া আমরা সাধারণভাবে উহাদের বিবরণ প্রদান করিব এবং প্রসঙ্গতঃ উহাদের সহজাততা এবং অভ্যাসজাততার আলোচনা করিব।

মানুষের যৌনবিকল্পের কতকগুলি শৈশবেই তাহাদের চরিত্রে সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমতঃ এইগুলিকেই সহজাতবাদীরা সহজাত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এলিস্ ও ডাঃ গ্রেসহেল্‌থ শিশুজীবনের এই সমস্ত বিকল্পকে প্রধানতঃ গৃহের পারিপার্শ্বিকতা ও পিতামাতার প্রভাবের ফল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পর বিদ্যালয়ে সহপাঠীগণের প্রভাবও আছে।

সহপাঠী ও খেলার সাথীদের প্রভাব শিশুজীবনের উপর এত বেশী যে, অধ্যাপক উইনিক্রেভ কালিস বলিয়াছেন—শিশুই শিশুদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী শিক্ষক। সুতরাং কতকগুলি বিকল্প শৈশবেই দেখা দেয় বলিয়া উহাদিগকে সহজাত বলিবার কোনও বিজ্ঞানসম্মত কারণ নাই।

প্রতীকানুরাগ

ফ্রয়েড ও তাঁহার অনুবর্তীগণের অভিমত এই যে, **শৈশবে বালক-বালিকার মধ্যে যে যৌনবিকৃতি আত্মপ্রকাশ করে, তাহা প্রধানত মলমূত্রদ্বার-সম্পর্কিত।** মলমূত্রদ্বারের সহিত মানবের যৌন-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, এই দুই শ্রেণীর প্রত্যঙ্গের দৈহিক ও মানসিক নৈকট্য অতি সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। পুরুষের মূত্রপথ তাহার যৌনপথের সহিত যতটা ঘনিষ্ঠ, নারীর মূত্রপথ ও যৌন-ইন্দ্রিয় বাহ্যতঃ না হইলেও কার্যতঃ প্রায় ততটা ঘনিষ্ঠ। শিশুমনোবিজ্ঞানীদের অভিমত এই যে, যৌনক্রিয়া শিশুদের চক্ষের আড়ালে করা হয় বলিয়া এবং শিশুমনের কৌতূহল অতিশয় প্রবল বলিয়া, শিশুরা নিজেদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে যৌনক্রিয়া সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। এই ধারণা হইতে মলমূত্র ত্যাগের ব্যাপার ও মলমূত্রদ্বার শিশুমনে একটা অসামান্য কৌতূহল সৃষ্টি করে।

যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত আকারগত ও ক্রিয়াগত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট দ্রব্যাদি দর্শনে যৌনবৃত্তির জাগরণ ও তজ্জন্য ঐ সমস্ত জিনিসের প্রতি প্রতীকানুরাগ (Fetishism) নারীপুরুষের প্রায় সকল বয়সের একটি যৌনবৈশিষ্ট্য। যৌনবোধ ও রুচির পার্থক্য অনুসারে এই শ্রেণীর দ্রব্যের সংখ্যা এত বেশী যে, উহাদের শ্রেণী ও সংখ্যা নির্ধারণ করা এক প্রকার অসম্ভব, এবং অসম্ভব বলিয়াই আমাদের দেশের আইনে অশ্লীলতার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ এবং অকর্মণ্য।

মিঃ এলিস ডাঃ জেলিকীর এক রোগিণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই রোগিণীর ১৩-১৪ বৎসর বয়সে যৌনবিকৃতি দেখা দেয়। এই বালিকা স্বীয় চিকিৎসকের কাছে লিখিতেছে—"আমার বয়স যখন ১৩-১৪ বৎসর, তখন হইতে আমাকে যৌনবিকৃতি তন্ময় করিয়া রাখিত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি চতুর্দিকে সমস্ত দ্রব্যাদিতে কেবল পুরুষের লিঙ্গের ও রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতাম। ....."

ডাঃ মালিনোস্কির এক ২৭ বৎসর বয়স্কা রোগিণীর যৌনবিকৃতি আরও অদ্ভুত। এই রমণী গতিশীল জাহাজ দেখিলেই রতিবাসনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিত। ছুরি, সাপ, ঘোড়া, কুকুর, ইঞ্জিন, বৃক্ষ, কদলী, মৎস্য প্রভৃতিও তাহার মনে তীব্র বাসনা জাগ্রত করিত; বৃষ্টির জল, মূত্র এবং অশ্রু দেখিলে পুরুষের শুক্রের কথা মনে পড়িত এবং সে তৎক্ষণাৎ বিবাহের জন্য অধীর হইয়া উঠিত।

যৌন-অঙ্গের সহিত সাদৃশ্য ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের ব্যবহৃত বা ব্যবহার্য জুতা, ছাতা, কাপড় ইত্যাদি কোন দ্রব্যবিশেষের দর্শন ও স্পর্শনে স্বতঃই প্রবল কামোদ্রেক হওয়াও এই পর্যায়ে পড়ে। এই জন্য এই বাতিকগ্রস্ত লোকেরা এই সকল দ্রব্য চুরি করিয়াও সঞ্চিত করিতে থাকে।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, দুই চারিজন স্ত্রীলোকের এই বাতিক থাকিলেও পুরুষদের মধ্যেই ইহার প্রকোপ বেশী। কিন্তু চুরির বাতিক অতৃপ্ত যৌন-জীবনযাপনকারী বয়স্কা নারীদের মধ্যে দেখা যায়।

উপরোল্লিখিত দ্রব্যাদি ও জীবজন্তু সর্বদাই সর্বত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং কি দেখিয়া কাহার মনে বাসনা জাগ্রত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। তবে কথা এই যে, মনের একটা বিশেষ অবস্থা না হইলে এরূপ প্রতীকানুরাগ ও সাদৃশ্যানুভূতি জাগ্রত হয় না। এক ব্যক্তি যে জিনিসটির সহিত যৌনাঙ্গের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবে, অন্য ব্যক্তি হয়ত তাহাতে কিছু লক্ষ্য করিবে না। সুতরাং স্নায়ুমণ্ডলী বিশেষভাবে প্রভাবিত না হইলে সচরাচর এইরূপ যৌনপ্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হয় না। ইচ্ছা করিলে যে কেহ চেষ্টা করিয়া যে-কোনও জিনিসের সহিত যে-কোনও অঙ্গের সাদৃশ্য-কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে আমরা যৌনবিকল্প বলিব না। যে সাদৃশ্যবোধ দ্রষ্টার কষ্টকল্পিত নহে, বরঞ্চ যাহা তাহার মনে স্বতঃই উদিত হয়, এবং করিয়াও সে যে বৃত্তিকে সংযত করিতে পারে না, তাহাকেই প্রতীকানুরাগ বলিব।

সাধারণতঃ শৈশবের কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা মনে উপর প্রগাঢ় ছাপ রাখিয়া যায় এবং উহার প্রভাবই এরূপ বাতিকের কারণ।

পশুগমন (Beastiality)

একশ্রেণীর নারীপুরুষ আছে, যাহারা স্বাভাবিক মৈথুন করিবার সুযোগের অভাবে পশুগমন করিয়া থাকে, আর একশ্রেণীর লোক স্বাভাবিক মৈথুনের

সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উহা করিয়া থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর নরনারীকে স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত বলা যাইতে পারে।

পশুপক্ষীর মিলন দর্শনে মানুষের, বিশেষত রতিশক্তিসম্পন্ন মানুষের বাসনা জাগ্রত হয়। সেজন্য তরুণ বয়সে অনেকে ঐ সব দৃশ্য দেখিতে ভালবাসে। ইহাকে যৌনবিকৃতি বলা উচিত হইবে না। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজপরিবারের এবং অভিজাত বংশের মহিলাগণ পর্যন্ত দল বাঁধিয়া ঐরূপ দৃশ্য উপভোগ করিতেন; কিন্তু ইহা অভ্যাসে পরিণত হইলে এবং সম্ভোগের পরিবর্তে এই দর্শনসুখের দ্বারা শুক্রস্খলন বা যৌন-তৃপ্তিলাভ করিতে আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই ইহাকে যৌনবিকৃতি বলিতে হইবে। মিঃ এলিসের মতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর পশু-উপভোগ স্পৃহা কম নহে। তিনি বলেন, এই জন্য কামজীবনে অতৃপ্ত অনেক নারীকে কুকুর-বিড়াল পুষিতে দেখা গিয়াছে।

ইহা ছাড়া কোনও কোনও সমাজে পশুমৈথুন প্রথা হিসাবেও প্রচলিত আছে। আফ্রিকার কতক অঞ্চলে এইরূপ প্রথা আছে যে, যুবক শিকারী বড় যে শিকার পাইবে তাহার সহিত মৈথুন করিবে। আরবেরা নাকি মুরগী বাজারে নিবার পূর্বে উহার সহিত মৈথুন করে। চীনাদের বেলায়ও এইরূপ শোনা যায়। মন্টেগাজা বলেন, ইহারা নাকি হাঁসের গলা কাটিয়া উহার সহিত মৈথুন করিয়া থাকে। ইরাকে অনেকে গর্দভী ব্যবহার করে। আমাদের দেশে গর্দভী, গাভী, ছাগী ইত্যাদি ব্যবহারের কথা শোনা যায়। স্বাভাবিক মিলনের অভাবে রাখাল যুবকেরা কদাচিৎ ইহা করিলেও প্রথাহিসাবে পশু-গমনের কথা এদেশে শোনা যায় না। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা কুকুরই বেশী পছন্দ করে। বিড়ালও শিক্ষা দিলে পুরুষের মত আচরণ করিতে পারে। অন্তত কুকুর ও বিড়ালকে স্বীয় যৌনাঙ্গের উপর তাহাদের প্রিয় খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া তাহা দেখাইলে উহারা লেহন করিবে।

ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধানে

ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধানে পশুগমনের অভ্যাসের কতকটা প্রকোপ ধরা পড়িয়াছে। তাঁহাদের অভিমতে মানুষের বরাবরই একটা বিশ্বাস ছিল যে, জীবজন্তুর মধ্যে শুধু স্বীয় শ্রেণীর পুং ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি যৌনভাব জাগ্রত হয়, অন্য শ্রেণীর জন্তুর প্রতি হয় না। এ সংস্কারের মূলে বোধ হয় প্রজননের উপর জোর দেওয়ার প্রবণতা এবং পুরাকালে পশুগমনের প্রতি ধর্মীয় নির্দেশের

কঠোরতাও খানিকটা রহিয়াছে। ইহুদীদের ধর্মে পশুগমনের জন্য একেবারে মৃত্যুদণ্ড রাখা হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্মে উহারই প্রভাব পড়িয়াছে।

ইদানীং মুক্তবুদ্ধিপ্রণোদিত অনুসন্ধানক্ষেত্রে মানব পুরুষের স্ত্রী জন্তুর প্রতি যৌন-আকর্ষণ দেখা গিয়াছে এবং এমন কি রতিক্রিয়াও খুব কম নহে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। সুতরাং একই শ্রেণীর জীবের মধ্যে পারস্পরিক যৌন-আকর্ষণ ও ক্রিয়ার মত ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও উহার প্রকোপ কতকটা আছে।

পুরুষের বেলায় পশুগমনের প্রকোপ আমেরিকায় শতকরা ১ এরও কম এবং কিশোর বয়সের পর কমিতে থাকে। এমন কি যাহারা ইহা করিয়াছে তাহারাও হয়ত জীবনে ২-৩ বার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। তবে কৃষিকার্যে রত গ্রামে বা ক্ষেতখামারে পুরুষদের পশুবিহারের বিস্তর সুযোগ থাকায় উহার প্রকোপ বেশী—এমন কি গণিকাগমন বা সমকামের প্রায় সমান।

ঐ সব লোকের প্রায় ১৭% পশুগমনে যৌনতৃপ্তি লাভ করে, বহু কিশোর বা যুবক তৃপ্তি লাভ না করিয়াও পশুবিহার করে। প্রায় ৪০% হইতে ৫০% ক্ষেতখামারে পালিত বা নিয়োজিত বালক, কিশোর ও যুবক জীবনে এক বা একাধিকবার পশুগমন করে বলিয়া ডঃ কিন্‌সেরা মন্তব্য করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলেন যে, বোধ হয় ঐরূপ ব্যবহার গোপন না করিলে অনুপাত আরও বাড়িয়া যাইত। আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে নাকি ইঁহারা শতকরা ৬৫ ক্ষেত্রে এইরূপ অভ্যাসের সন্ধান পাইয়াছেন। এই বদভ্যাস সারা দেশবাসীর উপরে চাপানো ঠিক হইবে না, একথাও ভুলিলে চলিবে না।

পৌনঃপুনিকতার বেলায় দেখা গিয়াছে যে, এক বা একাধিকবার হইতে সপ্তাহে কয়েকবার নিয়মিত পশুবিহারের অভ্যাসও রহিয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ২-৩ বৎসরের পর ঐরূপ অভ্যাস পরিত্যক্ত হয়। বালকদের মধ্যেই ইহার প্রকোপ বেশী। পশুদের মধ্যে পালিত প্রায় সকল প্রকার পশুই ব্যবহৃত হয়, যথা—গরু, মেষ, শূকর, বিড়াল, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি।

পুরুষদের বেলায় পশুমৈথুনের প্রকোপ যতটা নারীদের বেলায় উহা তুলনায় অতি সামান্য। ইহার কারণ এই যে, মেয়েরা যৌন-সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে ছেলেদের মত আলোচনা করে না, রতিক্রিয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে অতটা অবহিত থাকে না, পশুমিলন দেখিবার সুযোগও ততটা পায় না। তাই ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধানে নারীদের মধ্যে পশুমৈথুনের অভ্যাস অনেক কম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনুসন্ধানে কেবলমাত্র শতকরা ১'৫ নারী কৈশোরে

বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি পালিত জন্তুর সহিত আকস্মিকভাবে অথবা কৌতূহল বশত যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে। যৌবনে ঐরূপ যৌন-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অল্প।

পশুগমন প্রবৃত্তি অনেকের মতে স্নায়বিক ব্যাধি ও বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক। ডাঃ ফোরেলের মতে অস্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা ইহাদের রতিশক্তি নাশ করা উচিত, অন্যথায় ইহাদিগকে পাগলা গারদে আটক রাখা উচিত,—কারাদণ্ড ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। মিঃ এলিস্ অপেক্ষাকৃত উদারতার সহিত পর্যালোচনা করিয়াছেন। ইহাকে তিনিও খুব জঘন্য কার্য বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আইনকর্তা ও সমাজতত্ত্ববিদ্গণকে তিনি দুইটি উপদেশ দিয়াছেন:

প্রথমত অন্যান্য বিকৃতির ন্যায় ইহা সভ্যতাসঞ্জাত নহে। ইহা অশিক্ষিত অর্ধসভ্য, স্বল্পবুদ্ধি পল্লীমনের পরিচায়ক। বৃটিশ কলাম্বিয়া প্রভৃতি স্থানে আজিও মানুষ ও পশুতে কোন উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান স্ফুরিত হয় নাই। সেজন্য সেখানে ইহা স্বাভাবিক মৈথুন অপেক্ষা বিশেষ হেয় বিবেচিত হয় না।

জার্মানীর এক পল্লীগ্রামের কৃষক একবার এই জন্য ধৃত হইয়া বিচারালয়ে নীত হয়। সে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বিনা দ্বিধায় হাকিমের কাছে বলিয়াছিল—'আমার স্ত্রী বহু দূরে ছিল, তাহার সংসর্গ পাওয়া সম্ভব ছিল না বলিয়াই আমি আমার শূকরী ব্যবহার করিয়াছিলাম।''

স্বাভাবিক মিলনের সুযোগের অভাবে সুস্থ-মস্তিষ্কের লোকেও যে অবস্থা বিশেষে ইহাতে লিপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ—বিগত মহাযুদ্ধের সৈনিকগণ। বহুদিন স্ত্রীসংসর্গের অভাবে ইহারা ছাগল ও ভেড়ার সহিত মৈথুন করিত।

দ্বিতীয়ত পশুর উপর নিষ্ঠুরতা ব্যতীত পশুমৈথুনে সমাজের বিশেষ কোনও অনিষ্ট হয় না। ইহাতে কামতৃপ্তি হয় অথচ অবৈধ গর্ভ, রতিজরোগ ও অর্থ নাশের আশঙ্কা নাই, দুর্নামের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। মৈথুনক অনুচিত কার্য করে নিজের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে নহে। যে সমস্ত রুগ্ন ও বিকৃত-মস্তিষ্ক লোক স্ত্রীসহবাসের দ্বারা সন্তানোৎপাদন করতঃ পৃথিবীতে রোগী ও উন্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, পশুগামী তাহাদের মত সমাজের শত্রু নহে। সুতরাং পশুর প্রতি সাধারণ নিষ্ঠুরতার যে শাস্তি, পশুমৈথুনের শাস্তি তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত নহে।

পশুদের মধ্যে যৌনক্রিয়া দেখিয়া কিশোর ও যুবকদের উত্তেজনা হওয়া এবং ঐরূপ ব্যবহার করা আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নহে। উহা নর ও নারীর মিলন দেখিবার সুযোগপ্রাপ্ত দর্শকদের উত্তেজনাই সমতুল্য। ইহা ছাড়া অপরের

কাছে শুনিয়া বা অপরের কার্যকলাপ দেখিয়া উহার পুনরাবৃত্তি ও স্বাভাবিক। এই জন্য উহাকে অস্বাভাবিক বা বিকৃতি আখ্যা দিবার উপযুক্ত কারণ নাই। উহা স্বাভাবিক যৌনমিলনের বিকল্প মাত্র।

পশুমৈথুনে গর্ভসঞ্চার হয় বলিয়া আমাদের দেশে একটি সাধারণ বিশ্বাস আছে। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, **মানুষের শুক্র ও পশুর ডিম্ব** অথবা **মানুষের ডিম্ব ও পশুর শুক্রের** সংস্পর্শে **প্রজনন হইতে পারে না**। পশু ব্যবহারের সবচেয়ে বিষময় ফল এই যে, ইহাতে নানা প্রকার রোগসংক্রমণের ভয় থাকে। টিটেনাস, ইরিসিপেলাস এবং এ্যান্থাক্স ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক।

শিশুগমন (Infantilism)

এক শ্রেণীর বিকৃতমস্তিষ্ক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা শিশুদের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া থাকে। ডাঃ ফোরেল ইহাকে সহজাতবৃত্তি বলিয়াছেন। কিন্তু ক্রাফট্ এবিং এই বৃত্তিকে সহজাত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ক্রাফট্ এবিং-এর মত এই যে, **অস্বাভাবিকরূপে শিশু-অনুরাগ সাধারণতঃ অধিক বয়সেই হইয়া থাকে**। শৈশবে যে যৌনবিকৃতি দেখা দেয়, উহাকে সমমৈথুন বলা যাইতে পারে, এবং অধিকাংশ স্থলে উহা পারস্পরিক। ক্রাফট্ এবিং ও লিপম্যান গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিশুদের উপর বলাৎকারের যতগুলি ঘটনা তাঁহাদের চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাদের প্রায় সবগুলির অপরাধীই বিগতযৌবন বৃদ্ধ। ইহার কারণ ইহা নয় যে, এই প্রকৃতি কাহারও কাহারও বৃদ্ধাবস্থায় হঠাৎ গজাইয়া উঠে, বরং সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয় যে, কোন কোন লম্পট বৃদ্ধ বয়সে যুবতীদের আকর্ষণ করিতে অপারগ হওয়াতে অগত্যা সহজলভ্য ছোট মেয়েদের দ্বারা বাসনাপূরণ করে। সহজ লভ্য ও বাধা দিতে অক্ষম বলিয়া কখনও কখনও বাড়ীর যুবক চাকর সামলাইতে না পারিয়া মনিবের বালিকা শিশুর উপর অত্যাচার করে।

ডাঃ ফোরেল একজন প্রতিভাশালী শিল্পীর কথা বলিয়াছেন। এই শিল্পীটি সম্পূর্ণ রতিশক্তিসম্পন্ন ছিল। তবু তাহার অনুরাগ ছিল কেবল অল্পবয়স্কা বালিকাদের প্রতি। বার বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকা সে মোটেই পছন্দ করিত না। বৃদ্ধা নারীর শিশু-অনুরাগের দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। তিনি

লিখিয়াছেন—"বিকৃতমস্তিষ্ক বা নষ্টযৌবন বৃদ্ধ ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোকও শিশু-মৈথুন করিয়া থাকে। অনেকেরই একটি অন্ধ কুসংস্কার আছে যে, অক্ষতযোনি বালিকার সহিত রমণ করিতে পারিলে যৌন ব্যাধি বিশেষ করিয়া গনোরিয়া সারিয়া যায়। এই রোগগ্রস্ত অনেক পাপিষ্ঠ রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বয়স্কা বালিকার অভাবে শিশুবালিকার উপর বলপ্রয়োগে তাহাদের নিষ্পাপ দেহে এই রোগ সংক্রমিত করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর শিশু-মৈথুনীদের সংখ্যাও কম নহে এবং এইভাবে বিশেষ করিয়া, বড় বড় শহরে অনেক শিশুই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর শিশু-মৈথুন সর্বাপেক্ষা গুরুতর সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, লোকলজ্জার ভয়ে, এইরূপে (চাকর-বাকর দ্বারা বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা) কোনও শিশু রোগাক্রান্ত হইলে, তাহার অভিভাবক সহজে ইহা প্রকাশ করিতে বা উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইতে চাহেন না। তাহার ফলে কত সুন্দর নিষ্পাপ শিশু অকালে ঝরিয়া যায় বা অন্ধ ও বিকৃতাঙ্গ হইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করে।"

বালিকার এই রোগ বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক ও দুরারোগ্য হয়। পশুগমন অপেক্ষা শিশুব্যবহার গুরুতর দৈহিক ও সামাজিক পাপ। সুতরাং সমাজে ও রাষ্ট্রে এই পাপের প্রতিবিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার প্রতি আকর্ষণ (Gerontophilia)

শিশুগমনের বিপরীত অবস্থারও দৃষ্টান্ত আছে। কুমারী বা যুবতী নারী অপেক্ষা বিগতযৌবনা বা বৃদ্ধা নারীর প্রতি পুরুষের আসক্তি বা তরুণীর বৃদ্ধের প্রতি আকর্ষণ এই পর্যায়ে পড়ে।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক রুসো তাঁহার প্রকাশিত Confessionsএ (স্বীকারোক্তিতে) লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার অধিক বয়স্কা নারীর দিকে আকর্ষণ বেশী ছিল। ডাঃ হার্সফেল্ড অন্য একজন যুবকের কথা লিখিয়াছেন। যুবকটি একটি বৃদ্ধ লোক দেখিয়া আসক্ত হয়। বৃদ্ধ তাহার প্রেম-নিবেদনে সাড়া না দেওয়ায় সে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তাঁহার মোটেই আসক্তি হইল না; বৃদ্ধের প্রতিই তাঁহার আবেদন-নিবেদন চলিতে লাগিল। ইহা সমকামী বৃদ্ধ-প্রীতিরই নজীর।

যুবতী নারীরাও কখনও কখনও বৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গে ইচ্ছা করিয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। অর্থ বা সম্পত্তির লালসা আছে, এরূপ স্বার্থবুদ্ধি ও সুবিধাবাদীদের ক্ষেত্রে এই বিকল্পের কথা উঠেই না। তবে আমরা যে প্রবৃত্তির কথা বলিতেছি উহার প্রভাবও কোন কোনও ক্ষেত্রে থাকে বটে।

এই প্রবৃত্তির মূলে, ফ্রয়েডের মতে, একটা মানসিক উচ্ছ্বাস থাকা সম্ভব। ফ্রয়েড ইহাকে Œdipus Complex বলেন। ইহাতে পুত্রসন্তান মাতার প্রতি আসক্ত হয়। আবার Etectra Complex (শতরূপা কুটৈষা) এর ফলে কন্যাসন্তান পিতার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে। এই আসক্তি দৃঢ়মূল হইয়া গেলে উপযুক্ত বয়সে যুবকের বা যুবতীর পর্যায়ক্রমে মাতা বা পিতার সমবয়সী বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি আসক্তি হইয়া থাকে।

মৃতদেহে আসক্তি (Necrophilia)

জীবিত ব্যক্তি অপেক্ষা মৃতদেহের প্রতি আসক্তিও কাহারও কাহারও দেখা গিয়াছে। আর্ডিসন (Ardisson) নামক একব্যক্তি একটি বালিকার মৃতদেহ খুঁড়িয়া বাহির করিয়া লুকাইয়া রাখে। তাহার পর পচিয়া না যাওয়া পর্যন্ত উহার সহিত পুনঃপুনঃ মিলিত হইয়া নিজের কামের তৃপ্তি সাধন করে।

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষকেরা বলেন যে, এই প্রবৃত্তির মূলে শিশুর নিজ মাতার নির্বিকার ঘুমন্ত দেহের প্রতি আসক্তির পুনরাভিনয়ের চেষ্টা থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই প্রকার লোক বিনা প্রতিবাদে বাসনা পুরাইতে চাহে বলিয়া মৃতদেহ পছন্দ করে। এইরূপ বিকৃতি খুব কম দেখা যায়।

ধর্ষণেচ্ছা ও ধর্ষিত হইবার প্রবৃত্তি

কামপাত্রকে বেদনা দিবার কিংবা অপমান করিবার বা উহার নিকট হইতে বেদনা পাইবার কিংবা অপমানিত হইবার ইচ্ছার সহিতও যৌনবোধের তৃপ্তি সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে। প্রথম প্রকার প্রবৃত্তিকে **ধর্ষণেচ্ছা** (Sadism) এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রবৃত্তিকে **ধর্ষিত হইবার ইচ্ছা** (Masochism) বলে। Marquis de Side (১৭৪০-১৮১৪) একজন সুলেখক ছিলেন। তিনি অত্যাচারমূলক কামক্রীড়ার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম হইতে Sadism কথার উদ্ভব হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিপরীত প্রবৃত্তির নাম হইয়াছে জার্মান লেখক Sasher Masoch-এর (১৮৩৫-১৮৯৫) নাম হইতে।

প্রায় ক্ষেত্রেই শৃঙ্গার অথবা সহবাসের সময় অল্পবিস্তর অত্যাচার করিবার (যথা, চাপন, দংশন প্রভৃতি) বা অত্যাচারিত হইবার প্রবলেচ্ছা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাকে। মোটের উপর কোন কোন লোকের অত্যাচারের পাত্র প্রেমাস্পদ আবার অপর কোন কোন লোক নিজেই প্রেমাস্পদের অত্যাচারের পাত্র হইতে চাহে।

সাধারণতঃ এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকেরা স্বাভাবিক মিলন অপেক্ষা অত্যাচারমূলক কার্যাদি সমাধা করণে বা দর্শনে যৌনতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। বেদনা দান বা লাভ এবং যৌনতৃপ্তি একে অপরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

অনেকের মতে স্বাভাবিক মিলনে পুরুষের সক্রিয়তা ও নারীর বশ্যতা দৃশ্যত একের ধর্ষণ করিবার ও অপরের ধর্ষিত হইবার ইচ্ছার মতই দেখায়। কিন্তু এই দুই প্রকার ইচ্ছারই যদি প্রবলতা বা বাড়াবাড়ি এতদূর গড়ায় যে, স্বাভাবিক সম্ভোগ অপেক্ষা অন্য প্রকারে অত্যাচার করিয়া বা অত্যাচার সহিয়া উত্তেজনা এবং তৃপ্তিলাভ হয়, তাহা হইলেই তাহা আলোচ্য প্রবৃত্তিদ্বয়ের পর্যায়ে পড়ে।

এই উভয় প্রকৃতি সাধারণ কঠোরতা হইতে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা পর্যন্ত গড়াইতে পারে। কেহ নারীকে বেত্রাঘাত করিয়া আনন্দ পায়, কেহ তাহার শরীর হইতে রক্তপাত করিয়াও উপভোগ করে। পক্ষান্তরে কেহ প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে নিজের শরীরে নানাবিধ অত্যাচার করিতে প্ররোচিত করে। রমণকালে প্রেমাস্পদকে চাপন, দংশন ও তাহার পর বেত্রাঘাত, প্রহার এমন কি হত্যা করিয়াও অনেকে যৌনতৃপ্তি লাভ করে।

প্রদর্শনকাম (Exhibitionism)

নিজের যৌন-অঙ্গ বিষম-লিঙ্গের বা সমলিঙ্গের অপর ব্যক্তিকে প্রদর্শন করিয়া পুলক অনুভব করার নাম **প্রদর্শনকাম**। ফ্রয়েডের মত এই যে, ইহা **শৈশবেই** মানবমনে জন্মলাভ করে। তাঁহার গবেষণার ফল এই যে, শিশুগণ উলঙ্গ থাকিতে ভালবাসে এবং তাহাদের যৌন-অঙ্গ অপরে দেখিতেছে, এই অনুভূতি হইতে তাহারা স্বতঃ-উৎসারিত পুলক বোধ করে। ফ্রয়েডের মতবাদ কেহ খণ্ডন করিবার প্রয়াস পান নাই। কিন্তু পুটনাম প্রভৃতি যৌন-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে, এই বাতিক সাধারণতঃ যৌবনে উন্মেষ লাভ করে। ডাঃ লাসিগ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই যৌনবিকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা

করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই বিকল্প প্রায়শ সার্বজনীন। ডাঃ নরউড ইষ্টের মত এই যে, ব্রিক্‌ষ্টন জেলের ২৯১ জন যৌন-অপরাধীর মধ্যে ১০১ জন ছিল প্রদর্শনবাতিকের অপরাধী।

প্রদর্শনকারীরা অদ্ভুত মনোবৃত্তিসম্পন্ন। তাহারা রতিশক্তিসম্পন্ন হইলেও নারীকে কখনও আক্রমণ করে না বা সম্ভাষণ করে না, এমন কি কথাটি পর্যন্ত বলে না। তাহারা নারীকে যৌন-অঙ্গ প্রদর্শন করিয়াই এক প্রকার পুলক অনুভব করে। অনেক ক্ষেত্রে তাহারা নারীকে দেখাইয়া শুক্রস্খলন করে,—এই পর্যন্ত। ইহার বেশী আর কিছুই চাহে না। ইহারা রাস্তার কোনও দেওয়ালের আড়ালে কিংবা জানালার ধারে অপেক্ষা করিতে থাকে, কোনও নারীকে সেখান দিয়া যাইতে দেখিলেই তাহারা উক্ত নারীকে দেখাইয়া নিজেদের অঙ্গ নাড়াচাড়া করে। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা পুলিসের ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করে।

ডাঃ ক্রাফট্‌ এবিং-এর অভিমত এই যে, যৌবনের প্রারম্ভে অস্বাভাবিক যৌন-অত্যাচার ও অনিয়মের ফলে যাহারা রতিশক্তি হারাইয়া বসে, পরবর্তী জীবনে তাহারাই প্রদর্শনকামী হইয়া থাকে। ডাঃ ফোরেল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইঁহার মত এই যে, প্রদর্শনবাতিক কোনও প্রকার অভ্যাস বা অনিয়মের ফল নহে—ইহা সহজাত। আমাদের বিবেচনায় এই দুই প্রকার মতবাদেই একটু বাড়াবাড়ি আছে। অন্যান্য কুপ্রবৃত্তির ন্যায় প্রদর্শনবৃত্তিও কতকটা বংশজ অথবা জন্মগত হইতে পারে বটে, কিন্তু সংসর্গ ও অভ্যাসের দ্বারাও মানুষ প্রদর্শনবাতিকগ্রস্ত হইতে পারে।

ডাঃ মিডার (Maeder) প্রদর্শনবৃত্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম **শৈশবকালীন** প্রদর্শনবৃত্তি। ডাঃ মিডারের মতে শিশুগণ সাধারণতঃ যৌন-অঙ্গ দেখিতে এবং দেখাইতে এক প্রকার শিশুসুলভ পুলক অনুভব করিয়া থাকে। দ্বিতীয় **অক্ষমের** প্রদর্শনকাম। রতিশক্তিবিহীন লোকেরা প্রদর্শন দ্বারা লিঙ্গোদ্রেক করিয়া থাকে। তৃতীয়ত, **আকর্ষণের উপায় স্বরূপ** প্রদর্শন। সুস্থদেহ ও সুস্থমস্তিষ্ক বহু লোক স্বীয় যৌন-অঙ্গ প্রদর্শন করিয়া বাসনা জ্ঞাপন ও বিপরীত লিঙ্গের কামোদ্রেকের চেষ্টা করিয়া থাকে।

ডাঃ মিডারের এই শ্রেণীবিভাগ নির্দোষ ও সম্পূর্ণ না হইলেও, অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলা যাইতে পারে। কারণ, ডাঃ ক্রাফট্‌ এবিং-এর মতের যতই ত্রুটি প্রদর্শিত হউক না কেন, একথা

স্বীকার করিতেই হইবে যে, **রতিশক্তির অভাবহেতুই অধিকাংশ লোক প্রদর্শন-কামে সন্তোষলাভ** করিয়া থাকে; এই ধরনের প্রদর্শন-কারীরা আনন্দলাভের আশায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় অঙ্গ প্রদর্শন করিয়া থাকে। মদ্যপান ইত্যাদি অমিতাচার দ্বারাও এই শ্রেণীর কদর্য অভ্যাস হইতে পারে। ডাঃ নরউড ইষ্ট লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে মদ্যপায়ীর সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনকারীর হ্রাসবৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে।

অপস্মার বা মৃগী-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগাক্রমণের সময়ে স্বীয় যৌনঅঙ্গ প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু উহাদিগকে ঠিক ঐ শ্রেণীভুক্ত করা অন্যায় হইবে। কারণ, সজ্ঞান ও স্বেচ্ছাকৃত প্রদর্শনকেই আমরা যৌনবাসনাসঞ্জাত ক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত করিতে পারি—অজ্ঞান অবস্থায় কৃত কোনও কার্যকেই কোনও প্রকার যৌনবৃত্তিমূলক বলিতে পারি না।

অবশ্য একথাও ঠিক যে, যাহারা রতিবাসনা পূরণের জন্য কোনও প্রকার অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করে, তাহাদিগকেও এক শ্রেণীর বিকৃতমস্তিষ্ক লোক বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের বিকার যৌন-ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ যাহারা অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে স্থিরমস্তিষ্ক হইয়াও কেবল যৌন-ব্যাপারে বিকৃত মস্তিষ্ক, আমরা কেবল তাহাদের মনোবৃত্তিকে যৌন-বিকৃতি বলিতে পারি। সম্পূর্ণ উন্মাদ—যে ব্যক্তি ড্রেনের ময়লা প্রভৃতিকে রসগোল্লা-বোধে পরম তৃপ্তির সহিত গলাধঃকরণ করিতেছে, সে যদি যৌন-ব্যাপারে কোনও প্রকার অসাধারণত্ব প্রদর্শন করে, তবে তাহার কার্যকে কোনও মতেই যৌন-বিকৃতি বলা যাইতে পারে না।

পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে প্রদর্শনস্পৃহা অতি কম দৃষ্ট হয়। মিঃ এলিসের মত এই যে, নারী জাতির মধ্যে শৈশবেই যা-কিছু প্রদর্শনবৃত্তি দেখা যায়, বয়স্কা নারীর মধ্যে ইহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

প্রদর্শনকামীর কার্য প্রথম দৃষ্টিতে একটা নিরর্থক কদর্যতা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কারণ, ইহার মধ্যে দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি কোনও একটি যৌন-ইন্দ্রিয়ানুভূতির লেশ নাই। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, মানুষ যে কারণে অশ্লীল বাক্য শ্রবণ করাইয়া আনন্দ পায়, ঠিক সেই কারণেই গোপন-অঙ্গ প্রদর্শন করিয়াও আনন্দ পায়। এই উভয় কার্যে বক্তা ও প্রদর্শকের উদ্দেশ্য শ্রোতা ও দর্শকের মধ্যে ভাববিপর্যয় সৃষ্টি করা। প্রদর্শনহেতু দর্শকের তিনটি অবস্থা ঘটিতে পারে: হয় (১) দর্শক

লজ্জায় ও ভয়ে পলায়ন করিবে, (২) ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদর্শককে গালি দিবে, অথবা, (৩) আনন্দলাভ ও কৌতুক বোধ করিয়া হাস্য করিবে। এই তিন অবস্থার যে কোনও অবস্থাতেই প্রদর্শক আনন্দলাভ করে, তবে শেষোক্ত অবস্থাতেই যে সে সর্বাপেক্ষা অধিক পুলক অনুভব করে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কোনও প্রকার মানসিক তারল্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রদর্শকেরা যে প্রদর্শন-কার্য করিয়া থাকে, তাহা নহে। বরঞ্চ পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গেই তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে। তাহারা দর্শকের প্রাণে একটা ছাপ রাখিয়া দিতে চায়। সেইজন্য প্রদর্শককে অধিকাংশক্ষেত্রে গাম্ভীর্যপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে প্রদর্শন-কার্য করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ যখন একাধিক নারী একত্র হাস্যকৌতুকে রত থাকিবে, সেই মুহূর্তকে কস্মিনকালেও প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় মনে করিবে না। বরঞ্চ নারী যখন একা কোনও গুরুতর কার্যে রত থাকিবে, সেই সময়কেই সে প্রদর্শনের শুভ মুহূর্ত মনে করিবে।

ডাঃ গার্নিয়ার তাঁহার এক রোগীর মুখে প্রদর্শন-কামের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়াছেন—"আমি সাধারণতঃ গীর্জাতেই প্রদর্শন করিতাম। গীর্জার পবিত্রতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই যে আমি গীর্জায় ঐ কার্য করিতাম তাহা নহে। বরঞ্চ আমি বিশ্বাস করি, গীর্জার ন্যায় পবিত্র স্থানই প্রদর্শনকার্যের একমাত্র উপযুক্ত স্থান। যখন অধিকাংশ হুজুগপ্রিয় গীর্জাগামী গীর্জা ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং খাঁটি ভক্ত কতিপয় ধর্মপ্রাণা নারী নতজানু হইয়া বেদীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া উঠে, তখন আমি বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার অঙ্গ প্রদর্শন করিয়া থাকি। আমি তখন আশা করিয়া থাকি, ভক্ত নারীরা উল্লাসে বলিয়া উঠিবে, 'প্রকৃতির উন্মুক্তরূপ কত সুন্দর।'

পুরাকালে প্রায় সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যেই পরম গাম্ভীর্যের সহিত লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল; আমাদের মনে হয়, তাহাও এই অনুভূতি হইতেই।

মিঃ এলিস্ ও ডাঃ নরউড ইষ্টের মতে প্রদর্শনকাম যৌনবিকাশের একটা সাধারণ রূপ। ডাঃ ইষ্ট ১৫০ জন প্রদর্শনকারীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, **অবিবাহিত যুবকগণের মধ্যেই** প্রদর্শনবৃত্তি অতিশয় প্রবল। তাঁহার দেড়শত পাত্রের মধ্যে ৫৭ জনই ছিল ২৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক অবিবাহিত যুবক।

মিঃ এলিসের মত এই যে, যাহা আমাদের সমাজে স্বাভাবিক বলিয়া চলিতেছিল, তাহাই এক ধাপ বৃদ্ধি পাইয়া প্রদর্শনকামে পরিণত হইয়াছে।

তিনি এ বিষয় লিখিয়াছেন—"আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, অতি অল্পদিন হইল ইংলণ্ডে নগ্নতা আইনে দণ্ডনীয় হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দেও অভিজাত ঘরের মহিলারা পর্যন্ত বাড়ীর মধ্যে অপরিচিত আগন্তুকদের সম্মুখে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া চলাফেরা করিতেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রদর্শনকাম অন্যান্য যৌনবিকল্পের ন্যায় বিপজ্জনক নহে। কারণ প্রকর্শকরা কাহারও অঙ্গস্পর্শ করে না। কিন্তু তথাপি আমাদের দেশে ফৌজদারী আইনে যে প্রদর্শনকামকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে, তাহা ঠিকই করা হইয়াছে। কারণ প্রদর্শনকারীরা কাহারও অঙ্গ-স্পর্শ না করিলেও তাহারা যে নারীর সম্ভ্রমের হানি করিয়া থাকে, তাহাও সামাজিক নীতিবোধের দিক হইতে কম দূষণীয় নহে। তাহা ছাড়া প্রদর্শনবাতিকও প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমে আক্রমণাত্মক আকার ধারণ করিতে পারে।

ডাঃ ফোরেলও প্রদর্শনকামের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, প্রদর্শনকারীর অঙ্গদর্শনে যে সমস্ত তরুণী ভীতা হইয়াছে, তাহাদের অনেককে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সে ভয়ের ফলে তাহাদের মানসিক বা মস্তিষ্কগত কোনও ক্ষতি হয় নাই। সুতরাং প্রদর্শন-কারীদিগকে খুব গুরুতর শাস্তি দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী নহেন।

অনুকূল অবস্থার মধ্যে চিকিৎসা করিলে অনেক প্রদর্শনকারীকে এই অভ্যাসের হাত হইতে মুক্ত করা যাইতে পারে বলিয়া অনেক চিকিৎসকের অভিমত। মিঃ এলিসের অভিমত এই যে, কোন প্রদর্শনকামীকে যদি নগ্ন-বাদীদের দলে ভর্তি করিয়া দেওয়া যায়, তবে সে প্রথম প্রথম প্রদর্শনের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে, পক্ষান্তরে নগ্নবাদীদের সংসর্গচ্যুত হইবার ভয়ে সে কোনও প্রকার অন্যায় আচরণ করিতে সাহস পাইবে না। তাহা ছাড়া তাহার অঙ্গ দেখিয়া কাহারও ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা, কৌতুক আমোদ বা কামোদ্রেক হইতেছে না দেখিয়া সে আর প্রদর্শনে আনন্দ পাইবে না। উহার ঐ বাতিক সারিয়া যাইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, উহাদের কখনও নিঃসঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করা উচিত নহে। সর্বদা লোকজনের মধ্যে থাকিলে প্রদর্শনকাম অনেকটা সংযত থাকে।

সৌভাগ্যবশতঃ এই বিকৃতি খুব বেশীমাত্রায় পাক-ভারতে দেখা যায় না, অন্ততঃ আমরা অনুসন্ধানে পাই নাই। বিকৃতির সমস্তগুলি আমাদের দেশে

ব্যাপকভাবে প্রচলিত না থাকিলেও যাতায়াত ও ভাবের আদান-প্রদানের অধিকতর সুবিধাহেতু ঐগুলি আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়া বিচিত্র নহে। কুকাজ গোপন করিয়া লাভ নাই। প্রকাশ্য আলোচনার দ্বারা উহার প্রতিকার

ডঃ কিন্‌সের অভিমত—পুরুষদের নিজ যৌনাঙ্গ সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহ থাকায় এবং অপরদের যৌনাঙ্গ দেখিলে উত্তেজিত হওয়ায় তাহারা মনে করে যে, অপরেরাও তাহাদের যৌনাঙ্গ দেখিয়া সেইরূপ উত্তেজনা ও আনন্দ বোধ করিবে। এই জন্য তাহারা নিজেদের স্ত্রীদের, প্রণয়িনীদের এবং সমকামের অংশীদারগণকে নিজেদের যৌনাঙ্গ দেখায়। অধিকাংশ পুরুষ বুঝিতে পারে না যে, রমণীবৃন্দ পুরুষের অঙ্গ দেখিয়া উত্তেজিত হয় না। স্ত্রী ও প্রণয়িনীগণ যখন ঐরূপ উত্তেজিত হয় না তখন পুরুষেরা মনে করে যে, তাহারা আর তাহাদিগকে ভালবাসে না।

পক্ষান্তরে অনেক রমণী যখন দেখে যে, তাহাদের স্বামীগণ নিজেদের যৌনাঙ্গ দেখাইতে চাহে তখন তাহারা মনে করে যে, তাহাদের ভর্তাগণ মানসিক স্থূল ও কদর্য রুচির, অসভ্য ও গ্রাম্যভাবাপন্ন, যৌনবিকৃতি অথবা গোলযোগসম্পন্ন। এই ভুল বোঝাবুঝির জন্য দাম্পত্যজীবনে নানা জটিলতা ও গোলযোগের উৎপত্তি হয়, এমন কি বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়।

যে পুরুষেরা জনসমাগমের স্থানে নিজেদের যৌনাঙ্গ দেখায় তাহারা এই ভাবিয়া কামতৃপ্তি লাভ করে যে, রমণীগণ তাহাদের অঙ্গ দেখিয়া উত্তেজিতা হইবে। কখনও কখনও রমণীগণ ইহাতে যেভাবে ভীত, চকিত বা কুপিত হয় তাহা দেখিয়া প্রদর্শনকারীরা উত্তেজিত হয়।

কামিনীগণ কর্তৃক প্রদর্শন—কতক স্ত্রীলোক তাহাদের যৌনাঙ্গ কোনও পুরুষদের এই জন্য দেখায় যে, তাহারা জানে যে, ইহাতে পুরুষেরা প্রীত হইবে। কদাচিৎ কোনও প্রদর্শনকারিণী নারী নিজে ইহাতে উত্তেজিতা হয়।

দর্শনপ্রবৃত্তি (Voyeurism)

প্রদর্শনবাতিকের ঠিক বিপরীত এক প্রকার অভ্যাস আছে, যাহাকে **দর্শন-প্রবৃত্তি** (Voyeurism, Scoptophilia, Mixoscopia বা Peeping)

বলে। এই অভ্যাস যাহাদের আছে তাহারা সাধারণতঃ অত্যধিক সলজ্জভাব হেতু অথবা পুরুষত্বহীনতার জন্য প্রায়ই ইচ্ছানুযায়ী সঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা অন্য কাহাকেও ঐরূপ ক্রিয়াবত দেখিতে ভালবাসে; কাহারও বা ক্রিযার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত না দেখিলে তৃপ্তি হয় না, আবার কেহ কেহ শুধু বিপরীত লিঙ্গের কাহারও যৌনঅঙ্গ দর্শনেই তৃপ্ত হয়। ইহাদের প্রায় সকলেরই জীবজন্তুর মিলনক্রিয়া দেখিয়া আনন্দ হয়; অপরের মলমূত্র ত্যাগ লক্ষ্য করার প্রবৃত্তিও অনেকের হয়। তবে সাধারণ কৌতূহলপ্রবণতা বিকৃতির মধ্যে গণ্য হয় না, গণ্য হয় এমন সব অভ্যাস, যাহাতে **নিজের তৃপ্তি বা রেতঃস্খলন** অপরের ক্রিয়া দর্শন না করিলেও হয় না অথবা যখন স্বাভাবিক-ভাবে সঙ্গম করা অপেক্ষা অপরের সঙ্গম-দৃশ্য দেখিতে বেশী ভাল লাগে। এই প্রকার অভ্যাসের দাস অনেক বিত্তশালী লোক দাসদাসী বা অপরকে সুযোগ দিবার জন্য অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, এমন কি নিজের স্ত্রীর সহিত অপরের মিলন ঘটাইয়া সমস্ত কামক্রীড়া দর্শনে আনন্দলাভ করে।

এই বৃত্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেকে অশ্লীল চিত্র প্রদর্শন বা প্যারিস প্রভৃতি জায়গায় নগ্ননৃত্য বা অশ্লীল কামক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া অর্থ অর্জন করিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে, অন্যের কামক্রীড়া দেখিবার কৌতূহল নরনারীর স্বভাবজাত। ইহাকে **স্বাভাবিক দর্শনেচ্ছা** বলা যায়।

বাড়ীর দাসদাসীরা বালক-বালিকারা অনেক সময় তাহাদের গৃহে বাস-কারী দম্পতিদের ঘরের জানালায় বা দরজার ফাঁক দিয়া অলক্ষ্যে উঁকি মারিয়া থাকে। পশুপক্ষীর মৈথুনক্রিয়া দেখিয়াও প্রায় সকলেই উত্তেজনা উপভোগ করে। ইহা ছাড়া নিজের স্ত্রীর বা স্বামীর নগ্নদেহ দর্শন করিবার আগ্রহের কথাও অস্বাভাবিক নহে। আমার পরিচিত একজন শিক্ষিত যুবক পাঁচ বৎসর হইল বিবাহ করিয়াছেন। যৌনমিলন ছাড়া তাঁহার স্ত্রীর নগ্ন-সৌন্দর্য প্রত্যহ উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহা স্বাভাবিক দর্শনেচ্ছা—অল্পবিস্তর সকলের মধ্যেই আছে; কেহ সুবিধা থাকায় প্রায় প্রত্যহ উপভোগ করে, কেহ তাহা না থাকায় কালে-ভদ্রে; কেহ বা অহেতুক লজ্জার বশবর্তী হইয়া ইচ্ছা দমন করে মাত্র।

ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধানে ইহা পাওয়া গিয়াছে যে, পুরুষ স্ত্রীজাতির বক্ষ, নিতম্ব, পা ও যৌন-অঙ্গ দেখিয়া উত্তেজনা বোধ করে; কিন্তু নারীরা পুরুষের

যৌন-অঙ্গ দেখিয়া আনন্দ ত পায়ই না বরং ঘৃণা বোধ করে। তাঁহারা বলেন যে, এরূপ বিপরীতকামী পুরুষ খুব কমই আছে যে, সুবিধা পাইলে বিবস্ত্রা নারী অথবা সুরত ক্রিয়া না দেখে। অনেক পুরুষেব পক্ষে নারী যখন বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছে তখন তাহাকে দেখা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারীকে দেখা অপেক্ষা অধিক উত্তেজক। কারণ তাহাবা সম্পূর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের পর কি দেখিতে পাইবে তাহা কল্পনা কবে। বমণীদের মধ্যে এরূপ আচরণ অবশ্যই কদাচিৎ দেখা যায়।

নগ্নতাচর্চা (Nudism)

মিঃ এলিস **নগ্নতাচর্চাকে** প্রদর্শনবাতিকে চিকিৎসার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন। **নারী ও পুরুষ সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় একত্রে কাজকর্ম, চলাফেরা ও ব্যায়ামাদি করার নাম নগ্নতাচর্চা।** মানুষ তাহাব কয়েকটি প্রত্যঙ্গ ঢাকিয়া বাখিযা বরঞ্চ সেদিকে অপবের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছে। যাহা গোপন কবিবাব প্রথা, আমরা তাহাই বেশী করিয়া দেখিতে চাই। মানুষ যদি তাহার যৌন-অঙ্গসমূহ গোপন কবিয়া না চলিত, তবে যৌন-অঙ্গেব প্রতি মানুষেব আকর্ষণের এত তীব্রতা থাকিত না, সংসারে অপরাধ ও পাপের মাত্রাও কমিয়া যাইত।

স্বাস্থ্যেব উপর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও নগ্নবাদেব উদ্যোক্তাদের অনেক কিছু বলিবার আছে। তাঁহাদেব অভিমত এই যে, মানুষ সারা শরীবেব চামড়াব মধ্যস্থতায় অপকাবী বাষ্প ও ময়লা ঘামের সঙ্গে বাহির করিয়া থাকে, তাই শরীর যতটা উন্মুক্ত থাকে ততই এই শোধনকার্য সম্ভবপর হয়। সুইজাবল্যাণ্ডে যক্ষ্মারোগীদের বেলায এবং সর্বত্রই শিশুদের পক্ষে উন্মুক্ত স্থানে চলাফেরা, বায়ু সেবন এবং সূর্যতাপ উপভোগ করা উপকারী মনে করা হয়। এখন প্রায় সকল জায়গাতেই সূর্যতাপে স্নান (Sun bathing) স্নায়ুর পক্ষে উত্তেজক ও শক্তি-বৃদ্ধিকর বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ডাক্তারী মতে ইহা অনেকটা প্রামাণ্য বলিয়াও স্থির হইয়াছে। তবে ভাবতবর্ষের মত উষ্ণ দেশে সূর্যতাপের অভাব এমনিই বড় একটা হয় না।

নগ্নবাদীরা ইহাও দাবি করেন যে, নগ্ন ও উন্মুক্ত সমাজে লোকের মনে ভাবপ্রেরণা বেশী হয়। কবি আরও ভাল কবিতা লেখেন, ঔপন্যাসিকেব উপন্যাস আরও উপভোগ্য হয়, কলাবিদের কলাচর্চার ঐশ্বর্য আরও বৃদ্ধি

পায়। এই দাবি তাঁহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দাবিরই সমতুল্য। শরীর ক্লেদমুক্ত ও স্নায়ুসমূহ সম্পূর্ণ কার্যকরী থাকিলে মস্তিষ্কচালনার সুবিধা হওয়া বিচিত্র নহে উঁহারা আরও বলেন যে, দিনের পর দিন স্বভাবত অকৃত্রিম বিলাসিতাশূন্য জীবনযাপন করিয়া তাঁহারা সুখ ও শান্তি উপভোগ করিতে পারেন, এবং আদি মানুষের স্বর্ণযুগে প্রত্যাবর্তন করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট পন্থা।

মানুষের ভিতরকার কৃত্রিম লজ্জার প্রাচীর ভাঙিয়া মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে নগ্নবাদীরা জার্মানী ও আমেরিকায় সর্বপ্রথম প্রচার আরম্ভ করেন। কিন্তু সরকারী আইন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বাধাদান করায় তাঁহারা অগত্যা জনপদ হইতে দূরে অরণ্যাদির মধ্যস্থলে অথবা অপ্রকাশ্য স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ সেখানেই নগ্নতাচর্চা করিতেছেন।

নগ্নবাদীদের যুক্তি প্রথম দৃষ্টিতে খুব অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। মানুষ তাহার কতিপয় প্রত্যঙ্গ ঢাকিয়া রাখে কেন? অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে অনুরূপ কোনও লজ্জানুভূতি দৃষ্টিগোচর হয় না। মনোবিজ্ঞানবিদ্ ওয়াণ্ডের অভিমত এই যে, মানুষের মধ্যে সৃষ্টির আদিকাল হইতে যৌনলজ্জা বিদ্যমান ছিল। এ কথা কিছুতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ, যৌনলজ্জা যদি মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তি হইত, তবে সভ্য-অসভ্য-নির্বিশেষে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে এই লজ্জার ভাব দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। সভ্যজাতিসমূহ যে সমস্ত অঙ্গকে যৌন-অঙ্গ মনে করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করে, সমস্ত জাতি ও সমস্ত দেশের মানুষ ঐ সমস্ত অঙ্গকে লজ্জাস্থান ত মনে করেই না, কোনও কোনও জাতির আচার-ব্যবহার ঠিক বিপরীত। কোনও কোনও স্থানের মানুষ তাহাদের জননেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য সমস্ত অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে কিন্তু জননেন্দ্রিয় আবৃত করাকে তাহারা বিশেষ লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করে। থাসা নামক নিগ্রো জাতির সম্প্রদায়বিশেষ জননেন্দ্রিয় আবৃত করাকে বিশেষ অসভ্যতা বলিয়া মনে করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অসভ্য জাতির নারীরা কোমরবন্ধ পরিয়া থাকে তাহাদের যৌনপ্রদেশকে সুন্দর ও প্রিয়দর্শন করিবার জন্য—উহাকে আবৃত করিবার জন্য নহে। যে সমস্ত জাতির নারীপুরুষ সকলে উলঙ্গ থাকে তাহাদের পক্ষে নগ্নতাই স্বাভাবিক। তাহাদের মধ্যে পরস্পরের জননেন্দ্রিয় দর্শনে লজ্জা বা কামভাবের উদ্রেক হয় না। আমাদের সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে যেমন শারীরিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য টুপী, হ্যাট, জুতা, মোজা, নেকটাই

পরিবার, মুখে পাউডার, পায়ে আলতা অথবা ঠোঁটে রং লাগাইবার, কর্ণে ও গলায় অলঙ্কার পরিবার প্রথা আছে, ঐ সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যে তেমনই নানাপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া ও রং লাগাইয়া যৌন-প্রদেশকে প্রিয়দর্শন করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

আমরা কোনও মহিলাকে সুসজ্জিত দেখিলে তাহার রূপের ও সজ্জার প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু তাহাতেই আমাদের কামোদ্রেক হয় এ কথা যেমন বলা যায় না, তেমনি অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে চিত্রিত যৌনপ্রদেশসমূহ দর্শনে রূপের সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু তদ্দর্শনে কামোদ্রেকের কথা দর্শকের মনেও উদিত হয় না। নগ্নতা তাহাদের পক্ষে এমনই স্বাভাবিক সাধারণ ব্যাপার। এই জন্যই একজন প্রকৃতিবাদী পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ **নগ্নতা** অপেক্ষা সামান্য **আবৃত অঙ্গই** আমাদের **যৌনক্ষুধা অধিক** জাগ্রত করিয়া থাকে। চীন, জাপান ও ইউরোপের নানা দেশে একাধিক পুরুষ স্নানাগার, পুষ্করিণী, নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে বিবস্ত্র হইয়া সহজভাবে স্নান করে। এই প্রথায় অভ্যস্ত থাকায় তাহাদের সেজন্য লজ্জা, সঙ্কোচ বিশেষ কৌতূহল বা কুৎসিত ইয়ার্কির ইচ্ছা বা কামোদ্রেক হয় না।

ডাঃ স্নো বলিয়াছেন—"আমাদের সমাজে পাতলা কাপড়ে সজ্জিতা নারীদের সংসর্গে পুরুষের মনে যতটা বাসনা জাগ্রত হয়, অসভ্য জাতির নগ্ন নারীদের সংসর্গে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না।"

মিঃ রীড আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন—"নগ্নতা আমাদের কামনা যতটা নিবৃত্ত রাখে, সাজসজ্জা ততটা রাখিতে পারে না।"

এ সব কথা সত্য কেবল সেই জাতির জন্য, যাহারা স্বভাবতই উলঙ্গ থাকে। কারণ, অভিনবত্বেই লালসার উদ্রেক হইয়া থাকে—অন্য কিছুতেই নহে। প্রকৃতিবাদী পণ্ডিত ডাঃ ওয়ালেস এক পার্বত্য-নারীর কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"আমি একদা এক সুন্দরীকে পোষাক পরিধানে অভ্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমাদের মহিলাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া জনতাপূর্ণ রাস্তায় বাহির হইতে যতটা লজ্জাবোধ করা সম্ভব বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে, ঐ রমণী আমার দেওয়া পোষাক পরিয়া রাস্তায় বাহির হইতে তদপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও কম লজ্জিত হয় নাই।"

ক্যাপ্টেন কুক্ তাহিতীতে (Tahiti) প্রকাশ্য স্থানে বহু লোকের সম্মুখে একটি যুবক ও বালিকাকে রতিক্রিয়া করিতে দেখেন। ইহাতে সুরতকদ্বয়ের ত

কোন লজ্জার ভাব ছিলই না, উপরন্তু দর্শকের মধ্যে সম্ভ্রান্ত 'মহিলারা পর্যন্ত বালিকাটিকে উপদেশ দিতেছেন। ঐ স্থানে নাকি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রকাশ্যে চরিতার্থ করা হয়, নর ও নারী খোলাখুলিভাবে সমস্তই আলোচনা করে। আবার চীনদেশীয় রমণীদের মধ্যে সৌন্দর্যের আকরই হইয়াছে তাঁহাদের পদযুগল। অবিকৃত পা তাঁহাদের কাছে অভিশাপ বিশেষ। কেবল স্বামীই স্ত্রীর নগ্ন পা দেখিবার অধিকারী। তাঁহারা ডাক্তারকে পা দেখাইতে হইলে লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়েন। পা খাটো করিবার জন্য পায়ে খুব শক্ত জুতা পরাইয়া রাখা হয়।

নগ্ন অবস্থায় প্রকাশ্যে স্নান করার অভ্যাস পাশ্চাত্য দেশে এবং চীনে ও জাপানে অনেক জায়গায়ই বিশেষত স্নানাগারসমূহে প্রচলিত আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় এদেশে ইংরেজ সৈনিকদিগকে অহরহ নগ্ন অবস্থায় প্রকাশ্য স্থানে স্নান করিতে দেখা গিয়াছে। লজ্জা যত সব দর্শকের, সৈনিকেরা দল বাঁধিয়াই স্নান করিত। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে পর্যন্ত জাপানে নরনারী একত্রে স্নানাগারে স্নান করিত। পাঞ্জাবে অদ্যাবধি স্ত্রীলোকে পুষ্করিণী ও নদীর তীরে সমস্ত বস্ত্র রাখিয়া স্নান করে, পুরুষে দেখিলেও গ্রাহ্য করে না।

সুতরাং লজ্জা বলিয়া আমাদের সভ্যসমাজে যাহা প্রচলিত আছে, তাহা যে **একটা প্রথামাত্র**, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ লজ্জা যদি মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি হইত, তবে সভ্যজাতিসমূহের মধ্যেও লজ্জাস্থানের সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আরব, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ রমণী মুখ ঢাকিয়া চলাকে ভদ্রতা মনে করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে আবার রমণীরা প্রয়োজনবশে মুখ উন্মুক্ত কবিতে পারেন, কিন্তু গ্রীবাদেশ প্রাণ গেলেও উন্মুক্ত করিবেন না, পক্ষান্তরে বর্তমান ইউরোপের মহিলারা সমস্ত পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত রাখেন এবং স্তনের প্রায় অর্ধেক গলদেশের সামিল করিয়া উহাকে উন্মুক্ত রাখিতে লজ্জা বোধ করেন না। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, লজ্জাস্থান প্রধানতঃ প্রথাগত ব্যাপার এবং যৌনলজ্জাও কাজেই একটা **অভ্যাসজাত বৃত্তি**। যৌন-অঙ্গকে আমরা যতই আবৃত করিতেছি, উহার প্রতি আকর্ষণ আমাদের ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আদি মানুষের বন্যজীবন কতটা সহজ ও সুন্দর ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মোটের উপর, বেশভূষা ও কৃত্রিম সাজসজ্জার তারতম্য এবং

শ্রেষ্ঠতা বোধ না থাকায়, ঐরূপ সমাজে হিংসা বা লোভ কমিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। সুখ ও শান্তির কোনও সুনির্দিষ্ট পরিমাপ করা সম্ভব নহে; নিজ নিজ অবস্থায় সন্তোষ ও অনাবশ্যক অভাব-অভিযোগ হইতে মুক্তিই উহার উপায়।

মানুষের গঠন ও শারীরিক পরিবর্তন সব সময়ে উপভোগ্য নহে। ইহার উপর আবার বিকৃতি, সাময়িক অসুস্থতা, অঙ্গবিশেষের বৈকল্য অন্যের ঘৃণা উদ্রিক্ত করিতে পারে, নিজেদের মনেও কুণ্ঠার ভাব আনিয়া দিতে পারে। অবশ্য সবল, সুস্থ ও সুগঠিত শরীর সৌন্দর্যের নিদর্শন, কিন্তু যাঁহারা অতটা ঐশ্বর্যের অধিকারী নন, তাঁহারা কুশ্রী শরীর প্রদর্শন করিয়া খুব আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন ইহা মনে হয় না।

আমাদের মনে হয়, মানুষের লজ্জার পরিমাণ ক্রমশ কমিয়াই আসিতেছে কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, পাঠ্যবস্তু, দৃশ্যকলা ইত্যাদিতে ক্রমেই অনাবশ্যক কুণ্ঠা ও অহেতুক অবরোধ লাঘব হইয়া আসিতেছে।

তাই এই নগ্নবাদীদের মতবাদে ধৈর্য হারাইবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা অন্যের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া নিজেদের মধ্যে তাঁহাদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ রাখিলে অপরের বলিবার বিশেষ কিছু নাই। তাঁহারা বলেন যে, বিবস্ত্রা নারী দেখিয়া পুরুষদের কামভাব ও পুরুষ সম্মুখে নগ্ন অবস্থায় বিচরণ করিতে স্ত্রীলোকদের লজ্জা এবং পুরুষদের যৌনাঙ্গ দেখিয়া তাহাদের কৌতূহল, কৌতুক বা ঘৃণাবোধ নূতন সদস্যদের প্রথম দিনই থাকে। সকলকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া দেখিয়া পরের দিন হইতে উক্ত সমস্ত ভাবের উদয় আর হয় না।

(১৫)

যৌনবোধ বিকাশের ধারা

যৌনবোধের ক্রমবিকাশের যে ধারা ও গতিপথ বর্ণনা করিলাম তাহার সহিত পাঠক-পাঠিকা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, **অনেকক্ষেত্রে তাঁহাদের জীবনে এমনিতরই ঘটিয়াছে।** ইহাতে অস্বাভাবিক বা অনুশোচনার কিছু না থাকিবারই কথা।

নরনারীর স্বীয় জীবন-সম্বন্ধে বিবৃতি

আমাদের অনেক পাঠক-পাঠিকা তাঁহাদের প্রাথমিক যৌনজীবনের যে ইতিহাস লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার সহিত অন্যান্য দেশের যুবক-যুবতীর বৃত্তান্ত মিলাইয়া দেখা গিয়াছে যে, এই **সার্বজনীন ও তীব্র যৌনবৃত্তির বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় একই ধারায় হয়।**

১। একজন পাঠক (ল' কলেজের ছাত্র) লিখিয়াছেন:

"নিম্নে আমার যৌনজীবনের আনুপূর্বিক বিবরণ অকপটে লিখিতেছি। কোন কিছু গোপন করিব না বা অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিব না। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে যৌনবাসনা এবং যৌন সম্ভোগেচ্ছা প্রবল-ভাবে দেখা দেয়। ইহার origin (সূত্রপাত) কোথা ও কিরূপভাবে হয় তাহা আমার এক্ষণে ঠিক মনে নাই। তবে যাহা মনে আছে, একে একে লিখিতেছি।

"(ক) আমি **অনেক বয়স পর্যন্ত পিতামাতার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতাম** এবং মাঝে মাঝে **তাঁহাদের সঙ্গম করিতে দেখিতাম** এবং ঐ বিষয়ে কথাবার্তা শুনিতাম। ঠিক অনুরূপ কার্যগুলিই আমি সমবয়স্ক ও সমবয়স্কাদিগের উপর খেলাচ্ছলে experiment (পরীক্ষা) করিয়া দেখিতাম। উহাতে বেশ আনন্দ পাইতাম।

"(খ) আমাদের বাড়ীতে আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকিতেন। তাঁহার naked picture-এর (নগ্ন ছবি) অনেকগুলি album (সংগ্রহ) ছিল। সেগুলি আমাদের বাড়ীর এক চাকর আমাকে দেখাইয়া দেয়। আমি প্রত্যহ লুকাইয়া লুকাইয়া সেগুলি দেখিতাম এবং মাঝে মাঝে সেই picture-এর (ছবির) উপরই পুরুষাঙ্গ ঘর্ষণ করিতাম এবং টিপিয়া ধরিতাম। ঐ অবস্থায়

মাঝে মাঝে লালার ন্যায় একরূপ তরল secretion (স্রাব) হইত এবং সমস্ত শরীর পুলকিত হইয়া উঠিত। বড়ই আনন্দ লাগিত; সেইজন্য প্রায়ই ঐরূপ করিতাম। তখন আমার বয়স ৮-৯ বৎসর মাত্র। অতি অল্প বয়স হইতেই আমি খারাপ environment-এ (পরিবেশে) মানুষ হইয়াছি, কারণ মা-বাবা বিশেষ নজর রাখিতেন না। আমি ছোটলোকদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করিতাম। কাজেই কতকটা তাদের কাছে, কতকটা বাড়ীর চাকরদের কাছে এইরূপ ভাবে শিখিয়াছি।"

পরবর্তী ইতিহাস উদ্ধৃত করিবার মত নহে। তাহার সারমর্ম এই যে, ১৪ বৎসর বয়সে তাঁহার হস্তমৈথুনে বীর্যপাত হয় এবং তাহার পূর্বে তিনি সমবয়স্ক ও সমবয়স্কাদের সহিত নানাবিধ যৌনক্রিয়া করিতেন। তিনি বীর্যপাত করিবার নানাপ্রকার পন্থাও আবিষ্কার করেন। হস্তমৈথুনের অভ্যাস তাঁহাকে এত পাইয়া বসিয়াছে যে, তিনি কি করিবেন বুঝিতে পারেন না। অনুশোচনা এবং দুর্ভাবনায় মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন।

২। অপর একজনের বৃত্তান্তে জানা যায়, তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। পড়িবার জন্য ছাত্রেরা তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিত। ইহারা সকলেই যুবক ছিল। তাঁহাকে ইহারা শিক্ষকের ছেলে বলিয়া আদর, স্নেহ ও সম্মান করিত। ইহারা তাঁহাকে অতি অল্প বয়স হইতেই যৌনশিক্ষা দিত এবং সমমৈথুনে প্রবৃত্ত করিত। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবে অহরহ যৌনলালসার তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকিলেও তাঁহার **শারীরিক ও মানসিক কোন ক্ষতি হয় নাই** এবং বিবাহের পর হইতেই ঐ সকল অভ্যাস সম্পূর্ণ শোধরাইয়া গিয়াছে।

৩। আরও একজনের বিবরণে জানা যায়, তিনি সুন্দর ও সুশ্রী থাকায় ছেলেবেলা হইতেই বহু যুবক-বন্ধু তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য অহরহ চেষ্টা করে। আলাপ-সম্ভাষণ হইতে চুম্বন, আলিঙ্গন এবং উহা হইতেই সমমৈথুন প্রবৃত্তি আসে। তাঁহার **বিবাহিত জীবনে এইসকল প্রাথমিক সাময়িক ক্রীড়া কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই** এবং **তাঁহার শারীরিক বা মানসিক কোন ক্ষতি হয় নাই।**

৪। একাদশ অধ্যায়ের যে বালকটির (সুকুমার) উক্তি হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিয়াছি সে লিখিয়াছে: "(পূর্বোদ্ধৃত অংশের পর) ইহার প্রায় তিন বৎসর পর হইতে (অর্থাৎ তাহার ১৪ বৎসর বয়সে) স্ত্রীলোকের স্তন সম্বন্ধে অত্যন্ত interested (কৌতূহলী) হইয়া উঠি এবং যুবতী স্ত্রীলোক দেখিলেই

তাহার স্তনের দিকে লক্ষ্য পড়িত। ১৪ বৎসর বয়সের সময় আত্মরতিতে আমার অল্প অল্প বীর্য নির্গত হইত (হস্তমৈথুনে)। ইহার প্রায় ৪-৫ মাস পরে আমি সমবয়স্কদের নিকট হইতে জানিতে পারি যে, বীর্য অত্যন্ত সাধনার জিনিস ইহা ক্ষয় করা আদৌ উচিত নয়।

"আমার সমবয়স্করাও হস্তমৈথুনে লিপ্ত তাহা জানিতাম না। মনে করিতাম যে, একমাত্র আমিই এই কার্য করি। সেই জন্য মনে করিতাম ইহা অত্যন্ত বদ্ অভ্যাস, কারণ বীর্য নষ্ট হয়। সেই কারণে মনে অনুশোচনাও হইতে থাকে। তখন সপ্তাহে ২-৩ বার এইরূপ করিতাম। দুঃখের বিষয়, যখন আমার বয়স ১৫ বৎসর তখন বুঝিতে পারি যে, প্রত্যেকেই উহাতে অভ্যস্ত। কিন্তু তাহা সত্বেও আমার দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছে বীর্য নষ্ট হওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ; সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া (এখন লিখিতে লজ্জা করে) আত্মরতির পর বীর্য কোন পাত্র বা কাগজে ধারণ করি এবং তাহা নিজেই খাইয়া ফেলি। (এই কদভ্যাসের জন্য ছেলেটির ভুল ধারণা দায়ী। বীর্য বাহির হইয়া গেলে কোন ক্ষতি হয় না, তাহা পান করিলেও কোন উপকার হয় না। আমাদের দেশে কতিপয় অশিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার নামে শুধু শুক্র নয় মলমূত্র ইত্যাদিও গ্রহণ করে।)

"এখন আমি প্রায় দুই দিন অন্তর হস্তমৈথুন করি। এখন আমার **শারীরিক বা মানসিক কোন অস্বাচ্ছন্দ্য নাই।** কিন্তু বুঝিতে পারি না, এই 'ভক্ষণ-ক্রিয়াতে' আমার শারীরিক কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে কিনা। ইহাতে ফল কি হইতে পারে ? প্রায় ছয় মাস এইরূপ করিতেছি।" (সমস্ত বুঝাইয়া লেখায় ছেলেটি এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছে।)

ইহার পরের অংশ উদ্ধৃত করিবার উপযুক্ত নহে। তবে তিনটি মামাত ভগ্নীর পীড়াপীড়িতে সে উহাদের কথা না মানিয়া পারে না এবং এজন্য খুব বিব্রত এরূপ লিখিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে জ্যাঠাত, খুড়াত, মামাত ভ্রাতা-ভগিনীদের, ভগ্নীপতি ও শালীদের, নানা সম্পর্কীয় বৌদিদি ও ঠাকুরপোদের মিলিতে মিশিতে দেওয়ার কথা উঠে। **উভয় পক্ষের গুরুজনের মনে রাখা উচিত** যে, যৌবনসুলভ বাসনায় ঠাট্টা এবং হাসি-তামাশা সম্পর্কের সুযোগে ইহারা অনেকক্ষেত্রে **সীমা ছাড়াইয়া** যাইতে পারে।

আমরা দশম একাদশ অধ্যায়ে যৌনজ্ঞানের সূচনা কি ভাবে হয় দেখাইতে

গিয়া যে আলোচনা করিয়াছি তাহার সমর্থনও পাঠক-পাঠিকার উল্লিখিত বহু দৃষ্টান্তে পাওয়া গিয়াছে।

হ্যাভলক এলিস্ তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থে (Studies in the Psychology of Sex) বহু সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত নর ও নারীর, এবং আমেরিকার স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ, ৫০ বৎসর যাবৎ ঐ সবের চিকিৎসাকারী ডাঃ ডিকিন্‌সন (B. L. Dikinson) তাঁহার Thousand Marriages পুস্তকে তাঁহার রোগিণীদের মধ্যে এক হাজারের উপর বিবাহিতাদের, এবং The single Woman পুস্তকে শতশত কুমারীদের স্বীকারোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল উক্তিতে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যৌনবোধের ক্রমবিকাশের ধারা ত সকলেরই জানা আছে, তাহা লইয়া আর ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া লাভ কি? এলিস্ বলেন, মানুষে মানুষে যতটা একই রকম যৌন-অভিজ্ঞতা ঘটে, ততটা আবার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। **স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকের মধ্যে সীমারেখা টানিতে হইলে বহুসংখ্যক লোকের অভিজ্ঞতা বিচার না করিয়া উপায় নাই।** পক্ষান্তরে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা জানা থাকিলে কি করিয়া যৌন-স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে তাহা শেখা বা শেখানো সম্ভবপর হইবে।

হ্যাভলক্ এলিসের উল্লিখিত **কয়েকটি ক্ষেত্রে যৌনবৃত্তির প্রাথমিক বিকাশ** হইয়াছিল এই ভাবে—

৫। —ই-টি—ইনি সচরাচরই নিজের ছোট ভগ্নীকে স্নান করাইতে দেখিতেন। তাই **ছেলে ও মেয়ের বিভিন্ন যৌন-অঙ্গ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম কৌতূহল** জাগে তাঁহার প্রায় **নয় বৎসর** বয়সে। তখনই তিনি তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, **শিশুরা জন্মায় কেমন করিয়া?** পিতা তাঁহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করেন। ইহার পরে আরও প্রশ্ন করায় পিতা তাঁহাকে মারিবেন বলিয়া ভয় দেখান। তাঁহার মাতা বলেন যে, ডাক্তারেরা শিশুদের লইয়া আসেন। তিনি ইহা এতদূর বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার মাতার পরবর্তী সন্তান হইবার সময়ে ডাক্তারের গতিবিধি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করেন। ডাক্তার বগলে করিয়া কোন বাণ্ডিল লইয়া আসেন কিনা তাহাও লক্ষ্য করেন। নিরাশ হইয়া ষোল বৎসরের একটি চাকরাণীর নিকট তিনি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। এই মেয়েটি তাঁহাকে দেখাইবে বলে এবং পরে একদিন

যৌনমিলনে প্রবৃত্ত করে। তিনি এই বয়সে (৯ বৎসরে) এই কাজে যারপর নাই ঘৃণা বোধ করেন।

ইহার পর হইতেই তিনি যৌনবিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন এবং পশুপক্ষীর যৌনসম্মিলন লক্ষ্য করেন। ১০ বৎসর বয়সে তিনি ২৫ বৎসর বয়স্কা একটি যুবতীর গলার স্বর শুনিয়া তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন। ইহার পর যৌন-সম্মিলনের কথায় তাঁহার আর ততটা ঘৃণা বোধ হইত না।

বোর্ডিং স্কুলে ছেলেদের নিকট হইতে অশ্লীল চর্চা শুনিয়া তাঁহার যৌন-কৌতূহল আরও উদ্রিক্ত হইত। ভালবাসার গল্প পড়িয়া তিনি মেয়েদের কথা খুব ভাবিতেন। যৌনকার্য মহাপাপ, বাইবেলে এই কথা পড়িয়া এবং মাতার উপদেশমত তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে কুচিন্তা না করিয়া ভাল চিন্তাই করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল।

বার বৎসর বয়সে প্রথমে ১২ বৎসরের একটি মেয়ের দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। এই ভালবাসা বা আকর্ষণে বেশীর ভাগ সাহচর্য, আলাপ, সম্ভাষণ ইত্যাদির ইচ্ছাই বলবতী থাকিত। ইহার পরে ১৫ বৎসর বয়সে ঐ বয়সের একটি মেয়ের সহিত আলাপ হয় এবং উহাও সাময়িক প্রেম ও মিলনে পর্যবসিত হয়। কিছুকাল পরেই আলাপের অবসান হয়। ১২ বৎসর বয়সে তিনি ১৩ বৎসর বয়স্ক একটি মেয়ের চেহারায় বিমুগ্ধ হন এবং বহুদিন উহা তাঁহার স্মৃতি-পটে অঙ্কিত থাকে। পাঁচ বৎসর পরে ঐ মেয়ের সহিত আবার দেখা হয় এবং পরস্পর পরস্পরে আকৃষ্ট হন। বিবাহের প্রস্তাব করিলে অল্প বয়সের অজুহাতে মেয়েটি প্রত্যাখ্যান করে। ইহাতে তাঁহার খুব দুঃখ হয়। কিন্তু ইহার ৮ বৎসর পরে উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তৃপ্তিকর দাম্পত্যজীবন যাপন করেন।

তাঁহার মতে তাঁহার যৌন-চেতনা সকাল সকাল জাগ্রত হইবার মূলে রহিয়াছে ঐ **চাকরাণীর প্ররোচনা**। তবে তিনি মনে করেন যে, তাঁহার বাসনা গোড়া হইতেই যেরূপ প্রবল ছিল, তাহাতে কোনও-না-কোনও উপায়ে উহা চরিতার্থ না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। তিনি হস্তমৈথুন করিয়াছেন কিনা তাহা কিছু বলেন নাই। তাঁহার মতে, **কৈশোর হইতে যৌনবাসনা তৃপ্তি করিবার সুযোগ থাকিলে উহা বক্র, কুটিল এবং ক্ষতিকর পথ ধরিবে না।**

৬। একটি **বিবাহিতা রমণী** এলিসের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ : "আমার মাতা সুন্দরী ও তেজস্বিনী ছিলেন।

তিনি আমাদিগকে সুষ্ঠু ও নিষ্পাপ করিয়া গড়িয়া তুলিবেন বলিয়া সর্বদা ভাল কাজে ও ভাল চিন্তায় নিয়োজিত রাখিতেন। খারাপ কোন বই বা গল্প পড়িতে দেখিলে তিনি বারণ করিতেন এবং ভালবাসা বা বিবাহের কথায় কখনও আমল দিতেন না। তাই যৌনবিষয়ে আমি এত অজ্ঞ ছিলাম যে, ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করিতাম, পুরুষ ওষ্ঠে চুম্বন করিলেই মেয়েদের সন্তান হয়।

"নয় বৎসর বয়সেই আমার নানা বিষয়ে জানিবার কৌতূহল জাগে। বিজ্ঞানের গ্রন্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম, কিন্তু বুঝিতে না পারিয়া খুব দুঃখিত হইতাম। অন্যান্য ভগ্নীদের সঙ্গে বাস করিতে হওয়ায় নানা বিষয়ে আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়াঝাঁটি হইত। ১০ বৎসর বয়সের সময়ে একবার ঐ বয়সের একটি মেয়ে আমাদের বাটীতে বেড়াইতে আসে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কখনও নিজে নিজে উপভোগ করিয়াছি কিনা। এ কথায় তাহার উপর আমার খুব ঘৃণা হয়। ইহাতে আমি কোন উত্তেজনা বোধ করি না। তবে ছোটবেলা হইতেই লক্ষ্য করিতাম, কখনও কখনও উত্তেজনা হইত। বিছানায় পড়িয়া কামচিন্তা করিলে সাধারণতঃ প্রস্রাবের বেগ হইত এবং প্রস্রাব করিলে উত্তেজনা প্রশমিত হইত।

"ছেলেবেলা হইতেই আমার মনে ধর্মের ভাব প্রবল ছিল। তখন আমি ভগবানকেই স্বামীর আসন দিব মনে করিতাম।

"সতেরো বৎসর বয়সে আমি একটি বোর্ডিং-স্কুলে যাই। এখানে ১৭ হইতে ১৯ বৎসরের ৭০টি মেয়ে ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন অশ্লীল আলোচনা হইতে শুনি নাই। আমার মনে হয়, আমরা নানারকম ব্যায়াম ও খেলাধূলায় নিয়োজিত থাকায় অন্য চিন্তা মনে উদিত হইত না।

"আমি অন্য সকল মেয়ের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব করি নাই, কিন্তু ওখানকার ফরাসী শিক্ষয়িত্রীর দিকে খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর ছিল এবং তিনি খুব শাসন করিতেন। পক্ষপাতিত্ব দেখানো হইবে এই ভয়ে তিনি বরং আমাকে অন্যদের অপেক্ষা বেশী শাসন করিতেন।

"স্কুল ছাড়িবার পূর্বেই আমার যৌনবোধের বিকাশ হইল, কিন্তু নানারূপ কলাবিদ্যা আয়ত্ত করিবার প্রয়াসেই তাহা পর্যবসিত হইল। আমার এক ভগ্নীসহ আমি ভ্রমণ ও কলাশিক্ষার জন্য ইটালীতে গমন করিলাম। আমার মনে হয় যে, কলাচর্চার দিকে অসংখ্য মেয়ের যে প্রবল

ঝোঁক দেখা যায় তাহা তাহাদের **যৌনবাসনা তৃপ্তিরই নামান্তর মাত্র।***

"এই সময়ে ইটালীতে ৪৫ বৎসরের একজন পুরুষকে আমার ভাল লাগে। তিনি আমাকে পছন্দ করিতেন এবং আমিও মনে করিতাম, আমি আর এখন বালিকা নই, পুরুষের ভালবাসা পাইবার অধিকারিণী হইয়াছি।

প্রথমতঃ **ভাল লাগা,** দ্বিতীয়তঃ **সুখবোধ ও তজ্জনিত যৌনাঙ্গে রসসঞ্চার** এবং তৃতীয়তঃ **সম্পূর্ণ পুলকানুভবের দরুন তৃপ্তি**—এই তিন স্তর লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম স্তর সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত ও নির্লিপ্তভাবের—ছোট বেলায় ভগবান বা আমার শিক্ষয়িত্রীর প্রতি যেরূপ ভাবের উদয় হইত, দ্বিতীয় স্তরের উদয় হইতে কিছুকাল পরে—সাধারণতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের অথবা কোন গল্পের নায়কের চিন্তায়। তৃতীয় স্তর উদিত হইত—কোন বিশেষ ভালবাসার পাত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া, উহার স্পর্শের দরকার হইত।

"ইটালীতে অবস্থান কালে একটি পাত্রের সহিত আমি প্রণয়াবদ্ধ হই। বিবাহের নানাবিধ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু পরস্পরের দেখাশুনার সুযোগ হয়। প্রথমে আমাদের একত্র আহার-বিহার অহরহ হয়। দেখা-সাক্ষাতের পর হইতেই আমার প্রবল উত্তেজনা হইতে থাকে। তিন মাস পর্যন্ত এইরূপ দেখা-সাক্ষাতে আমার এক রকম অশান্তি, তলপেটে বেদনা ইত্যাদি হয়। প্রায় নয় মাস পরে বিচ্ছেদ হয় এবং আমার রীতিমত অসুখ হয়। ইহার পরেই বিবাহ-প্রস্তাব ভাঙিয়া যায়।

"ইহার পরেই অন্য এক পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্তা হয় এবং বিবাহ হইয়া যায়। আমার মনে হয় **পুরুষের সঙ্গলাভে যে বিষম উত্তেজনা হয়, তাহার স্বাভাবিক চরিতার্থতার অভাবের দরুনই নারীর শরীর ও মনে ভীষণ বৈকল্য উপস্থিত হয়।**"

৭। এলিসের নিকট একজন **পুরুষ** যে উক্তি করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ: "প্রায় ৫ বৎসর বয়সের সময়ে মনে পড়ে, একদিন অপর একটি ছেলের প্ররোচনায় একটি বালিকার পা দেখিবার জন্য কোথায় যেন যাই। ৬-৭ বৎসরের সময়ে নার্সের সঙ্গে শুইয়া তাহার খোলা বাহু দেখিয়া

***কোনও কোনও নারীর যে ধর্মানুষ্ঠানের অতিরিক্ত ঝোঁক বা বাতিক এবং শুচিবাই দেখা যায়, তাহা অনেক ক্ষেত্রে অতৃপ্ত ও কতকটা অবদমিত কামের ভিন্ন খাতে চলার দৃষ্টান্ত।**

আকৃষ্ট হই। তখনও যৌনচিন্তা আমার মনে জাগে নাই—একথা স্পষ্ট মনে আছে।

"৯ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের উত্তর-উপকূলে অবস্থান করি। এখানে কৃষকের মেয়েদের গরু চরাইতে সাহায্য করি। এই সমস্ত মেয়েরা সাধারণতঃ যৌন-বিষয়ে আলোচনা করিত, কিন্তু আমার মনে কোন লালসাই উদিত হইত না। ইহার কিছুদিন পরে আমার একটি দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নীর প্রেমে পড়ি, কিন্তু ভাল লাগা ছাড়া আর কোনও ভাবের উদয় হয় না।

"১৩ বৎসর বয়সে প্রথম স্বপ্নদোষ হয়। ইহার পরে হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত হই। প্রথমত স্বপ্নের সুখানুভূতি জাগ্রতবস্থায় লাভ করিতে পারি কিনা, এই কৌতূহলবশেই উহা করি। ইহার পরে ঘন ঘন স্বপ্নদোষও হইতে থাকে।"

এবার **এদেশের কয়েকটি বিবৃতিকারীর উদাহরণ দিতেছি।** এরূপ অসংখ্য বিবৃতি পাওয়া যাইতেছে।

৮। বিবৃতিকারীর বয়স ৩২ বৎসর, পেশা স্কুল মাষ্টারী। লিখিয়াছেন :

"যৌনবিষয়ে কৈশোরে আমার কৌতূহল জাগে। সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলার মধ্যে দিয়া উহা জাগ্রত হয়। সমবয়সীদের সাথে রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়াই প্রশস্ত ছিল।

"সাধারণতঃ 'ষণ্ডা' নামধারী কামুকগণের গল্প শুনিয়া বা কোকশাস্ত্র, লজ্জতন্নেছা ইত্যাদি বই পড়িয়া যৌনবিষয়ে জ্ঞান হয়। আমি কতিপয় আত্মীয়ের সন্তান-সন্ততিকে তাহাদের সমবয়সী বিপরীতলিঙ্গের কাছে বলিতে শুনিয়াছি—'গত রাত্রে মার সঙ্গে বাবা কি যেন করেছেন—আয় আমরাও ঐরূপ করি।' **(বয়স্ক ছেলেমেয়েকে পিতামাতার বিছানায় বা কাছে রাখার কুফল।)**

"পিতামাতা বা আত্মীয়জনের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার কোনও উপায় ছিল না। তবে সমবয়সীরা পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া দিত এবং রতি-ক্রীড়ার সুযোগ করিয়া দিত। ১৪-১৫ বৎসর বয়সে যৌনবোধ জাগিয়াছিল।

"নিতান্ত বাল্যকালে আমার যে সকল খেলার সঙ্গিনী ছিল তার মধ্যে একটি মেয়ে আমার কাছে থাকিত। সে আমাকে বুকের উপর উঠাইয়া লইয়া অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ করাইত। অপর একটি অনবরত তাহার অঙ্গে আমাকে আঙুল প্রবেশ করাইতে বলিত। আর একটি মেয়ে আমার অঙ্গ লইয়া খেলা করিত ও তাহার অঙ্গে হাত বুলাইতে প্ররোচিত করিত। কয়েকটি বিবাহিতা

ও কুমারী যুবতী প্রায়ই আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিত ও হুড়াহুড়ি করিত। তখন আমি ইহার কারণ বুঝিতাম না।

(অজ্ঞানী ছেলেকে লইয়া মেয়েদের বা মেয়েকে লইয়া ছেলেদের এইরূপ আংশিক কামক্রীড়া প্রায়ই হইয়া থাকে। পাত্র বা পাত্রী কি করা হইতেছে বুঝে না, কিন্তু যাহারা ঐরূপ করে তাহারা খানিকটা তৃপ্তি পায়।—গ্রন্থকার।)

"সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে পরে খেলাধূলা করিতাম। ইহারা আমার 'বৌ' সাজিত ও নিভৃতে আমাকে তাহাদের সহিত স্বামী-স্ত্রীর মত ব্যবহার করিতে হইত। এই খেলার সঙ্গিনীরা কৈশোরে কামক্রীড়ার পাত্রী হইত। মিলনের প্রক্রিয়া সমবয়সী বন্ধুদের নিকট শুনিয়া শিখিয়াছিলাম। এ পর্যন্ত দুইবারের বেশী স্বয়ংমৈথুন করি নাই। উহা হস্ত দ্বারা সাধিত হয়।

(ইনি অন্য প্রকার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক যৌনসংসর্গের সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়াই এদিকে ততদূর অগ্রসর হন নাই।—গ্রন্থকার।)

"স্বপ্নদোষ আরম্ভ হইবার পূর্বে আমার স্বাভাবিক যৌনবাসনা ক্ষীণ ছিল। ক্ষীণতার কারণ যৌনবোধের উন্মেষ না হওয়াই বলিয়া মনে হয়। মেয়েদের বুক এবং মুখ দেখিলেই উত্তেজনা আসিত এবং সে উত্তেজনা সাময়িকভাবে দেখা দিত। পরে আপনিই প্রশমিত হইত। উক্ত বয়সে অনুত্তেজিত অবস্থায় কুচিন্তা মনে আসিত না। ১৪-১৫ বৎসর বয়সে একটি বালিকাকে উপলক্ষ্য করিয়া ক্ষীণভাবে যৌন-আকর্ষণ অনুভব করি। উহার পরে ১০-১২ বৎসর বয়সের একটি বালকের প্রতি আকৃষ্ট হই। সে আমার কাছে শয়ন করিত এবং স্বেচ্ছায় আমার অঙ্গ ধরিয়া টানিত এবং সমমৈথুনে প্রবৃত্ত করাইত।

"বিবাহের পূর্বে অশ্লীল ছবি দেখিতে ও অশ্লীল গান শুনিতে ভালই লাগিত। বর্তমানে সে রুচি নাই।

"কৈশোরে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ভালবাসার আদান-প্রদান হয়। ইহা শেষে মিলন পর্যন্ত পৌছে। মেয়েটি আমাদের বাড়ীতে পালিতা হিসাবে আসে। একই সঙ্গে শয়ন করিতাম ও সংসারের খুঁটিনাটি কাজও এক সঙ্গে করিতাম। যখন সে ১১-১২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাহাকে মিলনে রাজী করি। তখন সে পৃথক বিছানায় থাকিত, কিন্তু নির্দেশ মত আমার কাছে আসিত।

"১৩-১৪ বৎসর বয়সে আমার **স্বপ্নদোষ** আরম্ভ হয়। তখন অস্বাভাবিক আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত খুবই হয়। বিবাহের পরে কদাচিৎ হয়। উহাতে পরিচিত ও অপরিচিত উভয় প্রকার ব্যক্তিই দেখিতাম ও

দেখি। দুইটি কারণ লক্ষ্য করিয়াছি—**যৌনবিষয়ে কুচিন্তা; অত্যন্ত গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ।** প্রায় ২৫ জনের সহিত সকর্মকভাবে সমমৈথুন ঘটিয়াছে। ইহার পরিমাণ অত্যধিক ছিল। ২৪ বৎসরে আমার বিবাহ হয়। স্ত্রীর বয়স তখন ১৩ বৎসর। বিবাহিত জীবন সুখের।

৯। বিবৃতিকারীর বয়স ২২ বৎসর। কলেজের ছাত্র—অবিবাহিত। ইনি লিখিয়াছেন: শৈশবে ও কৈশোরে পল্লীগ্রামে বহুপ্রচলিত কতকগুলি অশ্লীল গালি শুনিয়া এবং বয়স্ক বালকদের কাছে শুনিয়া যৌনবিষয়ে অস্পষ্ট জ্ঞান হয়। নরনারীতে মিলন হয় বা হইতে পারে তাহা জানা ছিল; কিন্তু বিবাহ দ্বারা যে বৈধ হইতে পাবে, তাহা জানা ছিল না। যৌনমিলন মাত্রই অবৈধ, সুতরাং সহবাস হইলে লোকচক্ষুর অগোচরে অনুষ্ঠিত হইবে, এই ছিল আমার ধারণা। আমি মনে করিতাম স্ত্রীর প্রয়োজন শুধু গৃহকার্য নিষ্পন্ন ও পুত্রকন্যা প্রতিপালন করিবার জন্য—যৌনমিলনের মত একটা জঘন্য (!) কাজ কোন অবস্থায়ও বৈধ হইতে পাবে তাহা ছিল আমার ধারণার অতীত—আমার একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কাল পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না আমার এক সাথী আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, রাত্রে স্বামীস্ত্রীতে প্রতিদিনই মিলন হয়। **পিতামাতার একদিনের ব্যবহারে** আমার মনেও এরূপ একটি ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমি আমার পিতামাতার এইরূপ ব্যবহারকে বৈধ মনে করিতে পারি নাই। তাঁহারা যদিও তাহা করেন তাহা অবৈধভাবেই করেন এইরূপ ছিল আমার ধারণা। বিবাহদ্বারা যৌনমিলন বৈধ হয়, এই কথা সাথী বুঝাইয়া দিলে পরে আমারও বিবাহ করিবার আগ্রহ জন্মে।

"তিন বৎসর বয়স হইতে ৫-৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত **ছেলেমেয়ে হওয়া সম্বন্ধে ধারণা** ছিল যে, ছেলেমেয়েরা আকাশ হইতে পড়ে বা শিশুদিগকে পার্শ্ববর্তী কোনও বাড়ী হইতে আনা হয়। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের পর বয়স্ক বালকদের কাছে শুনিয়া এবং গরু-ছাগলাদির প্রসব দেখিয়া সঠিক ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু পেটে মানুষ সৃষ্টি হইতে যে যৌনমিলনের আবশ্যক হয় তাহা বুঝি ১১-১২ বৎসর বয়সে সঙ্গীদের কাছে শুনিয়া। হাঁস-মোরগের যৌনমিলনকে ঝগড়া মনে করিতাম। গরু-ছাগলের মিলনকে উপভোগ্য তামাশাই মনে করিতাম। আর মনে করিতাম, স্ত্রীলোক বয়স্ক হইলে তাহার পেটে আপনা-আপনিই মানুষ সৃষ্টি হয়।

"যৌনবিষয়ে আমার কৌতূহল কোন্ বয়সে জাগে এবং কিরূপে তাহা মনে নাই। জ্ঞান হয় বাল্যকালে সহচরদের কাছে শুনিয়া। যৌনবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করি প্রথম ১৪ বৎসর বয়সে। এই জাতীয় প্রথম পুস্তকের নাম ভুলিয়া গিয়াছি—বোধহয়, উহা 'বেহেশ্‌তের সোপান'—প্রণেতার নাম মনে নাই। পুস্তকে অন্যান্য ধর্মীয় কথার সাথে দম্পতির রতিজীবন সম্বন্ধেও অনেক গোপনীয় কথা ছিল। সে সকল কথার অনেকগুলিই অবৈজ্ঞানিক। এই সময়ে 'যৌনবিজ্ঞানে'র প্রথম সংস্করণও হাতে পড়ে এবং তাহার অংশ বিশেষ পাঠ করি। সবটা ভাল করিয়া পড়িবার সুযোগ পাই নাই। ধাতুদৌর্বল্যের বিজ্ঞাপনাদি পড়িয়াও যৌনবিষয়ে অনেক জ্ঞান বা অপজ্ঞান হয়।

"যৌনবিষয়ে আলোচনা গোপনীয়, এই বোধ অল্প বয়স হইতেই ছিল। তাই এ বিষয়ে পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে কোনও প্রশ্ন করি নাই। তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করেন নাই। বয়স্ক সঙ্গীরা শুধু কথার সাহায্যেই আমার কৌতূহল নিবারণ করিত। তাহাদের কথাগুলির অনেকই ছিল ভ্রান্ত।

"যৌনবিষয়ে জনসমাজে বিস্তর ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। চতুর্থ সংস্করণের প্রশ্নমালা উত্তরদাতা (২২ নং প্রশ্নের উত্তরে—গ্রন্থকার) যে সকল ভ্রান্ত ধারণার তালিকা দিয়াছেন, তাহা ছাড়াও কতকগুলি অতিরিক্ত ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে, যথা :

"(ক) বার বিশেষের সহবাসে সন্তান ভাল বা মন্দ হয় অর্থাৎ শুক্র, রবি, সোম ও বৃহস্পতিবার রাত্রির সহবাসে সন্তান সদগুণান্বিত এবং অন্যান্য বার রাত্রির সহবাসে অসদ্‌গুণান্বিত হয়। (খ) সহবাসে স্ত্রী সকর্মক ভূমিকা গ্রহণ করিলে, সন্তান মেয়ে হইলে পুরুষ-প্রকৃতির হয়। (গ) শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণ-পক্ষের সহবাসজাত সন্তান যথাক্রমে ফর্সা ও কাল হয়। (ঘ) অমাবস্যার রাত্রির সহবাসজাত সন্তান অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়। (ঙ) প্রবাসযাত্রার পূর্ব রাত্রিতে সহবাস করা দূষণীয়। (চ) স্ত্রীর যৌন-অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলে দৃষ্টি-ক্ষীণতা জন্মে। (ছ) যৌন-চিন্তা করিলে মুখে ব্রণ হয়। (জ) কামনা কলুষিত যাহার মন, তাহারই স্বপ্নদোষ হয়। (ঝ) দশবার স্ত্রী-সহবাসে যত শক্তি ক্ষয় হয়, একবার স্বপ্নদোষে তত শক্তি ক্ষয় হয়।

"কোন্ বয়সে প্রথম আমার যৌনবোধ জাগে তাহা সঠিক মনে করিতে পারিতেছি না। তবে ৮ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে হইবে

কোনও সন্দেহ নাই। একদিন আমা হইতে বৎসর খানেকের ছোট এক সাথীর সঙ্গে খেলিতে খেলিতে সমমৈথুনের প্রবৃত্তি জাগে এবং সাথীকে প্রস্তাব জানাই। বলা মাত্রই সে রাজী হয়। নির্জনে পরস্পরের দেহভোগের চেষ্টা চলে। সার্থক ভোগ কোন দিন না হইলেও চেষ্টা বরাবরই চলিত। তাহাতে আনন্দ বোধ হইত। প্রথম দুই-তিন দিন করার পরে একজন অভিভাবক দেখিয়া ফেলেন ও শাস্তি দেন ; কিন্তু তাহা বন্ধ হয় না। অনেক সময়ে ৪-৫ জন ছেলে মিলিয়াও করিতাম। অন্যান্য সকলেই ছিল আমা হইতে ২-১ বৎসরের ছোট, কিন্তু প্রস্তাব করা মাত্র কাহারও বিষয়টা বুঝিতে সামান্যও দেরি হয় নাই। এরূপ কতদিন চলিয়াছিল মনে নাই। সমমৈথুনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আমার বা আমার সঙ্গীদের কাহারও ছিল না। আমার মনে প্রবৃত্তিটা জাগে অতি স্বাভাবিক-ভাবে। পল্লীগ্রামের প্রচলিত অশ্লীল গালির প্রভাব বোধ হয় থাকিয়া থাকিবে। ঐ সময়েই আমা হইতে ২-১ বৎসরের বড় দুইটি ছেলের সহিতও তাহা হইয়াছিল। দুই জনের মধ্যে একজন আমার দেহ জীবনে একবার মাত্র উপভোগ করিতে পারিয়াছিল—উপভোগ বলিতে পারি না—চেষ্টা বলিতে পারি। অন্য ছেলেটি ও আমি বিভিন্ন সময়ে মৈথুন (অসার্থক) করিতাম। ১৪ বৎসর বয়সের সময়ও এই বালকটির সহিত সংসর্গ হইত।

১০-১২ বৎসর বয়সের সময়ে একটি ৭-৮ বৎসরের মেয়ের সহিত সংসর্গ করিবার অত্যন্ত বাসনা জাগে। একদিন মেয়েটি রাজী হয়, কিন্তু ভোগ সার্থক হয় নাই—বোধ হয় অপরিণত অঙ্গের দরুন। আমার ১৪ বৎসর বয়সের সময়ে অন্য একটি ৮-১০ বৎসরের মেয়ের সহিত মিলিবার আগ্রহ হয়, কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই রাজী হয় নাই। এই সময়ে আমার বাড়ীর এক চাকর আমার দেহ উপভোগ করে। অনেক দিনই ঐরূপ করে, কারণ তাহার সহিতই রাত্রে শুইতে হইত। তাহার ব্যবহার আমার ভাল লাগিত না। তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইত। সে ছিল ২২-২৪ বৎসরের অবিবাহিত যুবক। চাকরটি আমাদের ছাগীর সহিত মৈথুন করিতে গিয়া ধরা পড়ে।

(**দাসদাসী, চাকর-চাকরাণীর সঙ্গে এক বিছানায় ছেলে-মেয়ের শুইতে দেওয়া বিপজ্জনক**—এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। —গ্রন্থকার।)

"১৩-১৪ বৎসর বয়সের সময় জলে নামিয়া প্রায়ই একটি মেয়ের অঙ্গে হাত দিতাম। সে গালি দিত। কিন্তু আমি আগে জল হইতে না উঠিলে সে উঠিত

না, আবার আমি জলে নামিলেই সেও নামিত। সে যে ঐ কার্যে পুলকানুভব করিত তাহা না বলিলেও চলে।

"আমি হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হই ১৪½ বৎসর বয়সে। সম্ভোগের অন্য কোনও উপায় পাই নাই বলিয়াই—ঐরূপ হই! প্রতিদিন রাত্রে শুইবার আগে হাতে তৈল লইয়া উহা করিতাম। কতদিন করিয়াছিলাম তাহা মনে নাই, তবে একমাস কালের বেশী নয়। প্রথম প্রথম ভালই লাগিত। কিন্তু কিছুদিন এইরূপে বীর্যপাত করিবার পরে উহার পর মূলাধারের ভিতর দিকে বেদনা অনুভব করি। সুতরাং পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। দুইবারের বেশী কোনও দিন তাহা করি নাই। ইহার পরে স্বপ্নদোষ হইতে থাকে।"

১০। বিবৃতিকারী ম্যাট্রিক পাস—লিখিবার অভ্যাস আছে। বয়স ২২ বৎসর। অবিবাহিত। ইনি লিখেন:

"শৈশবে এবং কৈশোরে যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে আমার **ধারণা** খুব অস্পষ্ট ছিল। সমবয়স্কদের নিকট হইতে এ বিষয়ে খুব পরিমিত জ্ঞান জন্মে। তখন বিষয়টিকে গোপনীয়, অসভ্য জানিতাম, তবে স্ত্রী-পুরুষের গোপন সম্বন্ধের বিষয় এবং বড়দের গোপনাঙ্গ সমূহের বিষয় জানিবার জন্য মনে মাঝে মাঝে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা জন্মিত। সন্তান জন্মের কারণ সম্বন্ধে ঐ সময় কোনও স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। তবে এটুকু তখন জানিতাম যে, বিবাহই সন্তান জন্মের কারণ।

"যৌন-বিষয়ে আমার প্রথম কৌতূহল জন্মে ১২ বৎসর বয়সে। আমার কনিষ্ঠ মাতুলকে দৈবাৎ ভাড়াটিয়াদের পরিণত বয়স্কা একটি মেয়েকে আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া চুম্বন করিতে দেখিয়া। অনুরূপ ঘটনা এই প্রথম আমার চোখে পড়ে এবং আমাকে অতি নিকটে দেখিয়া তাঁহাদের উভয়ের মনে যে একটা সলজ্জভাব জাগে তাহা অনুভব করি। এই সময় হইতে মেয়েটি (১৫-১৬) আমাকে খুব তোয়াজ করিত, পাছে কাহাকেও বলিয়া দিই। এ বিষয়ে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার মত তাহার নিকট হইতে কোনও উত্তর পাই নাই, তবে মামার এবং অন্যান্যের অজ্ঞাতে নির্জনে না চাহিতেই মাঝে মাঝে তাহার চুম্বন লাভের সুযোগ হইত।

"যৌনবিষয়ে গুরুজনবর্গের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় নাই। তাঁহারা আপনা হইতে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। সমবয়স্কদের নিকট হইতে বুঝিতাম, এটা 'অসভ্য'। গুরুজনের হাবভাবে

বুঝিতাম, ইহা গোপনীয় এবং খারাপ, জননী বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, যাহাতে সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পাল্লায় পড়িয়া কিছু না শিখিতে পারি।

"যৌনবোধ প্রথম ১৩ বৎসর বয়সে জাগে। ফলে, আমার যৌন-আচরণে প্রধানত নারীর প্রতি আকর্ষণের ভাব জাগে। ১৪ বৎসর বয়সে প্রথম নিম্নতলস্থ ভাড়াটিয়াদের একটি ১৪ বৎসর বয়স্কা মেয়ের প্রতি ভালবাসার আকর্ষণ জাগে। এই আকর্ষণ প্রতিদানসূচক। ইহা পরে প্রেমের পর্যায়ে উঠে। ১৫ বৎসর বয়সে আত্মীয়া একটি ১৩ বৎসর বয়স্কা মেয়ের প্রতি পারস্পরিক প্রেমাকর্ষণ জন্মে। মেয়েটির সহিত প্রেমপত্রের আদান-প্রদান হইত।

"১৭ বৎসর বয়সে একটি ১৯ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতার প্রতি বিনিময়ে যৌনাকর্ষণ জাগে। সে চন্দননগরে তাহার পিসিমার বাড়ী থাকিত। আমি সেখানে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। নিভৃতে প্রেমালাপাদি হইত। ১৮ বৎসর বয়সে পুরীতে 'রামচন্দ্র গোয়েঙ্কার ধর্মশালায়' থাকাকালীন মেদিনীপুর হইতে আগত একটি ১৬ বৎসর বয়স্কা মেয়ের প্রতি যৌনাকর্ষণ জন্মে। তাহার সহিত বেশ আলাপ হইত কিন্তু নিভৃতে কখনও পাই নাই।

"অতীত জীবনে অনেকেরই এইরূপ আযাচিত ভালবাসা লাভ করিয়াছি। কারণ, চিরদিনই আমি সদালাপী, উদারহৃদয়, দরদী, দৃঢ়চেতা এবং প্রতিভা-বান্। তাহা ছাড়া পূর্বে অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি খুব সুদর্শন ছিলাম।

(বিবৃতিকারী গ্রন্থকারের সহিত পরিচিত। তাঁহার কথা সত্য বলিয়া গ্রন্থকারের বিশ্বাস। **কুমারী ও বিবাহিতা মেয়েরাও সুদর্শন ও মিষ্টভাষী ছেলেদের প্রতি যৌনাকর্ষণ অনুভব করে,** এবং প্রতিদান ছাড়া প্রেমনিবেদনও করে সুযোগ পাইলে, তাহা ইহার জীবন হইতে বুঝা যায়।)

"বাল্যকালে চিমটি কাটা সুড়সুড়ি-দেওয়া, আলিঙ্গন জড়াজড়ি, হুড়াহুড়ি প্রভৃতি বালসুলভ যৌনক্রীড়া সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সহিত করিতাম।

"বাল্যে ১০ বৎসর বয়সে এক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ধনীর গৃহে দাদুর সহিত প্রায়ই যাতায়াত করিতাম। বৈকালেই সাধারণত যাইতাম। তাহাদের বাড়ীর প্রকাণ্ড ছাদে 'চোর চোর' খেলা হইত। তখন দেখিতে খুব সুন্দর ছিলাম। ঐ বাড়ীরই একটি **১৮ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা যুবতী** আমাকে খুব আদর করিত। সে খেলার সময় 'বুড়ী' হইত এবং তাহার কথামত সকলে আমাকেই বারে বারে 'চোর' করিত। ইহাতে সে খুব আনন্দিত হইত। সে

পাঁচিলের বিটের উপর বসিয়া আমার চোখ টিপিয়া ধরিত। এই সময় সে আমার বুকের উপর তাহার উন্নত বুকের চাপ দিত এবং উভয় উরুর মাঝে আমাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিত। ইহা ব্যতীত আমার গালে সজোরে টিপিয়া দিত। তাহার সঙ্গে 'লাগিলে' কাপড়ের উপর হইতে আমাকে অঙ্গ চাপিয়া ধরিয়া অঙ্গুলী দ্বারা কাটিয়া দিবার ভয় দেখাইত। রাত্রে এক একদিন তাহাদের বাড়ীতে থাকিতাম। কারণ, আমাদের নিজের বাড়ী হইতে সে বাড়ী কিছু ভিন্ন ছিল না বলিলেই চলে। রাত্রে আমার পাশে শুইয়া গল্প বলিত এবং নিষ্প্রদীপ ঘরে আমাকে বুকে জড়াইয়া শুইয়া থাকিত। অনেক দিন তাহার উন্মুক্ত বক্ষের প্রবল চাপে জাগিয়া উঠিতাম। অনেক সময়ে আমার একখানি পা তাহার উভয় উরুর মধ্যে বালিশের মত চাপিয়া শুইত। তখন অবশ্য এই সকল কার্য নিঃসন্দেহে আদর বলিয়াই ভাবিতাম।

"কৈশোরে ১২ বৎসর বয়সকালে আমাদের বাড়ীতে ভাড়াটিয়ার ১৬ বৎসর বয়স্কা একটি মেয়ের সহিত আমার মামার প্রণয় ছিল (এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি)। সে আমার নিকট ধরা পড়িয়া ঘুষ স্বরূপ চুম্বনাদি করিত তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাত্রে আমাদের ঘরে মা এবং আমি পাশাপাশি শুইতাম। মেয়েটা অনেক রাত্র পর্যন্ত মার এবং আমার মাথার নিকট বসিয়া মার নিকট হইতে গল্প শুনিত। এই সময়ে আমার হাতখানি লইয়া খেলা করিত—কোলে এবং পরে বুকে চাপিয়া ধরিত। আমার আপত্তি না পাইয়া ক্রমশ আমার হাতখানি ধরিয়া উরুতে এবং স্তনে বুলাইত। সে নীচে যাইবার পূর্বে আমি ঘুমাইয়া পড়িতাম। একদিন সে কাপড়ের ভিতর দিয়া বক্ষে এবং গোপনাঙ্গে আমার হাত বুলায়।

"সর্বপ্রথম অযাচিতভাবে এক ভদ্রলোক মাঠে বসা অবস্থায় আমাকে হস্তমৈথুন শিখান। তাহার পরে ঐ অভ্যাস কিছু কিছু হয়, এবং এখনও আছে। ১৭ বৎসর বয়সে প্রথম স্বপ্নদোষ আরম্ভ হয়। পরিমাণ সপ্তাহে গড়ে একদিন। অপরিচিতা এবং পরিচিতাদের স্বপ্ন দেখি এবং দেখিয়াছি। ১৫ বৎসর বয়সে আমার প্রথম নারীসংসর্গ হয়। ঘটনার পাত্রী আমার দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী। এক বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া ওখানে অপর একটি মেয়ের উদ্যোগে ইহার সহিত উপগত হই। তারপর আমাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। ইহার পর বহু নারী ও বিশেষ করিয়া এক প্রণয়িনীর সংসর্গ লাভ করিয়া আসিতেছি। শেষোক্ত মেয়েটির সহিত লোকাচারে বিবাহ না হইয়া থাকিলেও আমরা

বিবাহিত বলিয়াই মনে করি। বিবাহ শুদ্ধ করিয়া লইবার প্রতীক্ষায় আছি।

১১। বিবৃতিকারী চাকুরীজীবী। বয়স ৪২ বৎসর। বি এ. পাস—অতীতে মাষ্টারী করিয়াছেন, বর্তমানে কেরানী। ইনি লিখেন :

"শৈশবে ও কৈশোরে জননেন্দ্রিয়ের উত্থানে মনে একটা অব্যক্ত পুলক লাগিত এবং একটা কৌতূহলের ভাব উঠিত। যৌনকার্যে অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মনে শিকার ধরিবার প্রবৃত্তি জাগিত। কেন হইত তাহা বুঝিতাম না।

"ছেলেমেয়ে হওয়া সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। তবে গুহ্যদ্বার দিয়া ছেলেমেয়ে হয়, আবার কখনও কখনও প্রস্রাবের দ্বার দিয়া হয় বলিয়া অস্পষ্ট ধারণা করিতাম। ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার স্ত্রীরও ও সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

"বাল্যকালে সমবয়স্ক ও সমবয়স্কাদের সঙ্গে চিমটি কাটা, সুড়সুড়ি দেওয়া চুম্বন, জড়াজড়ি, হুড়াহুড়ি ইত্যাদি অনেক প্রকারের কৌতুক করিয়াছি। তাহাতে মনে একটা অব্যক্ত প্রফুল্লতার ভাব অনুভব করিতাম। আমরা অনেকগুলি ছেলেমেয়ে একত্র হইলেই ঐরূপ আমোদ-ফূর্তি করিতাম। মনের আনন্দেই তখন ঐরূপ করিতাম। অন্য কোনও কারণ উপলব্ধি করিতাম না। অনেক সময়ে আবার আমরা সকলে মিলিয়া 'চড়ুইভাতি' খেলিতাম। সেখানে কৃত্রিম রান্নাবান্নার কাজকর্ম হইত। সকলে এক পরিবারের লোকের মত খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা করিতাম। আবার অনেক সময়ে **'বৌ বৌ'** খেলিতাম। আমরা **'স্বামী স্ত্রী'** সাজিতাম। কৃত্রিম উপায়ে বিবাহ হইত ও ঘরকন্না চলিত। মেয়েরাই অগ্রণী হইয়া এই কাজ করিত ও শিখাইত। বয়স্কা মেয়েরাও আসিয়া মাঝে মাঝে উৎসাহ দিত। এইভাবে সমবয়সী মেয়েরা আবার নেকড়া দিয়া বৌ বানাইয়া অন্য বাড়ীর পুতুল ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিত। আমরা কয়েকজন কৃত্রিম পাল্কী তৈয়ার করিয়া ঐ বৌ লইয়া যাইতাম। রীতিমত শাদী হইত এবং খাওয়া-দাওয়া, হুড়াহুড়ি, হাসি-তামাশা ও আমোদ-ফূর্তি সকলই চলিত। এখনও গ্রামাঞ্চলে ঐ প্রথা বিদ্যমান আছে। তখন আমরা সকলে একত্রে গভীর রাত্র পর্যন্ত এবং কখন কখন দিনের বেলায় বালসুলভ নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতাম। যথা :—**ভেফল ভেফল*** খেলা, **লুকোচুরি, টিপমারা,* থাল মাগনী*** ইত্যাদি।

*ত্রিপুরা জেলার খেলা।

"বাল্যে ও কৈশোরে অনিচ্ছা সত্বেও আমাকে কয়েক ক্ষেত্রে কামপাত্র হইতে হইয়াছে। একদিন একটি জাহাজের সারেং (৫০ বৎসর) আমাকে ডাকিয়া নিয়া নাস্তা করায় (খাওয়ায়) ও পরে আমার সহিত যৌনক্রিয়া করে। তখনও আমার এসম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। (জাহাজের নাবিকদের মধ্যে নারীসংসর্গের অভাব হেতু সমমৈথুনের প্রচুর প্রচলন আছে।—গ্রন্থকার।)

"আর একদিন একজন উপযুক্ত মৌলবী সাহেব (৬০ বৎসর) বজরা নৌকায় মহাসমারোহে আসিয়া আমাদের বাড়ীর ঘাটে থাকেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি আমাকে ও আমার এক চাচাত ভাইকে তাঁহার বজরায় 'বিষাদসিন্ধু' বই পড়িয়া শুনাইতে ডাকিয়া লন। অনেক রাত্র হওয়ায় আমরা নৌকায় শুইয়া থাকি। রাত্রে তিনি একে একে আমাদের উভয়ের দ্বারা কাতৃপ্তি আদায় করেন। তিনি সকর্মক ও অকর্মক উভয় ভূমিকাই গ্রহণ করেন। ইহার পর আর একবার আর একটি বালককে ঐরূপ ব্যবহার করায় ধরা পড়িয়া অপদস্ত হন।

"আমাদের বাড়ীর পার্শ্বের আর একটি বালক আমার সহিত একদিন ঐরূপ ব্যবহার করে। তখন কিছুই বুঝিতাম না।

"আমার স্ত্রী বলেন যে, তিনি খুব রূপবতী হওয়ায় অনেক সময়ে তাঁহার নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা তাঁহার প্রতি আসক্তির ভাব প্রকাশ করিত। কেহ বা গোপনে প্রেমপত্র দিত, কেহ হঠাৎ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিত। একদিন তাঁহার এক দূর-সম্পর্কীয় মামা হঠাৎ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করে। ইহাতে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন না। তবে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝিতেও পারিতেন না।

"প্রথমে আমি **পিতামাতাকে সংসর্গ করিতে দেখিয়া** বিষয়টি বুঝি। পরে বাড়ীর অপর কয়েকজনকেও অলক্ষ্যে দেখি। ইহার পরই এবিষয়ে খানিকটা ধারণা জন্মে।

"কয়েকটি কিশোর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি। তাহারা কেহ কেহ **এক বিছানায় শুইয়া পিতামাতার যৌনকর্ম দেখিয়াছিল।** কেহ কেহ নূতন বর-বধূর মধুরাত্রি যাপন গোপনে লক্ষ্য করে। কেহ কেহ **গৃহ-পালিত পশুর মিলন লক্ষ্য করে। দুইটি চার বৎসরের ছেলে-মেয়েকে** যৌনক্রিয়া করিতে দেখিয়াছি; তখনও তাহাদের কথা ভাল করিয়া ফুটে নাই। (বোধ হয় পিতামাতার অনুকরণ।) একদিন দুইটি **৬-৭ বৎসরের ছেলেকে** সমমৈথুন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কোন উত্তর দেয়

নাই বরং ভয়ে একের ঘাড়ে অপরে দোষ চাপাইতে চাহিয়াছিল। নূতন বৌকে অথবা বড বোনকে যখন বিবাহের পর প্রথম বাসর-ঘরে দেওয়া হয় তখন অনেক বালক-বালিকাই গোপনে উহাদের লক্ষ্য করে। অনেকে আমার নিকট স্বীকার করিয়াছে। **কয়েকটি মেয়ে তাহাদের মায়ের কাছে** থাকাকালীন শিখে, কারণ মেয়েরা সচরাচর বয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছেই থাকে। আমার স্ত্রী তাঁহার চাচীর কাছে থাকাকালীন শিখিয়াছিলেন।

"১৪ **বৎসর বয়সে যৌনবিষয়ে কৌতূহল** জাগে। উহা **নানা কারণে** হয়, যথা :—(ক) পায়খানা ও প্রস্রাবের বেগের সহিত জননেন্দ্রিয়ের উত্থানে। (খ) তৈলমর্দনে। (গ) যৌনকেশ মুণ্ডনের প্রয়াস। (ঘ) জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত চুলকাইতে হস্ত ব্যবহারে। **এই ভাবেই হস্তমৈথুন** আরম্ভ হয়। (ঙ) স্বপ্নদোষ হওয়ায়। (চ) গাভী দোহন কালীন দুধে ভরা সটান বাঁটগুলিতে হাত বুলাইলে উত্তেজনা বোধ করি। (ছ) পশুপক্ষীর সংযোগ লক্ষ্য করায়। (জ) **নভেল নাটক পড়িয়া**। যথা—আনোয়ারা, মনোয়ারা, প্রেমের সমাধি, লায়লী-মজনু, শিরী ফরহাদ, ইউসুফ-জোলেখা, প্রেমের পথে, রামায়ণ, মহাভারত, লজ্জতন্নেছা, স্বামী-স্ত্রী, প্রেমপত্র. মহীউদ্দীন ও শোভনা, রোমিও-জুলিয়েট, আকর্ষণ, বিক্রা ইত্যাদি। (ঝ) **মাতা-পিতার মিলন দেখিয়া**। (ঞ) **বয়স্কদের মুখে যৌনবিষয়ক কথা শ্রবণ করিয়া**। (ট) বয়স্কা মেয়েদের যৌনপ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া। (ঠ) গোপনে বয়স্কদের যৌনক্রিয়া দেখিয়া। (ড) বিদেশে জায়গীরে থাকাকালীন বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মেয়েরা আমাকে সুন্দর দেখিয়া ভালবাসিয়া প্রলুব্ধ করায়। (ঢ) নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের মুন্সী মাস্টার ও জাহাজের কর্মচারীদের সমমৈথুন দর্শন করিয়া। (ণ) অশ্লীল গান বাজনা শুনিয়া ও **থিয়েটার বায়স্কোপ** দেখিয়া।

(বিবৃতিকারী বাল্যে ও কৈশোরে উত্তেজনা জাগিবার কারণগুলি বেশ ভালভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহা তাহার নিজের জীবনের কথা হইলেও অনেকের বেলায়ই এ সব কথা খাটে।—গ্রন্থকার)।

"এই পুস্তক পাঠ করার আগে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়। বন্ধু-বান্ধবদেরও একই দশা। পুস্তক পাঠ করে নাই এমন অনেক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানে না। যাহা কিছু জানে তাহাও কতকগুলি অলীক উক্তি ও বিবৃতি আহরণ করিয়া—যাহার মূলে কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য বা যুক্তি নাই। ঐগুলি

নিছক জনশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদের সংখ্যা প্রায় হাজার (!) হইবে এবং অল্পশিক্ষিত হইতে উচ্চশিক্ষিত পর্যন্ত। সহবাসের জ্ঞানকেই তাঁহারা যৌনজ্ঞান মনে করেন। অনেকে মনে করে গুহ্যদ্বার দিয়া অথবা প্রস্রাবের দ্বার দিয়া সহবাস করা হয় এবং ঐ দুইটির—একটি দিয়াই সন্তানাদি হয়। ১৪ বৎসর বয়স্কা আমার এক জ্যাঠতুতো বোন কিভাবে সহবাস করা হয় তাহা আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছিল। আমার স্ত্রীর ১৩ বৎসর বয়সে ঋতু হয়। উহা কি জিনিস তাহা কিছুই বুঝে নাই। সহপাঠিনীরা তাহাকে বুঝাইয়া দেন। আমি যখন বি. এ. পড়ি তখনও জানি নাই যে, মেয়েদের রমণ ও প্রসবপথ ছাড়া অন্য প্রস্রাবের দ্বার আছে। ১২ বৎসর বয়সের একটি মেয়ে সহবাসের অযোগ্য ও অজ্ঞ থাকায় আমার জনৈক বন্ধুকে (তাহার স্বামী) তাহার মুখ দিয়া সহবাস করিতে বলে। স্তনে মুখ লাগানোকে এখনও বহু নারীপুরুষ পাপের কাজ বলিয়া মনে করে। সতীচ্ছদ সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। কেতাবে দেখিয়াছি, মেয়েদেরও খাৎনা আছে। আমি ভাবিতাম ক্ষুদ্রোষ্ঠের মাথা কাটাকেই খাৎনা বলা হয়। ভগাঙ্কুর নামে যে এক বড় একটা দরকারী জিনিস আছে তাহা আমি কখনও জানিতাম না এবং এই প্রশ্নটি অনেক উচ্চশিক্ষিত বন্ধুবান্ধবকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাঁহারা অনেকেই উহার কথা জানেন না। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেও শতকরা ৯০ জন লোকই ইহার অস্তিত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ। ১০ মাস ১০ দিন না পুরিলে সন্তান হয় না এই বদ্ধমূল ধারণা এখনও অনেকের আছে। পুরুষের মত মেয়েদেরও যৌনকেশ জন্মিতে পারে, এই ধারণা আমাদের অনেকেরই ছিল না। এখন বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি, অনেক মেয়েই কোনও যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া উহা হাতে টানিয়া উঠাইয়া ফেলে, যন্ত্র ব্যবহার কুপ্রথা মনে করে। চিত হইয়া ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে সহবাস করাকে এখনও অনেক মেয়ে অনাচার মনে করিয়া থাকে। মোটাসোটা স্ত্রী-পুরুষের যৌনাঙ্গসমূহ মোটাসোটা হয়, এই ধারণা এখনও প্রচলিত আছে। যৌনক্রিয়ার পর স্নান করাকে অবশ্যকর্তব্য ও গোপনে সমাধ্য মনে করা হয়। সন্তান না হইলে অদৃষ্টে নাই বা খোদা ইচ্ছা করিয়া দেন নাই বলা হয়। দোষ-ত্রুটি আছে বা উহার প্রতিকার সম্ভব—বুঝাইতে গেলে অনেকে 'খোদার উপর খোদ্‌কারী' বলিয়া উপহাস করে। আমার কনিষ্ঠ ভাইটির একটিমাত্র অণ্ডকোষ হইয়াছে ও এখনও আছে। বয়স ২৬ বৎসর। এই

বই পড়িবার আগে সকলের ন্যায় আমিও বলিতাম, খোদা তাহাকে একটি অণ্ডকোষ দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪০ বৎসর পরে অদ্য আমি এ বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম—অর্থাৎ তাহার অপর অণ্ডকোষটি না নামিয়া শরীরের ভিতরে উপরের দিকে আছে। একটি মেয়ে গর্ভধারণের দুই বৎসর পরে সন্তান প্রসব করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রকৃত গর্ভধারণের সময় ভুল ধরিয়াছে মনে হয়। **সারা বৎসর ধরিয়া** সহবাস করিলে তবে সন্তান হয়—ইহাই ছিল এক সময়ে আমাদের ধারণা। ত্বকচ্ছেদের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না, বরং মনে করিতাম উহা করিলে অঙ্গটি খামকা ছোট হইয়া যায়। জরায়ু বলিয়া কোনও পদার্থ আছে বলিয়া কখনও কল্পনা করি নাই বরং মনে করিতাম, সন্তান সমস্ত তলপেটে ঘুরিয়া বেড়ায়। পেটের **ডানদিকে পুত্র ও বামদিকে কন্যা** থাকে এবং অনেক পাপকর্ম করিলে কন্যা হয়, এই কুসংস্কার এখনও প্রচলিত আছে। খোদার হুকুমে যমজ সন্তান হয়, এই অন্ধবিশ্বাস এখনও সমাজে শিকড় গাড়িয়া আছে। অণ্ডকোষ ছাড়া অন্য কোনওখানে শুক্র থাকিতে পারে এ কথা কখনও ভাবি নাই। শুক্র-কোষের কথা জানা ছিল না। শুক্র বোতলে রাখিয়া লক্ষ্য করিয়াছি সন্তান হয় কিনা। পশুর সহিত সঙ্গম করিলে সন্তান হইতে পারে, ইহাও বদ্ধমূল ধারণা ছিল। এখন আপনার বই পড়িয়া উহা দূরীভূত হইয়াছে। কোন্ পথে সহবাস করিতে হয় তাহা একটি চাকরাণীর নিকট হইতে ১৬ বৎসর বয়সে শিক্ষা করি। যৌনব্যাধি কোথা হইতে ও কিভাবে সংক্রামিত হয় তাহা অনেকেই জানে না। পাড়াগাঁয়ে ত মোটেই না। ইহা না জানায় বিপদ বাড়িয়া যায়। কলিকাতায় ১৯৪৬ সনে আমরা ছয়টা বিভিন্ন পরিবার একত্র বাস করিতাম। তন্মধ্যে পাঁচটারই তখন সন্তান হয় নাই। একটি মেয়ে কিছুতেই দিনে তাহার স্বামীকে সহবাস করিতে দিত না। পাপ মনে করিত ও দিনে আমাদের ঐরূপ কার্যকলাপের নিন্দা করিত। আর একটি মেয়ের বয়স ছিল ১৪-১৫ বৎসর, তাহার স্বামীকে সহবাস করিতে দিত না, উপদেশও মানিত না। যৌনবিষয়ে অজ্ঞতা—দম্পতির অশেষ অ-সুখের কারণ হয়।

(বিবৃতিকারী বিচক্ষণতার সহিত যৌন-অজ্ঞতার একটি চিত্র দিয়াছেন। ইহাতে অতিরঞ্জনের লেশমাত্র নাই। —গ্রন্থকার।)

"পূর্বেই বলিয়াছি, আমার ১৪ বৎসর বয়সে যৌনবোধ জাগে। নানা ভাবে উহার নিবৃত্তি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। স্ত্রীর ১৩ বৎসর বয়সে

উহা জাগে। সে সমলিঙ্গের সহিত একত্র শয়নে মাঝে মাঝে স্তনে হস্ত স্পর্শ ইত্যাদির দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিত। যৌনবাসনা তখন তীব্রভাবে তাহার মনে জাগে নাই। পশুপক্ষীর মিলন গোপনভাবে লক্ষ্য করিয়া পুলক পাইত। স্বপ্নদোষের পূর্বে আমার যৌনবাসনা তীব্র ছিল, কিন্তু প্রথম ঋতু-স্রাবের পূর্বে স্ত্রীর উহা ক্ষীণ ছিল। আমার ক্ষেত্রে তীব্রতার নানা কারণ পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। **স্ত্রীর** বেলায় সুন্দর সাজসজ্জায় সজ্জিত স্বামীর কথা চিন্তা করিলেও উহার সহিত কল্পনায় সংযোগের কথা মনে উঠিলে, অন্য প্রকার যৌনক্রীড়াকলাপ দেখিলে, **উত্তেজনা এবং প্রস্রাবের বেগ হইত।** আমি বিপরীত লিঙ্গ সংসর্গ খুঁজিতাম, না পাইলে আত্মরতি করিতাম। **স্ত্রী প্রস্রাব করিলে শান্ত হইত।** অনুত্তেজিত অবস্থায়ও আমার কুচিন্তা মনে আসিত।

"**১৪ বৎসর** বয়সে সমপাঠিকাদের উপর বিশেষ এক **জ্যাঠাত বোনের** উপর নজর পড়িত। তখন মক্তবে পুরাতন নিয়মে পড়াশুনা হইত। তারপর জায়গীর (প্রবাসে থাকিয়া পড়িবার প্রথা) থাকিয়া পড়িবার সময়ে ছাত্রীদের সহিত চুম্বন ও স্পর্শন চলিত। ইহার পর আমার ১৬ বৎসর বয়সে বাড়ীর চাকরাণীর (বয়স ১৮ বৎসর) সহিত সংসর্গ হয়। সে নিজে মুখে ভাঙিয়া না বলিলেও আমার ইঙ্গিতে সাড়া দিত। সন্তান হওয়ার ভয়ে সে মাঝে মাঝে বারণ করিত। দেখিতে সে কাল ছিল, তথাপি আমার কাছে ভালই দেখাইত। আমি সুকুমার ছিলাম। ইহার পর আর একটি **বিবাহিতা নারী (১৮ বৎসর)** খাবারের দোকানে থাকিত। তাহার **স্বামী বর্তমান** ছিল। অবস্থা খারাপ। আমরা দুই বন্ধু তাহার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। সে আমাদিগকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করিত। আর একটি **বিবাহিত মেয়েলোক** (৪০ বৎসর) আমার সংস্পর্শে আসে। তাহার **স্বামী ছিল।** অবস্থা খারাপ। তাহারা আমাদের প্রজা। তাহাদের বাড়ীতে একটি মেয়েলোক আনিয়া রাখার প্রস্তাবে মেয়েলোকটি নিজেই দেহদানে রাজী হয়। আর একটি **বিধবা নারী** (৪০ বৎসর) আমার নিকট-আত্মীয়ের স্ত্রী ছিল। **স্বামীর অসুখের দরুন** উহার **তৃপ্তিসাধনে অপারগ** ছিল। আমার সহিত নিজেই প্রেম করে। উপরের **তিনটি নারীই কয়েকটি সন্তানের মাতা।** ইহার পরে কলেজে পড়া কালীন দুইটি বালকের সঙ্গে সমকাম হয়। একটির সহিত প্রায় এক বৎসর কাল সংসর্গ চলে। সে সময়ে **বিবাহ**

করিয়াছি। প্রবাসে আত্মতৃপ্তির জন্যই সমকাম হয়। কতক বন্ধুকে দেখিয়াছি, স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সমকাম পছন্দ করে। আমার সেরূপ প্রবৃত্তি ছিল না। আমি দুইবার বিবাহ করিয়াছি। খানিকটা নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি।"

মোটের উপর পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে যৌনবোধ বিলম্বে অথবা শীঘ্র জাগ্রত হয়। আবশ্য পার্থক্য হয় বয়স ও সুযোগের তারতম্যে।

যৌনবোধের স্বাভাবিক পরিণতি

নরনারীর যৌনসম্পর্ক

আমরা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যে সমস্ত বিকল্প অভ্যাসের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অনেকগুলিতেই অপর লোকের দরকার হয় না। **যৌনবোধের স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু প্রণালী নরনারীর যৌনসম্মিলন।** উহাদের যৌন-অঙ্গসমূহকে পরস্পরের মিলনের উপযোগী করিয়া পরস্পরের প্রতি দুর্বার আকর্ষণের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ভবিষ্যৎ বংশবৃদ্ধির ভার যৌনমিলনের উপর ন্যস্ত করিয়া প্রকৃতি নরনারীর **যৌনসম্পর্ককে** গৌরব ও সৌষ্ঠব দান করিয়াছে।

প্রাচীনকালের নীতিশাস্ত্রে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রায় সর্বত্র আত্মরতিকে বদভ্যাস বলা হইয়াছে। কিন্তু আবার ইহার প্রসারও কম ছিল কারণ তৎকালে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় স্বাভাবিক যৌনমিলন সকাল সকালই সম্ভবপর হইত। এই সকল বিকল্প-অভ্যাসের উদ্ভব বা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে প্রথম যৌবনে বিবাহ না হওয়ার দরুন। উহাদের প্রসার হয় বিশেষ করিয়া স্বাভাবিক যৌনমিলনের অভাবে।

আমরা অন্যত্র **বাল্য বিবাহ** বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া আবার **অধিক বিলম্বিত** বিবাহকেও অসমর্থনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছি।

মাতাপিতা ও গুরুজনের কাছে কিন্তু ইহা একটি জটিল সমস্যা। তাঁহারা কি চোখ বুজিয়া উদাসীন থাকিবেন? অথবা সতর্ক পাহারা দিয়া কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিবেন?

সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মুখেও ইহা একটি মহা প্রশ্ন। কৈশোর হইতেই ছেলেমেয়েদের যৌনবৃত্তির তাড়না সহ্য করিতে হইবে অথচ **সমাজ স্বীকৃত একমাত্র** চরিতার্থতার উপায় যে **বিবাহ** তাহা হইবে অনেক পরে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে **যৌবনের শেষপ্রান্তে**! তবে উপায়?

নর ও নারীর মিলনেতর কামক্রীড়া

নর ও নারীর যৌনবোধ একক অপরের দিকে আকৃষ্ট করে ও পরস্পরের যৌনমিলন বা রতিক্রিয়ার পরিণতি লাভ করে। আঙ্গিক মিলনকে ও উহার

সহায়তায় উভয়ের কাম চরিতার্থতাকে আমরা প্রকৃতির অভিপ্রেত বলিয়া মনে করিতে পারি। সমাজসিদ্ধ বিবাহের দ্বারা এইরূপ মিলনের বৈধ অবাধ সুযোগ হইয়া থাকে। বস্তুত বিবাহিত এক পক্ষ অপর পক্ষকে এই উপভোগ হইতে বঞ্চিত করিলে বিবাহের কোন অর্থই হয় না—উহা ভাঙিয়া দিবার কারণ উপস্থিত হয়।

বিবাহ ছাড়া যৌনমিলন সমাজ গর্হিত বলিয়া মনে করে। এই হেতু সতীত্বনিষ্ঠা রক্ষা করার সঙ্কল্প, গর্ভভয়, রতিজ রোগের ভয়, ব্যথা পাইবার ভয় ইত্যাদি নানা কারণে বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী—এমন কি বিবাহিত পক্ষও অপর পক্ষের অভাবে বা অলক্ষ্যে মিলনেতর কাম-ক্রীড়ায় লিপ্ত হয়, অর্থাৎ ঐ ক্রীড়া আঙ্গিক মিলন ছাড়া আর সব কিছু যথা: আদর, সোহাগ, স্পর্শন-চুম্বন, আলিঙ্গন উরুমৈথুন, মুখমেহন প্রভৃতি পর্যন্ত গড়ায়। ইহাকে আমরা **মিলনেতর কামক্রীড়া বা রতিবিহীন উপাচার** (Heterosexual Petting) বলিব।

কামক্রীড়ারই লঘু পর্যায় যাহা গলদেশের নীচে গড়ায় না অর্থাৎ চুম্বনাদিতেই শেষ হয় তাহাকে ইংরাজীতে নেকিং (Necking) বলে।

মিলনেতর কামক্রীড়ার উদ্দেশ্যই যৌন-উত্তেজনা সম্পাদন। তাই আকস্মিক স্পর্শন বা চুম্বনে উত্তেজনা হইলেও উহাকে ঐ পর্যায়ে ফেলা যায় না। অথচ উদ্দেশ্যমূলক কামক্রীড়া স্পর্শন চুম্বন হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদূর গিয়া গড়াইতে পারে। চরমতৃপ্তি লাভে শেষ হইলেও হইতে পারে—পুরুষের পক্ষে হওয়াই স্বাভাবিক। নারীর পক্ষেও মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। প্রধানত উচ্চ শ্রেণীর যুবক-যুবতীরা সতীচ্ছদ রক্ষা, গর্ভ ও রতিজ রোগগুলির আশঙ্কা নিবারণের জন্য মিলন এড়াইবার উদ্দেশ্যে ইহা করে।

বিবাহের পূর্বে বিশেষ করিয়া আমেরিকায় স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এইরূপ যৌন-আচার খুব প্রচলিত। বিবাহিত নর ও নারীও পার্টি, নাচ, মোটর বিহার, ভ্রমণ ইত্যাদিতে নিজেদের মধ্যে ও পরের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। আঙ্গিক মিলন না হওয়ায় এইরূপ আচারকে সাধারণতঃ মার্জিত রুচিসম্মত প্রমোদ (Flirtation) বলিয়া গণ্য করা হয়।

আদিযুগে কামক্রীড়া

বহু লোক প্রাণীজগতের পূর্ব ইতিহাস না জানিয়া অথবা আদিমানবগোষ্ঠীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত না থাকায় ইহাই মনে করে যে, এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল

আচরণ আমেরিকার বর্তমান সমাজের নারীর অতি শিক্ষা, অবাধ স্বাধীনতা, অতি সভ্যতার ও প্রচুর ধনসম্পদের ফল। ঐ সমাজের আসন্ন ধ্বংস বা ক্ষয়-ক্ষতিরও ইহা একটি প্রধান কারণ এইরূপ বিশ্বাসও করে।

ডঃ কিন্‌সেরা মনে করেন যে এই রীতি বহু পুরাতন। ইহাকে ইংরেজীতে Flirting, flirtage, courting, bundling, spooning, mugging smooching. larking, sparking ইত্যাদি বলা হইত। পুরাতন সভ্যতার ইতিহাসে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়—এমন কি পুরাতন সাহিত্যে বিশেষ করিয়া সংস্কৃত, চীনা, জাপানী, গ্রীক, রোমীয়, আরবীয় গ্রন্থে এইরূপ কামক্রীড়ার শ্রেণী বিভাগ, তাহাদের বর্ণনা ও প্রত্যেকের সম্বন্ধে নির্দেশ ও উপদেশ আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পেরুর মৃৎশিল্পে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ বৎসর হইতে নানারূপ কামক্রীড়ার খোদাই করা চিত্র দেখা যায়। একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত পুরী, কোনারক প্রভৃতি স্থানের মন্দির গাত্রে নানাবিধ কামক্রীড়ায় রত বিভিন্ন আসনে মিথুনিভূত নরনারীর মূর্তি দেখা যায়। ইহুদী-খ্রীষ্টান-ইসলাম ধর্মে বিবাহেতর কামক্রীড়াকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বোধ হয় এই বলিয়া যে, উহার প্রসার বাড়িয়া গিয়াছিল।

আমেরিকায় আজকাল উহার প্রসার বাড়িয়াছে মাত্র এবং ঐ সম্পর্কে ওখানকার সমাজের মনোভাব আর ততটা কঠোর নহে।

কলাভেদ

আমেরিকাবাসীদের মধ্যে চুম্বন আলিঙ্গন হইতে আরম্ভ করিয়া আঙ্গিক মিলন বাদে যে কোনও প্রকার কায়িক সংস্পর্শ ও দেহ ব্যবহার প্রচলিত আছে।

লঘু চুম্বন—সাধারণতঃ শুধু সংস্পর্শ, আদর সোহাগ, ও লঘু চুম্বন হইতেই ক্রীড়া আরম্ভ হয়। প্রথম বার বা প্রথম প্রথম হয়ত আর অগ্রসর নাও হইতে পারে। কেহ কেহ আবার ইহাতে কেবলমাত্র সূচনা মনে করে।

গভীর চুম্বন—ইহাতে গাল, ঠোঁট, দাঁত, জিহ্বা ইত্যাদির অবাধ ব্যবহার হয়। চুম্বন, চোষণ, দংশন পর্যন্ত গড়ায়। স্তন ও গোপনাঙ্গ চুম্বন ক্ষেত্র বিশেষে হইয়া থাকে।

স্তন ব্যবহার—নারীর স্তন অনুভূতিশীল। ইহার ব্যবহার পুরুষের পক্ষে এক সার্বজনীন আনন্দজনক অভ্যাস। হস্ত ও মুখ স্থাপন, প্রচাপন ও চোষণ চলিয়া থাকে। তাহাতে নারীর বিশেষ সুখ অনুভূতি হয়। আমেরিকায়

নাকি নারীস্তনের দিকে পুরুষের ঝোঁক ইউরোপের চেয়ে বেশী। ইউরোপের বহু জায়গায় নারীর পায়ের গোছের (ankle) ও নিতম্বের নাকি কদর অত্যধিক।

মানবেতর দুগ্ধপায়ী জন্তুদের মধ্যে স্তনের ব্যবহার কদাচিত দৃষ্ট হয়। কুকুর ও শূকরের মধ্যে কখনও কখনও ইহা দেখা যায়। মানুষের মধ্যে স্তনে মুখ প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যৌনাঙ্গে হস্তসঞ্চালন—এরূপ আচরণ নারী অপেক্ষা পুরুষ অনেক বেশী করে এবং অনেক পুরুষ চায় যে নারী তাহাদের অঙ্গ ঘাঁটাঘাঁটি করুক। নারীর সঙ্কোচ, সলজ্জভাব এবং প্রকৃতিগত সূক্ষ্ম-সুরুচি বোধ হয় ইহার জন্য দায়ী। ইহাতে তাহার বেশী সুখানুভূতি জাগে না এবং পুরুষের অনুরোধে বা পীড়াপীড়িতেই সে এইরূপ আচরণে সম্মত হয়। ডঃ কিন্‌সেরা সংখ্যানুপাত দিয়া এই তারতম্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যৌনাঙ্গে মুখপ্রয়োগ—মানবেতর জন্তুতে এইরূপ কামক্রীড়া সচরাচরই দৃষ্ট হয়। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মনীতি মানুষের মধ্যে ঐরূপ আচরণ গর্হিত বলিয়া নির্দেশ দিয়াছে। এই হেতু এবং সাধারণ শালীনতা বোধের দরুন এইরূপ আচরণ হইলেও খুব কম এবং কামক্রীড়ার নিবিড় পর্যায়ে হইয়া থাকে। পুরুষের চেয়ে নারীর ইহাতে আপত্তি আরও বেশী। সংস্কারসৃষ্ট লজ্জা, শালীনতাভাব, ঘৃণার উদ্রেক ইত্যাদি কারণেই এইরূপ আচরণের অনুপাত কম হইয়া থাকে।

যৌনাঙ্গ-সংস্পর্শ—প্রকৃত রতিক্রিয়া বাদ দিবার সংকল্প লইয়াও কামক্রীড়ার পর্যায় বিশেষে পরস্পরের অঙ্গ-সংস্থাপন হইয়া থাকে। নারীর উরুদ্বয়ের মধ্যে ভগের উপরে শিশ্ন ঘর্ষণ করা হয়। গর্ভ ও রতিজ রোগগুলির ভয়ে এবং সতীচ্ছদ রক্ষার জন্য নারী সাধারণতঃ ইহার বেশীর অনুমতি দেয় না, অথবা উভয়েই সুবিবেচক ও সংযমী হইলে এই সীমা অতিক্রম করে না। অবশ্য ইহার বেশী অর্থাৎ প্রকৃত যৌনমিলন হইয়া গেলে উহা বিবাহেতর মিলনের পর্যায়েই পৌছে।

প্রসার পৌনঃপুনিকতা

বাল্যে সাধারণতঃ যাহা হয় তাহা নিছক ক্রীড়াচ্ছলেই বেশী হয়। কৈশোরে পুরুষ উহার স্বাদ বা সুখ উপভোগ করে এবং উদ্দেশ্যমূলক ক্রীড়ায়

রত হয়। এইভাবে আমেরিকার কিছু কিছু কিশোর তাহাদের প্রথম রেতঃপাত করে এবং ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে উহাদের সংখ্যা বেশ বাড়িয়া যায়। তারপর ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

ডঃ কিন্‌যেদের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে প্রায় শতকরা ৮৮ জন পুরুষ বিবাহের পূর্বে এইরূপ কামক্রীড়া করিয়াছে বা করিবে। বিবাহের পূর্বে ২৮% ইহাতে চরম তৃপ্তি লাভ করে। ১৬ হইতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৩৩% করে। নারীদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন ১৫ বৎসর পর্যন্ত বয়সের মধ্যে, শতকরা ৫৯ হইতে ৯৫ জন ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে এবং যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১০০ জনই কোনও-না-কোনও সময়ে এইরূপ আচরণে লিপ্ত হইয়াছে। প্রায় এই সমস্ত শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ উহাতে চরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্‌যেদের মতে এই অভ্যাসের প্রসার পূর্ব পূর্ব কাল হইতে বর্তমানেই সমধিক।

অভ্যস্তদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায় প্রতিদিন বা রাত্রেই এইভাবে চরম তৃপ্তি লাভ করে। কেহ কেহ সপ্তাহে, মাসে বা বৎসরে এক বা একাধিকবার এরূপ করিবার সুযোগ পায়। অবশ্য হস্তমৈথুন ইত্যাদি প্রক্রিয়াও চলিতে থাকে। হাই স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই ইহার প্রকোপ খুব বেশী (প্রায় ৯২%) নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে ইহা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। তাহারা ইহাকে যৌনবিকৃতি মনে করে। তাহাদের কিশোর-কিশোরীর মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর অপেক্ষা সহবাস অল্প ঘনিষ্ঠতাতেই হয়, সুতরাং তাহাই অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়। কেহ পর পর বহু সঙ্গীর সংস্পর্শে আসে আর কেহ কয়েকজন আবার কেহ বা ২-১ জনেই সীমাবদ্ধ থাকে।

স্বপ্নদোষের চেয়ে খানিকটা কম ক্ষেত্রে পুরুষের রেতঃপাত এই প্রক্রিয়ায় হয়। সামাজিক তাৎপর্যে কিন্তু ইহার গুরুত্ব বেশী। কিশোর-কিশোরীর মধ্যে আলাপ, আলোচনা, আদর, সোহাগ ও ভদ্র ব্যবহার ছাড়া জোরপূর্বক ইহা ঘটে না, এই হেতু ইহা সামাজিক মেলামেশা খানিকটা সুগম করে। অপর পক্ষে এই ক্রীড়া শেষ পর্যন্ত যৌন-মিলনে পর্যবসিত হইয়া ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কাও থাকিয়া যায়।

সাধারণতঃ পুরুষ পক্ষই এই ক্রীড়ার সূত্রপাত করে এবং সকর্মক অংশ

গ্রহণ করে। উন্মুক্তস্থানে বা প্রকাশ্যভাবে লঘুক্রীড়া সচরাচর আমেরিকায় দৃষ্ট হয়। গোপনে উহা আরও ব্যাপক ও গুরুতর পর্যায় ধারণা করে। ডঃ কিন্‌যের মতে আঙ্গিক রতিক্রিয়াকে এড়াইয়াই এই ক্রীড়া বেশীর ভাগ অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্রীড়ার প্রসার বাড়িয়া থাকিলেও নাকি বিবাহ-পূর্ব যৌন-মিলনের অনুপাত বাড়ে নাই।

ফলাফল

এরূপ কামক্রীড়ার ফলাফল সম্পর্কে অভ্যস্তদেব মধ্যে নানারকম অভিমত ও আশঙ্কা থাকে। ভবিষ্যৎ বিবাহজীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া কি হইবে তাহা লইয়া অনেকে চিন্তিত হইয়া পড়ে। মোটের উপর, কামাবেগেব চবমতৃপ্তি পর্যন্ত পৌছিলে শরীব বা মনেব উপর উহাব অনিষ্টকর পরিণতিব কোনও আশঙ্কা নাই। অপরিণত বা অপরিমিত উত্তেজনা ও অশান্ত-সমাপন ক্ষতিকর হইতে বাধ্য। সমস্ত দেহ ও মন উত্তেজিত বহিয়া গেলে এবং এইরূপ বারে বাবে হইতে থাকিলে কোমব, অণ্ডকোষ ও কুঁচকিতে বেদনা, অনিদ্রা, মাথাঘোবা, অজীর্ণতা ও নানাবিধ স্নায়বিক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে।

সামাজিক গুরুত্ব

আমাদের দেশে—তথা প্রাচ্যে—নব ও নাবীর অবাধ মেলামেশাব সুযোগ না থাকায় এইরূপ কামক্রীড়াব প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বহু কম। কিন্তু পর্দাপ্রথাব অন্তরালেও যে ইহা একেবাবে নাই তাহা বলা চলে না। নবনাবীব আবও ব্যাপক মেলামেশার সুযোগ দিবাবই আমরা পক্ষপাতী এই হেতু—আমাদেরও এ সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। বস্তুত এদেশেও গুরুজন, শিক্ষকগোষ্ঠী ও নীতিবাগীশদের এই অভ্যাসের প্রসার ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

সারা প্রাণীজগতে জীবজন্তুর একটা সার্বজনীন অভ্যাস প্রিয় বস্তু অঙ্গ বা অপর জীবের স্পর্শন বা প্রচাপনে সুখবোধ করা। মানব শিশুও শৈশব হইতে এইভাবে অভ্যস্ত হয়—মাতা, নার্স বা বন্ধুবান্ধবের শরীরের সংস্পর্শে আসিয়া উত্তাপ, মায়া-মমতা ও অবস্থাবিশেষে স্নাযবিক উত্তেজনা লাভ করিয়া সুস্থী হয়।

একটু বয়স বাড়িলেই পিতামাতার কায়িক সংস্পর্শ কমিয়া যায়, গুরুজন অপরের স্পর্শন গাহত বলিয়া বুঝাইয়া দেন, এবং মেয়েদেরকে ছেলেদের নিকট-সম্পর্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে সাবধান করেন। অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে কায়িক

সংস্পর্শ পুলকপ্রদ ছিল তাহাকে বর্জন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এইরূপ পৃথক ও ভিন্ন জীবন যাপন বহু বৎসর পর্যন্ত করিয়া বিবাহের পর আবার নিবিড় সংযোগের পরিস্থিতি উপস্থিত হয়। তখন উভয়ের সংকোচ বোধ, উদ্ভট-আচরণ বিশেষ করিয়া—নারীর উৎকণ্ঠা, উদাসীনতা, কামশীলতা পীড়াদায়ক হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।

পাশ্চাত্যদেশে—বিশেষ করিয়া আমেরিকায় ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ থাকায় তাহাদের মধ্যে মিলনেতর নানাপ্রকার কামক্রীড়ার প্রসার দেখা দিয়াছে। নীতিবাগীশদের চোখরাঙানি উপেক্ষা করিয়া তাহারা বিবাহ-পূর্ব উত্তেজনার প্রশমন চাহে—একান্ত আঙ্গিক মিলন বা রতিক্রিয়াকে এড়াইয়া তাহারা মনে করে ইহাতে তাহাদের সতীত্ব বজায় থাকে—শুধু—নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে উত্তেজনা প্রশমিত হয় মাত্র।

প্রাচ্যের লোকেরা এরূপ মতবাদকে সমর্থন নাও করিতে পারে। ইহাদের মতে ত চুম্বন আলিঙ্গন, আঙ্গিকবেষ্টনীসহ নৃত্য ইত্যাদিও দূষণীয়। এরূপ মনোভাবের জন্য ইহাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন, ঐতিহ্য ও প্রথা দায়ী।

পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিত—বিশেষ করিয়া ফ্রয়েড ও তাঁহার অনুবর্তীরা প্রচণ্ড কাম নিষ্পেষণের যে ভয়াবহ কুফলাদি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা হইতে প্রতীয়-মান হইবে যে, বিবাহপূর্বে খানিকটা শিথিল যৌন-আচরণের অভাবে নর ও নারীর পরবর্তী দাম্পত্য জীবন অসুখী না হইয়া আরও ফলপ্রসূ হওয়াই স্বাভাবিক। উভয়েই সম্মতিক্রমে, আস্তে আস্তে এমন কি বহুবারের সংস্পর্শে নারীদের কামক্রীড়া লঘু হইতে গুরু পর্যায়ে পৌঁছে। তাই ক্রমবর্ধমান যৌন-অভিজ্ঞতা বিবাহকে আর ভীতিপ্রদ অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে দেয় না। মনের মত স্বামী হইলে সুরতে নারীর চরমতৃপ্তি সহজে ও প্রায়ই হয়। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের অজানা বা অল্পজানা পাত্রীকে বিবাহের প্রথম দিকেই পূর্ণ রতিক্রিয়ার প্রায় আকস্মিক আক্রমণে সাধারণতঃ আতঙ্কিত, ঘৃণান্বিত, ব্যথিত কিংবা আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

বহু নারী অপরের উপদেশ বা পুস্তকপাঠের চেয়ে বেশী এইরূপ কাম-ক্রীড়ায়ই যৌন-আচরণের এবং নরনারীর কায়িক ও মনস্তাত্বিক আকর্ষণের প্রকৃত স্বরূপ, তাহার ফলাফল ও সে সম্বন্ধে কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিতে পরে।

ডঃ কিন্‌সেদের মতে ঐরূপ আচরণ ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী বিবাহ জীবনে

সচ্ছলতা আনয়ন করে। বিবাহিতা নারীদের চরমপুলকলাভে অপারগতা এইরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা অনেকটা দূর করে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য এই যে প্রথা বা আচরণ বিশেষের নিজস্ব ক্ষয়-ক্ষতি করণের চেয়ে সমাজের ভ্রূকুটি, নিন্দাবাদ এবং অভ্যস্তদের ধরা পড়িবার উৎকণ্ঠা ও ভীতি বেশী মারাত্মক হয়। স্বমেহনের অপকারিতাও এইজন্য। কুফলেব ভীতি অপসারিত হইলে এইরূপ ক্রিয়াকলাপ সাময়িক উপভোগেব মতই নির্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

(১৭)

বিবাহেতর যৌনমিলন

উহার প্রসার

স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন **স্বাভাবিক** এবং **সমাজসিদ্ধ। অপর নর ও নারীর মধ্যে যৌনমিলন স্বভাবসিদ্ধ হইলেও উহাকে বিবাহেতর যৌনমিলন বা ব্যভিচার** বলা হয়। এইরূপ যৌনসম্পর্ক ধর্ম, নীতি ও অবৈধ বলিয়া গণ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু তথাপি উহা সকল সময়েই এবং সকল সমাজেই ব্যাপকভাবে বর্তমান রহিয়াছে। প্রফেসর ব্রুনো মেয়ার (Bruno Meyer) বলেন যে, অর্ধেকের বেশী সংখ্যক যৌন-মিলনই আজকাল বিবাহেতর হইয়া থাকে।

কারণ সমূহ

(১) **যৌনবোধের তীব্রতা।** নব ও নারীর পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক ও দুর্নিবার আকর্ষণ। এই আকর্ষণেব মূল কারণ জরায়ু ও ডিম্বের প্রতি শুক্রকীটের আকর্ষণ। পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে, শুক্রকীট শুক্ররসে ভাসিয়া বেড়ায় ও এদিক ওদিক চলিতে থাকে। নর বা নারীর শরীরের অন্য কোনও অংশ উহাদের সন্নিকটে স্থাপন করিলে উহাদের গতিবিধির কোনও রকম ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু নাবীর জরায়ু বা ডিম্বকোষের কোনও অংশ কাছে রাখিলে তাহার দিকে চুম্বকাকৃষ্ট লোহের মত শুক্রকীটগুলি ধাবমান হয়। উহাদের আধার অর্থাৎ পুরুষের স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া শুক্রকীটের জরায়ু বা ডিম্বের প্রতি ঐরূপ আকৃষ্ট হওয়ারই অনুরূপ। সুতরাং ইহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে যে সমাজশাসন, ধর্মশাসন, আইনের ভয় বা নরকের ভীতি সত্ত্বেও **যৌনমিলন সম্বন্ধে মনুষ্য সৃষ্টি বিধিনিষেধ** নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণরূপ **প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে প্রতিনিয়ত** পরাভূত হইতেছে।

(২) **বিবাহিত জীবন নর ও নারীর পূর্ণ জীবনের অংশ মাত্র।** অধিকাংশ সভ্য সমাজের বিবাহের পূর্বে নর ও নারীকে বহুদিন অপেক্ষা করিতে হয়। বিবাহ হইয়া গেলেও অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর বিরহ বা

বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। একত্রে থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে অসুখ অশান্তি, গরমিল ইত্যাদি কারণে স্বামী ও স্ত্রী পূর্ণ দাম্পত্যব্যবহারে অনিচ্ছুক, অপারগ বা অক্ষম থাকে।

(৩) উভয়ের, বিশেষত নরের, **একে-অতৃপ্তি**। নূতন ভোগের বাসনা।

(৪) **বিবাহের পরেও একের মৃত্যুর পরে অপরের পুনর্বিবাহ করিবার অনিচ্ছা, অক্ষমতা বা বাধা থাকা।** মৃতদারের পুনর্বিবাহ না করা বা না করিতে পারা এবং বিধবার ঐরূপ না করা বা সমাজের বাধা-নিষেধের দরুন ইচ্ছা থাকিলেও না করিতে পারা।

এই সকল কারণ বিশ্লেষণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যে নর ও নারীর সম্মুখে সম্পূর্ণ **যৌন-নিষ্ঠার** আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখা সত্ত্বেও প্রায় সকল পুরুষ এবং প্রায় অর্ধেক নারী সেই অস্বাভাবিক আদর্শচ্যুত হইয়া পড়ে, এইরূপ পদচ্যুতির প্রতিফল ছিল **শাসন**—অবশ্য শুধু ধরা পড়িয়াছে এমন কতকগুলি ক্ষেত্রে। মানবচক্ষুর অগোচরে যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা ছিল **নীরবতা**। কিন্তু চক্ষু মুদিলে সত্যকার পারিপার্শ্বিক জগৎ সাময়িকভাবে **অদৃশ্য** হইতে পারে, **বিলুপ্ত** হয় না। তাই জিজ্ঞাসু প্রাণ আজকাল প্রশ্ন করিয়া বসে, এসম্বন্ধে যৌন-বিজ্ঞানের বলিবার কি আছে? কেন এমন হয়?

পদস্খলনের প্রধান কারণসমূহই আমরা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিব। আমরা বলিয়াছি, যৌনবোধ মানুষের একটি অতি তীব্র মনোবৃত্তি। শিশুকাল হইতে ইহার প্রভাব প্রকট হয়। সমাজ এবং সংস্কার এই বোধকে যেমন একদিকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকে, এই বৃত্তিটি অপর দিকে তেমনই বাধা ভাঙিয়া চরিতার্থতার সুযোগ খুঁজিতে থাকে।

জন্তুদের মধ্যেও যে বিপরীত-লিঙ্গ প্রাণীর অভাবে অনেক সময়ে স্বয়ংমৈথুন বা সমমৈথুনের প্রচলন দেখা যায় এবং মানুষের মধ্যে অনুরূপ কার্যকলাপের বর্ণনা আমরা পূর্ব কয়েক অধ্যায়ে দিয়াছি।

ইতর প্রাণীর আচরণ

ইতর প্রাণীর মধ্যে যৌনতৃপ্তি মাত্র **সুযোগের উপরেই** নির্ভর করে, পাত্রাপাত্রের বিচারের দরকার হয় না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির জন্তু পরস্পরের উপগত হইবে। এমন কি সন্তান জননীতে যৌনমিলন

সচরাচর দেখা যায়। পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় জন্তু পরস্পরকে খুঁজিয়া এবং সময়-বিশেষে যৌনমিলনে ব্রতী হয়। ইহাদের সমাজগত কোন বাধা নাই তবে শরীরের অবস্থার ব্যতিক্রমে বা সময় বিশেষে উহাদের যৌন-উত্তেজনা জাগ্রত হয়।

দুগ্ধপায়ী জন্তুদের মধ্যে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক শ্রেণী প্রায় জন্মের কিছুকাল পর হইতেই যৌনমিলনের চেষ্টা করিতে থাকে এবং শারীরিক ভাবে সমর্থ হইলেই উহাতে লিপ্ত হয়। এমন কি কতক মানব সদৃশ শিম্পাঞ্জী এবং ওরাং-ওটাং জাতির মধ্যেও সকাল-সকাল ঐরূপ প্রচেষ্টা ও কার্যকলাপ দেখা যায়। যদিও প্রায় মানুষের মতই উহাদের বয়ঃপ্রাপ্তি ৭ হইতে ১০ বৎসরের আগে হয় না। পুং জন্তুশাবকেরাই সকর্মক অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

মানুষের মধ্যে ধর্ম ও সমাজের নামে মানুষই নানা বাধানিষেধ আরোপ করিয়া থাকিলেও সারা প্রাণীজগতে কামক্রীড়া ও মৈথুনক্রিয়া দেহ ও মনের দিক হইতে পাত্র-পাত্রী নির্বিশেষে একই প্রকার।

আদি মানব জাতির মধ্যে

আদিম মানবজাতিতে বাধা-বিপত্তি কতটা ছিল তাহা নির্ণয় করা মুশকিল। এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে অবাধ যৌনমিলনের প্রচলন আছে। ইহাদের মধ্যে বালকবালিকা, কিশোরকিশোরী, যুবক যুবতী সমর্থ এবং ইচ্ছুক হইলেই উহা করিতে পারে। উহাদের মধ্যে সন্তান-জন্মের সহিত মিলনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ধারণা নাই। ব্রিটিশ নিউগিনির আদিম অধিবাসীরা এই মনে করে যে, সন্তান স্ত্রীলোকের স্তনে প্রথম জন্মে পরে উহা তলপেটে নামিয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা মনে করে "রাতাপা" নামক গর্ভসঞ্চারক প্রেতাত্মা স্ত্রীলোকের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কতিপয় নির্দিষ্ট ফল খাইলেই গর্ভাধান হয়। অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্সল্যাণ্ডের অধিবাসীরা মনে করে, সন্তান পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় স্ত্রীলোকের নাড়ীভুঁড়িতে সাপ বা পক্ষীর আকারে প্রবিষ্ট হয়। এস্কিমোরা বিশ্বাস করে, সন্তান ঐশ্বরিক উপায়ে উদ্ভূত হয়, পুরুষের শুক্র শুধু সন্তানের খোরাকরূপে যোগান হয়। ইহারা সহবাসকে শুধু একটি আনন্দজনক কার্য বলিয়া মনে করে।

ডঃ কিন্‌সেরাও মন্তব্য করেন যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তথাকথিত আদিম অধিবাসীদের মধ্যেকার বিবাহ-পূর্ব মৈথুন আজ সর্বজনস্বীকৃত এবং বর্তমান

দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যজাতির মধ্যে, প্রাচ্যের প্রাচীন জাতিদের মধ্যে এবং ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী ছাড়াও অপর ইউরোপীয় জাতিদের অধিকাংশের মধ্যে বিবাহ-পূর্ব মৈথুন প্রায় প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

কিন্‌সেদেব এইরূপ উক্তি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়। ধর্মসর্বস্ব প্রাচ্য মৈথুন ত দূরের কথা এমন কি কিশোর-কিশোরীর মেলামেশা পর্যন্ত পছন্দ করে না। বোধ হয় জাপানের কথা স্বতন্ত্র। ইঙ্গ-মার্কিনদেব শালীনতা-বোধেব পক্ষে অযথা ওকালতী করা বৈজ্ঞানিক অপক্ষপাতিত্বে পরিপন্থ ছাডা কিই বা হইতে পারে। অবশ্য সভ্য প্রাচ্যেব অতটা গোঁডামী ভাল কি মন্দ তাহাব বিচার এখানে কবিতেছি না। কথা হইল প্রকৃত পবিস্থিতি লইযা।

আমেবিকাব কামক্রীডা যে প্রায় সার্বজনীন এবং বিবাহেতব মৈথুনের পরিমাণও যে পৃথিবীব মধ্যে সর্বাধিক একথা ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধানেই ধবা পড়িয়াছে। (Because of this public condemnation of pre-marital coitus, one might believe that such contacts would be rare among American females and males. But this is only the overt culture, the things that people openly profess to believe and to do. Our previous report (1948) on the male has indicated how far publicly expressed attitudes may depart from the realities of behavior—the covert culture what males actually do. We may now examine the pre-marital coital behaviour of the female sample which has been available for this study." (Kinsey-Vol II-pp 285)

যাহা হউক, যৌন তাডনাবই ফলে অনেক রকম যৌন-আচরণ যে যৌন-প্রাপ্তিব পূর্বেই প্রকাশ পায় ইহার কারণ, যৌনবোধেব তীব্রতা প্রায় কৈশোর হইতেই অনুভূত হয়। 'এত কঠোর যে তাডনা, এত ব্যাপক যে বৃত্তি, এত জ্বালাময় যে ক্ষুধা, সমাজ তাহার তৃপ্তিব ব্যবস্থা করিয়াছে একমাত্র বিবাহের দ্বারা। উপদেশ দিয়াছে, বিবাহের পূর্বে সমস্ত যৌনবোধকে পিষ্ট করিয়া সংযত রাখিতে হইবে। ভয় দেখাইয়াছে, তাহা না করিলে ধরা পড়িবে ও কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে, ধরা না পড়িলেও ইহলোকে দুঃসহ ব্যাধি এবং পরলোকে নরকাদি এবং পরজন্মে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। আদর্শ এত কঠিন বলিয়াই স্খলনও হয় এত সহজে।

কিরূপে সংঘটিত হয়

বালক-বালিকার মধ্যে—শিশুকাল হইতে যৌনবৃত্তি অল্পাধিক সজাগ থাকে বলিয়া, স্বয়ংমৈথুন ছাড়া বালক-বালিকার ক্রীড়াচ্ছলে সম্মিলনও কখনও কখনও হইয়া থাকে। পিতামাতার বা পশুপক্ষীর মিলনক্রিয়া দর্শনে ইহারা পরস্পরে ঐরূপ ক্রিয়ার অনুকরণ করিবার প্রয়াস পাইতে পারে। অপরিণত শৈশবে এই সকল কার্যকলাপ অনেকটা খেলাধূলার মতই গণ্য করা যায়।

কিশোর-কিশোরীর যৌনচেতনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অপর বয়োজ্যেষ্ঠ নারী বা নর উহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া যৌনসম্মিলনে রাজী করার দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। স্কুলের বন্ধু, বান্ধবী, দাসদাসী, শিক্ষক বা নার্সের এইরূপ প্রচেষ্টার দৃষ্টান্তও দেখা যায়। **বালকবালিকাদের ভিন্ন বিছানায় একাকী শুইবার ও কুসংসর্গ হইতে বাঁচাইবার** ব্যবস্থার বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়া আমরা পূর্বেই একথা আলোচনা করিয়াছি। রাজা, বাদশাহ, নওয়াব, জমিদার ইত্যাদি বড়লোকদের বাড়ীর ছেলেরা সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ দাস-দাসী প্রভৃতির দ্বারা প্রলুব্ধ হয় এবং বয়োকনিষ্ঠদের সহিত যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে।

অবিবাহিত বড়দের মধ্যে—কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী রতিক্ষম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পায়। সমাজে অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকিলে এ ক্ষেত্রে উহাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্মিলন সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। পাশ্চাত্য সমাজে ইহাদের মধ্যে যৌনমিলন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

প্রসার

প্রোফেসার টারম্যান গবেষণা করিয়া আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁহার Psychological Factors In Marital Happiness নামক গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, **বিবাহের পূর্বে যৌনমিলনের মাত্রা দ্রুতগতিতে বাড়িয়াই চলিয়াছে।**

ইংলণ্ডে এইরূপ গবেষণা হয় নাই, তাহা হইলেও সমাজবিজ্ঞানবিদেরা যে সমস্ত তথ্য আহরণ করিয়াছেন তাহা হইতে ঐরূপই অনুমিত হয়।

নরম্যান হাইমস (Himes) দুইটি চার্ট উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমেরিকায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে প্রাগ্‌বিবাহ যৌনমিলনের মাত্রা

ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং ক্রমশই কমসংখ্যক যুবক-যুবতী পূর্ণ যৌন-পবিত্রতা লইয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। সকল যুবক-যুবতীর অনেকে প্রাগ্‌বিবাহ মন পাইবার চেষ্টাও যাচাই (courtship)-এর সময় কিংবা বাগ্‌দানের (engagement) পরে নিজেদের ভাবী স্ত্রী বা স্বামীর সহিত বিবাহের পূর্বে আলাপ-পরিচয়ের সময়ে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। অনেকে আবার অপর পুরুষ বা নারীর সহিতও ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে।

১৯৩৮ সালে মিস ডরোথি ব্রমলি আমেরিকার নানা কলেজের ৭০০ ছাত্রী ও ৬০০ ছাত্রের যৌনজীবনের ইতিহাস (প্রায় অর্ধেকের সহিত সাক্ষাতে কথা বলিয়া ও অপরের নিকট হইতে পত্রযোগে) অবলম্বনে লিখিত Youth and Sex পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, গড়ে ২০ বৎসর বয়সের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৫২ জন ও ছাত্রীদের মধ্যে ২৫ জনই সুরতাস্বাদ লাভ করিয়াছে।

এই সকল ধারা পর্যালোচনা করিয়া প্রোফেসার টারম্যান বলেন যে, যদি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালের যুবক-যুবতীর যৌন-নিষ্ঠার এইরূপ ক্রমঅবনত ধারা চলিতে থাকে, তাহা হইলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যে ছেলে এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যে মেয়ে জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের মধ্যে বিবাহের প্রাক্কালে যৌন-নিষ্ঠার মাত্রা বিলুপ্ত হইবে।

ডাঃ ডিকিনসন (Dickinson) আমেরিকার গবেষকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। তিনি The Single Woman পুস্তকে (তাঁহার শতশত কুমারী রোগিণীর যৌনজীবনের ইতিহাস অবলম্বনে) লিখিয়াছেন যে, বাগ্‌দত্তা কুমারীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই ভাবী স্বামীর সহিত সহবাস করে। তিনিও দীর্ঘ গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, **বিবাহের পূর্বে যৌন-উপভোগের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে।**

ডঃ কিন্‌সেদের মতে আমেরিকার বেশীর ভাগ পুরুষই বিবাহের পূর্বে রতিক্রিয়া করিয়াছে। শতকরা ২২ জন কৈশোরের পূর্বেই ১০ বৎসর বয়স হইতে উহা করিয়াছে বা করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং ঐ অভ্যাস পরবর্তী জীবনেও রাখিয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পুরুষের মধ্যে উহার প্রসারের তারতম্য আছে। শিক্ষামানের নীচের ধাপের প্রায় ৳ অংশ ঐ প্রকার অভ্যস্ত। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জন, যাহারা হাই স্কুলে পড়িয়াছে এবং উহার উপরে আর যায় নাই তাহাদের শতকরা ৮৪ জন এবং

নিম্নস্তরের স্কুলেই যাহাদের পড়া শেষ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন বিবাহের পূর্বে নারী সহবাস করিয়াছে।

নারী সহবাস ও হস্তমৈথুনই সারা আমেরিকার পুরুষদের প্রধান যৌনক্রিয়া। ব্যক্তিবিশেষের উভয় কার্যক্রমে যথেষ্ট ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। কেহ বা বিবাহের পূর্বে ভাবী স্ত্রীর সহিত মাত্র একবার সহবাস করিয়াছে, কেহ বা আবার সপ্তাহে ১০ বার পর্যন্ত চালাইয়াছে। কেহ মাত্র একজন কেহ বা ডজন ডজন মেয়ের সঙ্গে করিয়াছে। কেহ কেহ নূতন নূতন মেয়েব পিছনে ধাওয়া কবিয়া আমোদ পায় ও বিজয় গৌরব বোধ করে।

প্রবল ধর্মীয় ভাবাপন্ন লোকদের এরূপ আচবণ অপেক্ষাকৃত কম—যথা: ইহুদী ও গোঁড়া খ্রীষ্টানদের মধ্যে। গ্রাম অপেক্ষা শহরে ইহার প্রকোপ বেশী। গ্রামে সুযোগেব অভাব এবং সামাজিক অনুশাসন অপেক্ষাকৃত কঠোর বলিয়াই এরূপ তারতম্য হয়।

ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধান ক্ষেত্রে শতকরা ৫০% নারীই বিবাহের পূর্বে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হইযাছে। ইহাদেব মধ্যে বিবাহের ২-১ বৎসর পূর্বে বেশীর ভাগ ঐরূপ করিয়াছে। আবার কতক ভাবী স্বামীসহ যৌনমিলনে রত হইযাছে।

বিবাহে বিলম্ব হইলে ঐরূপ আচরণেও দেরি হইয়াছে; আবার সকাল সকাল বিবাহ হইলে সকাল সকালই যৌনমিলন ঘটিয়াছে। এই তথ্যের তাৎপর্য ইহাই হইতে পাবে যে সকাল সকাল যৌনমিলনে অভ্যস্ত নারীরা বিবাহও সকাল সকাল করিয়াছে অথবা বিবাহেব পূর্বে নারীবা অনেকটা মনোভাব শিথিল কবিয়াছে। ১৩-১৪ বৎসবের বালিকার যৌনমিলন খুব কমই পাওয়া গিয়াছে, শারীরিক অপরিপক্কতা ও সামাজিক কঠোব অনুশাসন উভয় কারণেই বোধ হয়।

যৌনমিলনেব কেবল কতক ক্ষেত্রে মাত্র নারীর চরমতৃপ্তিলাভ ঘটিয়াছে। বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রেও এমনতবই হইয়া থাকে।

বিবাহিতদের যৌনমিলন অপেক্ষা বিবাহপূর্ব যৌনমিলন সংখ্যায় ও অনুপাতে কম। কারণ সাধারণতঃ পাত্র-পাত্রী, সুযোগ, সময় ইত্যাদির অভাব এবং সামাজিক বাধা-বিপত্তি। নারীদের মধ্যে অনেকে কেবলমাত্র এক বা কম সংখ্যক পুরুষের সহিত সীমাবদ্ধ মিলনের প্রয়াস পায়।

আমেরিকায় **বিবাহ-পূর্ব যৌনমিলনের স্থান** সম্পর্কে ডঃ কিন্‌সেদের

অভিমত এই যে, মেয়েদের নিজ গৃহে, ছেলেদের নিজ গৃহে, বন্ধুর গৃহে, স্কুল, কলেজ, হোটেল বা ভাড়া ঘরে, মোটর বা অন্য গাড়ীতে, খোলা জায়গায় এবং অনুরূপ নানা পরিবেশে উহা সংঘটিত হয়।

মিলন-পুর্ব কামক্রীড়ার কথা বলিতে যাইয়া ইঁহারা বলেন যে, পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত কামক্রীড়ার (Petting) প্রায় সকল প্রকারই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বভাবতই নারীকে উত্তেজনা দিয়া সম্মত করিতে পুরুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করে। **বিবাহিতদের মধ্যে** ঐরূপ কামক্রীড়া প্রায় স্বামী ভুলিয়াই যায় এই বলিয়া বোধহয় যে, স্ত্রী তাহার ভোগের বস্তু ও তাহাব সম্মতি বা স্বীকৃতির ধাব না ধরিয়াই স্বামী নিজেব কামচবিতার্থ করিতে পারে।

প্রত্যেক স্বামীরই উচিত যে, প্রতিবাব মিলনেব পূর্বে নানা প্রকাব প্রেম-ক্রীড়া করিয়া স্ত্রীব মন উহাব জন্য প্রস্তুত ও আগ্রহান্বিত করতঃ তবেই যেন উহাতে ব্রতী হন। কারণ তবেই স্ত্রী উহাতে আনন্দ পাইবেন, সহযোগিতা কবিবেন এবং শীঘ্রই (তাঁহাব সহিত অথবা তাঁহাবও পূর্বে) চরমতৃপ্তি লাভ করিবেন। ফলে, তাঁহাবও আনন্দ দ্বিগুণ হইবে।

ডঃ কিন্‌যেদের উদ্‌ঘাটিত নিম্নলিখিত **তুলনামুলক** তথ্যাদি উল্লেখযোগ্য :

বিবাহ-পূর্ব যৌনমিলন

উৎপত্তি ও উত্তরাধিকার	নাবী	নব
দুগ্ধপায়ী জন্তুদের মধ্যে শাবীবিক সামর্থ্য হইলেই উহাব চেষ্টা	কম এবং অধিক বয়সে	বেশী এবং কম বয়সে
বহুপ্রাচীন সমাজে ছেলেমেয়েদেব মধ্যে উহাব অনুমতি দেওয়া বা সহ্য কবা	হাঁ	হাঁ
প্রাচীন সমাজে কৈশোবে কতকটা অনুমতি দেওয়া হইত	প্রায ৭০%	প্রায় সব ক্ষেত্রে
পাত্র সংখ্যা (অভ্যস্তদেব মধ্যে)		
একই পাত্রে সহিত	৫৩%	২৭%
শুধু ভাবী স্বামীর সহিত সঙ্গম	৪৬%	—
ভাবী স্বামী ও অপরের সহিত	৪১%	—
প্রক্রিয়া ভেদ		
মুখমেহন বর্তমান যুগে বেশী	হাঁ	হাঁ

স্বামী-স্ত্রীর মিলন অপেক্ষা বেশী সময় লাগে	হাঁ	হাঁ
দম্পতিদের তুলনায় আসনের বৈচিত্র্য কম	হাঁ	হাঁ
উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে নগ্ন হইয়া বেশী	হাঁ	হাঁ
সুযোগের অভাবে অসুবিধাজনক পবিস্থিতি	প্রায়ই	প্রায়ই

দৈহিক ও মানসিক ফল

কামাবেগের প্রশমন করে	কখনও ৪০%	সর্বদাই ৬৮-৯৮%
সতী কুমারীদের যৌনমিলন এড়াইবার ইচ্ছা	৮০%	—
অসতীদের ” ” ”	৩০%	—
যৌনমিলনের ইচ্ছা দমন করে :		
নীতিবোধ	৮৯%	২১-৬১%
কামভাবের অভাব	৪৫%	১৯-৪৫%
গর্ভসঞ্চারের ভয়	৪৪%	১৮-২৮%
ধরা পড়িবার ভয়	৪৪%	১৪-২৩%
রতিজ রোগের ভয়	১৪%	২৫-২৯%
সুযোগের অভাব	২২%	৩৫-৭২%

সামাজিক ফলাফল

গর্ভসঞ্চার	১৮%
বতিজ বোগেব সংক্রমণ	২-৩% উচ্চ শিক্ষিতে কম, অল্প শিক্ষিতে বেশী

ব্যভিচারের অনুপাত

অনূর্ধ্ব ১৫ বংসব	৩%	৪০%
১৬-২০ ”	২০%	৭১%
২১-২৫ ”	৩৫%	৬৮%

বিবাহেতর মিলনের প্রসারের কারণাবলী

প্রথমতঃ, ধর্ম ও সংস্কারের **বন্ধন অনেকটা শিথিল** হওয়া। অনেকে ইহাও মনে করিয়া থাকে যে, ধর্ম ও সমাজ অযৌক্তিক ও কুসংস্কারজনিত অনেক বাধা-নিষেধেব বেড়াজাল গঠন করিয়া আনন্দের ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। তরুণ তরুণীর উচিত হইবে ইহার বিরুদ্ধতা করা।

দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক এবং সামাজিক কারণে **বিবাহের বয়স পিছাইয়া**

যাওয়া। **যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হইবে যৌনতৃপ্তির প্রয়োজন** অথচ উহা সম্ভব হইবে বহুদিন পরে। এই অনিশ্চিত সুযোগের প্রতীক্ষায় যৌন-কামনা সম্পূর্ণ সংযত রাখা দুষ্কর।

তৃতীয়তঃ, **জীবনে ভোগস্পৃহা**। 'ইন্দ্রিয় দমনের জন্য কষ্ট স্বীকার অবশ্য কর্তব্য' এইরূপ আদর্শ এখন অনেকটা অচল হইয়া পড়িয়াছে। জীবনকে উপভোগ করার মত ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকা এবং সমস্ত সুযোগের যথোচিত সদ্ব্যবহার করা উচিত—এই মতবাদই এখন দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে।

চতুর্থতঃ, **নরনারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা**। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে নিজ নিজ আচরণের জন্য অন্যের কাছে জবাবদিহির প্রয়োজন নাই। বন্ধু-বান্ধবীর চলাফেরার উপর অপরের অযথা কৌতূহল ও সন্দেহ প্রকাশ করার কোন অধিকার নাই। পূর্বে গ্রামের সমাজবন্ধন দৃঢ় ছিল। একের কার্যকলাপ অপরের বিচার, এমন কি পাড়াসুদ্ধ লোকের আন্দোলনের বিষয় হইত। এখন ততটা হয় না এবং শহরে একই বাড়ীর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে কাহারা কি করিতেছে তাহাও জানিবার উৎসাহ বা প্রয়োজন কাহারও বড় একটা হয় না। গুরুজনদের শাসনও শিথিল হইয়া আসিতেছে, বিশেষতঃ বয়স্ক ও উপার্জনশীল যুবক-যুবতী সম্বন্ধে।

পঞ্চমতঃ, বিবাহের পূর্বে বহুদিন পর্যন্ত **কোর্টশিপের প্রথা**। পাশ্চাত্য জগতে **প্রেমই পরিণয়ে** পর্যবসিত হয়। তাই উপযুক্ত পাত্রপাত্রীকে পরস্পরকে বুঝিবার ও ভালবাসিবার সুযোগ ও সময় দেওয়া হয়। এই সময়ে উভয়ের আদর সোহাগ ও কেলিকলায় উত্তেজনা হওয়া এবং পরিণামে মিলনে পর্যবসিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

ষষ্ঠতঃ, **গর্ভসঞ্চারের ভয় প্রশমিত** হওয়া। জন্মনিয়ন্ত্রণের কলা ও কৌশল পাশ্চাত্যজগতে এখন প্রায় সর্বজনবিদিত। তাই নরনারী উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যৌন-অভিযানে অধিকতর অগ্রসর হইবে, ইহা মোটেই বিচিত্র নহে।

সপ্তমতঃ, নারীর উপার্জনের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকায় তাহাদের স্বাধীনতা ও সাহস বাড়িয়া চলিয়াছে।

অষ্টমতঃ, মনের গহনে পুরুষের নিজের রতিশক্তি সম্বন্ধে সংশয় এবং তাহা ঢাকিবার চেষ্টা অথবা নারীসম্ভোগ নেশাখোরের নেশার বস্তুর মত দুর্বার প্রয়োজনের বস্তু হইয়া উঠা।

ভারতবর্ষে ব্যতিক্রমের কারণ

যৌনপ্রবৃত্তি সকলখানেই একইরূপ তীব্র। তাই আমাদের দেশেও যুবক-যুবতীর বিবাহ-পূর্ব মিলন অল্পবিস্তর সংঘটিত হইবার কথা। তবে উপরোক্ত কারণসমূহের প্রভাবের তারতম্য এখানে লক্ষিত হইবে।

ধর্ম ও সমাজের বন্ধন এখনও অনেকটা দৃঢ় আছে। অবশ্য ইহা ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার এখানে করা হইতেছে না।

এখানে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহ বিলম্বে হয়। তাহা ছাড়া **বাল্যবিবাহের** প্রচলনই অধিক। সার্দা আইনে (Sarda Act) ইহার প্রশমনের চেষ্টায় অজ্ঞতাপ্রসূত হিড়িকে যে লক্ষ লক্ষ বাল্যবিবাহ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার বিষময় পরিণাম এখন প্রকট হইয়াছে।

জীবনে ভোগস্পৃহার আধিক্য এখানেও পরিলক্ষিত হইতেছে, যদিও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে উহার সুযোগ আপনা হইতেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

এখানে নরনারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ কম। **পর্দা প্রথা** এখনও কারাপ্রাচীরের স্থলাভিষিক্ত। ইহা শিথিল হইয়া আসিতেছে বটে, তবে নারী স্বাধীনতা এখনও অতি সামান্যভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। কোর্টশিপের প্রথা এখানে নাই, সামান্য যাহা আছে তাহা পাত্রপাত্রীকে অভিভাবক বা অভিভাবিকার সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে সাময়িকভাবে আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগ দেওয়া মাত্র। এই অবস্থায় যৌনমিলনের অবকাশ হয়ই না।

জন্মনিয়ন্ত্রণের আলোচনা এখনও সামান্য, এবং তাহাও শিক্ষিত সমাজের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ। অসংখ্য শিক্ষিত পিতামাতার ক্রমবর্ধমান সন্তানের বহর দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের গর্ভনিবারণের কৌশল আয়ত্ত করিবার সামান্য প্রচেষ্টাও নাই।

এই সকল বিবেচনা করিয়া মনে হয়, **ভারতবর্ষের যৌন-নিষ্ঠা স্বেচ্ছায় বা দায়ে পড়িয়া পালন করা হয় পাশ্চাত্যদেশের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষেত্রে।** তবে বহির্জগতের সংস্পর্শে ক্রমেই উহার পরিমাণ বা মাত্রা কমিয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। পণপ্রথার চাপে বিবাহ পিছাইয়া যাওয়ায় এবং মেলামেশার সুযোগ বাড়িয়া যাওয়ায় এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক।

বিবাহের পূর্বে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর যৌনমিলন ইন্দ্রিয়তাড়নার ফল। উহা অনেকাংশে সুযোগের উপর নির্ভর করে। গণিকারা নির্বিচারে অর্থের লোভে দেহদান করে বলিয়া যুবকেরা উহাদের ফাঁদে পড়িয়া যাইতে

পারে এবং কতক ক্ষেত্রে যায়ও। থিয়েটার ও সিনেমার অভিনেত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ রূপবান অথবা অর্থশালী যুবকদের প্রলুব্ধ করে অথবা তাহাদের প্রেম নিবেদনে সহজেই সাড়া দেয়।

বিবাহিতদের মধ্যে—বিবাহ হইয়া গেলে সাধারণতঃ **স্বামী-স্ত্রীর যৌনতৃপ্তির অবাধ সুযোগ হয়** বলিয়া অন্যদিকে মন আকৃষ্ট হইবার কারণ কম হয়। তথাপি বিবাহিত নর ও নারীর মধ্যে বিবাহেতর যৌনমিলনের পরিমাণ কম হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় না।

যুগ-যুগান্তরে

আদিম মানবের মধ্যে বিবাহের পূর্বেকার অপেক্ষা বিবাহের পরের ব্যভিচারকে বেশী নিন্দনীয় মনে করা হইত। বিবাহিতা নারীর পক্ষে পরপুরুষ-সঙ্গ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল, পুরুষের পক্ষেও নারী ভোগের পথে বাধানিষেধ আরোপ করা হইত। নারীকে পুরুষের সম্পত্তি মনে করা হইত এবং নীতিগত কারণ অপেক্ষা ইহাতেই বেশী জোর দেওয়া হইত। ব্যাবিলনীয়, হিটীয়, আসিরীয় এবং ইহুদীয় ধর্ম-বিধিতে ইহার নিদর্শন দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় এবং ইসলাম ধর্মে ইহুদীয় ধর্মের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

মধ্যযুগে ইউরোপে এবং আজিও অসভ্য জাতিদের মধ্যে বিবাহের পূর্বেকার ও পরের যৌনমিলনমাত্রকেই কদাচার বলিয়া ঘৃণ্য মনে করা হইয়াছে। বিবাহেতর যৌনমিলনমাত্রকেই কদাচার বলিয়া ঘৃণ্য মনে করা হইয়াছে। আধুনিক জগতে ও পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য কারণে এ সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন দেখা যায়।

বিবাহিত নর ও নারীর পক্ষে অপরের সহিত মিলন এখনও সমাজে নিন্দনীয় এবং আইনত দণ্ডনীয়। ধরা পড়িলে এখনও ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি এমন কি খুন জখম পর্যন্ত গড়ায়। তথাপি গোপনে অগোচরে বিবাহিত নর ও নারীর অপর পক্ষের সহিত মিলন একেবারে কম নয়। যাহারা প্রকাশ্যে এইরূপ আচরণে ভীষণ উষ্মা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহারাও আবার ব্যক্তিগত জীবনে এইরূপ করিয়াছে বা সুযোগ পাইলে করিয়া থাকে।

টারম্যান (Terman), হ্যামিলটন (Hamilton) প্রমুখ পূর্ববর্তী গবেষকদের মতবাদের উল্লেখ করিয়া ডঃ কিন্‌সেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, **প্রায় শতকরা ৫০% পুরুষ বিবাহিত অবস্থায়ও অপর নারী ভোগ করে।**

পক্ষান্তরে, ৪০ বৎসর বয়সে নারীদের মধ্যে প্রায় শতকরা ২৫ জন বিবাহের পরে অপর পুরুষের ভোগ্য হইয়াছে।

বিবাহের পূর্বে মিলনে অভ্যস্ত হইলে বিবাহের পরও এরূপ অভ্যাস থাকিয়া যাওয়া বিশেষ আশ্চর্যের কিছুই নহে। সুযোগ ও তাড়নার তারতম্যে এইরূপ মিলনের পরিমাণ ও ব্যবধান বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কেহ বা এক, কেহ বা একাধিক বার, কেহ বা মাঝে মাঝে, কেহ বা সুযোগ পাইলেই যথেষ্ট পরিমাণে এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। পতিতারা অবশ্য এইরূপ আচরণের বেশী সুযোগ করিয়া দেয়।

বিবাহের পরে পরেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে এত নিবিড় উপভোগে লাগিয়া যায় যে, তখন বিবাহেতর মিলনেব কারণ অনেকটা কম হয়। বিবাহের প্রাথমিক মোহ কাটিয়া গেলে, যখন কোন একজন অপরের কাছে কতকটা পুরাতন হইয়া যায়, তখন আস্তে আস্তে ভোগের মাত্রা মাথা.চাড়া দিয়া উঠে। লজ্জাব ভাব, সঙ্কোচ, মেলামেশায় কুণ্ঠার ভাব কাটিয়া গেলে এবং রতিসুখে অভ্যস্ত হইলে নারীরা একটু বেশী বয়সেই ঐরূপ যৌন-আচরণে সম্মত বা প্রবৃত্ত হয়। ডঃ কিন্‌সের অনুসন্ধানে ৩৪-৩৫ **বৎসর বয়সের পরেই নারীদের পদস্খলনের বেশী** উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

নারীদের পক্ষে বেশীর ভাগ বিবাহেতর যৌন-মিলনই **শুধু কখনও কখনও মাত্র হয়।** সুযোগ-সুবিধা, গোপনীয়তা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি অহরহ নাই। পুরুষের প্রমোদের জন্য গণিকাবৃত্তি যত প্রাচীন ও সুদূরপ্রসারী, নারীদের জন্য দেহ ব্যবসায়ী পুরুষ তদপেক্ষা অত্যন্ত কম। বহু দেশে নাই বলিলেই চলে। স্বামী বা স্ত্রীর অপর নারী বা পুরুষের সহিত সহবাস করা কখনও সমর্থন করা যায় কিনা, এ বিষয়ে আমেরিকার উচ্চ শিক্ষিতা কুমারীদের মতামত 'বিবাহের প্রয়োজনীয়তা' অধ্যায়ের 'যৌন নিবৃত্তির সুযোগ' অনুচ্ছেদে দেখুন।

কারণসমূহ

(১) দম্পতির **সাময়িক বিরহ।** আজকাল পূর্বের মত এক স্থানে বসিয়া গার্হস্থ্য জীবন অবিচ্ছিন্নভাবে চালাইবার সুযোগ বহু লোকেরই হয় না। আর্থিক সুযোগ-সুবিধার জন্য চাকুরী, ব্যবসা, ভ্রমণ, বাপের বাড়ী বাস, গর্ভাবস্থা, দীর্ঘস্থায়ী রোগ ইত্যাদির জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বহুদিনের জন্য ছাড়া-

ছাড়ি হইয়া থাকে। অথচ যৌনপ্রবৃত্তি পূর্বের মতই সজাগ ও সুতীব্র থাকিয়া যায়। বরং দাম্পত্য বিরহের স্মৃতি উভয়কে আরও পীড়া দেয়। এইরূপ বিরহের সময় যত দীর্ঘ হয় পদস্খলনের সম্ভাবনা ততই বাড়িতে থাকে। সৈনিক, নাবিক, ভ্রমণকারী, প্রবাসী ইত্যাদির গণিকাবৃত্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হওয়ার কথা একটু পরেই বর্ণনা করিতেছি। স্থানীয় **অবিবাহিত যুবক** অপেক্ষা **প্রবাসী** বা **ভ্রাম্যমাণ** বিবাহিত লোকেরাই অধিক সংখ্যায় বেশ্যাগমনে আসক্ত।

(২) সকল ক্ষেত্রেই যে বিবাহ **সুখের হয় এমন** নহে। কখনও কখনও স্বামী বা স্ত্রীর একের দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য অপরে অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইস্‌লামে এইরূপ ক্ষেত্রে সকর্মক ও ধৈর্যহীন বলিয়া পুরুষকে একাধিক বিবাহ করিয়াও যৌন-নিষ্ঠা পালনের আদেশ দিয়াছে। অবশ্য স্ত্রীর পক্ষে এরূপ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, বোধ হয় তাহাকে মৃদুতর কাম, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গৌরব দান করিয়া। ইহার সমাধান হিসাবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা অপ্রীতিকর হইলেও হিতকর। ভারতে নূতন হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনে অল্প কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এইরকম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা মন্দের ভাল। আশা করি উদার হৃদয় সমাজসংস্কারকগণ যাতে আরও অধিক ক্ষেত্রে এই সুযোগ হয় তাহার চেষ্টা করিয়া যাইবেন।

(৩) উভয়ে সুস্থ থাকা সত্ত্বেও **দাম্পত্য-অপ্রীতি, কলহ-বিবাদ** অনেক সময়ে একজনকে অপরের প্রতি বিরক্ত ও বিরূপ করিয়া তোলে। এই অবস্থায় অতৃপ্ত যৌন-অংশীদার ব্যভিচারের সুখ খুঁজিবার প্রয়াস পাইতে পারে। মন্ত্র পড়িয়া বিবাহসূত্রে গ্রথিত হইয়া গেলেই ভবিষ্যৎ জীবন একেবারে নিষ্কণ্টক উপদ্রবহীন হইয়া গেল, এমন নহে। স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক বোঝাপড়া দাম্পত্যজীবনের প্রতিদিন প্রতিক্ষণে হইতে থাকে। **মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার কলাকৌশলও অনেকটা শিক্ষণীয় বিষয়। এই পুস্তকের উদ্দেশ্যই উহার শিক্ষাবিধান।**

(৪) স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরম তৃপ্ত থাকিলেও (বিশেষত পুরুষের) **একে অতৃপ্তির** জন্যও ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীর পক্ষে অবশ্য দেহদান করিবার বিরুদ্ধে তাহার মৃদুতর কাম, লজ্জাশীলতা, গর্ভভয়, দুর্নামভীতি, সংযম, প্রেমের প্রয়োজন, রুচি ইত্যাদি কাজ করে। অর্থাৎ সাধারণতঃ স্ত্রীলোক দেহদান

করে ভালবাসিবার পরে। স্বামিগতপ্রাণার পক্ষে সচরাচর অপরকে ভালবাসিবার অথবা দেহদান করিবার কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু পুরুষের বেলায় ততটা নহে। তাহার প্রবৃত্তিই বৈচিত্র্যলোভী। সে বিবাহিত স্ত্রীকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসা সত্ত্বেও যে-কোন সহজলভ্য স্ত্রীলোক উপভোগ করিতে পারে। ইহাকে সে সাময়িক স্ফূর্তিবিশেষই মনে করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর প্রতি প্রেম বা শ্রদ্ধা হারায় না। শুধু নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত পুরুষের বারনারীগমন বা অন্য প্রকারের বিবাহেতর যৌনমিলনে ব্রতী হওয়া বিচিত্র নহে।

পুরুষেরা, নিয়ন্তা হিসাবে স্বাধীনতা প্রমত্ততায় নিজেদের উপভোগের জন্য বহুবিবাহের প্রথা চালাইয়া আসিয়াছে। সলোমনের হাজার পত্নী ও উপপত্নী, দায়ুদের শত পত্নী ইস্‌লামের চারি স্ত্রীর অধিক রাখা অবৈধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও বাদশাহ, নওয়াবদের বহু সংখ্যক বেগম রাখিয়া উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবন যাপন, হিন্দু-সমাজে এবং অনেক প্রাচীন অসভ্য ও অর্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে বহু-বিবাহ—এই সকলই পুরুষের একে-অতৃপ্তির উদাহরণ। স্ত্রীলোক স্বাধীন রাজ্ঞী হিসাবে অধিষ্ঠিতা থাকিলেও এতদূর করিতে পারিত বলিয়া মনে হয় না।

বহুবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া পুরুষের বহু স্ত্রী উপভোগকে বিবাহেতর যৌনমিলন বলা হইত না। কিন্তু মুশকিল হইত এই সকল স্ত্রীলোকদের লইয়া। একজন পুরুষের পক্ষে এতগুলিকে তৃপ্তিদান সম্ভবপর হইত না, তাই স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা অসাবধানতার সুযোগ পাইলে ইহাদের পদস্খলনের সম্ভাবনা বেশী থাকিত। বিবাহ ছাড়া শুধু কামলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য দাসী বা রক্ষিতা রাখার প্রথাও বড়লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বেশ্যার সঙ্গে ইহাদের বিভিন্নতা শুধু এই যে, গণিকারা সকলের, রক্ষিতা শুধু তাহার কর্তা বা রক্ষকদের উপভোগের পাত্র। অবস্থাপন্ন লোকেরা নিজেদের বাড়ীতে বা বিবাহিত স্ত্রীর ভয়ে বাগানবাড়ী বা প্রমোদাগারে ইহাদের ভরণপোষণ করিত। এমন কি, ইহুদীদের ধর্মপ্রণেতা মুসার একটি রক্ষিতা ছিল এবং জেকবের দুইটি ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

রক্ষিতার কর্তব্য ছিল রক্ষকের মনোরঞ্জন করা কিন্তু খাওয়া-পরা কিংবা বাঁধা মাহিয়ানা ছাড়া অন্য কোন কিছুতে তাহার অধিকার ছিল না। সামান্য কারণে তাহাকে ত্যাগ করা চলিত।

চিরকুমার রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের নিজেদেরই অনেকের এইরূপ রক্ষিতা থাকিত। সেন্ট আগষ্টাইন এই প্রথা সম্বন্ধে কতকটা উদার ছিলেন, কারণ তাঁহার নিজেরই প্রথম জীবনে একটি রক্ষিতা ছিল।

ডঃ কিন্‌সেদের উদ্ঘাটিত নিম্নলিখিত তুলনামূলক তথ্যাদি উল্লেখযোগ্য :

বিবাহেতর যৌনমিলন

উৎপত্তি ও উত্তরাধিকার	নারী	নর
প্রাণীদের মধ্যে প্রবল পক্ষ বেশী যৌন-সাথী পায়	না	হাঁ
দুর্বলের পক্ষে সাথী পাওয়া দুষ্কর	না	হাঁ
যৌন-সাথী ছাড়া অপরক্ষেত্রে যৌনমিলন চায়	কখনও কখনও	হাঁ
নূতন ক্ষেত্রে উত্তেজনা বেশী হয়	হাঁ	হাঁ
অপর কাহারও সাথে যৌনমিলনে বাধা দেয়	সাথী	অপর নরেরা
প্রসার		
পূর্ব হইতে আজকাল বেশী হয়	হাঁ	হাঁ
ধর্মভাবের শিথিলতার জন্য বেশী হয়	হাঁ	হাঁ
একই পক্ষের সহিত	৪১%	—
দুই হইতে ৫ জনের সহিত	৪০%	—

(১৮)

গণিকাবৃত্তি (Prostitution)

উৎপত্তির কারণ

বিবাহেতর যৌনমিলনের সব চেয়ে বেশী সুযোগ যোগায় **গণিকাবৃত্তি**। বারনারীর কুহকে অবিবাহিত কিশোর হইতে বিবাহিত বৃদ্ধও পড়ে। এই ব্যবসায় সমাজে একটা **পুরাতন অনুষ্ঠান**; ইহার প্রসার ও প্রভাব সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌দিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

সমাজ-গঠনের গোড়াপত্তন হইবার সময় হইতেই যে মানুষ তাহার যৌন-সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, **বিবাহপ্রথাই** তাহার প্রধান নিদর্শন। মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে এই প্রথাকে সুষ্ঠু করিবার চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু বিবাহ সকল ক্ষেত্রে সুখের হয় নাই। সর্বত্রই যে ইহা মানুষের যৌন-কামনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। ইহার প্রমাণ এই জঘন্য **অসামাজিক বৃত্তি**।

ইহার কারণ বহু। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সুখহীন বিবাহ ইহার অন্যতম কারণ এবং দাম্পত্য-অপ্রীতি এই কুপ্রথার ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছে। প্রধানতঃ বিধবা, ধর্ষিতা, সমাজপরিত্যক্তা ও দরিদ্রা নারী এই ব্যবসায় করিয়া **জীবন ধারণ** করিতেছে।

এই বৃত্তির **সামাজিক আবশ্যকতাও** অনেকে খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করিয়া থাকেন। আবশ্যকতা থাকুক বা না থাকুক, প্রাচীনকাল হইতে প্রায় সর্বত্র উহার অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই প্রথা যে আমাদের সমাজ-জীবনের একটা জটিল সমস্যা ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং আমরা এই ব্যবসায় **জন্ম, প্রসার, কারণ, প্রকৃতি ফল ও প্রতিকারোপায়** সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

ইহা **অতিপুরাতন হইলেও** সভ্যতার চেয়ে বেশী পুরাতন নহে, অর্থাৎ ইহা সভ্যতারই ফল। জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষ যেদিন দীক্ষা লইয়াছে, সেই দিন হইতেই মানবসমাজের এক কোণে বেশ্যা তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সভ্যতার জন্মের পূর্বে যতদিন আদিম মানুষের মধ্যে কোনও-না-কোনও প্রকারে যৌনস্বাধীনতা প্রচলিত ছিল, যৌননির্বিশেষত্বের দলগত

বিবাহ বা গ্রুপ ম্যারেজ অথবা বহু বিবাহ ও উপপত্নীত্বের আকারে তদানীন্তন গোষ্ঠী দল বা সমাজ পুরুষের যৌনস্বেচ্ছাচারিতাকে মানিয়া লইত, ততদিন ইহার প্রাদুর্ভাব ততটা ছিল না ; কারণ, আবশ্যকতাও ততটা ছিল না। কিন্তু বিবাহপ্রথা প্রবর্তনের দ্বারা, বিশেষ করিয়া একপত্নীর দ্বারা,—যেদিন হইতে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র মানুষের যৌনস্বাধীনতাকে অনেকটা খর্ব করিয়া আনিল, সেই দিন এই ব্যবসায় জন্মলাভ করিল।

ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম প্রভৃতি **সমস্ত প্রাচীন সভ্যদেশে এই বৃত্তি নানা আকারে প্রচলন ছিল।**

ব্যাবিলনে ধর্মানুষ্ঠানরূপে

ব্যাবিলনে ইহাকে পুণ্যের কার্য মনে করা হইত। সেজন্য প্রত্যেক গৃহী নারীকেও জীবনে অন্তত একবার অর্থের বিনিময়ে ব্যভিচার করিতে হইত। হেরোডোটাস লিখিয়াছেন যে, মাইলিত্তা (ব্যাবিলনীদের রতিদেবী (Mylitta) দেবীর মন্দিরে সমস্ত নারীকেই জীবনে অন্তত একবার যাইতে হইত। তাহারা সেখানে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সারি দিয়া বসিয়া থাকিত। মন্দিরপ্রাঙ্গণে পুরুষের বিশাল জনতা হইত। সেই জনতা হইতে পুরুষেরা অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ পছন্দমত নারীর কোলে রৌপ্যমুদ্রা নিক্ষেপ করিত এবং বলিত, "তোমার উপর মাইলিত্তার অনুগ্রহ বর্ষিত হউক।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নারীকে রৌপ্যমুদ্রা-নিক্ষেপকারী পুরুষের হাত ধরিয়া নির্জন স্থানে গিয়া উপগত হইতে হইত। এই ব্যাপারকে ব্যাবিলনীরা ধর্মানুষ্ঠান মনে করিত বলিয়া পুরুষের রূপ বা মুদ্রার পরিমাণ বিচার করিবার কোনও অধিকার নারীর ছিল না। সে সর্বপ্রথম মুদ্রানিক্ষেপকারীর সঙ্গে যাইতে বাধ্য থাকিত। সুন্দরী রমণীরা অতি সহজেই মুক্তি পাইত, কিন্তু অসুন্দরীগণকে মুদ্রানিক্ষেপ-কারীর অপেক্ষায় অনেক সময় সপ্তাহ, মাস এমন কি দু'চার বৎসর অবধি বসিয়া থাকিতে হইত। কারণ, কোনও পুরুষের সহিত মিলিত না হইয়া গৃহে ফিরিবার নিয়ম ছিল না।

ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াও ব্যাবিলনে নানাপ্রকারের যৌন-অভিসার চলিত।

ভারতবর্ষে—ভারতবর্ষেও বারনারীর স্থান বিশেষ নগণ্য ছিল না। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অপর দেবতাদের চিত্ত-বিনোদানার্থে নৃত্যপটিয়সী, চির-যৌবনা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরীগণকা আছে, সুতরাং পৃথিবীতেও

থাকা আবশ্যক বলিয়া সকলেই বিবেচনা করিত। বড় বড় তীর্থস্থানের দেব-মন্দিরসমূহে যে সমস্ত দেবদাসী থাকিত তাহাদের সহিত পুরোহিত বা নাগরিকদের অবৈধ সংসর্গ চলিত, অথবা উহাদিগকে দিয়া বেশ্যাবৃত্তি করাইয়া মন্দিরের পুরোহিতরা অর্থোপার্জন করিত।*

গ্রীসে—গ্রীকদের রতিদেবী **ভিনাস ও এফ্রোডাইট** (Aphrodite) বারবিলাসিনীদের প্রতীক ছিলেন। প্রকাশ্য মাঠে উহার মূর্তি স্থাপন করা হইত। প্রতি মাসের চতুর্থ দিন দেবদাসীর উপার্জিত অর্থে উহার মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ হইত। কোরিন্থ (Corinth)-এর মন্দিরেই সহস্রাধিক দেবদাসী থাকিত, কারণ, মেয়েদের ঐ দেবীর নামে উৎসর্গ করা হইত। উহারা পুণ্য অর্জন করিবার মানসেই বেশ্যাবৃত্তি করিত।

এথেন্সবাসী সোলন (Solun) সমগ্র গ্রীসের আইনপ্রণেতা ছিলেন। তিনি আইন করিয়াছিলেন যে, সমস্ত বেশ্যালয় রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং লভ্যাংশ **এফ্রোডাইট** দেবীর মন্দিরাদি নির্মাণ ও সংস্কারকার্যে ব্যয়িত হইবে। সোলনের সময় গ্রীক রমণীরা স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি অবলম্বন করিত না, বিজিত সম্প্রদায় সমূহের নারীগণকেই জোর করিয়া সরকারী গণিকালয়ে রাখা হইত। অভিজাতভোগ্যা দু'একজন উচ্চশ্রেণীর সুন্দরী ব্যতীত আর সকলের জীবন বড়ই দুর্বিষহ ছিল। উহাদের দেহ রাষ্ট্রের সম্পত্তি ছিল বলিয়া এবং পুলিস কর্মচারী উহাদের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিত বলিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক অসুখ বিসুখ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইত। পথিকগণকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য উহাদিগকে দ্বারদেশে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়াইয়া বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করিতে হইত। তথাপি খরিদ্দার না জুটিলে পথিকগণকে ভুলাইবার জন্য পথিপার্শ্বে রতিক্রিয়া করিতে হইত।

---

* কোনও কোনও ধর্মপ্রাণ অন্ধবিশ্বাসী পিতামাতা (অনেক সময়ে নিঃসন্তান অবস্থায় কৃত মানত রক্ষার্থে) নিজেদের কন্যাকে দেবতার সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহার দাসী অর্থাৎ দেবদাসী করিয়া দিতেন। দেবদাসীরা দেবমূর্তির সম্মুখে নৃত্যগীত করে। বিধবাদের মত তাহাদের কাছেও খাঁটি সতীত্ব বজায় রাখিয়া চলিবার প্রত্যাশা করা হয়, এবং চরিত্রদোষ প্রকাশ পাইলে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তথাপি স্বাভাবিক প্রভাবে অনেকেরই গোপনে পুরোহিত, পাণ্ডা অথবা দর্শনার্থীর সহিত অবৈধ সম্পর্ক ঘটে।

বলা বাহুল্য, বয়ঃপ্রাপ্তা যুবতীদের অভিভাবকহীন অবস্থায় প্রলোভনের সম্মুখে ফেলিয়া রাখা গুরু হন বা সমাজের একান্তই অনুচিত। এইরূপ অন্ধবিশ্বাসের অবসান হউক, ইহাই আমরা কামনা করি। কয়েক বৎসর পূর্বেও দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা ছিল। মাদ্রাজ আইনসভার এক মহিলা সদস্যার চেষ্টায় আইন পাস হইয়া রহিত হইয়াছে।

হেতায়রা (Hetaira) নামে এক শ্রেণীর উঁচুদরের বারনারীও গ্রীসে ছিল। রাজপুরুষ, সেনাপতি, কবি, দার্শনিক প্রভৃতি উঁচুদরের লোকের যোগ্যা হইবার জন্য ইহাদের শিক্ষিতা ও কলকুশলা হইতে হইত। ইহারা অভিজাতদের সংসর্গে ক্রমশ আরও সংস্কৃতিসম্পন্না হইয়া উঠিত। ইহাদের বাসগৃহ ও বেশভূষা আড়ম্বরপূর্ণ ছিল।

গ্রীক সভ্যতার অন্য সহচরী ছিল উপপত্নী। ডেমস্থিনিস (Demosthenes) এই প্রসঙ্গে বলেন, "হেতায়রা আমাদের বিলাসিতার জন্য, উপপত্নীরূপে দৈনিক ব্যবহারের জন্য; স্ত্রী আইনস্বীকৃত পুত্রকন্যার জন্য। স্ত্রী অন্তঃপুরে অনুগত থাকিয়া বৃদ্ধা হইবেন।"

উপপত্নীর গর্ভের সন্তান নাগরিক অধিকার পাইত না এবং সে পদমর্যাদায় স্ত্রীর অনেক নীচে থাকিত বলিয়া স্ত্রী তাহাকে ততটা হিংসা করিত না।

রোমে—রোমের গণিকাদের অধিকাংশ ছিল বিজিত জাতিসমূহের নারী। রোমীয় বেশ্যালয়ে তদানীন্তন সমস্ত জাতির নারী দৃষ্ট হইত। রোমক সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময় **নারী-পুরুষের একত্রে উলঙ্গস্নান** করিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। ইহার ফলে ইটালীর সমস্ত হাম্মামগুলি ব্যভিচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমগ্র ইটালীতে এই বৃত্তির বেশী প্রচলন ছিল যে, রোমের সমস্ত সার্কাস, থিয়েটার, মেলা ও তীর্থস্থান পণ্যা স্ত্রীলোকে পূর্ণ হইত। তাহাদের স্বাধীনভাবে রাস্তার সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া নানা কৌশলে শিকার ধরিতে দেখা যাইত। দেশের ইতর-ভদ্র সমস্ত লোক বারাঙ্গনা ভবনগুলিকেই একমাত্র প্রমোদক্ষেত্র মনে করিত এবং নিজ নিজ আয়ের বিপুল অংশ সেখানে ব্যয় করিত। ফলে বস্তুতই সেখানকার আমোদপ্রমোদ ও সুখসুবিধা দর্শনে বহু বিবাহিত বড়ঘরের স্ত্রীও দেহ বিক্রয় করিত। বড় বড় সম্রাটের স্ত্রীরাও নির্জন স্থানে বাড়ী ভাড়া করিয়া সম্রাটের অজ্ঞাতে ঐরূপ করিতেন। সম্রাট ক্লডিয়াসের মহিষী **মেসালিনা** এই অপরাধে সম্রাটের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে—মধ্যযুগে* পৃথিবীর সর্বত্রই এই বৃত্তির খুব প্রসার ছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সমস্ত দেশেই কুস্থান-সমূহ শিল্পকেন্দ্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হইয়াছিল। সৈন্যদলের উপভোগের

* ৫০০ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে ইউরোপ অজ্ঞানের অন্ধকারে ছিল।

জন্যও একদল ভ্রাম্যমাণ গণিকা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রুসেডের (ধর্মযুদ্ধ) সময় এই প্রথা জন্মলাভ করে এবং তাহা শেষ হইয়া যাইবার পরও বহুকাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকে।

ইংলণ্ডে—অন্যান্য দেশের মত ইংলণ্ডেও বহু প্রাচীন কাল হইতে নারী-দেহ ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু ওখানে বারাঙ্গনারা অন্যান্য দেশের মত রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। মধ্যযুগে ইংলণ্ডের গণিকালয়সমূহ সরকারী স্নানাগার-সমূহে কেন্দ্রীভূত হয়। ১৫৪৬ সালে হেনরী (৮ম) আইন দ্বারা উক্ত ব্যবসা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। এই নিষেধাজ্ঞায় সুফল না হইয়া কুফলই বেশী হইল। বেশ্যারা সারা লণ্ডনে ছাড়াইয়া পড়িল।

১৬৫০ সালে আইন করিয়া আরও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু ইহাতেও গোপনে বেশ্যাবৃত্তি চলিতেই থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অধিবাসীদের সহিত মেলামেশায় ফরাসী রীতিনীতি ইংলণ্ডেও ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইল। উহাদের অবাধ যৌন-আচরণের প্রভাব ইংলণ্ডেও প্রতি-ফলিত হইল। লণ্ডনের 'French Quarter' বা 'ফরাসী পাড়া' দুর্নীতির কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

ইহার পর থিয়েটারগুলিতে রূপজীবিনীদের অভিসার চলিত। ১৮২০ হইতে ১৮৩০ সালে সরকারী রাস্তাগুলিতে অসংখ্য দেহ-ব্যবসায়িনী ঘোরাফেরা করিত এবং আকারে-ইঙ্গিতে শিকার ধরিতে চেষ্টা করিত। জাহাজের ডকসমূহে তাহারা জমায়েত হইত, এমন কি নাবিকদের ফুসলাইবার জন্য এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় গিয়া জাহাজ ভিড়িবার পূর্ব হইতে হাজিরা দিত।

নাবিক ও সৈনিকদের মধ্যে রতিজ রোগসমূহের ভয়াবহ প্রসার হওয়ায় ১৮৬২ সালে একটি তদন্ত কমিটি বসে। এই কমিটি গণিকাদের হাসপাতালে চিকিৎসিত হইবার পরামর্শ দেন। ১৮৬৪ সালে আইন করিয়া তাহাদের ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তারদের অবহেলা ও পুলিসের অত্যাচারের অভিযোগে অনেকে এই আইনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। ইহার পর নানা কমিটি নানা সিদ্ধান্ত করেন ও নানা আইন হইয়া আবার নানাভাবে সংশোধিত হয়।

বর্তমানে ইংলণ্ডে ব্যাপার এইরূপ দাঁড়াইয়াছে :

১৩ বৎসর বয়সের কম বয়স্কা বালিকার সহিত সহবাস গুরুতর অপরাধ। ১৩ হইতে ১৬ পর্যন্তও বালিকার সহিত সংসর্গ অপরাধ। ২১ বৎসরের কমবয়স্কা

বালিকাকে অসদুদ্দেশ্যে রাখা বা পিত্রালয় হইতে সরানো, বেশ্যাবৃত্তির জন্য ঘরভাড়া দেওয়া বা আখড়া রাখা অপরাধ। রাস্তায় পথিকদের কথাবার্তায় ভুলাইবার চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। নিভৃতে বা গোপনে বেশ্যাবৃত্তি করিলে আইনতঃ কোনও বাধা দেওয়া হয় না।

বর্তমানে ইংলণ্ডে পেশাদারদের অপেক্ষা অভিসারিকাদের চাহিদা বেশী। আকারে-ইঙ্গিতে বা আলাপ-আলোচনায় পুরুষ জানিতে পাবে যে, সামান্য উপহাব, থিয়েটার দেখানো, মোটব ভ্রমণ, ডিনার ইত্যাদির বিনিময়েই যুবতীব সঙ্গ করা যাইবে। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল মেয়েরা শুধু স্ফূর্তির জন্যই দেহদান কবে। গ্রামাঞ্চলে যুবকযুবতীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ এবং গর্ভনিবারণেব কৌশলের প্রসারে যৌন-অভিসার খুবই চলিয়া থাকে। ইংলণ্ডে দেহ-ব্যবসায়ী বালকদেবও প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে। লণ্ডনে ইহাদের কয়েকটি আখড়া আছে। পিকাডিলী সার্কাস (Picadilly circus) এব আশে পাশে শহরের ছেলেরা এবং হাইড পার্ক (Hyde Park) এব আশেপাশে সৈনিকেবা ব্যবসা কবে। সৈন্যাবাস, নাবিকদেব বন্দর, বেলওযে স্টেশন ইত্যাদির চাবিপার্শ্বে ইহাবা ঘোবাফেরা কবে। লণ্ডনেব বাহিবে কতক কতক মফঃস্বল শহরেও ইহাদেব ব্যবসা বাড়িয়া উঠিতেছে।

জাপানে—জাপানে সপ্তদশ শতাব্দীব পূর্ব পর্যন্ত গণিকাবৃত্তি অসংবদ্ধ এবং পতিতারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। ঐ শতাব্দীতে তাহাদের স্থানবিশেষে একত্রিত কবিবাব চেষ্টা হয। ইযোডোতে বহুসংখ্যকেব থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। তখন হইতেই এই বেশ্যাবৃত্তি লাভজনক ব্যবসাযে পরিণত হয। ১৬১২ সালে একটা বিশিষ্ট কেন্দ্রের জন্য আবেদন করা হয এবং ফুকিয়া মাচি (Fukiya Machi) তে একটা কাদামাটি ও জঙ্গলে পূর্ণ জায়গা এজন্য দেওয়া হয়। বহু খরচপত্র করিয়া এই জায়গাটি সুরম্য শহরে পরিণত করা হয় এবং ইহার নাম **য়োশিওয়ারা** (Yoshiwara) বাখা হয়। বৎসর ত্রিশেব পর গভর্নমেণ্ট ঐ জায়গাটি খালি করিয়া দিবার হুকুম দেন। বহু আবেদন-নিবেদনে উহার সমতুল্য অন্য একটি জায়গা দেওয়া হয়। সরাইবার সময়ে আগুন লাগিয়া সেখানকাব বাড়ীঘর ভস্মীভূত হয়।

নূতন জায়গাটিও আসল জায়গার নিকটবর্তী। প্রথম প্রথম গণিকা শ্রেণীবিভাগ করা ছিল এবং শ্রেণী অনুযারী ভাড়ারও বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইত। ১৮৭২ সালে এই শ্রেণীবিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হয়। জায়গাটি পরিপাটি,

বাড়ীঘর আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত এবং অধিবাসিনীরা উঁচুদরেরই বলিয়া খ্যাত।

য়োশিওয়ারা ঠিক ব্যবসারীতি অনুসারেই পরিচালিত ছিল। দালাল ও মধ্যবর্তিনীদের দ্বারা কথাবার্তা ঠিকঠাক করা হইত। প্রতারণা বা অত্যাচারের সম্ভাবনা খুব কম থাকিত। পুরুষদের যত্ন করিবার এবং এমন কি নিজের স্বামীর মত দেখিবার উপদেশ মেয়েদের দেওয়া হইত এবং অনেকাংশে উহা তাহারা পালনও করিত।

আমাদের নিকট আশ্চর্য বোধ হইতে পারে যে, ওখানকার মেয়েরা কিছুকাল পরে সমাজে ফিরিয়া গিয়া স্থান পায় এবং রীতিমত বিবাহ করিয়া স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে পারে। যাহারা বিবাহ করে না তাহারাও নার্স বা অন্যবিধ চাকুরী করিতে পারে। প্রাথমিক গণিকাবৃত্তির জন্য সমাজে তাহাদের একটুকুও অনাদর বা অবহেলা করা হয় না। মানুষ হিসাবে তাহারা যে ঘৃণ্য বা হেয় নয় এমন ধারণা বোধ হয় আধুনিককালে কেবলমাত্র জাপানেই আছে। য়োশিওয়ারায় বৎসরে নানা উৎসব পালন করা হয়। তখন মেয়েরা সাজ-সজ্জায় ভূষিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ করে। ইহাদের নৃত্যগীত সাজসজ্জায় স্থানীয় বিশেষ নজর রহিয়াছে।

সেখান হইতে গভর্নমেণ্টের প্রচুর আয় হয়। সরকারী ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত পরীক্ষা এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। রতিজ রোগের প্রকোপ খুব কম। উঁচু শ্রেণীর মেয়েদের ফটো দেখিয়া পছন্দ করিতে হয়, চাক্ষুষ দেখাদেখি বা দরাদরির প্রথা নাই। নীচু শ্রেণীর মেয়েরা অবশ্য পছন্দ হইবার জন্য জানালার ধারে বসিয়া থাকে। রাত্রি দশটা পর্যন্ত সদর দরজা ও বারোটা পর্যন্ত ছোট একটা দরজা খোলা থাকে। তারপর সকাল পর্যন্ত আর প্রবেশ করিবার বা বাহির হইবার উপায় থাকে না। উহার মধ্যে ভাল হোটেল আছে। হোটেলগুলিতে খাইবার বন্দোবস্তের সুনাম আছে। বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে গমন করে, বিদেশী ভ্রমণকারীরাও ইহাদের একটা বড় অংশ।

স্বতন্ত্র বাসকারিণী নৃত্যগীতে পটু গাইশা (geisha) নামে লাইসেন্স করা গণিকাও আছে এবং দোকান পাট হোটেল ইত্যাদির দাসী-চাকরাণীরাও পুরুষসঙ্গ করে। শেষোক্ত ব্যাপার প্রায় সকল দেশের বড় শহরগুলিতে দেখা যায়।

বেশ্যা কাহাকে বলে

উপরে এই বৃত্তির যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া হইল, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীনকালের ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের গণিকাবৃত্তির প্রকারগত কোনও পার্থক্য নাই। ডাঃ ইভান ব্লখ (Iwan Bloch) এই বৃত্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন, **যে পুরুষ বা নারী অর্থের বিনিময়ে বিনা নির্বাচনে একাধিক লোককে যৌন-উদ্দেশ্যে দেহদান করিয়া থাকে,** তাহাকে **বেশ্যা** কহে। প্রাচীনকালে যাহা ছিল, এখনও এই বৃত্তির স্বরূপ মোটামুটি তাহাই আছে—এখনও অর্থের বিনিময়ে দেহদান করাকেই গণিকাবৃত্তি কহে। এই সংজ্ঞা অনুসারে :

(১) উপপত্নী গণিকা নহে। কারণ, সে মাত্র একই লোককে দেহদান করে।

(২) রতিসুখের সন্ধানে যে স্ত্রীলোক একাধিক লোকের সহিত সহবাস করে সেও গণিকা নয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে সে 'বিনা নির্বাচনে' ঐরূপ করে না।

(৩) অর্থ, উপহারাদি এবং সুবিধা লাভের জন্য বিশিষ্ট দুই-একজনকে দেহদান করিলেও উপরোক্ত কারণে উহাকে গণিকাবৃত্তি বলা যায় না।

(৪) পুরুষ অর্থ বা পুরস্কারের বিনিময়ে যে কোনও পুরুষকে দেহদান করিলে বা বিনা নির্বাচনে নারীসঙ্গ করিলে তাহাকে দেহব্যবসায়ী পুরুষ (বা বালক) বলা যায়। প্রথম প্রকারের বহু লোক বিশেষ বিশেষ জায়গায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক খুব কম।

(৫) নারী অর্থ বা পুরস্কারের বিনিময়ে যে কোনও নারীর সমকাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলে তাহাকেও বেশ্যা বলা যায়। ইহাদের সংখ্যাও নগণ্য।

প্রাচীনকালে এই বৃত্তির প্রসারলাভের কারণ

ইহার প্রধান কারণ এই ছিল যে **বিবাহিতা স্ত্রীকে পুরুষেরা প্রমোদ-সঙ্গিনী মনে করিত না। সন্তান উৎপাদনের জন্য নিতান্ত যন্ত্র-চালিতবৎ স্ত্রীসঙ্গম** করা ছাড়া পুরুষ স্ত্রীর সহিত আর বেশী কিছু করিত না। অধিকন্তু বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানপালন ও গৃহকর্ম সম্পাদনই প্রধান, এমন কি একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই দুইটি কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া প্রথমত তাহার পক্ষে সব সময়ে ফিটফাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা সম্ভবপর হইত না, দ্বিতীয়ত তাহার প্রমোদ করিবার অবসরও ছিল না। সেইজন্য

প্রাচীনকালে—শুধু প্রাচীনকালেই বা বলি কেন, আমাদের দেশে আজিও—বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সহিত প্রকাশ্যভাবে মেলামেশা করা, প্রাচীনদের দ্বারা বেহায়াপনা বা 'ছিনালী' বলিয়া বিবেচিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং স্বভাবতই বিবাহিতা স্ত্রী ছিল কর্তব্যসঙ্গিনী, এবং গণিকা ছিল প্রমোদসঙ্গিনী। সেইজন্য প্রাচীন সভ্যদেশসমূহে নৃত্যগীত, ললিতকলা, চিত্রবিদ্যা, এমন কি বিদ্যাচর্চা পর্যন্ত ইহাদের একচেটিয়া ছিল, বিবাহিতা নারীরা বিদ্যাচর্চা করিত না, গৃহিণীপনায় বিদ্যার কোনও প্রয়োজন নাই মনে করিত।

কেন নারী এই বৃত্তি অবলম্বন করে

এই প্রথাব কাবণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অধুনা বহু বিশেষজ্ঞ বেশ্যা-মনোবৃত্তি বুঝিবাব চেষ্টা কবিতেছেন। আমেরিকার ডাঃ উইলিয়াম স্যাঙ্গার দুই হাজার গণিকাকে তাহাদেব এই বৃত্তি গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই দুই হাজাবেব মধ্যে ৫১৩ জন যৌনবাসনার তীব্রতা, ৫২৫ জন দারিদ্র্য, ২৫৮ জন পুরুষেব প্রতাবণা, ২৮১ জন মদ্যপান, ১৬৪ জন স্বামী ও পিতামাতার অত্যাচাব, ১২২ জন বিনাশ্রমে সুখেব লালসা, ৮৪ জন কুসংসর্গ, ৭১ জন বৃদ্ধা প্রবোচনা, ২৯ জন আলস্য, ২৭ জন ধর্ষণ, ১৬ জন বিদেশগামী জাহাজের প্রলোভন এবং ৮ জন বোর্ডিংহোমে ধর্ষণ নিজেদের ঐ জীবনেব হেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থলেই নারী **যৌনবাসনার** অতৃপ্তি হইতে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ কবে।

ডাঃ ফোরেলেব সহিত ডাঃ স্যাঙ্গাবেব গবেষণার ফলেব অনেকটা মিল দৃষ্ট হয়। ডাঃ ফোবেলেও বলিযাছেন যে, ইহাদের মনোবৃত্তি অদ্ভুত। এই বৃত্তি হইতেই নারীজাতিব রহস্যময়তা প্রমাণিত হয়। নারীজাতি স্বভাবত সংযমী, লজ্জাশীলা বিনয়ী ও শিষ্টাচাবসম্পন্না। কিন্তু গণিকাদের নির্লজ্জতা, অসংযম ও যৌনবীভৎসতা নাবীজাতিব সাধাবণ চবিত্রেব সম্পূর্ণ বিপবীত। শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা যৌনব্যাপারে পবম লজ্জাশীলা নারীও কিরূপ যৌন-বীভৎসতা আয়ত্ত করিতে পারে. ইহাবা তাহাব 'জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ইহাদের আচরণ-দর্শনে এইজন্যই অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, নারীজাতির লজ্জা একটা ভণ্ডামি মাত্র। উহার মধ্যে যদি লেশমাত্র আন্তরিকতা থাকিত, তবে নারী এই বৃত্তি গ্রহণ করিয় অমন নারীচরিত্রবিরোধী নির্লজ্জতা আয়ত্ত করিতে পারিত না।

কিন্তু ইঁহারা নারীর প্রতি সুবিচার করেন নাই। সম্ভবত তাঁহারা অল্প কয়েকজন গণিকা দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা নারী-চরিত্রের একটা বিরাট দিকের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। সে দিকটি এই যে, চিরকাল নারীকে পরের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে বলিয়া **যে-কোনও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলার ক্ষমতা** পুরুষের চেয়ে নারীর অনেক বেশী। খাপ খাওয়াইয়া চলিবার এই অসাধারণ ক্ষমতাবলেই নারী উক্ত ব্যবসায়ের বীভৎসতা ক্রমশ (সহজে বা শীঘ্র নহে) আয়ত্ত করিতে পারে। তবে নারীর এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য তাহার গার্হস্থ্যজীবনের চরিত্রে কটাক্ষ করা উচিত হইবে না।

যাহা হউক, দাম্পত্য-জীবনের অতৃপ্তি অসন্তোষের এবং স্বামীর অত্যাচারের জন্য যে বহু নারী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, ইহা সত্য। আমাদের **দেশে অকালবৈধব্য, বালবিধবাদের উপর বলপ্রযুক্ত ব্রহ্মচর্য, বৃদ্ধের তরুণী বিবাহ,** প্রবৃত্তির বশে কুমারী বা বিধবার দৈবাৎ পদস্খলন অথবা গৃহে অত্যাচার বা লম্পট কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া গৃহত্যাগ, কিংবা ধর্ষিত হওয়ায় বিতাড়িত হওয়া, **স্বামীর দুর্ব্যবহার** প্রভৃতি কারণেই দেহব্যবসায়িনীদের দলবৃদ্ধি করিতেছে।*

সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ **দারিদ্র্য**। আমাদের দেশে একটি কথা আছে: **অভাবে স্বভাব নষ্ট**। পুরুষের বেলায় চুরি, ডাকাতি, অপরের পয়সা আত্মসাৎ ইত্যাদি যাবতীয় অপরাধের প্রধান উৎসই **অভাব**। নারীর বেলায়ও প্রায় তাই। অন্য সাধু উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে না পারিলে অগত্যা সতীত্বকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হওয়া বিচিত্র নহে। এই শ্রেণীর গণিকাদের ঘৃণা অপেক্ষা সহানুভূতিই পাওয়া উচিত।

ইরমা ট্রল-বরোষ্টিয়ানী (Irma Troll-Borostiani) বেশ্যাদের দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী উক্তি করিয়াছে: "এই অভাগিনীদের গিয়া জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা স্বেচ্ছায় এই অপকর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন কি না? প্রায় সকলেই আপনাকে কি করিয়া অভাব, কর্মচ্যুতি, জঠরজ্বালা ও জীবিকার অভাব তাহাদিগকে পথে বসাইয়াছে তাহার, অথবা কি করিয়া প্রণয় ও পদস্খলন হওয়ায় এবং ধরা পড়িবার ভয় তাহাদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া অসহায়

* শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'নারীর মূল্য' দেখুন।

ও নিঃসম্বল অবস্থায় এমন পাপের কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহা হইতে আর প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই—এই সকল কাহিনী শুনাইবে।”

গণিকার শ্রেণীবিভাগ

ইহারা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী স্বয়ং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিয়া থাকে। ইহারা নৃত্যগীতে পটু। থিয়েটার, রেডিও, সিনেমার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে। এজন্য তাহারা রাজা-জমিদার প্রভৃতি বড়লোকের বিলাস-দরবারে নিমন্ত্রণও পায়। ঐ সমস্ত উপায়ে ইহারা স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করিয়া বেশ সচ্ছল অবস্থায় জীবনযাপন করিয়া থাকে এবং অধিকন্তু মনোমত প্রণয়ীদের উপহারাদির বিনিময়ে দেহদান করিয়া থাকে। ইহারা নিজেরা স্বাধীন বলিয়া নিজেদের শরীর ও মনের উপর বেশীমাত্রায় অত্যাচার হইতে দেয় না। ইহাদের মজুরীও খুব বেশী।

আরও এক শ্রেণীর বেশ্যা আছে, যাহারা দলবদ্ধভাবে একজন ‘বাড়ীওয়ালী’র অধীনে বাস করে। বাড়ীওয়ালী একজন ধূর্তশিরমণি প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা গণিকা মাত্র! এই অভিজ্ঞা গণিকার কঠোর শাসনাধীনে সাধারণ বেশ্যারা বন্দিনী ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাদের উপার্জন ‘বাড়ী-ওয়ালী’র হাতে যায়। বাড়ীওয়ালী ইহাদের খোরাকপোশাকের ব্যয়ভার বহন করে। অসুখ-বিসুখের জন্য খরিদ্দার (‘বাবু’) ‘বসাইতে’ না পারিলে ‘বাড়ীওয়ালী’র নিকটে তাহাদিগকে বিশেষ তিরস্কার এবং শাসন ভোগ করিতে হয়। নিজেদের সুখ-সুবিধা বিচার করিবার অধিকার এই সমস্ত হতভাগিনীদের নাই। খরিদ্দারের ভিড় হইলে প্রতি রাত্রে এক-একজনকে বিশ-ত্রিশজন পর্যন্ত পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হইতে হয়। ডাঃ ফোরেল এই শ্রেণীর হতভাগিনীদের দুরদৃষ্ট বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত দেশে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা আছে, সেই সমস্ত দেশে যুদ্ধ ঘোষণার দিনে বেশ্যালয়ে অত্যন্ত ভিড় হয়। কারণ, যুবকগণ যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে শেষবারের মত রতিসুখ উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য ঐ সময়ে সেখানে এত ভিড় হয় যে, একজনকে একরূপ টানিয়া উঠাইয়া আর একজনকে শয্যা গ্রহণ করিতে হয়। বড় বড় শহরে সরকারী পায়খানার বাহিরে ভিড় করিতে যেমন ‘প্রকৃতির নিমন্ত্রিত’ ব্যক্তিগণ বিন্দুমাত্রও লজ্জাবোধ করে না, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়া

থাকে। গ্রাম্য কবিওয়ালাদের দলেও ঐরূপ অবস্থায় কয়েকজন রমণী থাকে।*

দেহ-ব্যবসায়ী সকর্মক পুরুষ

বেশ্যা বলিতে আমরা সাধারণতঃ কেবল বারনারীদেরই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে অল্প বিস্তর দেহব্যবসায়ী পুরুষও বিদ্যমান আছে এবং দিন দিন তাহাদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। মিঃ এইচ. জি. ওয়েল্‌স তাঁহার "ওয়ার্ক, ওয়েল্‌থ এণ্ড হ্যাপিনেস অব ম্যানকাইণ্ড" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিয়াছেন, নীতিবাগীশরা বেশ্যাপ্রথার দৈহিক দিকটাই কেবল আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষ যে বিবাহিতা স্ত্রী অপেক্ষা পণ্যা স্ত্রীর নিকট অধিক ক্ষেত্রে সত্য কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে সত্য নহে। তবু সে যে বারাঙ্গনা ভোগ করিয়া থাকে, তাহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। শহর-বন্দর প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে ব্যবসায় বা কর্মোপলক্ষে পুরুষেরা স্ত্রীহীন বা নিঃসঙ্গ অবস্থায় অস্থায়ীভাবে বাস করে, সেইখানেই গণিকার প্রাদুর্ভাব হয়। ইহার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, গণিকা **নিঃসঙ্গ পুরুষের অস্থায়ী সঙ্গী, বন্ধু, সান্ত্বনাদাত্রী যৌনসহচরী**—ইহাই তাহার প্রকৃত রূপ। তবে দুনিয়াতে নারীর জন্য পুরুষবেশ্যা বেশী নাই কেন? ইহার কারণ, আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কর্মোপলক্ষে পুরুষই এ যাবৎ ঘরের বাহির হইয়া অস্থায়ীভাবে বিদেশে বাস করিয়াছে; সুতরাং ঘরের বাহিরে সঙ্গীর প্রয়োজন হইয়াছে পুরুষেরই বেশী। ব্যবসায়ক্ষেত্রে, ভ্রমণে, যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র নিঃসঙ্গ পুরুষ অস্থায়ী ও আর্থিক দায়িত্ব-নিরপেক্ষ নারীসঙ্গ কামনা করিয়াছে। নারীবেশ্যা ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল।

কিন্তু বর্তমান নারী স্বাধীনতার যুগে নারীর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। নারী আজ আর অবরোধ-পিঞ্জরের পাখী নহে। নারীও আজকাল ব্যবসায় ব্যপদেশে শহর, বন্দর ও যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গীহীন অবস্থায় দুনিযার সর্বত্র পরিভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং অতীতে পরিভ্রমণশীল পুরুষের যে প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পুরুষের অস্থায়ী বন্ধুরূপিণী পণ্যা স্ত্রীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, বর্তমানে পরিভ্রমণশীল নিঃসঙ্গ নারীর সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নারীর অস্থায়ী বন্ধুরূপী দেহব্যবসায়ী পুরুষের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের

* তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাস দেখুন।

প্রমোদকেন্দ্রসমূহে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ধনবতী পরিব্রাজিকারূপে বহু আমেরিকান মহিলাকে ধনের বিনিময়ে অস্থায়ী পুরুষসঙ্গী সংগ্রহ করিতে দেখা গিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে অনেক পুরুষও ঐ সব স্থানে এই ধরনের নারীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। উহাদিগের সাঙ্কেতিক নাম '**গিগোলো**'। আইনের ব্যবস্থার সুবিধাহেতু এই সমস্ত পুরুষদের কোনও প্রকার সনদ লইতে হয় না বলিয়া এই প্রথা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। বারনারী অপেক্ষা ইহাদের সুবিধা অনেক বেশী। কারণ, এই বৃত্তির জন্য তাহাদের ন্যায় ইহাদিগকে সমাজে পতিত ও পরিত্যক্ত হইতে হয় না। একা স্বাধীনভাবে বাসকারী অথবা ভ্রাম্যমাণ ধনী কুমারী বা বিধবাদের জন্য অধিকাংশ আধুনিক নগরেও যে এইরূপ পুরুষ দেখা যায় না তাহার প্রধান কারণ নারীর কাম পুরুষের মত অত তীব্র বা সদাজাগ্রত নহে। তাহারা ভাল না বাসিয়া শুধু কামতৃপ্তির জন্য দেহদান কদাচিৎ করে। তাহাদের প্রকৃতিগত লজ্জা, শালীনতাবোধ, সূক্ষ্ম সুরুচি এবং দুর্নামের ভয় পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী।

দেহ-ব্যবসায়ী অকর্মক বালক

ইহা ছাড়া যৌনবিকল্পী অথবা সমমৈথুন অভ্যস্ত পুরুষদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বালকদের নারীর মত ব্যবহার করা হয়। ভারতের লক্ষ্ণৌ, কানপুর, রামপুর প্রভৃতি শহরে গোপনে হইলেও এইরূপ ব্যবস্থার কথা শোনা যায়। বার্লিন শহরে হাজার হাজার বালক খোলাখুলিভাবে ব্যবসা করিত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

আমাদের দেশে 'ঘাটু', রাখিয়া নৃত্যগীতের দল ব্যবসা করিয়া থাকে। সুন্দর বালকদের বালিকা সাজাইয়া নাচ গান শেখানো হয়। এই সকল "ঘাটু" সেই দলের অপরের কামলালসার পাত্র হয়। এবং সময়ে সময়ে অর্থের বিনিময়ে অন্যের নিকটও সাময়িকভাবে তাহাদিগকে রাখা হয়। পশ্চিম ভারতে তথা-কথিত হিজড়াদের (অধিকাংশই গোঁফ দাড়ি কামানো স্ত্রীবেশধারী পুরুষ) অনেকেই এইভাবে অর্থোপার্জন করে।

পুংমৈথুনের ইতিহাস ও প্রসার

এইরূপ অভ্যাসের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহা বহু প্রাচীন। ধর্মযাজকদের এইরূপ কদভ্যাসের কথা উল্লিখিত আছে। অসভ্য বা অর্ধসভ্য

অনেক জাতির মধ্যে ইহা দেখা যায়। নিউ মেক্সিকোর পুবেলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া বালককে গ্রামের শৌখিন লোকদের ব্যবহারের জন্য মেয়ের বেশে প্রতিপালন করা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতী দ্বীপে মানুষদের মধ্যে এইরূপ বালিকাবেশে বালকের ব্যবহার দেখা গিয়াছে। ফরমোসা দ্বীপের ডায়াকদের মধ্যে এইরূপ দেখা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতককে নাকি অপর পুরুষের সহিত রীতিমত বিবাহও দেওয়া হয়। চীনাদের মধ্যে পিতামাতারা নাকি সুশ্রী বালকদের নানাপ্রকার সাজসজ্জা উপাচারে সজ্জিত ও লোভনীয় করিয়া বড়লোকদের ভোজ বা উৎসবে পাঠাইয়া দেয়। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে বালক সম্ভোগের প্রথা খুব প্রসারলাভ করিয়াছিল। বড় বড় বাজারে বালকও পাওয়া যাইত। প্রাচীন রোমীয়দের মধ্যেও ইহাদের সংখ্যা নারীবেশ্যার চেয়ে কম ছিল না। খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে ও কিছুকাল পর পর্যন্ত বালকদের নাকি খুব আদর ছিল।

কারণ

দেহবিক্রেতা বালকের প্রাদুর্ভাবের কারণ প্রধানতঃ—(১) নারীবেশ্যা বা সহজলভ্যা নারীর অভাব—বিশেষতঃ জেলখানায়, সৈনিকনিবাসে, নাবিকদের মধ্যে, মঠ ও আশ্রমে, স্কুল-কলেজের হোষ্টেলে—যেখানে শুধু পুরুষদের একত্র থাকিতে হয়, (২) পাকা সমমৈথুনকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং (৩) অনেকের রতিজ রোগ এড়াইবার বা গর্ভাধানের হাঙ্গামা পরিহারের স্পৃহা।

পতিতা ও বন্ধ্যাত্ব

ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ব্যবসায়ী রূপজীবাদের অনেকেই সাধারণতঃ বন্ধ্যা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ **তাহাদের বন্ধ্যাত্ব** যে মানবসমাজের পক্ষে কতটা কল্যাণকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কারণ তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে **সিফিলিস ও গনোরিয়া** রোগের যেরূপ প্রসার, তাহাতে ইহাদের সন্তানাদির প্রায় সকলকেই অন্ধ অথবা উপদংশ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে মানবসমাজের একটা বিরাট অংশ এতদিনে পঙ্গু হইয়া পড়িত।

ইহাদের বন্ধ্যাত্বের **কারণ** সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর অভিমত এই যে, ইহাদের অধিকাংশ **গনোরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রজনন শক্তি হারাইয়া ফেলে**। ডঃ নরম্যান হেয়ার **বলেন**

যে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ জন নারীরই বন্ধ্যাত্বের কারণ গনোরিয়ার কুফল।

ইহাও সত্য যে, যে সকল পুরুষ গণিকাগমন করে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই গনোরিয়া হয়। (সিফিলিস অপেক্ষা ইহার প্রকোপ বেশী)। ইহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করাইয়া সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়। অবশিষ্ট অধিকাংশই উক্ত রোগের বীজাণুর দূষিত ক্রিয়ার ফলে সন্তানোৎপাদনে অক্ষম হইয়া পড়ে।

আর এক শ্রেণীর অভিমত এই যে, তাহারা বিভিন্ন পুরুষের সহিত ঘন ঘন মিলিত হওয়াতে তাহাদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন পুরুষের শুক্র একত্রিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন পুরুষের প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু কোনটিরই উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। কিন্তু, এই মত ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সাধারণতঃ যোনিনালীর শেষ প্রান্তে জরায়ুমুখের উপরেই কিংবা তাহার কোন এক বা একাধিক পার্শ্বে শুক্র পতিত হয়। তৎক্ষণাৎ শুক্রকীটসমূহ প্রতি তিন মিনিটে অর্ধ ইঞ্চি বেগে জরায়ু-মুখের দিকে শুক্রের তরল অংশে সাঁতরাইয়া চলিতে থাকে। সুতরাং ২-১ মিনিটেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। সর্বাগ্রগামী কীটই ফ্যালোপিয়ান নলের মধ্য দিয়া জরায়ুর দিকে চলমান ডিম্বাণুর মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া তৎক্ষণাৎ (পুং ক্রোমোসোম সম্পন্ন হইলে) একটি পুরুষ অথবা (স্ত্রী ক্রোমোসোম সম্পন্ন হইলে) একটি স্ত্রী ভ্রূণ সৃষ্টি করে। (পরে আর কোন প্রকারে ভ্রূণের লিঙ্গ পরিবর্তিত হয় না, অথবা কোন উপায়ে তাহা করা যায় না।) সুতরাং ইহার পূর্বে বা পরে পতিত অপর শুক্রের সহিত উহার মিশ্রিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। (১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাত হইতে সদ্য প্রত্যাগত একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞও জানাইয়াছেন যে, এই মত ভুল)।

ডঃ ডি. এইচ. কেলার একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

সম্প্রতি শিকাগো শহরে দুই শত পতিতার ডাক্তারী পরীক্ষা করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাহারা কখনও গর্ভধারণ করিয়াছে কিনা এবং না করিয়া থাকিলে কি কি কারণবশতঃ তাহা নির্ণয় করা।

ইহাদের জনন-যন্ত্রসমূহের কোনও বৈকল্য ছিল না। তাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল, শারীরিক গঠন স্বাভাবিক এবং ঋতুস্রাব নিয়মিত ছিল। তাহারা জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলপ্রদ কৌশল অবলম্বন করিত না। কয়েকজনে যাহা করিত তাহা গর্ভ নিবারণে অসমর্থ। ইহা সত্ত্বেও তাহারা বন্ধ্যা ছিল।

ইহাদের রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, উহা এমন বিষাক্ত (toxic) হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহা শুক্রকীটের বিনাশ সাধন করিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, উহাদের রক্তের সংস্পর্শে শুক্রকীট নির্জীব হইয়া পড়ে এবং অল্পক্ষণেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে মনে হয় যে, ইহাদের যোনিগাত্রে অসংখ্য শুক্রকীট প্রোথিত হওয়ায় রক্তে এমন পদার্থ সৃষ্ট হয় যাহা ডিম্বকোষের উপর ক্রিয়া করিয়া ডিম্বের পরিপক্ক হওয়া নিবারণ অথবা যোনিগাত্রে বেশী অম্লরস ক্ষরণ করিয়া গর্ভোৎপাদনে বাধা জন্মায়। অতঃপর ডাক্তারেরা রক্তপরীক্ষার এমন প্রণালী বাহির করেন যাহা দ্বারা তাঁহারা বলিতে পারেন, কোনও নারীর রক্তে ঐ বিষাক্ত পদার্থের (spermatotoxin) অবস্থিতির দরুন উহার গর্ভধারণে বাধা হইবে কি না।

জন্মনিয়ন্ত্রণে এই তথ্য কাজে লাগিবে। এ সম্বন্ধে আরও গবেষণা চলিতেছে। (উপরোক্ত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের মতে এই মতও ভুল)।

উক্ত কারণসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বারনারীর গর্ভসঞ্চার হইয়াই যায়, তথাপি তাহার সন্তান প্রায়ই বাঁচে না, কারণ উপদংশগ্রস্ত জরায়ু ভ্রূণের পক্ষে নিরাপদ নহে। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ভ্রূণটি স্বতঃই মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা জরায়ু হইতে স্খলিত হয় অর্থাৎ গর্ভস্রাব হইয়া যায় কিংবা মৃত সন্তান প্রসূত হয়। এতদুদ্দেশ্যে কোনও ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। জীবিত প্রসব হইলেও সন্তান অল্পায়ু হয়।

প্রতীচ্য দেশের অধিকাংশ গণিকা অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে রতিজ রোগ-প্রতিষেধক ঔষধাদির ব্যবহারে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছে। মিঃ এডুইন ফ্রেডারিক বাওয়ার্স বেশ্যাদের বন্ধ্যাত্বের কারণ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া খুব জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ের বেশ্যারা গৃহস্থ বালিকাগণ অপেক্ষা অনেক কম রতিজ ব্যাধিগ্রস্ত। ডাঃ উইলিয়ম রবিনসনও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্বাস্থ্যনীতির বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতির দ্বারা পরিচ্ছন্নতার ধারণা এতটা উন্নত ও সংস্কৃত হইয়াছে যে, আগামী দুই-এক যুগে গণিকারা ঐ সকল ব্যাধিমুক্ত হইয়া পড়িবে। ইউরোপীয় গণিকাগণ এতটা ব্যাধিমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের গর্ভসঞ্চার খুব কম হয়, সেজন্য অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করিয়া থাকেন যে, পূর্বোক্ত কারণসমূহ ছাড়াও গণিকাদের বন্ধ্যাত্বের অন্য কারণ আছে।

সেই কারণ কি? আধুনিক বিজ্ঞানীগণ আরও দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমত ব্যবসায়-পরিচালনে যে দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রয়োজন, তাহাতে গণিকাদের জননেন্দ্রিয়সমূহে একটা **স্থায়ী সংকোচন** হইয়া থাকে। এই সঙ্কুচিত অবস্থা সন্তানধারণের অনুকূল নহে। (উপরোক্ত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের মতে এই মতও ভুল)। দ্বিতীয়ত রোগপ্রতিষেধক ডুশসমূহে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, উহাদের অধিকাংশই যোনিগাত্রে শুক্রকীট পরিপোষক রসক্ষরণের প্রতিকূল।

অবশ্য এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্যদেশের বারাঙ্গনাদের মধ্যে অনেকেই **জন্মনিয়ন্ত্রণের** প্রক্রিয়া জানে ও ব্যবহার করে। আবার পুরুষেরাও রতিজ রোগ এড়াইবার জন্য **সাধারণতঃ কনডম ব্যবহার** করিয়া থাকে। ইহাতে গণিকাদের গর্ভাধান স্বতঃই বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাহা ছাড়া গর্ভ হইলে রূপজীবারা নির্বিঘ্নে ব্যবসায় চালাইয়া যাইবার জন্য এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার জানিয়া গর্ভপাত করাইবার ব্যবস্থা করে। এই প্রচেষ্টায় অনেক সময় প্রজনন-যন্ত্রসমূহ বিকল হইয়া বন্ধ্যাত্ব সূচিত হয়।

প্রাচ্যের দেহব্যবসায়িনীগণ প্রতীচ্যের ভগিনীদের ন্যায় ততটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বাস্থ্যনীতি পালন করে না, তবু তাহারাও উহাদের ন্যায়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধ্যা। তবে কতক ক্ষেত্রে সন্তান হইয়াও যায়।

আমাদের অভিমত এই যে, উপরোক্ত সমস্ত কারণের এক বা একাধিক ক্রিয়ার ফলেই বন্ধ্যাত্ব সাধিত হয়। মাত্র দুই-একটি কারণের মধ্যে উহাকে সীমাবদ্ধ করা কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত হইবে না।

পতিতাবৃত্তির উপকারিতা

ইহার প্রতি আমাদের যতই ঘৃণা থাকুক না কেন, আমাদের ইহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বহু সমাজবিজ্ঞানী এই প্রথার **আবশ্যকতা** ও **উপকারিতা** প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের সমাজ-জীবনের একটা আবশ্যক অঙ্গরূপেই ইহার প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার সমর্থনকারী সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত এই যে, **যে সামাজিক আবশ্যকতা হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে,** সেই আবশ্যকতার জন্যই ইহার **প্রচলন থাকা** উচিত। লেকী (Lecky) তদীয় "হিষ্ট্রি অব ইউরোপীয়ান মরাল্‌স্" (Aistory of European Morals)

নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, এই প্রথা আমাদের **পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পবিত্রতার রক্ষাকবচ (সেফটি ভালভ্)।** ফ্রয়েড ও এলিস অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক বার্ট্রাণ্ড রাসেল ইহাকে নিন্দা করিয়াও বলিয়াছেন যে, আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে যতদিন **যৌন-স্বাধীনতার** প্রবর্তন করা না হইবে, ততদিন ইহা রাখিতে হইবে।

ইহার পক্ষে এই সমস্ত মনীষীগণের প্রধান যুক্তি সাধারণতঃ এই যে, বর্তমান বৈশ্য-সভ্যতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী ব্যপদেশে অনেক পুরুষকে স্ত্রী ছাড়িয়া বহুদিন বিদেশে বাস করিতে হয়। শিল্প-কেন্দ্রে কলসমূহের অধিকাংশ শ্রমিকগণকে গ্রামে স্ত্রী ছাড়িয়া সমস্ত জীবন বা জীবনের বহুলাংশ ব্যয় করিতে হয়। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাষ্ট্রসমূহের অগণিত সৈন্যগণকে সাধারণতঃ বিবাহিত স্ত্রীর সংসর্গ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহা ছাড়াও বিবাহিতা স্ত্রীর নানা পারিবারিক সমস্যায় জড়িত ও চিন্তাগ্রস্ত এবং বিবিধ সাংসারিক কর্মে ব্যস্ত জীবনে কামের স্বল্পতা, অথবা তাঁহার কামশীতলতা, অসুস্থতা অথবা অনটনের সংসারে সন্তান-জননে অনিচ্ছা ও আশঙ্কা অনেক পুরুষকে যথেচ্ছ রতিসুখ ভোগে বঞ্চিত রাখে। এই সমস্ত লোকের জন্য বিবাহেতর নারীসম্ভোগের ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কুমারীদের পবিত্র রাখিতে হইলে এবং দাম্পত্য-জীবনকে পবিত্র ও সুখদায়ক করিতে হইলে এই সমস্ত কাম-বুভুক্ষু লোককে কিছুতেই অন্যের অন্তঃপুরে লুব্ধ দৃষ্টি দিতে দেওয়া যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাউক, বহুদিন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবার পর কিংবা সাগর-ভ্রমণ করিবার পর একদল সৈন্য বা নাবিক এক নগরে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিল। এই নগরে যদি যথেষ্ট সংখ্যক গণিকা থাকে, তবে সৈন্যগণ উহাদের দ্বারাই নিজেদের বাসনা পূরণ করিতে পারে। আর যদি না থাকে, তবে অনেকে আশঙ্কা করেন যে, ঐ সমস্ত লোকেরা ক্ষুধিত হিংস্র জন্তুর ন্যায় নগরবাসীর পুরমহিলাগণকে রাস্তাঘাটে বনে-জঙ্গলে আক্রমণ করিবে। তাহা ছাড়া, চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক নগর হইতে নগরান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে অথবা প্রবাসে বাস করিতেছে। বিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ অথবা বাস করা ইহাদের অনেকেরই পক্ষে সম্ভব নহে। এই সকল লোকের অভাব মিটাইবার জন্য গণিকাবৃত্তির উদ্ভব। ইহা ব্যতীত প্রধানত আর্থিক কারণে যুবকদের বিবাহের বয়স ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। কতক পুরুষ আজীবন কুমার থাকিয়া

যাইতেছে। গণিকালয়ই এই উভয় শ্রেণীর বিপত্নীকদের এবং দাম্পত্য জীবনে অসুখী অথবা বৈচিত্র্য-পিয়াসী স্বামীদের স্বাভাবিক যৌনক্ষুধা নিবারণের এবং অবাধ আমোদ-প্রমোদ করিবার সহজ ও সুলভ স্থান। ইহাতে বিশেষ সুবিধা এই যে, পুরুষের প্রয়োজনমত যখন তখন নারী পাওয়া যায়, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর খরিদ্দারের উপযোগী নারীর ব্যবস্থা আছে, এবং সাময়িক নারীসম্ভোগে বিলাসের জন্য পুরুষকে স্ত্রী বা সন্তান পালনের নৈতিক, আর্থিক বা আইনত কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় না। যদি ইহার প্রচলন না থাকিত তবে ঐ সমস্ত লোকেরা পারিবারিক ক্ষেত্রে আক্রমণ চালাইয়া প্রলোভনে বা বলপ্রয়োগে গৃহস্থগণের স্ত্রী-কন্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়া দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনে নানা অশান্তির সৃষ্টি করিত।

ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধান

ডঃ কিন্‌সেদের অনুসন্ধানে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে গণিকাগমন সম্বন্ধে অনেক তথ্যাদি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। শতকরা প্রায় ৬৯ জন শ্বেতকায় পুরুষ গণিকাগমন করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ একবার, কেহ কেহ কয়েকবার এবং কেহ কেহ বহুবার উহা করিয়াছে।

উহাতে যৌন-আনন্দলাভ সর্বপ্রকার যৌন-আচরণের খুব বড একটা অংশ নয়। তবু প্রাচীনকাল হইতে এই বৃত্তি সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত নানাপ্রকার অপবাদ জড়িত। চুরি, ডাকাতি, খুন-জখম, কালো-বাজারী, জুয়া, মদ্যপান ইত্যাদি বহু অপরাধ বেশ্যাকে কেন্দ্র বা আশ্রয় করিয়া চলে। রতিজ রোগের প্রসার এই প্রথার বিপক্ষে প্রধান যুক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এই ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মানব-সমাজ বহুদিন হইতে নিন্দা, প্রচার, আইন-প্রণয়ন ইত্যাদি করিয়া আসিতেছে তবুও ইহা লোপ পায় নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহার চাহিদা আছে।

কেহ কেহ পতিতাগমন করে অন্যপ্রকারে সন্তুষ্ট হইতে না পারায় নূতন রতিসুখের সন্ধানে—কেহ কেহ মনে করে যে, উহারা গুপ্ত কুলটা অপেক্ষা অধিক রতিজ রোগমুক্তা—কেহ কেহ উহাতে কি আছে জানিবার ঔৎসুক্য—তবে সবচেয়ে বেশীর ভাগ উহারা সহজলভ্য বলিয়াই পছন্দ করে।

কুমারী বা অপর নারীর সহিত মেলামেশা করিয়া বহু আদর-সোহাগ, সাধ্য-সাধনা করিয়া বহু দিন, সপ্তাহ কি মাস একত্র বেড়াইয়া, খাওয়াইয়া মনোরঞ্জন

করিয়া পরে হয়ত মিলন সম্ভবপর হইয়া থাকে। পণ্যা নারীর ক্ষেত্রে কোন সাধ্য-সাধনার দরকার হয় না। খরচের মাত্রাও অপেক্ষাকৃত বহু কম। সমাজের ভ্রূকুটি বা অনুশাসনের বালাই নাই, ধরা পড়িয়া লজ্জা পাইবার বা অবৈধ গর্ভ-সঞ্চারের ভয় নাই; প্রমোদসঙ্গিনীরা বারনারীদের ন্যায় পুরুষের ফরমায়েস মত আনন্দদান করিতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে এই বৃত্তির প্রসার বজায় থাকিয়া যাইতেছে।

অপকারিতা

উপরিলিখিত যুক্তিসমূহের সারবত্তা বহুলাংশে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, তথাপি ইহার অন্য দিকও আছে, এবং তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। এই প্রথার দ্বারা মানবের বহু অকল্যাণও হইতেছে। ইহার ফলে **বহু তরুণ যুবকের ভবিষ্যৎ নষ্ট ও পুরুষদের দাম্পত্যজীবন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, এতদ্ব্যতীত যৌনব্যাধি ও মদ্যপানের প্রসারের কেন্দ্র এই পতিতালয়।** এই দুইটিই মানবজাতির এমন গুরুতর অকল্যাণ করিতেছে যে, অন্য কোনও কারণ না থাকিলেও কেবলমাত্র এই দুইটি কারণে ইহার নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত।

শুধু এই বৃত্তির সহিতই যে রতিজ রোগসমূহ জড়িত তাহা নহে, প্রকাশ্য পতিতা ছাড়া গোপন ব্যবসায়ী নারী বা সহজলভ্য প্রমোদসঙ্গিনীর সংসর্গের ফলে ইহাদের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। **সাধারণত ও প্রধানত ব্যভিচারেই রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা বেশী থাকে।**

রতিজ রোগের ভয়াবহতা ও প্রতিকারের কথা আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করিতেছি।

শীতপ্রধান দেশসমূহে দেহকে শৈত্যাধিক্য হইতে রক্ষা করিয়া মানুষকে কর্মপ্রেরণা দিবার পক্ষে **মদ্যের** কিছু প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐরূপ উত্তেজক দ্রব্যের কোনও প্রয়োজনই নাই। শরীরের গঠন ও পুষ্টির জন্য সুরার আবশ্যকতা আছে বলিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রও বলে না। তথাপি আমাদের দেশে সুরাপান প্রথা হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আইন দ্বারা ইহা নিবারণ করার চেষ্টা হইতেছে কিন্তু তাহার ফলে গোপন ব্যবসা বাড়িতেছে। শেষ ফল কালের গর্ভে। ইহার কারণ এই যে, বেশ্যা ও তাহাদের মক্কেলগণ সদাসর্বদা অতিরিক্ত

যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত থাকায় স্বভাবতই যৌন-উত্তেজনা ও ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। সেজন্য কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনা ও শক্তি সৃষ্টির জন্য মদ্যপানের প্রয়োজন হয়। এইজন্য বেশ্যাপল্লীই মদ্য বিক্রয়ের প্রধান প্রকাশ্য ও গুপ্ত কেন্দ্র।

সুরাপানের ফলে মানুষ বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি (অর্থাৎ সংযম) হারাইয়া ফেলে বলিয়া তাহার যৌন-উত্তেজনা স্বভাবতঃই অন্ধবৃত্তিতে পরিণত হয়। মানুষের স্বাভাবিক যৌন-উত্তেজনার মধ্যে প্রেম-প্রীতি, কর্তব্যবোধ, পিতৃত্ব-বাসনা প্রভৃতি মহতী বৃত্তিসমূহ লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু সুরাপানের দ্বারা যে কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ সমস্ত বৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সুরা-উত্তেজিত সঙ্গমের মধ্যে শুধু উহার স্বাভাবিক লালিত্য মমতা ও কবিত্বই নয়, সজ্ঞানে নানাভাবে নানাবিধ সুখভোগও থাকিতে পারে না। বরঞ্চ মদের উত্তেজনা উহাকে অতিরিক্তমাত্রায় অশ্লীল, কদর্য ও যন্ত্রবৎ করিয়া তুলে। পূর্বে আমরা যে সমস্ত যৌনবিকৃতি ও যৌন-নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করিয়াছি ঐ সমস্তের অধিকাংশই সুরার প্রভাবজাত।

মদ্যের সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর ক্রিয়া এই যে, অতিরিক্ত মদ্যপানে মানুষের রতিশক্তি ও সুসন্তানলাভের সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া যায়। সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং আরও কতিপয় শহরের আদমশুমারী পর্যালোচনা করিয়া ডাঃ ফোরেল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বৎসরের যে ঋতুতে কার্নিভাল প্রভৃতি উৎসবামোদের জন্য অতিরিক্ত মদ্য পান করা হয়, সেই ঋতুতেই অধিকসংখ্যক বিকৃতমস্তিষ্ক লোক গর্ভস্থ হইয়া থাকে। যে সকল দেশে মদ্য প্রস্তুত হয়, সেখানে মদ্যপ্রস্তুতের ঋতুতেই অধিকাংশ ব্যাধিগ্রস্ত সন্তান গর্ভস্থ হইয়া থাকে।

যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মদ্যপান করা হইয়া থাকিলেও মজা এই যে, **অতিরিক্ত মদ্যপানই** আবার রতিশক্তির **সর্বাপেক্ষা** বেশী ক্ষতি করিয়া থাকে। কারণ, মদ্যপানের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দারুণ অবসাদ। রতি-শক্তির উপর মদ্যের ক্রিয়ার আলোচনা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে।

মদ্যপানে মানুষ সংযম ও বিচারক্ষমতা হারাইয়া ফেলে বলিয়াই **যৌন-নিষ্ঠুরতা ও যৌনবিকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি বহু অপরাধের মূলীভূত কারণ সুরা।** এতদ্ব্যতীত মদ্যপানের ফলে বহু দম্পতি অসুখী, ধনী পথের ভিখারী হইতেছে। মদ্যপানের অভ্যাস ও কুফল পুত্রপৌত্রাদিতেও সংক্রামিত হইতে পারে।

সুরার প্রভাবে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরা শীঘ্র ও সহজে সংযম হারায়। তাই লম্পটের বিশেষ অস্ত্র এবং সতীর বিশেষ শত্রু সুরা। সতীত্বরক্ষাপ্রয়াসী নারী যেন কখনও কাহারও অনুরোধ বা প্ররোচনায় একটুও সুরাপান না করেন॥

বালিকা ও নারী লইয়া ব্যবসা

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অনুসন্ধান ও তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড হইতে বহু বালিকা ও যুবতীকে নানা ছলে ইউরোপের নগরে নগরে পতিতাবৃত্তি করাইবার জন্য চালান দিয়া অর্থোপার্জনের এক বিরাট ব্যবসা রহিয়াছে।

জোসেফাইন বাটলার (Josephine Butler) তদন্তক্রমে এই কুপ্রথার দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৮৫ সালে আইন করিয়া ইংলণ্ড হইতে এই ব্যবসা বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়। এই আন্দোলনের ফলে প্যারিসে ১৯০২ হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে কয়েকটি কন্‌ফারেন্স হয় এবং কয়েকটি দেশই এই ঘৃণ্য ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। লীগ-অব-নেশন্‌স (League of Nations) এই ব্যাপারে আরও অনেকদূর অগ্রসর হন এবং ১৯২১ সালে জেনেভায় এক কন্‌ফারেন্সে ৩৪টি দেশ ঐরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

অবশেষে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ইহাদের অনুসন্ধানের ফল ১৯২৭ সালে বাহির হয় এবং ১৯২৮ সালে এইচ. উইলসন হ্যারিস (Harris) নামক একজন লেখক পুস্তকাকারে উহার সারাংশ প্রকাশ করেন। আরও কয়েকজন এ সম্বন্ধে লিখেন।

মোটামুটি দেখা যায় যে, এই সকল ব্যাপারে চারি প্রকার লোক সংশ্লিষ্ট (১) গণিকালয়ের মালিক, (২) গণিকালয়ের ম্যানেজার বা বাড়ীওয়ালী, (৩) দুই-একটি মেয়ের উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করে এমন লোক এবং (৪) দালাল (যাহারা দেশদেশান্তর হইতে মেয়ে কিনিয়া বা ফুসলাইয়া আনে)। ইহারা প্রায়ই মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে।

এই ব্যবসায়ের প্রসারের কারণ:

(১) কোনও কোনও জায়গার লোকেরা দেশী হইতে বিদেশী নারী বেশী পছন্দ করে। আমেরিকায় এবং অন্যত্র ফরাসী নারীর চাহিদা বেশী।

(২) নর ও নারীর সংখ্যানুপাত দেশবিদেশে বেশী বা কম থাকা। নারীর সংখ্যা কম থাকিলে আমদানী ও বেশী থাকিলে রফ্‌তানী হওয়ারই কথা।

(৩) কোন কোন দেশে কঠোর আইনের জন্য গণিকাবৃত্তিতে বাধা। অন্য দেশে বিনা বাধায় ব্যবসা করিতে যাইবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।

(৪) আর্থিক অনটন, দুরবস্থা ইত্যাদি। দুর্ভিক্ষ এবং জীবিকা নির্বাহে কষ্ট ইত্যাদি কারণে আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়া।

(৫) বিদেশে নৃত্য, গীত, সিনেমা ইত্যাদিতে যোগদান করিতে গিয়া অনেক সময় এইরূপ ব্যবসা করিতে প্রলুব্ধ বা বাধ্য হওয়া।

প্রথমতঃ শ্বেতজাতিসমূহের নারীদের লইয়া তদন্ত ও আন্দোলন আরম্ভ হয় বলিয়া এই ব্যবসায়ের নাম White Slave Traffic ছিল। কিন্তু এখন সারা পৃথিবীতে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আন্দোলন হওয়ায় ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ঐ নামের পরিবর্তে ইহাকে Traffic in Women and Children নামে অভিহিত করিবার সুপারিশ করেন। ইহাই যুক্তিযুক্ত।

পাশ্চাত্য জগতে বেশীর ভাগ নারীই ফ্রান্স, পোলাণ্ড এবং রুমানিয়া হইতে রফতানী এবং ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং মিশরে আমদানী হইত। ব্রিটেন হইতে রফতানী প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

প্রাচ্যদেশের অবস্থা সম্বন্ধে লীগ-অব-নেশন্সের তদন্ত কমিটি ১৯৩২ সালে রিপোর্ট দেন এবং উহার সারাংশ ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রাচ্যেও বিরাট এক ব্যবসা রহিয়াছে কিন্তু এশিয়ার মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ। এখানে প্রধানত চীন, জাপান এবং রাশিয়ার (এশিয়াটিক) মেয়েদেরই এইরূপ ভাবে এক দেশ হইতে অন্য দেশে চালান দেওয়া হইত। অন্যান্য দেশের মেয়েদেরও স্থানান্তরে পাঠানো হয়, কিন্তু ততটা নয়। চীনা নারীকেই খুব ব্যাপকভাবে নানা দেশে দেখা যায়।

পাশ্চাত্য দেশে এই ব্যবসায়ের যে সকল কারণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে সেগুলি অনেকটা প্রাচ্যেও খাটে। তবে **দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মেয়েদের পরনির্ভরতা** ইত্যাদি এখানে আরও প্রকট। ইহার উপরে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও কুসংস্কার ব্যাপারটিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানে বহু ব্যবস্থার দরকার। এই সব দেশের জনমত এখনও ততটা সজাগ হয় নাই।

গণিকা উচ্ছেদে লীগ-অব-নেশনস্

অতীতে নারীব্যবসার উচ্ছেদের বহু চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেলেও বর্তমানের সভ্যজাতিসমূহ নানা উপায়ে এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে লীগ-অব-নেশনস্ ১৯২৭ সালে একটি সাব-কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটি বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ লইয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই প্রথার প্রতিকারোপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সাব-কমিটির বাৎসরিক কার্যকলাপের যে সমস্ত রিপোর্ট বাহির হইতেছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, এই জটিল সমস্যা সমাধানের আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুন এই অনুষ্ঠানের কার্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

উক্ত কমিটি এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, এই বহুকাল প্রচলিত জটিল সমস্যা সমাধানের অনায়াসসাধ্য, সহজ ও সরল কোনও উপায় নাই। এই প্রথার প্রতিকারের জন্য একদিকে যেমন সুযোগ-সুবিধামত কার্যকরী আইন প্রণয়ন করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমন জনসাধারণকেও তদনুরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। কুসংস্কারবর্জিত সুশিক্ষার দ্বারা মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় ধারণার পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। এই প্রথা কোনও জাতি বা দেশবিশেষের সমস্যা নহে, **ইহা আন্তর্জাতিক সমস্যা**। উক্ত সাব-কমিটি বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, এটি একটি সুগঠিত ব্যবসা; সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসা অনেকটা একই প্রকারের। সুতরাং ইহার প্রতিকার করিতে হইলে একটি **আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার** প্রয়োজন হইবে. কোন জাতির বা রাষ্ট্রের একক চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে।

আইনের সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তি পতিতাবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে কি না, এ সম্বন্ধেও লীগ-অব-নেশনস্ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত। কারণ. ইহাতে সুফল পাইবার আশা কম।

এ বিষয়ে British Social Hygienic Council লীগের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিল, তাহা সকল দিক হইতে প্রণিধানযোগ্য। ঐ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে. ইংলণ্ডে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আইনের সাহায্যে **এই বৃত্তি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইহার ফলে যৌন-রোগীর সংখ্যা বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছে।** ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, হাজারে রোগীর সংখ্যা ২০১'০ হইতে ২৭৫'৪ এ উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও **তিনটি কারণে নিয়ন্ত্রণ-চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে।** (১) নিয়ন্ত্রণচেষ্টার সাফল্য রেজেষ্টারী করা গণিকার সংখ্যাবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। (২) উহাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রথায় উৎসাহ দান করা হয়। (৩) নিয়ন্ত্রণ-কার্যে পুলিসের মধ্যে ঘুষ, অত্যাচার ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। (৪) ডাক্তারী পরীক্ষার নিয়মিত ব্যবস্থা থাকিলে জনসাধারণ নিশ্চিন্ত মনে কুস্থানে গমন করে, কিন্তু ডাক্তারেরা ব্যস্ততা, ঘুষ প্রভৃতির বশবর্তী হইয়া বা কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিয়া মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়া থাকে।

সুতরাং লীগ **পতিতা-নিয়ন্ত্রণের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণকে যৌনবিজ্ঞানে অধিকতর শিক্ষিত করিয়া তুলিবার** দিকে অবহিত হইবার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়াছেন।

সোভিয়েতে গণিকাবৃত্তিলোপ

পৃথিবীর নানা দেশে নানা যুগে অনেক মনীষী বলিয়াছেন যে, আইন বলে এই ব্যবসা বন্ধ করিলেই ইহা উঠিয়া যাইবে। অনেক সরকারী কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করিয়া গণিকা পল্লীতে পুলিসের অভিযান চালাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিবারেই এই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। গণিকারা নির্দিষ্ট পল্লী ছাড়িয়া গুপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে গণিকাবৃত্তি, দুর্নীতি ও রতিজরোগ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই জন্য সোভিয়েত সরকার স্থির করিলেন যে, এই বৃত্তির মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন নারী ও পুরুষ ডাক্তার, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, মনোবিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ মিলিয়া গণিকাদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ১৯২৩ সালে এক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহার হাজার হাজার অনুলিপি গণিকাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া উত্তর পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন এবং নাম ধাম গোপন রাখা সম্পর্কে দৃঢ় আশ্বাস দিলেন। প্রায় সকল পতিতা স্বীকার করিল যে, দারিদ্র্যের চাপে নগদ উপার্জনের আশাতেই তাহারা এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু সকল দরিদ্র নারীই তো রূপজীবী হয় না।

সংগৃহীত উত্তরগুলি হইতে অপর একটি কারণেরও সন্ধান পাওয়া গেল—শোষণ। নানা সভ্য ও অর্ধসভ্য দেশে নারীদেহ লইয়া জঘন্য ও সঙ্ঘবদ্ধ

ব্যবসার বিশাল জাল ছড়াইয়া রহিয়াছে—ছলে, বলে, কৌশলে দরিদ্র ও অসহায় বালিকা ও যুবতীদের বারনারী হইতে বাধ্য করা। বহু গুণ্ডা, দালাল, আড়কাঠি, ধনী, বাড়ীওয়ালা ও বাড়ীওয়ালী মিলিয়া এই ব্যবসায় চালাইতেছে। এবং লাভের প্রধান অংশ ইহারাই পাইতেছে, অথচ বারাঙ্গনাদের ভাগ্যে থাকে চরম অবমাননা ও অভাব। দরিদ্র ও অসহায় নারীদের এই শোষণ ব্যবস্থাই এই বৃত্তির প্রকৃত ভিত্তি। এই জন্য সোভিয়েত কর্মপন্থায় পতিতাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা একেবারেই নাই, বরং আছে আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য।

প্রশ্নমালার উত্তরগুলি হইতে ইহাও দেখা গেল যে, বহু 'ভদ্র' নারী এক বা একাধিকবার অর্থের বিনিময়ে অথবা সামাজিক প্রভুত্বের প্রভাবে দেহদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, অধিকাংশ গৃহস্থ বধূর জীবন গ্লানি, অবমাননা, দুঃসহ দুঃখ ও শোষণের দিক হইতে বারাঙ্গনার জীবনেরই সমতুল্য। সুতরাং সোভিয়েত পরিকল্পনায় প্রকাশ্য গণিকা ও অপর নারীদের মুক্তি ব্যবস্থার মধ্যে কোন জাতিগত পার্থক্য করা হয় নাই। বুঝা গেল যে, সামাজিক পরিশ্রমের মর্যাদা ফিরিয়া না পাইলে নারীদের মুক্তি নাই, কারণ সাধারণ নারীদেরও নহে, গণিকাদের তো নহেই। সুতরাং **নিম্নলিখিত আইন ও ব্যবস্থাসমূহ** ১৯২৩ সাল হইতেই অবলম্বিত হইল :—

(১) কোন অবস্থায় কোন নারীকে চাকুরী হইতে ছাঁটাই করা চলিবে না।

(২) যাহাতে সমস্ত অনাথা নারী কাজ পায় এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের সমবায় কারখানা ও খামার খুলিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

(৩) সকল নারী যাহাতে স্কুল ও ট্রেনিং কেন্দ্রে যোগ দেয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রচুর উৎসাহ দিতে হইবে।

(৪) যে সমস্ত রমণী গ্রাম হইতে নগরে আসিয়াছে এবং যাহাদের বাসস্থানের সুব্যবস্থা নাই তাহাদের জন্য সমবায় বাসস্থান স্থাপন।

(৫) অনাথ ও অনাথা শিশু বালিকাদের রক্ষার যথাসম্ভব উত্তম ব্যবস্থা।

(৬) রতিজ রোগগুলি ও গণিকাবৃত্তির কুফল সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে সর্বতোভাবে ক্রমাগত প্রচার করিতে হইবে।

(৬) জারের আমলে পতিতাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শাস্তিমূলক আইন ও
1 ছিল তাহা তুলিয়া দিতে হইবে।

(৮) যে সমস্ত আড়কাঠি, দালাল, বাড়ীওয়ালী প্রভৃতি এই ব্যবসা হইতে কোনরূপে অর্থ উপার্জন করে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন।

(৯) বতিজ রোগগ্রস্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯২৩ সালে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে কয়েকটি ধারা যুক্ত হইল। তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত **দুইটি ধারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য**:

১৭০ ধারা (সারমর্ম): যে কোন ব্যক্তি শারীরিক বা নৈতিক প্রভাবের সাহায্যে অথবা নিজ লাভের জন্য অথবা অপর যে কোন কারণে গণিকা ব্যবস্থাকে সাহায্য করিবে, প্রথমবার অপরাধের জন্য তাহার অন্তত তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইবে।

১৭১ ধারা (সারমর্ম): গণিকা ব্যবসায় হইতে যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন করে প্রথমবার ধরা পড়িলে তাহার অন্তত তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। বারাঙ্গনা যদি আসামীর তত্ত্বাবধানে থাকে বা আসামী দ্বারা নিযুক্ত থাকে তবে তাহার অন্তত ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইবে।

এই সালেই **গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য** নামে নূতন আইন জারি করা হইল। তাহার সারমর্ম এই:—

(১) গণিকালয়গুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

(২) যে সকল ব্যক্তি কোনভাবে ঐ সকল বাড়ীর সহিত সংশ্লিষ্ট—যেমন, ভাড়া দেওয়া, পরিচালনা করা, স্বত্বাধিকারী হওয়া—অথবা যে সমস্ত দালাল খরিদ্দার যোগাড় করিয়া আনে এবং যে সকল আড়কাঠি ছলে, বলে, কৌশলে বালিকা বা যুবতী সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতার করিয়া আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হইবে।

এই জাতীয় বাড়ীগুলি তল্লাশ করিবার পর সার্বজনীন আমোদপ্রমোদ ও পানাহারের স্থান প্রভৃতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হইবে যে, সেখানে কোন আকারে এই পাপ ব্যবসায় চলে কিনা। যদি চলে তাহা হইলে তাহাদের মালিক (অজ্ঞতার ভান করিলেও) শাস্তি পাইবে। সম্পর্কিত সমস্ত ব্যক্তির শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকিবে।

(৪) বারনারীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না। তাহাদের গ্রেফতার করা হইবে না। যে দুর্বৃত্ত ব্যবসায়দারেরা তাহাদের শোষণ করিতেছিল তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কারণে

তাহাদের আদালতে হাজির করা হইবে না। যাহারা তাহাদের বাড়ী তল্লাশ করিবে তাহারা এই অভাগিনীদের **নিজেদের সমান সামাজিক মর্যাদা দিবে ;** কোন দেহ-ব্যবসায়িনী যেরূপ অভদ্র ভাষাই ব্যবহার করুক না কেন, তাহারা ভদ্র ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) **গণিকালয় হইতে উদ্ধার করিবার পর ইহাদের রোগের চিকিৎসা করা ও অর্থকরী শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হইবে।** এই চিকিৎসা ও শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ভদ্রকন্যাদেরও **শিক্ষার ব্যবস্থা** আছে। এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনা-ভার কোন সরকারী কর্মচারীর উপর নয়, শিক্ষার্থিনীদের নিজ সঙ্ঘেরই উপর। এই ব্যবস্থার ফলে তাহারা নিজেদের পতিতা, সমাজ পরিত্যক্তা বা একঘরে মনে করিয়া আত্মসম্মান হারাইবে না।

(৬) পতিতা-পল্লীতে যে সব খরিদ্দারের সাক্ষাৎ বা সন্ধান পাওয়া যাইবে তাহাদের উপর কোন জুলুম না করিয়া, তাহাদের নাম পরিচয় লিখিয়া লইয়া সেগুলি **"মেয়েদের শরীরের ক্রেতা"** এই শিরোনামা দিয়া এক ইস্তাহারে ছাপাইয়া সেই অঞ্চলের প্রকাশ্য স্থানে বা কারখানার বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইবে।

এই সকল ব্যবস্থায় প্রায় ১০ বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েত দেশ হইতে গণিকাবৃত্তি লুপ্ত হইয়াছে। কানাডার লেখক ডাইসন কার্টার তাঁহার Sin and Science নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালে একজন সোভিয়েত যুবককে জিজ্ঞাসা করেন যে, সোভিয়েত সরকার ঠিক কিভাবে গণিকা, যৌনব্যাধি, যৌন-অপরাধ, শিশুদের মধ্যে যৌন-বিকৃতি এবং মাতালদের সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উত্তর দিতে পারে নাই। তাহারা বলে যে, সে. দেশের প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ঐ সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে, তাহারা তখন ছোট ছিল। তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও কানাডার টরেন্টো শহরের রাজপথেই জীবনে প্রথম গণিকা দেখিয়াছে।

(১৯)

যৌনবোধ ও বিকাশের মনোবিশ্লেষণ

(The Psycho-analytic theory of Sex)

ফ্রয়েডের অভিমত

আমরা যৌনবোধের যে ব্যাখ্যা ও সুদূর-প্রসারী বিকাশের ধারা বর্ণনা করিয়াছি, সে সম্পর্কে অতি-আধুনিক **মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির** (Psycho analysis) কি বলিবার আছে তাহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের কিছু বিবরণ ব্যতীত যৌন মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। আজকাল মনস্তত্ত্বের সর্বাধিক পরিচিত দিক হইল মনোবিশ্লেষণ। ইহার ভিত্তি প্রধানত গড়িয়া উঠিয়াছিল মানসিক বিশৃঙ্খলার অনুসন্ধান ও চিকিৎসার প্রয়াসকে কেন্দ্র করিয়া। স্নায়বিক রোগীর নিদান শাস্ত্রীয় (Pathological) বিশৃঙ্খলার মূল কারণ বাহির করিবার উপায় স্বরূপ কৃত্রিম মনোবিশ্লেষণের উৎস হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে একটি মূর্ছারোগীকে চিকিৎসা করিবার সময় ভিয়েনার যোশেফ ব্রুয়ার (Jeseph Breuer) উপরিউক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার কয়েকটি বিচিত্র লক্ষণের অর্থোদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া আবিষ্কার করিলেন যে, রোগীর প্রত্যেকটি লক্ষণের পিছনেই গভীর আবেগমূলক কোন এক ঘটনা রহিয়াছে, যাহা পরে রোগী সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল। সেই সব আবেগমূলক ঘটনার পুনরুদ্দীপন করিতে গিয়া ব্রুয়ার আবিষ্কার করিলেন যে, সাময়িকভাবে তাহাতে রোগীর লক্ষণগুলি প্রশমিত অথবা দূরীভূত হইল।

ইহার পূর্বে ফ্রান্সের সারকো (Charcot) ও জ্যানে (Janet) পরিষ্কার দেখাইয়াছিলেন যে, মূর্ছারোগের (হিষ্টিরিয়ার) লক্ষণগুলির পিছনে সাধারণতঃ কোন বিস্মৃত ঘটনা থাকিয়া থাকে, কিন্তু ব্রুয়ারই সর্বপ্রথম এই রোগের চিকিৎসার পন্থাটি পরিচিত করিয়া তুলেন। এই ব্যাপারে জগদ্বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ভিয়েনার প্রফেসর সিগমণ্ড ফ্রয়েডও ব্রুয়ার-এর কাছে ঋণী।

এই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির মূলসূত্র হইল রোগের লক্ষণগুলির পশ্চাতে যে ঘটনাগুলি ক্রিয়াশীল, নিদ্রাভিভূত অবস্থায় সেগুলিকে ফিরাইয়া আনা এবং

সেই ঘটনাগুলির সহিত জড়িত যে আবেগ রোগীর অচেতন মনে তলাইয়া গিয়াছিল, তাহার চেতন মনে সেগুলি আনয়ন করা।

আবেগের পুনরানুভবকে অভিক্ষোন (abreaction) বলা হয় এবং এই বিশেষ পন্থাটিকে বিবেচন (cathartic) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ফ্রয়েডের নূতন পদ্ধতি

ফ্রয়েড এই বিশেষ চিকিৎসা প্রণালীর এক উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিয়াছেন। রোগীব চৈতন্যাবস্থায় এই চিকিৎসা প্রণালীব প্রয়োগ সম্ভব করিয়া তিনি সম্পূর্ণ নূতন এক দিক খুলিয়া দিলেন। আবেগের পন্থা পবিত্যাগ কবিয়া ফ্রয়েড যে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন কবিলেন, তাহা হইল এই : বোগীকে তিনি শুধু অনুবোধ করিলেন নিজের আবেগ ও চিন্তাব উপব জাগ্রত আধিপত্যেব কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের চেতনাকে শিথিল কবিবাব প্রয়াস করিয়া তাহাব মনে যে চিন্তাই আসে তাহাই সে যেন খোলাখুলি বলিয়া যায়। ইহাব নাম Free Association Method অর্থাৎ অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি।

পন্থাটি শুনিতে যেমন সহজ আসলে ঠিক তেমন নয়, কাবণ আমাদেব প্রাত্যহিক জীবনে আমাদেব বাক্যস্ফুবণ সামাজিক ও নৈতিক নিষেধাদির সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ। সেই দৃঢ়মূল প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া মনের কদযতম ও রূঢ়তম চিন্তা খোলাখুলি বলা সহজসাধ্য নহে।

তবুও উপরিউক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াও মানসিক ব্যাধি ও সাধারণ মানব জীবনেব প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে ফ্রয়েড সক্ষম হইয়াছিলেন। যে সব স্বপ্নেব কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, তাহারও গূঢ় কারণ এইভাবে বাহির হইয়া গেল এবং প্রাত্যহিক জীবনের ভুল ও ভ্রান্তিরও অতি সূক্ষ্ম কারণ আবিষ্কৃত হইল। শিল্পকলা সাহিত্য ইতিহাস সবকিছুই নূতন পন্থার সূক্ষ্ম জটিল পন্থাগুলির আওতায় আসিল এবং ফ্রয়েড একদা ঘোষণা করিলেন, সমগ্র মনুষ্য সমাজই তাঁহার রোগীর পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। তবে ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, মনঃসমীক্ষণেব মতবাদের এখনও প্রচুর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিপুষ্টি হইতেছে এবং ইহা এখনও একেবারে নির্ভুল পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায় নাই।

কার্যকারণ প্রক্রিয়া বস্তুজগতে ও মনোজগতে সমানভাবে ক্রিয়াশীল। যেখানে কোন মানসিক ব্যাপারের সচেতন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,

সেখানে ধরিয়া লইতে হইবে যে, ইহার কোন অবচেতন কারণ নিশ্চয় রহিয়াছে। পরিণত বয়সে কোনও ব্যাপারে যে **অস্বাভাবিক আসক্তি** (Mania) বা **অস্বাভাবিক বিরক্তি** (Phobia) থাকিয়া থাকে, ক্রমশই দেখা যায়, সেগুলির সহিত বাল্যকালের কোনও আবেগ-তপ্ত অভিজ্ঞতা জড়িত রহিয়াছে।

অতি আসক্তি (Manias and Fetiches)'

আরামদায়ক অভিজ্ঞতা ও জিনিসগুলির প্রতি মানুষের আসক্তি স্বাভাবিক। বন্ধুদের সহিত সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক, দরদ-ভরা মন, নব-নারীর প্রেম ইত্যাদির প্রতি আমাদের সহজাত আকর্ষণ।

তবে কখনও কখনও আমরা যাহা পছন্দ করি তাহা অস্বাভাবিকের পর্যায়ে গিয়া দাঁড়ায় এবং সেখানে আসক্তি ও অন্ধবিশ্বাস ক্রিয়াশীল হয়।

ইংরেজীতে 'Erotic Symbolism' বলিয়া যে শব্দটি যৌন-মনস্তত্ত্বে প্রচলিত, তাহার তাৎপর্য হইল ভালবাসার বস্তু হইতে দৃষ্টি বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার চরিত্রের একটি বিশেষ দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা এবং সেই বিশেষ দিকের চিন্তায় মনকে আচ্ছন্ন রাখা। এমনও দেখা গিয়াছে যে, প্রেমাস্পদের কুকুর বা প্রেমিকার চুলের কাঁটা প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকার নিজস্ব মূল্যকে অনেকটা ম্লান করিয়া দিয়াছে। এই সব প্রতীক প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকা হইতে কি ভাবে বেশী অর্থপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায় মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহা প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিচার করিয়া দেখা সম্ভবপর।

সুশিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না এক রমণী তাঁর দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে কখনও সন্তানসন্ততি হওয়া সত্ত্বেও যৌন-মিলনে চরমপুলকের অভিজ্ঞতার আস্বাদন পান নাই। তিনি ইহার সহজবোধ্য কোন কারণ খুঁজিয়া না পাওয়ায় বড় বিষাদ-গ্রস্ত ছিলেন।

একদিন স্বামীর সঙ্গে তাঁহার প্রচণ্ড এক কলহ হওয়ার পরই স্বামী তাঁহার সহিত দ্রুত এক যৌন-মিলনে আবদ্ধ হন এবং ভদ্রমহিলা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেন যে, সেই মিলনে প্রথম তাঁহার চরমপুলক-প্রাপ্তি হইল। তাহার পর হইতে ঝগড়া হইলেই যৌন-মিলন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চরমপুলক-প্রাপ্তি!

ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে, ইহার সহিত বাল্যকালের একটি অভিজ্ঞতা জড়িত রহিয়াছে। তিনি মাতাপিতার সহিত একই শয্যায় শয়ন করিতেন এবং লক্ষ্য করিতেন যে, যৌন-মিলনের অধিকার পিতা পুরুষসুলভ

জবরদস্তির সহিত দাবি করিতেন এবং মাতা নারীসুলভ কুণ্ঠার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেন। তারপরে চলিত উভয়ের মধ্যে কলহ, পরে, মাতার হার মানা, সর্বশেষে উভয়ের যৌন-মিলনের পরে অখণ্ড তৃপ্তি। তখন হইতেই এই বিশেষ বিবাহিতা রমণীর মনে যৌন-মিলন সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার পারম্পর্যমূলক ছবি গড়িয়া উঠিয়াছিল, যেখানে কলহের পরে আত্ম-নিবেদন এবং একজনের হার মানার পরেই উভয়েরই তৃপ্তি।

অত্যধিক ভয়-বিতৃষ্ণা (Phobias and anti-fetiches)

বর্তমান গ্রন্থলেখকের নিজের একটি অত্যন্ত অসুবিধাজনক উৎকণ্ঠা আছে। বন্ধ কোন জায়গায় তিনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। এই মনোব্যাধির নাম ক্লাষ্ট্রোফোবিয়া (Claustro-phobia)। সিনেমা দেখিবার সময় সিনেমা ঘরের সমস্ত দরজা ও নিষ্ক্রমণ পথ বন্ধ হইয়া যায়, তখন তাঁহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবারও ভাব উপস্থিত হয়। সেই কারণে উড়ো জাহাজে চড়িতেও তিনি ইতস্তত করেন। ঝড়ের দিনের নদীতে লঞ্চে চড়িয়াও বিহার করিতে তিনি বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে মোটরে চড়িয়া টানেলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তাঁহার দম প্রায় আটকাইয়া আসে। তিনি পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন যে, তাঁহার এই বিশেষ দুর্বলতাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও হাস্যকর কিন্তু তবুও ইহা কাটাইয়া উঠিতে পারেন না।

খুব সম্ভবত ইহার পিছনে গ্রন্থলেখকের অবজ্ঞাত শৈশবকালের কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা জড়িত রহিয়াছে।

রিভার্স (W. H. Rivers) একটি ডাক্তার সম্বন্ধে সমতুল্য এক বিবরণ দিয়াছেন। সেই ডাক্তারটি কোন কোন অবস্থায় (বিশেষ করিয়া যখন তিনি কোন সঙ্কীর্ণ সরু আবেষ্টনীতে থাকিতেন) তোতলাইতে আরম্ভ করিতেন এবং সেই অবস্থায় স্বভাবতই তাহার ভয় বাড়িয়া যাইত।

কিছুদিন পরেই তিনি অনুধাবন করিলেন যে, তাঁহার এই দুশ্চিন্তাটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর তাঁহার ভয় ও তোতলামি দুই-ই বাড়িয়া গেল। হাসপাতালে ভর্তি হইবার পরও রাত্রিতে ভীতিপ্রদ সব দুঃস্বপ্ন দেখিবার নিমিত্ত তিনি নিদ্রাভোগ করিতে পারিতেন না।

রিভার্স তখন রোগীকে বলিলেন তাঁহার সমস্ত স্বপ্নগুলি লিখিয়া রাখিতে এবং চেষ্টা করিয়া দেখিতে সেই সব স্বপ্নগুলির সহিত তাঁহার পূর্বকালীন

জীবনের কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য আছে কিনা। রোগী সেই চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহার শিশুকালের একটি ঘটনার কথা মনে করিতে পারিলেন। সেই সময় তিনি একাকী এক বৃদ্ধের গৃহে যাইতেন। সেই বৃদ্ধটি বিবিধ প্রকারের জিনিস কুড়াইয়া আনিবার জন্ম প্রত্যেক শিশুকে প্রত্যহ আধ পেনী করিয়া দিত। বৃদ্ধের গৃহ হইতে বাহির হইবার পথটি ছিল একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়া। একদিন সেই প্রকোষ্ঠের শেষপ্রান্তে আসিয়া তিনি (এখনকার রোগীটি) আবিষ্কার করিলেন যে, বাহির হইবার দরজাটি বন্ধ। নিজে দরজা খুলিবার মত বয়স তখন তাঁহার হয় নাই। এমন অবস্থায় তিনি দেখিলেন প্রকোষ্ঠের অপর প্রান্তে একটি কুকুর—অবিশ্রান্ত ঘেউঘেউ শব্দ করিয়া যাইতেছে। এদিকে দরজা খোলা যায় না, ওদিকে হিংস্র চেহারার এক কুকুরের বিরামহীন বিকট চীৎকার, এই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া তখন তাহার মন খুব ভয়ার্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই ঘটনাকেই যখন তাঁহার রুদ্ধ পরিবেশকে ভয় করিবার কারণ হিসাবে দেখানো হইল, তখন তিনি এই ভয় ক্রমে ক্রমে কাটাইয়া উঠিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তাঁহার অনুরূপ কোন অভিজ্ঞতা আর হয় নাই।

একটি সুস্থ এবং আর সব ব্যাপারে স্বাভাবিক নারীরও একটি কৌতুকোদ্দীপক ভীতি ছিল। উচ্চশিক্ষিতা এবং সাহসিনী হইলেও ইঁদুর দেখিলে তিনি নিদারুণ ভয় পাইতেন। হিংস্র জন্তু দেখিলেও তাঁহার ভয় হইত না কিন্তু ইঁদুর দেখিলে বা ইঁদুরের কথা শুনিলে মন হইতে তাঁহার সমস্ত সাহস উড়িয়া যাইত। ইহার পিছনেও খুব সম্ভব ইঁদুরকে কেন্দ্র করিয়া শৈশবকালের কোন ভীতিপ্রদ ঘটনা জড়িত রহিয়াছে।

অবচেতন মন

উপরিউক্ত উদাহরণগুলি হইতে এই কথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে আমাদের চেতন (conscious) মন এর নাগালের বাহিরে একটি অবচেতন (subsconscious) মন এবং তাহারও নিম্নে অচেতন (unconscious) মন আছে, যেখানে নানা প্রকারের অভিজ্ঞতা সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করে। অবশ্য একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, চেতন মন হইতে এই অবচেতন মনের বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। বস্তুতঃ এরা তিনটি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ হিসাবে শরীরে বিরাজমান নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর উৎস।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রথম কথা হইল, এই অবচেতন মনের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে পরিচিত হইতে হইবে। ইহা খুব সহজ কাজ নহে, কারণ বিভিন্ন পরস্পর সম্পর্কবিচ্ছিন্ন অনেক ঘটনা এই অবচেতন মনের সহিত জড়িত রহিয়াছে।

তুচ্ছ প্রাত্যহিক জিনিসগুলিও যেমন ঘড়ির টিকটিক শব্দ অথবা হৃদ্স্পন্দন অবচেতন মনে গিয়া জড় হইতে পারে। কিন্তু গভীব তাৎপর্যমূলক অন্য ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতাও সেখানে গিয়া আশ্রয় নেয়। যে সব চিন্তা ও অনুভূতি আমাদের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নয়, সেগুলি চেতন মন বর্জন করিতে উৎসুক থাকে এবং সেই কারণে সেগুলি দমিতও হইয়া থাকে। যে সব প্রবৃত্তি দমিত হইয়' থাকে, সেইগুলি অন্য আকাবে চেতন মনে আবার ফিরিয়া আসে।

অদং, অহং ও পরাহং (ID, EGO and Supper-EGO)

ফ্রয়েড মনকে তিন ভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন। এই বিভাগগুলি শবীব বা মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ নহে—কাল্পনিক বৃত্তি-বিভাগ মাত্র। প্রথম হইল অদ বা ইড, যাহা আবেগ-জনিত প্রতিক্রিয়াগুলিব আশ্রয়স্থল, দ্বিতীয় অহং বা 'ইগো' যাহা প্রথমটাব বহিরাস্তবণ এবং যাহার সহিত বস্তুজগতেব সচেতন সংযোগ রহিয়াছে; তৃতীয় পরাহং বা সুপাব-ইগো অর্থাৎ বিবেক ও বিচার বুদ্ধি, যাহা দ্বিতীয়টিব বর্ধিত রূপ প্রবৃত্তিগুলিকে অযৌক্তিকভাবে দমন করিতে অভ্যস্ত। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, পরাহং মানুষেরই বৈশিষ্ট্য এবং ইহা অহং-এর উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। অদ এবং পরাহং-এর চাহিদা মিটাইতে গিয়া বেচারা অহং-এর অবস্থা বড় কাহিল হইয়া পড়ে।

মানসিক বিশৃঙ্খলায় প্রায়শঃই দেখা যায় যে, অহং নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে ও সাফল্যের সহিত করিতে অক্ষম। অতএব মনঃসমীক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া যে চিকিৎসা-পদ্ধতি, তাহার প্রথম কাজই হইল অহংকে দৃঢ়ীভূত করা। এই প্রচেষ্টা যে সফল হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ক্রয়ার ও ফ্রয়েডের সফল অভিজ্ঞতা।

যৌনপ্রবৃত্তি ও জবরদস্তি (Sexuality and Aggression)

দমিত প্রবৃত্তিগুলিকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়: যৌন এবং ক্ষমতাপ্রিয়তা (will to power)। ফ্রয়েড যৌন-প্রবৃত্তিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়াছিলেন; তবে তাঁহার শিষ্য এ্যাডলার (Adler)-এর মত হইল যে, দমিত প্রবৃত্তির পিছনে মানুষের আসল উদ্দেশ্য হইল নিজের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করা বা জোর করিয়া ক্ষমতা দখল করা।

বর্তমানে আমাদের বাঁচিবার উপাদান সম্বন্ধে ঈষৎ ধারণা করিলেও ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, অনেক প্রবৃত্তিকেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে দমন করিতে হয়। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হতাশা ও গ্লানি প্রত্যহই আমাদের মনে বিরূপভাব সৃষ্টি করে। তবে বাঁচিবার তাগিদে সেগুলি আমাদের দমন করিয়া যাইতে হয়। প্রেমে বিফলতা বা প্রবল কোন আকাঙ্ক্ষায় বিপত্তি আমাদের মনে আরও অনেক গভীর এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী বিরূপ ভাবের সৃষ্টি করে; সেগুলি দমিত হইয়া অবচেতন মনে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

এ্যাডলার-এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বের প্রধান অসুবিধা হইল যৌন-দিক সম্বন্ধে অবচেতনার ভাব এবং ক্ষমতা-লোভ প্রবৃত্তির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দান। অপর ক্ষেত্রে যৌন-দিক সম্বন্ধে ফ্রয়েড প্রখরভাবে সজাগ ছিলেন, তবে প্রবৃত্তিগুলিকেও তিনি একেবারে অবহেলা করেন নাই।

ফ্রয়েডীয় যৌন-মনস্তত্ত্ব (Freudian Psychology of Sex)

মানসিক বিবর্তনের যে-সব নীতি মনঃসমীক্ষণে পাওয়া যায়, সেগুলির সহিত মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীতে যৌন-নীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যৌনানুভূতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের ধারণা অতি ব্যাপক। দার্শনিক প্লেটো আকর্ষণ (Eros) বলিতে যাহা বুঝাইতেন এবং খ্রীষ্টানধর্মে প্রেম (Love)-এর যে পরিকল্পনা, তাহারই সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা হইল ফ্রয়েডের যৌনবোধ (Sex impulse) বা লিবিডো (Libido) সম্বন্ধে মত। ফ্রয়েডের পরিকল্পনা যৌনানুভূতি সম্বন্ধে কয়েকটি বহুপ্রচলিত অথচ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিয়াছেন। যথা—

(১) শিশুদের কোন যৌনানুভূতি নাই এবং যদি কোন লক্ষণ ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তবে তাহা পাপ হিসাবে ধরিতে হইবে।

(২) যৌনানুভূতি প্রথম উদ্ভব হয় বয়ঃসন্ধির (Puberty) সময়।

(৩) নারীদের যৌন-মিলনের পূর্বে কোন যৌনানুভূতি থাকে না।

(৪) যৌনানুভূতির যৌনাঙ্গসমূহের (Sex Organs) ক্রিয়াতেই সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ। এই সব ধারণা যে কত ভ্রান্ত তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি।

শিশুর যৌনবোধ (Infantile Sexuality)

প্রায়ই ইহা বলা হইয়া থাকে যে প্রত্যেক মানুষই শৈশব-জনিত কয়েকটি যৌনানুভূতির ভিতর দিয়া বিকাশলাভ করে। স্তন্যপানকেও এই দৃষ্টিভঙ্গীতে

যৌনানুভূতির একটি অঙ্গ হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। শিশু স্বভাবতঃই মাতা পিতাকে যৌনপাত্র হিসাবে ধরিয়া লয়। পুরুষ-সন্তান মায়ের প্রতি প্রীত এবং পিতার প্রতি ঈর্ষাতুর এবং কন্যা-সন্তান পিতার প্রতি প্রীত ও মায়ের উপর ঈর্ষাতুর হইয়া থাকে। ইহাকে **ইদিপাস কমপ্লেক্স** (Œdipus Complex বা পূষন্ কূটৈষা বলে।* গ্রীক পুরাণের ইদিপাস নাকি অজ্ঞাতসারে তাহার পিতা থিবিসের রাজা লাইআস (Laius)-কে হত্যা করিয়া মাতা জাকোষ্টা (Jacosta)-কে বিবাহ করিয়াছিল।

কোনও কোনও বিষয়ে এই মনোবৃত্তির পরিবর্তন সম্ভব হইলেও ফ্রয়েড-মতে মূল জিনিসটি কিন্তু সর্বদা বিরাজমান। অতএব দেখা যাইতেছে, এই মনোবৃত্তিতে এক দ্বন্দ্বের ভাব রহিয়াছে। সংযমও ইহাতে উহ্য।

এই দ্বন্দ্বের ভাবটির সহিত প্রায় প্রত্যেক শিশুই পরিচিত। প্রত্যেক শিশুর বিকাশে এবং ব্যক্তিত্বের পরবর্তী পরিণতিতে ইহার প্রভাব গভীর ও দৃঢ়মূল। সামাজিক সচেতনতা (তাহা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের হইলেও) প্রত্যেক শিশুকে এক সহজাত সংযম দেয় বলিয়া বাস্তবক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব কখনও অবৈধ মিলনে অথবা পিতৃ অথবা মাতৃহত্যায় পর্যবসিত হয় না। আবার অধিকাংশ শিশু কন্যার পিতার প্রতি অতিরিক্ত টান দেখা যায়। অধিক বয়স পর্যন্ত এই অহেতুক ভালবাসা থাকে। ফ্রয়েড ইহাকে 'ইলেক্ট্রা কম্প্লেক্স' নাম দিয়াছেন। বাংলায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে শতরূপা কূটৈষা।**

এই পূষন্ কূটৈষা অথবা শতরূপা কূটৈষা যখন কোন বিশেষ শিশুকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে তখন তাহার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক শিশুই ক্রমে ক্রমে এই ভাবের তীব্রতা হইতে মুক্ত হইয়া পড়ে এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়।

অবচেতন মন রূপকের সাহায্যে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। দমিত যৌনপ্রবৃত্তি-গুলি যখন সচেতনতায় অন্য রূপ লইয়া ফিরিয়া আসে, তখনই এই যৌনরূপকের সৃষ্টি হয়। যৌন-অভিজ্ঞতাগুলি খুব সহজ করিয়া বলিবার রীতি তাই মনুষ্য-সমাজে বিশেষ প্রচলিত নহে। ফ্রয়েড-এর মতে প্রায় সমস্ত রূপকেরই কোন যৌন-সম্বন্ধীয় পশ্চাৎভূমি রহিয়াছে এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি প্রত্যেকটি রূপকের একটি যথোপযুক্ত যৌন পশ্চাৎভূমি গড়িয়া তোলেন।

*ঋগ্বেদে আছে—পূষন্ (সূর্য) একসময়ে তাহার মাতার দিধিষ (বিধবার স্বামী) হইয়াছিল।
**মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী ব্রহ্মা নিজের যে কন্যাগমন করেন তাহার এক নাম শতরূপা।

এ্যাডলার ও ইয়ুং (Adler and Jung)

ফ্রয়েড-এর বিরোধীরা বলেন, প্রত্যেক রূপকেরই যে এক যৌন পশ্চাৎ-ভূমি থাকিতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। দ্বন্দ্বের একটি মূল কারণ আবিষ্কার করিতে গিয়া এ্যাডলার বলিয়াছেন যে, শৈশবকালে নিজেদের নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে যে একটি বদ্ধমূল ধারণা (হীনভাব বা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স) আমাদের থাকে পরিণত বয়সে তাহা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সহিত দূর করিয়া সাফল্যের নেশায় আমরা মাতিয়া থাকি এবং সাফল্যের জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা করিয়া থাকি। শৈশবকালে নিজেদের হীনতাভাবের উৎপত্তি হইল গুরুজনের বিবিধ শাসন এবং সমস্ত ব্যাপারে আদেশ করিবার প্রবৃত্তির মধ্যে। পরিণত বয়সে এই সব তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতিই আমাদের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

ইয়ুং এই ব্যাপারে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন অবচেতন মন শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, গোত্রীয়ও বটে। অবচেতন মনে অতীতের জাতীয় বা গোত্রীয় স্মৃতিগুলি বেশ ক্রিয়াশীল। এই বিশেষ মতটি অবশ্য আধুনিক বংশগত (Heredity) সম্বন্ধে মতবাদ খণ্ডন করিয়াছে।

তবে একটি মূল্যবান কথা হইল, শিশুকালীন যৌন-অভিজ্ঞতাই পরিণত বয়সের দ্বন্দ্বের একমাত্র কারণ নয়—পরিণত বয়সের মনও সেই দ্বন্দ্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত!

আমাদের মতে, উপরিউক্ত তিনটি মতবাদেই সত্যের এক বড় অংশ অস্পষ্ট রহিয়াছে কিন্তু কোনটিকেই, বা তিনটি মিলাইয়াও যাহা দাঁড়ায় তাহাকেও, সমগ্র সত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

মানুষের মানসিক প্রক্রিয়া বা ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট 'ছক'-এ বাঁধা সম্ভবপর নয়। উভয়েরই পেছনে জটিল সূক্ষ্ম হাজারো রকমের প্রবৃত্তি ও আকৃতি কার্যশীল।

যৌন প্রবৃত্তির গুরুত্ব

যৌন-অনুভূতি জীবন ও সমাজের সব স্তরে ছড়াইয়া আছে, ফ্রয়েড-এর এই কথাটিকে সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির নিমিত্ত এই প্রবৃত্তি আমরা অবশ্য দমন করিতে শিখিয়াছি এবং জন্তু জগতে যে যৌন-যথেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান, তাহা হইতে নিজেদিগকে দূরে রাখিয়াছি। অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক যৌনানুভূতির সহিত পরিণত বয়সে

আদর্শবাদ বা নৈতিকতার যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া প্রায় প্রতিটি উপন্যাস ও নাটক রচিত হয়। অসুখী বিবাহে প্রেম ও বিদ্বেষ, শারীরিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, আশা এবং ক্ষোভ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সামাজিক আদর্শ একই সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাহা উপন্যাস ও নাটকের উপাদান হইয়া থাকে। শুধু নাটক উপন্যাসই নহে, বাস্তব জীবনও যৌন-আবেগ-বিতৃষ্ণার প্রশস্ত লীলা ক্ষেত্র। লেখকেরাও নিজের এবং পরিচিতদের ঐ সমস্ত ভাবের এবং তদনুযায়ী নানা ঘটনার ফাঁকগুলি কল্পনাবলে পূরণ করিয়াই কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেন।

(২০)

যৌনবোধ ও লজ্জাশীলতা

(Sex and Modesty)

সলজ্জভাব

অন্যান্য পশুর মত মানুষের যে আদিম সহজাত যৌনবৃত্তি রহিয়াছে উহাই সংস্কার হইয়া মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। যৌন-কামনার অবাধ উপভোগের বিরুদ্ধেই ক্রমবিকাশ পাইয়াছে সঙ্কোচ ও সলজ্জভাব। লজ্জাকে তাই—ভয়, সঙ্কোচ ও গোপনীয়তা রক্ষা করিবার উৎকণ্ঠা ইত্যাদির একটা সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। যৌন-আচরণকে কেন্দ্র করিয়াই উহার বিকাশ হয়। নারীর সঙ্কোচ ও সলজ্জভাব পুরুষকে উত্তেজিত করে। নারীর যৌন-কামনা সঙ্কোচের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। পুরুষকে প্রতিটিবার প্রেম নিবেদনের দ্বারা তাই তাহার লজ্জার বাঁধ ভাঙিয়া তাহাকে নূতন করিয়া জয় করিতে হয়। শিশুর কোনও লজ্জা থাকে না। সে উলঙ্গ অবস্থায় চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করে—রীতি-রেওয়াজের কোনও ধার ধারে না। কিন্তু কিছুকাল পর হইতেই মাতা পিতা, গুরুজন উহার অবাধ কার্যক্রমে বাধা দেন এবং কি করা উচিত বা অনুচিত তাহার ক্রমাগত নির্দেশ দিতে থাকেন। যৌন-অঙ্গসমূহকে লজ্জার কেন্দ্র বলিয়া বুঝাইতে থাকিলে শিশুর মনে লজ্জার ভাব উদিত ও প্রকটিত হইতে থাকে। সভ্যসমাজের সংস্কার লজ্জার সৃষ্টি করে।

লজ্জার বিশ্লেষণ

সহজাত-লজ্জার পূর্ণ বিকাশ ঘটে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে। ইহা বিনয়, ভীরুতা, সঙ্কোচ, অস্বীকৃতি ইত্যাদি ভাবেরই সমাবেশ। মানুষ ও অপরাপর প্রাণীজাতির মধ্যে যৌনলজ্জা স্ত্রীলিঙ্গের যৌন-অসামর্থ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য জ্ঞাপন করে। নিজেকে যৌন-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উহা অস্ত্র বিশেষ। এই অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবার পর নারীজাতি উত্তেজনার সময়েও উহা একেবারে প্রত্যাহার করিতে পারে না। তাই মনে মনে কামনা করিতে থাকিলেও উহারা সঙ্কোচ, কুণ্ঠা ও অস্বীকৃতির ভাব দেখাইতে থাকে। পুরুষজাতি ঐ সকল ভাব দূর করিয়া তাহাদের জয় করে।

হ্যাভলক্ এলিস বলিয়াছেন, নারীজাতির এইরূপ লজ্জাশীলতা, যৌন-আচরণের ক্ষেত্রে, পুরুষজাতির সহজাত আক্রমণাত্মক ভাব অপেক্ষা আত্মরক্ষা-মূলক মনোভাবের বিশেষ কারণ এই যে, স্ত্রীজাতির যৌন-কামনা সাময়িক এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ে তাহাদের পুরুষ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হয়—পুরুষের এইরূপ কোনও প্রয়োজন থাকে না।"

প্রাচীন যুগে নারী ও পুরুষ যৌনক্রিয়া বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর, অথবা বেকায়দায় আক্রমণ করিতে পারে এমন যৌনশত্রুর, ভয়ে শঙ্কিত থাকিত। নর্থকোটের (Northcote) মতে, গোপনে যৌনক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা ও এই ভয়ের কারণ এই যে, যৌনক্রিয়া গোপনে সম্পাদন করা অতি স্বাভাবিক। যেহেতু কোনও গোপনীয় জিনিসকে খারাপ মনে করা ইহারই পরবর্তী ধাপ মাত্র. ইহা সহজেই বোধগম্য হওয়া উচিত—কেন বর্তমানে যৌনমিলন চৌর্যবৃত্তির সামিল এবং উহা হইতে লব্ধ আনন্দকে পঙ্কিল মনে করা হয়।

লজ্জার সামাজিক উপাদান বিরক্তি ও ঘৃণার ভাবের মধ্যে নিহিত। বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিরক্তির বস্তু ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু প্রতিক্রিয়া প্রায় একই প্রকারের। জনসাধারণ চিরকালই মলমূত্রকে ঘৃণ্য মনে করে। সুতরাং মূত্র-পথ হইতে নির্গত শুক্রকেও অপবিত্র মনে করে। ঐ মনোভাবই ধর্মমতের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাবকেও অপবিত্র মনে করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে—সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহকেও ঘৃণা উদ্রেককারী (abnoxious) মনে করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইত। এমন কি, প্রত্যক্ষভাবে উহাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ না করিয়া পরোক্ষভাবে উহাদের নাম উল্লেখ করা হইত। এবং এখনও এই মনোভাব বিদ্যমান।

বংশপরম্পরাগত এই সামাজিক মনোভাবের দরুনই—আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মহিলা গোপনাঙ্গ সম্বন্ধে এত লজ্জিতা যে, মারাত্মক রোগে ভুগিলেও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ কিংবা শরীর পরীক্ষা করিতে দিবেন না। অল্প কিছুদিন পূর্বে এমন কি বিজ্ঞান-লেখকেরা পর্যন্ত এই অহেতুক কুসংস্কারের প্রভাবাধীন ছিলেন। ডি গ্রাফ (De Graaf) এবং তাঁহার পরে লিন্নাস (Linnaes) স্ত্রীলোকের যৌনঅঙ্গ-সমূহের বর্ণনা করিতে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। এখন অবশ্য এই সেকেলে অহেতুক মনোভাবের অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জ্ঞান-বিতরণের আগ্রহে লেখকেরা আর কুণ্ঠাবোধ করেন না। হ্যাভলক্ এলিস লজ্জা সম্বন্ধে সংক্ষেপে মন্তব্য করিয়াছেন: এইভাবে আমরাও

লজ্জার উপাদানের মধ্যে দেখিয়াছি—(১) আদিম পশুদের মধ্যে স্ত্রীজাতির যৌন-অস্বীকৃতি জ্ঞাপন অর্থাৎ জীবনে প্রজনন ও প্রসূতি অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা পুরুষ প্রাণীর সহবাস কামনা করিত না। (২) বিরক্তি ও ঘৃণা উৎপাদনের ভয়। মলমূত্র ত্যাগের অঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সন্নিবিষ্ট থাকার দরুন যৌন-অঙ্গগুলিও বিরক্তিকর ও ঘৃণাব্যঞ্জক মনে করা হইত। (৩) যৌনাঙ্গ আচ্ছাদন না করিলে তাহার উপর যাদুবিদ্যার প্রভাবের আশঙ্কা। উৎসবাদি ও বিবাহের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এই ভয় নিবারণের জন্যই প্রতিষ্ঠালাভ করে। আস্তে আস্তে সামাজিক ভদ্র ব্যবহার এই লজ্জারই রক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (৪) অলঙ্কার ও পোষাকের ক্রমবিকাশ। উহাদ্বারা একদিকে লজ্জা-নিবারণ ও অপরদিকে বিকল্পে পুরুষের কামনাকে উদ্দীপিত করা হয়। (৫) স্ত্রীলোককে সম্পত্তি হিসাবে ধরিয়া লওয়া।

মোটের উপর নানা উপাদান মিলিয়া লজ্জা গঠন করিয়াছে।

যৌন-ক্ষেত্রে বক্রোক্তির প্রসার

মানবসমাজে লজ্জাশীলতার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, যৌন-অঙ্গ ও যৌন-আচরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষণ অপেক্ষা বক্রোক্তিরই বেশী প্রচলন। স্পষ্ট ভাষণকে অশ্লীল ও নির্লজ্জ মনে করা হয়—শালীনতা বজায় রাখা হয় অস্পষ্ট বা পরোক্ষ নির্দেশের সাহায্যে। সভ্য ও অসভ্য উভয় জাতিদের মধ্যেই ছদ্ম পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। এইজন্য কামশাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত ভদ্রপুস্তকাবলীতে কামোপভোগের অঙ্গগুলি সম্বন্ধে, ইতর সমাজে বহু প্রচলিত শব্দগুলি অপেক্ষা অপ্রচলিত অথবা খুব কম প্রচলিত শব্দগুলিই ব্যবহৃত হয়।

বাইবেলে কোথায়ও কোথায়ও স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করা হইয়া থাকিলেও কোরানে অতি শালীন ইঙ্গিতে যৌনব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপের আলোচনা করা হইয়াছে। নাটক-নভেলে ড্যাশ, সাদা জায়গা ছাড়িয়া দেওয়া, তারকা চিহ্ন ইত্যাদির সাহায্যে অনেক কিছু বুঝিয়া লইবার ইঙ্গিত করা হয়।

বিজ্ঞানের প্রভাবে স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রচলন হওয়ায় এখন আর **অহেতুক অতি লজ্জা** (Prudery) অতটা কার্যকরী নয়। সভ্যদেশে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনের তাগিদে স্পষ্ট ভাষণ ও সঠিক নির্দেশ—অজ্ঞতা অপসারণে কার্যক্ষম হইয়াছে। নিজে বলিতে পারিব না, অন্যেও পারিবে না অথচ প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে, রোগ, অস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি দূর করিতে হইবে, অজ্ঞানের অকল্যাণ হইতে নর ও নারীকে মুক্ত করিতে হইবে—অহেতুক অতি লজ্জায় তাহা কি করিয়া সম্ভব ?

সামাজিক
ও
ব্যক্তিগত সমস্যা
ও
সমাধান

যৌনবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ—সামাজিক সমস্যা

বিবাহপ্রথা—উহার সমাধান

আমরা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যৌনবোধের তীব্রতার যে ব্যাখ্যা এবং উহার তৃপ্তির যে বহুমুখী প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে মনে হওয়া উচিত যে, নর ও নারীতে ঐরূপ অবাধ সমাজসম্মত যৌনতৃপ্তির সুযোগ-সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন সমাজের সকল স্তরেই প্রকট হইয়াছে। নানা কারণ পরম্পরায় নানাদিক বিচার করিয়া সমাজ উহার সমাধান করিয়াছে **বিবাহ-প্রথার** প্রবর্তন করিয়া।

পৃথিবীর সকল স্থানে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে **প্রায় সার্বজনীন** ভাবে এই অনুষ্ঠানটি দেখা যায়। কামনা তৃপ্তির জন্য একজন সাথীর প্রয়োজন হয়। যদি শুধু 'কর্তার ইচ্ছায়ই কর্ম' বা 'ভোগেচ্ছুর ইচ্ছাতেই ভোগ'—এইরূপ ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে একজনের স্বেচ্ছাচারিতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত অপরের বা অপর সকলের। ইহাতে একজনের স্বাধীনতা থাকিত যেমন অবাধ, অপর জনের অধীনতা হইত তেমনি নিরবচ্ছিন্ন। শুধু দুইজনের সম্মতির উপরেও যদি সমাজ সকল ভার ছাড়িয়া দিত তবুও ঐরূপ সম্মতি প্রকৃত কিনা, সম্মতি দিবার যোগ্যতা একের বা উভয়ের হইয়াছে কিনা, পারস্পরিক উপভোগের ফলস্বরূপ যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে তাহার ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য একের বা উভয়ের আছে কিনা, সেই দুইজনের বিবাহ হইলে কোন সামাজিক অনিষ্ট বা বিশৃঙ্খলা হইতে পারে কিনা ইত্যাদি বিষয়ও সমাজের নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ থাকার প্রয়োজন থাকিত, নতুবা সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য।

বিবাহপ্রথা একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ভোগেচ্ছা, অপর দিকে দায়িত্ববোধ ও সমাজশৃঙ্খলার মধ্যে **সামঞ্জস্য-বিধানের সাধু-প্রচেষ্টা মাত্র।** ইহা **চিরকালের জন্য** মানিয়া লইতে হইবে এমন নহে,—তবে **উৎকৃষ্টতর পন্থার অভাবে** এখন উহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের চলিতে হইবে।

এই প্রথা সমাজেরই বিচারসাপেক্ষ। উহার সংশোধন দরকার হইলে সমাজ তাহাও অবশ্যই করিবে। সংশোধনের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে সংস্কারমুক্ত বিচার বুদ্ধির সহায়ে সাধারণভাবে বিবাহের সুবিধা-অসুবিধা, দোষ-গুণ এবং প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতিসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে।

আমরা এই ব্যবস্থার ইতিহাস, প্রসার, প্রকার, দোষ ও গুণ যথাযথভাবে পাঠক-পাঠিকার সমক্ষে উপস্থাপিত করিব। সমাজেরই লোক হিসাবে এবং উহার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিব না।

বিবাহের সংজ্ঞা

হ্যাভলক্ এলিস্ বিবাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—**বিবাহ বলিতে সাধারণত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সাময়িক বা আজীবন দৈহিক এবং সন্তান-পালনের সম্মতিযুক্ত সম্পর্ক বুঝায়।**

এলিস্ এই সংজ্ঞায় সন্তানের উপর জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্তান-পালনের ইচ্ছা না থাকিলেও বিবাহ বলবৎ থাকিতে পারে, কিন্তু ঐরূপ সম্পর্কে সমাজ বা প্রকৃতির কিছুই যায় আসে না।

আমাদের মতে ঐ সংজ্ঞাকে আরও একটু ব্যাপক করা দরকার। আমরা বলিব : **ধর্ম, সমাজ কিংবা আইন কর্তৃক স্বীকৃত বিপরীত-লিঙ্গের ব্যক্তির স্থায়ী, অথবা বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের নামই বিবাহ।**

উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, **বিবাহের মধ্যে তিনটি মূল সূত্র** বিদ্যমান আছে—

(১) **বিপরীত-লিঙ্গের লোকের প্রয়োজন।** বিবাহের যার প্রধানত দেহসম্পর্ক-স্থাপনই উদ্দেশ্য বলিয়া বিপরীত-লিঙ্গ হওয়া প্রয়োজন। (২) ঐ সম্পর্ক স্থায়ী হইবে, অন্তত বিচ্ছেদ পর্যন্ত, এইরূপ আশা থাকা চাই। (৩) এই সম্পর্ক ধর্ম, সমাজ কিংবা আইনের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া চাই।

এক পুরুষের বহু স্ত্রী বা এক নারীর বহু স্বামী বিবাহ প্রথাও স্বীকৃত ছিল ও আছে।

এই তিনটি শর্তের সব কয়টির পূরণ না হইলে তাহাকে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়:

(১) একই লিঙ্গের দুই ব্যক্তির দৈহিক সম্পর্ককে **যৌনসহযোগিতা** বা **সমলৈঙ্গিক সম্বন্ধ** (Homosexual Relation) বলা যায়, উহাকে **বিবাহ** বলা যায় না।

(২) গণিকা বা উপপত্নীর সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হইলেও উহা সাময়িক বলিয়া অর্থাৎ স্থায়িত্বের সম্ভাবনাযুক্ত নয় বলিয়া উহাকে বিবাহ বলা যায় না। স্থায়িত্বের সম্ভাবনাযুক্ত হইলেও ধর্ম, সমাজ বা আইন ঐরূপ সম্বন্ধকে স্বীকার করে না বলিয়াও উহা বিবাহ নয়। তবে বারনারী বা উপপত্নীকে (প্রথা থাকিলে) বিবাহ করিয়া লওয়া যায় বটে।

(৩) পরস্পরের সম্বন্ধ নিজেদের কাছে যতই মধুর হউক না কেন, ধর্ম, সমাজ বা আইন উহা স্বীকার না করিলে উহাকে বিবাহ বলা যায় না। আইনে স্বীকার না করিলেও ধর্মত বিবাহ হইতে পারে; যথা **বাল্যবিবাহ**। ধর্মে ও সমাজে স্বীকার না করিলেও আইনতঃ বিবাহ হইতে পারে, যথা **সিভিল ম্যারেজ** অথবা ডক্টর হরি সিং গৌড়ের Inter-Caste Marriage Act অথবা ১৯৫৫ প্রবর্তিত বিশেষ বিবাহ আইন (Special Marriage Act) অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ।

বিবাহের ইতিহাস

অনেকের মতে, আদি মানব সমাজে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। মানুষ তখন পশুপক্ষীর মত ইচ্ছামত যাহার-তাহার সঙ্গে যখন তখন উপগত হইতে পারিত। বিবাহপ্রথার দ্বারা মানুষের সম্ভোগকে সংযত ও নিয়মাধীন করা হইয়াছে। সুতরাং **প্রকৃতপক্ষে বিবাহপ্রথা যৌন-মিলনের সুবিধার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই; উহা সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই করা হইয়াছে**। অন্যান্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের মত বিবাহও একটা অনুষ্ঠান মাত্র। মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেদের সর্বাপেক্ষা তীব্র বৃত্তির উপর এমন কঠোর নিয়মের বল্গা পরাইয়া দিলে কেন?

ডঃ ওয়েষ্টারমার্কের The History of Human Marriage একটি অমূল্য অবদান। ফিনল্যাণ্ডে ইহার জন্ম হয় কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিখিয়া ইনি ইংরেজীতেই এই তথ্যবহুল ইতিহাস লেখেন। যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া, এমন

কি, ৬ বৎসর কাল মরক্কোতে বাস করিয়া স্থানীয় ভাষা শিখিয়া লোকদের সঙ্গে মিশিয়া তিনি ব্যবস্থা-অনুষ্ঠানাদির কথা ভালভাবে পর্যালোচনা করেন।

তাঁহার মতে, **পরিবারপ্রথাই** বিবাহের উৎস। মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার পরে বহুদিন পর্যন্ত অসহায় এবং পরনির্ভরশীল থাকে। মাতা বা পিতার বা উহাদের স্থলাভিষিক্ত কাহারও বা কাহাদেরও আদর-যত্নে প্রতিপালিত হওয়া উহার জীবনধারণের জন্য একান্ত দরকার। প্রাণীজগতে পাখী বা পশু-বিশেষের মধ্যেও এইরূপ দেখা যায়। জন্মদাতা পুরুষ ও গর্ভধারিণী মাতা একত্রে বাস করিয়া সন্তানের প্রতিপালন করিয়া থাকে। তাহাদের দৈহিক সংস্পর্শের সঙ্গে-সঙ্গেই সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া যায় না। আমাদের পূর্বপুরুষ বানরজাতীয় জন্তুদের মধ্যেও মানুষের মত শিশুর অসহায় অবস্থা দৃষ্ট হয় এবং উহাকে ঘিরিয়া জনকজননী পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করে।

মানুষের মধ্যেও জনক ও জননী পরস্পরের প্রণয়ে এবং অপত্যস্নেহে আবদ্ধ হইয়া বসবাস করিত এবং সন্তানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের লইয়া পরিবার গড়িয়া উঠিত। এই পরিবারপ্রথা মানুষের সকল স্তরেই দেখা যায়।

প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে **জনকের উপর পরিবারের ভরণপোষণ ও রক্ষা করিবার দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব গড়িয়া উঠে এবং জননীর উপর সন্তান-পালন ও পরিবারের সুখ-সুবিধা ও শান্তি বিধানের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ঐ সকল দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে সমাজ ও আইনের দ্বারা সমর্থিত এবং সংরক্ষিত হইতে হইতেই বিবাহপ্রথা উদ্ভূত হইয়াছে।**

লাবক, মর্গান, ব্যাকোফেন্, ম্যাক্লেশান্, ব্যাষ্টিয়ান্ ও উইল্ক্যান্স প্রভৃতি সমাজ-বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, মানুষ যখন সভ্যতার দিকে একপদ অগ্রসর হইয়া সমাজবদ্ধ হইল, তখন হইতে বিবাহ-প্রথার প্রচলন হইল। কারণ, এই সময়ে মানুষ দলবদ্ধভাবে ইতস্তত বিচরণ করিত। এক দল আর এক দলের প্রতি বিশেষ শত্রুভাবাপন্ন ছিল। এই দলগত শত্রুতার জন্য প্রত্যেক দলই আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার দিকে সর্বদা তৎপর থাকিত। **আভ্যন্তরীণ শান্তি এবং সন্তানের পালন ও রক্ষা, সুতরাং লোক-বলবৃদ্ধি,** এই দুইটি অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যের জন্যই বিবাহ-প্রথা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিবাহ প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে অন্যথায় নারীরূপ সম্পত্তির **অধিকার ও ভাগবাঁটোয়ারা** লইয়া **ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা ও বাদবিসম্বাদ** হইত। ইহাতে দলের লোকদের **ঐক্য প্রীতি ও সংহতি** নষ্ট হইত। সেই জন্য দলের কর্তা নিজের ইচ্ছামত যৌন-মিলনের ব্যক্তি নির্দেশ করিয়া দিতেন। ইহাই ক্রমে বিবাহের অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

লোকবলবৃদ্ধির জন্য বিবাহের প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে, জনক ও জননী **উভয়েই** সন্তানের লালন-পালনে যত্নবান হইলে, শিশুর পিতা তাহার মাতাকে রক্ষা ও তাহার ভরণপোষণ করিলে তবেই তাহার জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়।

মানব-সভ্যতার ঐ স্তরে **নারী, পুরুষের বাসনাপূরণের পাত্রী ও মানুষ-তৈয়ারীর যন্ত্ররূপেই গণ্য** হইত। সেইজন্য দলগত যুদ্ধবিগ্রহে গরু, ঘোড়া, উট প্রভৃতি সম্পত্তি দখল করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নারী দখল করিবারও চেষ্টা করিত। যুদ্ধে পরাজিত দলের পুরুষদের হত্যা করিয়া নারীদিগকে বন্দিনীরূপে আনয়ন করা হইত এবং বিজয়ীদলের পুরুষদের মধ্যে উহাদিগকে বণ্টন করা হইত। এইভাবে বিজয়ী দলের এক একজন পুরুষের দখলে বহু নারী থাকিত। **বহুবিবাহের সূত্রপাতও** বোধ হয় এই ভাবেই হয়। ইহাদের দ্বারা তাহারা সন্তানোৎপাদন করিয়া নিজেদের দলের লোকবল বৃদ্ধি করিত। অবিবাহিত পুরুষ এবং অনুর্বর স্ত্রী উভয়কেই ঘৃণা করা হইত। যথাসম্ভব সন্তানবৃদ্ধি করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করা হইত।

সভ্যতার পরবর্তী ধাপে পদার্পণ করিয়া পুরুষ নারীকে আরও একটু অধিকার ছাড়িয়া দিল। সন্তানোৎপাদনের পর সন্তান-পালনের বেলায় নারীর প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া এবং গৃহকর্মের অনেকখানি দায়িত্ব তুলিয়া দিল। এইভাবে নারী **দাসীত্ব** হইতে **গৃহকর্ত্রীত্বে** অধিষ্ঠিত হইল।

ইহার পরবর্তী ধাপে নারী পুরুষের **সহধর্মিণীরূপে** গৃহীত হইল। এই সময় হইতে বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য বিবাহ একটা ধর্মমূলক অনুষ্ঠানে উন্নীত হইল এবং বিবাহে মন্ত্র-আবৃত্তি, যাগযজ্ঞ, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ইত্যাদি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

ইহা **পিতৃতান্ত্রিক সমাজের (Patriarchy)** মোটামুটি ইতিবৃত্ত।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ

ইহা ব্যতীত মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরও (Matriarchy) প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর সমাজে **মাতাই** ছিল পরিবারের **মূল** এবং সন্তানের **অভিভাবক**। নারী নিজেই ইচ্ছামত যে-কোনও পুরুষের দ্বারা স্বীয় গর্ভে সন্তানধারণ করিত, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং সেই সন্তান মাতার পরিচয়ে পরিচিত হইত।

আজকাল অসভ্য জাতিদের মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবারের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলে গারো পাহাড়ের পাদদেশে যে সমস্ত **গারো** বাস করে, তাহাদের রীতিনীতির বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'সাংসারিক' বলে। ইহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছেলেরা হয় না—মেয়েরাই হইয়া থাকে। মেয়েরা সম্পত্তি অধিকার করিয়া বাড়ীতেই থাকে। অন্য পরিবারের উপযুক্ত ছেলে-দিগকে ধরিয়া আনিয়া বা উহাদের সম্মতিক্রমে মেয়েদের সহিত বিবাহ দিয়া সংসারভুক্ত করা হয়, বর ও কন্যা দুইজনকে বসাইয়া সমাজের নেতা বা পুরোহিত একসঙ্গে তাহাদের গাত্রস্পর্শ করে। দুইটি মোরগও বরকন্যাকে ছোঁয়াইয়া মারা হয়। তালাকের প্রথাও প্রচলিত আছে। **কিন্তু তালাকের পর স্ত্রীর সম্পত্তি স্ত্রীরই থাকিয়া যায়।** বিধবারা পুনরায় বিবাহ করে।

এইরূপ সমাজব্যবস্থা অষ্ট্রেলিয়া, মধ্য-আফ্রিকা এবং বোর্নিওর অনেক আদিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায়।

আসামে **শিলং পাহাড়ে** ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে **খাসিয়াদের** মধ্যে সামাজিক অনুশাসন 'মাতৃবিধি' (Matriarchal system) অনুসারে চলে। তাহাদের পরিবারের মাতাই সর্বময়ী কর্ত্রী এবং মাতার নিকট হইতেই পরিবারের অন্য সকলে বংশগোত্রাদি প্রাপ্ত হয়। নারীরা সর্ববিষয়ে প্রাধান্য পাইয়া থাকে। উহাদের সমাজে এখনও নারীর আর্থিক কর্তৃত্ব লোপ পায় নাই। উহাদের সমাজে কন্যা জন্মিলে মাতাপিতা আতঙ্কিত হয় না, পুলকিতই হয়। বিবাহের পর স্বামীকে স্ত্রীর গৃহে আসিয়া বাস করিতে হয়।

মালাবারে **নায়ার** জাতির মধ্যেও ঐরূপ সমাজপ্রথা দেখা যায়। পাত্র বিবাহের পর পাত্রীর বাড়ীতে গিয়া বাস করে এবং ছেলেরা মামার সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী হয়, পিতার সম্পত্তির নয়। বর্তমানে সভ্যতার যুগে নারী **সহ-ধর্মিণীর** স্তর হইতে **সহকর্মিণীর** স্তরে আরোহণ করিয়াছে। **এখন নারী জ্ঞানবিজ্ঞানে, যুদ্ধবিগ্রহে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সর্বত্র নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইতেছে।** নিজের হাত খরচ বা জীবিকার জন্য সে আর পুরুষের গলগ্রহ থাকিতে প্রস্তুত নহে। এই স্তরের বিবাহে নারীকে তাহার **জবীনসহচর** নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সংক্ষেপে ইহাই বিবাহের ইতিহাস। সুতরাং দেখা যাইতেছে, **বিবাহপ্রথা বহুলাংশে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।**

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

বিপরীত অবস্থা—যৌন যথেচ্ছাচার না ব্রহ্মচর্য

এখন প্রশ্ন এই, মানব-সভ্যতার আদিম যুগে যাহার প্রয়োজন ছিল, আজিও তাহার কোনও **প্রয়োজনীয়তা** আছে, না মানুষ কেবল জন্মগত সংস্কারবশে পিতা-পিতামহের **প্রথার মর্যাদা রক্ষা** করিয়া আসিতেছে?

একথার যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে গেলে আমাদিগকে বিবাহের বিপরীত অবস্থাটা পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বিবাহপ্রথা উঠাইয়া দিলে আমরা মাত্র দুইটি অবস্থা কল্পনা করিতে পারি: প্রথমত **সম্পূর্ণ কামদমন বা আজীবন ব্রহ্মচর্য**, দ্বিতীয়ত **যৌন-নির্বিশেষত্ব**।

ব্রহ্মচর্যের ধর্মীয় ব্যাখ্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও এ সম্বন্ধে দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এক দলের অভিমত এই যে, 'ইন্দ্রিয়দমন' অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য দান করে, এবং নৈতিক শুচিতা, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও ভগবানলাভের সহায়। পক্ষান্তরে, অপর দলের মত এই যে, উহা উন্মাদ, মস্তিষ্কবিকার, হিষ্টিরিয়া, শুচিবাই, কলহ-পরায়ণতা প্রভৃতি স্নায়বিক রোগের প্রধান হেতু। এই দুই মতেই বিশেষ অতিশয়োক্তি আছে। ইন্দ্রিয়সংযমেই মানুষ বিকৃতিমস্তিষ্ক হইয়া পড়ে এ কথাও বলা যেমন অন্যায়, উহাতে মন ও দেহের কোনও অনিষ্ট হয় না, বরং অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয়, এ কথা বলাও তেমনই অসঙ্গত।

আমরা যৌননিষ্ঠা-প্রসঙ্গে এই খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করিব, তথাপি এখানেও কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। কারণ, এ দেশে এক দিকে সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রের ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মূলত শাস্ত্র অনুগত প্রাচীন পন্থীদের অভিমত প্রথমোক্তরূপ, আবার অপর দিকে আধুনিক শরীর-বিজ্ঞানের শেষোক্তরূপ সুদৃঢ় অভিমত দেখা যায়।

যৌন-নিবৃত্তির সুযোগ

ফলত ইন্দ্রিয়দমন মানুষের পক্ষে **স্বাভাবিক নহে** বলিয়াই উহা দূষণীয়। কোনও কোনও লোকের তাহাতে যদি দৃশ্যমান কোনও অনিষ্ট

নাও হয়, তথাপি উহা দূষণীয়। কারণ, দুই-একজন লোকের দেহ ও মনের মাপকাঠিতে সমস্ত লোকের দেহমনের বিচার করা চলে না। ফ্রয়েড বলিয়াছেন, **সাধারণ সামাজিক মানুষ যৌন-নিবৃত্তির উপযুক্ত নহে, সুতরাং জোর করিয়া এই কঠোর কর্তব্য মানুষের ঘাড়ে চাপাইলে তাহার উপর অত্যাচার করা হইবে।**

বিধবাবিবাহ-বিরোধীদের ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত। বিবাহে অনিচ্ছুক বা অসুখী ব্যক্তিদেরও অপরের ক্ষেত্রে নিজেদের অভিমত চাপাইবার স্পৃহা দমন করা উচিত। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, **সমস্ত বৃত্তির সুসংযত বিকারের নামই সুখময় ও সম্পূর্ণ জীবন।*** কোনও বৃত্তিকে পুষ্ট বিকাশের সুবিধা না দিয়া উহাকে নিরুদ্ধ করা অন্যায়। তাহা হইলে প্রকৃতির ব্যবস্থার সফলতাই অস্বীকার করা হয়। সেইরূপ কোন ইন্দ্রিয়, বৃত্তি বা শক্তির অপব্যবহারও অন্যায়।

ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা মানবদেহের দৃশ্যমান কোনও বিরাট অনিষ্ট না হইলেও সুস্থ ও সবল মানুষের যে উহাতে **স্বাস্থ্যহানি হয় এবং মনে অশান্তি** আসে এ বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে কোনও **মতভেদ নাই।** স্থির বুদ্ধি ও সূক্ষ্মবিচারী পণ্ডিত বলিয়া ডাঃ নাকের নাম আছে। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—**"সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়দমন স্বাস্থ্যহানিকর, এ বিষয়ে আর মতভেদ থাকা উচিত নহে।"**

ডাঃ ফ্রয়েড ও অন্যান্য বহু বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, যৌন-বিরতি দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বাস্থ্যহানি হয় বটে, কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা **নারীর অনেক বেশী অনিষ্ট হয়।** ইহার কারণ এই যে, পুরুষের কাম তীব্রতর এবং উহা যে কোন সময়ে সামান্য শারীরিক বা মানসিক উদ্দীপক দ্বারা উত্তেজিত হয়। পক্ষান্তরে, নারীর কাম (১) অপেক্ষাকৃত মৃদু, (২) তাহা ঋতুর ২-৩ দিন পূর্বে ঋতুকালে এবং স্রাব বন্ধ হইবার পর ৫-৭ দিন যাবৎ কথঞ্চিৎ থাকে, মাসের অপর সময়ে সহজে জাগে না এবং (৩) পুরুষের তুলনায় মানসিক উদ্দীপক সমূহে সে সাড়া কমই দেয়। নারীর যাবতীয় যৌনযন্ত্রাদি সন্তানধারণের উপযোগীই শুধু নহে, উহারা মাসে মাসে উহার জন্য প্রস্তুত ও উন্মুখ থাকে।

বিধবাবিবাহ-বিরোধী ব্যক্তিদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ক্যাথারিন ডেভিস এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। তিনি ১২০০ উচ্চ-

* সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অনুশীলন ধর্মতত্ত্ব' পুস্তক দেখুন।

শিক্ষিতা কুমারীর নিকট পত্রের দ্বারা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি কি মনে করেন যে, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যৌনমিলন অবশ্য প্রয়োজনীয়?" এই প্রশ্নের উত্তরে এক হাজার মহিলার মধ্যে ৩৭৪ জন উত্তর দিয়াছিলেন, 'হাঁ'। অবশিষ্ট যাঁহারা সোজাসুজি 'হাঁ' বলেন নাই, তাঁহারাও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

জার্মানীর অন্তর্গত কলোনের ডাঃ মিরস্কী ৮৬ জন চিকিৎসক সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, উক্ত ৮৬ জনের মধ্যে মাত্র একজন বিবাহের পূর্বে নারীসম্ভোগ করেন নাই। মিঃ এলিস্ ডাঃ মিরস্কীর গবেষণা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে কলোন অপেক্ষা অনেক বেশী লোক বিবাহের পূর্বে যৌনপবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু যাহারা তখন নারীসম্ভোগ করে না, তাহারা সকলেই স্বমেহনে লিপ্ত থাকে।

বিখ্যাত বহুদর্শী চিকিৎসক ডাঃ রোহেল্ডার বলিয়াছেন যে, **সত্যকারের যৌনসংযম বলিয়া কোনও জিনিস দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই।** যাহারা নারীসম্ভোগ করে না, তাহারা হয় হস্তমৈথুন বা অন্য কোনও রূপ স্বয়ংমৈথুন করিয়া থাকে, অথবা নিয়মিত স্বপ্নমৈথুন দ্বারা তাহাদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত থাকে। এই দুইটার একটাও না হইলে বুঝিতে হইবে **তাহারা রতিশক্তিহীন।**

যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, স্বাস্থ্যবর্ধক ব্যায়ামাদিতে এবং নিরামিষভোজনে খুব স্বাস্থ্যবান লোকেরও যৌনক্ষুধার সাম্য সাধিত হয়, মিঃ এলিস্ ও ডাঃ হার্সফেল্ড তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, নিয়মিত ব্যায়ামে যৌনক্ষুধা ও ক্ষমতা ত কমেই না, বরঞ্চ সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে বর্ধিত হইয়া থাকে। তবে এ কথা ঠিক যে অতিরিক্ত ব্যায়ামে যখন শরীরের উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হইতে থাকে তখন **স্বাস্থ্য ও শক্তির হানির সহিত যৌনক্ষুধারও** প্রশমন হয়। আর নিরামিষ আহার সম্বন্ধে তাঁহাদের মত এই যে, মাংসাশী হিংস্র সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি অপেক্ষা নিরামিষাশী গরু, ঘোড়া, ছাগল, প্রভৃতি অনেক বেশী রতিপ্রিয়।

মানুষের রতিশক্তিকে যৌনসম্ভোগে ব্যয় না করিয়া অন্য কোন মহত্তর কার্যে নিয়োজিত করা (sublimation) যায় না, তাহা নহে। কিন্তু উহাতে বিরত হইয়া মানুষ যে শক্তি রক্ষা করে তাহার সবটুকু সেই মহত্তর কার্যে প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহার অনেকটা অপব্যয়িত হইতে বাধ্য। ডাঃ ফ্রয়েড

একটি চমৎকার উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইঞ্জিন-চালনায় বাষ্পের চারি আনা মাত্র কাজে লাগে, বারো আনাই চিমনী দিয়া বা অন্য উপায়ে বাহির হইয়া যায়। (চারি আনা বারো আনার অনুপাত ঠিক নয়। কতকাংশ কাজে লাগে এবং কতকাংশ অন্য পথে ব্যয়িত হইয়া যায়—মোটের উপর ইহাই বুঝিতে হইবে।—গ্রন্থকার।) ঠিক সেইরূপ মানুষের শক্তি কোনও উচ্চতর আত্মিক সাধনার জন্য সঞ্চয় ও ব্যয় করিলেও তাহার বারো আনা অংশ নষ্ট হইয়া বিভিন্ন প্রকারে চারি আনা অংশ মাত্র উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর শক্তিতে পরিণত হইয়া জ্ঞান বা ধর্মসাধনায় সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু ইহাকে কিছুতেই শক্তির সদ্ব্যবহার বলা যাইতে পারে না।

পুত্রকন্যা-লাভ

এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে। **সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইলে যৌনমিলন ব্যতীত উহা হইতে পারে না।***

সন্তানবৃদ্ধি করিবার স্পৃহা সভ্য-অসভ্য প্রায় সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়। ধর্মও এই মনোভাবের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে।

চীনাদের মধ্যে বংশ না রাখিয়া যাইতে পারা পরম দুর্ভাগ্য মনে করা হইয়া থাকে, শুধু তাহাই নহে—গুরুজনের আত্মা নাকি পরলোকেও এই জন্য অভিশপ্ত হয়। **হিন্দুদের** মধ্যে 'পুৎ' নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে বলিয়া পুত্রলাভ করা কর্তব্য বিবেচিত হইত। পুত্র তর্পণ করিয়া পিণ্ড দিলে তবে পিতা ও পিতৃপুরুষ নাকি প্রেতলোক হইতে উদ্ধারলাভ করেন। কন্যাকে বয়স্থা হইবার পূর্বেই পাত্রস্থ করিবার ব্যবস্থা পালিত হইত। **হিব্রুজাতি** (ইহুদিরা) বিবাহকে অবশ্য কর্তব্য অনুষ্ঠান মনে করিত। কেহ বিবাহ না করিলে রক্তপাতের জন্য অভিশপ্ত হইত। এমন কি বিশ বৎসর বয়স্ক যুবককে বিবাহ করিতে আইনত বাধ্য করা যাইত। মুসা "Be fruitful and multiply" খোদার অভিপ্রায় বলিয়া প্রচার করিতেন।

খ্রীষ্টধর্মে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়: নারীকে হেয় ও দাম্পত্য ব্যবহারকে ঘৃণ্য মনে করা হইয়াছে। সেন্ট পল **কৌমার্যকে** বিবাহের উপরে স্থান দিয়াছেন। "He that giveth her (his virgin) in marriage doth

* অবশ্য পুরুষের শুক্রকীট যন্ত্রের সাহায্যে নারী-অঙ্গে প্রবেশ করাইয়া (Artificial Insemination) সন্তান জন্ম দেওয়া যাইতে পারে।

well, but he that giveth her not in marriage doth better." অর্থাৎ যে কন্যার বিবাহ দেয় সে ভালই করে, কিন্তু যে না দেয় সে আরও ভাল করে। তিনি আরও বলেন, "It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let each man have own wife, and let each woman have her own husband. অর্থাৎ নারীকে স্পর্শ না করাই ভাল। তবে ব্যভিচার এড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রী, এবং প্রত্যেক নারী স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। এই উক্তিতে বুঝা যায়, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন বিবাহে সম্মতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে ধর্মযাজক ও ধর্মযাজিকাদের মধ্যে অবিবাহিত থাকার প্রথা গড়িয়া উঠে।

যৌননিষ্ঠা প্রসঙ্গে আমি পূর্বেই খ্রীষ্টীয় ধর্মের শোচনীয় দিকটার প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি।

মুসলমানদের মধ্যেও পুত্রকন্যালাভ মানুষ হিসাবে সকল নর ও নারীর কর্তব্য মনে করা হয়। এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বিবাহ করা শ্রেয়ঃ। বলা হইয়াছে—"আন্নিকাহু নিস্‌ফুল ঈমান' অর্থাৎ বিবাহই অর্ধেক ধর্মপালনের তুল্য। পুত্রকন্যাকে কি করিয়া খাইতে দিব—এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে আশা দেওয়া হইয়াছে, খোদাই সকলের খোরাক দিয়া থাকেন।

সুতরাং **সৃষ্টিরক্ষা** এবং **মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা** করিতে হইলে **যৌন-মিলন মানিয়া লইতেই হইবে।** এই যৌনমিলন সংঘটন করিবার জন্য যদি আমরা কোন প্রকারের বিবাহ-প্রথা মানিয়া না লই তবে আমাদিগকে **যৌন-যথেচ্ছাচার** মানিয়া লইতে হয়।

যৌন-যথেচ্ছাচারে বিপত্তি

সম্বন্ধবিচার না করিয়া যাহার তাহার সঙ্গে সম্ভোগের নাম যৌন-নির্বিশেষত্ব, যৌন-যথেচ্ছাচার বা অজাচার (Promiscuity)। ইহার অন্যান্য বিশেষত্ব এই যে, এখানে সম্বন্ধের স্থায়িত্ব, সন্তান ও তাহার মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ বা তেমন কোন বন্ধন নাই। যৌন সম্বন্ধ এখানে নিতান্তই খেয়াল-খুশী অনুযায়ী ও সাময়িক।

এখন আমাদের বিচার্য এই যে, মানবকল্যাণের দিক হইতে বিবাহ ও যথেচ্ছাচারের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের গ্রহণযোগ্য।

পারিবারিক জীবনযাপন করিতে হইলে কোনও-না-কোনও রীতির বিবাহ

প্রচলিত রাখিতেই হইবে, এ সম্বন্ধে অধিক যুক্তির অবতারণা বাহুল্য মাত্র। পারিবারিক জীবন উঠাইয়া দিয়া রাষ্ট্রের স্কন্ধে সন্তানপালনের দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া যৌন-নির্বিশেষত্বের প্রবর্তন করা যাইতে পারে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে দুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, যৌন-নির্বিশেষত্বের দ্বারা নারীর সন্তানোৎপাদিকা শক্তি খানিকটা কমিয়া যায়। সুতরাং উহা মানবজাতির সংখ্যাহ্রাসের কারণ হইতে পারে। ইহা ডাঃ মেনের অভিমত।

দ্বিতীয়তঃ, ইহার দ্বারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হইবে কি না? মানুষের স্বাভাবিক ঈর্ষাপরায়ণতা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে কিনা—ইহার বিচার করিতে গেলে আমাদের দেখা উচিত, বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রবর্তনের পূর্বে মানবসমাজের সত্যকার যৌন-নির্বিশেষত্ব ছিল কিনা, এবং থাকিলে তাহা কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

লাবক, বাকোফেন, ম্যাকলেনান্, বাষ্টিয়ান, উইলকেন্স প্রভৃতি সমাজ-তত্ত্ববিদ্গণের অভিমত এই যে, আদিকালে মানবজাতির মধ্যে যৌন-নির্বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইঁহাদের পুস্তক পাঠে দেখা যায়, ইহার যে দৃষ্টান্ত ইঁহারা দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি যৌন-নির্বিশেষত্বই নহে—বিভিন্ন রীতির বিবাহপ্রথা মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ঐ সমস্ত সমাজতত্ত্ববিদ্ বহু স্ত্রী বা বহু স্বামী গ্রহণকেও যৌন-নির্বিশেষত্ব বলিয়াছেন। আমরা উপরে বিবাহের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, সেই সংজ্ঞানুসারে বহু স্ত্রী বা বহু স্বামী গ্রহণকেও বিবাহ বলা যাইতে পারে।

ডাঃ ফোরেল এবং হ্যাভলক্ এলিসের সুদৃঢ় অভিমত এই যে, **অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে যৌন-নির্বিশেষত্ব প্রচলিত ছিল না এবং নাই।** কারণ, অসভ্য জাতিসমূহ এ বিষয়ে অত্যধিক ঈর্ষাপরায়ণ। তাহাদের মধ্যে নরনারীর যৌনমিলন সম্বন্ধে নানাবিধ নিষেধ আছে। ডাঃ ওয়েষ্টারমার্ক এ বিষয়ে একমত যে, মানুষের মধ্যে সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যৌননিষ্ঠাবোধ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যৌন-নির্বিশেষত্ব প্রসারলাভ করিয়াছে। কারণ, **গণিকা-বৃত্তিই** কতকটা যৌন-নির্বিশেষত্বের দৃষ্টান্ত এবং এই প্রথা সভ্যতার সৃষ্টি। ডাঃ ফোরেলের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতজাতিসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন অসভ্য জাতিসমূহের দেশে উপনিবেশ স্থাপন ব্যপদেশে ঐ সমস্ত জাতির মধ্যে মদ্যপান,

বেশ্যাবৃত্তি ও রতিজ রোগের প্রসার করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, শ্বেতজাতিসমূহের গমনের পূর্বে ঐ সমস্ত অসভ্যজাতি যৌননিষ্ঠায় অতীব দৃঢ় ও নীতিমান ছিল এবং ঔপনিবেশিকদের আগমনের পর উহারা মদ্যপান ও অন্যান্য দুর্নীতিতে আসক্ত হইয়া অবনত হইয়াছে। ডাঃ ওয়েষ্টার-মার্কের অভিমত এই যে, ইউরোপীয় সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে জারজসন্তানের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী এবং ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যেও আবার শহর অঞ্চলে জারজসন্তানের সংখ্যা পল্লী অঞ্চলের দ্বিগুণ। ইহাতে প্রতীয়-মান হয় যে, গুপ্ত যৌননির্বিশেষত্ব সভ্যতারই বিষময় ফল।

উক্ত বৃত্তিকেও কিন্তু ঠিক যৌন-নির্বিশেষত্ব বলা যায় না। কারণ পতিতারা শুধু তাহাদিগকেই দেহদান করিয়া থাকে, যাহারা বিনিময়ে তাহাদিগকে অর্থদান করে। **বাসনা পূরণের জন্যই যেখানে যৌনক্রিয়া নির্বিচারে সাধিত হয়,** কেবল তাহাকেই **যৌন-নির্বিশেষত্ব** বলা যাইতে পারে। **নিউ-ইয়র্কের ওনিডাস** উপনিবেশের অধিবাসীগণ পরস্পরের সম্মতিক্রমেই কাল, পাত্র ও সম্বন্ধ নির্বিশেষে মিলিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে রোম, ভারতবর্ষ, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশসমূহে কোনও না-কোনও প্রকার যৌন-নির্বিশেষত্ব প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কটল্যাণ্ডে অল্পদিন পূর্বেও পাণি-গ্রহণ (hand-fasting) প্রথার প্রচলন ছিল। এই প্রথানুসারে যে-কোনও যুবক যে-কোন যুবতীর হস্তধারণপূর্বক তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া এক বৎসর পর্যন্ত তাহার সহিত স্বামী-স্ত্রী-রূপে বাস করিতে পারিত। রোম ও ভারতবর্ষের দেবদাসী প্রথা গৃহস্বামীর নিজের কন্যা বা স্ত্রীকে অতিথির সহিত রাত্রিযাপন করিতে দিয়া অতিথিসেবা করিবার প্রথা, দলপতি, রাজা, কুলপুরোহিত, গুরুদেব প্রভৃতিকে দেহদান না করিয়া কোনও স্ত্রীলোকের স্বামীসহবাস করিতে না পারিবার প্রথাও অন্ধবিশ্বাসপ্রসূত বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে বোম্বাই প্রদেশে বল্লভাচারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে খানিকটা অবাধ মিলনের প্রচলন আছে বলিয়া শোনা যায়। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলেও নাকি ঐরূপ প্রথা ছিল। তবে এই সকল প্রথাকেও ঠিক যৌন-নির্বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে না।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সত্যকার যৌন-নির্বিশেষত্ব মানবজাতির কল্যাণকর নহে। কাজেই কোনও-না-কোনও প্রকারের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকা সমাজকল্যাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

(২৩)

বিভিন্ন বিবাহপ্রথা

নানা প্রকারের দৃষ্টান্ত

এখন প্রশ্ন এই যে, **কোন্ প্রকারের বিবাহনীতি** আমাদের গ্রহণীয়? এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে দিতে গেলে আমাদিগকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কালের বিবাহপ্রথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে হইবে। বিবাহপ্রথাকে মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা, (১) এক-স্ত্রী বিবাহ (Monogamy), (২) বহু-স্ত্রী বিবাহ (Polygamy), (৩) বহু-স্বামী বিবাহ (Polyandry), (৪) দলগত বিবাহ (Group Marriage)।

একপত্নীক বিবাহ

বাহ্যত **এক-স্ত্রী বিবাহই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত প্রথা।** রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থার সাম্যবিধানেব জন্য এক-স্ত্রী বিবাহ বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ, পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। তবে যুগবিশেষে, দেশ-বিশেষে বা কারণবিশেষে এই সংখ্যাব তারতম্য হইতে পারে। তাই যাঁহারা একপত্নীক বিবাহের গুণগানে মুখর তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিবিধ কাবণে অপরাপর বিবাহপ্রথা চালু থাকাটা অস্বাভাবিক নহে।

বহুপত্নীক বিবাহ

এক-স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকা পুরুষের সাধারণ স্বভাব না হওয়ায়, রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীব উপর পুরুষেব প্রাধান্য থাকায়, এবং পুরুষ নারী অপেক্ষা দৈহিক বলশীল হওয়ায়, কিংবা নারী পুরুষেব সংখ্যার তাবতম্য থাকায় পুরুষ বহু-স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, **একই সময়ে একাধিক বিবাহিতা স্ত্রী রাখার নামই বহুবিবাহ**। এক-স্ত্রীর তালাকের বা মৃত্যুর পর অন্য স্ত্রী বিবাহ করিলে (এবং এইরূপে পর পর শতাধিক স্ত্রী বিবাহ করিলেও) তাহাকে বহুবিবাহ বলা যাইবে না। পক্ষান্তরে, এক নারীকে বিবাহ করিয়া বিবাহেতর সহস্র রমণীর সংসর্গ করিলেও তাহাকে বহুবিবাহ বলা যাইবে

না। **আইন বা সমাজের চক্ষে গৃহীত নীতিতে একসঙ্গে একাধিক নারীর সহিত যৌন-সম্পর্ক স্থাপিত থাকার নামই বহুবিবাহ।**

এই হিসাবে **ইহুদীদের** মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। হজরত, মুসা, ইব্রাহিম, দাউদ, সুলেমান প্রভৃতি নবী ও বাদশাহের বহু পত্নী ছিল। মানববংশবৃদ্ধি খোদার ইচ্ছা বলিয়া ধরিয়া লওয়া এবং দলের শক্তি-বৃদ্ধির জন্যই হয়ত তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বোধ হয় নারীর সংখ্যাধিক্যও ইহার একটি কারণ ছিল।

মেক্সিকো, পেরু, জাপান ও চীনদেশের অধিবাসীরা বাহ্যত এক-পত্নীক বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাবা বহুপত্নীক। কারণ, আইনগ্রাহ্য বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত তাহারা বহুসংখ্যক উপপত্নী বাখিয়া থাকে, এবং উহাদের গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সেই সমস্ত সন্তানকে উহারা নিজেরা এবং উহাদেব দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র বিবাহজ সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে।

খ্রীষ্টান ইউরোপেও বহুবিবাহের প্রচলন ছিল, সেণ্ট-অগষ্টিন ও লুথার প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী সমাজসংস্কারকগণও বহুবিবাহের বিরুদ্ধতা করেন নাই। ১৮৩০ সালে জোসেফ স্মিথের নেতৃত্বে স্থাপিত **মর্মন** Mormon নামীয় আমেরিকার খ্রীষ্টান-সম্প্রদায় বহুবিবাহকে ধর্মেব অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়া থাকে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের মধ্যে সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও উহাদের অধিকাংশের ধর্মীয় সংস্কার ঘুচে নাই।

নিগ্রোরা বহুবিবাহ করে বাসনা পূরণ করা অপেক্ষা ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য। নিগ্রোরাজ লোয়াঙ্গোর সাত হাজার মহিষীর কথা শোনা যায়। নিগ্রো পুরুষ শিকার করিতে গিয়া মেয়েমানুষ ধরিয়া, অবিবাহিত বালিকা দিয়া বা উপপত্নী রাখিয়া স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিতে পারে, তবে বিবাহ করে প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য। টাণ্ডা নামক একজন নিগ্রো নেতার এক শত মহিষী ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীদের অসমর্থ লোক দিয়া পাহারা দেওয়ানো হয়। বর্তমান সময়েও পশ্চিম আফ্রিকার বেনিনের রাজার এক হাজার এবং পূর্ব আফ্রিকার উগাণ্ডার রাজার ইহারও বেশী মহিষী আছে বলিয়া শোনা যায়।

ফিজির অধিবাসীদের মধ্যে বহুবিবাহ খুব প্রচলিত। ফিজি দ্বীপের নৃপতিগণ সাধারণতঃ একশতের বেশী রাণী রাখেন না। স্ত্রীদের মধ্যে কলহ-

বিবাদ লাগিয়াই থাকে। স্বামী উহাদের নিরস্ত করিবার জন্য একটি বিশিষ্ট প্রকার লাঠি রাখে।

প্রাচীন ভারতের **হিন্দুদের** মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই প্রথা **বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়** পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে কুলীন ব্রাহ্মণগণ এত অধিক বিবাহ করিতেন যে, তাঁহাদের অনেকের পক্ষে সমস্ত স্ত্রীর সহিত জীবনে ভালমত পরিচিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। প্রণামী অথবা বার্ষিকী আদায় করিতে যাইবার সুবিধার জন্য খাতায় অসংখ্য শ্বশুরের নাম ও ঠিকানা লেখা থাকিত। নিজের পক্ষে সমস্ত স্থানে যাইবার সুযোগ হইত না। যেখানে বেশী পাওনার সম্ভাবনা সেখানে নিজেই যাইত। যে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা বহু বৎসর পূর্বে তাহাকে দেখিয়াছিল বলিয়া ঠিক চিনিবে না, সেখানে প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিত। ১৯৫৫ সালের পূর্বে উহাদের বহু বিবাহের আইন-গত কোন বাধা ছিল না এবং নানা স্তরে কিছু কিছু বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত দেখা যাইত।

১৯৫৪ সালে, যে কোন ভারতবাসী এবং বিদেশবাসী ভারতীয় নাগরিক সম্বন্ধে প্রযোজ্য, ১৮৭২ সালের ধর্মানুষ্ঠানবর্জিত সিভিল বিবাহ আইনের (Civil Marriage Act) পরিবর্তে, যে বিবাহ আইন পাস হয় এবং ১৯৫৫ সালের ১৮ ই মে তারিখে সারা ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনের প্রতি এবং মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী ও ইহুদী ব্যতীত অপর সকলের প্রতি প্রযোজ্য যে '১৯৫৪ সালের হিন্দু বিবাহ আইন' (The Hindu Marriage Act, 1954) জারি হয়, এই উভয়ের অন্যতম শর্ত এই যে বিবাহের সময় কোন পক্ষের স্ত্রী বা স্বামী জীবিত নাই এবং উভয় অনুসারে এক স্ত্রী অথবা স্বামীর জীবদ্দশায় অপর বিবাহ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

ইসলামে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ না করিয়া উহাকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। এক হইতে চারিটি পর্যন্ত স্ত্রী রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—তবে একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমভাব দেখানো বা সুবিচার করা সম্ভব হইবে না, এইরূপ ভয় থাকিলে এক-স্ত্রী গ্রহণের নির্দেশই দৃঢ়ভাবে দেওয়া হইয়াছে।

একাধিক বিবাহে সরকারী বাধা—ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন লোকের একাধিক স্ত্রী বা স্বামী বর্তমান থাকিলে সে সরকারী চাকুরী পাইবে না, এবং কোন সরকারী কর্মচারী এক স্ত্রী বা স্বামীর

জীবদ্দশায়, অপর বিবাহ করিতে হইলে, উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া সরকারের অনুমতি লইতে হইবে, নতুবা তাহার চাকুরী যাইবে।

উপরে যে সমস্ত বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, উহাতে ইহাই নিঃসন্দেহ-রূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, যে সমস্ত জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে প্রধানত উহা **বড়লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ**। প্রকৃতপক্ষে বহুবিবাহ বরাবর রাজা বাদশাহদের বিলাসিতার একটি উপকরণ মাত্র ছিল। জনসাধারণের মধ্যে উহা আর্থিক এবং অন্যান্য কারণে খুব বেশী প্রসারলাভ করিতে পারে নাই।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মুসলমানদের মধ্যে অবস্থাবিশেষে চারিজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ডাঃ ফোরেলের বিবরণ অনুসারে **ভারতীয় মুসলমানদের শতকরা ৯৫ জন ও পারস্যের মুসলমানদের শতকরা ৯৮ জন একপত্নীক**। ডাঃ ফোরেল আরও গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যাহাদের একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাহারাও সাধারণতঃ এক-স্ত্রীকেই মাত্র প্রাধান্য দিয়া থাকে। ইহাতেই মানুষের একপত্নীক চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এমনও বহুপত্নীক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে দিনের পর দিন এক-এক স্ত্রীর সহিত রাত্রি যাপন করিয়া থাকে। তবে অনেক বহুপত্নীকেরই অবস্থা এই যে, তাহারা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট এক বা একাধিক স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া থাকে; অবশিষ্টরা অবস্থাবিশেষে এবং সুযোগমত স্বামী-সঙ্গ লাভ করে।

বাড়ীর ও ক্ষেত-খামারের কাজকর্ম করিবার সুবিধার জন্য এখনও কৃষক ও গৃহস্থদের একাধিক পত্নী রাখিবার দৃষ্টান্ত কিছু কিছু দেখা যায়।

বহুস্বামী বিবাহ

বহু-স্বামী প্রথার কারণ সাধারণতঃ **নারীর সংখ্যাল্পতা, দারিদ্র্য** এবং **সংস্কার**। **পৌরাণিক ভারতে** যে বহুস্বামী-বিবাহ প্রচলিত ছিল দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী তাহার প্রমাণ। ইংরেজ শাসনের পূর্বে সিংহলেও বহুস্বামী বিবাহের প্রচলন ছিল। দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল। এখনও **ক্যানারী** দ্বীপপুঞ্জের কতিপয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিমালয়ের পাদদেশে **তিব্বতবাসীগণের** মধ্যে এবং **এস্কিমো** প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই প্রথা কিছু কিছু দেখা যায়।

ভারতে চ্যকরাতা হইতে দেরাদুন পর্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী পথের আশেপাশে বসতিকারী জওনসারি (Jaunsari) সম্প্রদায় এবং রাজস্থান ও পাঞ্জাবের কোন কোন জাঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে (মহাভারতোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণ স্ত্রী দ্রৌপদীর মত) সর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীগণ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের স্ত্রী হইয়া যায়। সম্ভবত উক্ত সমাজগুলির আর্থিক দুরবস্থা বশতঃ প্রত্যেক ভ্রাতা স্বতন্ত্র বিবাহ ও পরিবার গঠনে অসমর্থ থাকায় এই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে।

বহু পত্নীত্বে যেমন সকল স্ত্রী স্বামীর সমান ভালবাসা পায় না, বহুস্বামীত্বেও তেমনই স্ত্রীর সমান ভালবাসা সকল স্বামী পায় না।

দলগত বিবাহ

আদিম যুগে মনুষ্য বন্য পশু ও শত্রুদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। এই সকল আদিম সমাজে খাঁটি সাম্যবাদ (Communism) ছিল। সকল বস্তুতে দলের সকলের সমান অধিকার ছিল। কাহারও নিজস্ব বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু ছিল না। ব্যবহার্য ভোগ্য বস্তুর মত, যৌনক্ষুধার তৃপ্তির জন্য নারী বা পুরুষও কাহারও নিজস্ব স্বতন্ত্র ছিল না। সকল পুরুষ সকল নারীর এবং সকল নারী সকল পুরুষের ভোগ্য ছিল। ইহার পরবর্তী অবস্থায় নিকটবর্তী বন্ধুভাবাপন্ন দুই দলের মধ্যে এই ব্যবস্থা হয় যে, একদলের সমস্ত পুরুষ অপর দলের নারীকে ভোগ করিতে পাবে এবং প্রথম দলের সমস্ত নারী দ্বিতীয় দলের সমস্ত পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইতে পারে। এই প্রথাকেই **দলগত বিবাহ** বলে। পরবর্তী ব্যবস্থাকে বহির্বিবাহও (Exogamy) বলে।

বাকোফেনের মতে **লিসীয়ান** এবং **এট্রাসকান, ক্রেটান, এথেনিয়ান, লেসবিয়ান,** এবং **মিশরীয়** প্রভৃতি জাতির মধ্যে **দলগত বিবাহ** প্রচলিত ছিল। **টোগা সম্প্রদায়ের** মধ্যে আজিও দলগত বিবাহ প্রচলিত আছে। উহাদের মধ্যে বড় ভাই বিবাহ করিলেই সকল ভাইয়ের বিবাহ করা হইল। সকলেই ঐ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারিবে। তদুপরি উক্ত স্ত্রীর সমস্ত ভগিনীই ভ্রাতৃগণের সকলের ভোগ্যা। টোগা সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোনও দেশে বা জাতির মধ্যে এরূপ দলগত বিবাহপ্রথা দৃষ্টিগোচর হয় না।

উপরের বিভিন্ন বিবাহপ্রথার বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, একপত্নীক **বিবাহই সাধারণ ও বহুল প্রচলিত বিবাহপ্রথা।**

অবশ্য পুরুষ-মনস্তত্ব অনুধাবন করিলে আমরা একপত্নীকত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া থাকি। নারীর যৌনক্ষুধা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক পুরুষের দ্বারাই তৃপ্ত হয়। কিন্তু পুরুষের বেলা তাহা নহে।

তাহার যৌনক্ষুধা সাধারণতঃ এক নারী সম্ভোগে তৃপ্ত হয় না। ক্রমাগত কিছুদিন এক নারী ভোগ করিলেই পুরুষের মন তৎপ্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। পুরুষের এই বৈচিত্র্যলোভী ও চঞ্চল বৃত্তি জগতে ঐকিক বিবাহ-প্রতিষ্ঠার বিষম প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। অবশ্য অনেক নারী ও পুরুষ বহু স্ত্রী-গ্রহণ পছন্দ করিয়া থাকে। ডাঃ লিভিংষ্টোন বলিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ম্যাকোলোলো নামক স্থানের মেয়েরা একপত্নীক পুরুষকে কৃপণ ও কাপুরুষ বলিয়া থাকে। বোধ হয়, ঐ সব সমাজে স্ত্রীদের দাসীর মত কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, এবং সেইজন্য যাহাতে খাটুনির লাঘব হয়, তাহারা ইহা চায়। কিন্তু ইহাকে নারীর সাধারণ মনোবৃত্তি বলা যাইতে পারে না।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক-বিজ্ঞানী ডাঃ হিণ্টস ইউরোপীয় ঐকিক বিবাহের ভণ্ডামীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রচুর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, **ইউরোপীয়** জাতিসমূহ **বাহ্যত এক বিবাহবাদী** হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহারা **যৌননিষ্ঠার দ্বারা এক বিবাহের মর্যাদা রক্ষা করে না।** পক্ষান্তরে, প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইনগত বাধা না থাকিলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে যৌননিষ্ঠাবান্ একপত্নীক।

এই কঠোর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় জাতিসমূহের স্বপক্ষেও বলিবার আছে। একস্ত্রীবাদী বা ঐকিক মতে বিবাহবদ্ধ হইয়াও ব্যভিচার করা স্বামী-স্ত্রীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত **প্রতিজ্ঞাভঙ্গ** বা প্রলোভনে **পদস্খলন** মাত্র। একাধিক স্ত্রী থাকিলেই যে স্বামীরা বিবাহেতর যৌনমিলন করে না বা করিবে না, তাহারই-বা নিশ্চয়তা কি? বিবাহেতর যৌনমিলনের প্রলোভন যদি কেহ এড়াইতে না-ই পারে, তবে তাহার চারি স্ত্রীই যে পবিত্রতা রক্ষা করিবে তাহাই-বা কেমন করিয়া বলা যায়? তবে এক স্ত্রীর দূরে থাকায়, অসুখ-বিসুখে বা অসামর্থ্যে অপরের দ্বারা যৌনক্ষুধা মিটাইতে পারা যায়,—একাধিক স্ত্রী থাকায় এইটুকু মাত্র লাভ। বিবাদ, বিসম্বাদ, ঈর্ষা, কলহ ইত্যাদিতে লোকসান উপেক্ষণীয় নহে। দেশগত ও কালগত চরিত্রভেদে যৌননিষ্ঠার ব্যতিক্রম স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা স্পষ্টত দেখিতে পাই যে, ঐকিক

বিবাহই সকল দিক দিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের উপযোগী।

অবশ্য সময় বিশেষে মানুষ যে ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না, এমন ধরা-বাঁধা নিয়ম থাকার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যুদ্ধ-বিগ্রহে কোনও দেশ বা জাতির বহুসংখ্যক পুরুষের প্রাণত্যাগের ফলে যদি সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অত্যধিক হয়, তেমন অবস্থায়ও একপত্নীক বিবাহ প্রথার উপর অযথা জোর দিয়া বহুসংখ্যক নারীকে যৌনসম্ভোগ এবং সন্তানলাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হইবে না, রাষ্ট্রের স্বার্থের দিক হইতে বুদ্ধিমানের কার্যও হইবে না। ইসলাম ধর্মে সময়বিশেষে চারিজন পর্যন্ত নারীকে বিবাহ করিবার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে উহা এইরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য দূরদৃষ্টিজাত কিনা তাহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমরে যে বিপুল লোকক্ষয় হইয়াছে তাহার ফলে স্থান-বিশেষে, বিশেষ করিয়া ইউরোপে, এই সমস্যা কঠোরভাবে প্রকট হইয়াছে। মানবজাতির সর্বাপেক্ষা বীর্যবান্ ও কর্মক্ষম যুবকেরাই বহুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বেসামরিক লোকেরা বোমা, রোগ, শোক, অনাহার ইত্যাদিতে মারা গেলেও এবং উহাদের মধ্যে কতকাংশ নারী থাকিলেও যুদ্ধ-শেষে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছে।* সমাজ এই সমস্যার

* প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে পুরুষের অপেক্ষা নারীর আধিক্য এইরূপ হয় : পোলাণ্ডে শতকরা ৩৮, রুশিয়ায় ৩২, বিলাতে ২৩, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালীতে ২২। ফ্রান্সে শতকরা দশজন পুরুষের রক্ষিতা ছিল।

খৃষ্টানেরা সাধারণতঃ বহুবিবাহের ঘোর বিপক্ষে তথাপি যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বৃটেনে নর ও নারীর অসমতার দরুন সৃষ্ট জটিল সমস্যাটির সমাধানকল্পে পার্ডো (Geoffrey Pardoe) সম্প্রতি একখানা পুস্তকে সাহস করিয়া বহুবিবাহের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করেন, "এই দেশে এমন অনেক সংসার আছে যেখানে দুইটি স্ত্রীর বসবাস সম্ভবপর .... স্বামীর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ যদি প্রথমা পত্নীর পক্ষে আত্মসম্মানের হানিকর না হয় এবং যদি ইহার পশ্চাতে সমাজের সাগ্রহ অনুমোদন থাকে, তাহা হইলে অনেক নারীই সপত্নী গ্রহণে সম্মত হইবেন। অবিবাহিতা নারীদের মধ্যে অনেকে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সমস্ত 'উদ্বৃত্ত' নারীদেরই সন্তানলাভে উৎসাহ দিতে হইবে,—তাহা বিবাহের মাধ্যমে হউক বা না হউক।"

বৃটেনে নাকি ৩০ লক্ষ নারী উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের যৌন-জীবন বিড়ম্বিত হইতে বাধ্য। ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগে হয়ত যৌন-আচরণে বাধা হইবে না, কিন্তু আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় ইঁহারা মাতৃত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহা একটা দারুণ সমস্যা।

সমাধান না করিলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও নারীদের এক বিপুল অংশের উপর ঘোর অবিচার করা হইবে।

আশা করি, দেশবিদেশের বা নানা জাতির বিবাহপ্রথা দেখিয়াই নাসিকা কুঞ্চিত করিবার মত মনোভাব কাহারও হইবে না। **নিজেদের প্রথা যতই ভাল মনে হউক,** অপরের প্রথাও যে নানা কারণসঞ্জাত এবং নিজেদের সমাজেও নানা কুপ্রথা আছে, তাহা মনে রাখিয়া উদার মনে অপরকেও যোগ্য মর্যাদা দান করিতে হইবে। অবস্থা-বিশেষের জন্য মানুষকে **অতটুকু স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া** একথা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে যে, **মানুষ ক্রমে ঐকিক বিবাহের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।**

(২৪)

বিবাহ ও বিচ্ছেদের বিভিন্ন প্রণালী

পদ্ধতি সার্বজনীন

দল, সমাজ বা রাষ্ট্রের মঞ্জুরী লাভের জন্য মানুষ অনাদিকাল হইতে একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়াছে। দেশ ও কালভেদে এই সমস্ত পদ্ধতিতে বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু পদ্ধতি একটি থাকিতেই হইবে। আদিম বর্বরতম জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সভ্যতম জাতি পর্যন্ত সকল মানুষ সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারে।

পুরাকালে

পুরাকালে সভ্য অসভ্য প্রায় সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রীজাতি পুরুষের সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। সুতরাং ঐ সময়ে পুরুষের ইচ্ছাই ছিল নারীর সহিত যৌনসম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র নিয়ামক। বুলগেরিয়ানদের মধ্যে নিয়ম আছে কোনও নারী কোনও পুরুষের মনোনীত হইলে উক্ত পুরুষ বলপূর্বক উক্ত নারীর সহিত সহবাস করিলে, ইহার পর নারীর পিতামাতা উক্ত পুরুষের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিতে পারিবে না। যে সমস্ত দেশে যুক্তপরিবার প্রথা আজিও বলবৎ আছে, সেখানে অনেক পরিবারের কর্তা তাহার দোর্দণ্ড প্রতাপ নিজের ভোগলালসায় নিয়োজিত করিয়া থাকে। এমন কি, কোথাও কোথাও নিজের বৃদ্ধা স্ত্রীগণকে পুত্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া নূতন যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে।

রুশিয়া এবং জাপানে ৩০-৪০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত পরিবারের কর্তা পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সকলের যৌন-সম্বন্ধ নির্দেশ করিতেন। এস্কিমো, পশ্চিম আফ্রিকার আশান্তি প্রভৃতি জাতিসমূহের মধ্যে এবং ভারতবর্ষের কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে গর্ভস্থ সন্তানের বিবাহ গুরুজন কর্তৃক স্থির হইয়া থাকিত।

হিন্দু সমাজ

ইহার ব্যতিক্রম যে একেবারে হইত না, তাহা নহে। প্রাচীন ভারতে **স্বয়ম্বর প্রথা ও গান্ধর্ব বিবাহ** তাহার উদাহরণ। এই স্বয়ম্বরপ্রথায় কন্যাকে বহু পাণিপ্রার্থীর মধ্যে বর বাছিয়া লইবার অধিকার দেওয়া হইত। রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা এইভাবে পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। গান্ধর্ব বিবাহে পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে মনোনীত করার পর দুই-একজন সাক্ষীর সম্মুখে মালা বদল করিয়া বিবাহ হইত। অর্জুন কৃষ্ণের সমক্ষে তাঁহার ভগিনী সুভদ্রাকে, এবং রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে তাঁহার সখীদের উপস্থিতিতে এইভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

অষ্ট্রেলিয়াতে **বিনিময়প্রথা** প্রচলিত ছিল। এই প্রথায় পুরুষ নিজের মা, ভগিনী বা কন্যার বিনিময়ে অন্য নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিত।

অর্থের **বিনিময়ে** জামাতা বা স্ত্রীলাভ বহু জাতির মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং আজকালও আছে। মনুসংহিতায় ইহার নাম 'অসুর বিবাহ'। ওয়েষ্টারমার্ক ইহার নাম দিয়াছেন 'ম্যারেজ বাই পারচেজ'। কন্যার মূল্য নগদ আদায় করিতে না পারিয়া অনেক বরকে কিছুকাল কন্যার বাপের চাকুরী করিবার পর স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত। মুসাকে এইজন্য বহুদিন চাকুরী করিতে হইয়াছিল বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে। বৃটিশ কলম্বিয়াতে প্রত্যেক নারীর দাম রূপ ও গুণের তারতম্য-অনুসারে কুড়ি হইতে চল্লিশ পাউণ্ড পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। আজকাল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেও কন্যাপণের প্রচলন আছে।

এই প্রথা রোমীয় সভ্যতার আমলে বিপরীত রূপ ধারণ করে। এই সময়ে কন্যার কোন মূল্য ত ছিলই না, পরন্তু তৎপরিবর্তে বরপণপ্রথার প্রবর্তন হইয়াছিল। এই প্রথা অনুসারে কন্যাকে ধনসম্পত্তিসহ বরের বাড়ী আসিতে

হইত। বর্তমানে ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে বরপণের প্রচলন আছে।

পুরাকালে ভারতবর্ষে আট প্রকার বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলিয়া মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য উন্নত ধরনের আধ্যাত্মিক-বিবাহ। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া পূজাসহকারে যথাবিধি কন্যাদানের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞে বৃত ঋত্বিককে অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া কন্যাদান দৈব-বিবাহ। বরের নিকট হইতে একটি বা দুইটি গোমিথুন গ্রহণ করিয়া কন্যাদান আর্ষ-বিবাহ। উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্মাচরণ কর, ইহা বলিয়া অর্চনা সহকারে কন্যাদানকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলিব।

অবশিষ্ট পৈশাচ, রাক্ষস, অসুর ও গান্ধর্ব এই চারি প্রকার বিবাহে সমস্ত মানবজাতির বৈবাহিক ক্রমবিকাশের ধারা প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। নারীর নিদ্রাবস্থায় বা তাহাকে মদ্যপানে অজ্ঞান করিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করতঃ বিবাহ করার নাম পৈশাচ-বিবাহ। কন্যার আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করিয়া বা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নারীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস-বিবাহ। (ওয়েষ্টারমার্ক ইহার নাম দিয়াছেন Marriage by capture)। অর্থের বিনিময়ে নারীকে ক্রয় করিয়া তাহাকে বিবাহ করার নাম অসুর-বিবাহ। পিতামাতার অজ্ঞাতে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিক্রমে পরস্পরকে বিবাহ করার নাম গান্ধর্ব-বিবাহ।

ইসলামে

ইসলামে বিবাহপদ্ধতি খুব সহজ। নাবালিকার বিবাহ পিতা বা তৎপদ-বিশিষ্ট অভিভাবক দিয়া থাকেন। নাবালক ছেলের বিবাহও উহারা দিতে পারেন। সভ্য সমাজে এই ব্যবস্থা অচল হওয়াই উচিত। Child Marriage Act করিয়া এ প্রথার বিরুদ্ধতা করা হইয়াছে। করাই উচিত।

উভয়ে বয়স্ক হইলে উভয়ের সম্মতি গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য এবং ইহারা দুইজন ছাড়া দুইজন বয়স্ক পুরুষ বা চারিজন বয়স্থা স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকিলেই হইল। শেষোক্ত বিবাহে পিতামাতার সম্মতি না হইলেও চলে। এ ব্যবস্থা ভাল।

মুসলমান, আহ্‌লে কিতাব ও কাফেরদের সম্পর্কে ভেদাভেদ করা হয়। মহামতি আকবর বাদশাহ এ ব্যবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়ান ও হিন্দু-মুসলমানে বহু

বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হয়। হওয়াই উচিত। ধর্মীয় গোঁড়ামীর অবসান ও মানুষে মানুষে প্রীতি স্থাপন হইবে অবাধ অন্তর্বিবাহের সুফল।

বাজার হইতে ক্রীতদাসীর অবাধ সম্ভোগ একটা পুরাতন ব্যবস্থা। ইসলামও এ প্রথার সমর্থন করিয়াছে। সভ্য সমাজে এ ব্যবস্থা অমানুষিক ও বর্বরতা বলিয়া বিবেচিত হয়।

তালাকের প্রথা অতিশয় একতরফা। পুরুষকে যখন তখন খেয়ালখুশী মতে তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এ অধিকারকে আইনবলে খর্ব করিতেই হইবে।

চীনদেশে

চীনদেশে নানা পদ্ধতির বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি ক্রমশ লোপ পাইতেছে। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে উদ্যোগে-আয়োজনের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তা ঘটকের মারফত চলিতে থাকে। ভারতের মতই অনেকটা তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার দরকার হয়। কনের নাম, জন্মমাস ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করা হয়। ইহার পর গণকের পালা। গণকেরা শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া দেয়। বিবাহ শুভ হইবে এইরূপ নির্দেশ পাইলে পাত্রের বাড়ী হইতে পাত্রীর বাড়ীতে উপহারাদি পাঠানো হয়। ইহার পর বিবাহের তারিখ ইত্যাদি ঠিক হয় এবং পরিশেষে পাত্রীকে শোভাযাত্রা সহকারে পাত্রের বাড়ীতে চলিয়া যাইতে হয়।

বিবাহের দিন পাত্রের বাড়ীতে মহাসমারোহে ভোজের আয়োজন করা হয়। আঙিনায় একটি টেবিলে নানারকম মিষ্টদ্রব্য সাজাইয়া রাখা হয়। পাত্র পিতার সম্মুখে ছয়বার মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে। ইহার পর পিতা আদেশ করেন, "যাও বাবা, তোমার স্ত্রী খুঁজিয়া লও এবং প্রত্যেক কাজে জ্ঞান ও সদ্বিবেচনার সহিত অগ্রসর হও।"

পাত্র তখন পাত্রীকে আনিবার জন্য সজ্জিত পালকি বা আরাম-কেদারা পাঠাইয়া দেয়। বহু চাকরবাকর ও দাসদাসী ঐ সঙ্গে শোভাযাত্রা করিয়া যায়।

দম্পতির যাত্রা শুভ হইবে, এই আশায় বহু জিনিসপত্রের সমাবেশ করা হয়। একটি কমলালেবু-ভরা ছোট গাছ আনা হয় এবং উহাতে থলিভরা টাকা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়; ইহাতে নাকি দম্পতির বহু সন্তান হইবে এবং উহাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, ইহা বুঝায়। একজোড়া রাজহাঁসও রাখা হয়;

ইহাতে নাকি দাম্পত্য-প্রণয় স্থায়ী থাকে। পাত্রীকে গুরুজনের আদেশ উপদেশ ও আশীর্বাদ লইয়া, এক পেয়ালা মদ খাইয়া পালকিতে গিয়া বসিতে হয়। তাহার লোকজন, দাসদাসীও শোভাযাত্রায় যোগদান করে। শোভাযাত্রায় লোকেরা নানারকম নিশান, ছাতা, সাজসজ্জা লইয়া যোগ দেয় এবং নিশানগুলি পাত্র ও পাত্রীর পিতৃপুরুষদের নাম বহন করে। এই শোভাযাত্রাকে সকলেই প্রদর্শন করে এবং উচ্চনীচ সকলে উহার জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দেয়।

পাত্রের বাড়ী আসিলে, বর পাখা দিয়া পালকির দরজায় আঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কনের দাসীরা উহা খুলিয়া দেয়। কনে ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া বাহির হইয়া আসে এবং একটি দাসীর পিঠে চড়িয়া বসে। আগুনের দুইদিকে বরের দুইখানি জুতা রাখা হয়। আর একটি দাসী কনের মাথার উপরে চাউল, পান ইত্যাদিতে ভবা একখানি থালা উঠাইয়া ধরে। বব একখানি উঁচু চেয়ারে বসিয়া বধূকে গ্রহণ করে। বধূকে বরের পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। ইহার পরেই বর বধূর ঘোমটা সরাইয়া প্রথমবার মুখ দর্শন করে।

বাসরঘরে দম্পতিব পূর্বপুরুষদের মূর্তি পূজা করিতে হয়। ইহার পবে আরও যাগ-যজ্ঞ কবা হয। তৃতীয় দিনে দম্পতি শোভাযাত্রা সহকারে বধূব পিতার বাড়ীতে ফিবিয়া যায়।

তিব্বতে

তিব্বতে ধর্মের প্রভাব খুব বেশী। সাময়িক আচার-অনুষ্ঠানও ধর্মবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু বিবাহবিধি নাকি ধর্মপ্রভাবমুক্ত। তিব্বতী যুবকেরা বয়স্ক হইলেই স্ত্রীর খোঁজে বাহির হইয়া পড়ে।

পরিণয়প্রার্থী যুবক নাকি ঘোড়ায় চড়িয়া নির্বাচিত মেয়ের তাঁবুর কাছে গিয়া মেয়েকে ধরিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে নিজের বাড়ী লইয়া আসে। মেয়ের পিতা বন্ধুবান্ধবসহ উহাদের পিছনে পিছনে গোলমাল করিতে করিতে ছুটিয়া আসে। কিছুক্ষণ পরে দুই দল মিলিয়া যায়। তখন তাহারা ভোজনে বসে। দুই-এক প্রকার মাদকদ্রব্য ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকে। তিব্বতে মেয়ে অনুমোদন-সাপেক্ষভাবে স্বামীর ঘর করিতে থাকে; যদি তিন দিনের মধ্যে কোন অমিল না হয় তবে বিবাহ পাকাপাকি হইয়া যায়। যদি অমিল হয় তাহা হইলে মেয়ে বাপের তাঁবুতে ফিরিয়া আসে এবং বিবাহ ভাঙিয়া যায়।

তিব্বতীদের মধ্যে একটি মেয়ে **দুই বা ততোধিক ভাইকে** বিবাহ করিতে পারে। ইহাতে নাকি পারিবারিক সম্পত্তি একত্র থাকে, ভাগ হয় না। তাহাদের মতে, বেশী থাকিলে সন্তানের সংখ্যাও নাকি বাড়ে। লোকবৃদ্ধি করিবার কৌশল হিসাবে এক মেয়ের একাধিক স্বামী রাখার প্রথা প্রচলিত আছে। বেশীদিনের জন্য প্রবাসে থাকিতে হইলে পুরুষেরা সেখানে সাময়িক-ভাবে স্ত্রী জুটাইয়া লয়। আবার বাড়ী ফিরিবার সময়ে তাহার ঐ স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া আসে। দরকার বা ইচ্ছা হইলে একাধিক স্বামী গ্রহণেরও রীতি আছে। তিব্বতী মেয়েরা নাকি একাধিক স্বামী রাখা পছন্দই করে। এক স্বামীর কথা বলিতে তাহারা আশ্চর্য বোধ করে এবং বলে, "সে কি কথা ? তবে স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীর অবস্থা হবে কি ?" সম্ভোগের চেয়ে পারিবারিক স্থিতি ও নিজেদের রক্ষণের কথাই তিব্বতীরা বেশী ভাবে।

সাঁওতালদের মধ্যে

সাঁওতালেরা আমাদের দেশের এক আদিম জাতি। বাংলার মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় এবং বিহারের সাঁওতাল-পরগনা, কাটিহার প্রভৃতি অঞ্চলে এবং উড়িষ্যার জায়গায় জায়গায় ইহাদের বাস।

সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের যৌনবিষয়ে উপদেশ দেয় ঠাকুরদাদা, ভগ্নীপতি, পিসেমশাই এবং বিধবা বা তালাক-প্রাপ্তা নারীরা এবং বিশেষ করিয়া বউদিদিরা। ইহা ছাড়া যুবক-যুবতীদের প্রেম-অভিসারে ছেলেমেয়েরা সংবাদ ও উপহারাদি বহন করিয়া থাকে।

মেয়ে উপযুক্তা হইলে কোনও ছেলে উহাকে দেখিয়া প্রেমে পড়ে। নাচের মজলিসে হাত বাড়াইয়া বা মুক্ত মাঠে ফলফুলাদি উপহার দিয়া ছেলেটি মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দেয় অথবা বউদিদি বা ঠাকুরমা ইত্যাদির মারফত উভয়ের মেলামেশার সুযোগ হয়। ইহার পর গ্রামের সর্দারকে উভয়ের অভিযোগের কথা জানানো হয় এবং তিনি একটি বৈঠক ডাকিয়া মেয়েটির সম্মতি লন। তারপর ছেলেটি মেয়ের কপালে সিন্দুর-ফোঁটা দিয়া দেয়।

অনেক সময়ে উভয়ে পলাইয়া গিয়া স্বামী-স্ত্রীভাবে বসবাস করে। আত্মীয়েরা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ছেলেটিকে বেদম প্রহার করিয়া শিক্ষা দেয়। তারপর অবশ্য সিন্দুর-ফোঁটা দিয়া বিবাহ শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়।

জোর করিয়া অথবা মালা-বদল করিয়া বিবাহ করিবারও প্রথা আছে।

বিবাহ না করা সাঁওতালদের মধ্যে অবৈধ ও অপমানকর। বিবাহের পর তাহারা সম্প্রদায়ের পূর্ণ সভ্য হিসাবে গণ্য হয়।

অন্যত্র

ব্যালিয়ারিক দ্বীপের অধিবাসীগণের বিবাহ-প্রথা অতি অদ্ভুত। বিবাহের রাত্রে আত্মীয়-স্বজনের সকলে একে একে কন্যাকে উপভোগ করিবার পর সর্বশেষে শেষরাত্রে বর তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। **সেনেগাম্বিয়াতে** প্রত্যেক কন্যাকে বিবাহের রাত্রে দলপতির শয্যাসঙ্গিনী হইতে হয়।

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কোনও-না-কোনও পদ্ধতি এবং তৎসঙ্গে উৎসব ধর্মানুষ্ঠান ও ভোজের ব্যবস্থা আছে। সভ্য ও অসভ্য-ভেদে এবং ধনী ও নির্ধন-ভেদে উৎসব ও ভোজনের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

বিবাহের স্থায়িত্ব ও তালাকের ব্যবস্থা

দেশ ও জাতি ভেদে **বিবাহের স্থায়িত্বের** গুরুতর প্রভেদ হইয়া থাকে। **আন্দামান, সিংহল** প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীগণের বিবাহবন্ধন মৃত্যু ব্যতিরেকে ছিন্ন হইতে পারে না। ওয়েষ্টারমার্ক ২৫টি অসভ্য জাতির নাম করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

উত্তর-আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের (রেড ইণ্ডিয়ানদের) বিবাহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হইয়া থাকে। ওয়ানডট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্র কয়েক দিনের জন্য বিবাহ হইবার নিয়ম প্রচলিত। **গ্রীনল্যাণ্ডের** অধিবাসীরা ছয় মাসের জন্য বিবাহ করিয়া থাকে। **কুইনস্‌ল্যাণ্ড, টাসমানিয়া, সামোয়া** প্রভৃতি দ্বীপসমূহের অধিবাসীরা অতি অল্প সময়ের জন্য বিবাহ করিয়া থাকে। **পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়** এক ঘণ্টা হইতে নিরানব্বই বৎসরের মেয়াদে বিবাহ করিয়া থাকে। এরূপ **অস্থায়ী বিবাহকে 'মুতাআ'** বলে। **মিশরেও** এরূপ মেয়াদী বিবাহের প্রচলন আছে। প্রবাসী, বণিক, সৈনিক, ভ্রমণকারী প্রভৃতির সুবিধার জন্যই **শিয়া** মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ অল্পকাল-স্থায়ী বিবাহের রীতি আছে। **সাহারা** মরুভূমির নারীরা ঘন ঘন স্বামী পরিবর্তন করাকে একটা ফ্যাশান মনে করে। যে নারী বহুদিন এক স্বামীর ঘর করে, তাহাকে ইহারা ঘৃণার চক্ষে দেখে। দীর্ঘদিন একই লোকের সহিত সহবাস করাকে ইহারা কদর্য ও কুৎসিত ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও জার্মানদের মধ্যেও ঘন ঘন স্ত্রী ত্যাগ একটা ফ্যাশান ছিল।

বিবাহ মেয়াদীই হউক আর স্থায়ীই হউক, স্বামী-স্ত্রীর গরমিল, কলহ বা অন্যান্য গুরুতর কারণে উহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিবার বা পৃথক থাকিবার মত ব্যবস্থা বহু সমাজে আছে এবং সকল সমাজেই থাকা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা তিন প্রকারের : (১) তালাক, (২) বিবাহ নাকচ, (৩) আইনত পৃথকীকরণ।

তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce)

স্বামী স্ত্রী উভয়েরই অপরকে তালাক দিবার অধিকার থাকা উচিত। এইরূপ অধিকার ধর্ম, সমাজ অথবা আইন দ্বারা স্বীকৃত হওয়া উচিত। এই অধিকার থাকিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হইয়া অপরকে বিবাহ করিতে পারে।

মুসলমানদের মধ্যে উপযুক্ত সাক্ষীর সম্মুখে স্বামী স্ত্রীকে "তোমায় তালাক দিলাম" এইরূপ তিনবার বলিলেই হয়। তবে, পরে বিতণ্ডা উপস্থিত হইতে পারে, এই ভয়ে কাজীর (Marriage Registar) কাছে গিয়া রেজেষ্ট্রি করিয়া লওয়া হয়। স্ত্রীর স্বামীকে তালাক দিবার অধিকার নাই।

জাপানী ও চীনাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব, অসতীত্ব, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ঔদাসীন্য, বাচালতা, স্বামীর সহিত অসদ্ব্যবহার, বাক্যের কর্কশতা, পুরাতন রোগ—এই সাত কারণে স্ত্রী তালাক দিবার বিধি আছে। কিন্তু তথাপি চীন ও জাপানে তালাক খুব কমই দৃষ্ট হয়।

রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে তালাকের প্রথা আদৌ নাই। তবে আলাদা হওয়ার রীতি আছে। **প্রোটেষ্টাণ্ট-খ্রীষ্টান** ইউরোপে ও আমেরিকাতে প্রধানত ব্যভিচারের জন্য বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার বিধি থাকায় অনেক সময় অবনিবনা হইলে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করিয়া (Collusion) মিথ্যা ব্যভিচারের অভিযোগ আনিয়া বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকে।

অন্যান্য যে সকল কারণে প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের আদালত বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবার ছয় মাসের জন্য কাঁচা হুকুম (Decree Nisi) ও তাহার পর পাকা হুকুম (Decree absolute) দেয়, সেগুলি এই : (১) ত্যাগ করা অর্থাৎ তিন বৎসর বরাবর আলাদা থাকিয়া স্ত্রীর ভরণপোষণ না করা (Desertion)

(২) শরীর বা মনের উপর নিষ্ঠুরতা, (৩) দুরারোগ্য উন্মাদ রোগ ও (৪) পুংমৈথুন।

বিবাহ নাকচ করা (Dissolution of marriage)

এই ব্যবস্থায় বিবাহ-বন্ধন ভাঙিয়া দেওয়া হয়। বিবাহ সিদ্ধ না হইয়া থাকিলে বা অন্য গুরুতর কারণে এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ নাকচ করা হয় এবং স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রহিত হয়। ইহাতেও যুক্ত অংশীদার অপরকে বিবাহ করিতে পারে।

নিম্নলিখিত কারণে আদালত খ্রীষ্টানদের বিবাহ নাকচ (Null and void) বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন : (১) অপর পক্ষ মরিয়াছে এরূপ অনুমানের সঙ্গত কারণ দেখাইলে, (২) নিষিদ্ধ রক্ত-সম্পর্ক (Consanguinity) প্রমাণিত হইলে ; (৩) ভুল, জবরদস্তি, প্রতারণা বা পাগলামির জন্য বিবাহে প্রকৃত সম্মতি ছিল না প্রমাণিত হইলে ; (৪) আইন-অনুযায়ী বিবাহের নিম্নতম বয়স অপেক্ষা কম বয়স থাকিলে ; (৫) অপর বিবাহের স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকিলে ; (৬) সহবাসের সম্পূর্ণ ক্ষমতা না থাকিলে, (৭) কতকগুলি নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালিত না হইয়া থাকিলে ; (৮) একবারও সহবাস করিতে ইচ্ছাপূর্বক অস্বীকার করিলে, (৯) বিবাহের সময় মস্তিষ্ক-বিকৃতি থাকিলে, (১০) মাঝে মাঝে মৃগী বা উন্মাদ রোগ হইতে থাকিলে ; (১১) বিবাহের সময় সংক্রমিত করিবার মত রতিজ রোগ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইলে ও (১২) বিবাহের সময় স্ত্রী অপরের দ্বারা গর্ভবতী থাকিলে।

আইনত পৃথকীকরণ (Judicial Separation)

এই ব্যবস্থায় কোর্টের নির্দেশমত স্বামী বা স্ত্রীকে অপর পক্ষ হইতে ভিন্ন বা পৃথক বাসের অনুমতি দেওয়া হয়। ইহাতে দাম্পত্যসম্পর্ক রহিত হয় না, স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার স্বামীকে লইতে হয়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে আদালত খ্রীষ্টান স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা বাসের অধিকার দিতে পারেন :

স্বামীর (১) স্ত্রী বা সন্তানদের ক্রমাগত মারপিট করা (২) ব্যভিচার ; (৩) ত্যাগ ; (৪) আলাদা থাকা ; (৫) ইচ্ছাপূর্বক ভরণপোষণ না করা ও (৬) বদ্ধ মাতাল হওয়া।

স্ত্রীর (১) সন্তানের প্রতি ক্রমাগত নিষ্ঠুরতা; (২) ব্যভিচার; (৩) বদ্ধ মাতাল হওয়া।

এই সকল অবস্থায় এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে। উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ যুক্তি, সুবিচার, সহৃদয়তা ও নিরপেক্ষতাপ্রসূত।

হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে বিবাহবন্ধন শুধু যে আজীবন স্থায়ী তাহা নহে; তাহাদের বিবাহবন্ধন মৃত্যুর পর পর্যন্তও স্থায়ী থাকে। এই ধারণায় হিন্দুদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পরও স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করে না। কিন্তু বিপত্নীকদের পর পর বিবাহ করা আটকায় না।

পূর্বোক্ত ১৯৫৪ সালের হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত কারণসমূহে, যদি বাদীর পক্ষে বিবাহবন্ধন অসাধারণ ক্লেশকর হইয়া থাকে, অথবা প্রতিবাদীর অসাধারণ দুশ্চরিত্রতা ও কদাচার প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে, বিবাহের অন্ততঃ তিন বৎসর পরে স্বামী বা স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের দরখাস্ত দিতে পারেন যে, অপর পক্ষ: (১) ব্যভিচারী জীবনযাপন করিতেছে, (২) ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, (৩) বিবাহের ঠিক পূর্বে অন্ততঃ তিন বৎসর যাবৎ অসাধ্য পাগলামি, (৪) কুষ্ঠ বা (৫) সংক্রামক রতিজ রোগে ভুগিতেছিল, (৬) কোন ধর্মসঙ্ঘে যোগ দিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছে, (৭) সাত বৎসব যাবৎ জীবিত আছে বলিয়া শোনা যায় নাই, (৮) আদালত স্বতন্ত্র হওয়ার প্রার্থনা মঞ্জুর করার পর অন্ততঃ দুই বৎসর যাবৎ পুনরায় সহবাস করে নাই, এবং (৯) আদালত দাম্পত্য অধিকার পুনঃস্থাপন করিবার আদেশ দিবার পরেও অন্ততঃ দুই বৎসর যাবৎ তাহা পালন করে নাই।

স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত দিতে পারেন, যদি (১) স্বামী এই আইন জারি হইবার পূর্বে বাদীকে এবং আর একজনকে বিবাহ করিয়া থাকে, এবং সেই দ্বিতীয়া স্ত্রী বাদীর বিবাহের সময় বাঁচিয়া ছিল এবং এখনও বাঁচিয়া আছে, এবং (২) স্বামী বিবাহের পরে (ক) বলাৎকার, (খ) পুংমৈথুন অথবা (গ) পশুগমন করিয়া থাকে।

পরস্পরের সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থাও উক্ত আইনে রহিয়াছে।

সতীদাহ প্রথা

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ মৃতপতির সহিত চিতায় আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছায় ভস্মীভূত হওয়াকে পতিভক্তি ও দাম্পত্য সম্বন্ধের

অমরত্বের নিদর্শন মনে করিতেন। ইহাকে **সতীদাহ** বলা হইত। সতীদাহ দুই প্রকারের ছিল—**অনুমরণ ও সহমরণ**। পতির শবের সহিত দগ্ধ হওয়াকে সহমরণ ও বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার কাপড়-চোপড় বা তাহার ব্যবহৃত কোন বস্তু লইয়া চিতানলে দগ্ধ হওয়াকে অনুমরণ বলিত। এই প্রথা ব্রাহ্মণদের উপর প্রযোজ্য ছিল না। স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে প্রসবের পরে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইত। একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদের মধ্যে কে সতীদাহে সহমরণের অধিকারী, ইহা লইয়া গোলযোগ হইত। সতীদাহের সময় স্ত্রীর পক্ষে রোদন বা অশ্রুমোচন অশোভন মনে করা হইত। ভয় পাইয়া পরে 'সতী' হইতে অস্বীকার করায় কোন বাধা ছিল না; কিন্তু একবার চিতায় উঠিয়া পরে পলাইতে চাহিলে বলপূর্বক স্ত্রীকে দগ্ধ করা হইত। মোগল-সম্রাট আকবর এই প্রথা রহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময়ে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখের চেষ্টায় সতীদাহ আইনে দণ্ডনীয় করা হয়। এই আইন প্রণয়নে হিন্দু জনসাধারণ খুব বাধা প্রদান করিয়াছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন প্রণয়ন করার পর হইতে সতীদাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

প্রাচীনকালে আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশে রাজা ও বড়লোকেরা মরিলে পরলোকে তাঁহাদের সেবা করিবে বলিয়া তাঁহাদের রাণী ও দাসীদের এবং সুখ-সুবিধার জন্য আবশ্যকীয় নানা দ্রব্য তাঁহাদের মৃতদেহের সহিত কবর দেওয়া বা দাহ করা হইত। হয়ত ঐ প্রথারই অবশেষ হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ।

বিধবা বিবাহ—হিন্দুসমাজ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ' লইয়া বহু গবেষণা ও আন্দোলন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে হিন্দুদের পরাশর ও নারদ-সংহিতা অনুযায়ী স্বামী (১) অনুদ্দেশ হইলে (নিঃসন্তানা হইলে জাতিভেদে দুই হইতে চারি বৎসর, সন্তানবতী হইলে চারি হইতে আট বৎসর প্রতীক্ষা করার পর), (২) মরিলে, (৩) প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, (৪) ক্লীব (রতিশক্তিহীন) স্থির হইলে অথবা (৫) (গুরুতর মহাপাপ করিয়া) পতিত হইলে, **স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা বিধেয়**। আবার মহর্ষি কাত্যায়নের মতে যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায় সে ব্যক্তি যদি (১) অন্যজাতীয়, (২) পতিত, (৩)

ক্লীব (৪) যথেচ্ছাচারী, (৫) সগোত্র, (৬) দাস, অথবা (৭) চিররোগী হয় তাহা হইলে **বিবাহিতা কন্যাকেও অন্য পাত্রে সম্প্রদান** করিবে।

এইরূপ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত। দুঃখের বিষয়, ইহা পালন করা হয় না।

মুসলমানদের মধ্যে বিবাহবন্ধন স্বামী বা স্ত্রীর ইচ্ছাতে ছিন্ন হইবার বিধি আছে। ব্যাধি, গরমিল, নিরুদ্দেশ ইত্যাদির জন্য বিচ্ছেদের একান্ত দরকার হইয়া পড়িলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়া পুনর্বিবাহের সুযোগ দেওয়া হয়।

হজরত মোহাম্মদের স্ত্রীদের মধ্যে শুধু একজন বিবাহের পূর্বে কুমারী ছিলেন। অন্য সকলেই বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন। বিধবা বা ঐরূপ বিবাহমুক্ত নারীকে বিবাহ কবিতে যে কোনই আপত্তি থাকা উচিত নহে তাহার দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। "আপনি আচরি ধর্ম জগতে শিখায়।"

সন্তানস্নেহ ভালবাসা ও পরস্পরের সুখ ও সুবিধা সম্বন্ধে যত্ন প্রভৃতির সংযোগে বিবাহবন্ধন দৃঢ় হইয়া থাকে। মানুষের সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির প্রতি ব্যবহারের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন পুরুষ পারতপক্ষে স্ত্রী ত্যাগ করিতে চায় না। সুতরাং **বিশেষ অবস্থায়** বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার নারী-পুরুষ উভয়েরই থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় বিবাহিত জীবন দুর্বিষহ হইয়া ব্যভিচার ও পারিবারিক অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বাস্তবিকপক্ষে **বিবাহ-বিচ্ছেদ** কোন দম্পতিরই কামনা করা উচিত নহে; তবে **বিশেষ বিশেষ কারণে উহার ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক**। বিবাহের উদ্দেশ্য বিফল হইলে নর ও নারী উভয়ে যেন মুক্ত হইয়া নূতন সাথী বাছিয়া লইতে পারে—ইহা তাহাদের ন্যায্য অধিকার। তাহা না হইলে বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

বিবাহপ্রথাকে সুষ্ঠু ও সুখময় করিতে এবং চরিত্র রক্ষার উপায়ে পরিণত করিতে হইলে আমাদের অপ্রীতিকর যৌন-সম্পর্কের অবসান করিবার অধিকার দিতে হইবে একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা

স্বামীর মৃত্যুর পর **নারীকেও পুনর্বিবাহ করিবার অধিকার দিতে হইবে**। খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা এ বিষয় উদার।

হিন্দু সমাজে সতীদাহ বন্ধ হইয়া থাকিলেও বৈধব্যদশা দুঃখে ও শোকে ভরা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রাণ হিন্দু বিধবার দুর্দশা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় সরকার কর্তৃক "বিধবা বিবাহ আইন" বিধিবদ্ধ হয়। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় আংশিকভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছে মাত্র। এখনও সমাজের এই বিরাট সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের করুণ আবেদন কত প্রাণস্পর্শী

'বিধবা বিবাহ' দ্বিতীয় পুস্তকের শেষে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন:

'আপনারা ইতিপূর্বে কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই পূর্ব-প্রচলিত আচারের পরিবর্তে অবলম্বিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে যখন শাস্ত্র পাইতেছেন এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শতশত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয় স্পষ্ট বুঝিতেছেন, তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করা আপনাদিগের কোন মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন ততই মঙ্গল। বস্তুত দেশাচারের দোহাই দিয়া আর আপনাদিগের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত।...

"ধন্যরে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, হিতাহিত-বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্মও অধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে।...

'হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যা-পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য ও যথার্থ মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিরাকরণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া

লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ তাহাতে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না যে, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জন, দেশাচারের আনুগত্য ও সঙ্কল্পিত লৌকিক রক্ষা ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকেও দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। হায়, কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ-জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় **"নানা জাতির বৈধব্যপ্রথা"** শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ভবানী পাঠক মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন:

"স্বামীর মৃত্যুতে নারীকে কতকগুলি কষ্টকর ব্রতপালনে নিয়োজিত করা কমবেশী প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে দেখা যায়। সভ্য বা অসভ্য কেহই এই অনুশাসন হতে মুক্ত নহে।

"তবে যুক্তি ও বুদ্ধির যুগে এই বিংশ শতাব্দীতে যারা সংস্কৃতিবান্ জাতি, তারা এই অপচারের হাত থেকে নিজেকে অনেকখানি মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। বিধবার জীবনকে দুর্বহ নির্যাতনে কণ্টকাক্ত করে তোলার দুষ্ট ধর্ম এখনও যাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তারা সাধারণত অসভ্য আদিম বর্বর সম্প্রদায়। শুধু বাংলা-দেশ এ বিষয়ে বর্বরদের সঙ্গেও টেক্কা দিতে পারে। বিধবাকে পুড়িয়ে মারার

প্রথা এই সেদিনও বাংলাদেশে ধর্মানুমোদিত, লোকসমর্থিত ও প্রচলিত ছিল। আজ যদিও পুড়িয়ে মারা হয় না, তবুও অন্যবিধ যে-সব সামাজিক নির্যাতনের ব্যবস্থা আছে তা নিষ্ঠুরতায় ভরা' কঙ্গো, নিউগিনি এবং পূর্বভারত দ্বীপবাসী উলঙ্গ নরমাংসভুক অরণ্যচারী মানুষদের রীতিনীতির সঙ্গে তুলনীয়।"

(২৫)

বিবাহের উদ্দেশ্য, উপকার ও দোষ

সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীর সাত রূপ

সংস্কৃতে একটা কথা আছে—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—অর্থাৎ পুত্রোৎপাদনই বিবাহের উদ্দেশ্য। পুত্র না হউক, সন্তানোৎপাদনই যে বিবাহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, একথা প্রায় সকল জাতিই স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু কথাটার মধ্যে একটি মস্ত বড় গলদ রহিয়া গিয়াছে। সন্তানোৎপাদনের জন্য নারীপুরুষের যৌনমিলন প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু **বিবাহের প্রয়োজন** তাহাতে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং সৃষ্টি ধারা রক্ষাই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে রাণী ইন্দুমতির মৃত্যুতে রাজা 'অজ'-এর বিলাপে বলিয়াছেন 'গৃহিণী সচিবঃ সখা মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।' অর্থাৎ তুমি আমার গৃহিণী, রহস্যসখী এবং (সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি) সুললিত কলা প্রয়োগে প্রিয়শিষ্যা ছিলে। আবার রামায়ণে দেখি, রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

কার্য্যেষু মন্ত্রী, চরণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া, ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু রমা, রঙ্গে সখী, লক্ষণ! সা মে প্রিয়া॥

মহাভারতের আদিপর্বে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার কথায় এই ভাবের কথা দেখিতে পাই। আবার সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নমালা সংগ্রহ 'সুভাষিত রত্ন-ভাণ্ডাগারম্' এর ৬ষ্ঠ প্রকরণে, সতীবর্ণনম্ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে আছে :—

কার্যে দাসী, রতৌ বেশ্যা,ভোজনে জননীসমা।
বিপত্তৌ বুদ্ধিদাত্রী চ সা ভার্যা সর্বদুর্লভা॥

ফলত হিন্দুশাস্ত্রে ও সাহিত্যের বহু স্থলেই স্ত্রীকে **স্নেহে জননী, আদর-যত্নে ভগিনী, সহানুভূতিতে মিত্র, উপদেশে গুরু, সেবায় দাসী, শয়নে বেশ্যা ও সন্তানোৎপাদনে ভার্যা** বলা হইয়াছে। বস্তুত

দাম্পত্যজীবনের ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও পরিপূর্ণ রূপ কল্পনা বোধ হয় আর হইতে পারে না।* গৃহে আনন্দদায়িনী, বিপদে সান্ত্বনাদায়িনী, ইহাই স্ত্রীর আদর্শ রূপ, এবং বিবাহের চরম বিকাশ এই আদর্শের পরিপূর্ণতায়।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, স্ত্রীর এই রূপ বরাবর ছিল না। সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতি স্ত্রীরূপে পুরুষের হৃদয়ে এক বিপুল অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি এতটা প্রেম দৃষ্টিগোচর হয় না। সেখানে সন্তানের জন্যই স্ত্রীর যা-একটু আদর-আপ্যায়ন। স্ত্রীও স্বামীকে ততটা ভালবাসে না, কেবল তাহার সন্তানের পিতা বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সেবাযত্ন করিয়া থাকে।

শুধু অসভ্য জাতির মধ্যে কেন, সভ্য জাতির অশিক্ষিত নিম্নতম সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি প্রেম-ভালবাসা অনাবশ্যক, এমন কি কতকটা বেহায়াপনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে অন্যান্য অশিক্ষিত ও কৃষ্টিহীন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন গুরুজনের চক্ষে অনেকটা কুৎসিত নির্লজ্জতা বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-জীবনের আদর্শ হইতেছে স্বামীর সংসারে কঠোর পরিশ্রম করা এবং স্বামীর গুরুজন ও অন্যান্যের সেবা করা। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা তদ্রূপ নহে। সেখানে অপত্যস্নেহ নিরপেক্ষভাবে সুগভীর দাম্পত্যপ্রেম পরিস্ফুট হয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সুরুচি ও কৃষ্টি সম্মত ধারণা জন্মলাভ করে এবং বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আমাদের ভারতীয় সভ্যতায় স্ত্রীকে সহধর্মিণীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বস্তুত দাম্পত্য-জীবনের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ বোধ হয় আর কল্পনা করা যাইতে পারে না। গৃহ-সংসারে, জ্ঞান ও কর্ম-সাধনায়, ভোগ-বিলাসিতায়, ধর্মচর্চায় অর্থাৎ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত ও পবিত্র করিবার চেষ্টায়—সকল ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহচর। ইহাই বোধ হয় দাম্পত্য-জীবনের সুন্দরতম পরিকল্পনা। নির্ভাজ প্রেম ও স্নেহপ্রীতির দিক হইতে আলোচনা না করিয়া স্বার্থ ও বিষয়বুদ্ধির দিক হইতে বিবেচনা করিলেও আমরা বিবাহের কতকগুলি প্রত্যক্ষ উপকার দেখিতে পাই।

* বঙ্কিমবাবুর "বিষবৃক্ষে" সূর্যমুখীর পলায়নের পর নগেন্দ্রের আত্মচিন্তা ও বিলাপ দেখুন।

বিবাহের উপকার

১। **যৌনতৃপ্তি**।* যৌনপ্রবৃত্তি মানুষের একটি প্রবল বৃত্তি। এই বৃত্তির তৃপ্তিসাধনের জন্য মানুষকে বিবাহেতর মিলনে রত হইতে হইলে কত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ঘটিত, সে সমস্ত কথা আমরা "বিবাহের প্রয়োজনীয়তা" অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। স্বাভাবিক সম্ভোগ দ্বারা উত্তেজনার নিবৃত্তি যে নর-নারীর শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ও শান্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, সে কথা পাঠকগণ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। বিবাহের একটি মস্ত বড় সুবিধা এই যে, ইহার জন্য একটি আপনার **লোক নির্দিষ্ট থাকায়** নারী বা পুরুষ ইচ্ছামত তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। এ বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী হইতে অথবা সময়-সুযোগের সন্ধান করিতে হয় না। ইচ্ছামত বাসনার তৃপ্তিসাধনের পাত্র সুনির্দিষ্ট থাকায় নারী বা পুরুষ একরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।

যৌন যথেচ্ছাচারিতার দোষ—যদি বিবাহের দ্বারা দুইটি নর-নারীকে পরস্পরের দেহের প্রতি এই অধিকার দেওয়া না হইত, অর্থাৎ যদি সমাজে যৌন-যথেচ্ছাচারিতা প্রচলিত থাকিত তবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সর্বদা কামচিন্তায় ব্যস্ত থাকিতে হইত। বাসনার উদ্রেক হইলে কাহাকে পাওয়া যাইবে, কে সম্মত হইবে, যে সম্মত হইবে সে মনোমত হইবে কিনা, যে মনোমত হইবে সে সম্মত হইবে কিনা, উভয়ে সম্মত হইলেও সুবিধামত স্থান পাওয়া যাইবে কিনা ইত্যাদি চিন্তায় অহরহ মানুষকে ব্যস্ত থাকিতে হইত। এইভাবে নারী পুরুষ উভয়ে অহরহ অভিসারে ব্যস্ত থাকিলে সাংসারিক কাজকর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদির চর্চা ও সাধনা অনেকখানি ব্যাহত হইত। কিন্তু সমাজ বিবাহ দ্বারা পাত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় এবং পরস্পরের দেহের প্রতি আইন ও সমাজ স্বীকৃত অধিকার সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ এই বিষয়ে অহরহ চিন্তা ও চেষ্টার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া জ্ঞান ও কর্ম-সাধনায় উন্নতি করিবার সুবিধা পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া বিবাহের আর একটি সুন্দর দিক আছে। একাদিক্রমে দীর্ঘ দিন ধরিয়া একই ব্যক্তির সহিত সহবাস করায় উভয়ের এতটা **পারস্পরিক আঙ্গিক উপযোগিতা** এবং কাম ও রতিশক্তির সাম্যলাভ হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর কাহারও কামতৃপ্তি লাভে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। অঙ্গের আকৃতিগত

* জর্জ বার্নার্ড শ' বলিয়াছেন—"Marriage is a ghastly public confession of a strictly private intention."

সামঞ্জস্য ও রতিকালের স্থায়িত্বগত সামঞ্জস্য উহাদের মিলনকে অতীব সহজ সাধ্য ও আনন্দদায়ক ব্যাপার করিয়া তোলে। ফলে নরনারীর খুব বেশী উত্তেজনা হয় না এবং পুরুষের খুব বেশী শক্তিক্ষয় হয় না। **কাজেই যৌন-নিষ্ঠা উভয়েরই শান্তি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে আশ্চর্য রকম উপকারী**

২। **বংশবৃদ্ধি**। পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি রাখিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে একটি অতিশয় প্রবল বৃত্তি। "আমার পরে আমার নাম বজায় রাখিবার কেহ থাকিবে না"—এই কল্পনা মানুষের পক্ষে নিতান্ত পীড়াদায়ক ও ভয়াবহ। "বংশে বাতি দিতে কেহ না থাকিবার" অভিশাপ আমাদের দেশে চরম অভিশাপ। এই "বংশে বাতি দিবার লোক" রাখিয়া যাইবার জন্যই মানুষ বিবাহ করিয়া থাকে। বিবাহ ছাড়াও লোক সন্তান উৎপাদন করিতে পারে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ সে পুত্রকে স্বীকার করিয়া না লওয়ায় এবং অবাধ মিলনে কোনটি কাহার সন্তান বুঝা যায় না বলিয়া পুরুষের পিতৃত্বের ক্ষুধা তৃপ্তি হয় না। কাজেই বিবাহেরই ভিতর দিয়া সুনির্দিষ্ট পিতৃত্বের তৃপ্ত লাভ হয়।

৩। **মৈত্রীলাভ**। বস্তুত যেখানে দাম্পত্য-জীবন সুখের হয়, সেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এবং স্ত্রী স্বামীর মধ্যে চরম বন্ধুত্ব লাভ করিয়া থাকে। দোর্দণ্ড-প্রতাপ, নিষ্ঠুর-হৃদয়, হিংসুক ও অত্যাচারী স্বামীকে অনেক সময়ে স্ত্রীর উপদেশ ও পরামর্শে ক্রোধ ও অসূয়া দমন করিতে দেখা গিয়াছে। শুধু শিক্ষিত ও ভদ্র-সমাজের দম্পতি নহে, পরন্তু অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্ত্রীকে স্বামীর পরম হিতৈষী বন্ধুরূপে আচরণ করিতে দেখা যায়। **বিপদে সান্ত্বনা, রোগে পরিচর্যা, শোকে সহানুভূতি, এই সমস্ত ব্যাপারে স্ত্রীকে খুব উচ্চশিক্ষিতা হইবার প্রয়োজন হয় না**। নিতান্ত সাধারণ ঘরের অশিক্ষিতা স্ত্রীর মধ্যেও সচরাচর এইরূপ গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কলহ-বিবাদ হয় না, তাহা নহে। বরঞ্চ অনেক সাধারণ ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে দিবারাত্র কলহ লাগিয়াই আছে। কিন্তু ঐ সকল হয় প্রায়শ বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া এবং **উভয়ে একই সংসারকে নিজের সংসার** মনে করে বলিয়া। সুতরাং ঐ কলহ তাহাদের পরস্পরকে মিত্র বা আপনার জন ভাবিবার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকতা জন্মায় না।

৪। **সাহচর্যলাভ**। বিবাহের পর হইতেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জানে যে, উভয়ের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা। একজনের দুঃখে আর একজনের দুঃখ; একজনের সুখে অপরের সুখ। এই অনুভূতি হইতে সংসারের কর্তব্যগুলিকে

উভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমান ভাগে ভাগ করিয়া লয়। স্বামী সাধারণতঃ বাহিরের কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া আসিয়া দেখে ভিতরের কাজগুলি স্ত্রী গুছাইয়া রাখিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী স্বামীর অর্থোপার্জনের কার্যেও সমান সহযোগিতা করিয়া থাকে। বস্তুত হুমায়ুন (শেরশাহের নিকট পরাজিত হইয়া) যখন দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাজপুতানার প্রান্তরে বৃক্ষতলে নিজেকে ক্ষুধাকাতর ক্লান্তভাবে শায়িত দেখিল, তখন সেই বিপদে নিজের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিল কাহাকে?—নিজের স্ত্রীকে। সুতরাং আপদে-বিপদে, সুখে-সম্পদে স্ত্রীর মত সহচরী আর কেহ নাই। যে বিপদে পুরুষ নিজের ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-কন্যা পর্যন্ত হারাইয়া ফেলে, সেই চরম মুহূর্তে যাহার সান্ত্বনা-শীতল হস্ত পুরুষের দেহ জুড়াইয়া দেয়—সে সহচরী স্ত্রী। বস্তুত স্ত্রীই পুরুষের বিরাট সাংসারিক দায়িত্বকে অতটা লাঘব করিয়াছে এবং সাংসারিক সকল কাজে শৃঙ্খলা বিধান করিয়াছে।

৫। **মানবমনের বিস্তৃতি** সাধন। মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। মানুষ দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ই নিজের সুখসুবিধা ও স্বার্থের মাপকাঠি দিয়া ওজন করিয়া থাকে। তাহার কর্ম ও জ্ঞান-সাধনার সমস্ত সৌধ নিজেকে ঘিরিয়া ও নিজের স্বার্থকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে। কিন্তু মানবের এই আত্মপরতার ভিত্তিতে আঘাত করে বিবাহ। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা যৌনপ্রেম হইলেও তাহার প্রতি আসক্তি ও মোহ, তাহার দ্বারা নানাবিধ প্রয়োজন সিদ্ধি হওয়াতে এবং আরও হইবার আশা থাকায় ও উভয়ের স্বার্থ অনেক ব্যাপারে একই হওয়ায়, স্বামীকে সকল ব্যাপারে স্ত্রীর অংশীদারত্ব মানিয়া লইতে হয়। এতদিন সমস্ত ভোগসুখে সে নিজেকে একা কল্পনা করিয়াই আনন্দ পাইত, কিন্তু বিবাহের পর হইতে সকল কাজে যে একটি ব্যক্তি, হয়ত তাহার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অর্থের ভাগীদার ও যত্নের দাবীদার রূপে আসিয়া দাঁড়ায় —সে তাহার স্ত্রী। এইভাবে পুরুষের আত্মপরতার কোনও এক ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া স্ত্রী পুরুষের সমস্ত আত্মকেন্দ্রিক সুখের রাজ্যের অপরিত্যাজ্য অংশীদার হইয়া বসে। তাহার পর ক্রমাগত সন্তানদের আগমনে পুরুষের সেই সুখের রাজ্যের অংশীদার-সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে পুরুষের আত্মপরতার বিস্তার এবং আমিত্ব প্রসার লাভ করিয়া সেই বৃত্তের মধ্যে ক্রমশ সন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী, দেশবাসী এবং আরও প্রসারিত হইয়া বিশ্ববাসীকে গ্রহণ করে। ফলত বিবাহই মানুষের মনকে ক্ষুদ্রতা ও

স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রশস্ত ও পরার্থপর করে, মানুষের স্নেহপ্রীতিকে বিস্তৃত করে, পরের জন্য আত্মত্যাগের বাসনাকে জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করে। এক কথায়, মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিবাহ এক অতি **সুনিশ্চিত-সাধনাপথ**।

বিবাহের দোষ

পক্ষান্তরে বিবাহের অনেকগুলি **দোষও** আছে। এই সমস্ত দোষ এত জটিল ও দুঃসাধ্য যে, উহাদিগকে সহজে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। এই সমস্ত দোষের মধ্যে **যৌন-অতৃপ্তি, কর্মকেন্দ্রের সংকীর্ণতা, আর্থিক অনটন, দায়িত্বের বোঝা, জ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতির (পারমার্থিক) সাধনায়** বিঘ্ন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) ডাঃ ফ্রয়েড এবং অন্যান্য বহু যৌনবিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, বিবাহ মানুষকে **যৌনতৃপ্তি** দান করিতে পারে না। আমরা পূর্ব-পূর্ব অনুচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, পুরুষ সাধারণত **বহুনারীকামী**; সে এক স্ত্রীতে তৃপ্ত থাকিতে চাহে না। অথচ বিবাহজীবনে যৌন-নিষ্ঠা রক্ষা না করিলে দাম্পত্যজীবন কিছুতেই সুখের হইতে পারে না। যৌন-নিষ্ঠার এই বাধ্যবাধকতা পুরুষের পক্ষে বিশেষ ক্লেশকর। সেইজন্য **বিশেষ সংযমী ও মৃদুকামসম্পন্ন** অথবা **কতকটা পুরুষত্ব-হীন পুরুষ ব্যতীত** বহু পুরুষ যৌন-নিষ্ঠা রক্ষা করে না, স্ত্রীর জ্ঞানে অজ্ঞানে অন্য নারী কিংবা গণিকাগমন করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রী তাহা জানিতে পারেন। তখন দাম্পত্যজীবন অ-সুখের হইতে বাধ্য। যৌন-নিষ্ঠার এই দুঃসহ বাধ্যবাধকতা এড়াইবার জন্য পুরুষ তাহার ক্ষমতাবলে আইনসম্মত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে বহুবিবাহের প্রচলন করিয়া। আজিও পৃথিবীর বহু সভ্যজাতির মধ্যে বহু-স্ত্রী গ্রহণ করা আইনসঙ্গত। যে সমস্ত জাতির মধ্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইনঘটিত বাধা আছে, তাহারা অনেকে বিবাহেতর নারীসঙ্গমে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। অথচ সতীত্বরক্ষার দায়িত্ব কেবল স্ত্রীদের স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে। ইহাকেই বলে নর ও নারীর জন্য স্বতন্ত্র নৈতিক মান বা আদর্শ (Double Standard of morality)। ফলে বিবাহের এই দোষ অর্থাৎ একই যৌনসঙ্গী লইয়া সন্তুষ্ট থাকার অসুবিধা, নারীজাতিকেই বেশী ভোগ করিতে হইতেছে।

ডাঃ হ্যামিল্টন এ বিষয়ে একশত পুরুষ ও একশত বিবাহিতা নারীর জবান-

বন্দী গ্রহণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই যে, বিবাহে পুরুষ অপেক্ষা **নারীজাতিই** বেশী নৈরাশ্য ভোগ করিতেছে।

কিন্তু ক্যাথারিন ডেভিসের গবেষণার ফল অন্যরূপ। তিনি এক হাজার বিবাহিতা নারীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ৮৭২ জনের উত্তর পাইয়াছেন যে, তাঁহারা বিবাহে সুখী হইয়াছেন; ১১৬ জন অসুখী হইয়াছেন এবং ১২ জন কোনও উত্তর দেন নাই। যৌন-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডিকিন্‌সন তাঁহার এক হাজার আটানব্বই জন রোগিণীর স্বীকারোক্তি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শতকরা ৬০ জন বিবাহিতা নারীই বিবাহিত জীবন 'সহিয়া নিয়াছেন' অর্থাৎ 'কোনও মতে খাপ খাওয়াইয়াছেন' মাত্র।

সুতরাং বিবাহিত জীবন মোটের উপর নারী বা পুরুষ কাহারও পক্ষে যৌনতৃপ্তির দিক হইতে খুব সুখের নহে। এতদ্ব্যতীত বিবাহিত জীবনে প্রায়শ দৈহিক মিল নিতান্ত একঘেয়ে বলিয়া নারীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই উহা কতকটা নিরানন্দ ও উত্তেজনাবিহীন।

মিলনের তৃপ্তি ও আনন্দের দিক হইতে বিচার করিলে বিবাহের এই সমস্ত দোষের কথা নিতান্ত তুচ্ছ নহে, এ কথা ঠিক। কিন্তু এ সমস্তেরই বহুলাংশে প্রতিকার হইতে পারে। বিবাহকে আমরা সমাজকল্যাণের অন্যান্য দিক হইতে আবশ্যক বিবেচনা করিলে উপরোল্লিখিত ত্রুটিসমূহ অনেকটা দূর করিবার উপায় সহজেই উদ্ভাবন করিতে পারি। বিবাহের পূর্বে আমরা ভাবীদম্পতির **স্বাস্থ্য, রুচি, শিক্ষা, দীক্ষা, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সামঞ্জস্য** ইত্যাদির বিবেচনা করিয়া **সর্বাঙ্গীণ উপযোগিতা** সাব্যস্ত করিয়া বিবাহ দিলে এই সমস্ত অসামঞ্জস্যের বারো আনা সম্ভাবনা দূরীভূত হইবে। মানুষের জ্ঞানের সসীমতা হেতু তথাপি বিবাহজীবন অসুখী হইতে পারে। তাহার প্রতিকারের জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উভয়পক্ষের তালাকের ন্যায্য ক্ষমতা থাকিলে এ সমস্ত অমঙ্গলের হাত হইতে সমাজ রক্ষা পাইতে পারে। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে বিবাহিত জীবনে দৈহিক মিলনের একঘেয়েমি দূর হইতে পারে, দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম হইতে ষোড়শ অধ্যায়ে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

(২) **পারমার্থিক সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি**। ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, অনেক জ্ঞানতাপস এবং ধর্মপ্রবর্তক সমাজসংস্কারক স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে সৎকার্য সাধনের **পরিপন্থী** মনে করিয়া বিবাহ করেন নাই অথবা স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাদের অভিমত এই যে, পরিবার মানুষকে

নির্ঝঞ্ঝাটে, শান্তিতে ও নির্লিপ্তভাবে কোনও বৃহৎ ও মহৎ কার্য করিতে দেয় না। স্ত্রী-পুত্র মানুষের হৃদয়কে সঙ্কীর্ণ ও তাহার সাধনক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে। নিজের স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে পুরুষকে এত ব্যস্ত ও বিব্রত থাকিতে হয় যে বিদ্যাচর্চা, দেশসেবা, মানবসেবা প্রভৃতি মহৎ কার্য করিবার তাহার সামর্থ্য, ইচ্ছা ও সময় মোটেই থাকে না। কোন কোন বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের স্ত্রীগণের জীবন অতীব শোচনীয় ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়, কারণ উক্ত দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ নিজেদের সাধনায় এমন আত্মবিস্মৃতভাবে সমাহিত থাকিতেন যে, স্ত্রীর প্রতি যৌন ও অন্যান্য কর্তব্য পালন করিবার কথা তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেন। সুতরাং কোন সাধনার পক্ষে বিবাহ একটা মস্ত বড় বিঘ্ন।

কিন্তু এই ধারণা একদেশদর্শী। বিবাহও যে একটা সাধনা, এ সাধনায়ও যে ফল ও আনন্দ আছে, ইহাও যে মানবকল্যাণের একটা উৎস, ইহার ফলে জ্ঞানী, কর্মী ও সাধক দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় (অবশ্য পত্নী সুশীলা ও গুণবতী হইলে) নানা ভাবনা-চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও সর্বপ্রকার সুখ, সুবিধা ও আরামের অধিকারী হইয়া, নির্বিঘ্নে নিজ কর্ম করিয়া যাইতে পারেন, প্রাচীন জ্ঞানপন্থীগণ এই দিক হইতে বিবাহকে বিচার করেন নাই। বস্তুতঃ নারীজাতি শিক্ষায় ও জ্ঞানে উন্নত হইলে পুরুষের প্রত্যেক সাধনাক্ষেত্রে **পরিপূর্ণ সহযোগিতা** করিতে পারে, এই বোধ সর্বত্র উন্মেষ লাভ করিতেছে।

(৩) ইহাতে পুরুষের স্কন্ধে একটা **আর্থিক দায়িত্ব** আরোপিত হয়। বর্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে নিজের জীবনসংস্থানেই বিশেষ বেগ পাইতে হয়, তাহার উপর জীবনের প্রারম্ভে যৌবনেব আনন্দ উপভোগের সময় দায়িত্ব স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়ায় যুবকমাত্রেরই সুখ-স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়। অভাবের তাড়নায় সে দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে থাকে। বিশেষ করিয়া এই বেকারসমস্যার যুগে, স্ত্রী যুবকের স্কন্ধে একটা দুর্বহ বোঝা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

যুবকদের দুর্ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অনেক দূরদর্শী সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি এই জন্য যুবকদিগকে উপার্জনক্ষম হইবার পূর্বে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। সচ্ছলতার দিক হইতে ইহা সুপরামর্শ সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার যৌনজীবনের কথাটা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? স্ত্রীর জন্য দেহের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, অন্যথায় তাহাকে বিবাহেতর যৌন-সম্ভোগ করিবার পরামর্শ দিতে হইবে। যৌনপবিত্রতা রক্ষা করিতে

গেলে যুবকদের সর্বাপেক্ষা মধুর ও প্রণয় স্বপ্নময় (Romantic) জীবনকাল বৃথা অতিবাহিত হইবে এবং দুর্বার কাম-রিপুর সহিত অবিরত সংগ্রামে স্বাস্থ্য, সুখ ও শান্তি নষ্ট হইবে, পক্ষান্তরে বালক, নারী বা পশু সম্ভোগ করিতে গেলে তাহার সুনাম, চরিত্র, স্বাস্থ্য ও অর্থ বিপন্ন হইবে। সুতরাং ইহা উভয়-সঙ্কটের ব্যাপার এবং ইহার জন্য বর্তমান বিবাহপ্রথাকেই দায়ী করা হয়।

কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহা সঙ্কট নহে। স্ত্রীকে জীবনের ভার মনে করা একটা ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের যুবকদের মনে ইহা সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু একটু ধীরচিত্তে চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বিবাহ আমাদের কর্মজীবনের দীক্ষামাত্র। প্রিয়তমা সুশীলা স্ত্রী আমাদের **কর্মে প্রেরণা সৃষ্টি** করিয়া থাকে। অনেক নিষ্কর্মা ও উচ্ছৃঙ্খল যুবককে সুন্দরী স্ত্রী বিবাহ করাইয়া বিষয়-কর্মে নিয়োজিত করিবার সংবাদ হয়ত অনেকেই অবগত আছেন। বস্তুত **বিবাহ আমাদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানের সৃষ্টি** করে। অবিবাহিত তরুণ যুবকের মধ্যে **অগভীর তারল্য, চপলমতিত্ব, কর্তব্যে অবহেলা, স্বার্থপর ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও নিষ্ফল ক্রীড়াকৌতুকে মত্ততা** আমরা সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু **মনোমত** যুবতীর সহিত বিবাহ করাইয়া দিলে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকৃতির তরুণদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের স্ফুরণ হইতে দেখা গিয়াছে।

ইহা ছাড়া আজকাল **জন্মনিয়ন্ত্রণের** প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির জ্ঞান আহরণ করা দম্পতির পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য। ইহাতে পরিবারবৃদ্ধির দরুন আর্থিক অনটনের আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া যায়।

উপরে উল্লেখিত বিবাহের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দোষ শুধু পুরুষদের সম্বন্ধেই খাটে। **নারীর পক্ষ হইতেও বহু অসুবিধা** আছে। বিবাহিত জীবন নারীর জ্ঞান ও কর্মশক্তিকে পঙ্গু করিয়া দেয়। নারীর মাতৃত্ব এবং জ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতির সাধনা ও রাষ্ট্রনৈতিক ও বহির্জাগতিক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে প্রকাণ্ড বিরোধ রহিয়া গিয়াছে। মাতৃত্ব এত বড় একটা দায়িত্ব যে, ঐ দায়িত্ব পালনে নারীর প্রায় সমস্ত সময় ও শক্তি অতিবাহিত হইয়া যায়; জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ও সমাজসেবার তাহার আর অবসর থাকে না। কতকটা এই জন্যই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনে নারী প্রতিভার ততদূর বিকাশ হইতে দেখা যায় না।

ইহা খুব শক্তিশালী যুক্তি হইলেও ইহা বিবাহের বিরুদ্ধে নহে—ইহা সৃষ্টির বিরুদ্ধে। বিবাহপ্রথা না থাকিলেও **নারীকেই সৃষ্টি কার্য চালাইতে হইবে** এবং সন্তান প্রসব ও পালনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট তাহাকেই সহ্য করিতে হইবে। সুতরাং এজন্য বিবাহপ্রথাকে দোষ দেওয়া যায় না।

(২৬)

বিবাহে বিবেচ্য ও কর্তব্য বিষয়সমূহ

প্রণয় সাপেক্ষ পরিণয় বনাম পরিণয়-সাপেক্ষ প্রণয়

পূর্বের আলোচনায় মোটামুটি এই সাব্যস্ত হইল যে, (১) মানবকল্যাণের দিক হইতে বিচার করিলে নরনারীর যৌনসম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণের এবং অপর নানা সুবিধার জন্য কোনও-না-কোনও প্রকারের বিবাহপ্রথা মানিয়া লওয়া উচিত এবং (২) বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে, অবস্থাবিশেষে বিশেষ ব্যবস্থাসহ, **এক বিবাহই** (Monogamy) **ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর।**

বিবাহপ্রথার দেশগত ও কালগত বৈচিত্র্যের অবধি নাই। মানুষের **সংস্কার, অভ্যাস ও দলগত মনোভাব বশত নিজেদের রীতিনীতি বা আচার-প্রথাকেই** প্রায় সকলের নিকট মনোহর বা তৃপ্তিকর করিয়া তুলে। এইজন্য আমাদের নিকটও একই কারণে আমাদের আচার-প্রথা এরূপ মনে হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। তবে আমরা যে মুক্ত বুদ্ধি লইয়া নিরপেক্ষ-ভাবে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি উহাতে নূতনের প্রতি-নিরর্থক বিরুদ্ধ-ভাবের অবকাশ নাই। পূর্বসংস্কারবর্জিত হইয়াই পাঠক-পাঠিকাকেও এই আলোচনায় যোগ দিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। অপরের ভাষা, পরিচ্ছদ, রীতিনীতি এবং জাতিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় মতামত ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও উদারতাই হৃদয়ের প্রসার, সভ্যতা, ভদ্রতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠি।

আধুনিক জগতে পাত্রপাত্রী নির্বাচনে যে **দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী রীতি** দেখা যায় তাহা **প্রণয় সাপেক্ষ পরিণয়** (Love marriage) এবং **পরিণয় সাপেক্ষ প্রণয়** (Married love); জগতের প্রায় অর্ধসংখ্যক লোক প্রথমোক্ত পদ্ধতি এবং বাকী অর্ধেক অপর পদ্ধতি অবলম্বন করে। ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া **সাধারণতঃ** প্রথমোক্ত

এবং আফ্রিকা ও এশিয়া সাধারণতঃ শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে, তবে মোটামুটি উহাই সত্য।

দুঃখের বিষয়, সংস্কারগত মনোভাব লইয়া বিচার করিতে গিয়া একে অপরের প্রথাকে অযথা **হেয়, কুরুচিপূর্ণ ও অনিষ্টকর** প্রতিপন্ন করিবারও চেষ্টা করিতেছে।

পাশ্চাত্যজগতের মতে, মোটামুটিভাবে, **প্রণয় ব্যতিরেকে প্রণয়** প্রহসন মাত্র। দুইটি ব্যক্তি পরস্পরের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয় মাত্র পরস্পরেব দেহভোগেব অবাধ অধিকার দিয়া। উহারা পরস্পরকে মন দিয়া কামনা করে কিনা, একে অপবেব উপযোগী কিনা পাত্র ও পাত্রীকে তাহা বিচার করিবার অবকাশও দেওয়া হয় না। ইহাতে বিবাহকে নিতান্ত ঘাড়ে চাপানো একঘেয়ে দৈহিক সম্পর্কে পরিণত করা হয় মাত্র, এবং এই হেতু উহাকে **আইনসম্মত পণ্যা-স্ত্রী ভোগ** (Legalised Prostitution) বলিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

পক্ষান্তবে প্রাচ্যজগতেব মতে, মোটামুটিভাবে, **পরিণয় ব্যতিরেকে প্রণয়** অবৈধ উচ্ছৃঙ্খল আচবণের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ইহাতে ছেলেমেয়েকে প্রলোভনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বিপন্ন কবা হয় মাত্র এবং যুবক-যুবতীব পক্ষে কেলেঙ্কারীব কর্দমে হাবুডুবু খাইয়া ক্ষণিক মোহাচ্ছন্ন মনোভাব লইয়া বিবাহের পব কিছুদিনেই আবার বিরাগ, বিতৃষ্ণা ও ছাড়াছাড়ির আশঙ্কা থাকিয়া যায় মাত্র। কাবণ অপরিপক্ক বুদ্ধিব বিচার নির্ভুল না হইবার কথা।

আমাদের মনে হয়, **উপযুক্তভাবে বিচার করিতে হইলে উভয় রীতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইতে হইবে।** আমরা নিরপেক্ষভাবে পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উভয় দিকেবই আলোচনা করিব।

প্রণয় সাপেক্ষ পরিণয়

পাশ্চাত্য মতে **প্রণয়** ও **প্রেমই** বিবাহের **ভিত্তি** হওয়া উচিত। এলেন কী (Ellen Key) বলেন, সত্যকার বিবাহে একটি মাত্র শর্ত থাকিবে— **যাহারা পরস্পরকে ভালবাসে তাহারাই স্বামী-স্ত্রী।**

প্রেম বা প্রণয় কি, উহার স্ফুরণ কি প্রকারে হয়, প্রেমিক-প্রেমিকার জীবন কত মাধুর্যময়, প্রেমের জন্য স্বার্থত্যাগের অপূর্ব উদাহরণ—ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ আমরা পূর্ব এক অধ্যায়ে করিয়াছি।

যৌবনে নর ও নারীর প্রেম বিপরীত লিঙ্গের পাত্রবিশেষে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। তবে উপযুক্ত অবস্থার অভাবে হয়ত তাহাদের মিলন নাও ঘটিয়া উঠিতে পারে। কবে কোন শুভ মুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকার সন্ধান মিলিবে—এই বলিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য বসিয়া থাকাও চলে না।

তাই পাশ্চাত্য জগতে রীতিমত **প্রেম অভিসারের প্রথা** (Court-ship) প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ বিবাহের পূর্বেকার **প্রণয়লীলার** উদ্দেশ্যই থাকে বিবাহ। এই জন্য উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েকে মিলিবার মিশিবার সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। সহপাঠ, ভ্রমণ, নৃত্য, পার্টি, ভোজন, খেলাধূলা, চা-পান প্রভৃতিতে একত্র হওয়ার এইরূপ সুযোগ মিলে। উহারাও সেবায় যত্নে, উপহারে, উপকারে, বেশভূষায়, কথাবার্তায়, ব্যবহারে, গানে, গল্পে সুন্দর, মহৎ ও কঠিন কিছু করিয়া নিজেদের লোভনীয় করিয়া তোলে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দোষ ঢাকিয়া গুণের পরিচয় দিতে চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে একই পুরুষকে একাধিক প্রেমিকা এবং একই রমণীকে একাধিক প্রেমিক জয় করিবার জন্য প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে।

যাহা হউক, আশা-নৈরাশ্য, ঘাত-প্রতিঘাত, পাওয়া-না-পাওয়ার ভিতর দিয়া অবশেষে দেখা যায়, দুইটি যুবক-যুবতী প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়াছে, অথবা আসলে, নিজের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে। তাহারা তখন মাতাপিতা বা গুরুজনের অনুমোদনক্রমে আরও কিছুকাল **পরস্পরের উপযোগিতা** যাচাই করিতে থাকে। এই অবস্থাকে **কোর্টশিপ** বলে। যখন যুবক মনে করে যে, সে যুবতীর হৃদয় জয় করিয়াছে, তখন সে তাহার পাণি প্রার্থনা করে এবং সম্মতি পাইলেই গুরুজনের আশীর্বাদ লইয়া বাগ্‌দত্ত (Engaged) হয় ও তাহার চিহ্নস্বরূপ আংটি বদল করে। ইহার কিছুদিন পরেই প্রথামত উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়।

পরিণয়-সাপেক্ষ প্রণয়

এশিয়া ও আফ্রিকার বিপুল জনসাধারণের মধ্যে অপর রীতি অর্থাৎ **পরিণয়-সাপেক্ষ প্রণয়ের** প্রচলন আছে।

পিতামাতা বা গুরুজন সন্তানের মঙ্গল-কামনায় প্রচলিত আচার, প্রথা এবং নিজেদের রুচি, আদর্শ এবং খেয়াল-খুশী অনুযায়ী সঙ্গী জুটাইয়া দেন। সন্তানের পক্ষে মতামত প্রকাশ করা লজ্জার কথা।

বিবাহ একটা গুরুতর দায়িত্ব। বহু বিষয়ে বিবেচনা করিয়া ইহাতে আবদ্ধ হইতে হয়। অপরিণতবয়স্কদের স্কন্ধে এতবড় গুরুদায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া আশঙ্কার কথা। তাই গুরুজনই সকল দিক বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেন। তাঁহাদের আশীর্বাদ মাথায় লইয়া বরবধূ জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। তাহাদের পরিচালনার ভার তখনও অনেকটা গুরুজনের উপরেই থাকে। সুখের বিষয়, নববিবাহিতেরা যৌবনধর্ম বশতঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা সুখী হয়।

বিবাহকে কর্তব্য হিসাবে দেখা হয়। কর্তব্য যে সব সময়েই স্বনির্বাচিত বা সুনির্বাচিত হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। জগতে এমন বহু কর্তব্যই আমরা সানন্দে সমাধা করি, যাহাদের নির্বাচনে আমাদের কোন হাত থাকে না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রণালীর দোষগুণ

প্রাচ্য প্রণালীর গুণ—(১) বিবাহ কর্তব্যবিশেষ। স্বেচ্ছায় বরণ না করিয়া থাকিলেও হিতৈষী ও সমধিক সংসার-অভিজ্ঞ গুরুজনের নির্বাচন সানন্দে মাথা পাতিয়া লওয়া হয়। (২) বিবাহ গুরুতর বিষয়। উহাতে গুরুজনের বহুদর্শিতা, অভিজ্ঞতা এবং সমৃদ্ধ জ্ঞানের সাহায্য পাইলে ফল শুভ হইবারই কথা। (৩) টানাটানি, হেঁচড়া-হেঁচড়ি বা প্রতিযোগিতার ধাক্কা দম্পতির ঘাড়ে না পড়ায় নিষ্ফলতার তীব্র জ্বালা বোধ করে না। তাহারা পারিবারিক শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে। (৪) সামাজিক শৃঙ্খলা; পদমর্যাদা, লজ্জা-শীলতা, সুনীতি ইত্যাদি সংরক্ষিত হয়।

প্রাচ্য প্রণালীর দোষ—(১) পিতামাতা বা গুরুজন সর্বক্ষেত্রে বিচক্ষণ-তার সহিত কাজ করিতে পারেন না বা করেন না, তাহার প্রমাণ: (ক) **ভয়াবহ বাল্যবিবাহের অভিশপ্ত প্রচলন।** (খ) **দুর্ভেদ্য জাতিপ্রথার** সংরক্ষণ। (গ) **ঘৃণ্য অর্থলোলুপতা বা পণপ্রথা।** টাকার লোভে কুৎসিত কিংবা অশিক্ষিতা পাত্রী, কুৎসিত, নেশাখোর, চরিত্রহীন, রুগ্ন ও দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের পাত্র নির্বাচন। (ঘ) বহুসংখ্যক অসুখী দম্পতি।

(২) পুত্রকন্যা সাবালক, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও পাত্রী বা পাত্র নির্বাচনে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বা পুরাতনপন্থী মাতাপিতার তাহাদের মতামত না লওয়া ও তাহাদের রুচি ও পছন্দ সম্পূর্ণভাবে অবহেলা বা উপেক্ষা করা।

(৩) অনেক দিন আলাপ-পরিচয়ের ফলে পাত্রীকে পরস্পরের স্বভাব, প্রকৃতি, স্বাস্থ্য ও গুণাগুণ বুঝিবার সুযোগ দেওয়া তো দূরের কথা, বিবাহেচ্ছুকে

একটিবার জীবন-সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে দেখিয়া লইবারও অনুমতি বা সুযোগ না দেওয়া।

(৪) অর্থলোভী ঘটকের চাতুর্যপূর্ণ অতিরঞ্জনে বিশ্বাস করিয়া পাত্র ও পাত্রীর স্বাস্থ্য, চরিত্র ও বিদ্যা, তাহাদের পিতৃ ও মাতৃকুলের স্বাস্থ্য, আয়, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, সংস্কৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ না লইয়া, শুধু বংশের প্রাচীনতা, কৌলিন্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং ধন-সম্পদ দেখিয়া, লম্বার সহিত বেঁটের, কাল ও কুৎসিতের সহিত গৌরবর্ণ ও রূপবান্ বা রূপসীর, স্বাস্থ্যবানের সহিত রুগ্নার, স্বাস্থ্যবতীর সহিত রুগ্নের বা (গনোরিয়া-জনিত) বন্ধ্য পাত্রের, বিদ্বানের সহিত মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্নের, বৃদ্ধের সহিত যুবতীর বিবাহ দিয়া শ্রেষ্ঠ পক্ষের মনে চির অসন্তোষ জাগানো ও ভবিষ্যৎ বংশ মাটি করিয়া দেওয়া।

(৫) ফলিত জ্যোতিষে ও কোষ্ঠীতে অন্ধবিশ্বাসের ফলে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী হাতছাড়া করিয়া অযোগ্যের সহিত বিবাহ দেওয়া। নির্বাচনে মুখ্য ব্যাপারসমূহে জ্ঞানের অভাব ও বাজে কথা লইয়া বাড়াবাড়ি।

পাশ্চাত্য প্রণালীর গুণ—(১) পাত্রপাত্রীর স্বাধীন নির্বাচন স্বীকার করিয়া পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহের মুলোচ্ছেদ করা হইয়াছে। পিতামাতার অযথা সাধ বা আহ্লাদ বশত স্নেহের দুলাল-দুলালীকে অপরিণত অবস্থাতেই বিবাহে আবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টার অবকাশ থাকে না।

(২) স্বাধীনভাবে প্রেম-অভিসার করিতে হয় বলিয়াই ছেলেমেয়েদিগকে মিলিবার মিশিবার উপযুক্ত হইতে হয়। ইহাতে সুষ্ঠু সামাজিক আচার ব্যবহার গড়িয়া উঠে। কি করিয়া পরস্পরের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া মেলামেশা করিতে হয় তাহা হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে হয়। ছেলেমেয়েরা ইহাতে সৌজন্য, শালীনতা, সুরুচি, ভব্যতা, সহিষ্ণুতা, ঔদার্য, সহৃদয়তা, আত্ম-নির্ভরতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ আয়ত্ত করিবার সুযোগ পায়। অযথা লজ্জা, অশোভন কুণ্ঠা, অবগুণ্ঠিত জড়সড় ভাব সামান্য কারণে মুষড়াইয়া পড়া ইত্যাদি দুর্বলতা লোপ পায়।

(৩) প্রেম কৃত্রিম:বাধাবিপত্তির ধার ধারে না বলিয়া বিবাহে দেশ জাতি, ধর্ম প্রভৃতির অনিষ্টকর গণ্ডির উচ্ছেদ সাধন করিবার মত এমন সুন্দর কার্যকরী উপায় আর নাই। সমাজের তথাকথিত উচ্চ-নীচতা সমান করিয়া দেয় প্রেম। এই প্রেমজ বিবাহ আমাদের দেশের কুপ্রথাজনিত কুসংস্কারমূলক

ভেদ ও বৈষম্যের একটা **প্রবল প্রতিষেধক** হইতে পারে। **সাদাকালোয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে, ধনী-দরিদ্রে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে, হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি ও সমন্বয় সাধনে ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ** হইতে পারে।

(৪) পিতামাতার অর্থের ঘৃণ্যলোভ অথবা অলীক বংশমর্যাদা বা প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহবশত ছেলেমেয়েকে ধরিয়া-বাঁধিয়া **অর্থকরী যন্ত্র-হিসাবে** ব্যবহারের এবং এইজন্য অযোগ্যের সহিত তাহাদের বিবাহ দেওয়ার অবকাশ থাকে না। এইরূপ প্রণয়-সাপেক্ষ পরিণয়ই আমাদের দেশের ঘৃণিত **পণপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত** করিতে পারে।

(৫) যাহারা অজানা ব্যক্তিকে মন্ত্র আওড়াইয়া গ্রহণ করে তাহাদের পক্ষে **ফরমায়েস মত** প্রেম করাটাই সমস্যা, বাঁচাইয়া রাখা ত পরের কথা। কিন্তু প্রেম লইয়া যাহারা বিবাহবদ্ধ হয় তাহাদের সমস্যা—শুধু দাম্পত্য-জীবনেও **উহাকে জীবিত ও দীপ্ত** রাখা।

বস্তুত আমাদের দেশের, তথা প্রাচ্যের, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই **দাম্পত্য প্রেম** থাকে না, থাকে প্রেমের লঘুতর অবস্থা অথবা মমতাবোধ, অধিকার ও সম্পত্তি-বোধ কিংবা পারস্পরিক সৌজন্য ও শালীনতা। দেশবাসীর নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন ভুল না বুঝেন। প্রেম **অর্ডার দিয়া** বা **ফরমায়েস মত** উৎপাদন করা যায় না। আমরা সমাজের মঙ্গল কামনা করিয়াই নিরপেক্ষ সত্য দেখাইবার জন্য এই সব তুলনামূলক কঠিন মন্তব্য করিতেছি।

পাশ্চাত্য প্রণালীর দোষ—(১) প্রেম-অভিযানে ব্যস্ত থাকিয়া যুবক-যুবতীর পদস্খলিত হইবার ভয় থাকে। উহারা বিবাহপূর্ব ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় অভ্যস্ত হইয়া চরিত্র হারাইয়া বসিতে পারে।

(২) প্রেম-অভিসারে অকৃতকার্য বা প্রত্যাখ্যাত হইয়া বহু যুবক-যুবতীর মানসিক অশান্তি সারা জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিতে পারে।

(৩) যৌবনের অভিজ্ঞতাজনিত দূরদৃষ্টি এবং **ধৈর্যের** অভাবহেতু **নির্বাচনে** ভুলের সম্ভাবনা বেশী। ক্ষণিক মোহে বা রূপের আকর্ষণে **অপাত্রে মনঃ-সংযোগ** হইবার আশঙ্কা থাকে। বিবাহার্থী যুবক-যুবতী কোর্টশিপের সময় সযত্নে নিজ নিজ দোষত্রুটি ও দুর্বলতা ঢাকিয়া শিষ্টতা ও সৌজন্যের মুখোশ পরিয়া থাকে। দোষগুলি বিবাহের পরেই জানা যায়।

রূপের **মাদকতা** (মাকাল ফল বা শিমূল ফুলের মত) পাত্রপাত্রীকে এমন **মোহাচ্ছন্ন** করিয়া রাখিতে পারে যে, গুণহীন ও দোষযুক্ত অযোগ্য জীবন-

সাথী নির্বাচনের ফলে বিবাহিত জীবনের **কঠোর বাস্তবতার** ধাকায় তাহাদের পূর্বরাগ সম্পূর্ণ **বিরাগে পরিণত** হইতে পারে।

(৪) বহু ক্ষেত্রে নানা কারণে বিবাহিত জীবন অশান্তিময় হয়। তাহার মধ্যে কতক ক্ষেত্রে আদালতের সাহায্যে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করানো হয়, কতক ক্ষেত্রে আলাদা থাকিবার অধিকার ও স্ত্রীর 'খোরপোশ' লাভ করা হয়, এবং এইগুলি অপেক্ষা বহুগুণ ক্ষেত্রে বাহিরে কেলেঙ্কারী না করিয়া দম্পতি কোথাও বা একত্রে, কোথাও বা স্বতন্ত্র বাস করিয়া, দুঃখময় জীবন যাপন করে। প্রাচীনপন্থীরা বলেন, এদেশের তুলনায় স্থায়ীভাবে সুখী বিবাহের অনুপাত পাশ্চাত্যে কমই দৃষ্ট হয়। ইহাব কারণ এই যে, প্রাচ্য নারীদের অশিক্ষিত, অধিকারহীন, সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখার ফলে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সাহস বা ক্ষমতা তাহাদের থাকে না।

এই সকল আশঙ্কার কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অস্বীকার করেন না। বরং স্বীকার করিয়া লইয়া উহাদের **প্রতিষেধক ব্যবস্থা** (যথা—পরীক্ষামূলকভাবে একত্র বাস ও পরে বিবাহ-Companionate Marriage বা Trial Marriage) প্রবর্তনের প্রচেষ্টাও তাঁহাদিগকে করিতে দেখা যায়।

উপরোক্ত দোষত্রুটির সম্বন্ধে পর্যায়ক্রমে মন্তব্য এই :

(১) যৌননিষ্ঠার স্বরূপ ও আদর্শ পূর্বের এক অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। পরস্পর হইতে সযত্নে দূরে রক্ষিত যুবক-যুবতীদের সতীত্বের ও নিষ্ঠার মূল্যই বা কতখানি? কোন কোন ক্ষেত্রে পদস্খলন হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। ক্রমবর্ধমান মেশামেশির ফলে এদেশের কুমার-কুমারীর চরিত্রহানি হইতেছে। গর্ভনিবারণের সঠিক কোন উপায় সযত্নে অবলম্বিত হইলে ইহার ফলে গুরুতর অনিষ্ট হয় না।

(২) আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, **প্রত্যাখ্যাত প্রেম** ধীরে ধীরে অপর পাত্রস্থ হয়। জীবনে অকৃতকার্যতার অভিজ্ঞতা যত তিক্ত বাধাবিপত্তি এড়াইয়া বা মাড়াইয়া ইষ্ট লাভের ও প্রিয়জনকে জয় করিবার অভিজ্ঞতা ততই উপভোগ্য। **বিজয়ী প্রেম জীবনের সর্বাপেক্ষা মধুর অনুভূতি।**

(৩) পিতামাতা বা গুরুজন অসৎসঙ্গ বা অপাত্রের সংস্পর্শ হইতে ছেলে-মেয়েকে সদুপদেশ, এমন কি আদেশ নির্দেশ দিয়া বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন। পিতামাতার কর্তব্যই হইতেছে লক্ষ্য করিয়া যাওয়া যাহাতে উহারা উপযুক্ত পাত্রী ও পাত্রের সংস্পর্শে আসে। কন্যার যোগ্য পাত্রদের তাঁহারা নিমন্ত্রণাদি

করিয়া নিজ বাড়ীতে আসিতে উৎসাহ দেন ও কন্যার সহিত আলাপে সুযোগ দেন। ইহা সত্ত্বেও মতিভ্রম হইলে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের নিজেদেরই করিতে হইবে।

বিবাহের পর অমিলের আশঙ্কা বাস্তবিকই ভয়াবহ। তবে বাস্তবতার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার দায়িত্ব ইহাদেরও যেমন, অপরদেরও তেমন।

ধৈর্য ও স্থৈর্যের কত যে দরকার তাহা পাশ্চাত্য দেশের যৌনতাত্ত্বিকেরা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন। বিবাহকে মধুর করিবার উপায় কি এবং ছোট-বড় আশঙ্কা কি করিয়া এড়ানো যায় তাহা সে-দেশের **বিরাট যৌনবিজ্ঞানের** সর্বপ্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। আমাদের এই পুস্তকও **দম্পতিরই মঙ্গলকামনায় উৎসর্গীকৃত।**

(৪) তুচ্ছ কারণে বিবাহভঙ্গ হইতে দেখা গেলেও মনে রাখিতে হইবে, উহা পুঞ্জীভূত গরমিলের চরম ফল। **প্রত্যাখ্যান, অবহেলা, কলহ** ইত্যাদিতে প্রেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—একথা কেহ বলে না। আর যদি বাস্তবিকই বিবাহ-জীবন দীর্ঘকাল যাবৎ অসুখকর হইয়াই পড়ে, এবং সদ্ভাব পুনঃস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা না থাকে তবুও **লোক দেখাইবার** ও কেলেঙ্কারী এড়াইবার জন্য বা **মন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিবার ছলে** উহাকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে, ইহা কথাই নহে।

আমাদের জীবনের পরিসর খুব দীর্ঘ নহে। চেষ্টা করিয়াও যদি সঙ্গীর সহিত একত্র থাকা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে উহাকে মুক্তি দিয়া নিজেকেও মুক্ত করিয়া লইয়া অপর মনোমত সঙ্গীর খোঁজ করায় দোষ কি?

বিবাহিত জীবনও সাধনাক্ষেত্র; উহাকে শান্তিময় কবিতে হইলে যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের দরকার তাহা আয়ত্তে আনিতে হইলে শিক্ষার দরকার। তালাকের ন্যায্য অধিকার থাকা সত্ত্বেও তালাকের দরকার হইবে না, যৌনবিজ্ঞানীরা এই অবস্থাই কামনা করেন।

বিষম অশান্তি লইয়া কতক পুরুষ এবং অসংখ্য স্ত্রীলোক যে অশ্রুভার বহন করিয়া স্বামীর ঘর করিয়া যাইতেছে তাহার উদাহরণ এদেশে কম নহে। নারী যথেষ্ট **আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলে** ইহাদের মধ্যে অনেকেই যে বিদ্রোহিনী হইয়া উঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৫৫ সালের 'হিন্দুবিবাহ

আইনে' বিশেষ অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হইয়া খুবই ভাল হইয়াছে।*

এদেশের তুলনায় যে পাশ্চাত্য দেশে সুখী বিবাহের অনুপাত কম, ইহা আত্মজ কূপমণ্ডুকতা-প্রসূত নিজ সমাজ ও প্রথা সম্বন্ধে অন্ধ অনুরাগ ও গর্ব এবং অপর সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞাজনিত অনুমান মাত্র। ডাঃ হ্যামিল্টন তাঁহার A Research in Marriage গ্রন্থে এবং ক্যাথারিন ডেভিস তাঁহার Factors in the Sex life of Twenty-two hundred women গ্রন্থে যেরূপ বাস্তব তথ্য সংগ্রহ পূর্বক পাশ্চাত্য সুখী ও অসুখী বিবাহের অনুপাত, অসুখী বিবাহের নানা কারণের অনুপাত এবং যৌনজীবনের নানা ব্যাপার ও অভ্যাসের সহিত বিবাহে সুখ ও অসুখের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন (এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা দেখুন), আমাদের সমাজ সম্বন্ধে ঐরূপ গবেষণার ফল প্রকাশিত না হইলে নিরপেক্ষভাবে তুলনা ও মন্তব্য করা অসম্ভব।

আমাদের নিবেদন, **বিবাহে সংস্কারের প্রয়োজন আছে।** আমরা সভ্যতার পূর্ণবিকাশে এমন অবস্থার কল্পনা করিতে পারি যখন মানুষ **ভালবাসার দ্বারাই বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্ধারণ করিবে।** অন্ধ ও বিচার-ক্ষমতাহীন বলিয়া প্রেমের একটা বদনাম আছে। তবে সৌন্দর্য বিচার করিয়া যদি মানুষ ভালবাসার পাত্র স্থির করিতে পারে, তবে ঐ সঙ্গে **পাত্রের আরও দু'চারটা গুণ যে কেন বিচার করিতে পারিবে না, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নাই।** মানুষের রূপজ মোহ সাধারণতঃ এত অন্ধ নহে যে, সে পাত্র-অপাত্র ইত্যাদি বিচার না করিয়া, পাত্রের বয়স, স্বভাব-চরিত্র, স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, কুটুম্ব ইত্যাদি অগ্রাহ্য করিয়া, শুধু রূপ দেখিয়াই একজনকে জীবন-সাথী করিতে সংকল্প করিবে। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ঐরূপ দুর্জয় মোহ সাময়িকভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে পারে. তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু ঐ শ্রেণীর অন্ধ প্রেম প্রায়শঃ বিবাহে পরিণতি লাভ করে না। আমরা এখানে প্রেমের পাত্র বিচার

* হিন্দু সমাজে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া নারীর অপর বিবাহ করিবার বিধান পরাশর, নারদ, কাত্যায়ন ও বশিষ্ঠের সংহিতায় আছে; যথা স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, পতিত যথেচ্ছাচারী, অপস্মার (মৃগী Epilepsy) রোগগ্রস্ত বা অন্তজাতীয় প্রভৃতি স্থির হইলে, বিবাহিত নারীর পুনর্বার বিবাহ হইতে পারে। (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা-বিবাহ—দ্বিতীয়' পুস্তকের ৫-১৩ পৃষ্ঠা দেখুন।)

করিতে বসি নাই; বিবাহের পাত্র নির্বাচনের প্রণালী বিচার করিতেছি। সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, মানুষ প্রথমে রূপ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া থাকিলেও সামান্য চেষ্টাতেই সকল দিক হইতে গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণপ্রসূ পাত্র ও পাত্রী নির্বাচন করিতে পারিবে। যৌনবিজ্ঞান মানুষকে সদুপদেশ দিবে।

কেবলমাত্র প্রেমই যে বিবাহে সুখের নিশ্চিত কারণ নয়, ইহা ওয়েষ্টারমার্কও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই মর্মে বলেন,—

"While love is generally considered among ourselves as the proper motive for a marriage, if offers no guarantee for a happy married life, in fact marriages of reason are often more enduring than love-matches,"

মন্টেইন (Montaign) বলেন, "আমি কোন বিবাহেই অত শীঘ্র দাম্পত্য সদ্বিবেচনা বিফল হইতে দেখি না যতটা দেখি সৌন্দর্য ও যৌন-আকর্ষণের উপর ন্যস্ত বিবাহে, ইহার চেয়ে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর উহাকে গড়িতে হইবে, উহাতে আরও **সদ্বিবেচনার** দরকার; ঐরূপ তীব্র অনুভূতির মূল্য কিছু নহে।"

আমরাও বলি যে, রূপ ছাড়া অপর পক্ষের স্বভাব, প্রকৃতি, স্বাস্থ্য, পিতৃ ও মাতৃকুলের স্বাস্থ্য ও আয়ু, উভয়ের বয়স, রুচি, আদর্শ, ধর্ম, নীতি, সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্য, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অপর পক্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামত, আর্থিক অবস্থা, শারীরিক গড়ন, দৈর্ঘ্য ও বর্ণ, খাদ্য, পরিচ্ছদ, মিতব্যয়িতা, বদান্যতা, সন্তান-লাভ, সন্তানের সংখ্যা, সন্তানের শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি, মদ্য, জুয়া প্রভৃতির নেশা, সখ, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতিতে অনুরাগ, মেজাজ, পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে যেন যতদূর সম্ভব সমতা ও সামঞ্জস্য থাকে ইহা দেখা কর্তব্য। পিতামাতা বা গুরুজন একেবারে অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবেন তাহাও নহে। তাঁহারা সদুপদেশ দিয়া পুত্রকন্যাকে চালিত করিবেন। বস্তুত গুরুজন অথবা পাত্রপাত্রী নিজেরা এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনা করেন না, একথা বলিলে অন্যায় হইবে।

প্রেমের স্ফুরণের পরেও **কোর্টশিপে** বহুদিন কাটিয়া যায়। এই অবকাশের কার্যই হইতেছে **প্রেমের পরীক্ষাকরণ** এবং পারস্পরিক অন্যান্য উপযোগিতার বিচার।

মোট কথা, উভয় প্রথারই গুণ ও দোষ দুইই রহিয়াছে। তবে কোনটার কতটা তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতে পাঠক-পাঠিকা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন। উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ সফলতা **সাবধানতা, বিচারবুদ্ধি** এবং **সদ্বিবেচনা সাপেক্ষ।** উহার **অবলম্বন** ও **প্রয়োগ** আমরা **যৌন-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত পরিণতবয়স্ক পাত্রপাত্রীর** হাতেই তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী; অবশ্য মাতাপিতা গুরুজনের শুভাকাঙ্ক্ষা ও সদুপদেশের মধ্যস্থতাতেই বটে। **সম্পূর্ণ পরনির্ভরতা পরাধীনতারই সমতুল্য;** উহা **ব্যক্তিত্ব-বিকাশ** ও **আত্ম-প্রতিষ্ঠার** পরিপন্থী।

সমন্বয়-প্রচেষ্টা

পাত্রপাত্রী নির্বাচনে আমাদের দেশে পিতামাতার অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অর্থলোভ, অপর পক্ষের বংশমর্যাদা, জাতি, কোষ্ঠীর ফল প্রভৃতির প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা, নিজ সন্তানের রুচি ও মতকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্য সমাজের স্বনির্বাচনে রূপজ মোহে বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হওয়া এবং সাংসারিক জ্ঞানহীনতার জন্য ভুল করা প্রভৃতি দোষ নিবারণ করা এবং পিতামাতার অভিজ্ঞতা এবং পাত্রপাত্রীর পছন্দ এই উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন ও দুই প্রথারই সুফল লাভের জন্য বিলাত ফেরত ব্রাহ্ম এবং উচ্চশিক্ষিত হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টান সমাজে একটা সমন্বয়-প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় পিতামাতা, জামাতা হইবার যোগ্য যুবকদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিয়া ভোজনের ও তাহাদের টেবিল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলার মাঠে, ড্রয়িংরুমে গান-বাজনার মধ্যে কন্যার সহিত তাহাদের আলাপ-পরিচয়ের সুবিধা করিয়া দেন। যাহাকে কন্যারও পছন্দ হয়, তাহাকে ক্রমশ কন্যার সহিত আলাপের সুযোগ দেওয়া হয়; কন্যাকে তাহার মাতা অথবা অপর আত্মীয়া পরামর্শ ও উপদেশ দিতে থাকেন। সেইরূপ পুত্রের উপযুক্ত পাত্রীদের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করা হয়, অথবা পুত্রকে যাহারা পছন্দ করিয়া নিজ কন্যার সহিত আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ দিতেছেন, অথবা পুত্র নিজে যে কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের বাড়ী যাওয়া-আসা করিতেছে, সেইসব পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সমস্ত খোঁজ-খবর নেন এবং পুত্রকে যথাযথ পরামর্শ ও উপদেশ দেন।

কলেজে সহ-শিক্ষার (co-education) প্রসার বাড়িলে পাত্র ও পাত্রীর

সুনির্বাচনে খুব সুবিধা হইবে। কারণ কোর্টশিপের সময়ের মত তরুণ-তরুণীরা কলেজে বিবাহের উদ্দেশ্যে মিলিত হয় না এবং সেইজন্য ঐ সময়ের মত সাময়িক ভব্যতার মুখোশ পরিয়াও থাকে না। সুতরাং বহুদিন ধরিয়া নানা ব্যাপারে পরস্পরকে নিজ মূর্তিতে দেখিবার ও চিনিবার উত্তম সুযোগ লাভ হয়। তখন বন্ধুত্ব ও কোর্টশিপ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চলিতে পারে। বহু তরুণ ও তরুণীকে দেখিবার ও তাহাদের সহিত মিশিবার সুযোগ থাকাতে তরুণী ও তরুণরা জীবনসাথী নির্বাচন ব্যাপারে বিশেষ ভুল করিবে না।

যাহারা ছেলে বা মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আলাদা স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং বা কনভেণ্টে পড়ে বা থাকে এবং বিপরীত শ্রেণীর সহিত মিশিবার সুযোগ পায় না, তাহারা যৌবনধর্মবশত প্রথম যাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশে অনেক সময় তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং প্রবৃত্তির ঝোঁকে কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়া এবং খোঁজ-খবর না লইয়াই, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, রূপ, চরিত্র বা স্বাস্থ্য-হিসাবে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিকেও জীবনসাথী নির্বাচন করিয়া বসে। ধনী ও অভিজাত ঘরের শিক্ষিতা কন্যাদের, এবং ঐরূপ ঘরের 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' ও বিধবাদের, এই কারণে চাকরের (বিশেষত মোটর ড্রাইভারদের) সহিত অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত থাকিতে অথবা গৃহত্যাগ করিতে দেখা যায়।

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার পাত্রপাত্রী নির্বাচনের উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে অক্ষম। সেখানে পিতামাতা স্বীয় নির্বাচিত পাত্রী ও পাত্রের সহিত পুত্র ও কন্যাদের পরস্পরকে দেখিবার ও যথাসম্ভব আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ দিয়া তাহাদের অভিমত জানিয়া কাজ করিবেন।

বিবাহের বিবেচ্য বিষয়

পিতামাতা, গুরুজনের এবং যুবক-যুবতীদের **কি কি বিষয়ে অবহিত ও সতর্ক** হইতে হইবে তাহাই এখন আলোচ্য। বিবাহে নারী-পুরুষের **রক্ত-সম্পর্কে, বংশ, রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, চরিত্র, শিক্ষা, মেজাজ** প্রভৃতি বহু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

রক্তসম্বন্ধ

বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে মানুষ **রক্তসম্বন্ধকে** একটি মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কোনও কোনও মতে রক্তের বিচারে খুব নিকট সম্বন্ধের

মধ্যে বিবাহ হওয়ায় আপত্তি নাই। আবার কোনও কোনও মতে যাহাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই, এমন দুইজনের মধ্যেই বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়ের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপনে সকল জাতিই আজকাল ঘৃণাবোধ করিয়া থাকে। কিন্তু বরাবর এই মনোভাব ছিল না। গ্রীক ও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে পিতাপুত্রী ও মাতাপুত্রে বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রায় সমস্ত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরীয় দেবতা আমন তাঁহার মাতাকে, স্কাণ্ডেনেভিয়ার দেবতা ওডিন স্বীয় কন্যা ফ্রিগাকে, রোমীয় দেবতা জুপিটার তাঁহার সহোদরা জুনোকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কাহিনী প্রচলিত আছে।

পৌরাণিক কাহিনীর কথা ছাড়িয়া দিলেও ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুইজাবল্যাণ্ড, এথেন্স, মিশর, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে **মাতা-পুত্রে, পিতা-কন্যায়, ভ্রাতা-ভগিনীতে** বিবাহ প্রচলিত ছিল। মিশরের ফেরাউন (Pharoah) রাজারা সহোদরা ও সতাতো ভগ্নী বিবাহ করিতেন, মিশরের টলেমী (Ptolemy) বংশের রাজারা উহাদিগকে অনুসরণ করেন। রোমীয় যুগে কৃষক ভূস্বামীদের মধ্যে জমিভাগ এড়াইবার উদ্দেশ্যেও ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ হইত। ইব্রাহিম তাঁহার সতাতো ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে, প্রায় সর্ব দেশে নিষিদ্ধ হইলেও, বিরল ক্ষেত্রে সহোদর ও সতাতো ভ্রাতা-ভগিনী, পিতা-কন্যা, পিতৃ ও কন্যাস্থানীয়া, মাতৃ ও পুত্রস্থানীয়, এমন কি কদাচিৎ মাতা ও পুত্রের মধ্যেও যৌনসম্বন্ধ দেখা যায়।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মিশর ও পারস্য হইতে ঐ প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে বটে, তবু এখনও খুব নিকট-আত্মীয়দের মধ্যেই বিবাহ হইয়া থাকে। স্পেন ও রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশেই এবং মুসলমানদের মধ্যে **সহোদর ভাই-ভগিনী ব্যতীত অন্য সকল প্রকার ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ-প্রথা** বিদ্যমান ছিল ও আছে।

সিংহলের ওয়েডা সম্প্রদায়ের মধ্যে **সহোদর ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ** খুব পুণ্যের কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে দুইটি বিপরীত প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার অর্ধসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে এ বিষয়ে এত কড়াকড়ি নিয়ম বিদ্যমান যে, এক সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে বাধ্য। সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের

হিন্দুগণ, বিশেষত বাংলার হিন্দুগণ সম-গোত্রে বিবাহ করেন না। এই প্রথাকে বহির্বিবাহ বা Exogamy বলে।

সমগোত্রে কিংবা নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ না করিবার দুইটি যুক্তি আছে : প্রথমতঃ ইহাতে সম্বন্ধ এলোমেলো হইয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে বংশ-বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এ সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আলোচনা করিতেছি।

পক্ষান্তরে পৃথিবীতে বহু অর্ধসভ্য বা অসভ্য সম্প্রদায় আছে, যাহারা নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ করেন না। শান্তিপুরের তন্তুবায় ও ঢাকার কায়স্থগণও এই প্রথা পালন করেন। এই প্রথাকে অন্তর্বিবাহ বা Endogamy বলে।

আদিমকালে মানুষ যাহাই করুক না কেন, এখন মানুষ মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। মধ্যপন্থাই বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া বোধ হয়। একেবারে ঘনিষ্ঠ রক্তসম্পর্কের মধ্যে বিবাহ যেরূপ শুভ নহে, তেমনি একেবারে ভিন্ন গোত্রে চলিয়া যাওয়াও সুফলদায়ক নহে। ডাঃ ফোবেল বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পশুদের মিলিত করাইয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে সন্তানোৎপাদন হয় না। আবার সহোদর ভাই-ভগিনীর দ্বারা যে সমস্ত সন্তান হয়, তাহারা দুর্বলমস্তিষ্ক ও উৎপাদিকাশক্তিহীন হইয়া পড়ে। সহোদর ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, এমন বহু জাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ডাঃ ফোরেলের মতে, এই শ্রেণীর যৌনমিলনে শতকরা ৪টি সন্তান মাতৃগর্ভেই মারা যায়।

পক্ষান্তরে টলেমীদের আত্মীয়-বিবাহের ধারা পর্যবেক্ষণ করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঐরূপ বিবাহে রাজবংশের কোনই ক্ষতি হয় নাই। তৃতীয় টলেমী হইতে আরম্ভ করিয়া দুই শতাধিক বৎসরকাল ইহারা ভ্রাতা-ভগ্নী এবং অনুরূপ বিবাহ করিয়া আসেন। মিশরের বিখ্যাত রাণী ক্লিওপেত্রা (Cleopeta) ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহের সন্তান ছিলেন।

এই বংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কেহ বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত বা শারীরিক ও মানসিক অবনতিগ্রস্ত হন নাই।

বৈদিক যুগের আর্যদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের বহুল প্রচলন ছিল। 'সগোত্র' 'সপিণ্ড' 'সকুল্য' 'সবান্ধব'-এর বিধি-নিষেধ তখনও প্রচলিত হয় নাই।

বৌদ্ধ ভারতে সহোদর ভাই-বোনে বিবাহের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বৌদ্ধগ্রন্থ "মহাবংশে" দেখা যায়, লাড় দেশের রাজা সীহবাহু নিজে সহোদরা ভগ্নী সীহসী বিলীকে বিবাহ করেন। শাক্যবংশের উদ্ভব সম্বন্ধে যে বিবরণ

আছে, তাহাতে দেখা যায়, রাজা ওক্কাক্কের চারি পুত্র তাঁহার পাঁচ কন্যার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বাদ দিয়া বাকী চারিজনকে বিবাহ করিয়া কপিলবস্তু নগরে বসবাস করেন। তাঁহারা ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহে "সমর্থ" বা "শক্য" হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের বংশকে 'শাক্যবংশ' আখ্যা দেওয়া হয়।

মনু সবর্ণ অসগোত্রে বিবাহের বিধান দিলেও, প্রতিপত্তিশালী লোকেরা প্রয়োজন অনুসারে এ নিয়ম অনেক ক্ষেত্রেই ভঙ্গ করে। মনুর বিধানের পরেও অসবর্ণ, অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

সাক্ষাৎ খুড়তুতো, মামাতো এবং পিসতুতো ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ হইলে তদ্দ্বারা যে মানবের কোনও প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে, ডাঃ ওয়েষ্টার-মার্ক বা ফোরেল তাহা স্বীকার করেন না। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ বিবাহের ফলে সন্তানদের মধ্যে কোন তারতম্য দেখা যায় না।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিবাহে যে মানুষের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সে বিতৃষ্ণা সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার জন্য নহে, পরন্তু পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার জন্য। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে মানুষের যৌনবাসনা ততটা উদ্দীপ্ত হয় না। **প্রকৃতি ও আকৃতির বিভিন্নতাই যৌন-আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া থাকে,** ইহা ডাঃ বার্নাডিনের অভিমত। তিনি বলেন, বেঁটে-ব্যক্তি দীর্ঘ-ব্যক্তিতে এবং দীর্ঘ-ব্যক্তি বেঁটে-ব্যক্তিতে অধিকতর আসক্ত হইয়া থাকে। উগ্রপ্রকৃতির লোক কোমলপ্রকৃতির লোককে এবং কোমলপ্রকৃতির লোক উগ্রপ্রকৃতির লোককে অধিকতর পছন্দ করে।

বোধ হয়, মানুষ যে সাধারণতঃ গোত্রের বাহিরে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তাহা **আত্মীয়গমনে বিতৃষ্ণার** জন্য নহে, পরন্তু অনেকটা **অভিনবত্বের লালসায়।** কিন্তু যেখানে গোত্র অতি বৃহৎ অথবা বিস্তৃত, সেখানে এ কথা খাটে না। সেখানেও গোত্রের মধ্যে বিবাহ করা যাইবে না, ইহা যুক্তিহীন ও অর্থহীন প্রথামাত্র।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই যে, ভাই-ভগিনীদের মধ্যে কতকগুলি বংশগত দোষ ও গুণ, অনেকটা একই ধরনের ও মাত্রার থাকা স্বাভাবিক। তাহাদের বিবাহের ফলে ঐসব একই রকম (Common) দোষ ও গুণ সন্তানদের মধ্যে বর্ধিত আকারে দেখা যায়। যদি কোন বিবাহে এরূপ সমজাতীয় গুণের গুরুত্ব কিংবা সংখ্যা অধিক থাকে তবে তাদৃশ সমধিক গুণশালী সন্তান পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে যদি ঐরূপ দোষের গুরুত্ব কিংবা সংখ্যা অধিক হয় তবে সন্তানদের

অন্যে ঐ সব দোষ বেশী পরিমাণে দেখা যাইবে ও সেই বিবাহের ফল মন্দ বলা হয়।

আমাদের মনে হয় খুড়তুতো, মামাতো বা পিসতুতো ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ হইতেই হইবে বা হইতেই পারিবে না—এইরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকার দরকার নাই। বিবাহের পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে যতটা উদার মতাবলম্বী হওয়া যায় ততটাই ভাল।' নির্বাচনের ক্ষেত্র যত সঙ্কুচিত হইবে বাছিয়া লইবার স্বাধীনতাও ততটা খর্ব হইবে। সুতরাং সুযোগ্য পাত্র বা পাত্রী পাইবার সম্ভাবনা ততই কম হইবে। নাগপুরে অনুষ্ঠিত Indian Science Congress-এর এক অধিবেশনে উপস্থিত পাঁচশত বিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সগোত্র বিবাহে জীববিজ্ঞানের দিক হইতে কোনই অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে মাঝে মাঝে বংশে বাহিরের রক্ত আসিলে তাহার উন্নতি হয়।

বংশ

পাত্র-পাত্রীর বংশবিচার একটা দুরূহ ব্যাপার। ব্যাপারটি নানা দিক দিয়াই জটিল। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদের যুগে যখন মানুষ উচ্চনীচ ও ইতরভদ্র প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতেছে, সেই সময়ে বংশবিচার দ্বারা আমরা কি বুঝি, তাহা পরিষ্কারভাবে জানিতে হইবে।

পূর্ব-অনুচ্ছেদে আমরা নিকট-আত্মীয় বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছি যে, বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে নারীপুরুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। এ বিষয়ে জাতিগত বা দেশগত বা অন্য কোনও রূপ প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নহে।

আমরা এখানে বরকন্যার বংশবিস্তার করিবার পরামর্শ দিতেছি এইজন্য যে, বংশ অর্থে আমরা আভিজাত্য বুঝাইতেছি না। শুধু তাহাই নহে, ইহা দ্বারা আমরা গোত্র-সম্প্রদায়, ধর্মমত বা অন্য কোনও বর্ণ ভেদও বুঝাইতেছি না। বংশের লোকদের অর্থাৎ পিতামাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী ও ভ্রাতা-ভগিনীর দেহ ও মস্তিষ্ক-প্রকৃতি বুঝাইতেছি। বরকন্যার উপরোক্ত আত্মীয়দের স্বাস্থ্য, আয়ু, মেজাজ ও প্রকৃতির অনেকখানি তাহাদের মধ্যে সংক্রমিত হইবার কথা। সুতরাং ঐ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহজাত সন্তানাদির পক্ষে উহা শু

বিশেষ কল্যাণের আকর হইবেই, তাহা ছাড়া দম্পতির জীবনেও উহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে।

আমরা বংশ অর্থে পাত্রপাত্রীর Biological ancestry অর্থাৎ পিতৃমাতৃ পুরুষের শরীর ও মনের ধারার কথা বলিতেছি, কৃত্রিম সামাজিক শ্রেণীবিভাগের কথা বলিতেছি না। ইহার কারণ এই যে, জনক-জননীর বংশানুক্রমিক দৈহিক বা মানসিক ব্যাধি থাকিলে সন্তানের পক্ষে ভয়াবহ বিপদের কথা। উহাদের ফুসফুস হৃৎপিণ্ড এবং বৃক্কদ্বয়ের (কিডনীর) ব্যাধি, বহুমূত্র কিংবা জননেন্দ্রিয় বা মস্তিষ্কের ব্যাধি, সিফিলিস (উপদংশ), হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ ইত্যাদি থাকিলে সন্তানের ঐসব রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে। স্বামীর প্রমেহ (গনোরিয়া) থাকিলে স্ত্রীরও হইবে, তখন প্রসবের সময় জরায়ুগ্রীবায় (cervix-এ) অবস্থিত উক্ত রোগের বীজাণুপূর্ণ পুঁজ শিশুর চক্ষে লাগিয়া সে আঁতুড়েই অন্ধ হইতে পারে। অথবা মাতার অজ্ঞতা কিংবা অসাবধানতাবশত জন্মের পর তাহার চক্ষে অথবা কন্যা সন্তানের গোপনাঙ্গে ঐ পুঁজ লাগিয়া চক্ষের প্রদাহ ও অন্ধতা অথবা ভগের প্রদাহ (vulvo-vaginitis) হইতে পারে। পাত্র বা পাত্রীর এই সব রোগের কোনটি থাকিলে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ সুতরাং অর্থব্যয়, সংসারের কার্যে হানি ও দম্পতির জীবন অসুখী হইবে।

পিতামাতার দাম্পত্যজীবন সুখের হইলে উহার প্রভাব পাত্রপাত্রীর উপর পড়িবে। পিতামাতার কলহ-বিবাদ, গরমিল, বিচ্ছেদ ইত্যাদিও সন্তানদের উপরে ছাপ রাখিয়া যায়।

যে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ সমাজকে উচ্চ-নীচে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে ও অসংখ্য লোককে নীচ, হেয় এমন কি অস্পৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা মানবসমাজের এক কলঙ্ক; জীববিজ্ঞানের দিক দিয়া উহার কোন অর্থ, যৌক্তিকতা বা মূল্য নাই।

স্বাস্থ্য

বিবাহের প্রাক্কালে তথাকথিত বংশমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা, পণের পরিমাণ, বাহ্য সৌন্দর্য ইত্যাদি অপেক্ষা বেশী লক্ষ্য করিতে হইবে পাত্র ও পাত্রীর দেহমনের সরলতা। ইহাই হইবে বিবাহে বিচার-বিশ্লেষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। আমরা একটু পূর্বেই পিতৃপুরুষের বংশগত

কতকগুলি ব্যাধির উল্লেখ করিয়াছি। পাত্রপাত্রীর মধ্যে ঐ সব রোগ থাকিলে সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করা উচিত নহে।

পাত্রপাত্রীর নির্বাচনের এবং বিবাহের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দম্পতির **দৈহিক ও মানসিক কল্যাণ** ও **তৃপ্তি** এবং **ভাবী বংশধরের মঙ্গল**। পাত্র ও পাত্রী উভয়ে হইবে দেহ ও মনের দিক হইতে যথাসম্ভব নিখুঁত Biologically sound); অন্যান্য বিবেচনা আসিবে পরে।

উপরোক্ত বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য সকল দেশেই উপযুক্ত **চিকিৎসক মনোবিজ্ঞানী** এবং **যৌনবিজ্ঞানবিদ্** লইয়া গঠিত **"বিবাহ ব্যুরো"** থাকা ভাল, যেমন কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে আছে। ইহারা পাত্রপাত্রীকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত অভিমত দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, বংশগত রোগ থাকিলে কেহ বিবাহ করিতে পারিবে না; ঐরূপ রোগগ্রস্ত পাত্র-পাত্রীকে **রোগমুক্ত** হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। বিবাহিতেরাও সেখানে গিয়া নিজ নিজ শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে পারিবে।

তবে এইরূপ দেখা-সাক্ষাতের কথা খুব গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা অযথা কাহারও অনিষ্ট হইয়া পড়িতে পারে।

আবার ইঁহাদের মতামত হইবে **উপদেশাত্মক** (Advisory), **বাধ্যতামূলক** (Compulsory) নয়, অর্থাৎ পাত্র এবং পাত্রী জানিয়া শুনিয়া ঐ সকল মতামত উপেক্ষা করিলে দায়িত্ব তাহাদেরই থাকিবে।

ধর্মনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মতবাদ

ধর্মমত, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর **বিশ্বাস** বা **মতবাদ** একই রূপ হওয়া ভাল। এই হেতুই **প্রায় প্রত্যেক ধর্মই** নিজ নিজ **সম্প্রদায়ের** মধ্যে বিবাহ নির্দেশ করিয়াছে।

গোঁড়া বিশ্বাসীর পক্ষে **অন্য মতের** কাহাকেও লইয়া সংসারযাত্রা করা দুরূহ। ধর্মমত বা অনুষ্ঠান সামাজিক নিয়ম, আচার, প্রথা, সংসার পরিচালনা, কুসংস্কার, শুচিবাই প্রভৃতি বিষয়ে বিরোধিতা দাম্পত্য-প্রীতির প্রতিবন্ধক হইতে বাধ্য। ধর্মের বিভিন্নতা বিবাহের এবং দাম্পত্য-প্রীতির প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নহে। **ধর্ম** অর্থে শুধু দেশবিদেশের বা জাতিবিশেষের পাপপুণ্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস ও পারলৌকিক পরিত্রাণ লাভাদির উদ্দেশ্যে অনুসৃত উপাসনা-

পদ্ধতি নহে ; তাহার প্রকৃত অর্থ **জীবনদর্শন** (philosophy of life), জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে ন্যায়ের অনুসরণ, সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত জীবনপথ চারণ। ধর্মের প্রকৃত মর্ম যাঁহারা সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ তাঁহারা **পরমতসহিষ্ণু** হন এবং তাঁহাদের **বাহ্য আনুষ্ঠানিক ধর্ম নামে যতই বিভিন্ন হউক না কেন,** বিবাহ বদ্ধ হইলে তাঁহাদের মধ্যে শুভ ছাড়া অশুভ হইবে না। জগতের ধর্ম-বৈষম্য জনিত বিরোধিতা, কলহ, বিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক হইবে **এইরূপ বিবাহ**। আলেকজাণ্ডার পারস্যবিজয়ের পরে ইউরোপ-এশিয়ার সমন্বয়-সাধন মানসে দুই ভূখণ্ডের লোকদের মধ্যে বহুসংখ্যক বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহামতি আকবর বাদশাও হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য স্থাপনমানসে অন্তর্বিবাহে উৎসাহী ছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই সকল প্রচেষ্টা আজও প্রসারলাভ করে নাই।

ফলত সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের কৃত্রিম সংস্কারগত বাধা বিপত্তি কমিয়া আসা উচিত। জাতি, সম্প্রদায়, গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, দেশ, ধর্ম, আচার ইত্যাদির বন্ধন যতই শিথিল হইবে, **"সবার উপরে মানুষ সত্য"** এই মন্ত্র ততই মানুষের মধ্যে **সাম্য ও মৈত্রীর মর্যাদা** রক্ষিত হইবে, **আত্মা** মুক্ত বুদ্ধ ও শুদ্ধ হইবে।

রূপ

বিবাহের ন্যায় আজীবন-স্থায়ী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে পরস্পরের গুণাগুণ বিচারের ন্যায্য অধিকার নারী-পুরুষ উভয়ের **সমভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়** হইলেও পুরুষের প্রাধান্য-হেতু এ যাবৎ সে বিচারের অধিকার পুরুষ একাই ভোগ করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার এই **একচেটিয়া অধিকার** কেবল **নারীর রূপ-বিচারেই** বিনিয়োগ করিয়াছে। নারীও অগত্যা পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য রূপচর্চাতেই নিজের অধিকাংশ শক্তি নিয়োজিত করিয়া আসিতেছে। পুরুষের সৌন্দর্যবোধই হইয়া আসিতেছে নারীর সৌন্দর্যের নিয়ামক। যে দেশের পুরুষ যেভাবে নারীকে সুন্দর মনে করিয়াছে, সেই দেশে নারী সেইভাবেই নিজের দেহকে প্রসাধিত করিয়াছে।

সৌন্দর্যের ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অতি অদ্ভুত রকম বিভিন্ন। প্রাচ্য নারীরা ঘন **কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ কেশরাজিকে** সৌন্দর্যের উপকরণ মনে করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় নারীরা এক সময়ে কুঞ্চিত দীর্ঘ অলকদাম পছন্দ

করিলেও ইদানীং সোনালী রঙের ঝাঁকড়া বাবরি চুল পছন্দ করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা আর্যজাতির উচ্চ নাসিকাকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। কোচিনচীনের অধিবাসীরা সাদা দাঁতকে অতিশয় কদর্য মনে করিয়া থাকে। চীনের অধিবাসীরা নারীর ক্ষুদ্রাকৃতি পদ অতিশয় পছন্দ করিয়া থাকে। হটেন্‌টটের অধিবাসীদের বিবেচনায় নারীর স্তন এতটা দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে সেই স্তন অনায়াসে কাঁধের উপর দিয়া পিঠে ঝুলাইয়া দিতে পারে এবং পিঠে বাঁধা সন্তান তাহা হইতে অনায়াসে দুগ্ধ পান করিতে পারে। সাঁওতাল রমণীরা সুন্দর দেখাইবে বলিয়া প্রায়ই অধিক ওজনের গহনা পরিয়া থাকে।

মোটের উপর পুরুষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নারী নাক কান ছিদ্র করিয়াছে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে উলকি পরিয়াছে। ফলত নারীকে পুরুষ যেভাবে সুন্দর হইতে বলিয়াছে, যুগে যুগে নারী সেইভাবে তাহার রূপের ক্ষুধা মিটাইয়াছে।

নারীর স্বাস্থ্যও রূপেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বাস্থ্য ভাল না হইলে রূপ উজ্জ্বল বা স্থায়ী হয় না; সুতরাং এ বিষয়ে পৃথক করিয়া বিচার করিবার কারণও সচরাচর ঘটে না। বিবাহের বর্তমান ব্যবস্থায় তাহা সকল সময়ে সম্ভবও হয় না। হওয়া যে উচিত তাহা একটু পূর্বেই আমরা বলিয়াছি।

গুণ

পাত্রপাত্রীর গুণ কথাটি একটি সর্বগ্রাসী শব্দ। স্বামীর প্রয়োজনভেদে নারীর গুণ বিচার হইয়া থাকে। নিতান্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কৃষকের স্ত্রীর মধ্যে যে গুণ থাকিলে কৃষক খুশী হইবে, রোমান্টিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রেমিকপ্রাণ ধনীপুত্রের বধূর পক্ষে তাহা দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। 'কামসূত্র' প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় যৌনশাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, তৎকালে নৃত্য গীত ও রন্ধন ব্যতীত শৃঙ্গারাদি চৌষট্টি কলাতে নিপুণ হওয়া নারীর বিবাহ-যোগ্যতার মধ্যে পরিগণিত ছিল। বড়লোকের গৃহিণীর যোগ্যতার মাপকাঠি যাহাই হউক না কেন, সাধারণ গৃহস্থের গৃহিণী হইতে গেলে পত্নীর রন্ধন, রোগীর শুশ্রূষা, শিশু-পালন ও সংসার পরিচালন ব্যাপারে দক্ষতা অত্যাবশ্যক। সুতরাং বিবাহকামী পুরুষ নিজের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে ভাবী স্ত্রীর দোষগুণ বিচার করিয়া থাকে।

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যদেশসমূহের মত ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণ বিবাহে কন্যার আবশ্যক গুণসমূহেরই আলোচনা করিয়াছেন বেশী। পুরুষের দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনা তাঁহারা করেন নাই,—করিবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া। কারণ, পুরুষ নারী নির্বাচন করিত, স্ত্রীর পুরুষ নির্বাচন করিবার কোন সাধারণ নিয়ম ছিল না।

উক্ত পণ্ডিতগণের মতে নিম্নলিখিত গুণ দেখিয়া স্ত্রী নির্বাচন করা উচিত: (১) সমবংশজাত, (২) শিক্ষিতা, (৩) সাহসিনী, (৪) বুদ্ধিমতী, (৫) বিচারক্ষমতাশালিনী, (৬) পবিত্রা, (৭) কর্তব্যপরায়ণা, (৮) যশস্বিনী, (৯) ধনবতী, (১০) দৈহিক ত্রুটিশূন্যা, (১১) সুন্দরী ও (১২) বয়স্কা।

উপরোক্ত গুণ-বর্ণনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, ভারতীয় পণ্ডিতগণ বংশের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছেন। বর্তমান সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদের যুগে প্রাচীনকালের মত বংশমর্যাদার উপব তেমন জোব দেওয়া উচিত নহে, সম্ভবও নহে। যে অর্থে বংশবিচার করিবার নির্দেশ দেওয়া উচিত তাহা একটু পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

কন্যার দিক হইতে বরের বিচার করিবার কোন নিয়ম না থাকিলেও ভাবতীয় পণ্ডিতগণের মতে শ্বশুরের দিক হইতে জামাইয়ের গুণ-বিচারের কতকগুলি সূত্র আছে। এই বিচারফল অধিকাংশ সময়ে কন্যারই মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বিচারক কন্যা নহে, কন্যার পিতা। তাঁহার বিচারে জামাতা শিক্ষিত, সাহসী, ধনী, গুণবান্, যশস্বী, তরুণ, সুন্দর, সদ্বংশজাত, মিষ্টভাষী, দানশীল, দয়াবান্, প্রফুল্লচিত্ত, বহু-গোষ্ঠীসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা, সচ্চরিত্র, নীরোগ ও বলবান্ হওয়া চাই। কন্যার উপর বিচারভার অর্পণ করিলেও বরের এই সমস্ত গুণই সে বিচার করিত। সুতরাং অধিকাংশ স্থলে পিতার নির্বাচন কন্যার পক্ষে কল্যাণকরই হইত।

কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে, তাহার যেমন নির্দেশ আছে, কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করা যাইবে না, সে সম্বন্ধেও বাৎস্যায়ন ও কল্যাণমল্ল কতকগুলি নিষেধাত্মক নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে (১) সন্ন্যাসিনী, (২) বয়োজ্যেষ্ঠা, (৩) বিক্ষতযোনি (বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা প্রভৃতি যাহার পুরুষ সহবাস হইয়াছে), (৪) কুষ্ঠাঙ্গী, (৫) উন্মাদিনী, (৬) সগোত্রা ও (৭) উচ্চ গোত্রের নারীকে বিবাহ করা উচিত নহে। *

এই সকল কথা উপদেশাত্মক সন্দেহ নাই, কিন্তু সবগুলিই পালনযোগ্য নহে। পালনযোগ্য ও বিবেচ্য বিষয়সমূহের ব্যাখ্যাই আমরা এই অধ্যায়ে করিতেছি।

ইংরেজীতে যাহাকে ফিজিঅগ্‌নমি (Physiognomy) এবং ফ্রেনলজি (Phrenology) বলে, ভারতবর্ষে এবং আরবে অতি প্রাচীনকালে তাহার প্রচলন ছিল। দৈহিক গঠনবৈশিষ্ট্য দর্শনে চরিত্র নির্ণয় করিবার শাস্ত্রের নাম ফিজিঅগ্‌নমি বা সামুদ্রিক শাস্ত্র বা ইলমে ফেরাসৎ। এবং মস্তকে গঠনপ্রণালী দর্শনে চরিত্র নির্ণয় করিবার শাস্ত্রের নাম ফ্রেনলজি। ভারতবর্ষ ও আরবে এই বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ভারতবর্ষের সমস্ত যৌনশাস্ত্রবিদ্‌ই শারীরিক লক্ষণ দৃষ্টে প্রকৃতি-নির্ণয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। ঋষি নাগার্জুনের 'সিদ্ধ-বিনোদন' নামক পুস্তকে প্রধানত স্ত্রীপুরুষের দেহলক্ষণ হইতেই তাহাদের চরিত্র নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। আরবী ফারসী ও সংস্কৃত সাহিত্যে যৌনবিজ্ঞানের এই দিকটায় যথেষ্ট মিল আছে বলিয়া 'ইলমে ফেরাসৎ'-এর এক ফরাসী পুস্তক হইতেই নমুনা-স্বরূপ কিঞ্চিৎ লক্ষণতত্ত্ব উদ্ধৃত করিলাম (ইহা নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল) :

কপাল—যাহার কপাল ছোট সে অল্পবুদ্ধি; যাহার কপাল নাকি ক্ষুদ্র এবং ঈষৎ কুঞ্চিত, সে অতিশয় ক্রোধান্ধ হয়। যাহার কপাল বিশাল সে ক্রোধান্ধ ও পাশব মনোবৃত্তিসম্পন্ন। কপাল কুঞ্চিত হওয়া প্রগল্‌ভতার চিহ্ন।

চক্ষু—ভ্রূ যুগলে ঘন কেশ চিন্তাধিক্য ও প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক। লম্বা ভ্রূ বাচালতা ও আত্মম্ভরিতার লক্ষণ। চক্ষু বড় হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ। প্রশস্ত ও ভাসা-ভাসা চক্ষু অজ্ঞতা ও বাচালতার পরিচায়ক। কোটরস্থ চক্ষু কামবশতার নিদর্শন। চক্ষুর রক্তিমতা সাহসিকতা ও ক্রোধের পরিচায়ক। নীলাভ চক্ষু নীচ প্রকৃতির লক্ষণ। চক্ষুর তারার চতুষ্পার্শ্ববর্তী চক্র ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার লক্ষণ। চক্ষুতারকার হরিদ্রাভা নরহন্তার লক্ষণ। উজ্জ্বল চক্ষু কামাতিশয্যের পরিচায়ক।

নাক—নাসিকার অগ্রভাগ সরু হওয়া ক্ষিপ্রতা ও কলহপ্রিয়তার লক্ষণ। নাসিকার অগ্রভাগ মোটা ও মাংসল হওয়া অল্পবুদ্ধির পরিচায়ক। নাকের ছিদ্র প্রশস্ত হওয়া সাহসিকতা ও ক্রোধান্ধতার পরিচায়ক। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতীয় সামুদ্রিক শাস্ত্রেও বহু আনুমানিক অলীক উক্তি আছে।

আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা

বিবাহে আর্থিক অবস্থা বিচার আর একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কন্যা যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে প্রতিপালিত হয়, বিবাহের ফলে সে যদি স্বামীর ঘরে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পতিত হয় তবে তদ্দ্বারা দাম্পত্য জীবনের সুখসুবিধা অনেকখানি ক্ষুন্ন হইয়া থাকে। সম্পদশালী বড়লোকের অতি সচ্চরিত্রা, কর্তব্যপরায়ণা ও স্বামীর প্রতি অতিশয় প্রেমবতী কন্যাও দরিদ্র কৃষক বা শ্রমিকের গৃহিণীরূপে খুব সুখে জীবনযাপন করিতে পারে না; অথচ সমান অবস্থার স্বামীগৃহে পড়িলে ঐ মেয়েই আদর্শ গৃহিণীরূপে খ্যাতি অর্জন করিতে পারে।

সুতরাং বিবাহে উভয় পক্ষের আর্থিক অবস্থা বিচার করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, বড়লোকের মেয়ে দরিদ্র যুবকের দৈহিক রূপ ও ব্যক্তিগত গুণে মুগ্ধ হইয়া যৌবনের উদ্দাম প্রেমের আতিশয্যে নিশ্চিত দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। মেয়ের প্রাণে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, যুবকের প্রতি তাহার অগাধ প্রেম তাহাকে যে কোনও প্রকার দুরবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দান করিবে; কিন্তু যৌবনে ভাঁটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের উদ্দামতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, প্রেমের নেশা ছুটিয়া গেল, সকল স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, পিতার অবস্থা ও স্বামীর অবস্থার পার্থক্য এতদিন পরে তাহার প্রাণে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল; জীবন তাহার দুর্বিষহ হইয়া পড়িল। এইভাবে দুইটি সুন্দর প্রাণ অবস্থাবৈগুণ্যে পরস্পরের প্রতি তিক্ত হইয়া পড়িল ইত্যাদি।

অবস্থা বিচার না করিয়া প্রেমে পড়ার ইহা স্বাভাবিক পরিণতি। **যৌবনের প্রেম** অসম্ভব কর্ম সাধন করিতে পারে, কিন্তু **প্রৌঢ়ের প্রেম** তাহা রক্ষা করিতে পারে না, এই কথাটি বিবেচনা করিলে প্রেমেরও মর্যাদা রক্ষা হয়, বিবাহও যথাস্থানে হইতে পারে।

বয়স

বিবাহের **বয়স বিচারটাও** প্রয়োজন। মনু বলেন, "ত্রিংশদ্বর্ষঃ উদ্বহেৎ কন্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং"—অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। পূর্বে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে অধ্যয়ন ইত্যাদিতে কিছুকাল কাটিয়া যাইত; স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন বলেন, অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা

'গৌরী' ও নবমবর্ষীয়া কন্যা 'রোহিণী' এবং রজস্বলা হইবার পূর্বেই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য।

ইসলামে বালেগা (অর্থাৎ রজস্বলা) হওয়ার পরেই বিবাহ দিবার উপদেশ আছে। তবে উহার পূর্বে বালিকার বা একেবারে বৃদ্ধারও বিবাহ নিষেধ নাই।

আজকাল পুরুষের ২২-২৮ ও মেয়েদের ১৮-২২ বৎসর বয়সই প্রশস্ত। সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ৪-৮ বৎসরের পার্থক্য থাকা উচিত।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ অবশ্য পরিত্যাজ্য। বাল্যবিবাহে নারীজাতির উপর অকাল-মাতৃত্বের বোঝা চাপানোরূপ সাধারণ দোষ ছাড়াও একটি বিশেষ দোষ এই হয় যে, নারী অল্পদিনেই স্বাস্থ্য ও রূপযৌবন হারাইয়া ফেলে এবং পুরুষ স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার জন্য অন্য যুবতীর দিকে ধাওয়া করে। তাহা ছাড়া বালিকামাতা শিশুসন্তানের সম্যক্ যত্ন করিতে না জানায় ও না পারায় শিশু-মৃত্যু বেশী হয়। মেয়েদের লেখাপড়া হইতে পারে না, সুতরাং স্বামীর সহিত বিদ্যা ও বুদ্ধির পার্থক্য অনেক বেশী থাকায় তাঁহার যোগ্য সঙ্গিনী হইতে পারে না, কাজেই বিবাহ সুখের হয় না। স্বচ্ছন্দভাবে খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদ করিবার সুবিধা অল্প বয়সেই শেষ হইয়া যায়, শরীর ও মনের অসমর্থ অবস্থায় বধূ এবং মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঘাড়ে করিতে হয়, কাজেই কোনটাই ভালরূপে সম্পাদিত হয় না। জননেন্দ্রিয়ের অপরিণত অবস্থায় সেখানে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া কেহ স্বামীর শয্যাকে ও স্বামীকে ভয়ের চক্ষে দেখিতে থাকায় 'ছড়কো' হয়, অর্থাৎ যোনিমুখের আপেক্ষিক সঙ্কোচের জন্য সহবাসে অক্ষম হয়, সেখানে যাইতে চায় না, কিন্তু আত্মীয়েরা যাইতে বাধ্য করে; কেহ বাপের বাড়ী পালায়, কাহারও প্রচুর রক্তস্রাব হয়, কেহ বা তাহাতে মারা যায়। ৬০-৭০ বছর আগে বাংলাদেশে হরিমোহন মাইতির সাড়ে এগার বৎসর বয়সের স্ত্রী এইভাবে মারা যাওয়ার ফলে 'সহবাস-সম্মতি আইন' (Age of Consent Act) বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে ১২ বৎসরের কম বয়সের বালিকার সহিত সহবাস বলাৎকার (rape) রূপ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, যদিও তাহার সম্মতি থাকে, আর যদি সে স্ত্রীও হয়। ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ঝড় উঠে। রসরাজ অমৃতলাল বসু 'সম্মতি-সঙ্কট' নামে নাটক লেখেন হিন্দুর ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে ও অন্তঃপুরে পুলিসের

হস্তক্ষেপের আশঙ্কায়। বছর পনের আগে বালিকাদের সহবাস সম্বন্ধে আইন-গ্রাহ্য সম্মতি দিবার বয়স বাড়াইয়া ১৩ বৎসর করা হইয়াছে।

বিবাহের বয়স-ব্যাপারে একটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ নানা দিক হইতেই নিন্দনীয়, সুতরাং বর্জনীয়। বাল্যবিবাহ যে ভারতবর্ষের কত বড় একটা সামাজিক কদাচার তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রায় সাহেব হরবিলাস সার্দা আইন দ্বারা বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারিত করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি (যোশী কমিটি) বসে। এই কমিটিতে একজন ব্রিটিশ মহিলা-ডাক্তার ছাড়া সকল সদস্যই ভারতীয় ছিলেন। সদস্যেরা সকলেই নেতৃস্থানীয় এবং খ্যাতিসম্পন্ন সদ্বিবেচক ছিলেন। ইঁহারা সর্বত্র ঘুরিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইঁহারা মন্তব্য করেন:

"অকালমাতৃত্ব একটা কদাচার এবং খুব বড় রকমের। ইহা বহুলাংশে গর্ভিণীমৃত্যুর এবং শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী। ইহা বহু বালিকার শরীর একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং জাতির শারীরিক অবনতির সূচনা করে। এই প্রসঙ্গে অকালমাতৃত্বের সঙ্গে সতীদাহপ্রথার তুলনা করিতে হয়। ঐ প্রথা আইনবলে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"সতীদাহের দৃষ্টান্ত খুব কম ছিল। বহুদিন পরে একটি দুইটি হইত। উহা সমাজের মনোযোগ সজোরে আকর্ষণ করিত; কারণ মৃত্যুমুখী বিধবার দারুণ যন্ত্রণা মানবহৃদয়ে তীব্র কশাঘাত করিত। কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে নির্যাতন ছিল ব্যক্তিগত; সকল যন্ত্রণা বিধবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইত এবং উহার দরুন সে আদর্শ পতিব্রতা, ভক্তিপরায়ণা স্ত্রী-হিসাবে মৃত্যুর পরেও পূজিত হইত। কিন্তু অকালমাতৃত্ব এত প্রসারিত, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এত বালিকার জীবন উহাতে জর্জরিত হয় যে, প্রতিকার না করিয়া উপায় নাই। ইহার প্রসার এত ব্যাপক যে, সমগ্র সমাজজীবনে ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে মৃত্যু এড়াইয়া যদি কোন বালিকা বাঁচিয়াও থাকে, তাহা হইলেও সে ত্রিশ বৎসরেই বৃদ্ধা হইয়া পড়ে; তাহার পূর্ব শরীরের ছায়া মাত্র থাকিয়া যায়। তাহারা সারাজীবন দীর্ঘ জ্বালা-যন্ত্রণার আকর হয় এবং সে সেই কদাচারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উৎসর্গীকৃত নারী মাত্র থাকে। এই সামাজিক কদাচার নানা দিক দিয়া এত অনিষ্ট করা সত্ত্বেও জনগণ সমস্ত সমাজের উপর

ইহার নিদারুণ কুফলের কথা ভাবিয়াও দেখে না।...যদি সতীদাহ বন্ধ করিবার জন্য আইনের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অকালমাতৃত্ব বন্ধ করিবার জন্য, মানবের মঙ্গল এবং সামাজিক ন্যায়ের খাতিরে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করার আরও বেশী প্রয়োজন আছে।

সর্দা আইনে (১৯৩০, এপ্রিল মাস হইতে) ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্কা বালিকার বিবাহ আইনত দণ্ডনীয় করা হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে এই আইন সংশোধিত হওয়াতে উক্ত বয়স ১৫ বৎসর করা হইয়াছে। আমাদের দেশে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের এতই প্রভাব যে, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বেই উহা এড়াইবার জন্য লক্ষ লক্ষ বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। লজ্জার বিষয় এই যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও বিবাহ দিবার জন্য বিষম তাড়াহুড়া লাগিয়া গিয়াছিল।

এই মূঢ় অজ্ঞতাপ্রসূত তাড়াহুড়ার ভয়াবহ পরিণাম যে কি হইয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারীর হিসাবে। এই হিসাবে যদিও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়াইয়াছিল ১০·৬%, ১৫ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকাবধূর সংখ্যা ৩২,৫০,০০০ হইতে ৫৫,০০,০০০-তে গিয়া উঠিয়াছিল। লজ্জার বিষয় এই যে, পাঁচ বৎসরের কম বয়স্কা শিশুবধূর সংখ্যা প্রায় ২,১০,৫০০ হইতে প্রায় ৮,০২,০০০-এ অর্থাৎ প্রায় চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়।

পিতামাতা ও গুরুজন সন্তানের কল্যাণকামী, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু অজ্ঞতা, লোভ, সংস্কার ও অদূরদর্শিতার জন্য তাঁহাদের বিবেচনা যে কিরূপ অনিষ্টকর হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বাল্যবিবাহ এবং কুলীন বলিয়া অথবা কন্যাকে অরক্ষণীয়া ভাবিয়া কিংবা অর্থলোভে অতি বৃদ্ধের সহিত তরুণীর বিবাহ হইতেই বুঝা যায়।

দুঃখের বিষয়, সর্দা আইন যথেষ্ট পরিমাণে কঠোর নহে—তাই আইনকে ফাঁকি দিয়া বহু পিতামাতা এখনও পুত্রকন্যাকে অপরিণত বয়সেই বিবাহ দিতেছেন। এ সম্বন্ধে আরও কড়াকড়ি কাম্য।

বর্তমান আইন অনুসারে পুলিস এরূপ বিবাহের কথা অবগত হইলেও অপরাধীকে চালান করিতে পারে না। কোন লোককে অথবা কোন সমিতিকে ১০০৲ আদালতে জমা দিয়া নালিশ করিতে হয়। অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। পুলিস অপরাধীকে ধরিয়া উহার বিরুদ্ধে সরকার বনাম অপরাধী মোকদ্দমা চালাইতে পারে (cognizable) এইভাবে ঐ

আইন সংশোধিত না হইলে উহা হইতে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে না।* সুতরাং উক্ত আইনের সংস্কারের জন্য আন্দোলন হওয়া আবশ্যক।

বাল্যবিবাহের সন্তান—বাল্যবিবাহের সন্তান সম্পর্কে অনেকের ধারণা যে, বাল্যবিবাহের স্বামী-স্ত্রীর শরীর অপরিণত থাকায় তাহাদের সন্তান দুর্বল, স্বাস্থ্যহীন এবং অল্পায়ু হইবেই। এ ধারণাও আবার ভ্রান্ত। কারণ সন্তানের স্বাস্থ্য ও গুণাগুণ নির্ভর করে **সৃষ্টিবীজ** এবং জন্মলাভের পরে যথোচিত পুষ্টিকর খাদ্য লাভ ও লালন-পালনের উপর। মাতাপিতার ডিম্বাণু ও শুক্রকীট যদি পরিণত ও রোগশূন্য হয় এবং জন্মিবার পরে যদি সন্তান যথোচিত খাদ্য ও যত্ন পায় তবে সেই সন্তান দুর্বল ও অল্পায়ু হওয়ার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এ দেশবাসী স্বাস্থ্যহীন ও অল্পায়ু হয় নাই। শৌর্য, বীর্য, জ্ঞানবুদ্ধিতে এদেশের বহু মনীষী বাল্যবিবাহের সন্তান ছিলেন।

কিন্তু পূর্বোক্ত কারণসমূহের জন্য আমরা বাল্যবিবাহের সমর্থক নহি।

একটু পূর্বেই বিবাহপদ্ধতি বর্ণনা করিতে গিয়া আমরা যে **পাত্রপাত্রীর পরস্পরকে নির্বাচন করিবার অধিকারের** কথা বলিয়াছি, উহা এইরূপ বাল্যবিবাহ প্রথার একটা প্রধান প্রতিষেধক হইতে বাধ্য।

প্রৌঢ়বিবাহ

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যে উল্টাদিকে বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে ইহাও আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। বিবাহের বয়স না হইতেই যেমন বালক-বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে, বিবাহের বয়স হইলে এ বিষয়ে বিলম্ব করাও তেমনিই উচিত নহে।

শিক্ষা ও বৈষয়িক সংস্থানের অজুহাতে আজকাল এদেশেও অনেকেই বিবাহে অযথা বিলম্ব করিয়া থাকে। ইহার ফলে অনেককে যৌবনসন্ধ্যায়ও অবিবাহিত দেখা গিয়া থাকে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বাল্যবিবাহ যেমন মাতার স্বাস্থ্য ও শরীর গঠনের পরিপন্থী, সন্তানের পক্ষে অনিষ্টকর এবং স্ত্রীশিক্ষার পরিপন্থী, যৌবন শেষে বিবাহও তেমনিই স্বাস্থ্য, চরিত্ররক্ষা, সুখ, শান্তি, সন্তানধারণ, পিতা উপার্জনক্ষম থাকিতে পুত্র ও কন্যার শিক্ষা সমাপন ও বিবাহ হইবার, বরবধূর বয়সের বিশেষ পার্থক্য থাকিলে স্বভাব প্রকৃতি

* "মাতৃমঙ্গল" পুস্তকে এই প্রসঙ্গে গর্ভিণী ও শিশুমৃত্যুর মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়াছি।

মেজাজ, রুচি, সুখ, বিলাস আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি বিষয়ে গরমিল ও বয়োবৃদ্ধির ৫০-৫৫ বয়সের পর যৌন-অক্ষমতা ইত্যাদির জন্য দাম্পত্য সুখের প্রতিকূল।

বাল্যবিবাহের সন্তান সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যাহা বলিয়াছি প্রৌঢ় বিবাহের সন্তান সম্পর্কেও তাহাই প্রযোজ্য।

প্রাচ্যদেশীয় সকল জাতির মধ্যেই অতি প্রাচীনকাল হইতে **যৌবন-বিবাহ** প্রচলিত ছিল। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে **বাল্য ও শৈশব-বিবাহ হাস্যকর মাত্রায়** পৌছিয়াছিল একথা ঠিক, কিন্তু **যৌবন শেষে বিবাহ** বড় একটা দেখা যাইত না। পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ অনেকস্থলে বিপরীত দিকে হাস্যকর মাত্রায় পৌছিয়া থাকে। পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের দেশেও আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বাল্যবিবাহকে যতটা নিন্দা করা হয়, অধিক বয়সে বিবাহকে ততটা নিন্দা করা হয় না। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায়ও এই আতিশয্যের ভ্রান্তি উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মেরী ষ্টোপ্‌স, ডাঃ কিশ্, নরম্যান হাইম্‌স প্রভৃতি যৌন-বিজ্ঞানীগণ **যৌবনাগমে সত্বর বিবাহ দেওয়ার বিশেষ পক্ষপাতী।**

শুভাশুভ নির্ণয়

শাস্ত্রের নামে কুসংস্কারমূলক বিচার-পদ্ধতি সারা জগতে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে, উহা আলোচিত বিবেচ্য বিষয়সমূহ ছাড়াও **দৈব-নির্ধারণের** প্রচেষ্টা। **শুভাশুভ-নির্ণয়ের** রীতি চীন ও ভারতে এখনও প্রচলিত।

চীনদেশে কন্যার জন্মদিন, মাস, বৎসর নির্ধারণ করিয়া গণক-পণ্ডিতেরা **শুভাশুভের** নির্দেশ দেন। আমাদের দেশেও **হিন্দুদের** মধ্যে **কোষ্ঠী-বিবাহ** একটা সাধারণ রীতি। "অযুগ্মবর্ষে বিবাহে কন্যা দুর্ভাগ্যবতী হয়, হয়, যুগ্মবর্ষে বিবাহে বিধবা হয়" ইত্যাদি ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে।

মুসলমানদের মধ্যে **কোষ্ঠী** কেহ বড় একটা রাখেন না; উহা লইয়া মাথা ঘামাইতে কাহাকেও দেখা যায় না। তবে '**মোহাম্মদী**' পঞ্জিকা দেখিয়া বা আরবী, ফার্সী, উর্দু কেতাব ঘাঁটিয়া 'মুবারক' মাস, দিন বাছিয়া লওয়া হয়।

পঞ্জিকা, পুঁথি, কেতাব শাস্ত্র ইত্যাদি এই শুভাশুভ নির্ণয়ে উৎসাহ দেখাইলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, জন্মদিন, তিথি, বার, মাস, রাশি নক্ষত্র

ইত্যাদির কোনই প্রভাব আধুনিক গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) অথবা অপর কোন বিজ্ঞান স্বীকার করে না।

এই অবৈজ্ঞানিক ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) বা মুবারক-মানহুসের ধারণা অনুয়ায়ী ঐ সবের শুভাশুভ ফলে বিশ্বাস না করিতেই আমরা পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করি। এরূপ বিশ্বাসের ফলে অযথা ভয় বা অহেতুক আশ্বাসের সূচনা হয় এবং সংকল্পিত উচিত কর্মে বাধা বা বিলম্ব হয়, ভাল পাত্র-পাত্রী হাতছাড়া হইয়া যায়।

ভাগ্যনির্ভরতা (Fatalism)

অনেকেই ধর্মভাব বা কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া বিশ্বাস করেন যে, পাত্র-পাত্রীর নির্দেশ খোদা বা ভগবান পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছে। চেষ্টায় তাহা হইলে আর লাভ কি ? "প্রজাপতির নির্বন্ধ" শীর্ষক ধারণারও উহাই মূল কথা।

বস্তুত ইহা ভুল ধারণা। নর ও নারী মিলিত হইয়া মানববংশ রক্ষা করিবে ইহা বিধাতার বা প্রকৃতির নির্দেশ হইলেও রাম, শ্যাম, যদু, হরি কাহাকে কাহাকে বিবাহ করিবে ইহা কখনও পূর্ব নির্ধারিত হয় নাই। এরূপ মনে করা কুসংস্কারমূলক বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নহে। পাত্র ও পাত্রীর একত্র সমাবেশ মানুষেরই **অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টাসাপেক্ষ**।

অজ্ঞতা, দুর্বলতা, ও পরাধীনতা প্রসূত আলস্যমূলক এই অদৃষ্টবাদ সর্বপ্রকার বিচার, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা-যত্নের পরিপন্থী। সত্যকার নিষ্ঠাবান্ অদৃষ্ট-বাদীর হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু এরূপ করিলে এ কর্মবহুল জগতে বাঁচিয়া থাকাই সম্ভবপর হইবে না। 'খোদা যাহা করে' বা 'রাখে হরি মারে কে' ইত্যাদি বুলি সাময়িক সান্ত্বনাদায়ক হইলেও কাজের বেলায় তদ্বির, চেষ্টা, যত্ন না করিলে চলে না।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ;
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা .
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

অর্থাৎ, যে পুরুষ উদ্যোগী, লক্ষ্মী তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।' ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে, এই কথা কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে। অতএব স্বীয়

শক্তি দ্বারা দৈবকে বিনাশ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর। সবিশেষ যত্ন করিলেও যদি কার্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে আর দোষ কি?

ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা ও জীবন-যাপনে উপযুক্ত তদ্বির অদৃষ্টবাদের মূলোচ্ছেদকারী।

বিবাহে ব্যয়বহুল আড়ম্বর

বিবাহে ব্যয়বহুল আড়ম্বরের একটা প্রথা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। দুঃখের বিষয় ইহা বাড়াবাড়িতেই পৌঁছিয়াছে। ইহার বিষময় পরিণাম এই যে, বিবাহ দিতে গিয়া পিতামাতা অথবা বিবাহ করিতে গিয়া বর-বধূ প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়া যায় এবং বরপণ-পীড়িত সমাজে মেয়ে ও কন্যাপণদুষ্ট সমাজে পুরুষ অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া যায়; ফলে তাহাদের সুখ, শান্তি ও চরিত্র নষ্ট হয় এবং সমাজে ব্যভিচার, রতিজরোগ, গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা, আত্মহত্যা ও গণিকাবৃত্তি প্রসার লাভ করে।

ইসলামের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ অতি অল্প খরচে বিবাহ সমাধা করিবার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সেকালে তাঁহার বা তাঁহার অনুবর্তীদের পরিবারে বন্ধুবান্ধবদের খেজুর ও শরবত দিয়া অনুষ্ঠান সমাধা করিবার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু মুসলমানেরা সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছেন না। হিন্দুদের মধ্যে পণপ্রথার চাপের উপর আবার আনুষঙ্গিক ব্যয়বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামর্থ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

এ বিষয়ে পাত্রপাত্রীর পক্ষে আগ্রহাতিশয্য অপেক্ষা বন্ধুবান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীরই উৎসাহ বেশী দেখা যায়। *

আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে নেতাদের মনোনিবেশ করা উচিত। বিবাহের নিতান্ত অনাবশ্যক দিকটাকে এত বড় করিয়া ফেলার সার্থকতা কিছুই নাই। আত্মীয়স্বজন এদিকে সহানুভূতি না দেখাইয়া বরং এই উপলক্ষকেই দলাদলি, মান-অভিমান ও রাগারাগির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া থাকেন। কঠোর আইন করিয়া এই কুপ্রথা রহিত করা একান্ত কর্তব্য।**

* প্রবাদ আছে: কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

অর্থাৎ (বিবাহকালে) কন্যা বরের রূপ, মাতা তাহার ধন, পিতা বিদ্যা, বান্ধবগণ সৎকুল এবং অন্যান্য লোক মিষ্টান্ন চায়।

** গ্রন্থকার নিজের প্রথম বিবাহে কেবলমাত্র ফুলের গয়না লইয়া পাঁচ-সাতজন

জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, শ্রেণী, পর্যায়, পণ প্রভৃতির মিল হওয়ার উপর অযথা জোর দেওয়া, এবং কোষ্ঠী ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক বিচারের বাড়াবাড়িতে কনের যোগ্য বরের এবং বরের যোগ্য কনের সংখ্যা অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়াতেই পণপ্রথা পুষ্টিলাভ করে এবং স্বভাব, প্রকৃতি, মেজাজ, স্বাস্থ্য, বয়স, রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি উপার্জন-ক্ষমতা, আর্থিক অবস্থা, কর্মপটুতা, রুচি, সংস্কৃতি, গড়ন, দৈর্ঘ্য, বর্ণ প্রভৃতি হিসাবে যোগ্য পাত্র বা পাত্রী হাতছাড়া করিয়া অযোগ্যকে নির্বাচন করা হয়। তাই সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক সামাজিক ব্যবস্থাই হওয়া উচিত কুপ্রথা এবং কুসংস্কার হইতে উদ্ভূত অহেতুক সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের ক্ষেত্রকে সমগ্র মানবজাতিতে সম্প্রসারিত করা এবং যুবকযুবতীদের ইচ্ছা ও রুচির প্রাধান্য স্বীকার করা। তাহা হইলে পাত্রপাত্রীর অভাব হ্রাস পাইবে এবং পিতামাতা গুরুজন সন্তানের বিবাহকে ব্যবসায়ের পর্যায়ে ফেলিতে পারিবেন না।

দাম্পত্যজীবনে সুখ

বিবাহিত জীবনে মানব সেবার কর্তব্যের কথা আপাতত বাদ দিয়া শুধু স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজনের দিক হইতে আলোচনা করিলেও ক্যারেন হর্নীর মতে বিবাহের অতি সুস্পষ্ট তিনটি দিক আছে: (১) **দৈহিক সম্বন্ধ**, (২) **মানসিক সম্বন্ধ**, এবং (৩) **সাংসর্গিক সম্বন্ধ**। এই তিনটি সম্বন্ধের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী যদি যোগসূত্র খুঁজিয়া পায়, তবেই **আদর্শ বিবাহ** হইয়াছে মনে করিতে হইবে; অন্যথায় উহার মধ্যে যে পরিমাণে যোগসূত্রের অভাব থাকিবে দাম্পত্য-জীবন **সেই পরিমাণে অসুখকর ও তিক্ত** হইবে।

দাম্পত্যজীবনে সুখী হইতে হইলে সর্বপ্রধান প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর **দৈহিক সামঞ্জস্য**। দৈহিক সামঞ্জস্যের অর্থ উভয়ের শারীরিক স্বাস্থ্য, দৈর্ঘ্য, বর্ণ, গড়ন ও **যৌনঅঙ্গের পারস্পরিক উপযোগিতা**। মানুষের অন্যান্য অঙ্গের আকারভেদের ন্যায় তাহাদের জননেন্দ্রিয়েরও আকারভেদ হওয়া স্বাভাবিক। যে সমস্ত পুরুষের জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত দীর্ঘ তাহাদের সঙ্গে হ্রস্ব-যোনিনালীবিশিষ্ট নারীর মিলন খুব সুখের হইতে পারে না। আবার হ্রস্ব-জননেন্দ্রিয়বিশিষ্ট পুরুষের সহিত দীর্ঘ-যোনিনালীবিশিষ্টা নারীর মিলন খুব সুখের হইতে

আর আগেকার স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় বিবাহে মাত্র চার-পাঁচজন লইয়া বরযাত্রী হইয়াছিলেন।

পারে না;—এ বিষয়ে অন্য অধ্যায়ে আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি। বিবাহের পূর্বে ও সম্বন্ধে জানিবার সুযোগ হইবার কথা নহে; তবে শারীরিক গঠন ও দেহের পরিমাপ দেখিয়া কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ভুল হওয়াও খুব সম্ভব, কারণ রোগা ও বেঁটে পুরুষের বৃহৎ, লম্বা-চওড়া লোকের ক্ষুদ্র অঙ্গও দেখা যায়। আমরা যে 'বিবাহ ব্যুরো'র কথা বলিয়াছি, সেখানে ডাক্তারী পরীক্ষায় ও পরামর্শে এ সম্বন্ধে খাঁটি জ্ঞানলাভ করা যাইবে। পরীক্ষামূলক বিবাহেও (Trial marriage বা Companionate marriage-এ) ইহা জানা যায়।

জননেন্দ্রিয়ের আকার ব্যতিরেকে অন্যান্য দিক হইতেও **পারস্পরিক যৌন উপযোগিতা** বিচার করা প্রয়োজন। **কামের তীব্রতা মিলনের ক্ষমতা ও বাসনা** এবং **যৌন-জীবন সম্বন্ধে রুচি ও আদর্শ** বিষয়েও পরস্পরের অনেকটা মিল থাকা দরকার। এ সমস্ত পরীক্ষামূলক বিবাহেই জানা যাইতে পারে। উভয়ের মধ্যে কিংবা কাহারও মধ্যে **জননেন্দ্রিয়-ঘটিত ত্রুটি ও পীড়া** থাকিতে পারে। এই ত্রুটি বা পীড়া দম্পতির অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ-জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিতে পারে। বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষার বাঞ্ছনীয়তার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

দাম্পত্যজীবনের সুখের জন্য আমরা দম্পতির জননেন্দ্রিয়ের উপব এত অধিক জোর দিতেছি দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত মনে করিতেছেন যে, আমরা স্বামীস্ত্রী-সম্বন্ধে **নিছক দৈহিক** সম্পর্করূপেই মনে করি। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। আমরা খুব ভাল করিয়াই জানি যে, স্বামীস্ত্রী-সম্বন্ধে শুধু নারী-পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ নহে, উহার মধ্যে অনেকখানি হৃদয়ের সম্পর্কও আছে। শুধু তাহাও নহে, আমরা বিবাহকে মানুষের সাধনার প্রকৃষ্টতর পন্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং এই সাধনাপথের সকল প্রকার ত্রুটি ও বিঘ্ন সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা হওয়ার পক্ষপাতী।

কিন্তু দাম্পত্যজীবনের দৈহিক দিকটা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। যৌনসম্পর্কলেশহীন দম্পতি যে এ জগতে নাই বা ছিল না, সে-কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু উহা মানবজীবনের সাধারণ চরিত্র নহে—উহা নিতান্ত বিরল বিকল্প। সাধারণ কথা এই যে, **বিবাহসম্পর্ক প্রধানত যৌন সম্পর্ক**। যৌনসম্পর্করূপে দাম্পত্যজীবন সফল হইলে দাম্পত্যজীবনের মহীরুহ মানব-জীবনের বৈষয়িক ও পারমার্থিক কল্যাণের ফুলে-ফলে মঞ্জরিত হইয়া

উঠে। সুতরাং যৌনসম্পর্করূপে দাম্পত্যজীবনের সাফল্যের উপরই অন্যান্য সকল দিকের সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

কথাটা নিতান্ত গন্ধময় ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কথার মত শুনা গেলেও ইহা পরম সত্য কথা এবং এই সত্য কথাটা গোপন করিয়া বাহ্যিক ঠাট বজায় রাখিতে গিয়াই আমরা বহু অমঙ্গল ও অকল্যাণকে ডাকিয়া আনিয়াছি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিবাহ একটা সাধনা। এই সাধনার উপর মানবজীবনের সকল দিকেই কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। দম্পতির **পারস্পরিক যৌন উপযোগিতা** এই সাধনার ভিত্তিভূমি। দম্পতির দৈহিক উপযোগিতার অভাব হইলে **প্রাথমিক সরঞ্জামের** অভাবে সে সাধনা গোড়াতেই ব্যাহত হয়, আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। নারী-পুরুষের প্রথম চেষ্টা এইভাবে ব্যাহত হইলে বর্তমান সভ্যতার যুগে অবশ্য বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা উপযোগিতার সন্ধানে অন্যত্র চেষ্টা করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু বার বার উপযোগী সহকারী নির্বাচনেই যদি মানুষের কর্মপ্রেরণার সর্বাপেক্ষা মাহেন্দ্রক্ষণ যে যৌবন, তাহা অতিবাহিত হইয়া যায়, তবে সে নরনারীর জীবন অনেকখানি ব্যর্থ হইয়া গেল মনে করিতে হইবে। সুতরাং প্রথম নির্বাচনই যাহাতে সর্ব প্রকারে নির্ভুল ও সকল দিক হইতে বাঞ্ছনীয় হয়, আমাদের সে চেষ্টা করা উচিত এবং এ কার্যে যে সমস্ত **বাধাবিঘ্ন তাহা সংস্কারগতই হউক আর আইনগতই হউক দূর করা উচিত।**

আমাদের দেশে প্রচলিত অন্ধ বিবাহপদ্ধতিতে **যৌন অসামঞ্জস্যেরই** আশঙ্কা বেশী থাকিবার কথা। তাই দুর্ভাগ্যক্রমে অথবা পরীক্ষামূলক বিবাহ বা বিবাহের পূর্বে উভয়ে ডাক্তারী পরীক্ষার এবং তাহার ফল (বিস্তৃত রিপোর্ট) উভয়ের গোচরীভূত করার ব্যবস্থার অভাবে যদি যৌনসামঞ্জস্য লাভ না-ই হয় তবুও হতাশ হইবার কারণ নাই। রতিকৃষ্টি বা কলারূপে দাম্পত্য বিহার আরম্ভ করিয়া এই অবস্থার অনেকটা প্রতিকার করা যায়।

যৌনজ্ঞান

ডাঃ ফোরেল, মিচেল্‌স, মার্শাল, হ্যাভলক্‌ এলিস এবং অন্যান্য বহু যৌন-বিজ্ঞানীর মত এই যে, **বিবাহের পূর্বেই নারীপুরুষ উভয়ের যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।** এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন বরকন্যার নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে **ভাব-বিনিময় হওয়াই**

প্রয়োজন। শারীরবিজ্ঞান ও যৌনবিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত দুইটি যুবক-যুবতী অতি সহজেই নিজেদের পারস্পরিক উপযোগিতা বুঝিতে পারিবে এবং উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে। তাহাদের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের উপযোগিতা বিচারের জন্য একত্রে মিশিতে দিলে তাহাদের যৌনপবিত্রতা নষ্ট হইবে, তাহারা সাময়িক কাম বাসনায় পরস্পরে উপগত হইবে, ইহা মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বরঞ্চ যৌনবিজ্ঞানে অশিক্ষিত বাহ্যত লজ্জাশীল যুবকযুবতীকে একত্রে ছাড়িয়া দিলে বিপদের যত সম্ভাবনা আছে, উপরোক্ত অবস্থায় তত বিপদের সম্ভাবনা নাই।

বরকন্যার পারস্পরিক দৈহিক উপযোগিতা পরিমাপ করিবার জন্য তাহাদিগকে মিশিতে দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু বিবাহের অপর দিক অর্থাৎ বরকন্যার মানসিক সামঞ্জস্য নির্ধারণ করিবার জন্য বরকন্যাকে মিশিতে দিবার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দৈহিক মিলন-সম্পর্কিত রুচি ও ক্ষমতা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনযাত্রার উপকরণ, খাদ্যাখাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনে অভিরুচি সন্তানের জন্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে আদর্শ, ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় মতামত, অর্থব্যয়, দান প্রভৃতি অর্থনৈতিক অবস্থাগত বিচার বিবেচনা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে সমতা না হউক অন্ততঃ সামঞ্জস্য না থাকিলে দাম্পত্য-জীবন সুখের হইতে পারে না। সুশিক্ষিত দুইটি তরুণ-তরুণী অতি সহজেই এই সমস্ত ব্যাপারে পরস্পরের অভিমত ও অভিরুচি জানিতে পারে। এজন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট সুযোগ দিতে হইবে।

সর্বগুণসম্পন্ন দুইটি তরুণ-তরুণীর মধ্যেও মতের মিল না হইতে পারে। এমন দুইটি সুন্দর প্রাণকে জোর করিয়া বাঁধিয়া দিয়া দুইজনেরই জীবন ব্যর্থ করিয়া দেওয়া কখনও উচিত নহে।

ডাঃ ফোরেলের মতে আদর্শ দাম্পত্যজীবন

ডাঃ ফোরেল ভবিষ্যৎ মানবের আদর্শ বিবাহের যে কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি সরল। তিনি লিখিয়াছেন: "ভবিষ্যতের মানুষ শৈশব হইতেই যৌনবিজ্ঞান ও উহার বিভিন্ন দিকের

উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হইবে। মানুষ মদ্যপান বা অন্য কোন নেশা করিবে না, মানুষের কাঞ্চনকৌলীন্যে বিশ্বাস থাকিবে না। সহস্র লোকের রক্ত শোষণ করিয়া এক ব্যক্তি ঐশ্বর্যের স্তূপ সৃষ্টি করিবে না। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের কামলালসার ইন্ধন যোগাইবার জন্য সহস্র পুরুষের প্রাণ ও সহস্র নারীর সতীত্ব বিসর্জন দিতে হইবে না; মানুষ বিলাসী থাকিবে না; শিল্পকলা ও ললিতকলা সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন হইবে। মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের বাহুল্য থাকিবে না। স্বাস্থ্যসম্মত, স্বল্পব্যয়-সাপেক্ষ পোষাকে মানুষ তৃপ্ত থাকিবে। আড়ম্বর ও বিলাসিতা যে শিল্পকলা নহে, এ কথা মানুষ হৃদয়ঙ্গম করিবে। সুতরাং মানুষের আবাসবাটী আড়ম্বর-পূর্ণ ইষ্টকস্তূপ থাকিবে না, মানুষের বাসোপযোগী, কবিত্বময়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শিল্পকলার নিদর্শন হইবে। মানুষ ভণ্ডামি ভুলিয়া যাইবে। সত্য কথা সত্য করিয়া জোরের সঙ্গে বলিবার অভ্যাস হইবে। যৌনবিজ্ঞানের অভিজ্ঞ তরুণ-তরুণী অন্যান্য দশটি বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় নিজেদের যৌন উপযোগিতার আলোচনা ও বিচার করিবে। তাহারা পয়সার হিসাব করিতে যেমন ভুল করে না, যৌন ব্যাপারে কিংবা জীবনসাথী নির্বাচনেও তেমনই ভুল করিবেন না। নারীপুরুষের উভয়েরই তালাকের অধিকার থাকিবে, কিন্তু তালাকের প্রয়োজন থাকিবে না।

খ্যাতনামা মহিলা ডঃ মেরী ষ্টোপস্ বলিয়াছেন: "বিবাহপ্রথাকে যদি আনন্দ, শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যের ভিত্তিভূমিরূপে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাই তবে স্বামীস্ত্রীর দৈহিক সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে এবং উভয়ের প্রীতিদায়করূপে যৌনকার্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।"

বিবাহ সম্বন্ধে কর্তব্য—সারকথা

এইবার আমরা বিবাহে সুখী হইবার উপায় সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে পাঠক-পাঠিকাকে স্মরণ করাইয়া দিব।

পাত্র ও পাত্রী নির্বাচনের সময় তাহাদের নিজের ও তাহাদের ভ্রাতাভগিনী, পিতৃ ও মাতৃ-বংশের রূপ স্বাস্থ্য, আয়ু, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও আর্থিক অবস্থা কিরূপ তাহার সন্ধান লইতে হইবে।

পাত্রের বয়স ২২-২৮ ও **পাত্রীর বয়স** ১৮-২২ এবং পাত্রীর অপেক্ষা পাত্র ৪-৮ বৎসরের জ্যেষ্ঠ হওয়া উচিত। **বাল্যবিবাহ** বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

অভিভাবকেরা নির্বাচন করিবেন, কিন্তু তাঁহারা পাত্র ও পাত্রীকে পরস্পরকে দেখিবার ও যথাসম্ভব সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগ দিয়া তাহাদের অভিমতানুযায়ী কাজ করিবেন।

পাত্র ও পাত্রী পরস্পরকে নির্বাচন করিয়া থাকিলে তাঁহারা অভিভাবকদের মত লইবেন ও তদনুসারে চলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। নির্বাচনে অনিশ্চিত **অপবিজ্ঞান** ফলিত জ্যোতিষ ও তাহার সন্তান কোষ্ঠী এবং অদৃষ্টবাদ বর্জন করিয়া **আধুনিক বিজ্ঞানানুযায়ী বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইবেন।**

ভাল পাত্র বা পাত্রী পাইলে সম্পর্কীয় ভ্রাতা-ভগিনী (cousins), জাতি উপজাতি, তাহার শাখাপ্রশাখা, শ্রেণী-উপশ্রেণী, জেলা, প্রদেশ, দেশ প্রভৃতির অযৌক্তিক বাধা গ্রাহ্য করিবেন না।

পাত্র ও পাত্রীর ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সমাজসেবা, দান-ধ্যান, মিতব্যয়িতা আত্মীয়পোষণ ও অতিথিসেবা, পোষাক, গৃহসজ্জা, সঙ্গী-সাথী, সখ (hobby) পানাহার, পুত্রকন্যার সংখ্যা, শিক্ষা, বিবাহ, আমোদপ্রমোদের প্রণালী, চাকর-দাসী ও পাচক রাখা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা মিল আছে কিনা দেখা উচিত।

কোনও পক্ষ কর্তৃক স্বাভাবিক ব্যভিচার, উৎপীড়ন এবং পরিত্যক্ত হইলে, অসাধ্য উন্মাদরোগ, ধ্বজভঙ্গ বা মৃত্যু হইয়াছে মনে হইলে **বিবাহবিচ্ছেদের** অথবা **স্বতন্ত্র হওয়ার** আইন থাকা উচিত এবং স্বামী অপরাধী হইলে স্ত্রী যাহাতে খরচ পায় সে ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বিবাহের সময় স্বামীর রতিজ রোগ ছিল অথবা সে পুরুষত্বহীন বা বিবাহিত ছিল, কিংবা বিবাহে জোরজবরদস্তি, জালজুয়াচুরি, দাগাবাজী করা হইয়াছিল, প্রমাণিত হইলে ঐ বিবাহ **নাকচ** করিয়া স্ত্রীকে স্বামীর খরচ দিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

পণপ্রথা দাতার পক্ষে সর্বনাশকারী ও গ্রহীতার পক্ষে আত্মমর্যাদাহানিকর, ঘোর স্বার্থপরতার পরিচায়ক, অপমানজনক এবং উপযুক্ত বয়সে পাত্র-পাত্রীর বিবাহের বাধা-স্বরূপ। অর্থবলে অধমের সহিত উত্তমের বিবাহ ঘটাইয়া সমাজের অনিষ্ট সাধন করা হয়। লোভী অভিভাবকেরা ইহা স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করিলে পুত্র ও কন্যা যদি গান্ধর্ব বিবাহ করে তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। আইন প্রণয়ন দ্বারা এই প্রথাকে সমাজ হইতে বিদূরিত করিতে হইবে।

নিজে দুর্বল হওয়া সত্বেও বিদ্রোহী হইয়া হঠাৎ সমাজকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া বিপ্লবের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া কোন লাভ নাই। অন্য আপত্তিকর সামাজিক কুপ্রথা কুসংস্কারগুলি বর্জন ও তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে।

স্বাধীন ভারতের গৌরবের যুগে যেমন ভিন্ন প্রদেশবাসীর ও বিদেশীর সহিত বিবাহ হইত (মহাভারত এবং হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ইতিহাস ও কাহিনী-সমূহ দেখুন) তেমনি রূপবতী ও স্বাস্থ্যবতী ভিন্ন-প্রদেশবাসিনী ও ইউরোপীয় কন্যা বিবাহ করা উচিত। ভিন্ন রক্তের আমদানীতে জাতির শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হয়। এইরূপ পাত্রপাত্রী উভয়েরই আদান-প্রদান করা উচিত।

আদর্শ বিবাহ

আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সকল প্রকার **যৌন মিলন ব্যবস্থার মধ্যে বিবাহই শ্রেষ্ঠ** এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, বিবাহের মধ্যে **ঐকিক বিবাহই** প্রশস্ততম এবং সকল দিক হইতে **সামাজিক কল্যাণকর।**

সেইজন্য সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে ঐকিক বিবাহকে আইন ও সামাজিক শাসনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার ধারাবাহিক চেষ্টা চলিতেছে। পুরুষের যৌন-প্রবৃত্তি যাহাই হউক না কেন, বৈষয়িক নানা কারণের চাপে মানুষ সাধারণতঃ এক-বিবাহের পক্ষপাতী। অনুকূল অবস্থার সাহায্য পাইলে পুরুষ একপত্নী বিবাহেই সন্তুষ্ট থাকিতে প্রস্তুত আছে। আর নারীজাতি ত স্বভাবতই ঐকিক বিবাহের পক্ষপাতী।

তবু যে ঐকিক বিবাহপ্রথা নানা প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তবুও যে মানুষের বিবাহিত জীবনে নানা প্রকার অপ্রীতি ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দিতেছে তাহার কারণ, বিবাহকে সর্বাঙ্গীণ আদর্শ অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারে নাই। সমাজ-বিজ্ঞানীগণ অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না, রাষ্ট্রনায়কগণ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন না, তবু আমরা বিবাহকে আদর্শ অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারি নাই। পারি নাই এই জন্য যে, মানুষের স্থিতিস্থাপক, সংস্কার-বিরোধী মন ধর্মগত ও সমাজগত স্থাণুবৎ কুসংস্কারসমূহে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। সংস্কারকদের সদিচ্ছা-প্রণোদিত সমস্ত প্রচেষ্টা মানুষের প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মনের পাষাণ-প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরিতেছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে হইলেও ভ্রান্ত সংস্কারের কুজ্ঝাটিকা ভেদ করিয়া সত্যদৃষ্টি আমাদিগকে **আদর্শ বিবাহের** রূপ দেখাইবে।

যে বিবাহে স্বামী-স্ত্রী দৈহিক ও মানসিক উভয়ত পরস্পরের উপযোগী, যে বিবাহে মিলনে উভয়ে সমান আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, স্বামীকে বলাৎ-কারী বা স্ত্রীকে যৌন-অসন্তোষপূর্ণ হইতে হয় না, যে বিবাহে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন উপলব্ধি ও পূরণ করিতে পারে, যে বিবাহে স্ত্রী স্বামীর আর্থিক গলগ্রহ নহে, যে বিবাহে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পারমার্থিক আদর্শ সাধনের পরিপন্থী না হইয়া সহায়ক হয়, সেই বিবাহকেই আমরা **আদর্শ বিবাহ** বলিয়া মনে করি এবং সেইরূপ বিবাহের প্রচলনই কামনা করি।

আমাদের আশা, সত্যের সূর্যকিরণ কুসংস্কারের কুজ্ঝাটিকা ভেদ করিয়া দুনিয়াকে আলোকিত করিবেই। সত্যানুসন্ধিৎসু সমাজহিতৈষীকে কুজ্ঝাটিকার অন্তরালে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সত্যের আলো গ্রহণ করিবার জন্য তাহার মনকে প্রস্তুত করিতেই হইবে। মানবকল্যাণের জন্য মানুষকে **নৈতিক ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য,** তাহাকে ক্রমোন্নতিশীল প্রাণরূপে বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে, তাহার **দৈহিক ও মানসিক উন্নতি** বিধানের জন্য এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির জন্য বিবাহপ্রথাকে আমাদের বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। শুধু প্রথাটিকে বাঁচাইয়া রাখিলেই চলিবে না। এই প্রথাকে **সকল প্রকারে** মানবের **কল্যাণপ্রসূ** করিতে হইবে, এই প্রথাকে মানুষের **দৈহিক ও মানসিক, আনন্দের উৎসে** পরিণত করিতে হইবে। এক কথায়, বিবাহ প্রথাকে মানুষের সকল প্রকার যৌন-অকল্যাণ ও যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার **প্রতিষেধক মহৌষধিরূপে,** সকল প্রকার যৌনসংযম ও **যৌনতৃপ্তির মনোরম উপায়রূপে,** মানবের মনে, তাহার সমাজে, তাহার রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কি করিয়া পারা যায় তাহাই এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য।

কৈশোর ও যৌবনকালের সমস্যা

ঐ সময়ের নানা উদ্বেগ

কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর স্বভাবতই নানা রকম অশান্তি ও উদ্বেগ থাকে। শৈশব সকলেরই সাধারণতঃ খেলাধূলাতেই কাটিয়া যায়। প্রিয়জনের আদর-সোহাগে, চাওয়া মাত্র অভাব পূরণে, দায়িত্বহীন আচরণে, কঠোর সংসার জীবনের অজ্ঞাতে যে স্বপ্নময় সুমধুর কালটি কাটিয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। বয়স বাড়িয়া চলিতে চলিতে বাধা-নিষেধের বালাই বাড়ে, লজ্জাশীলতা ও দায়িত্বজ্ঞান আসিয়া পড়ে, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট না হইলেও একটা মোটামুটি ধারণা হয়।

শারীরিক পরিপুষ্টির সঙ্গে যৌনজীবনে যে সচেতন ভাব জাগে তাহাব আলোচনা আমরা ৯ম অধ্যায়ে করিয়াছি। কৈশোরে নারীর সলজ্জভাব, যৌন-অনুভূতির নম্র ও মধুর কৌতূহল, কিশোর ও যুবকের প্রতি মৃদু আকর্ষণ দেখা দেয়। খানিকটা ভয়, খানিকটা আশা, খানিকটা আদর-সোহাগের প্রত্যাশা কিশোরীর মনে উদয় হয়। কিশোরের কিন্তু যৌনচেতনার স্তর উগ্র। কৈশোর হইতে শরীরে শুক্রসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক অভূতপূর্ব যৌন-কৌতূহল উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া বসে।

যৌবনের প্রারম্ভে নর ও নারীর যৌন-চেতনার স্তর উগ্র হইতে থাকে। উভয়ে বিশেষ করিয়া নর জাতি, বিবাহের পূর্বেই এক বা একাধিক যৌন-বিকল্পের আশ্রয় লয়। পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে আমরা যৌনবিকাশের বিভিন্নমুখী পরিণতির সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি।

পিতামাতা, গুরুজন ইত্যাদির নিকট হইতে সুনীতি, সাধু আচরণ ও যৌনদমনের অজস্র আদেশ উপদেশ পাওয়ার পরও নিতান্ত যৌন-তাড়নার ফলে বাধ্য হইয়া তৃপ্তির সুযোগ ভোগ করিয়াও ইহারা নির্মল আনন্দ পায় না। চুরি করিয়া নিষিদ্ধ ফল ভোগ করার মত অপরাধী মন কুণ্ঠিত থাকে। শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে নিতান্ত উদ্বিগ্নও থাকে।

মুশকিল হইল অন্যান্য রোগের মত এই সকল কৌতূহল, সমস্যা, ক্রিয়া বা অভ্যাস সম্বন্ধে অপরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ ও লজ্জা হয়। অপরাধ

করিয়া লোকে যে রকম গোপন করিয়া যায়, যৌন অপরাধও যেন তেমনই। আনন্দ হয় মুহূর্তের কিন্তু অনুশোচনা দীর্ঘস্থায়ী—আর করিব না বলিয়া পণ করা হয় বহুবার, কিন্তু পণ ভঙ্গও হয় বার বার। পাপ ত করিলামই—বোধহয় আমার সারা ভবিষ্যৎ জীবনও কণ্টকিত করিলাম, ইহাই হয় সদাজাগ্রত মনোভাব!'

কিশোর ও যুবকের মন এই সময়ে কতটা ভারাক্রান্ত ও উদ্বিগ্ন থাকে তাহার নমুনা নিম্নে আমার নিকট লিখিত একটি শিক্ষিত যুবকের পত্রাংশ হইতে বুঝা যাইবে :

"......কিন্তু মনেব দিক থেকে যথেষ্ট বুড়িয়ে গিয়েছি বলেই আমি আজ নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন!

"শুধু বাজে বকেই চলেছি, আপনার বিরক্তি উত্তরোত্তব বৃদ্ধি করে। যাকগে! এ হলো আমার মনের বিক্ষিপ্ত চেহারা!

"যে কোনো মুহূর্তে আত্মহত্যা বা সন্ন্যাস অবলম্বন করা আমার পক্ষে আদৌ বিচিত্র নয়। দৈহিক বার্ধক্যের কথাটা খুব সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছি। আপনার 'যৌনবিজ্ঞান, পড়ে কোথাও কোথাও আশা, উদ্দীপনা উৎসাহ পেয়েছি, কখনো দেখেছি সম্ভাবনার ইংগিত, কিন্তু কখন যে আবার অবচেতন মন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে ভূত হয়ে আছে টেরও পাই নি। হবার কথাও বটে। কারণ যত উদাহরণ, দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, আজ পর্যন্তও আমার মতো দুরূহ রোগী একটিও দেখতে পাই নি!

(ভূমিকাটা আরও বড়, কিন্তু উদ্ধৃত অংশটুকু হইতেই বুঝা যাইবে যে, যুবকটি কতটা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত! বহু যুবকেরই মনের অবস্থা এ রকম। আমার সান্ত্বনা ও পরামর্শ পাইয়া যুবকটি প্রকৃতিস্থ হয়। এখন সে বিবাহিত ও ভাল চাকুরীতে বহাল।—গ্রন্থকার)

"আমার বর্তমান বয়স ২৪। বাল্যের স্মৃতিটা বেশ লাগে ভাবতে; কিন্তু এর পরের কথা মনে হলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে তার ভয়াবহ চেহারায়। কৈশোরটা যে কখন এলো আর গেল, আজও ঠাহর করতে পারি না! আর এখন যে আমি কী, তা আপনিই বলে দেবেন মেহেরবানী করে। যে পংকিল পরিবেশে আমার জন্ম, তাতে করে বার'র (১২) কোঠায়ই পরিচিত হই হস্তমৈথুনের সাথে। ক'বার যে হতো তার কোনো হিসেব নেই। এমন কী পায়খানায় বসে, পড়ার সময়, শুয়ে তো কথাই নেই যতক্ষণ ঘুম না এলো, ফের ঘুম ভাঙলে ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ কিছুদিন চললো......। বাপ মায়ের কড়া শাসনে থাকায়

মকন, চাকর ছাড়া কোনো সঙ্গী পাইনি সে বাচ্চাটি থেকেই। আর চাকরগুলোও বা! সব কটা একত্র হয়েছে তো আর রক্ষে নেই, যত সব অশ্লীল আর উলংগ যৌন-আলোচনা তাদের মুখে। আর সে কী উল্লাস বাপরে! কাজেই গোড়াতে গলদ, মনটায় আমার অঙ্কুরেই দানা বেঁধেছে নোংরামী। আর সে যুগটা ছিল পুংমৈথুনের চরম অবস্থা, অন্তত আঞ্চলিক। এবং সে অঞ্চলটা ভয়ঙ্কর, এ কারণে অনেক নিরীহ ছেলের জীবন বিপন্ন হয়েছে—সুতরাং রেহাই পাই নি, দু' একবার নিজেও আক্রান্ত হয়েছি, কারণ তাদের মতে আমার চেহারা ও স্বাস্থ্য নাকি ছিল লোভনীয়। কিন্তু এ জিনিসটাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি বরাবর।

(হস্তমৈথুনের প্রসার ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। আমরা ১১শ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, হস্তমৈথুনের অভ্যাস সার্বজনীন। শতকরা প্রায় ৯৯ জনই উহা করে নিতান্ত প্রয়োজনে—যৌন উত্তেজনা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে—উহা করায় কোনই ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা নাই বরং সুফলই বেশী। এই যুবকটি অপরে কি করে না করে না জানিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল যেন এ জগতে একমাত্র সে-ই ঐরূপ করিয়াছে।

সমমৈথুন সম্পর্কেও প্রায় একই কথা। ইহা ততটা ব্যাপক না হইলেও যথেষ্ট সংখ্যক কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী জীবনের এক স্তরে ইহার সাময়িক অভ্যাসে লিপ্ত হয়। ইহারও ভবিষ্যৎ ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ কিছু নয়। এ সম্পর্কেও পূর্বে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে।

যে নীতিবাগীশরা এ সকল বিকল্পের আলোচনায় আপত্তি করেন তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন যে, আলোচনার চেয়ে গোপনতা অধিক আপত্তিকর। এই যুবকের মত অসংখ্য যুবক ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া প্রায় আত্মঘাতী হইবার উপক্রম করে। অথচ বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের আলোকে ইহারা মোটেই উৎকণ্ঠিত হইত না।

ফ্রয়েডের মত আমরাও বলিতে বাধ্য যে, বোধ হয় এইরূপ অমূলক অনুশোচনা ও ভীতি অসংখ্য ক্ষেত্রে উবায়ু (Neurosis) জন্মায় ও অপূরণীয় মানসিক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে।—গ্রন্থকার।)

"কিছুদিন না যেতেই নতুন পর্যায় শুরু হলো আমার জীবনের। এক যুবতীর নেক নজর পড়লো আমার উপর, আমিও আকৃষ্ট হলাম চাকরের সৎপরামর্শে। সে আমার চাইতে বয়সে কিছু বড় হবে, বিয়ে হয়েছিল কিন্তু স্বামীর সাথে বেশীদিন তার বনে নি। বেশ কিছুদিন অবৈধভাবে চললো তার

সাথে। আমি আকৃতিতে তার চাইতে কিছু ছোট ছিলাম, সেদিক থেকে ভো বটেই; কিন্তু সে বলতো, সে নাকি পূর্ণ আনন্দ এবং তৃপ্তি পেত। এক সময় এ পথে বিঘ্ন ঘটলো। দেখতে আমি সত্যি তখনো যথেষ্ট ছোট ছিলাম, কেউ দেখলে কল্পনাও করতে পারতো না যে আমি অতখানি। এদিকে হস্ত-মৈথুনের বিরাম নেই।

(ছোট বেলায় বড় মেয়েদের পাল্লায় পড়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। বিশেষ করিয়া নিকট আত্মীয়া, বিধবা বা হাসিঠাট্টার পাত্রী বৌদি, ভাবী ইত্যাদি পরিচয়ের ও আলাপের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকায় বিবাহের পূর্বে প্রায় সকল নরই নারী-সংসর্গ করিয়া থাকে। ডঃ কিন্‌সে হইতে উদ্ধৃত তথ্যাবলীর উল্লেখ আমি পূর্বেই করিয়াছি।

নারীসঙ্গ হইলেও, গোপনে কখনও কখনও মাত্র সম্ভবপর বলিয়া, হস্ত-মৈথুনও চলা স্বাভাবিক।—গ্রন্থকার।)

"একদিন চিত হয়ে স্বমেহন করছি তো বীর্যগুলো সব এসে পড়েছে তলপেটে, হাত দিয়ে অনুভব করলাম বেশ আঠালো আর ঘন হয়েছে। কেমন একটু মায়া হলো, কিন্তু বন্ধ করতে পারি নি। কমসে কম শোয়ার সময়, ঘুম ভাঙলে একবার আর পায়খানায় বসে কখনো কখনো।

"তখন আমি কিছু কিছু ব্যায়াম করতাম, রীতিমতো না হলেও মোটামুটি খেলোয়াড়। অসুখ-বিসুখের সাথে বিশেষ কোনো পরিচয় নেই। বয়েস ১৪-১৫, মোটামুটি স্বাস্থ্য ভালই ছিল বলতে হবে। ষোল'র কোঠায় এসে সাক্ষাৎ মিললো এক রূপসী তরুণীর। কিছুদিন মাত্র বিয়ে হয়েছে, কিন্তু স্বামীকে ত্যাগ করেছে, অপারগ বলে। তার ভাষায় 'সে ধ্বজভঙ্গ'। প্রথম দিনে পুরোপুরি সম্মতি না থাকায় খুব শীগগীর তার discharge হয়ে যায়; অবশ্য আমি তখন এ সব বুঝতাম না। এমন কি শৃঙ্গার পর্যন্ত জানতাম না।

"কিছুদিন তাকে নিয়ে বেশ চলেছে। সেও স্বামীকে হারিয়ে আমাকে দিয়ে যৌবনটা পুরোপুরি ভোগ করে নিয়েছে, আর আমিও সুযোগ ছাড়ি নি। দুজনেই যথেষ্ট আনন্দ এবং তৃপ্তি পেতাম। তখনো আমার হস্তমৈথুনের অভ্যাস কিছু কমে নি। তার কথা মনে হলেই একবার সেরে নিতাম। কিছুদিন পরেই তার স্বামী-গৃহে চলে যেতে হয়—সে এখন নাকি সুস্থ। সে চলে যাওয়ার পর আমাকে ফের সাবেক আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু তখন হস্তমৈথুনে যথেষ্ট বীর্য যায় বলে খুব মায়া হতো। হঠাৎ এক প্রকৃষ্ট উপায় বের করলাম, 'কন্ড

বীর্যক্ষয়ে হস্তমৈথুন'। মৈথুন করে চরম অবস্থায় পৌছে যেই 'বীর্যটা বেরুবে অমনি লিঙ্গের অগ্রভাগকে খুব জোরে চেপে ধরতাম। আন্দোলনটা শেষ হয়ে গেলেই মৃদু চাপ দিয়ে তাকে ফের ভিতরে পাঠিয়ে দিতাম। তাতে করে একটু রস বেরুত মাত্র আর বীর্যটা আপাত দৃষ্টিতে চেপে যেত।

"এ উপায় অবলম্বন করে করে আমি তখন বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে যেতে লাগলাম, কিন্তু এটাই যে কারণ তা তখন টের পাই নি। ভাবতাম বীর্যটা তো বেঁচে গেল। ইতিমধ্যে আমার একবার ম্যালেরিয়া হয়ে গেছে, বেশী নয় ১০-১৫টা দিন মাত্র, কিন্তু শরীরটা বেশ নেতিয়ে পড়েছে।

(এই প্রসঙ্গে একটা মস্ত অমূলক ভয় সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাকে সাবধান করা উচিত মনে করি। শুক্রের মূল্য সম্বন্ধে হেকিমী, কবিরাজী ইত্যাদি পুস্তক-গুলি অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলা হয় যে, ৭০ ফোঁটা রক্তে ১ ফোঁটা শুক্র তৈয়ারী হয়। পঞ্জিকা ও বাজে পুস্তিকায় ঔষধের বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া ভয় দেখানো হয় যে, শুক্র-নিঃসরণ হইলে মস্তিষ্কের হানি হয়—পৃষ্ঠে ও কোমরে বেদনা হয়, মাথা ঘোরা ও চক্ষে ঝাপসা দেখা হয়, স্মৃতি-শক্তি কমিয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আজগুবি কথার কোনও সার্থকতা নাই। বাস্তবিক পক্ষে শুক্র কি এবং কি ভাবে উৎপন্ন হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শুক্রকীট ও শুক্র তৈয়ার হইতে থাকে। খরচ হইলে উৎপন্ন হইয়া আবার পরিপূরণ হয়।

হস্তমৈথুনে, নারী সংসর্গে এবং বিবাহের পর নিজের স্ত্রী সম্ভোগে প্রথম প্রথম খানিকটা বাড়াবাড়ি হইলেও পরে খরচের পরিমাণ কমিয়া আসে।

এই যুবকটি যে বীর্যনিঃসরণকে ভীতির সঙ্গে দেখিত তাহা বুঝা যায় তাহার বীর্যরোধের নিষ্ফল চেষ্টায়। বীর্যরোধ করিবার এইরূপ চেষ্টাই বরং ক্ষতিকর হইতে বাধ্য।—গ্রন্থকার।)।

"অনেক দিন পর একদিন আমার দ্বিতীয় জনটিকে পেলাম, এক অসাবধান মুহূর্তে; সে ঘুমিয়ে আছে, নিজকে আর সংযত করতে পারলাম না। কাছে যেতে না যেতেই বীর্যপাত হয়ে গেল। মনটা সাংঘাতিক দমে গেল, এবং রীতিমতো চিন্তা হতে লাগলো—'এ আমার কী হলো।' বোধ করি সেটা ভয়ের জন্যেই হয়েছিল।

(কিশোর যুবকদের নিতান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নারী সংসর্গে বিফলতার একটা ভয় থাকে। নীতিজ্ঞান, বিবেকের দংশন, কর্মবোধ, ভয়, কুণ্ঠা লজ্জা

—এ সকল মিলিয়া প্রায় তাহাদের জড়সড় করিয়া ফেলে। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই অঙ্গ স্থাপনের পূর্বেই, সঙ্গে সঙ্গেই অথবা পরক্ষণেই বীর্যপাত হইয়া যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত অঙ্গ নিস্তেজ হইয়া পড়ায় অঙ্গ সংযোগ ঘটিয়াই উঠে না। এইরূপ অপারগতা বা আংশিক বিফলতা কিশোর যুবকদের মনে ভীষণ রেখাপাত করে। তাহারা শুধু পাত্রীর কাছে লজ্জাই পায় না—ইহাও মনে করিতে থাকে যেন আর কখনও তাহারা যৌনমিলন সফলভাবে করিতেই পারিবে না। একবার এইরূপ মনোভাব দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইলে বার বার চেষ্টা করিয়াও বিফল হওয়া স্বাভাবিক। শুধু তাহাই নহে— ঐ বিফলতা বিবাহ-জীবনে পর্যন্ত গড়াইতে পারে।

বিবাহপূর্ব যৌননিষ্ঠা পালন করিয়া যাহারা প্রথমেই দাম্পত্যজীবনে যৌন-মিলনে অভ্যস্ত হয় তাহাদের পক্ষে মায়া, মমতা, ভয়হীনতা ও একাত্মবোধের দরুন ততটা কুণ্ঠাভাব থাকে না। তাই ততটা বিফলতারও আশঙ্কা থাকে না। তবে অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক উত্তেজনার জন্য অতি দ্রুত স্খলন হইয়া যাইতে পারে।

যাহারা এইরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে তাহাদেরও ভয় পাইবার কিছুই নাই। এরূপ বিফলতা **সাময়িক** মাত্র। বিবাহজীবনে এই অবস্থার উন্নতি দুঃসাধ্য নয়। আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে উপদেশ দিয়াছি। এই যুবকের বিফলতা ইহাকে কতদূর কুণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছিল তাহা বুঝা যাইবে ইহার পরবর্তী উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিবরণীতে।—গ্রন্থকার)

"মাপ করবেন। এ ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি। মনের আমার এতটুকুও দোষ নেই—কারণ তাকে গড়ে তোলার, তাকে শক্তিশালী করার বা সংযম শিক্ষা দেওয়ার আমার কেউ ছিল না। জীবনে কোনো সৎসঙ্গ পাই নি, কারো সদুপদেশ পাই নি। অবশ্য বাপ-মা আমার অশিক্ষিত নন, তাঁরা মনে-প্রাণে চেয়েছেন ছেলে মানুষ হোক, ভাল হোক। কিন্তু, তাঁরা ছেলের মনকে গড়ে তুলতে পারেন নি, সেখানেই যা গলদ। এ জন্যেও সম্পূর্ণ তারাই দায়ী নন,—দায়ী দারিদ্র্য, দেশ, সমাজ, সংস্কার, শাসন। তা হোক, এ সব আমার আলোচনার বিষয় নয়।

"কিছুদিন বাদেই ফের ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হই, এবং ভীষণভাবে। মাস দুই দারুণ রকম ভুগে খাড়া হয়ে উঠলাম কোনো রকম। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়ার জন্যেই বোধ করি। শরীরটাকে এবারে একদম ভেঙে দিয়ে গেছে।

তবু ক'টা দিন যেতেই মনটাকে জোর করে চাঙ্গা করে তুললাম। তৃতীয় অভিযান চললো কিছুদিন; কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি আগের মত অতোটা শরীরের ক্ষমতা নেই। স্থানান্তরে যেতে হয় শীগ্‌গীরই, কলেজে পড়ার জন্যে। এখন বয়েস দাঁড়িয়েছে উনিশ।

"বেশ নিস্তেজ মনে হচ্ছে নিজেকে। নয়া জীবন সম্বন্ধে একটুও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না—Co-education সম্বন্ধে কত রং-বেরং-এর রোমাঞ্চ জাগতো মনে, সব যেন মরে ভূত হয়ে গেছে! নিঃসাড় হয়ে আসছে যেন সব, কিছুই ভাল লাগে না, মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যের ক্রমেই অবনতি ঘটছে, কিছুতেই মন ওঠে না, একটুতেই হাঁপিয়ে উঠি। মেয়েদের সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবলেও দেহে তেমন কোনো অনুভূতি দেখা দেয় না। নেহাত মন খারাপ হলে একবার হস্তমৈথুন করি। তবে এখন মাত্রা কম। স্বপ্নমৈথুনে যথেষ্ট আনন্দ পাই।

"অনেক দিন কাটলো নির্ঝঞ্ঝাটে। প্রায় দু'বছর। আর এক রাত্রে আর একজনের সঙ্গে চেষ্টা করে দেখা গেল, কিছুই আমি পারলাম না—এক মিনিটের মধ্যেই শেষ।

"এরপর থেকে আর কোনো চেষ্টাও করি নি, সুযোগও পাই নি। কিন্তু দেহ ও মন দু'টোই সমানভাবে দুর্বল হতে চললো। অনেকগুলো সমস্যা এসে ভিড় করেছে এক সাথে জীবনের পথে, যার সমাধান আজও হয় নি, কখনো হতেও পারে না। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমার শরীর থেকে কিছু না কিছু শক্তি প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে বেশ টের পাই। কিন্তু আটকে রাখতে পারছি না। যৌন-অনুভূতিটা আমার সম্পূর্ণ উবে গেছে। শত চেষ্টা করেও আমার পাশে একটি মেয়েকে ভাবতে পারি না, সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে একটা মেয়েকে ভাবলেও আমার দেহে যৌন-অনুভূতি জাগে না। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে হস্তমৈথুন করি, বীর্য বেরিয়ে আসে বটে, কিন্তু লিঙ্গোদ্রেক হয় না। সুতরাং মনেপ্রাণে আমি জানাচ্ছি, আমি পঙ্গু হয়ে গেছি। সর্বক্ষণ উঠতে বসতে, খেতে, শুতে যখন তখন মনে হয় 'আমি শেষ', সব কিছু বিষিয়ে ওঠে, বেঁচে থাকার একটুও আগ্রহ আমার নেই। দিশেহারা হয়ে ছুটেছি অনেক ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথের কাছে। কিন্তু ব্যাটারা যেমন বিদেশী ওষুধের দালাল, তেমনি দায়গ্রস্ত মেয়ের বাপগুলোরও দালাল। ব্যাটারা না রোগীর কথা শুনবে, না রোগের নাম—মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে বসলো। বগলে কয়েকটি

ওষুধ, আর একটা প্যাটার্ণ স্ত্রী, ব্যস্। এখন কি করি? আত্মহত্যা ছাড়া উপায় কি?"

যুবকটির করুণ আত্মনিবেদন আরও দীর্ঘ। উদ্ধৃত অংশটুকু হইতেই মনে হইবে যে, নিতান্ত যৌনতাড়নায় অসংখ্য যুবক যাহা করে ও যতটা ফল বা কুফল লাভ করে, তাহাতেই সে নিরাশ হইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক সময়মত পরামর্শ পাইয়া তাহাব জীবনের গতি ফিরিয়াছে। এখন সে বিবাহিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এরূপ বহু চিঠিপত্র প্রসঙ্গে আমরা কিশোর ও যুবকদেব কয়েকটি উদ্বেগের সন্ধান পাই:

(১) হস্তমৈথুনের অভ্যাস ও ঐ অভ্যাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে অমূলক চিন্তা।

হস্তমৈথুনের অভ্যাস প্রায় সার্বজনীন। সুতরাং উহা লইয়া দুশ্চিন্তা করিবাব কারণ নাই।

(২) শুক্রনিঃসারেণ ভীষণ ক্ষতি হয়, এইরূপ অহেতুক ধারণা।

শুক্র আপনা হইতেই উৎপন্ন হইতে থাকে। খরচ না হইলে স্বপ্নদোষের মারফতে বাহির হইয়া যায়। অবশ্য খুব বেশী-বাব অল্প সময়ে শুক্রস্খলনে কোমরে প্রচাপ ইত্যাদি বোধ হইতে পারে। তবে বাড়াবাড়ি আপনা হইতেই বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৩) বিবাহের পূর্বে আকস্মিক নারী-সংসর্গের চেষ্টায় ভড়কাইয়া যাওয়া। বিফলতাব কারণ—প্রবল উত্তেজনা, ক্রিয়াব নূতনত্ব, পাত্রীর নূতনত্ব বা কুণ্ঠা, ধর্মভাব, নীতিবোধ, বিবেকের দংশন, লোকভয়, অভিনবত্ব, গর্ভ-সঞ্চারের ভয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ অপারগতা **সাময়িক**। একাধিকবারের চেষ্টায়ও আত্মপ্রত্যয় না জন্মিলে বিবাহের পূর্বে নারী-সংসর্গের চেষ্টা ত্যাগ করাই উচিত। কারণ, বিফলতার ভাব বদ্ধমূল হইয়া পড়িলে বিবাহজীবনে পর্যন্ত অপারগতা থাকিয়া যাইতে পারে।

(৪) রতিক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ কিশোর-যুবকদের বিবাহের পরে স্ত্রী-সংসর্গে সফল হইবে না এইরূপ উৎকণ্ঠা।

অন্তবিধ বিকল্প যৌনতৃপ্তিতে অভ্যস্ত বা একেবারে যৌন-নিষ্ঠাবান্ অনেকেরও দাম্পত্যবিহারে কি হইবে না হইবে চিন্তা করা স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে কিশোরী ও যুবতীদের ভাবী স্বামী কিরূপ ব্যবহার করিবে এই লইয়া দুর্ভাবনা থাকা স্বাভাবিক। পূর্বে যৌনবিষয়ে অজ্ঞতা ভীতিবিহ্বলতা আরও বাড়াইত। এখন উপযুক্ত যৌনজ্ঞান লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবনের শুভ অধ্যায়ের প্রতীক্ষা করাই ভাল। দাম্পত্যজীবনের প্রায় সকল সমস্যারই সমাধান সম্ভবপর। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্যও তাহাই।

(৫) যৌন-অঙ্গসমূহ ও স্বাভাবিক সুষ্ঠু কিনা ইহা লইয়া উভয়ের উৎকণ্ঠা।

এই উৎকণ্ঠার কারণ এতদিন ছিল ঐ সকল অঙ্গের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা। লজ্জার দরুণ নিজেদের অঙ্গ সম্পর্কে অপরের পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভবপর হইত না। কিশোর ও যুবকদের এইরূপ উৎকণ্ঠা থাকে যে, বুঝি তাহাদের লিঙ্গ উপযুক্ত পরিমাপের নয়। এ আশঙ্কা প্রায় ক্ষেত্রেই অমূলক। আমরা এই পুস্তকের ২য় খণ্ডের 'অঙ্গের পরিমাপ ও কার্যকারিতা' অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকা পুস্তক পড়িয়াই নিজেদের অঙ্গ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

খানিকটা এদিক-ওদিক হওয়া স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক বা রোগের অবস্থা আমরা একটু পরের এক অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। জন্মের পরেই শিশুর অঙ্গসমূহের অবস্থা মাতাপিতার পর্যবেক্ষণ করা ভাল। ইহাতে লজ্জার কিছুই নাই। অনেক ক্ষেত্রেই তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ বা চিকিৎসা করিলে অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাধারণত উহারই পরিমাপ ও ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া গঠিত ও ক্রমবর্ধমান। হাতের অঙ্গুলি যেমন মাপসই ও অবাধে কার্যক্ষম হয়, যৌন-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাধারণতই ঐরূপ হয়। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা করা বৃথা। হাতুড়ে কবিরাজ, অর্থলোভী অসাধু ডাক্তার ইত্যাদি লোকেরা নানারকম ভয় দেখাইয়া লিঙ্গের পরিমাপ বাড়াইবার আগ্রহ সৃষ্টি করে। উহাদের প্রলোভনে পড়া বিপজ্জনক।

(৬) কতক কতক কিশোর নিজেদের স্ফীত বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ভয় পায়। তবে কি তাহারা মেয়েদের মত স্তন পাইয়া বসিবে! একজন কিশোর—সে গর্ভধারণ করিয়াছে বলিয়াই মনে করিয়া ফেলিয়াছিল!

ইহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। ক্রমে ক্রমে স্তন শক্ত হইয়া যাইবে। অথবা উহাতে হস্তস্পর্শ বা পেষণাদি না করাই উচিত।

(৭) **মেয়েদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রথম প্রথম ঋতুদর্শনে ভীতা হইয়া পড়ে।** বিশেষতঃ এ সম্পর্কে কেহ তাহাদের সতর্ক না করিলে।

গুরুজনের উচিত মেয়েদের পূর্বেই (অর্থাৎ স্তনোদ্গমের ৬-৭ মাস পরেই) অবগত করানো। নিজেরা না পারিলে নার্স, ডাক্তার ইত্যাদির আশ্রয় লওয়া উচিত। এই সময়ে কোনও প্রামাণ্য যৌনবিজ্ঞানের পুস্তকে উল্লিখিত বিষয়টি পড়িতে দিলে শিক্ষিতা মেয়েরা আপনা হইতেই বুঝিয়া লইবে।

ঋতুস্রাব কি ও কি ভাবে হয় তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উহা যে স্বাভাবিক ও রোগবিশেষ নয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐ সময়ে পালনযোগ্য বিধিনিষেধের উল্লেখ আমরা ২৮শ অধ্যায়ে এবং ঐ সম্পর্কে রোগ বিশৃঙ্খলার আলোচনা ২৯শ অধ্যায়ে করিতেছি। ঋতুস্রাবের স্বাভাবিক ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া উহার সম্পর্কে ঘৃণা বা ভয় না করিবার উপদেশই আমরা দিতেছি।

(৮) **গর্ভসঞ্চারের ভয়ে কিশোরী ও যুবতীই অভিভূতা থাকে।** কেহ কেহ এমনও মনে করে যে পুরুষের সঙ্গে চুম্বন বা আলিঙ্গনেই গর্ভসঞ্চার হইতে পারে!

গর্ভসঞ্চারের পদ্ধতি আমরা 8র্থ অধ্যায়ে চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছি। ডিম্বস্ফোটনকালে নারীর জননেন্দ্রিয়ে পুরুষের শুক্রকীট স্থাপিত না হইলে (অর্থাৎ রতিক্রিয়া ব্যতিরেকে) গর্ভসঞ্চার হয় না। আদ্য ঋতুর ২-৪ বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে ডিম্বস্ফোটন হয় না। সুতরাং যথাসময়ে ঋতু হইল না দেখিয়া ভয় পাওয়া সঙ্গত নহে। তবে এ কথাও সত্য যে, মাত্র একবারের সহবাসেও গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। অবাধ মেলামেশার ফলে অবাঞ্ছিত গর্ভাধান বহুক্ষেত্রে হইয়া থাকে। বিবাহের পরেও অসংখ্য নারী বার বার গর্ভসঞ্চারের ভয়ে ভীতা থাকেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ করা আজকাল দুঃসাধ্য ত নয়ই এমন কি কষ্টসাধ্যও নয়। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম কয়েক অধ্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

(৯) **স্বপ্নদোষ সম্বন্ধে ভুল ধারণা।**

স্বপ্নদোষে যে প্রকৃত 'দোষে'র কিছুই নাই, উহা যে কামোত্তেজনা প্রশমনের প্রাকৃতিক একটি বিধান তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ঐ আলোচনা ভালমত পড়িলে স্বপ্নদোষ সম্বন্ধে আর কোনও ভুল ধারণা থাকিবার কথা নহে। বিবাহিত জীবনে রতিবিহার নিয়মিত হইতে থাকিলে যে স্বপ্নদোষ কমিয়া যায়, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(১০) নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ব্যথিত, শঙ্কিত বা উৎকণ্ঠিত হওয়াও অনেকেরই অভ্যাস।

পূর্বকালে বিশ্রী বা বিকট স্বপ্ন দেখিলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিবার জন্য লোকে উৎসুক হইত। রাজা মহাজনেরা দেখিলে ত হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়া যাইত। ব্যাখ্যা করিবার গণক বা সাধু ফকিরের দেশময় খোঁজ হইত। বাইবেলে কোরানে এ রকম বহু ঘটনার উল্লেখ আছে।*

পূর্বেকার পুস্তকাদিতে (আরবী পুস্তক তা'বিরুল আহ্‌লাম দ্রষ্টব্য) কি দেখিলে কি বুঝিতে হইবে তাহা লইয়া মতামতের ছড়াছড়ি থাকিত।

ঘরবাড়ি পুড়িয়া গেল বা দাঁত পড়িয়া গেল দেখিলে গ্রন্থকার নিজে ছোট বেলায় মনে করিত আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইবে! বাস্তবিক দুই এক ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা হইয়াও গিয়াছে। ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলেই গ্রন্থকার অশান্তিতে দিন কাটাইত এবং কে কবে মরিবে আশঙ্কা করিতে থাকিত!

এই কুসংস্কার বহুদিন পরে কাটে। এখন আর ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলেও বিচলিত হয় না।

ফ্রয়েড তাহার 'ইণ্টারপ্রিটেশন অব ড্রিম্‌স' পুস্তকে স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক গবেষণা করিয়াছেন।

কখনও শারীরিক প্রচাপনে বা উদ্দীপনে (Stimulus) স্বপ্ন দেখা হয়—যথা মলমূত্র ত্যাগের বেগ হইলে স্বপ্নে ঐরূপ করিতেছি দেখা, শুক্রবেগ বা কামোত্তেজনা বেশী হইলে নিদ্রাঘোরে যৌনমিলন বা কামক্রীড়া করিতেছি দেখা, শীতের প্রকোপ পড়িলে বরফের দেশে গিয়াছি দেখা, প্রবল ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বোধ হইলে খাইতেছি বা পান করিতেছি দেখা।

কখন ইচ্ছাপূরণের (Wish fulfilment) ছলে স্বপ্ন দেখা হয়—যথা বিলাত যাইবার সখে বাস্তবিকই বিলাত গিয়া পৌছিয়াছি দেখা; বড় হইবার সখে বহু টাকা-পয়সা রোজগার করিলাম দেখা ইত্যাদি। ছেলেমেয়েদের বেলায় পূর্ব দিনের অভিজ্ঞতায় চাহিয়া না পাওয়ার অপূর্ণ চাহিদা স্বপ্নঘোরে মিটে। কোন বিষয়ে তীব্র বাসনা এবং ভাবনাও সেই সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখায়।

কখনও উৎকণ্ঠা উদ্বেগের প্রশমন (Anxiety-dreams) স্বরূপ স্বপ্ন দেখা হয়। পক্ষান্তরে ঐ জন্য ভয়াবহ স্বপ্ন দেখাও সম্ভবপর। ছেলেমেয়েরা ভূতের

*রবীন্দ্রনাথের হিং টিং ছট কবিতা দেখুন।

বা বিকট জানোয়ারের গল্প শুনিয়া বিকট স্বপ্ন দেখে। রাত্রে গুরুভোজনের জন্য 'পেট গরম' হইলে অনেক ক্ষেত্রে অসংলগ্ন অর্থহীন স্বপ্ন দেখা যায়।

জাগ্রত অবস্থায়ও মানুষ কখনও কখনও কল্পনায় গা ভাসাইয়া দেয়। চিন্তা কোনও বিশিষ্ট ধারায় ইচ্ছা করিয়া না চালাইলে আপনা হইতেই উহা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যেন ভাসিয়া বেড়ায়। ভাবের সংযোগ বিয়োগ হইতে থাকে।

ধরুন, গা হেলাইয়া ইজি চেয়ারে বসিয়া বিশেষ কিছু ভাবিতেছেন না। কিছুক্ষণ পরেই দেখিবেন চিন্তার স্রোত আপন মনেই চলিতেছে। টাকার কথা ভাবিতে ভাবিতে মহাজন, দেনাদার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিল—একজনের বাড়ী কলিকাতায়, তাই শহরের ছবি মনের সামনে ফুটিয়া উঠিল—অমনিই কলিকাতার কলেজের ও নানা প্রফেসারের ছবি ভাসিয়া আসিল—বিশেষ বন্ধু বা বান্ধবী আসিয়া জুটিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চিন্তার স্রোত আপন মনে চলিতেছে—মনশ্চক্ষুর সামনে ছবি ভাসিয়া বেডাইতেছে কিন্তু চক্ষু বা কান কোনও কাজে আসিতেছে না। **স্বপ্নে ঠিক ঐ সকল ছবি চোখে দেখা যায়; কথাবার্তা কানে শোনা যায়; ভয়, বিরক্তি, আকর্ষণ, বিকর্ষণ মনে উদয় হয়।** পার্থক্য এখানে—স্বপ্নঘোরে দেখা, শুনা, ভাবা যেন সিনেমার মত—বিশ্বাস হয় সকলই সত্য ও প্রকৃত।

জাগিবার পর অনেকটা মনে থাকে, অনেকটা ভুলিয়া যাই। এই জন্যই অসংলগ্ন ও অনর্থক অভিজ্ঞতার অস্পষ্ট ঘটনাস্রোত মনে পড়ে মাত্র।

সুস্বপ্ন সুখপ্রদ কিন্তু দুঃস্বপ্নেও ভাবিবার কোনই হেতু নাই।

স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়ের প্রতি নির্ভয়, দ্বিধাহীন ভাবপোষণ করিতেই আমি সকলকে উপদেশ দিই। ও সকল মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াই ভাল।

এখনও প্রত্যেক স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যার কোনও সন্ধান বিজ্ঞান দেয় নাই। ভবিষ্যতে দিলে তখন এ সম্পর্কে মাথা ঘামানো যাইবে।

* * *

যৌনবিজ্ঞানের নূতন আলো কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীর অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রসূত ভয়, ভীতি, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অনেকটা লাঘব করিবে, তাহাদের মনে দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় জাগিবে এই আশায়ই এই পুস্তক প্রণীত হইয়াছে।

যৌন-স্বাস্থ্য রক্ষা

যৌন স্বাস্থ্য রক্ষা সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার অঙ্গ

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে শিশুদের প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া দরকার। সুখের বিষয়, স্কুল পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় ইহার স্থান হইয়াছে। কিন্তু যৌন-জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা অতি ভয়ানক। যৌন স্বাস্থ্য রক্ষা যে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষারই অঙ্গ তাহা ভুলিয়া যাওয়া হয়।

কি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কি যৌনবিজ্ঞানের আলোচনায় কোথায়ও যৌন স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা নাই। ইহা খুব শোচনীয়। এ বিষয়ে আলোচনাকে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

শিশুদের যৌন-জীবন নিয়ন্ত্রণ

নবজাত শিশুরা সম্পূর্ণ অসহায়। তাহাদের প্রতি যত্ন নেওয়া ও তাহাদের চাহিদা যোগানো মাতাপিতার কর্তব্য। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে. শিশুদের আবির্ভাব মাতাপিতার **যৌন সহযোগিতারই** ফল এবং উহারা নিজেদের বেলায় ঐ একইভাবে ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির জন্ম দিতে পারিবে। শিশুদের যৌনজীবন নিয়ন্ত্রণ (Sexual management of child) এজন্য মাতাপিতার অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

শিশুদের যৌন-অঙ্গগুলি স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ ও অক্ষুন্ন কিনা (যথা, বালকের উভয় অণ্ডকোষই তাহাদের থলির মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে কিনা, বালিকার সতীচ্ছদে ছিদ্র আছে কিনা) তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহাদের নিয়মিত ভাবে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। উহাতে অযথা ঘাঁটাঘাঁটি করা অনুচিত। ঘন ঘন চুম্বনের ও দোলনের দ্বারা উহাদের উত্তেজিত করিতে নাই। পরিষ্কার রাখা, স্নান করানো এবং কাপড়-চোপড় পরানো ইত্যাদি যথাসময়ে ও অনাড়ম্বরে হওয়া উচিত। রবারের নল, চুষিকাঠি ও দুধের বোতল ইত্যাদি উহাদের মুখে বেশীক্ষণ রাখা উচিত নহে। মায়ের বুকেও তাহাদের বেশীক্ষণ থাকিতে না দেওয়াই ভাল। শিশুদের নগ্ন দেহ দেখিতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। ইহাতে তাহারা শৈশবে কয়েক বৎসর নগ্ন থাকিলে কিংবা নগ্ন মানুষ দেখিলে মনে আঘাত কিংবা লজ্জা পাইবে না।

ত্বকচ্ছেদ

পুরুষ শিশুর লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ অতি প্রাচীন ও ব্যাপক প্রথা। পেশাদার লোকেরা এই সামান্য অস্ত্রোপচার করিয়া থাকে এবং সচরাচর কোন অনিষ্ট হয় না। সালফানিমাইড পাউডার এবং পেনিসিলিন মলম ঘা পচা নিবারণের অব্যর্থ ঔষধ। গরম পানি সাবান তারপর স্পিরিট দ্বারা লিঙ্গের ত্বকের বাহির ও ভিতর যতটা সম্ভব পরিষ্কার করিয়া ত্বকচ্ছেদ করিতে হয়। সালফানিমাইড পাউডার বা পেনিসিলিন মলম দিয়া ঐ ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই উহা পুঁজ ইত্যাদির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায়।

ত্বকচ্ছেদের ফলে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কাপড়-চোপড় ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে ধীরে বেশী সহনশীল হয় ও উহার ধোয়া-মোছা সহজ হয়। সুতরাং তাহাতে দুর্গন্ধময় শ্বেতবর্ণ ময়লা ফ্যাদা বা স্মেগ্‌মা (Smegma) জমিতে পারে না। স্পর্শকাতরতার হ্রাস প্রাপ্তির ফলে যৌনক্রিয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং দুই পক্ষই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার ফলে কোন কোন রোগ হইতে স্থায়ী ও সম্পূর্ণ মুক্ত ও কোন কোন রোগ হইতে আংশিক মুক্ত হওয়া যায়। শৈশবে যত শীঘ্র ইহা করা যায় ততই মঙ্গল। কেহ কেহ শিশুর জন্মের প্রথম মাসেই এই ত্বকচ্ছেদ করিয়া থাকে। কোনও কোনও জাতি ৭-৮ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করে। কিন্তু চামড়া যতই পুরু হয় ততই এই ত্বকচ্ছেদ কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে।

মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে এই প্রথা ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে প্রচলিত আছে। অন্যান্য কোনও কোনও জাতির মধ্যেও ইহা অংশত প্রচলিত। কেহ কেহ স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খাতিরে ইহা করিয়া থাকে।

এই ত্বকচ্ছেদের সমর্থক বিরোধীদের মধ্যে তর্কের অবকাশ আছে।

বিরোধী দলের বক্তব্য: (১) প্রকৃতিই পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগকে পাতলা চামড়া দ্বারা আবৃত করিয়া রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই আবরণকে ত্বকচ্ছেদের দ্বারা তুলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা।

(২) ত্বকচ্ছেদ কালে যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে হয় তাহাতে উহাকে বর্বর যুগের চিহ্ন ও স্মারক ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? সভ্য মানুষ ইহা করিবে কেন?

(৩) অগ্রভাগের চামড়া তুলিয়া নিলে লিঙ্গাগ্রের স্নায়ুর স্পর্শকাতরতাকে ম্লান করিয়া দেয় এবং এই জন্য যৌন-আনন্দ কমিয়া যায়।

স্বপক্ষে বক্তব্য : (১) যাহারা ত্বকচ্ছেদ করে না তাহাদের মধ্যে ব্যালানাইটিস (Balanitis) রোগ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ত্বকচ্ছেদের ফলে লিঙ্গাগ্র পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকে এবং কোনও রকমের গন্ধের উৎপত্তি হয় না।

(২) ত্বকচ্ছেদের ফলে অংশত হস্তমৈথুন, শিশুদের খেঁচুনী ও অন্যান্য রোগ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। এই বিষয়ে মোল (Moll), ব্লক (Block), বেকার (Baker) প্রভৃতি গ্রন্থকার প্রচুর সাক্ষ্য ও প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) মুদা বা ফাইমোসিস (Phimosis) রোগের একমাত্র চিকিৎসা হইল ত্বকচ্ছেদন। উহা করিলে উল্টা মুদা বা প্যারাফাইমোসিস (Paraphimosis) রোগ হইবার আদৌ আশঙ্কা নাই। (পরবর্তী অধ্যায়ে এই সকল রোগের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।)

(৪) ত্বকচ্ছেদন দ্বারা সিফিলিস ও শ্যাঙ্কার রোগ হইতে আংশিকভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ আমেরিকান ডাক্তারেরা এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন।

(৫) ত্বকচ্ছেদন পুরুষাঙ্গের ক্যানসার রোগের পূর্ণ প্রতিষেধক। শৈশবাবস্থায় যাহাদের ত্বকচ্ছেদন হইয়াছে এমন লোকের পুরুষাঙ্গের ক্যান্সার হইয়াছে বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই।

(৬) বিবাহিত জীবনে ত্বকচ্ছেদবিশিষ্ট লোকদের সহসা ও অকালে শুক্র নিঃসৃত না হওয়ায় তাহারা যৌনক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ স্থায়ী করিতে সক্ষম। ইহাতে নারীর চরম পুলকলাভ অধিকক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়।

আমাদের মতে—ত্বকচ্ছেদ দ্বারা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা বা ইহাকে নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক ও বর্বরযুগের চিহ্ন ও স্মারক বলা যায় না। কারণ—আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে আমরা চুল ছাঁটি, নখ কাটি ও কাপড় পরিয়া থাকি। তাহাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ বুঝায় না। টিকা ও ইন্‌জেকশন লওয়া, শরীরে কোন প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার ইত্যাদিও নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার চিহ্ন নয়। সুতরাং প্রয়োজনবোধে ত্বকচ্ছেদ করাও দূষণীয় হইতে পারে না। ত্বকচ্ছেদের ফলে রতিক্রিয়া খানিকটা অধিককাল স্থায়ী হয়।

ত্বকচ্ছেদবিশিষ্ট কিংবা ত্বকচ্ছেদহীন সকলের পক্ষেই যৌনঅঙ্গসমূহ সাবধানতার সহিত নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা দরকার।

ছোটবেলা হইতেই আজীবন মেয়েদেরও যৌনঅঙ্গকে খুব সাবধানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। কারণ, পরিচ্ছন্নতার অভাবেই, মেয়েলোকের লিউকোরিয়া ও অন্যান্য রোগ দেখা দেয়। ভারতীয় ও পাকিস্তানী রমণীরা

অলঘার পরিষ্কার করিবার সময় পিছন হইতে সামনে হাত টানিয়া থাকে। পিতা-মাতার উচিত উহাদের শিক্ষা দেওয়া যাহাতে তাহারা সামনে হইতে হাতকে পিছনে টানিয়া ধোয়। নতুবা অঙ্গুলিতে লাগা মল সম্মুখস্থ যোনিপথে লাগিয়া যাইতে পারে।

নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস

মূত্রস্থলীতে অধিকক্ষণ ধরিয়া মূত্র আটকাইয়া রাখার বিরুদ্ধে শিশুদের সর্বদা সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। শিশুরা নিদ্রিতাবস্থায় অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র ত্যাগ করে। কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় লজ্জায় বা খেলাধূলায় মাতিয়া গেলে মূত্রবেগে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। মলত্যাগের বেলাও প্রথমে অনিচ্ছাকৃতভাবে হইয়া পরে চাপিয়া রাখিবার বদ অভ্যাস হইতে পারে।

মূত্র চাপের দরুন মূত্রাশয় ভরিয়া গেলে শুক্রকোষের উপর প্রচাপ পড়ে। এইজন্য গভীর বা শেষ রাত্রে পুরুষের লিঙ্গোদ্রেক হইয়া থাকে। মূত্রত্যাগ করিলে আবার লিঙ্গোদ্রেক প্রশমিত হয়।

বালিকা-কিশোরীদের পক্ষে মূত্র চাপিয়া রাখা অধিকতর ক্ষতিকর। অনেক সময়ে চাপের দরুন জরায়ু স্থানচ্যুত বা বিকল হইয়া যায়।

শয্যাগ্রহণের পূর্বে বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীকে মূত্রত্যাগের অভ্যাস করাইতে হয়। প্রাতঃকালে ২-১ গ্লাস জল পান করিয়া কিংবা কিছু খাইবার পর মলত্যাগ করিলে পেট সহজে পরিষ্কার হয়। **শয্যাপার্শ্বে গভীর রাত্রে দরকার হইলে মূত্রত্যাগের জন্য উপযুক্ত পাত্র রাখা ভাল।** শয্যাত্যাগের আলস্যে মূত্র চাপিয়া রাখিবার প্রবণতা হইতে ইহাতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহাতে লজ্জার কিছুই নাই। ছেলেমেয়েদের এই নিয়মে অভ্যাস করানো ভাল।

কোষ্ঠবদ্ধতা

কোষ্ঠবদ্ধতাকে বর্তমান সভ্যতার অভিশাপ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা সাধারণ স্বাস্থ্য ও বিশেষ করিয়া স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের দারুণ ক্ষতি করিয়া থাকে। যৌন-জীবনে ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে সজাগ থাকা উচিত। কোষ্ঠবদ্ধতার দরুন পুরুষের প্রষ্টেটগ্রন্থি এবং নারীর জরায়ুর নানারূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রচুর পরিমাণ জল, দুধ, শাক-সবজী ও টাটকা

ফলমূল (যথা, বেল, পেঁপে, কলা) পাকস্থলীর ক্রিয়া সুস্থ রাখিয়া মলমূত্রকে নিয়মিত করে। ভোজনের সময় মাঝে মাঝে ও রাত্রে শয়নের পূর্বে ও শয্যা-ত্যাগের পর প্রচুর পরিমাণে জলপান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ঔষধপত্র সেবন যুক্তিযুক্ত নহে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

বয়স্ক বালকদিগকে ল্যাঙোট পরিধানে ও বালিকাদের বডিস (স্তনাবরক) ইত্যাদি পরিধান করিতে উৎসাহিত করা উচিত—বিশেষ করিয়া যখন তাহারা ব্যায়ামচর্চা কিংবা দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদি করিতে থাকে। বালিকাদিগকে খুব আঁটসাঁট কোমরবন্ধ ব্যবহার করিতে দিতে নাই। তাহাদের শাড়ী কোমরে অত্যন্ত শক্তভাবে আঁটিয়া পরিতে নাই, সংকীর্ণ কোমরের চাইতে সুস্থ আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিক মূল্যবান।

শিশুদের জন্য পৃথক বিছানা

শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতাপিতাব সাথে একই শয্যায় না রাখা উচিত। কারণ মাতাপিতার কথাবার্তা, আলিঙ্গন, শৃঙ্গার মিলনাদি তাহারা কৌতূহলে গোপনে লক্ষ্য করিতে পারে ও করিয়া থাকে এবং অনুকরণও আরম্ভ করিতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের পৃথক পৃথক শুইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। কারণ, দুইজনের মধ্যে একজনের বা উভয়ের যৌন-চেতনা দেখা দিলে অবাঞ্ছিত যৌন-সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে। সমমৈথুন বা বিপরীত লিঙ্গের কামক্রীড়া ভাই-ভাই বা ভাইবোনেও সম্ভবপর। শিশুদের চাকর চাকরাণী, এমন কি শিক্ষক ও শিক্ষায়িত্রীদের সাথে পর্যন্ত এক সঙ্গে শুইতে দিতে নাই। তাহাদেরও অসদ্ব্যবহার ও যৌন-সুযোগ গ্রহণের দৃষ্টান্ত একেবারে কম নয়।

মাতাপিতা বা নিকট আত্মীয়ের লক্ষ্যের ভিতরে অথচ পৃথক পৃথক বিছানায় শুইবার অভ্যাস করানোই সকল দিক দিয়া শ্রেয়।

শিশুর মানসিক উন্নতি

শিশুর মানসিক উন্নতির দিকে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া উচিত। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিবার পর শিশুর যৌন-জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং প্রকৃতপক্ষে কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহার

সূচনাও আমরা দেখিতে পাই। শিশুর যৌনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রশ্নকে তাহার সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা মারাত্মক ভুল।

শিশুদের নিজেদের যৌনাঙ্গ ঘাঁটা অথবা অপরের সহিত কোন প্রকার যৌনক্রিয়া করা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করিতে হয়। উহা সাধারণতঃ খেলা-ধূলার পর্যায়ভুক্ত। শিশুদের যে যৌনশিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

জীবনের বহু প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়ে শিশুর কৌতূহল পরিলক্ষিত হয়। শিশুকে জীবের জন্ম সম্বন্ধে কোনও মিথ্যা ধারণা দেওয়া উচিত নহে বরং তাহার প্রশ্নের সরল ও প্রকৃত উত্তর সহজ ও স্বাভাবিকভাবে দেওয়া উচিত। যেমন ধরুন শিশুর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বলা যাইতে পারে যে, একটি ফুল যেমন একটি বীজ থেকে জন্মে ঠিক তেমনই শিশুরও জন্ম হয় তাহার মায়ের মধ্যে রোপিত একটি বীজ হইতে।

শিশুকে তাহার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এবং কোনও অংশে অসুবিধা বোধ করিলে তাহা সোজাসুজি সরল ও স্পষ্টভাবে বলিতে উৎসাহিত করা উচিত। তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ নানা কারণে ঘড়ি ও সাইকেলের মত খারাপ হইতে পারে এবং সময় মত চিকিৎসায় সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়।

যে অশ্লীল গল্প যৌনভাব জাগরিত করে তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে। যৌনপ্রেরণা যথাসময়ে দেখা দিবেই, কিন্তু তাই বলিয়া অসময়ে উহাকে উদ্দীপিত করিয়া লাভ কি? শিশুরা যখন বই পড়িয়া বুঝিতে পারে তখন হইতে বইপত্র তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু হইয়া উঠে। চরিত্র গঠন করে এই রকম বই-পুস্তক উহাদের উপহার দেওয়া উচিত। ভূতপ্রেতের গল্প, নিষ্ঠুর অপরাধের উপাখ্যান, যৌন-বিষয়ে বাজে, পুস্তক, হাল্কা যৌন-আবেদনপূর্ণ উপন্যাস কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন খিচুড়ী, যাহা প্রাচীন ধর্ম বলিয়া প্রচলিত, এ ধরনের যাবতীয় লিখাই কিশোর ও যুবকের মনের পক্ষে দারুণ ক্ষতিজনক। উহাদের গ্রন্থাগারে উচিত আমোদজনক শিল্পকলার বিবরণ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, সাহসিক কার্যের গল্প এবং মহৎ লোকের জীবনচরিত।

কোন্ ধরনের ফিল্ম বা চলচ্চিত্র শিশুরা দেখিবে সে বিষয়ে মাতাপিতার বিবেচনা করা উচিত। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখনও ছেলেমেয়েদের দেখিবার মত চলচ্চিত্র খুব কম প্রযোজিত হইতেছে। প্রেমের কাহিনী ও

রোমাঞ্চকর গল্পই কেবল লাভজনক বলিয়া অধিক সংখ্যক চিত্রের বিষয়-বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব ছবি দেখিতে গিয়া ছেলেমেয়েদেরও মাতাপিতার পার্শ্বে বসিয়া উত্তেজিত ও লজ্জিত হইতে হয়।

আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিতে চাই যে, কেবলমাত্র নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ দ্বারাই তাহাদের যৌন-কামনা ও লোভ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে না। যাহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী তাহা হইল দৃঢ় **মনোবল ও সুসংবদ্ধ চরিত্র।**

বালক-বালিকাকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিরালায় লালন-পালন করিলে একে আপরের প্রতি অস্বাভাবিক রকমের পছন্দ-অপছন্দের ভাব পোষণ করে এবং বিবাহিত জীবনে পরস্পরকে সুসামঞ্জস্যভাবে খাপ খাওয়াইতে পারে না। পরিচিত পরিবেশে শিশুর যৌনতাড়নার তীব্রতা হ্রাস পায় এবং যৌন-লালসা সহজে সংবরণ করিবার ক্ষমতা জন্মে।

অন্তত দশ বৎসর পর্যন্ত মিলিত খেলাধূলা ও সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। অবশ্য তার পরে মাতাপিতা ও শিক্ষকের পক্ষে কথঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

কৈশোর ও যৌবনে যৌনভাব

কৈশোরকাল স্ত্রী-পুরুষের যৌবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং উভয়েরই যৌনস্বাস্থ্য বহুলাংশে এই সময়ে রক্ষিত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মাতাপিতা এই সময়ে বালক-বালিকার স্বাস্থ্যের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন না।

কৈশোরকাল শৈশব ও যৌবনের মাঝামাঝি সময়। পুরুষের ক্ষেত্রে ১৩ হইতে ১৭ বৎসর কাল এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ১১ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত সময় কৈশোরাবস্থা। এই সময়েই বিরাট শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল এই যে, কিশোর-কিশোরীর যৌনগ্রন্থি-সমূহ স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়া না করিলে পরবর্তী জীবনে যৌনস্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হয় ও উহাতে বৈকল্য দেখা দেয়। যৌন-নির্দেশক চিহ্নাবলী ও ভাব-ব্যবহারের ব্যতিক্রমের সুদীর্ঘ আলোচনা আমরা ১০ম অধ্যায়ে করিয়াছি। অভিভাবক-অভিভাবিকার লক্ষ্য করিয়া যাওয়া উচিত কৈশোরে পুরুষ ও নারীসুলভ

শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সুস্পষ্ট কি না। অভাব ও অতিমাত্রা উভয়ই উদ্বেগের কারণ, চিকিৎসার যোগ্য।

সুরাপান হইতে এই সময়ে উহাদের কঠোরভাবে বিরত রাখিতে হইবে। ইহা উহাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় রকমের ক্ষতিসাধন করে। ইহা যৌনক্রিয়ার আসক্তি যোগায় এবং অনেক সময়ে হস্তমৈথুনের অভ্যাস প্রদীপ্ত করে। নীতিজ্ঞানকে নষ্ট ও বিবেকের প্রতিরোধ শক্তিকে ইহা খর্ব করিয়া দেয়। অনেক কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী কেবল ইহারই প্রভাবে পাপের পথে অগ্রসর হয়। এই স্তরে ধূমপান করাও ভয়ানক ক্ষতিকর অভ্যাস। ধূমপানের অভ্যাসকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

খেলাধূলা ও অধ্যয়ন এই অবস্থায় অতিরিক্ত করিতে নাই। কৈশোর প্রাপ্তির কয়েক মাস আগে হইতে কয়েক মাস পর পর্যন্ত ক্লান্তিকে পরিহার করিয়া চলাই উত্তম। কারণ মাংসপেশী ও মস্তিষ্কের উপর বেশী চাপ পড়িলে যৌনগ্রন্থিসমূহের সঙ্গত কার্যকলাপে বাধার সৃষ্টি হইয়া অনর্থ ঘটিতে পারে।

এই সময় হইতে সহশিক্ষা ও একত্রে মিশিয়া খেলাধূলা করা বিষয়ে বহুবিচার করিতে হইবে। গুরুজন বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে মিলিতে মিশিতে দিতে বাধা নাই। **নির্জনে অবাধ মেলামেশা বিপজ্জনক হইতে পারে।** উচ্ছ্বসিত যৌনচেতনা যৌনক্রীড়া ও যৌনমিলনে যে অনেক সময়েই পর্যবসিত হয় তাহার সুদীর্ঘ আলোচনা আমরা ১৬শ ও ১৭শ অধ্যায়ে করিয়াছি।

বালক-বালিকাকে পূর্বেই যৌবনপ্রাপ্তির বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে অবহিত করা বাঞ্ছনীয় যাহাতে শারীরিক পরিবর্তনের ফলে তাহারা হতভম্ব হইয়া না যায়।

বালিকার প্রথম ঋতুস্রাব তাহার যৌবনপ্রাপ্তির প্রমাণ এবং এবং প্রকৃতির ঐ মর্মে তাহার কাছে নোটিশ। যৌনজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বালিকা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে বলিয়া **ঋতুস্রাবের ফলে পুরাপুরি আতঙ্কিত হইয়া যায়** এবং কি করিতে হইবে, কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া পায় না। যৌনশিক্ষার গুরুত্ব এইখানেই।

ঋতুস্রাব ও স্বাস্থ্যরক্ষা

ঋতুস্রাব সম্বন্ধে প্রথম কথা হইল এই যে, বালিকাকে এই বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে। অসংখ্য বালিকা এই ঋতুস্রাবের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত

থাকে। ফলে তাহারা মর্মাহত হয়। অনেকের মনে এই বিষয়ে নানা অনিষ্টকর ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়।

এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি স্মরণ রাখা উচিত হইবে:

(১) ঋতুস্রাব দ্বারা বুঝায় যে যৌনঅঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হইতেছে—ইহা নারী দেহের গভীরে অতি জটিল শারীরিক প্রক্রিয়ার বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। এই প্রক্রিয়া হইল ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়া।

(২) প্রত্যেক নারীরই প্রায় চার সপ্তাহ অন্তর অন্তর ইহা ঘটে। ইহা ৪৫-৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবশ্য গর্ভবতী অবস্থা ও শিশুরও দুগ্ধ পান করাইবার ফলে ইহা বন্ধ থাকে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে মনে করিতে হইবে পুষ্টির অভাবে, রোগের দরুন কিংবা স্নায়ুবতী গোলমালের দরুন এমন হইতেছে।

(৩) অনেক সময়ে ঋতুস্রাবের বিশেষ তারতম্য ঘটে ও অনিয়মিত হইতে দেখা যায়। যেমন কোনও কোনও বালিকার দশ বছরেই আবার কতকের আঠারো-বিশ বছরের পর ঋতুস্রাব প্রথম আরম্ভ হয়। ৪০ বৎসরের আগে বন্ধ হইলে চিকিৎসা করা দরকার।

(৪) স্বভাবতঃ ঋতুস্রাবের রক্ত তরল ও গভীর লাল। ঋতুস্রাবের দুই একদিন আগে হইতে গর্ভাশয় ও যোনিপথ দিয়া এক রকমের সাদা রস নিঃসরণ আরম্ভ হয়। ইহা রক্তের সাথে মিশ্রিত হইয়া এসিড প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।

(৫) ডিম্বস্ফোটন, রক্তস্রাব ও অপরাপর প্রক্রিয়াগুলি গ্রন্থির কার্যকলাপের দরুনই আরম্ভ হয়।

(৬) কোনও কোনও সময় রক্তস্রাবের পূর্বে, কালে কিংবা পরে গোলযোগ দেখা দেয়। রক্তস্রাব আরম্ভের আগে স্তন স্ফীত, দৃঢ়, শক্ত ও বেদনাযুক্ত হয়। স্রাবকালে সাধারণতঃ মহিলাদের কাজে কোন উৎসাহ থাকে না, সহসা তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ক্ষুধা তেমন পায় না, দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অন্যান্য স্বাভাবিক চিহ্নও দেখা দেয় এবং সংক্রমণের সম্ভাবনাও বেশী হয়। এই সময় স্নায়বিক দৌর্বল্য, মাথাধরা ও খিটখিটে ভাবও দৃষ্ট হয়। এই সকল লক্ষণ ও ভাব সামান্য হইলে ভাবনার কারণ নাই—কিন্তু মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

অনেক স্ত্রীলোক স্রাবের আগে ও অব্যবহিত পরে এবং অনেকে স্রাবকালে যৌনতাড়না উপলব্ধি করে। বিবাহিতা স্ত্রীলোক সমাজসম্মত যৌনসম্বন্ধের মাধ্যমে স্রাবের আগে ও পরে যৌনসুখ ভোগ করিতে পারে। অবিবাহিতা

মহিলাদের কর্তব্য—উত্তেজনার ও চিন্তার ভাবকে দূরে সরাইয়া রাখা আর স্বাস্থ্যপ্রদ আমোদ-প্রমোদ করিয়া এবং শারীরিক ও মানসিক কার্যের পরিমাণ বাড়াইয়া নিয়া যৌন-আবেগকে অন্য পথে চালিত করিয়া দেওয়া। এই সময়ে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রাদিকে যথেষ্ট বিশ্রাম দেওয়া দরকার। স্রাবকালে স্বাস্থ্য-রক্ষার অন্যতম পন্থা হইল সদাসর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা। এই সময়ে ঈষদুষ্ণ জলে সতর্কতার সঙ্গে মাঝে মাঝে যোনিপথ ধৌত করিতে হইবে। বেশী গরম বা ঠাণ্ডা জল, ময়লা কাপড়, তুলা বা ন্যাকড়া, জোরালো সিরিঞ্জ বা জোরে জোরে ঝাপ্টা দিয়া জল ব্যবহার করা অনুচিত। মৃদুভাবে পিচকারী দিয়া স্বচ্ছ গরম জল ব্যবহার করাই ভাল।

সচরাচর দুই রকমের পিচকারী ব্যবহৃত হয়: **ঝরণা পিচকারী** ও **বাল্‌ব পিচকারী**। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার, স্বাচ্ছন্দ্যলাভের ও ঠাণ্ডা হইতে

৩২নং চিত্র

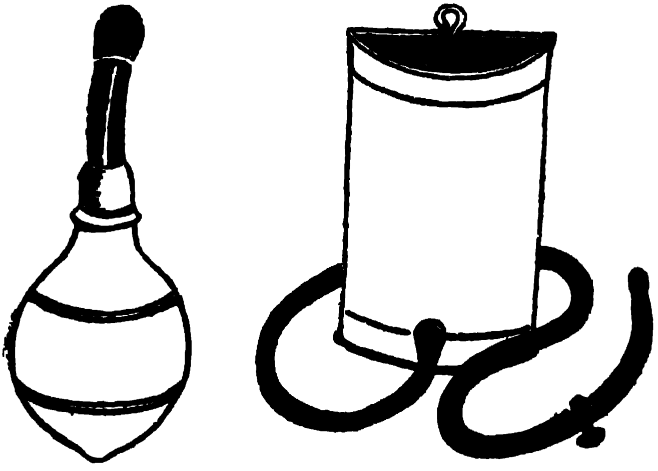

বাল্‌ব পিচকারী ঝরণা পিচকারী

বাঁচিবার সর্বোত্তম স্বাস্থ্যকর পন্থা হইল 'ডায়াপার' (Diaper), ন্যাপ্‌কিন (Napkin) বা ধোয়া বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করা। ইহা কোমরের চারিদিকে কোমরবন্ধনী যোগে ভগদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং রক্তের স্রাবকে শুষিয়া লয়। তুলা কিংবা সেলুলোজের প্যাড বা থলেও ব্যবহার করা যায়। বাজারে স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক প্যাড মিনটেক্স (Mintex), কোটেক্স (Kotex), ট্যাম্‌পাক্স (Tampax) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কি ব্যবহার করিতেছে এবং কেমন করিয়াই বা করিতেছে—এ সম্বন্ধে বালিকারা অত্যধিক পরিমাণে অসাবধান থাকে। পুরানো পচা ও পরিত্যক্ত কাপড়, ন্যাকড়া ব্যবহার বিপজ্জনক। বিভিন্ন রকমের জীবাণু থাকা সম্ভবপর। পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডকে ত্রিকোণাকৃতি করিয়া কাটিয়া উহার মধ্যে নরম তুলা পুরিয়া গরীব লোকেরা ব্যবহার করিলেও যৌনস্বাস্থ্য রক্ষা হয়—অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করিতে নাই। স্রাবকালে উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। ঢিলা-ঢালা কাপড়ই শ্রেয়। তলপেট ও স্তনে কাপড়ের চাপ না পড়াই বাঞ্ছনীয়।

তাহা ছাড়া ঋতুস্রাবকালে উপযুক্ত খাদ্যও খাইতে হইবে। আপেল, আঙুর, কমলা ইত্যাদি ফল ছাড়াও দুগ্ধ পান এ সময়ে বেশ উপকারী। জলপান যতদূর সম্ভব ঘন ঘন করিতে পারিলে ভাল। প্রাতঃভোজনের আধঘণ্টা পূর্বে নিয়মিত এক গেলাস ঠাণ্ডা জল পান করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাদ্য, সুরাপান ও তীব্র ঘন কফি একেবারে পবিত্যাজ্য। পুনঃপুনঃ মল-মূত্র ত্যাগও স্রাবকালে বিশেষ উপকারী। বালিকারা ঘন ঘন বাথরুমে বিরক্তিকর মনে করে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত খারাপ। যথাসময়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতেই হইবে। এই সময়ে যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন জিনিসই আমল দেওয়া উচিত হইবে না। উত্তেজক উপন্যাস, সাহিত্য, সিনেমা, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, যৌনক্রীড়া বা যৌনমিলন ইত্যাদি হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

সর্বশেষ, ঋতুস্রাবকালে মনকে ক্রোধ, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। মেজাজকে সুবিবেচনার সহিত স্থির ও শান্ত রাখাই উত্তম।

জন্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা

যুবক-যুবতীকে, যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেওয়া অতি আধুনিকার পরিচায়ক মনে হইতে পারে। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহার ফলে বহুবিধ দুর্ঘটনা হইতে অব্যাহতি লাভ সম্ভব হয়। প্রথম ঋতুস্রাব কাল হইতেই বালিকারা সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা পায়। কিন্তু তাহাদের শরীর ও মন পূর্ণ পরিণত হইবার আগে কোনও মতেই গর্ভধারণ শুভ হয় না। ১৮ বছরের আগে গর্ভধারণ বন্ধ রাখা উচিত। আমাদের দেশে সকাল সকাল বালিকারা ঋতুমতী হয়। তাই বিবাহিত জীবনের প্রথমে কিংবা তাহারও আগে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে শিক্ষা অপরিহার্য হওয়া উচিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে, জন্মনিয়ন্ত্রণ (মত ও পথ) এবং Ideal Family Planning পুস্তকে করিয়াছি।

ব্যায়ামের দ্বারা যৌনক্ষমতা লাভ

জীবনে যৌনক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত ব্যায়াম ও খেলাধূলার উপর। দুঃখের বিষয়, স্কুল কলেজ সমিতি ও ক্লাবগুলিতে বালক-বালিকার ভবিষ্যৎ যৌন-চাহিদা মাফিক কোনও ব্যায়ামানুশীলনের ব্যবস্থা নাই। এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যায়াম সম্বন্ধে Dr. A. P. Pillay লিখিত The Art of Love and Sane Sex Living এবং Dr. Van de' velde লিখিত Sex Efficiency Through Exercises গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যায়ামের নির্দেশ রহিয়াছে। ব্যায়ামগুলি মোটামুটি ভাবে তলপেটের মাংসপেশীর পক্ষে উপকারী।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাযাম (প্রাণায়াম) উপকারী। শ্বাস গ্রহণের সময় উদরের মাংসপেশী বিস্তৃত হয় এবং প্রশ্বাস ত্যাগের সময় তাহারা সঙ্কুচিত হয়। এই প্রক্রিয়াব ফলে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পাইয়া বক্ষকে প্রসারিত করে, রক্ত চলাচলকে ত্বরান্বিত কবিয়া অনাবশ্যক বা অনিষ্টকারী পদার্থগুলির বহিঃনিঃসরণ প্রক্রিয়াবলীকে শক্তিশালী করিয়া দেয়।

ঠিকভাবে ছন্দে ছন্দে গভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস উপযুক্ত ব্যায়ামের পুর্বে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য তথা যৌন-ক্ষমতা লাভে ইহা বিশেষ উপকারী। বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম প্রণালী ও শরীর-চর্চার দ্বারা উদরের মাংসপেশীকে সুগঠিত করা যায।

রতি ক্ষমতা বাড়াইবার প্রণালী আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি।

কামদমন ও তাহার উন্নয়ন

পশুজগতে যৌনক্ষুধার তৃপ্তি সাবালক প্রাপ্তি, যৌনক্ষমতা এবং সঙ্গী লাভও তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কোনও সামাজিক বাধা কিংবা লজ্জার বালাই নাই ; মনুষ্য-জগতে কিন্তু সাবালকত্ব প্রাপ্তিই যথেষ্ট নহে। কারণ যৌন-সম্পর্কে সমাজেব অনুমোদনসাপেক্ষ। কেবল মাত্র সমাজসম্মত ও আইনসম্মত দাম্পত্য সম্বন্ধের ভিতরেই সম্যকভাবে স্বাধীন যৌনতৃপ্তি সম্ভব। অবশ্য গোপনে ইহার ব্যতিক্রম সম্ভব এবং যথেষ্ট ঘটেও। যৌনসুখের জন্য স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে সম্মানজনক পন্থা হইল বিবাহের সময় পর্যন্ত নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রাখা। এরূপ সংযম দুঃসাধ্য, তবুও আংশিক পালনও উপকারী।

কামদমন ও তাহাকে উর্ধ্বান্বিত (Sublimated) করার কৌশল :

(১) নিয়ত ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ প্রধানত ভোগের জন্য সঞ্চয় করে এবং পুনঃলাভের জন্য ত্যাগ করে। সম্পূর্ণ বয়স্ক হইবার আগে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়ার অর্থ অনেকটা ব্যবসা সম্পূর্ণ আরম্ভ করার আগে মূলধন অপচয়ের শামিল। প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের ধারণা ও চির কৌমর্যের ধারণা অতিরঞ্জিত হইলেও শরীরের গঠনশীল অবস্থায় কামচরিতার্থতা হইতে যতটা পারা যায় নিরত থাকা ভাল। দাম্পত্য জীবনের বাহিরে যৌনতৃপ্তি সমাজে পাপকার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অপরিণত বয়সে অতিরিক্ত যৌনতৃপ্তি করাও অনিষ্টকর। ইহা ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও সুখ বিপন্ন করে।

রোমান ক্যাথলিক, বৌদ্ধ, ঋষি ও সন্ন্যাসীদের আজীবন কৌমার্যের সংযম অবাস্তব এবং শরীর ও মনের অনিষ্টকারী, উহা কোনও বোধশক্তিবান্ সংস্কার-মুক্ত মানুষের অনুমোদন লাভ করিতে পারে না। বস্তুত মানুষের কাম চরিতার্থ করা ছাড়া যৌনক্ষুধার তৃপ্তি হইতে পারে না।

(২) অপর পন্থা হইল নিজেকে লেখাপড়ায়, সঙ্গীতে, শিল্পে, খেলাধূলায় এবং সামাজিক জনহিতকর কার্যে নিয়োজিত রাখা। মস্তিষ্ককে সর্বদাই উপকারী কার্যে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে যাহাতে দুষ্ট চিন্তা কোন স্থান দখল করিতে না পারে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় যৌনচিন্তায় মগ্ন না থাকিয়া সৎসঙ্গ ও খেলাধূলায় এবং কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া শরীর ও মনকে সক্রিয় রাখাই উত্তম পন্থা।

এই উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালে গ্রেটবৃটেনে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (Lord Baden Powel) কর্তৃক প্রবর্তিত বয় স্কাউট প্রতিষ্ঠান একটি মহৎ প্রচেষ্টা। বালকদের তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (১) উল্ফ কব (Wolf Cub) অর্থাৎ যাহারা ৮ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক; (২) স্কাউটস্ (Scouts) অর্থাৎ যাহাদের বয়স ১১-এর উর্ধ্বে, এবং (৩) রোভার্স (Rovers) অর্থাৎ যাহাদের বয়স ১৭-এর অধিক। স্কাউট প্রতিষ্ঠানের মত বালিকাদের জন্য রহিয়াছে গার্ল গাইড (Girl-Guides) প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান প্রচলিত হয় ব্যাডেন পাওয়েল-এর ভগ্নী এগ্‌নিস ব্যাডেন পাওয়েল-এর (Agnes Baden Powel) প্রচেষ্টায়। ৮ হইতে ১১ বৎসরের বালিকাদের "ব্রাউনি" (Brownies) নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে ৮ হইতে ১৬ বৎসরের বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হয় বিভিন্ন শিল্পকলা ও শরীরচর্চা। এই রকম দুই প্রতিষ্ঠানই পৃথিবীব্যাপী শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত।

এই রকম প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা ছাড়াও সচ্চরিত্র ও প্রকৃত ধার্মিকদের সাহচর্যও বিশেষ ফলপ্রদ হয়। মনকে উন্নত, প্রশস্ত ও আদর্শবান্ করে এমন ভাল ভাল পুস্তক ও মহাপুরুষদের জীবনচরিত পাঠ করিলে ঐ কামভাব সংযত রাখা যায়।

যৌন-লালসার উৎপত্তি হইলে নৈতিক কিংবা ধর্মীয় পবিত্র সূত্র মনে মনে আওড়াইয়া মনকে ভিন্ন পথে চালিত করিলে, কোনও রকমের ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া বা তাড়াতাড়ি অপর লোকের সঙ্গে সদালাপে রত হইয়াও মনকে ফিরানো যায়।

পূর্ণ কাম সংহার প্রায় অসম্ভব

ইহা মনে করা একান্ত ভ্রমাত্মক যে, যৌন শক্তিকে মানবীয় সেবা, দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ, জ্ঞানান্বেষণ ও শিল্পকলার মধ্যে নিমগ্ন করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা চলে। তবে উহাকে সংযত রাখা সম্ভবপর বটে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেইগ্লর (W.S. Tayglor) চল্লিশ জন শারীরিক ও নৈতিক দিক হইতে উন্নত অবিবাহিত যুবককে পরীক্ষা করিয়া উহাদের যৌন-বিকাশের লক্ষণ দেখিয়াছেন এইরূপ :

লক্ষণ	সংখ্যা
১। নিদ্রাবেশে শুক্রস্খলন	৭
২। যৌনক্রীড়া (Extreme Petting)	৬
৩। আত্মমৈথুন	২৫
৪। গণিকা গমন	৩
৫। বিভিন্ন নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক	৫

সংখ্যা ৪৬ হওয়ার কারণ হইল এই যে, ছয়জন লোকের মধ্যে ২ হইতে ৫ পর্যন্ত বিভিন্ন রকমেরই ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে অতটা না হইলেও কিছুটা কামচর্চা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং এটা সহজবোধ্য যে, পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত কামদমনের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও যৌন-লালসাকে একেবারে দমন করা যায় না। ইহাতে নীতিবাগীশ্রা হতাশ হইতে পারেন ; তাহা হইলে উপায় ?

উত্তরে বলা যাইতে পারে—**সকাল সকাল বিবাহ করা উচিত।** যদি বিবাহ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে মাঝে মাঝে হস্তমৈথুন করিলে অশান্তি ও উত্তেজনা, দুর্নাম ও অর্থনাশ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

যৌনস্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তির জন্য যথা সময়ে বিবাহ করাই উত্তম। আমাদের দেশে যুবক ও যুবতীর যথাক্রমে ২২ ও ১৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করা উচিত। বর্তমান যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এত উন্নত হইয়াছে যে, সন্তান পালনের ভয়ে যথাসময়ে বিবাহ না করাব কোনও কারণ নাই। উপযুক্ত বয়সের পরেও বিবাহ না করা বর্তমান সমাজের উল্টো এক মারাত্মক বৈকল্য দেখা যাইতেছে। অপর পক্ষে বাল্যবিবাহও অতি জঘন্য প্রথা, উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করা যৌনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং দাম্পত্য সুখ লাভেব প্রধান উপায়।

নিয়মিত যৌন-জীবন যাপন

যৌনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে শেষ কথা হইল বিবাহেব পরে যৌনশক্তির **স্বাভাবিক** ব্যবহার। তাহার অঙ্গ হইল: (১) **নিয়মিত যৌনক্রিয়া সম্পাদন।** কেবল মাত্র বিবাহ করাই যথেষ্ট নহে। স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে সমস্ত বিবাহিত জীবনব্যাপী যৌনতৃপ্তি লাভ ও সাধন সম্ভব হইতে হইবে। অনেক সময় দম্পতি মিলনেব তীব্র বাসনা থাকা সত্বেও একত্র থাকিতে পারে না। সমাজের পক্ষে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে যত অধিক দিন সম্ভব বসবাস করিতে পারে এবং যেখানে তাহা সম্ভব নহে সেখানে তাহাদের ঘন ঘন পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিধবা ও বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে এমন স্ত্রীপুরুষকেও নূতন সঙ্গী বাছিয়া লইতে কেবল অনুমোদনই নহে, উৎসাহিত ও সাহায্য করা উচিত।

(২) **মিতাচার**—স্বাভাবিক যৌনমিলনের সুযোগ বিবাহের পূর্বে কদাচিৎ হয়। বিবাহিত জীবনে তাই হঠাৎ **মাত্রাহীনভাবে** রতিক্রিয়া চলিতে পারে। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, জীবন সাথী পালাইয়াও যাইবে না কিংবা সে ভোগের অযোগ্যও হইবে না। যৌন-উপভোগ সমস্ত জীবনব্যাপী চলিতে পারে যদি না **অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি** করিয়া পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকে ধ্বংস-সাধন করা হয়।

(৩) **উচিত ও অনুচিত আচরণ**—যৌনজীবনে কি উপযুক্ত এবং কি অনুপযুক্ত সে সম্বন্ধে বিস্তর মত ও বিশ্বাস আছে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই স্বাস্থ্য রক্ষার এবং যৌনজীবনে সুখ ও শান্তি লাভের অনুকূল নহে। এই সকল ব্যাপারে আধুনিক যৌনবিজ্ঞানই পথপ্রদর্শক হওয়া বাঞ্ছনীয়—কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ধর্মীয় ও সামাজিক লোকাচারের বিধিনিষেধ নহে। বর্তমান গ্রন্থে পুরাতনের মধ্যে যাহা মূল্যবান কেবল তাহাই রাখিয়া আধুনিক বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের অনুমোদিত আচরণের পন্থাই নির্দেশ করা হইয়াছে।

(২৯)

রতিজ রোগসমূহ

সংজ্ঞা—যৌনাঙ্গে রোগগ্রস্ত নরনারীর সহিত সহবাসে সংক্রমণজনিত যে সকল রোগ হয় তাহাদিগকে রতিজ রোগ (Venereal Diseases) বলে। কেহ কেহ ইহাদিগকে যৌন-রোগ আখ্যা দেয়, ইহা ভুল। কারণ যৌন-রোগ (Sex Diseases) বলিতে বুঝায় নরনারীর বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গ ও যন্ত্রের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ও কুগঠন।

সাধারণ অজ্ঞতা

রতিজ রোগসমূহ ও যৌন-বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে সাধারণ, এমন কি, উচ্চ শিক্ষিত লোকদেরও জ্ঞান অতি সামান্য। শুধু সামান্য হইলেও উহা বোধ হয় অতটা ক্ষতিকর হইত না যতটা হইয়া থাকে উহা বিকৃত ও ভুল বলিয়া।

ভুল জ্ঞানের প্রধান কারণ এই যে, অন্যান্য রোগের ন্যায় এই সকল রোগ বা বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে লোকেরা, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকেরা খোলাখুলি আলোচনা করিতে পারে না। বরং লজ্জাবশতঃ গোপন করিয়াই চলে।

বিকৃত জ্ঞানের প্রধান কারণ অল্পবুদ্ধি বা স্বল্পজ্ঞান বন্ধু-বান্ধবীর পরামর্শ গ্রহণ। যাহারা নিজেরাই অজ্ঞ তাহারা অপরকে সঠিক জ্ঞান কি করিয়া দিবে?

ইহার চেয়েও মারাত্মক কারণ **হাতুড়ে হেকীম, কবিরাজ ও অর্ধ-ডাক্তারদের অজ্ঞতা এবং ভয় দেখাইয়া ঔষধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা।** বিজ্ঞাপন পুস্তিকায় নানা রকম রোগের ভয়াবহ কাল্পনিক রূপ প্রচার অর্থাৎ

বিকৃত জ্ঞান বিতরণ করা হয়। এবং অমোঘ বা ধন্বন্তরি ঔষধের কার্যকারিতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

অসংযমের পরিণামে যে সমস্ত ভয়াবহ রতিজ রোগসমূহ দেখা দিতে পারে, এখন তাহাদের আলোচনা করিব।

শুধু প্রকাশ্য গণিকাদের সংসর্গেই যে এই রোগসমূহ সংক্রমিত হয় তাহা নহে, সকল দেশে প্রকাশ্য ছাড়া গোপন ব্যবসায়ী নারী এবং পাশ্চাত্য দেশে সহজলভ্য প্রমোদসঙ্গিনীর দ্বারা ইহাদের প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে।*

রতিজ রোগ প্রধানত তিনটি—**প্রমেহ বা গনোরিয়া** (Ganorrhoea), **সফ্‌ট শ্যাঙ্কার** (Soft Chancere) এবং **উপদংশ বা সিফিলিস** (Syphilis)।

গনোরিয়া বা প্রমেহ

ইতিহাস—এই রোগের কথা **প্রাচীনেরাও** অবগত ছিলেন। খ্রীষ্ট-জন্মের ষোল শত বৎসর পূর্বেকার মিশরীয় একটি পুথিতে উহার উল্লেখ দেখা যায়। পুরাতন বাইবেলে পরোক্ষভাবে ইহার উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালের লোকেরা মোটামুটি শুক্রতারল্য (Spermatorrhoea), গনোরিয়া এবং প্রষ্টেট গ্রন্থিস্রাবকে (Prostatorrhoea) একই পর্যায়ে ফেলিতেন এবং একই ব্লেনোরিয়া (Blenorrhoea) নামে অভিহিত করিতেন।

মধ্যযুগে গনোরিয়া সংক্রামকতা, দূষিত সহবাসে উহার উৎপত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান অনেকটা অগ্রসর হয়। গণিকাবৃত্তিকে ইহার প্রসারের জন্য দায়ী করিয়া রোগগ্রস্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

গনোরিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। রিকর্ড (Ricord) ১৮০০ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে গবেষণা দ্বারা ঠিক করিলেন যে, গনোরিয়া এবং উপদংশ দুইটি একেবারে স্বতন্ত্র রোগ। নাইসার (Neisser) কর্তৃক এই রোগের **বীজাণু আবিষ্কারের** (১৮৭৯খ্রীঃ) পর

* এই প্রকার নারীসংসর্গকারী অবিবাহিত পুরুষেরা গৃহস্থ সমাজে আত্মীয়া ও বান্ধবীদের ভিতর এবং বিবাহিতেরা উহাদের ব্যতীত নিজ নিজ পত্নীদের মধ্যে এই রোগসমূহ ছড়াইতেছে। সুতরাং কোন পুরুষ বা নারী, যতই শিক্ষিত, ধনী, সুশীল এবং বাহ্যতঃ সচ্চরিত্র হউন না কেন, এই সমস্ত রোগ হইতে একেবারে মুক্ত, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। কোনরূপ ব্যভিচারের সঙ্কল্প মনে উদয় হইলে যুবক-যুবতীরা যেন এই কথাটি ভাবিয়া দেখেন। অন্ততঃ রতিজ রোগের ভয়ে সকলের চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে যত্নবান হওয়া উচিত।

হইতেই ইহার সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানের সূচনা হইল। আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে গনোবীজের নাম হইল—নাইসেরিয়া গনোরাই (Neisseria Gonorrhoeae)।

কিরূপে হয়

'গনোকক্কাস' (Gonococcus) নামক একপ্রকার বীজাণু মূত্রনালীতে প্রবিষ্ট হইয়া উহাতে প্রদাহ সৃষ্টি করিলেই গনোরিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। ইহা অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি। ইহা পুরুষ হইতে নারীতে এবং নারী হইতে পুরুষে অতি সহজে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

এই রোগগ্রস্ত নর বা নারী সহবাসেই নারী বা নরের এই রোগ হইতে পারে। এই বীজাণু শরীরের অন্যান্য অংশেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

সহবাস ব্যতিরেকেও এই রোগগ্রস্তের ব্যবহৃত তোয়ালে, ডুস ইত্যাদি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া সংক্রমণ হইতে পাবে। বালিকাশিশুর অঙ্গে নার্স বা ধাত্রীর ঐ বীজাণু দূষিত অঙ্গুলি, তোয়ালে প্রভৃতির সংস্পর্শহেতু এইরূপ সংক্রমণ সম্ভবপর হয়। গনোরিয়াগ্রস্তদের সদ্যব্যবহৃত কমোড বা পায়খানার সিট প্রভৃতি ব্যবহারেও এই রোগ নরনারীর শরীরে সংক্রমিত হইতে পারে।

কিন্তু অতি অল্প ক্ষেত্রেই এরূপ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, গনোকক্কাস রৌদ্র বা বাতাসে বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। জীবিত বীজাণু পুরুষের মূত্রনালী এবং নারীর যোনি ও জরায়ুর মত কোমল জায়গাতে লাগিলে তবেই আক্রমণ করিতে পারে। সাধারণতঃ লোকে নারী সহবাস করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে স্বীকার না করিয়া নানা বাজে কারণ নির্দেশ করিয়া থাকে। যথা—নিদ্রাস্খলনের পর প্রস্রাব ও ধৌত না করা, রোগগ্রস্তের প্রস্রাবের অথবা কোন বিষাক্ত দ্রব্যের উপর প্রস্রাব করা প্রভৃতি। এই রোগগ্রস্ত নর বা নারী সংসর্গই ব্যাধিগ্রস্ত হইবার প্রধান ও প্রায় একমাত্র কারণ।

শোচনীয় ভুল বোঝা

অনেক সময় পুরুষ ভুল বুঝিয়া মনে করে, তাহার রোগ সারিয়া গিয়াছে। কারণ, সাধারণতঃ জ্বালা-যন্ত্রণা দুই সপ্তাহে দূর হয় এবং পুঁজ আসাও কয়েক মাসে বন্ধ হয়। কিন্তু ঠিক চিকিৎসা ব্যতীত ইহা কখনও আপনা-আপনি

একেবারে সারে না। সে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে সংক্রমিত করিয়া বসে। স্ত্রীর শরীর হইতে পুনরায় বীজাণু গ্রহণ করিয়া নিজের শরীরে রোগ-লক্ষণ দেখিয়া স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে অসতী সাব্যস্ত করে। অনেক সময় স্বামী বাহিরে দূষিত-যোনি সহবাসে আক্রান্ত হইয়া স্ত্রীকে সংক্রমিত করে। তারপর নিজে চিকিৎসিত হইয়া রোগমুক্ত হয়, কিন্তু ঐ স্ত্রীসহবাসে আবার রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

অতি বুদ্ধির বিপদ

অনেকে মনে করে যে, পুংমৈথুনে বা দূষিতযোনি নারীর পিছনে মিলিত হইলে গনোরিয়ায় আক্রান্ত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহা একটি ভুল ধারণা। কারণ, যে পুরুষ বা নারীর পশ্চাদ্‌ভাগ ব্যবহার করা হইবে সেই পুরুষ বা নারীকে ঐ ভাবে কোন গনোরিয়াগ্রস্ত পুরুষ ব্যবহার করিয়া থাকিলে সংক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ইহা ভিন্ন রোগগ্রস্ত নারীর যোনি হইতে স্রাব গড়াইয়া মলদ্বার পর্যন্ত পৌছিতে পারে, কাজেই রোগগ্রস্তা নারীর অস্বাভাবিক পথ ব্যবহারেও (সে নারীর অপর কোন পুরুষ দ্বারা ঐ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া না থাকিলেও) সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

প্রাথমিক লক্ষণ—পুরুষের

গনোরিয়ার প্রাথমিক অবস্থায়ই চিকিৎসা সহজসাধ্য বলিয়া প্রাথমিক অবস্থায় লক্ষণসমূহের দিকে সজাগ থাকা উচিত।

সংক্রমণের পর **সাধারণতঃ ২ দিন হইতে ৮ দিনের মধ্যেই** এই ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূষিতযোনি-সহবাসের তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসেই লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ, মূত্রনালীর (urethra) সম্মুখ-ভাগ আক্রান্ত হওয়ার ফলে লিঙ্গের অগ্রভাগ (মূত্রদ্বার) সুড়সুড় করে ও প্রস্রাবত্যাগে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। ক্রমশ মূত্রদ্বার ফুলিয়া যায় ও লাল হয়। হইতে প্রথমে পাতলা লালার ন্যায় ও পরে ঘন ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের পুঁজের ন্যায় স্রাব হইতে থাকে। এই সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ ও কোমরে বেদনা, জ্বর ও কতক ক্ষেত্রে বৃহৎ অস্থি-সন্ধিসমূহেরও বেদনা হইতে পারে। কখনও কখনও এই প্রাথমিক অবস্থাতেও মূত্রপথের ঝিল্লীর প্রদাহের ফলে রক্তস্রাব, বেদনা ও জ্বালায় জন্য প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

আক্রান্ত স্থানসমূহ—প্রাথমিক অবস্থায় অচিকিৎসা বা কুচিকিৎসার

ফলে এই রোগ মূত্রনালী বাহিয়া ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে এবং সাধারণতঃ দুই সপ্তাহের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে মূত্রনালীর পশ্চাতের অংশ, প্রষ্টেট, শুক্রকীটবাহী নল, এপিডিডাইমিস, অণ্ডকোষ প্রভৃতি আক্রান্ত হয় ও তাহার জন্য নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতন গনোরিয়া বা গ্লীটের (Chronic Gonorrhoea or gleet) অবস্থা দাঁড়াইয়া যায়—ইহাতে কিছুদিন পর্যন্ত অল্পবিস্তর স্রাবের সহিত মাঝে মাঝে প্রস্রাবে সামান্য জ্বালা ভিন্ন অন্য কোনও লক্ষণ থাকে না। গ্লীটে সাধারণতঃ পাতলা লালার ন্যায় স্রাব হয়, কখনও কখনও বা এত কম স্রাব হয় যে, বাহিরে কোন স্রাবই দেখা যায় না, কেবলমাত্র মূত্রনালীর মুখ আঠার ন্যায় জুড়িয়া যায় অথবা সমস্ত রাত্রি

৩৩নং চিত্র

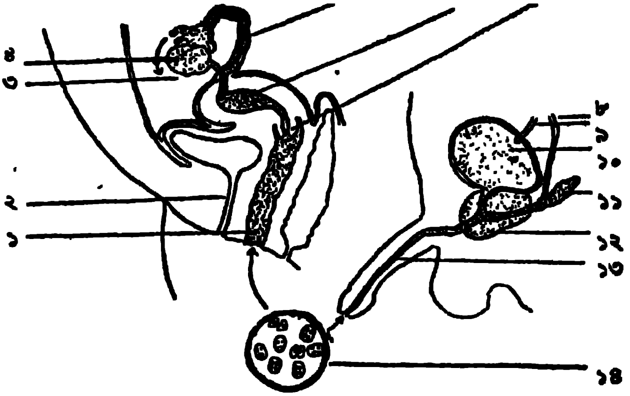

নারীপুরুষের জননেন্দ্রিয়ে গণোরিয়ায় আক্রান্ত স্থানসমূহ

১। যোনিপথ, ২। মূত্রনালী, ৩। তলপেটস্থ ঝিল্লীকোটর, ৪। ডিম্বাশয়, ৫। ডিম্ববাহী নল, ৬। জরায়ু, ৭। জরায়ুমুখ, ৮। শুক্রবাহী নল, ৯। ইউরেটার, ১০। মূত্রাশয়, ১১। বীর্যস্থলী, ১২। প্রষ্টেট গ্রন্থি, ১৩। মূত্রনালী, ১৪। গনোবীজ।

জমা হওয়ার পর সকালে মূত্রনালী টিপিলে লিঙ্গের মুখ হইতে সামান্য মাত্রায় স্রাব বাহির হয়। এই অবস্থাতেও রোগী অন্যকে সংক্রমিত করিতে পারে। ক্রমশঃ রক্তপ্রবাহের সহায়তায় এই রোগবীজাণু শরীরের নানা অংশ আক্রমণ করে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অস্থিসন্ধিপ্রদাহ (Gonorrhocal arthritis) ও অন্যান্য মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে।

এই রোগ কিছুদিন স্থায়ী হইলে বা পুনঃপুনঃ আক্রমণ ঘটিলে মূত্রনালী সরু হইয়া মূত্ররোধ ঘটায়। ইহা একটি ভয়ানক অবস্থা। শলাকা প্রয়োগ (Catheter) বা অস্ত্রোপচার ভিন্ন প্রস্রাব করানো যায় না।

পুরাতন রোগীর ধ্বজভঙ্গ দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক লক্ষণ—নারীর

পুরুষ অপেক্ষা নারীতে এই ব্যাধি অধিকতর দুশ্চিকিৎস্য। কারণ 'গনোকক্কাস' নারীর জননেন্দ্রিয়ে নিরাপদে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিতে পারে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের গঠনপ্রণালী এই রোগবীজের বাসের অত্যন্ত উপযোগী। প্রথমতঃ যোনিনালী হইতে অস্বাভাবিক স্রাব হইতে থাকে এবং প্রস্রাব করিবার সময়ে জ্বালা বোধ হয়, অঙ্গসমূহে ঘা হইতে পারে এবং কোমরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়। কখনও কখনও এই লক্ষণগুলি এত সুস্পষ্ট ও প্রবলভাবে দেখা দিয়া থাকে যে, স্রাব ও বেদনা রোগিণীকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু একটু বেশী পরিমাণ স্রাব হওয়া ছাড়া সে আর কিছু লক্ষ্য করে না এবং উহাকে শ্বেতপ্রদর মনে করিয়া চিকিৎসার কথা ভাবে না।

এই মারাত্মক বিষবীজ ক্রমশ জরায়ু, ডিম্ববাহী নল, এমন কি ডিম্বকোষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই অবস্থায় সন্তান প্রসব হইলে সন্তানের চক্ষে গনোবীজ লাগিতে পারে। ইহাতে সন্তানের 'চোখ উঠিয়া' থাকে এবং ফলে, হয় সে কয়েক দিনের মধ্যে অন্ধ হয়, না হয় তাহার দৃষ্টিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ হইয়া থাকে।

শিশু ও গনোরিয়া

গনোরিয়া বংশগত (Hereditary বা Congenital) রোগ নয় অর্থাৎ গর্ভে শিশুর শরীর জন্মের পূর্বেই উহার আক্রমণ হয় না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বীজাণু শিশুকে আক্রমণ করিতে পারে। মাতার গনোরিয়ার পুঁজ প্রসবের সময়ে শিশুর চক্ষুতে লাগিয়া প্রদাহ হওয়ার ফলে আঁতুড়েই অন্ধ হইবার উদাহরণ অসংখ্য। এই তথ্য না জানিয়া লোকে এইরূপ শিশুদের 'জন্মান্ধ' বলে।

জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের চোখে **সিলভার নাইট্রেটের ফোঁটা** দিলে উহা নিবারিত হয়। মাতা, পিতা, ধাত্রী, নার্স ইত্যাদির এটা মনে রাখা উচিত। আক্রান্ত স্থল হইতে **হস্তাঙ্গুলীর মারফতে ঐ বীজাণু** নিজের বা অপরের চক্ষুতে পৌছিতে পারে।

গনোরিয়াগ্রস্ত মাতা, পিতা, ধাত্রী, নার্স, চাকর, চাকরাণী ইত্যাদির অসাবধানতার জন্য বা দূষিত দ্রব্য ব্যবহারে এবং কোন কোন সময় গনোরিয়া রোগীর কুসংস্কারের জন্য* বহু বালিকাশিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহাদের যোনি ও যোনিপথের প্রদাহ (Gonorrhocal vulvo-vaginitis) প্রধান ও প্রায় একমাত্র লক্ষণ। চক্ষু আক্রান্ত হইয়া অক্ষিগোলক আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ (Gonorrhocal conjunctivitis) দেখা যায়। সৌভাগ্যের বিষয় শিশু বালিকার যোনি ও যোনিনালীর প্রদাহের চিকিৎসা অনেকটা সহজসাধ্য—অন্যান্য চিকিৎসার সহিত একপ্রকার স্ত্রী হরমোন (Eollicular hormone) প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বন্ধ্যত্বের প্রধান কারণ

গনোরিয়া যাহাদিগকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে, মানবজাতির সৌভাগ্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রজননশক্তি হারাইয়া ফেলে। অন্যথা জন্মের সময় মাতার গনোরিয়ার পুঁজ শিশুর চক্ষে লাগার ফলে পৃথিবীতে জন্মান্ধের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত।

গনোরিয়া বন্ধ্যত্বের একটা প্রধান কারণ। এই রোগগ্রস্ত পুরুষদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৭ হইতে ২৫ জন পর্যন্ত বন্ধ্য হইয়া পড়ে। এপিডিডাইমিস ও শুক্রকীটবাহী নলে প্রদাহ জন্মাইয়া এই রোগ পুরুষের শুক্রকীট নিষ্ক্রান্ত হইবার পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে এবং শুক্রকীটের উর্বর করিবার শক্তিও নষ্ট করিতে পারে। এই রোগগ্রস্ত নারীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ জন সম্পূর্ণ বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

রোগ নির্ণয়

প্রস্রাবের কিছুটা লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া বীজাণু আছে কিনা লক্ষ্য করিতে হয়। পুরাতন রোগে পরীক্ষা একটু দুঃসাধ্য, কারণ কোনও সময়ে মাত্র অল্প সংখ্যক বীজাণু ধরা পড়িতে পারে।

মূত্রনালীর যে কোনও স্রাবই যে গনোরিয়াজনিত তাহা মনে করা ভুল হইবে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, চুলকানি ইত্যাদির জন্যও খানিকটা স্রাব

* অনেক জায়গায় এরূপ কুসংস্কার আছে যে, কুমারীসম্ভোগে পুরুষের গনোরিয়া রোগ সারিয়া যায়। ইহা মারাত্মক কুসংস্কার।

হইতে পারে এবং তাহার জন্যও চিকিৎসার দরকার হয়। এই জন্যই ডাক্তারী পরীক্ষা করাইয়া সঠিক রোগ নির্ণয় করিয়া লওয়া উচিত। পরীক্ষাপ্রণালী বা চিকিৎসার খুঁটিনাটি এখানে উল্লেখ করিবার অবকাশ নাই। মোট কথা, যত শীঘ্র পারা যায় উপযুক্ত এলোপ্যাথের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

চিকিৎসা

পূর্বে গনোরিয়ার চিকিৎসার জন্য **সময় ও ধৈর্যের** দরকার ছিল। কারণ, সারিতে অনেক সময় লাগিত।

পূর্বের মত এখন আর তীব্র ঔষধ ব্যবহার করিবার প্রথা নাই। উহার পরিবর্তে বীজনাশক নরম ঔষধ ব্যবহার করিয়াই ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রোটারগল (Protargol), সিলভার নাইট্রেট (Silver Nitrate), নিওসিলভোল (Neosilvol), পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (Potassium Permanganate), আরজিরল (Argyrol) ইত্যাদির ব্যবহার আজকাল প্রচলিত।

Gonoderm (Gonococcus Filtrate, Corbus-Ferry) ইন্‌জেকশন করিয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অনেক ডাক্তার বলেন। অল্পমাত্রায় কিছুদিন পর পর ইন্‌জেকশন করিবার ব্যবস্থা আছে। দেশীয় কারখানায় প্রস্তুত Vaccine'ও পাওয়া যায়। আধুনিক আবিষ্কারের ফলে সেবনের জন্য কয়েকটি ভাল ঔষধ পাওয়া গিয়াছে। Sulphapyridine, Sulphathiazole, Sulphadiazine ইত্যাদি নিউমোনিয়া, মেনিন্‌জাইটিস, গনোরিয়া প্রভৃতিতে ফলপ্রদ এবং বহুব্যবহৃত। M & B (693) অর্থাৎ সাল্‌ফা পাইরিডিন এবং M & B (760) ট্যাবলেট ব্যবহারে প্রায় এক সপ্তাহে আরোগ্য হয়।

তবে সর্বদা চিকিৎসকের উপদেশ ও নির্দেশ মত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। রোগের কোন্ অবস্থায়, কি ভাবে, কতদিন পর্যন্ত কোন্ ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা উপযুক্ত চিকিৎসক ঠিক করিয়া দিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত রোগ সর্বতোভাবে না সারিয়া যায় ততদিন পর্যন্ত উহার পরামর্শমত চিকিৎসা চালাইতে হইবে। নিজের খেয়ালমাফিক ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ সেবনে ফল খারাপ হইতে পারে। চিকিৎসার সময় মদ্যপান ও দেহমিলন নিষিদ্ধ।

পেনিসিলিনের আবিষ্কার

গত মহাযুদ্ধের কালে (১৯৩৯-৪৫ খ্রীঃ) গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারসমূহের মধ্যে মধ্যে পেনিসিলিনের (Penicillin) আবিষ্কার একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ইহা

বহু রোগে এত আশু ফলপ্রদ যে, ইহাকে 'Wonder drug' বা 'বিস্ময়কর ঔষধ' বলা হয়। মানবকল্যাণে ইহা একটা যুগান্তকারী অবদান।

অধ্যাপক আলেক্জাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Flemming) ইহার আবিষ্কারক। কতকগুলি মারাত্মক বীজাণু ধ্বংস করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা পেনিসিলিনের আছে। স্টাফিলোককস ব্যাসিলি (Staphilococus bacilei) জনিত পচা ঘা, স্ট্রেপ্টোককস (Streptococus) ব্যাসিলি জনিত রক্ত বিষাক্ত হওয়া (Blood-Poisoning), নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, ডিপ্থেরিয়া, পৃষ্ঠব্রণ, গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগে ইহার ব্যবহার আশ্চর্যজনক-ফলপ্রদ। উপরোক্ত গন্ধক ঘটিত ঔষধগুলিতে (Sulfa drugs-এ) যে সব গনোরিয়া রোগী সারে নাই তাহারাও পেনিসিলিনে সারিয়াছে।

এই ঔষধটি ইন্‌জেক্‌শন করিয়া শরীরে প্রয়োগ করা হয়। গনোরিয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা পর পর ইন্‌জেক্‌শন দিয়া সাধারণতঃ ৪-৫ দিনে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র ৩০ ঘণ্টার মধ্যে নিরাময় করা যায়। অধুনা পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন প্রয়োগ বিধি সহজতর হইয়াছে এবং এক প্রকার দীর্ঘকাল ক্রিয়া-কারী পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গনোরিয়ার সম্বন্ধে একটা মস্ত বিপদ এই যে, উহা চিকিৎসা ব্যতিরেকে কখনও আপনা-আপনি সারিয়া যায় না; কেবল গুপ্ত বা লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। নারী ও পুরুষের এই অবস্থায় বিশেষ অসুবিধা হয় না বলিয়া উভয়ে উহাকে অবহেলা করিতে পারে ও করে। ইহাতে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়। এই রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থার কথা একটু পরেই আলোচনা করিতেছি।

সফ্‌ট শ্যাঙ্কার (Soft Chancre)

ইহাও এক প্রকার বীজাণুর (Streptobacillus of Ducrey) আক্রমণের ফল। এই বীজাণু ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কর্তার নাম ডুক্রে (Ducrey)। এই ব্যাধিতে লিঙ্গ প্রদেশে ঘা হয়, ক্ষত লাল হয়, পুঁজ রক্ত পড়ে এবং ক্ষতের ধার নরমই থাকিয়া যায়। সংক্রমণের তিন দিন হইতে পনর দিনের মধ্যে এই ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। কুঁচকিতে দবল হওয়া (গ্রন্থিস্ফীতি), বা দূষিত হইয়া যাওয়া, তন্তসমূহের প্রদাহ ইত্যাদি নানাভাবে এই ব্যাধি প্রকাশ পায়। ইহা সাধারণতঃ মারাত্মক হয় না এবং অল্পেই সারিয়া যায়;

কিন্তু অবহেলা করিলে বা আক্রমণ প্রবল হইলে নানারকম উপসর্গ দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। ক্ষতগুলিতে পুঁজ ও দুর্গন্ধ হয় ও বেশ বেদনা বোধ হয়। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না করিলে ক্ষতগুলি বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং গুহ্যদ্বার পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। দুই-চারি ক্ষেত্রে সমস্ত লিঙ্গ পচিয়া যাওয়ার কথাও শোনা যায়।

দূষিত অঙ্গ সংযোগেই (সহবাসে) সচরাচর এই ব্যাধির সংক্রমণ হয়। ঘা সংক্রামক হইলেও লিঙ্গ প্রদেশেই সাধারণতঃ ইহার প্রকোপ বেশী দেখা যায়। লিঙ্গদেশে সদ্য দূষিত কাপড়-চোপড়ের সংস্পর্শেও এই রোগ হইতে পারে।

সুচিকিৎসা হইলে দুই সপ্তাহের মধ্যে এই সকল ক্ষত একেবারে শুকাইয়া বা একেবারে সারিয়া যায়। আধুনিক আবিষ্কার সালফানিল্যামাইড (Sulphanilamide) মলম ইহার একটি চমৎকার ঔষধ। এই মলমের ব্যবহার এবং এই রোগের বীজাণু হইতে প্রস্তুত ইন্‌জেক্‌শন দ্বারা চিকিৎসা হইয়া থাকে।

উপদংশ বা সিফিলিস (Syphilis)

ইতিহাস—উপদংশ যেন সভ্যতারই সহচর। অনেকের বিশ্বাস এই যে, ১৪৯২ সালে কলম্বস প্রমুখ আমেরিকা-আবিষ্কারকেরা তথা হইতে এই ব্যাধি বহন করিয়া আনিয়া স্পেনদেশে প্রথম ছড়াইয়া দেন। ইহার পরে উহা ইউরোপে ও ইউরোপীয়দের সঙ্গে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ইহাদের মারফতেই ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস এবং এই জন্যই আয়ুর্বেদে উহাকে **'ফেরঙ্গ রোগ'** বলা হইয়া থাকে। গনোরিয়ার মত এই রোগের ইতিহাস তত পুরাতন নয়।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহা বহু পুরাতনকাল হইতেই ছিল এবং মাত্র সময়ে সময়ে ইহার ভীষণ প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে। ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। বাইবেল (ওল্ডটেস্টামেণ্টে) (Scourge of Baal peor) নামে বোধ হয় ইহার উল্লেখ আছে।

কিরূপে হয়

এই রোগ একপ্রকার কীটাণু ট্রেপোনিমা বা স্পাইরোকীটা প্যাল্লিড্যম (Treponema বা Spirocheta pallidum) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। চর্মের যে স্থান কাটিয়া, ছড়িয়া বা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেই স্থান দিয়া ইহা শরীরে প্রবেশ করে। ইহা রক্তের ভিতর দিয়া চলাফেরা করে এবং শরীরের অথবা

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর (Mucus membrane-এর) মধ্য দিয়া যে কোনও অংশ বা এমন কি অস্থি পর্যন্ত আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে।

উপদংশগ্রস্ত পুরুষ ও রমণীর সহিত সহবাসই এই রোগের সর্বপ্রধান কারণ। শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রেই এইরূপ সহবাসে উপদংশ হয়। ইহা ছাড়া রোগীর উচ্ছিষ্ট খাইলে বা তাহার কাপড়চোপড়, চিরুনি, সাবান, গেলাস, বিছানা ব্যবহার করিলেও সংক্রমণ হইতে পারে। সাধারণতঃ রোগী বা রোগিণী সহবাস স্বীকার না করিয়া এই সমস্ত উপায়ে হইয়াছে বলে।

প্রথম অবস্থা (Primary Stage)

সংক্রমণের পর লাল শক্ত দানার মত সিফিলিসের পিড়কা বা ফুস্কুড়ি (Nodule বা Hard Chancre) ১০ হইতে ৫৬ দিনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে—সাধারণতঃ তৃতীয় সপ্তাহেই হার্ড শ্যাঙ্কারের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়। এই পিড়কা প্রধানতঃ পুরুষের লিঙ্গমুণ্ড বা শিশ্নাগ্র-আবরক ত্বকের ভিতরে এবং নারীর বৃহদোষ্ঠের ভিতরগাত্রে বা ক্ষুদ্রোষ্ঠে প্রকাশ পায়। পুরুষের অণ্ডকোষের থলিতে ও লিঙ্গগাত্রের যে কোনও স্থানে, নারীর জরায়ুমুখ ও মূত্রনালীর মুখ এবং উভয়ের কামাদ্রি ও তলপেটেও প্রাথমিক পিড়কা দেখা দিতে পারে। ইহা ভিন্ন শরীরের যে কোনও স্থানে, বিশেষ করিয়া ঠোঁটে, স্ত্রীলোকের স্তনের নীচে, গুহ্যদ্বারে, এমন কি মাথা, নাক, মুখ, গলা, হাত ও পা—সর্বত্রই ইহা হইতে পারে। স্তনে ও গুহ্যদ্বারে সাধারণতঃ অস্বাভাবিক মৈথুনের জন্য, ঠোঁটে ও যৌনাঙ্গে চুম্বনের জন্য, ওষ্ঠাধার বা জিহ্বায় উপদংশ রোগীর ব্যবহৃত পাত্রে পান-ভোজনাদির জন্য এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে নানা কারণে উহা প্রকাশ পাইতে পারে। ২-৩ দিনে উক্ত পিড়কা ক্রমশ বাড়িয়া মটরদানার মত হয় এবং গলিয়া গিয়া ক্ষত সৃষ্টি করে। এই ক্ষত দুই প্রকারে প্রকাশ পাইতে পারে: (১) সামান্য উঁচু, শক্ত, ছোট পিড়কার মত—সাধারণতঃ ঘা হয় না এবং বেদনা বা জ্বালা না থাকায় রোগী ইহাকে অবহেলা করিয়া থাকে, তবে অত্যধিক ঘর্ষণে ঘা হইতেও পারে। (স্ত্রীলোকের হার্ড-শ্যাঙ্কার সাধারণতঃ এইভাবেই আত্মপ্রকাশ করে এবং লুক্কায়িত স্থানে বেশী হয় বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগিণী এ সম্বন্ধে কিছু জানিতেই পারে না। (২) ক্ষত—ইহাতে সাধারণতঃ কোন পুঁজ-রক্ত থাকে না, সামান্য রস নির্গত হয় এবং ক্ষতের চারিদিক শক্ত হইয়া উঠে। এই রস বিশেষ প্রক্রিয়ায় অণুবীক্ষণ

দ্বারা পরীক্ষা করিলে কীটাণু (T. Pallidum) দেখা যাইতে পারে এবং রক্ত-পরীক্ষা ব্যতীতও নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণীত হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় চিকিৎসা আরম্ভ করিলে অল্পদিনের চিকিৎসাতেই রোগ সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া যায়। অতএব সিফিলিসের ক্ষত প্রকাশ পাইবামাত্রই অথবা সন্দেহস্থলেও উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া অবিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। সুচিকিৎসা না হইলেও এই ক্ষত বা ক্ষাটল আপনা হইতেই শুকাইয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, বীজাণু রক্তপ্রবাহের সহিত মিশিয়া কায়েমীভাবে বসবাস আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় অবস্থা (Secondary Stage)

সর্বশরীরে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও বক্ষে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভেদ বা র‍্যাশ (Rash)—গোলাপী দাগ (Spots), উচ্চ লাম্প দাগ এবং ব্রণের মত উদ্ভেদ-সমূহ (Eruptions) দেখা দেয়। উহাদের বর্ণ ক্রমশ ফিকা হইয়া গেলে ধূসর বর্ণের দাগ থাকিয়া যায়। যে সব স্থানের চর্ম আর্দ্র থাকে (যথা—মুখ, গলা ও যৌনাঙ্গের ভিতর) তথায় উচ্চ মোটা চাপড়াসমূহ (Patches) বাহির হয়। ইহাদের কন্‌ডাইলোম্যাটা (Condylomata) বলে। সেগুলি হইতে অতিশয় সংক্রামক রস নিঃসৃত হয়। সংক্রমণের ৪০ দিন পরে জ্বর হইতে পারে। এক হইতে দুই মাসের মধ্যে কুঁচকিতে বেদনাসহ গ্রন্থিস্ফীতি (বাঘী বা Bubo) হইতে পারে। পেশী ও অস্থিসন্ধিসমূহে বেদনা, শিরঃপীড়া, রক্ত-হীনতা, ক্লান্তিবোধ, কামলা বা ন্যাবা (Jaundice), ক্ষীণ-স্মৃতি ও প্লীহাস্ফীতি হইতে পারে; চুল শুষ্ক ও ভঙ্গপ্রবণ হয় এবং সহজে পড়িয়া যায়। নখগুলিও ভঙ্গপ্রবণ হয় এবং তাহাদের খাঁজে ঘা হয়।

টনসিল ও নরম তালুতে (Soft Palate-এ) শ্লেষ্মার চাপড়া হয় এবং সেখানে অনেকগুলি ছোট অগভীর ক্ষত (Superficial 'Snail track' ulcers) দেখা যায়। কখনও কখনও অস্থিগুলিতে ভ্রাম্যমাণ (রাত্রে বর্ধনশীল) বেদনা হয়। একটি বা উভয় চক্ষুর প্রদাহ বা আইরাইটিস (Iritis) হইতে পারে; তখন দৃষ্টিক্ষীণতা, চক্ষে বেদনা এবং আলোক অসহ্য হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অবিলম্বে সুচিকিৎসা না হইলে রোগী অন্ধ হইয়া যায়। কখনও কখনও জানু-সন্ধিতে বেদনাহীন স্ফীতি হয়। বিরল ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের প্রদাহ বা

মায়েলাইটিস (Myelitis) হয়। ইহার ফলে হঠাৎ পেশীগুলির পক্ষাঘাত হইতে পারে। এই অবস্থা দেড় হইতে আড়াই বৎসর যাবত থাকে।

৩য় অবস্থা (Tertiary Stage)

সাধারণতঃ ইহা রোগ সংক্রমণের দুই হইতে দশ বৎসরের মধ্যে আরম্ভ হয়। তবে ইহার (নিম্নলিখিত) লক্ষণসমূহ ছয় মাসের মধ্যে দেখা দিতে পারে। এই সময়ের কোন নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত (absolute) ঊর্ধ্ব সীমা নাই।

যাহাদের অভাবজনিত কষ্ট, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং রোগ ভোগের জন্য দুর্বলতা ও জীবনীশক্তি হ্রাসের জন্য রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে বিশেষতঃ তাহাদের এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

এই তৃতীয় অবস্থার বিশেষত্ব হইল চর্ম, অস্থি, পেশী কিংবা শরীর যন্ত্রগুলির বরাবর বা ক্রনিক (Chronia) প্রদাহিত অবস্থা।

এই সকল স্থানে কঠিন, বেদনাহীন অর্বুদের মত স্ফীত মাংসপিণ্ডসমূহ উঠে। ইহাদের স্থিতিস্থাপক বিশেষত্বের জন্য ইহাদিগকে গ্যমা (Gumma) বলে। এগুলি ক্রমশঃ নরম ও তরলীভূত হইয়া ক্ষতে পরিণত হয়। ইহাদের চতুষ্পার্শ্বের মাংস নষ্ট হইবার পূর্বে সুচিকিৎসা হইলে এগুলি শীঘ্র সারিয়া যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল ক্ষত পায়ে, বিশেষতঃ জানু প্রদেশে, দেখা যায়। তাহাদের কিনারাগুলি কাটা কাটা দেখায় ও তাহাদের তলদেশ দানাদার বোধ হয় এবং সেগুলি হইতে ঘন পুঁজের মত পদার্থ নির্গত হয়। সেগুলি সারিয়া গেলে গোল অথবা ডিম্বাকার অল্প গভীর চিহ্ন থাকিয়া যায়। প্রায়শ এই চিহ্নগুলি চর্মের বর্ণ অপেক্ষা গাঢ়তর বর্ণের (Pigmented) হয়।

জিহ্বা, নাসিকা ও গলদেশে (Larynx-এ) এই প্রকার যে অর্বুদসমূহ (Gummata) হয়, সেগুলি হইতে উৎপন্ন ক্ষত বিশেষভাবে চতুষ্পার্শ্ব ধ্বংসকারী। ইহাতে নাকের উপরের হাড় ধসিয়া যায় (গন্নাকাটা হয়) এবং গলদেশে হইলে ইহাতে জীবন সংশয় হইতে পারে।

চতুর্থ অবস্থা বা নিউরোসিফিলিস (Neurc-Syphilis)

রোগ সংক্রমণের ২০-২৫ বৎসর পরে এই অবস্থা আসিতে পারে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে মস্তিষ্ক বিকৃতি কিংবা পক্ষাঘাত (General Paralysis of the insane, সংক্ষেপে G. P. I) এবং স্নায়ুরজ্জু বা সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord) আক্রান্ত হইলে হাঁটার সময় ঠিকভাবে পা না পড়া বা লোকোমোটর

অ্যাট্যাক্সি (Locomotor ataxy) এবং তাহার ফলে ভূমিতে পতন ও মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

বংশানুক্রমে এই রোগ পুত্রে এবং পৌত্রে সংক্রমিত হইতে পারে।

রোগ নির্ণয়—প্রাথমিক পিড়কা বাহির হইবার ১৫ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে 'ভাসারমান রি-এ্যাকশন' (Wasserman Reaction) নামক রক্ত পরীক্ষা দ্বারা সাধারণতঃ রোগ নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় এবং জন্মগত (Congenital) প্রায় সবক্ষেত্রেই এই পরীক্ষায় রোগ ধরা পড়ে।

শিশুর জন্মগত রোগ (Congenital Syphilis)

পিতা বা মাতার উপদংশের দরুন জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের শরীরে প্রাথমিক ক্ষত বা ফাটা দেখা দেয় না এবং বুঝাই যায় না যে, উহার শরীরে সংক্রমিত হইয়াছে। কিন্তু ছয় মাস বা বৎসর খানেকের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া বসে। দুই-এক ক্ষেত্রে যৌবনপ্রাপ্তির সময় পর্যন্ত বীজাণু লুক্কায়িত থাকিয়া যাইতে পারে। ফলতঃ গনোরিয়া ও সিফিলিস প্রত্যহ বৃদ্ধিলাভ করিয়া মানবের গুরুতর ক্ষতি করিতেছে। ডাঃ উইনফিল্ড স্কটপিউ উপদংশ বিষয়ে একটি প্রবন্ধে ইহার সংক্রমণশীলতার বহু উদাহরণ দিয়াছেন।

গর্ভের উপর সিফিলিসের প্রভাব—(ক) যদি গর্ভধারণের পূর্বে মাতার শরীরে এই রোগ আসিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায় ৭৫% ক্ষেত্রে গর্ভপাত অথবা অকাল প্রসব হয়। বিষের তেজ যেরূপ কমিয়া আসিতে থাকে, সেরূপ পরবর্তী গর্ভসমূহের স্থিতিকাল ক্রমশ বাড়িতে থাকে এবং শেষে পূর্ণ সময়ে মৃত অথবা রুগ্ন সন্তান প্রসব হয়। পরে এই রোগ হইতে মুক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও বাঁচিয়া থাকে।

(খ) যদি মাতা গর্ভধারণের সময়েই সিফিলিস দ্বারা সংক্রমিত হয়, তাহা হইলে ভ্রূণ, হয় মাতা হইতে নতুবা সাক্ষাৎভাবে পিতার শুক্র হইতে, এই রোগগ্রস্ত হয় এবং অকালে প্রসূত হয়।

(গ) যদি গর্ভের প্রথম দিকে মাতা সংক্রমিত হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ ভ্রূণও তদ্রূপ হয় এবং অচিরে অথবা বিলম্বে গর্ভপাত (বা মিস্‌ক্যারেজ) হইয়া যায়।

(ঘ) গর্ভের যত শেষের দিকে মাতার এই রোগ হয়, ততই গর্ভস্থ শিশুর এই রোগ হইতে পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা থাকে।

ডাঃ পিউ বলিয়াছেন যে, উপদংশদুষ্ট দম্পতির ভাবী সন্তানের সম্ভাবনা থাকিলেও শতকরা ৮০টি গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় ; অবশিষ্ট ২০টির মধ্যে ১০টি বাঁচিয়া গেলেও তাহারা পঙ্গু ও নিতান্ত অকর্মণ্য হইয়া জীবনধারণ করে। এই রোগের ভয়াবহতা এক সময়ে কলেরা ও বসন্ত অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে ইহার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের অনেকটা সুব্যবস্থা হইয়াছে। এই রোগের ইতিহাসে নিম্নলিখিত আবিষ্কারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) ১৯০৫ সালে ইহার বীজাণু হোফম্যান ও শাউডিন (Hoffman and Schaudinn) নামক জার্মান বৈজ্ঞানিকদ্বয় দেখিতে পান ও তাহার নাম দেন স্পাইরোকীটা প্যাল্লিডা (Spirochaeta Pallida)।

(২) ১৯০৭ সালে রক্তে এই বীজাণু দেখিবার নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা জার্মান বিজ্ঞানী ভাসারমান (Wassermann) আবিষ্কার করেন। তাই ইহাকে ভাসারমানের পরীক্ষা (Wassermann Test বা সংক্ষেপে W. R.) বলে। কিছু পরে কাআন (Kahn) নামে অপর একজন জার্মান আর এক প্রকার পরীক্ষা বাহির করেন। তাহার পদ্ধতিকে Kahn Test বলে।

(৩) ১৯১০ সালে ইহার উৎকৃষ্ট (ইন্‌জেক্‌শনের) ঔষধ জার্মান বিজ্ঞানী এয়্যারলিশ (Ehrlich) বাহির করেন ও তাহার নাম দেন সালভারশন (Salvarsan)।

(৪) ১৯৪৩ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Flemming) কর্তৃক যে নানা দুষ্ট বীজাণু গঠিত বিবিধ সাংঘাতিক রোগের ঔষধ পেনিসিলিন (Penicillin) ইন্‌জেক্‌শন আবিষ্কৃত হয় তাহা যে ইহার তরুণ (প্রথম ও দ্বিতীয়) অবস্থায় প্রায় অব্যর্থ ঔষধ তাহা কয়েক বৎসর পরে জানা যায়।

উপদংশ একবার হইলে আর হয় না বলিয়া একটি ভ্রমাত্মক বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেকে পরে নারীসংসর্গে অসাবধান হইয়া পড়ে। ইহা মারাত্মক ভুল।

সফ্‌ট শ্যাঙ্কারের সঙ্গে উপদংশের (হার্ড শ্যাঙ্কারের) পার্থক্য :

সফ্ট শ্যাঙ্কার	উপদংশ
১। ঘায়ের কিনারা নরম	১। উহা শক্ত।
২। সহবাসের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফোস্কা দেখা যায়।	২। উহা সাধারণতঃ ২-৩ সপ্তাহের পর দেখা দেয়।
৩। ঘায়ে পুঁজ ও গন্ধ হয়।	৩। পুঁজ ও গন্ধ হয় না।
৪। ঘা বেদনাদায়ক।	৪। বেদনা হয় না।
৫। ঘা একাধিক।	৫। ঘা সাধারণতঃ একটি মাত্র
৬। ঘা ছড়াইয়া বা বাড়িয়া যায়।	৬। ঘা ততটা বাড়ে না।

কতক কতক ক্ষেত্রে উভয় রকম রোগই একসঙ্গে হয় এবং সাধারণ লোক বা অর্ধ ডাক্তারদের পক্ষে পার্থক্য ধরা সহজ হয় না। রক্ত বিশ্লেষণ করিলে প্রকৃত ব্যাপার বুঝা যায়। উপযুক্ত ডাক্তার দেখানো উচিত।

চিকিৎসা

উপদংশ রোগীর চিকিৎসা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসায় প্রধানতঃ সেকো বিষ (Arsenic), বিস্‌মাথ (Bismuth), বেনজোল (Benzol) ও পারদ (Mercury) হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার ইন্‌জেকশনাদি এবং আইওডাইড (Iodide) যথা—সালভারশন (Salvarsan or '606'), নিও সালভারশন (Neo-Salvarsan or '914') প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

পেনিসিলিনের আবিষ্কারের কথা গনোরিয়া প্রসঙ্গে বলিয়াছি। **উপদংশেও পেনিসিলিন নিশ্চিত ফলপ্রদ।** আমেরিকান নৌবিভাগ (Navy) উহার ব্যবহারই উপদংশের প্রধান চিকিৎসাপ্রক্রিয়া বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

পেনিসিলিন ব্যবহারে গর্ভিণীকে উপদংশের হাত হইতে রেহাই দিয়া গর্ভপাত হইতে উহাকে এবং উপদংশের সংক্রমণ হইতে সন্তানকে রক্ষা করা যায়। সন্তান উপদংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও উহাকে পেনিসিলিন দ্বারা নিরাময় করা যায়।

উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ এবং প্রয়োজনমত দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা করাইলে, তবেই এই রোগ সম্পূর্ণরূপে ভাল হইতে পারে। চিকিৎসার ফলাফল

ও রোগের পরিণতি বুঝিবার জন্ম মাঝে মাঝে রক্ত পরীক্ষা করানো উচিত। যত সকাল সকাল চিকিৎসা আরম্ভ হয়, ততই ভাল।

সুখের বিষয় এই যে, উপযুক্ত চিকিৎসকের হাতে এই রোগ সারিয়া যাইবারই কথা। হাতুড়ে কবিরাজ, হেকিম, হোমিওপ্যাথ প্রভৃতি এই রোগের কিছুই করিতে পারে না।

[রতিজরোগগুলির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়]

পুরুষদের যৌন-সংযোগের পূর্বে সমস্ত লিঙ্গ, বস্তিপ্রদেশ ও অণ্ডকোষের থলিতে বীজাণু প্রতিষেধক মলম * (30% Calomel ointment) ঘষিয়া লইয়া একটি উৎকৃষ্ট কনডম পরিয়া লইতে হইবে। ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবার পর (সামান্য কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করিয়া), অঙ্গ ছোট হইবার পূর্বে লিঙ্গমূলে কনডম টিপিয়া ধরিয়া সাবধানে বিযুক্ত হইতে হইবে।

বিযুক্ত হইবার পর কনডম উল্টাইয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব করা কর্তব্য—প্রস্রাব খুব বেগের সহিত করিতে হইবে এবং প্রস্রাবকালে মাঝে মাঝে মূত্রদ্বার টিপিয়া প্রস্রাবপ্রবাহ রোধ করিতে পারিলে খুব ভাল হয়।

তাহার পর সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষের থলি, পেরিনিয়াম, কামাদ্রি, উরুর উপরের অংশের ভিতর গাত্র এবং আরও যে যে স্থানে যোনি নিঃসৃত রস লাগিবার সম্ভাবনা, সেই সমস্ত স্থান খুব ভাল করিয়া, অন্ততঃ ৫ মিনিট ধরিয়া সাবান ও জল দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে। লিঙ্গমণির খাঁজ, লিঙ্গমণির ও চর্মের সংযোগস্থলে (Frenum) দুইপাশ ও চর্মের ভাঁজগুলির প্রতি বিশেষ করিয়া মনোযোগ দেওয়া দরকার। শুধু এই উপায়েই সফ্ট শ্যাঙ্কার (এবং কিয়ৎপরিমাণে উপদংশ) হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

সাবান ও জল দ্বারা ধৌতকার্য সমাধা হইলে সমগ্র প্রদেশটি কোন বীজাণু-নাশক লোশন দ্বারা (Pot· Parmanganate 1 in 1000. Lysol or Dettol—1 teaspoonful in a pint) ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ধৌত স্থানগুলি তোয়ালে দ্বারা ভাল করিয়া শুষ্ক করার পর চায়ের চামচের ১ চামচ পরিমাণ আরজিরল লোশন (Argyrol 10%) অথবা প্রোটারগল লোশন (Protargol 2%) লইয়া মূত্রনালীর ভিতর পিচকারী দ্বারা প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। যাহাতে লোশন মূত্রপথ হইতে বাহির হইয়া না আসিতে পারে, তজ্জন্য মূত্রদ্বার টিপিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং লিঙ্গের তলদেশ হস্ত-

* কয়েকটি মলমের formula পরে দেওয়া হইল।

দ্বারা চাপিয়া চাপিয়া লোশন যাহাতে মূত্রনালীর গোড়ার দিকে চালিত হয় সেই চেষ্টা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই লোশন কার্যকরী করিতে হইলে ব্যবহারের অল্পক্ষণ পূর্বেই প্রস্তুত করা দরকার। ইহা এবং পিচকারী ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইবে। লোশনের পরিবর্তে সে স্থলে Norgol জেলী অথবা Urosalv (C. D. C) জেলী ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই জেলীগুলি টিউবে থাকে এবং মূত্র-নালীতে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য বিশেষ নল টিউবের সহিতই পাওয়া যায়। লোশন বা জেলী যাহাই ব্যবহার করা হউক না কেন, অন্ততঃ ১৫ মিনিট মূত্রদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

ইহার পর ১ ড্রাম পরিমাণ ক্যালোমেলের মলম (30% to 33% Calomel ointment) লইয়া দশমিনিট কাল লিঙ্গের সমস্ত অংশ এবং অন্যান্য স্থানে (সাবান ব্যবহারের সময় যে যে স্থান উল্লিখিত হইয়াছে) ঘষিয়া ঘষিয়া লাগানো প্রয়োজন। খানিকটা মলম মূত্রদ্বারেও প্রবেশ করানো উচিত। যাহাতে মলমের সংস্পর্শ অনেকক্ষণ থাকিতে পারে এবং কাপড়ে দাগ না লাগে সেজন্য সমস্ত জায়গাটি অয়েল পেপার (oil paper) বা ওয়াক্স্ পেপার (wax paper) দ্বারা আবৃত রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় ৪-৫ ঘণ্টা থাকিবার পর প্রস্রাব করা বা পরিষ্কৃত হওয়া চলিবে।

সঙ্গমের পর প্রস্রাব করা, লোশন দ্বারা ধৌত করা, মূত্রনালীতে আরজিরল বা প্রোটারগল লোশন অথবা জেলী প্রবিষ্ট করানো **গনোরিয়া প্রতিষেধক** এবং সাবানজল ব্যবহার ও ক্যালোমেল মলম ব্যবহার **সিফিলিসের প্রতিষেধক। কনডম ব্যবহার সবগুলিরই আংশিক প্রতিষেধক।**

নীচে তিনটি মলমের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম ব্যবস্থাপত্রটি আমেরিকান সেনাবিভাগের (U. S. Army formula,) দ্বিতীয়টি আমেরিকার নৌবিভাগে ব্যবহৃত হয় (U. S. Navy formula) এবং তৃতীয়টি সহজলভ্য ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত করা যায়।

1. R/

Calomel—30 parts

Adeps Benzoatus—65 parts

White Bees Wax—5 parts

2. R/ Calomel—33 parts
Phenol—3 parts
Comphor—2 parts
Anhydrous Canolin—39 parts
Adeps Benzoatus—20 parts
Bees Wax—3 parts

3. R/ Calomel—30 or 33 parts
Unguentum Simplex B. P.110— parts

দূষিতযোনি সঙ্গমের (সন্দেহ স্থলেও) পূর্ব ও পরে প্রতিবারেই এতখানি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তবেই যৌনব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইহার কিছুটা কম হইলেও আশঙ্কা থাকিয়া যায়। **প্রতি সহবাসে এত সাবধানতা, পরিশ্রম, আশঙ্কা ও অর্থব্যয়ের কষ্ট অপেক্ষা কি যৌননিষ্ঠা পালন অধিকতর কষ্টকর ?** বিশেষতঃ, পতিতালয় প্রভৃতি যে সব স্থলে সংক্রমণের আশঙ্কা সর্বদাই রহিয়াছে সেই সকল স্থানেই এই সব প্রতিষেধক অবলম্বন অধিকতর অসুবিধাজনক। আজকাল আবার আর এক ধরনের রূপোপজীবিনী দেখা দিয়াছে—ইহারা আধুনিক শৌখিন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরের বড় রাস্তাগুলিতে, পার্কে, থিয়েটারে বা সিনেমায় শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, উপযুক্ত শিকার পাইলেই কোন হোটেল বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে গিয়া দেহপণ্যে অর্থোপার্জন করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বল্প বেতনের চাকুরী করে। যেমন, নার্স, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি এবং জীবিকানির্বাহের বা পরিবার পালনের পক্ষে বেতন যথেষ্ট না হওয়াতে উপরি রোজগার হিসাবে এই ব্যবসায় করিয়া থাকে ; অনেক সময় ইহাদের মধ্যে ভদ্রঘরের দুঃস্থা কুমারী, বিধবা, এমন কি, সধবাও দেখা যায়। যাহারা তীব্র রতিবাসনা থাকা সত্ত্বেও সঙ্কোচ, দুর্নাম বা রতিজ রোগের ভয়ে বেশ্যালয়ে যাইতে চাহে না, তাহারাই সহজে ইহাদের কুহকে পড়িয়া থাকে এবং ইহাদের দেহ ব্যবহারে এই সব রোগের সম্ভাবনা নাই এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কোনরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে না। কিন্তু তাহারাও উক্ত ব্যধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। কাজেই ইহাদের সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে—ইহাদের সহিত সংসর্গের ফলে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে এইরূপ দুই-চারিটি যুবকের কথা আমাদের

জানা আছে। আবার কোন একটি বিশেষ নারীর সহিত সহবাস করিয়া কোন একজন রোগগ্রস্ত হয় নাই, অতএব সেই নারীর দেহোপভোগে অপরেরও হইবে না, এই ধারণার বশবর্তী হইয়াও অনেকে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

নারীর পক্ষে প্রতিষেধক ব্যবস্থা

এতক্ষণ পুরুষের রক্ষা পাইবার উপায় সম্বন্ধেই বলিলাম। নারীর যৌনযন্ত্রের জটিলতাহেতু তাহার পক্ষে রোগগ্রস্ত পুরুষের সহবাস ঘটিলে যৌনব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। শুধু বীজাণুনাশক ট্যাবলেট, সাবান Calomel মলম বা ডুশ ব্যবহার করিলেই হইবে না। এইগুলি যে প্রক্রিয়ার ও যে সব যন্ত্রপাতি সহযোগে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা করা কোন নারীর পক্ষে নিজে নিজে (এমন কি স্বামীর সহায়তায়ও) সম্ভব নয়—বিশেষভাবে শিক্ষিত ধাত্রী বা চিকিৎসকের সাহায্য লইতেই হয়। যে সমস্ত নারীর বিশেষভাবে এই সব ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া দরকার (যেমন গৃহস্থ ঘরের কন্যা বা বধূ) তাহাদের পক্ষে প্রতি সহবাসের পর ধাত্রী বা ডাক্তার ডাকিয়া যৌন-অঙ্গসমূহ পরিষ্কৃত ও বীজাণুশূন্য করা সম্ভব নয়। কাজেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এ পুস্তকের পক্ষে অনাবশ্যক। একমাত্র স্বামী দেবতারা বিবেচক ও এ সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেই নিরপরাধ নিষ্পাপ বধূরা এ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। সহবাসের পূর্বে ও পরে সমস্ত ভাগে, বিশেষত মূত্রপথ ও যোনিপথে কোন বীজাণুনাশক বটিকা বা মলম (যথা, ৩০% ক্যালোমেল মলম) মাখাইয়া ও প্রবিষ্ট করাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ কনডম ব্যবহার করিয়া উপযুক্ত সাবধানতার সহিত বিহার করিলে অথবা নারী ফিমেলশীথ ব্যবহার করিলে রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু ইহা সর্বদা নিরাপদ নহে। লিঙ্গগাত্রে (গোড়ার দিকে), অণ্ডকোষের থলিতে বা কাছাকাছি কোন জায়গায় সিফিলিসের ক্ষত থাকিলে কনডমে কিছুই হইবে না।

শুধু চোখে দেখিয়া কাহারও রতিজ রোগ আছে কিনা কখনও বলা সম্ভব নয়। তবে "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" এই নীতি অনুযায়ী, বিবাহেতর মিলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আগে দেখা উচিত যে, অপর পক্ষের বস্তিপ্রদেশের কোথাও উপদংশের ক্ষত অথবা তাহার চিহ্ন আছে কিনা, আর মেয়েদের উচিত মিলনকামী পুরুষের অঙ্গের নীচের দিকের মূত্র-

নালীর গোড়ার দিক হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত টিপিয়া, টানিয়া দেখা (প্রেমক্রীড়ার স্থলে) যে, গনোরিয়ার পুঁজ বাহির হয় কিনা।

এতখানি আলোচনা করা হইল ইহাই দেখাইবার জন্য যে, যৌননিষ্ঠা রক্ষা করা শুধু যে সব চেয়ে নিশ্চিত প্রতিষেধক তাহাই নহে, ইহা সর্বাপেক্ষা সহজ প্রতিষেধক। যৌননিষ্ঠা সম্বন্ধে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

রতিজ রোগসমূহের ভয়াবহ প্রসার

কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্সে প্রত্যহ ১৪০০০ রতিজ রোগী চিকিৎসিত হইত। ইহা ছাড়া কত রোগী যে রোগ গোপন করিত বা গুপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। এই রোগসমূহে আক্রান্ত নরনারীর পেশার অনুপাত ছিল প্রায় ৩% সৈনিক, ৮% মজুর, ১৬·৫% চাকুরিজীবী এবং ব্যবসাজীবী, ২৫% ছাত্র, ২৬% হোটেল ও চায়ের দোকানের কর্মচারী। একশত জন রোগাক্রান্ত নরনারীর মধ্যে ৬৫ জন ভুগিতেছিল গনোরিয়ায়, ১৮ জন সফ্‌ট্ শ্যাঙ্কারে এবং ১৭ জন সিফিলিসে। **মদ্যপানহেতু অসাবধানতা ছিল এই সকল রোগের একটা প্রধান কারণ।**

আমেরিকায় জনস্বাস্থ্য-বিভাগের কার্যকলাপ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৮ সনের ১লা জুলাই হইতে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, বিবাহেচ্ছু যুবক যুবতীকে ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করিতে হইবে যে তাহাদের উপদংশ রোগ নাই। আইন উপদংশ রোগীর বিবাহ করা নিষিদ্ধ করিয়াছে।

নিউইয়র্ক এবং অন্যান্য ৯টি প্রদেশে ঐ সময়ে ১৯৩৮ খ্রীঃ পাত্র-পাত্রীকে ডাক্তারী সার্টিফিকেট লইয়া দেখাইতে হইত যে, তাহারা উপদংশ রোগাক্রান্ত নহে।

এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রাক্কালে অসংখ্য বিবাহ তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলা হইয়াছিল। আমাদের স্যর্দা আইনের অব্যবহিত পূর্বে অসংখ্য বাল্য-বিবাহ সারিয়া ফেলিবার মতই হুজুক পড়িয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, আমেরিকায় উপদংশ রোগের বিরুদ্ধে অভিযান বস্তুতঃই আন্তরিকতাপূর্ণ।

পাশ্চাত্য দেশে এ দেশ হইতে রতিজ রোগসমূহের প্রকোপ বেশী হইলেও এ দেশেও এই রোগসমূহের ক্রমবর্ধমান প্রসার ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতে

কয়েক বৎসর পূর্বে তদানীন্তন ডিরেক্টর জেনারেল অব মেডিক্যাল সার্ভিস সার জন্ মেগ্অ (Sir John Megaw) ভারতের গ্রামসমূহে কতকগুলি রোগের প্রকোপের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছিল যে, ভয়াবহ গনোরিয়া এবং সিফিলিস রোগীর সংখ্যা তখন ১'৩০'৯৬' ৩০০ ছিল। গ্রামেই যদি ইহাদের এত প্রাদুর্ভাব হয় তাহা হইলে লোকাকীর্ণ শহরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই সমস্ত রোগী আবার শুধু বসিয়া নাই, ইহারা রোগ ছড়াইতেছে; শুধু তাহাই নহে ইহাদের রোগ ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হইতেছে। এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিবার পূর্বে আমি আবার বলিতে চাই:

(১) যৌন-অসংযমের বিষময় পরিণামের কথা সকলকে মনে রাখিতে হইবে। উহার ফলে মানসিক অশান্তি, দুর্নাম, দুর্নীতির প্রসার, গর্ভভয় ইত্যাদি অপেক্ষা যাহা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ, তাহা রতিজ রোগসমূহ।

(২) আমাদের দেশে অজ্ঞতা, অবহেলা ইত্যাদির দরুন বারবনিতারা প্রায় ষোল আনাই গনোরিয়া ও সিফিলিসে আক্রান্ত। উপযুক্ত প্রতিষেধক অবলম্বন না করিয়া উহাদের সংসর্গে রতিজ রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা অত্যধিক। আমার অনেক বন্ধু মাত্র একবার শখ করিতে গিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছেন।

(৩) যদি দুর্ভাগ্যবশত সংক্রমণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, আক্রমণ প্রথমত যতই মৃদু মনে হউক না কেন, আপনা-আপনি সারিয়া যাইবার মত রোগ সিফিলিস বা গনোরিয়া নহে। মন্ত্র-তন্ত্র যেমন নিষ্ফল, তেমনই নিষ্ফল কবিরাজ, হেকিম ও হোমিওপ্যাথের চিকিৎসা এবং শতকরা নিরানব্বইটি বিজ্ঞাপিত ঔষধ। 'দৈব', 'অব্যর্থ', 'বিফলে মূল্য ফেরত', সন্ন্যাসী প্রদত্ত, স্বপ্ন লব্ধ ইত্যাদি বলিয়া পয়সা লুটিবার মত ব্যবসায়ী এদেশে অসংখ্য। সংবাদপত্র, পঞ্জিকা, পুস্তিকার পৃষ্ঠে বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিবেন না।

যে-কোনও পঞ্জিকা, সংবাদপত্র বা পত্রিকার পৃষ্ঠে ধন্বন্তরি গণেলা,

গণোবাম, গণোকিওর, গণোনিপাত, গণোরিয়া ধ্বংস ইত্যাদি বিজ্ঞাপন বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়। সিফিলিস সম্বন্ধেও তথৈবচ। আবার ঐ সকল ঔষধ চিরদিনের জন্য রোগ আরোগ্য করে এইরূপ আশ্বাস বা গ্যারান্টিও দেওয়া হয়। কিন্তু ইহারা এত সহজে সারিবার মত ব্যাধি নয়। আনন্দের বিষয়, ভারত সরকার কিছুকাল আগে আইন করিয়া যৌনব্যাধির এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

(৪) হাতুড়ে কবিরাজ, হেকিম, হোমিওপ্যাথ ও আধা-ডাক্তার এই সমস্ত রোগীকে লইয়া হাতড়ায় এবং নিজেদের পকেট ভারী করে মাত্র। সাময়িক প্রশমন মোটেই কর্তব্য নয়; কারণ সিফিলিস, গনোরিয়ার বিষ সমূলে উৎপাটিত না হইলে সারা জীবন উহার বিষময় ফলভোগ করিতে হইবে; শুধু নিজেরা নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও বিপন্ন হইবে।

(৫) জনসাধারণকে সাবধান করা এবং রোগীদিগকে সকাল সকাল চিকিৎসাধীনে লইয়া অধিকতর অমঙ্গলের হাত হইতে সমাজ ও শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্র গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন।

সুখের বিষয়, এদিকে আমাদের এখানেও কিঞ্চিৎ সাড়া দেখা যাইতেছে। কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে সোশ্যাল হাইজিন এক্সপোজিশন-এর এ্যাডভাইসরী বোর্ডের এক সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বাংলার গভর্নমেণ্ট এবং কলিকাতা করপোরেশন বিনামূল্যে রতিজ রোগসমূহের পরীক্ষা ও চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা করুন এবং ঐ রোগসমূহের উৎপত্তিস্থল ও কারণ নির্ণয় করুন। কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ইতিমধ্যেই গোপনে ও বিনামূল্যে এই সকল রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা পরম সুখের বিষয়। এই সম্বন্ধে 'ডিরেক্টর, সোশ্যাল হাইজিন—৮৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা', এই ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া অনুসন্ধান করুন। ঐ প্রস্তাবে ইহাও বলা হইয়াছে যে, শিক্ষাবিভাগ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে প্রাথমিক যৌনবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করুন। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করি। উক্ত বোর্ড Social Hygiene Welfare Board নামক স্থায়ী সাহায্যকেন্দ্র ও গবেষণাগারে পরিণত হইতেছে দেখিয়া আমরা ইহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

পাকিস্তানেও ঐরকম গবেষণা ও ব্যবস্থা হওয়া নিতান্ত দরকার।

(৩০)

অন্যান্য যৌনরোগ

(Other Sexual Disorders)

অসংযমের পরিণাম কতদূর ভয়াবহ হইতে পারে তাহা দেখাইতে গিয়া কয়েকটি রতিজ রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। কিন্তু নর ও নারীর যৌন-জীবনকে বিড়ম্বিত করিবার মত আরও বহু রোগ ও বিশৃঙ্খলা আছে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই পুস্তক চিকিৎসা পুস্তক নহে; চিকিৎসকের দায়িত্ব গ্রহণের মত যোগ্যতা ও ইচ্ছাও গ্রন্থকারের নাই।

এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান যৌনবিশৃঙ্খলার উল্লেখ করা হইতেছে। ইহাদের কতকগুলির আলোচনা এই পুস্তকেরই অন্যত্র এবং দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে। আমরা ঐ সকল আলোচনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। একই জায়গায় উহাদের সমাবেশ সুবিধাজনক হইলেও অসুবিধাও যথেষ্ট। কারণ, ঐসকল আলোচনা পূর্ববর্তী কথা বা পরবর্তী বিষয়বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট; বিযুক্ত করিয়া আনিলে বুঝিতে অসুবিধা হইবে।

পাঠক-পাঠিকা সূচীপত্র এবং বর্ণসূচী দেখিয়া আলোচনার সূত্র পাইবেন।

পুরুষের যৌনবিশৃঙ্খলা

(১) **অণ্ডকোষ সংক্রান্ত**—অণ্ডকোষ বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় মনে হইলেও উহা পুরুষের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যৌন-অঙ্গ। উহার আকার, অবস্থিতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ব এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে শুধু অণ্ডকোষের নানা রোগের আলোচনা করিতেছি:

(ক) **অণ্ডকোষ থলিতে না নামা।** ভ্রূণের অণ্ডকোষ দুইটি তলপেটে অবস্থান করে, কিন্তু জন্মের পূর্বেই উহারা থলিতে নামিয়া আসে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি বা উভয় অণ্ডকোষই থলিতে নামিতে পারে না। তলপেটে কুঁচকির গর্তে উহারা থাকিয়া যায়। এই অবস্থা কম হইলেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। সাধারণতঃ, সাবালক হইবার প্রাক্কালে উহারা আপনা হইতেই থলিতে নামিয়া আসে। না আসিলে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে নামাইয়া দেওয়া যায়। বিজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য লওয়া উচিত।

পিটুইটারী গ্রন্থির প্রভাবেই অণ্ডকোষ থলিতে নামিয়া আসে বলিয়া এখন জানা গিয়াছে। তাই ছোট বেলাতেই বালকের শরীরের পিটুইটারী গ্রন্থিরস প্রবিষ্ট (ইনজেক্ট) করাইয়াও ঐ অবস্থার প্রতিকার করা যায়। পিতামাতার এ বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত।

দুইটির মধ্যে একটিও থলিতে নামিয়া আসিলে পুরুষের শরীরের পুষ্টি বা পুরুষালী ভাবের কোন হানি হয় না। তবে যদি বয়ঃপ্রাপ্তির পর উভয় অণ্ডকোষ উপরেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে পুরুষের সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতা হারাইবারই কথা। কারণ শরীরের গরমে শুক্রকীট জন্মে না। শরীরের বাহিরের স্থিত অণ্ডকোষ শুক্রকীটের পক্ষে রেফ্রিজারেটারের তুল্য। উভয় অণ্ডকোষই থলিতে নামে নাই, এ রকম লোক কদাচিৎ দেখা যায়।

(খ) আবরক পর্দার ভিতরে রস জমা (কোরণ্ড বা কোষ বৃদ্ধি Hydrocele)। আবরক পর্দার ভিতরে রস জমিয়া যাওয়া খুব সচরাচরই ঘটে। এই অবস্থায় হাঁটিয়া চলিতে কষ্ট হয় এবং ভার বোধ হওয়ায় অস্বস্তি বোধ হইতে পারে। দৈহিক মিলনে খানিকটা অসুবিধা হইলেও সন্তান জন্মদানে অসামর্থ্য আসে না। তবে কোরণ্ড বেশী বড় হইয়া গেলে পুরুষাঙ্গের অনেকখানি ইহার ভিতরে ঢুকিয়া যায় এবং সে ক্ষেত্রে মিলন অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

আজকাল অস্ত্রোপচারে এই অবস্থার স্থায়ী প্রতিকার করা যায়। কথা এত সহজে পাওয়া যায় যে, এখনও অসংখ্য লোক কেন যে এই ভার বহন করিয়া বেড়ায় তাহা বুঝা কঠিন। অস্ত্রোপচার না করিয়াও কেবলমাত্র নল দিয়া রস বাহির করিয়া ফেলা যায়। ইহাতে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভ হয় মাত্র আবার জল ভরিয়া যায় ; সেইজন্য ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। উক্ত প্রক্রিয়ার সময় দুষ্ট বীজাণু সংক্রমণের ভয়ও আছে।

অবহেলা করিলে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে খুব বড়, ভারী এবং পরিশেষে শক্ত হইয়া অসুবিধা ও মাঝে মাঝে বেদনার সূচনা করিতে পারে।

ছেলেদের 'লেঙ্গুটি' বা ল্যাঙ্গোট পরিবার অভ্যাস করা উচিত,—বিশেষ করিয়া দৌড়-ঝাঁপ বা খেলাধূলার সময়। ইহাতে কোষদুটির ঝুলিয়া পড়া বন্ধ হয় এবং উহাদের উপর কম চাপ পড়ে।

(গ) থলির ফাইলেরিয়া (Filarial Scrotum)। ইহাতে থলির চর্ম বৃদ্ধি পাইয়া থলি বৃহদাকৃতি ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গের চর্মও

মোটা হইতে পারে এবং পুরুষাঙ্গের গোড়ার দিকের খানিকটা ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে পারে। অবস্থা গুরুতর দাঁড়াইলে যৌনমিলন সম্ভবপর হয় না। ইনজেকশন ও অস্ত্রোপচারে প্রতিকার করা যায়।

(ঘ) **অপরিণত অবস্থা (Infantilism)** বালকের অণ্ডকোষ কোনও কারণে অপরিণতই থাকিয়া যাইতে পারে। ইহা হইলে পুরুষের পূর্ণ পুরুষালী ভাব আসে না। যৌবনেও ইহারা দেহে মনে বালকদের মতই থাকিয়া যায়। নির্ণালী অন্তঃস্রাবী কোন গ্রন্থির ক্রিয়াবৈকল্যেই সাধারণতঃ এরূপ হয়। এরূপ অবস্থা হইলে দাম্পত্যজীবন সুখের হয় না। উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ লইলে এই অবস্থার উপশম হইতে পারে।

(২) **এপিডিডাইমিস সংক্রান্ত**—অণ্ডকোষে সন্নিবিষ্ট জড়ানো ও পেঁচানো নালিকাগুলিতে অণ্ডকোষে প্রস্তুত শুক্রকীটগুলি আসিয়া পড়ে এবং শুক্রকীটবাহী নল বাহিয়া শুক্রকোষে গিয়া সঞ্চিত হয়। এপিডিডাইমিস তাই প্রয়োজনীয় উপাঙ্গ।

এপিডিডাইমিস কতিপয় রোগে আক্রান্ত বা কোনও ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে উহার নল বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। **গনোরিয়া রোগেই** সাধারণতঃ উহাতে প্রদাহ হয় এবং শুক্রকীটের গতিপথ রুদ্ধ হয়। উভয় দিকেই এরূপ হইলে শুক্রকীট নিক্রান্ত না হইতে পারায় **পুরুষ বন্ধ্য হইয়া** পড়ে।

গনোরিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব অধ্যায়ে করিয়াছি।

(৩) **শুক্রকীটবাহী নল সংক্রান্ত**—এপিডিডাইমিস সম্বন্ধে যাহা বলা হইল শুক্রকীটবাহী নল সম্বন্ধেও তাহা খাটে। **গনোরিয়ায় এগুলি আক্রান্ত ও রুদ্ধ হয়।**

(৪) **পুরুষাঙ্গ বা শিশ্ন সংক্রান্ত**—ইহা সঙ্গমযন্ত্র এবং প্রস্রাবের পথ। যৌনজীবনে ইহার স্বাভাবিকতা ও স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অত্যধিক। ইহার নিম্নরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যায়ঃ

(ক) **অপরিণতি।** যৌবনেও ইহার অপরিণতি এবং বালসুলভ অবস্থা থাকিয়া যাইতে পারে। এরূপ হইলে উহার ক্ষমতা ও ক্রিয়ার হ্রাস হয় ও যৌনজীবনে অশান্তির কারণ উপস্থিত হয়।

সাধারণতঃ অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির ক্রিয়াবৈকল্যেই এরূপ হইয়া থাকে। উপযুক্ত ডাক্তার দেখাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত।

(খ) ক্ষুদ্রতা। ইহার বড়ছোট্টতা পরিমাপ সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহার আকারের তারতম্য খুবই হয়। সাধারণ অবস্থায় সচরাচর গ্রীষ্মকালে ২½ হইতে ৩½ ইঞ্চি লম্বা, শীতকালে আরও ছোট এবং উত্থিত অবস্থায় দৈর্ঘ্যে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি হইয়া থাকে। (এ বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের "অঙ্গের পরিমাপ ও কার্যকরিতা" অধ্যায় দেখুন।)

ইহার কিছু এদিক ওদিক হওয়াও স্বাভাবিক, সাধারণতঃ শরীর দীর্ঘ, হৃষ্টপুষ্ট বা বলিষ্ঠ হইলেই যে ইহার আকার বড় বা বিপরীত অবস্থায় ছোট হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। লিঙ্গের আকার বোধ হয় অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়ার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ইহা বড় হইলেই যে যৌনক্ষমতা বেশী বা ছোট হইলেই কম হইবে এমন নয়। বিপরীত অবস্থাও দৃষ্ট হয়।

নিজের অঙ্গের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে অনেকেই দুর্ভাবনা ভোগ করিয়া থাকেন। ইহার কোনও অর্থ নাই। লিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলেই যে যৌনজীবন যাপনে অসুবিধা হইবে তাহার কারণ নাই। উহার ক্ষমতা ও সদ্ব্যবহারই বড় কথা। তবে একেবারে অপরিণত বা বালসুলভ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। লিঙ্গের আকার সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে দুর্ভাবনা বহন না করিয়া ডাক্তারের অভিমত জিজ্ঞাসা করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রেই যে সন্দেহ অমূলক তাহা মনে রাখা উচিত।

(গ) বক্রভাব। ইহার বক্রভাব অনেকের ভয়ের কারণ হয়। জন্মগত থাকিলে এবং তাহাতে অসামর্থ্য সূচিত না হইলে ভয়ের কোন কারণ নাই। আঘাতের ফলে হইলে চিকিৎসা করানো উচিত।

হেকীমগণ ইহাকে এবং লিঙ্গের দৃশ্যমান মোটা শিরাগুলিকে স্বমেহনের বিষম কুফল বলিয়া লোকদের মিথ্যা ভয় দেখাইয়া মালিশ ও সেবনের বাজে উত্তেজক ঔষধ দিয়া অর্থোপার্জন করে।

(ঘ) অগ্রচ্ছদ না খোলা বা মুদা (Phimosis)। লিঙ্গাগ্রের আবরক চামড়া (অগ্রচ্ছদা) ঢিলা না হওয়ায় এরূপ অবস্থা হইতে পারে। উহা উপরের দিকে টানিয়া মুণ্ড বাহির করা যায় না। কখনও কখনও উহার ছিদ্র এত ছোট থাকিতে পারে যে, প্রস্রাব করাই মুশকিল হয়। ইহার উপর ঐ চামড়ার ভিতরে ময়লা বা রস জমিয়া জ্বালা-যন্ত্রণার সূচনাও করিতে পারে। গনোরিয়া প্রভৃতি রোগ হইলে এই অবস্থায় চিকিৎসাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

এই অবস্থার সবচেয়ে ভাল প্রতিকার ত্বকচ্ছেদ (Curcumcision)।

(ঙ) **অগ্রচ্ছদ খুলিয়া লিঙ্গগ্রীবা চাপিয়া ধরা বা উল্টা মুদা— (Paraphimosis)।** উপরে বর্ণিত অবস্থার উল্টা অবস্থাও হইয়া থাকে। ইহাতে অগ্রচ্ছদা খুলিয়া লিঙ্গগ্রীবা পেঁচাইয়া ধরে, আর লিঙ্গাগ্রের উপরে উহাকে ফিরাইয়া লওয়া যায় না। লিঙ্গগ্রীবার চাপ লাগিয়া মুণ্ডটি ফুলিয়া যায়। ইহাতে বেদনা উপস্থিত হয়। রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ায় বিষম আশঙ্কার কারণ হয়। এইরূপ হইলে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা উচিত। ত্বকচ্ছেদ যাঁহারা করান তাঁহারা এ উভয় উপদ্রব হইতে রক্ষা পান।

(চ) **লিঙ্গাগ্রের প্রদাহ (Balanitis)।** উপরোক্ত কারণে বা অপরিচ্ছন্নতার (সাদা ক্যাদা বা Smegma) দরুন লিঙ্গাগ্রের প্রদাহ হইতে পারে। প্রত্যেকবার প্রস্রাবের পর ও স্নানের সময় অগ্রচ্ছদা পিছনে টানিয়া মুণ্ডটি জলদ্বারা একটু রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। ত্বকচ্ছেদ এ অবস্থারও উপশম করে। যাঁহাদের ত্বকচ্ছেদ করা আছে তাঁহাদের এ সব উপদ্রব খুব কমই সহ্য করিতে হয়।*

(ছ) **ফাইলেরিয়া (Elephantiasis of penis)।** এই অবস্থায় পুরুষাঙ্গের চর্ম মোটা হইতে হইতে এত বড ও মোটা হয় যে, স্ত্রীসহবাস অসম্ভব হইয়া পড়ে। অস্ত্রোপচারে প্রতিকার সম্ভবপর।

(৫) **প্রষ্টেট গ্রন্থিসংক্রান্ত**—এই গ্রন্থির অবস্থিতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। শুক্রস্খলনে সাহায্য করে এবং শুক্রে নিজের রস যোগ করে বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। ঐ রস শুক্র-কীটগুলিকে সজীবতা দেয়। এই গ্রন্থির গোলযোগে নানারকম যৌনবিশৃঙ্খলা এবং প্রস্রাবের গোলযোগ দেখা দেয়। যৌন-অনাচার ও মূত্রপথের প্রদাহ ইহার অনিষ্ট করে।

(ক) **অস্বাভাবিক স্রাব (Prostatorrhoea)।** এইরূপ স্রাবকে প্রাচীন লোকেরা গনোরিয়া বলিয়া ভুল করিত। কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

---

* ম্যাগনাস হেয়ার সম্পাদিত যৌনবিশ্বকোষে বলা হইয়াছে: "These various complications resulting from a quite superfluous foreskin explain why a wise legislator instituted the prophylactic practice of circumcising children. A physician can only endorse this measure because, apart from the troubles just mentioned, a glans without foreskin offers more resistance to venereal infection," (italics mine).

(খ) প্রদাহ (Prostatitis)। সাধারণতঃ গনোরিয়া বীজাণুর আক্রমণেই এইরূপ হয়। মূত্রাধার ইত্যাদি হইতে সংক্রমণেও এইরূপ হয়। এইরূপ হইলে খুব বেদনা উপস্থিত হয়। আশু চিকিৎসা করানো কর্তব্য।

(গ) বৃদ্ধি (Enlargement of the prostate)। প্রষ্টেট আকারে বৃদ্ধি পায় সাধারণতঃ মধ্য বয়সের পরে (পঞ্চাশোর্ধ্বে)। এইরূপ হইলে প্রস্রাবে বাধা বা ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গও থাকে।

প্রস্রাবে বাধা জন্মিলে অনেক ক্ষেত্রে শলাকা (Catheter) দিয়া প্রস্রাব করাইতে হয়। অবস্থা গুরুতর হইলে অস্ত্রোপচার করিয়া সমস্ত বা খানিকটা প্রষ্টেট বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। এই অস্ত্রোপচারের নাম প্রষ্টেটেক্টোমি (Prostatectomy) অণ্ডকোষের অন্তঃস্রাবী রস (Testosteron বা Testicular hormone) দ্বারাও ইহার চিকিৎসা হইয়া থাকে। অনেক সময় শুধু হরমোন ইনজেকশনেই কাজ হয়—অস্ত্রোপচারের দরকার হয় না।

(৬) অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি সংক্রান্ত—এই সকল গ্রন্থি যে, সকল শরীরের কত প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করে তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ইহাদের ক্রিয়াবৈকল্য ঘটিলে শরীরে ও মনে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়।

এই সকল গ্রন্থির গোলযোগের সহিত শরীরের অপরিণত অবস্থায় থাকা বা অতিকায় ধারণ করা, যৌন-অঙ্গসমূহের অপরিণত অবস্থা এবং উহাদের অক্ষমতা, পুরুষত্বহীনতা, রতিজড়তা, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট। কোন গ্রন্থির কিরূপ গোলযোগ হইয়াছে তাহা উপযুক্ত ডাক্তার নির্দেশ করিতে পারেন।

গ্রন্থগুলির গোলযোগের প্রতিকার আবার গ্রন্থি-নির্যাস ব্যবহার করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়। এক প্রাণীর গ্রন্থি অন্য প্রাণীতে সংযোজিত (transplantation) করিয়াও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(৭) মূত্র সংক্রান্ত—(ক) বহুমূত্র (Diabetes)। বহুমূত্র সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতেই আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। বারে বারে ও বহু পরিমাণে মূত্রত্যাগ, পিপাসাধিক্য, শরীরের ওজন ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়াই এই রোগের পরিচয় পাওয়া যায়। অচিকিৎসিত থাকিয়া গেলে রোগীর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যায়।

ইংরেজ ডাক্তার টমাস উইলিস (Thomas Willis) প্রথম আবিষ্কার করেন যে, বহুমূত্র রোগীর মূত্র মিষ্ট এবং ডবসন (Dobson) উহা যে শর্করারই (sugar) অনুরূপ তাহা নির্দেশ করেন। প্যানক্রিয়াস গ্রন্থির রস ইনসুলিন

(Insulin) ইন্‌জেক্‌শন আবিষ্কারের পর এই রোগের চিকিৎসা সহজসাধ্য হইয়াছে।

(খ) **মূত্রপথের পাথুরি** (Renal, ureteric or vesical stone)। মূত্রপথে পাথুরি হইলে থাকিয়া থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণা, প্রস্রাবের সহিত রক্তপাত প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রস্রাবের সহিত পাথর বাহির হইয়া গিয়া কষ্টের উপশম করে। ভিটামিন চিকিৎসায় কদাচিৎ উপকার হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

(৮) **যৌনক্ষমতা সংক্রান্ত**—শরীরের আয়তন দেখিয়া পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্য বা বেড় তথা যৌনক্ষমতার মাত্রা ঠিক করা সম্ভবপর নয়। তবে সুস্থ, সবল শরীর যৌনক্ষমতার স্বাভাবিকতার মোটামুটি পরিচয় দেয় বটে। সাধারণতঃ আয়তন অপেক্ষা যৌন-অঙ্গসমূহের স্বাভাবিকতা এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়াসৌষ্ঠবই যৌনক্ষমতার প্রকৃত নিয়ামক। যৌনক্ষমতা সংক্রান্ত রোগ নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার:

(ক) **পুরুষত্বহীনতা** (Impotence)। ইহার বিশদ আলোচনা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে।

(খ) **শুক্রতারল্য** (Spermatorrhoea)। পুরুষের উত্তেজনা হইলে লিঙ্গপথে গন্ধ ও বর্ণহীন ঈষৎ চটচটে রসস্রাব একটা সাধারণ অবস্থা। কিন্তু উত্তেজনা ব্যতিরেকেও রসস্রাব হওয়ায় অনেকে খুব দুর্ভাবনায় পড়েন। খুব বেশী বা ঘন ঘন এইরূপ স্রাব না হইলে ভয়ের কারণ নাই; হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়।

এই অবস্থার সাধারণ কারণ: কোষ্ঠকাঠিন্য, হাঁটা বা ঘোড়ায় চড়ার দরুন যৌন-অঙ্গের উত্তেজনা, লম্বা আবরক ত্বক (foreskin), অন্ত্রসমূহের কীটের উৎপাত, উত্তেজক গল্প পড়া, চিত্র দেখা, কামচিন্তা ইত্যাদি। বাল্যকাল হইতে অতিরিক্ত আত্মরতি হইতেও শুক্রতারল্য ঘটিতে পারে।

(গ) **দ্রুত রেতঃপাত** (Premature ejaculation)। এই অবস্থার দীর্ঘ আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে।

(ঘ) **অত্যধিক রমণেচ্ছা** (Satyriasis)। ইহার সম্বন্ধে আলোচনাও দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে।

(৯) **প্রজনন ক্ষমতা-সংক্রান্ত**—সাধারণতঃ শুক্রকীট, ডিম্ব, জননেন্দ্রিয়-

সমূহের বৈকল্য এবং আনুষঙ্গিক বহু কারণে বন্ধ্যাত্বের সূচনা হয়। এখানে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নাই।*

নারীর যৌনবিশৃঙ্খলা

(১) **সতীচ্ছদ (Hymen) সংক্রান্ত**—সতীচ্ছদ কি, উহার অবস্থা ও কাটিবার কারণ ইত্যাদি পূর্ব এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। সতীচ্ছদ পুরু থাকার দরুন স্বামী-সহবাসে অসুবিধা হইলে অস্ত্রোপচার করাইয়া লইতে হয়। ব্যাপার সামান্য। একেবারে ছিদ্রবিহীন সতীচ্ছদ (Imperforate hymem) থাকিলে ঋতুস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমন অবস্থা খুব কদাচিৎ দেখা যায়। অস্ত্রোপচারে ইহা অপসারণ করানো উচিত।

(২) **যোনিপথ সংক্রান্ত**—যোনিপথ একাধারে সঙ্গমপথ ও প্রসবপথ। উহা অতিশয় সম্প্রসারণশীল। তাই স্বামী-সহবাসে কয়েকদিন অভ্যস্ত হইলেই উহার আয়তন বাড়িয়া থাপ খাইয়া যায়। প্রসূতির বেলায় যোনিপথ সন্তান বাহির হইয়া আসিবার মত প্রসারিত হয়।

(ক) **অপরিণত অবস্থা** (Infantilism)। পুরুষের অণ্ডকোষের অপরিণত অবস্থার বেলায় যাহা বলা হইয়াছে এখানেও তাহা খাটে।

(খ) **প্রদাহ (Vaginitis)**। গনোরিয়া বীজাণুর আক্রমণে এইরূপ প্রদাহ হইতে পারে। ইহা ছাড়া কোনও বস্তু ভিতরে থাকিয়া বা ঢুকিয়া (যথা ক্রিমি, পেসারী প্রভৃতি) প্রদাহ জন্মাইতে পারে। বলাৎকার, প্রসবকালে আঘাত, ঠাণ্ডা লাগা, হাম, সংক্রামক-জ্বর ইত্যাদির উপসর্গ হিসাবেও উহা দেখা দিতে পারে।

নূতন প্রদাহে সাধারণতঃ সামান্য শ্লেষ্মা স্রাব হয়, কটি, উরু ও নিতম্ব প্রদেশে ভার বোধ ও বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, যোনিপথ সামান্য ফুলিয়া গিয়া উহাতে বেদনা অনুভূত হইতে পারে। **পুরাতন প্রদাহে** যোনিমধ্যস্থ শ্লেষ্মা নিঃসারক ঝিল্লীতে নীলাভ লালবর্ণ চুলকণা প্রকাশ হয়, যোনি শিথিল হইয়া পড়ে, তাহা হইতে সাদা, হলদে প্রভৃতি নানা বর্ণের পুঁজ নিঃসৃত হয়। কারণ বুঝিয়া চিকিৎসা করাইতে হয়।

*আমার 'মাতৃমঙ্গল, জন্মবিজ্ঞান ও সুসন্তানলাভ', 'জন্মনিয়ন্ত্রণ—মত ও পথ' এবং Ideal Family planning', পুস্তকগুলিতে নরনারী উভয়েরই বন্ধ্যত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

(গ) **যোনিপ্রদেশের আক্ষেপ** (Vaginismus)। এই অবস্থায় স্বামী সঙ্গমের উপক্রম করিলে যোনিপ্রদেশ ও যোনিপথের পেশীসমূহ এতদূর সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে যে উহা অসাধ্য হয়। যোনিদ্বারের বা পথের অত্যধিক ক্ষুদ্রতা, সতীচ্ছদ পুরু হওয়া অথবা তাহার অনুভব শক্তির আতিশয্য, যোনিপথের প্রদাহ ইত্যাদির দরুন এবং নারীর **সহবাসে ভয় ও উৎকণ্ঠা থাকিলে** উহার প্রাক্কালে এইরূপ অবস্থা দাঁড়ায়। কারণ বুঝিয়া চিকিৎসা করাইতে হয়।

আঙ্গিক বিকৃতি ছাড়া মানসিক কারণেও এইরূপ হইতে পারে। প্রথম প্রথম স্বামীর **যৌনদুর্ব্যবহার বা সহবাসে বলপ্রয়োগ** অনভিজ্ঞ নারীকে এতদূর ভীত, বিব্রত, দুঃখিত, বা বিক্ষুব্ধ করিতে পারে যে, নারীর প্রতিকূল মনোভাব এই অবস্থার সূচনা করিয়া ফেলে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের দশম অধ্যায়ে আরও বলা হইয়াছে। বড় গামলায় বা টবে গরম জল ঢালিয়া কোমর পর্যন্ত ডুবাইয়া খানিকক্ষণ বসিলে উপকার হইতে পারে।

(ঘ) **সহবাসের বেদনা**(Painful coitus—Dysperunia)। প্রথম প্রথম সহবাসে সতীচ্ছদ ছিন্ন হওয়া বা পুরুষাঙ্গের প্রচাপের দরুন সামান্য বেদনা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কয়েকদিনেই এই বেদনা দূরীভূত হইয়া যায়।

কিছুদিন সহবাস করিবার পরেও বেদনা থাকিয়া গেলে মনে করিতে হইবে যে, নারীর আঙ্গিক কুগঠন, কোষ্ঠবদ্ধতা যোনিপথের প্রদাহ, পুরুষের অসাবধান রমণ বা স্বামীর প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষ প্রভৃতির দরুন এইরূপ হইতেছে।

কারণ বুঝিয়া চিকিৎসা ও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) **বিবিধ স্রাব বা শ্বেতপ্রদর** (Leucorrhoea)। যোনিপথে রক্ত ছাড়া একপ্রকার সাদা, পীত, মাংসধোয়া জল বা আলকাতরার ন্যায় আঠাল রস জরায়ু হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। সচরাচর স্রাব শ্বেত বর্ণের হইয়া থাকে, সেই জন্য এই রোগের নাম শ্বেতপ্রদর। সকল বয়সের নারীরই এরূপ হইতে পারে। ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরেই এইরূপ বেশী হইয়া থাকে। অত্যধিক পরিশ্রম, স্বাস্থ্যের অবনতি, মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি এই অবস্থা গুরুতর করিয়া তোলে।

কারণ—জননেন্দ্রিয়সমূহের দুষ্ট বীজাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়া, গনোরিয়া প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর দুষ্ট বীজাণু সংক্রমণ, জরায়ুর প্রদাহ, ঠাণ্ডা লাগা, ক্রিমি, অপরিষ্কার থাকা, স্বাস্থ্যভঙ্গ, অতিরিক্ত সঙ্গম ইত্যাদি কারণে এই অবস্থা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় জন্ম নিয়ন্ত্রণকল্পে যোনিপথে অপরিষ্কৃত স্পঞ্জ

পেসারী রাখিয়া দেওয়া অথবা অপরিষ্কৃত পেসারীও ক্রমান্বয়ে ২-৪ দিন ধরিয়া ভিতরে রাখিয়া দিলে ইহা হয়। কারণ বুঝিয়া চিকিৎসা করাইতে হয়।

উপসর্গ—কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথাধরা, পেটফাঁপা, হজমের গোলযোগ, মুখমণ্ডলের রক্তহীনতা প্রভৃতি পুরাতন হইলে পুঁজের ন্যায় স্রাব এবং সেইজন্য যোনিতে ক্ষত হয়। বিধি—সাধারণতঃ স্রাব খুব বেশী না হইলে দুর্ভাবনার কারণ নাই। সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নতিলাভ করিলে ইহা সারিয়া যায়। বাত, রক্ত-হীনতার দরুন এইরূপ হইলে উহাদের চিকিৎসা করা কর্তব্য। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। কোষ্ঠকাঠিন্য স্রাবের অবস্থা গুরুতর করিয়া তোলে। প্রত্যহ স্নান জননেন্দ্রিয় দিনে ৩-৪ বার ধৌত করা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য, দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য পিচকারী দ্বারা ঠাণ্ডা জলে যোনি ধৌত করা।

নিষেধ—আদি রসাত্মক নাটক-নভেল পাঠ, কুসংসর্গ, গুরুপাক দ্রব্য আহার উত্তেজক থিয়েটার-সিনেমা দেখা, অতিরিক্ত সহবাস।

(চ) **যোনি ভ্রংশ** (Prolapsus Vaginoe) জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ যোনিও কখন কখন নির্গত হইয়া পড়ে। মলভাণ্ডে কঠিন মল সঞ্চিত বা মূত্রাধার স্ফীত হইলে অথবা কষ্টকর প্রসব বেদনার পর হইতে পারে।

লক্ষণ—তলপেটে ভারবোধ, পদচালনে ক্লান্তি ও মলভাণ্ড স্ফীত হওয়া।

বিধি—১০-১৫ মিনিট অন্তর খানিকক্ষণ জলে বসিয়া থাকা ও কিছু হেলান দিয়া শুইয়া থাকা।

(ছ) **ভগের চুলকানি** (Pruritus Vulvoe), ফুস্কুড়ি প্রকাশ। কারণ —দুর্বলতা। বিধি—আক্রান্ত স্থানটি সর্বদা পরিষ্কার রাখা। চিকিৎসা করানো।

(৩) **জরায়ু সংক্রান্ত**—(ক) অপরিণত অবস্থা (Infantilism)। জরায়ুর কাজ ভ্রূণকে জায়গা দেওয়া এবং উহার বৃদ্ধির সহায়তা করা। তাই জরায়ুর অপরিণত অবস্থা থাকিলে ভ্রূণের অবস্থিতি ও পরিণতির ব্যাঘাত জন্মে। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের গোলযোগের দরুনই সাধারণতঃ এরূপ হয়। সুচিকিৎসায় প্রতিকার সম্ভবপর। (৩৩নং চিত্রে দেখুন)।

(খ) **প্রদাহ**—(Inflammation)। জরায়ুর ভিতরগাত্রের ঝিল্লীর প্রদাহকে এণ্ডোমেট্রাইটিস (Endometritis), উহার পেশীসমূহের প্রদাহকে মেট্রাইটিস (Metritis) এবং চারিদিকের তন্তুসমূহের প্রদাহকে পেরিমেট্রাইটিস (Perimetritis) বলে। অনেক সময়ে গরমজলের ডুশ ব্যবহারে আরাম পাওয়া যায়। কখনও কখনও অস্ত্রোপচারের (Curettage) আবশ্যক হয়।

নূতন প্রদাহের কারণ—প্রসবের বা গর্ভস্রাবের ফলে রক্ত দূষিত হওয়া।

লক্ষণ—অত্যন্ত শীত বোধ, প্রবল জ্বর ও তলপেটে বেদনা।

পুরাতন প্রদাহের কারণ—প্রসবের পর জরায়ুর সঙ্কুচিত হইয়া না আসা, বহুদিবস যাবৎ হরিৎ পীড়ায় (Chlorosis-এ) ভোগা প্রভৃতি।

লক্ষণ—উদর ভারী বোধ, বাধক বেদনা, স্তনে ও কোমরে বেদনা, ঋতুর বিশৃঙ্খলা, স্বামী-সংসর্গে বেদনা, মূত্রস্থলী ও মলদ্বারে বেগ, হিস্টিরিয়া প্রভৃতি।

বিধি—জননেন্দ্রিয় গরমজল দ্বারা প্রত্যহ ২-৩ বার উত্তমরূপে ধোওয়া, প্রতিদিন যথাসময়ে স্নান, পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন ও নিয়মিত পরিশ্রম।

নিষেধ—স্বামী-সংসর্গ ও কোমরে খুব কষিয়া কাপড় পরা।

(গ) জরায়ুর পতন (Prolapse)। জরায়ু যোনিপথে নামিয়া পড়িতে পারে। কারণ—সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সে পেশী ও বন্ধনী (Ligament) ঢিলা হইয়া গেলে উহারা জরায়ুকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। যৌবনেও কঠিন বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের পর এবং প্রসবের ধকলের জন্য এবং ইহা ছাড়াও দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয়, কঠিন কাশির (chronic cough) দরুন নারী কুন্থন করিতে করিতে জরায়ুর পতন ঘটাইতে পারে।

লক্ষণ—অস্বস্তি বোধ, তলপেটে বেদনা, পৃষ্ঠবেদনা, ক্লান্তিবোধ, ঘন ঘন মূত্র বা মলের বেগবোধ, কিন্তু উপবিষ্ট অবস্থায় কম অস্বস্তি, মাসিক স্রাবের আধিক্য বা দীর্ঘস্থায়িত্ব ইত্যাদি।

শীঘ্র শীঘ্র ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে অস্ত্রোপচার, প্রসবের সময়ে ও পরে সাবধানতা, শিশুকে স্তন্যদান, প্রসবোত্তর ব্যায়াম (ব্যায়াম পদ্ধতির জন্য আমার 'মাতৃমঙ্গল' পুস্তক দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি ইহার প্রতিষেধক।

(ঘ) স্থানচ্যুতি (Displacement)। জরায়ু তলপেটে নির্দিষ্টভাবে অবস্থান না করিয়া এদিক-ওদিক হেলিয়া থাকিতে পারে, কারণ অন্যান্য যন্ত্র-সমূহের চাপ, জরায়ুর ভার বা তলপেটে ফোড়া, অত্যধিক পরিশ্রম, ভারী জিনিস তোলা, বহুক্ষণ উবু হইয়া বসা, মলত্যাগকালে অত্যধিক কুন্থন, প্রসবের পর শীঘ্র শীঘ্র (৬-৭ দিনের আগে) উঠিয়া বসা, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রায় জোলাপ লওয়া, অর্শ, বমন, বেশী আঁটিয়া কাপড় পরা, লাফালাফি করা, আঘাতাদি।

লক্ষণ—তলপেটে বেদনা, মূত্রত্যাগে কষ্ট, শ্বেতপ্রদর, রজঃ-আধিক্য বা রজঃস্বল্পতা, বাধক, রক্তস্রাব প্রভৃতি।

বিধি—কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা ও কারণগুলি এড়ানো। রোগিণীকে অর্ধ-শায়িতাবস্থায় রাখিয়া ও তাহার উরু বুকের দিকে তুলিয়া জরায়ুর (তলপেটের) উপর অঙ্গুলির দ্বারা ঈষৎ চাপ দিয়া করতল দ্বারা রক্ষা করতঃ জরায়ুটি অল্পে অল্পে উপরের দিকে উঠাইয়া দিবে। জরায়ু স্বস্থানে নীত হইলে কিছুকাল পেসারী (Hodge's Pessary or Ring Pessary) ব্যবহার করা প্রয়োজন।

অধিক নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ানো নিষেধ।

কোন কোন ক্ষেত্রে জরায়ুর স্থানচ্যুতির জন্য যোনিপথ হইতে শুক্রকীটের জরায়ুতে প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ হইলে নারীর গর্ভসঞ্চার হয় না। জরায়ুর সামান্য এদিক-ওদিক হওয়া বা থাকা সচরাচরই দেখা যায়। কোনও অসুবিধা না হইলে ইহাতে দুর্ভাবনার কারণ নাই। জরায়ুকে যথাস্থানে ফিরাইয়া দিতে পারিলেই আর কষ্ট বা অসুবিধা থাকে না।

(ঙ) **উল্টাইয়া যাওয়া** (Inversion of uterus)। কদাচিৎ প্রসবের পর এমনও হয় যে, জরায়ু একেবারে উল্টাইয়া যায়। এরূপ হইলে শীঘ্র অস্ত্রোপচার করাইয়া লইতে হয়।

(চ) **টিউমার বা আব** (Tumour)। জরায়ুতে বিনাইন (Benign), ফিব্রয়েড (Fibroid), পলিপাস (Polypas) ইত্যাদি নানা ধরনের টিউমার হইয়া থাকে। উহারা গোলাকার মটর-কলাইয়ের আকার হইতে একটা সন্তানের মাথার মত বড় ও শক্ত হইয়া উঠিতে পারে। সংখ্যায় এক হইতে পঞ্চাশটি পর্যন্ত হইতে পারে। সাধারণতঃ ৩০ বৎসর বয়সের পরেই এইরূপ হয় এবং ঋতু সংহারের (৪২-৪৮ বৎসর বয়সে) কাছাকাছিই বেশী হয়। সন্তানহীনা বা অবিবাহিতা নারীদের বেশী দেখা যায়। কোন কোন আব হইতে রক্ত ও পুঁজ বাহির হয়। কখনও শ্বেতপ্রদর থাকে। এই পীড়া বশতঃ রক্তাল্পতা, বন্ধ্যাত্ব, অনিয়মিত, রক্তস্রাব, স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। (৩২ ও ৩৩নং চিত্র)।

জরায়ুর বহির্গাত্রে হইলে তাহার প্রথম লক্ষণ স্বরূপ স্ফীতি দেখা যায়। এই স্ফীতি এতাদৃশ হইতে পারে যে, রোগিণী তাহাকে গর্ভ হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করে। যে কোন সময়ে নিরীহ টিউমার বিষাক্ত ও সংক্রামক বা ম্যালিগ্ন্যান্ট (malignant) হইয়া উঠিতে পারে। তখন তাহার মূলের উপর পাক খাইয়া, অথবা অন্ত্রের ভিতর মলের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করিয়া জীবন সঙ্কটাপন্ন করিতে পারে। ইহারা কখনও কখনও প্রসব কঠিন করিয়া তোলে।

প্রতিকার—অস্ত্রোপচারে অপসারণই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। কোনও

কারণে তাহা অনুচিত বোধ হইলে এক্স-রে এবং অপরাপর উপায় দ্বারা কোন ক্ষেত্রে কষ্ট নিবারণ করা যায়।

(ছ) **ক্যানসার** (Cancer of Uterus)—ইহা এক প্রকার বিষাক্ত ও সংক্রামক মাংসার্বুদ। প্রধানত জরায়ুগ্রীবায় এবং অপেক্ষাকৃত কমক্ষেত্রে জরায়ুর ঊর্ধ্বাংশে (Fundus-এ) হয়। কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থানও আক্রমণ করিতে পারে। ইহার ভয়াবহতাই এই যে, ইহা নিকটবর্তী স্থান সমূহেও ছড়াইয়া পড়ে।

লক্ষণ—প্রথম দিকে ঋতুর সময় ছাড়া অপর সময়েও রক্তস্রাব এবং দুর্গন্ধ স্রাব। উক্ত স্রাবের সহিত রক্ত থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। অধিকাংশ নারী উহাকে রোগ বলিয়াই মনে করে না, বিশেষতঃ যাহাদের ইতিপূর্বে বহুকাল যাবৎ শ্বেতপ্রদর ছিল। সাধারণতঃ এই স্রাব বা অর্বুদ সৃষ্ট হওয়ার ও বাড়িতে থাকার অনেক মাস পরে বেদনা দেখা যায়। যখন বেদনা আরম্ভ হয় তখন অস্ত্রোপচার করিবার মত অবস্থা আর থাকে না।

'বেদনা ত নাই, সুতরাং ইহা কোন রোগ নহে' এইরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া না থাকিয়া **অবিলম্বে ক্যান্সার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার** দেখানো একান্ত কর্তব্য। সন্তানবতীদের অথবা যাহার একাধিক গর্ভ নষ্ট হইয়াছে, তাহাদেরই জরায়ুগ্রীবার ক্যানসার হয়। ইহার কারণ বহুদিন পর্যন্ত উত্তেজনা বা জ্বালা (Chronic irritation)।

প্রতিকার—প্রথম অবস্থায় জরায়ুগ্রীবার ক্যানসার সহজে এবং বেদনা না দিয়া রেডিয়াম প্রয়োগে আরোগ্য হয়। জরায়ু-দেহের হইলে প্রথম অবস্থায় সামান্য অস্ত্রোপচারে আরোগ্য হয়।

অস্ত্রোপচারই ইহার সর্বোত্তম চিকিৎসা। তবে রেডিয়াম, এক্সরে এবং প্রফেসর ব্লেয়ার বেলের কলেডিয়াল লেড (Prof. Blair Bell's Colladial lead) দ্বারা চিকিৎসায় বর্ধিত অবস্থাতেও সাফল্য লাভ হইতেছে।

আমেরিকার Dr. Papanicolaon ১৯২৩ সালে ইহার রোগ নির্ণয় পন্থা আবিষ্কার করেন। ইহা 'পাপার পরীক্ষা' (Papa Test) নামে খ্যাত। ১৯৪৩ সালে সে দেশের ডাঃ Meigs ও Ayre ইহার সেল সন্ধানের পদ্ধতি বাহির করেন। দুই সহস্রাধিক রোগীর মধ্যে ইহা ৯৭% ক্ষেত্রে সফল হয়।

(জ) **জরায়ুর উগ্রতা** (Hysteralgia)। জরায়ুতে বেদনাবোধ, সমস্ত বস্তিদেশে কনকনে বেদনা (এই বেদনা আরবিরু, ঋতুর সময়ে ও সঙ্গমকালে

বৃদ্ধি হয়), ক্ষুধামান্দ্য, অস্থিরতা, বমনেচ্ছা, অনিদ্রা, পাকাশয়ে গোলযোগ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণীয়।

(ঝ) জরায়ুজ মূর্ছা বা হিস্টিরিয়া (Hysteria)। কারণ—স্নায়ুসমূহের (বিশেষতঃ জরায়ুর স্নায়ুসমূহের) উগ্রতা, অতৃপ্ত কামজীবন প্রভৃতি। রোগিণীর প্রকৃতি—ভবাপ্রবণ, লাজুক, অভিনয় করিতে ভালবাসে, সহানুভূতির জন্য কাঙাল। বিধি—মূর্ছা অবস্থায় রোগিণীর মুখ ও নাসারন্ধ্র অতি অল্পক্ষণ মাত্র উত্তমরূপে টিপিয়া ধরিয়া, অল্প উচ্চ স্থান হইতে গাড়ু বা বদনা দ্বারা তাহার মুখমণ্ডলের উপর এমনভাবে জল ঢালিতে হইবে যেন তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার অল্পক্ষণ মাত্র ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্য তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার মূর্ছা ভাঙিতে পারে।

৩৩ নং চিত্র

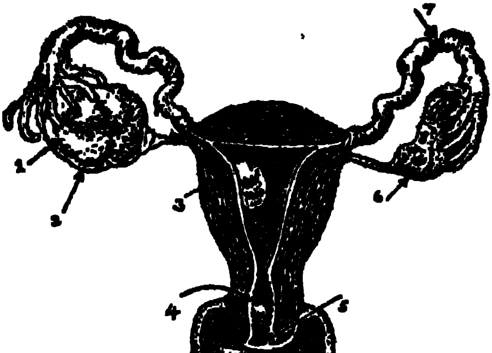

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে কতিপয় বিশৃঙ্খলা

1. ডিম্বকোষে টিউমার, 2. হরমোনের অসমতা, 3. জরায়ুর টিউমার, 4. জরায়ুর মুখে পলিপাস, 5. শুক্রকীটধ্বংসী রসক্ষরণ, 6. রোগাক্রান্ত ডিম্বকোষ, 7. রুদ্ধ ডিম্ববাহী নল।

(৪) ঋতুস্রাব সংক্রান্ত—নারীর (মাসিক) ঋতুস্রাব একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রায় ২৮ দিন অন্তর অন্তর, তিন হইতে পাঁচ দিন পর্যন্ত, বেশী বেদনা-বিহীন, মাঝারি রকম রক্তস্রাব হওয়াই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ইহার কারণ অন্যত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। অস্বাভাবিক হইলে অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মিত হয়।

ঋতুস্রাবের মাত্র কতকগুলি গোলযোগের কথা লেখা হইল :

(ক) প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব (Delayed menstruation)। এদেশের সুস্থ স্ত্রীলোকদের সাধারণতঃ ১২-১৩ বৎসর বয়সে প্রথম রজঃস্রাব আরম্ভ হইয়া ৪০-৪৫ বৎসর অবধি থাকে। ১৪-১৫ বৎসর বয়স অবধি না হইলে অথবা একবার মাত্র হইয়া বন্ধ হইয়া গেলে তাহা অস্বাভাবিক বুঝিতে হইবে। তবে যদি ডিম্বস্ফোটন হইয়া থাকে তাহা হইলে গর্ভসঞ্চারও সম্ভবপর।

আদৌ না হওয়ার কারণ—স্নায়বিক দুর্বলতা, দীর্ঘকাল কোন পীড়ায় ভুগিয়া দুর্বলতা ও রক্তাল্পতা, যোনিমুখের আবরক ঝিল্লীতে (সতীচ্ছদ) ছিদ্র না থাকা, অন্তঃস্রাবী কোন গ্রন্থির ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য, জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের অপরিণত অবস্থা প্রভৃতি।

বিধি—অকালে ঋতু আরম্ভ হইলে উহা বন্ধ করিবার ও ঋতু আরম্ভে বিলম্ব হইলে উহা ঘটাইবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কিন্তু যদি বয়ঃসন্ধিকালে —১২ হইতে ১৬ অথবা তদূর্ধ্ব বয়সে রক্তস্রাব দেখা না যায়, কিন্তু মাঝে মাঝে তলপেটে বেদনা বোধ হয় ও শরীর অসুস্থ লাগে অথবা অল্প স্রাব হয় এবং তাহার বর্ণ কাল হয় এবং তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো উচিত। নিষেধ—ঠাণ্ডা লাগানো, শীতল জলে স্নান, বেশী পড়াশুনা, আলস্য, গরম মসলা বা উত্তেজক পানাহার।

(খ) রজোরোধ (Amenorrhoea)। লক্ষণ—রজঃস্রাব আরম্ভ হইয়া বন্ধ হইয়া যাওয়া।

কারণ—রক্তহীনতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, উদ্বেগ, আবহাওয়ার অথবা জীবন যাত্রা প্রণালীর হঠাৎ পরিবর্তন, ঠাণ্ডা লাগা, আলস্যপরায়ণতা রক্তাল্পতা, ঋতুর সময় অধিক রকম খাওয়া, জলে ভিজা, দীর্ঘ পর্যটন, হঠাৎ শোক দুঃখ বা ভয় পাওয়া প্রভৃতি। বয়ঃসন্ধিকালে অনিয়মিত হওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার।

যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে তবে ভয় পাইবার কারণ নাই। অন্যথায় ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া উচিত। গর্ভসঞ্চার হইলে প্রসব পর্যন্ত এবং প্রসবের পরেও কয়েকমাস ঋতুস্রাব বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। ৪২-৪৮ বৎসর পরে ঋতু একেবারে বন্ধ হয়।

(গ) রক্তস্রাবের আধিক্য ও অত্যল্পতা। ঋতুস্রাবের সময়ে অত্যধিক রক্তস্রাবকে Menorrhagia এবং দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী কালে অনিয়মিত-ভাবে রক্তস্রাবকে Metrorrhagia বলে। সাতদিনের বেশী রক্তস্রাবকে অত্যধিক মনে করা যাইতে পারে। প্রৌঢ় বয়সে (৪২-৪৮ বৎসর) রজোনিবৃত্তি

কালে কোন কোন রমণীর অতিরজঃ বা অনিয়মিত স্রাব হইয়া থাকে। **কারণ**—জরায়ুগ্রীবায় বা ডিম্বকোষে রক্তসঞ্চয়, দুর্বলতা, রক্তাল্পতা, অধিকমাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, উৎকট চিন্তা, পুনঃপুনঃ গর্ভসঞ্চার, জরায়ু মধ্যে অর্বুদ। **লক্ষণ**—অলসভাব, গা ভাঙা, হাই উঠা, গা মাটি মাটি করা, মাথা ভার ও বেদনা, পৃষ্ঠে ও কোমরে বেদনা, অরুচি, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, শীতবোধ প্রভৃতি। অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ের জন্য মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটরাবিষ্ট, হস্ত-পদ শীতল, কর্ণে তালা লাগা, দৃষ্টি ও নাড়ী ক্ষীণ, মূর্ছা প্রভৃতি দেখা যায়। **বিধি**—যদি কোন দৌর্বল্যকর পীড়া বা ধাতুগত দোষ থাকে এবং রোগিণী সবল থাকেন, তাহা হইলে গরম জলের টবে রোগিণীর কোমর পর্যন্ত ডুবাইয়া ১০-১৫ মিনিট বসিবার পর গরম কাপড় দ্বারা গাত্র মার্জনা করিলে উপকার হয়। শুইয়া থাকা **নিষেধ**—অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম।

জরায়ুর রক্তস্রাবের (Metrorrhagia) সহিত ঋতুস্রাবের কোন সংস্রব নাই। ইহা ঋতুসহ, তৎপূর্বে বা পরে বর্তমান থাকিতে পারে। এই রক্তস্রাব অল্প বা অধিক উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। **কারণ**—জরায়ুর উপরে বা মধ্যে অর্বুদ (tumour), প্রসবান্তে ফুল না পড়া, আঘাত প্রভৃতি। **লক্ষণ**—অবসন্নতা, ক্ষুধামান্দ্য, বসিয়া দাঁড়াইতে না পারা প্রভৃতি। **বিধি ও নিষেধ**—অতিরজের (Menorrhagiaএর) মত। অত্যল্প স্রাবকে Hypo-menorrhoea, দুই ঋতুস্রাবের মধ্যে ব্যবধান অত্যধিক হইলে উহাকে Oligo-menorrhoea এবং কমিয়া গেলে Epimenorrhoea বলে। রক্ত সম্বন্ধীয় রোগ বা **গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়াবৈকল্যের** জন্য এরূপ হয়। সুচিকিৎসা প্রয়োজনীয়।

(ঘ) **ঋতুস্রাবে বেদনা বা বাধক** (Dysmenorrhoea)। তলপেটে চাপা মিনমিনে (dull) বেদনা অথবা তীব্র ও আক্ষেপযুক্ত (Spasmsdic) বেদনা। ঋতুস্রাবের সময়ে, পূর্বে বা পরে বেদনা অনুভূত হইতে পারে। এই বেদনা প্রতিমাসেই একই রকম এবং একই সময় হইয়া থাকে। অস্বস্তি বোধ হয়, মাথা ধরে এবং তলপেটে বেদনা হয়।

লক্ষণ—**কুমারী যুবতীর বেলায়** বমনের ভাব, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা কোষ্ঠকাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য, পেটের অসুখ, বমনেচ্ছা বা বমন, বার বার প্রস্রাব হওয়া, তলপেটে, মেরুদণ্ডে, কোমরে বা সর্বাঙ্গে বেদনা, মনের অবসাদ ইত্যাদি দেখা দিয়া থাকে। **বিবাহ হইলে** এই অবস্থা সারিয়া যায়, আবার

কাহারও কাহারও বিবাহের পর হইতে আরম্ভ হইয়া **প্রথম সন্তানলাভের পর** সারিয়া যায়। এই অবস্থার সাধারণ **কারণসমূহ** : জরায়ুমুখ সরু হওয়া, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, রক্তসঞ্চার-জনিত জরায়ুর প্রদাহ, শ্বেতপ্রদর, বাত হিস্টিরিয়া, জীবনযাপন প্রণালীর পরিবর্তন যেমন পাঠদ্দশা ত্যাগ, আহার, বায়ু ব্যায়ামের পরিবর্তন ইত্যাদি। এই রোগাক্রান্তা কুমারীরা সাধারণতঃ নির্জনতা এবং আপন মনে চিন্তা করিতে ভালবাসে। যাহারা পরিশ্রমের কাজ করে বা মুক্ত বায়ুতে খেলাধূলা করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করে তাহাদের এই অবস্থা ঘটে না।*

বিধি—জননেন্দ্রিয় খুব পরিচ্ছন্ন রাখা, শারীরিক ধকল ও মানসিক উত্তেজনা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা এড়ানো, বেদনা অত্যধিক না হইলে হাল্কা রকম ব্যায়াম।

প্রতিকার—মাসিক আরম্ভের পূর্বদিন, নতুবা হইলেই, কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ সেবন অথবা এনিমা (বা মলদ্বারে ডুশ) লওয়া। ২-৩ মাসে আরোগ্য না হইলে ডাক্তর দেখানো উচিত।

বেদনা নিবারণের জন্য এ্যাসপিরিন, এ্যাসপ্রো, সারিডন, এমোগ্যাল, ভেরামন বা তড়িৎপ্রয়োগ ফলপ্রদ। দৈনিক ২-৩ বার সেব্য। আরম্ভের পূর্বে বেদনা হইলে (succisalye) এবং পরে হইলে (Novalgin) বটিকা তিনবার দৈনিক সেবনে উপকার হয়। গ্রন্থিরস (হরমোন) প্রয়োগে ফল হয়। সীসটোমেনসিন (Sistomensin), প্রগাইনন (Progynon) অথবা থীলিন (Theelin) ব্যবহারের উপযোগী। ডাক্তারের নির্দেশ বিনা কখনও হরমোন ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়। গরম জলের বোতল বা ব্যাগ প্রয়োগ, গরম জলে স্নান, গরম জলের টবে বসা (Hip bath) ইত্যাদিও ভাল। জরায়ুমুখ খুলিয়া দিবার (Cervical dilatation) প্রক্রিয়া ও জরায়ুর ভিতর গাত্র চাঁছিয়া দিবার (curettage) প্রয়োজনও হইতে পারে। **কুমারী ছাড়া অন্য নারীর বেলায়** এই বেদনা বস্তিকোটরের (pelvis-এর—অর্থাৎ তলপেটের) নানা রোগ ইত্যাদির জন্যও হইতে পারে। সুচিকিৎসা বাঞ্ছনীয়। এই সময় মদ্যপান নিষেধ ও সহবাস অকর্তব্য।

* সর্বদেশেই নারীর ঋতুস্রাব সম্পর্কে বিধিনিষেধের ছড়াছড়ি দেখা যায়। উহাদের অধিকাংশই ভুল ও কুসংস্কারজাত। আমি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং "মাতৃমঙ্গল" পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

(ঙ) রজোনিবৃত্তি (Menopause)। ঋতু সাধারণতঃ ৩০-৩২ বৎসর থাকে। যদি ১৪ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ৪৪-৪৬ বৎসর বয়সে একেবারে বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ ৪০ বৎসর বয়সের পর জরায়ুতে মাসিক রক্ত সঞ্চয় অল্প হইয়া আসে এবং এদেশে ৪২-৪৮ বৎসর বয়সে ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন জরায়ু ছোট ও যোনিপথ সঙ্কুচিত হয়।

লক্ষণ—ঋতু বন্ধ হইবার পূর্বে প্রায় এক বৎসর যাবৎ রক্তের পরিমাণ ও সময়ের ব্যবধান উভয় বিষয়ে ঋতু অনিয়মিত হয়। তথাপি যদি ঋতুকালে অত্যধিক রক্তস্রাব হয়, অথবা দুই ঋতুর মধ্যে রক্তস্রাব হয় (ক্যানসারের সূত্রপাতের লক্ষণ) তাহা হইলে 'এ সময়ে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক' এই ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া সুচিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। উপসর্গ—কাহারও কাহারও স্নায়ুর উগ্রতা (যথা দেহে তাপের ঝলক বা পুনঃপুনঃ গরম বোধ, শিরঃপীড়া, বুক ধড়পড়, হিস্টিরিয়া), বমনেচ্ছা, কোষ্টবদ্ধতা, উদরে বায়ুসঞ্চয়, প্রচুর ঘর্ম বা প্রস্রাব প্রভৃতি নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগ দেখা যায়।

বিধি—অল্প গরম জলে স্নান, লঘুপাচ্য খাদ্য, যথাসময়ে আহার-নিদ্রা, অল্প পরিশ্রম, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ইত্যাদি। মাত্রাধিক্যে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। উত্তেজক বা নিদ্রাকারক ঔষধাদি সেবন নিষেধ।

(৫) মূত্রসংক্রান্ত—(ক) বহুমূত্র—পুরুষের বেলায় ইহার আলোচনা করিয়াছি। ঐ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(খ) ধারণে অক্ষমতা—ইহার কারণ মূত্রস্থলী বা বৃক্কতে কোন পুষ্ট বীজাণুর সংক্রমণ, পাথুরী, স্নায়বিক বা অপর গোলযোগ ইত্যাদি।

কারণ অনুসন্ধান করিয়া সে অনুযায়ী চিকিৎসা প্রয়োজন।

(৬) যৌনক্ষমতা সংক্রান্ত—যৌনমিলনে নারীর নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়। নারীর ইচ্ছা বা উত্তেজনার অভাব থাকিলেও উহাতে বাধা হয় না—এই জন্যই নারীর যৌনক্ষমতার অভাব বা তারতম্য বড় একটা হিসাবের মধ্যে আসে না। কিন্তু ইহা ভুল। সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবনে উভয়ের যৌনক্ষমতা সতেজ থাকা চাই।

রতিজড়তা (Frigidity) ও রতি-উন্মত্ততা (Nymphomania) সম্বন্ধে দাম্পত্য ব্যবহার আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।

(৭) প্রজনন-ক্ষমতা সংক্রান্ত—নারীর সন্তানোৎপাদনের অক্ষমতা বা বন্ধ্যাত্ব (Sterility) একটি বিষম সমস্যা। (৩৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এ বিষয়ে এত কথা বলা দরকার যে এখানে তাহা সম্ভবপর নয়।

আমার 'মাতৃমঙ্গল', 'জন্মনিয়ন্ত্রণ', এবং 'Ideal Family Planning' পুস্তকগুলিতে।

(৮) **রক্ত সংক্রান্ত-হরিৎ পীড়া** (Chlorosis)। **লক্ষণ**—এই রোগে রক্তের লালকণিকার ভাগ কমিয়া যায়, সেইজন্য গাত্রচর্ম খড়িমাটির ন্যায় শুষ্ক, পীতবর্ণ বা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হয়। অনিয়মিত ঋতু, শরীরের তাপ হ্রাস, শীতবোধ, শিরঃপীড়া, চক্ষুর পাতা ফোলা, চক্ষুর চারিদিকে কালিপড়ার মত দাগ, বুক ধড়ফড় করা, ক্ষীণ নাড়ী, ফ্যাকাশে ঠোঁট, অজীর্ণতা কোষ্ঠবদ্ধতা, খিট্‌খিটে মেজাজ, অরুচি প্রভৃতি।

কারণ—বেশী রক্তস্রাব, ঋতুর গোলযোগ, আলস্য, দুশ্চিন্তা, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি। **বিধি**—ঠাণ্ডাজলে (সমুদ্রজলে আরও ভাল) স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, সকালের রৌদ্র মিনিট দশেক গায়ে লাগানো বা ঐ সময়ে বেড়ানো। **পথ্য**—দুগ্ধ, পালটের (bran এ) বা জাঁতায় ভাঙা আটার হাতে গড়া রুটি, কাঁচা ডিম বা ডিমের হলদে অংশ, ছোট মাছ, টাটকা তরকারি, সুপক্ক ফল, দুগ্ধ দধি, ঘোল, অধিক পরিমাণে জলপান।

(৯) **ডিম্বাশয় সংক্রান্ত**—(ক) **প্রদাহ** (Ovaritis)। **লক্ষণ**—কুঁচকির একটু উপরে (পেটের খুব ভিতরে) বেদনা ও কনকনানি, চাপিলে বা নড়িলে-চড়িলে বৃদ্ধি, জর বা বমন, সঙ্গমেচ্ছা প্রভৃতি। **কারণ**—আঘাত লাগা, প্রবল বমনেচ্ছা, ঠাণ্ডা লাগিয়া রজোবন্ধ প্রভৃতি। **বিধি**—বিশ্রাম, লঘু পথ্য ও শুষ্ক সেক।

(খ) **স্নায়ুশূল** (Ovaralgia)। ইহা স্নায়বিক বেদনা ডিম্বকোষের প্রদাহাদি ইহার কারণ নহে। **লক্ষণ**—সহসা বেদনা আরম্ভ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বমন, পেট ফাঁপা, হৃৎস্পন্দন, প্রস্রাব করিয়া যাওয়া প্রভৃতি। **নিষেধ**—মানসিক উত্তেজনা ও স্বামীসহবাস।

৩৪নং চিত্র

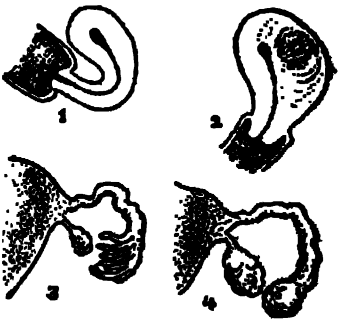

বন্ধ্যাত্বের কতিপয় কারণ
১, অপরিণত জরায়ু, ২ জরায়ুতে টিউমার। 3. ডিম্বকোষ, 4. বদ্ধমুখ ডিম্বনল।

(গ) **অর্বুদ বা আব**—(Ovarian Tumour) **লক্ষণ**—অসহ্য যন্ত্রণা, প্রদর, জ্বর, উদর বৃদ্ধি, উদরী, জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি। **উপায়**—অস্ত্রোপচার। (৩২নং ৩৩নং চিত্র)

(৩১)

সতীত্বের আদর্শ

যৌননিষ্ঠা ও সতীত্ব

আমরা **যৌননিষ্ঠা পালনের আদর্শ** হইতে নর ও নারী কি পরিমাণে এবং কেন বিচ্যুত হয় তাহা ৮ম অধ্যায়ের গোড়ায় আলোচনা করিয়াছি। **যাহা হইয়া থাকে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ** করিতে না পারিলে উহা প্রশমন বা সংশোধন করা সম্ভবপর হয় না। সংশোধনের উপায় আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা দেখিতে চাই, **বিজ্ঞান** যৌননিষ্ঠার বিষয়ে কি অভিমত পোষণ করে এবং কি পরামর্শ দেয়। **ধর্ম ও সমাজ স্বীকৃত বিবাহ ছাড়া অন্য উপায়ে যৌনসম্মিলনকে অবৈধ ও অন্যায়** বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; **যৌননিষ্ঠার** স্তুতিগানে ধর্ম সাহিত্য ও সমাজের একই সুর।

ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি সার্বজনীন। খাইবার প্রচেষ্টা শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজীবন বলবতী থাকে। এখানেও সমাজ ও সংস্কার এই প্রচেষ্টাকে সংযত করিয়া রাখে। যেখানে সেখানে যাহার তাহার কাছে, যাহা তাহা খাইয়া জীবন যেন বিপন্ন করা না হয়, পিতামাতা আত্মীয়স্বজন শিশুকে ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। অন্যের খাদ্যদ্রব্য পাইলেই খাইতে হইবে এমন নহে, এরূপ শিক্ষাও শিশু পাইয়া থাকে। সেইরূপ যৌনবোধ তীব্র বলিয়াই যে সুযোগ পাওয়া মাত্রই উহার তৃপ্তি সাধন করিতে হইবে এমন নহে।

বিবাহিতা স্ত্রী বা স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত দৈহিক মিলন না হওয়ার নামই **যৌননিষ্ঠা** বা **সতীত্ব**। **সতী** বলিতে যৌন নিষ্ঠাবতী স্ত্রীলোককে বুঝায়। **যৌননিষ্ঠাবান্** পুরুষ বুঝাইবার মত কোনও শব্দ আমাদের অভিধানে নাই। ইংরেজী Chastity শব্দ দ্বারাও নারীর যৌননিষ্ঠাই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ইংরেজী যৌন-সাহিত্যে পুরুষের বেলাতেও অন্য শব্দের

অভাবে chaste এবং chastity কথা ব্যবহার করা হইয়াছে। ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য আমিও এই পুস্তকে পুরুষ সম্বন্ধে সৎ, নারী সম্পর্কে সতী এবং উভয়ের সম্পর্কে 'সতীত্ব' বা যৌননিষ্ঠা শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

পৃথিবীর অধুনা প্রচলিত সমস্ত ধর্মই সতীত্বের উপর খুব জোর দিয়াছে এবং ব্যভিচারের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছে, বিশেষত নারীর ক্ষেত্রে। আবার নারী ও পুরুষ উভয়েই সতীত্বের প্রশংসা ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও করিয়াছে, বিশেষত নারীর, কারণ উহাতেই পুরুষের সুবিধা।

বাইবেল (ওল্ড টেষ্টামেণ্ট) ও কোরানে বর্ণিত জোসেফের (আরবী উচ্চারণে 'ইউসুফ') আত্মসংযমের কাহিনী মর্মস্পর্শী। ইনি সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন। পিতার স্নেহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহাকে অপর ভ্রাতাদের হিংসা ও কোপের পাত্র হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। খেলিবার উপলক্ষ্য করিয়া পিতার নিকট হইতে লইয়া গিয়া ভ্রাতারা তাঁহাকে এক কূপে ফেলিয়া আসে। দৈবক্রমে সেখান হইতে পথিকেরা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দূরদেশে তাঁহাকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে। এখানে যে উচ্চপদস্থ লোকটি তাঁহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার স্ত্রী জুলেখাকে তাঁহার উপযুক্ত আদর-যত্ন করিবার আদেশ দিলেন এই আশায় যে, তাঁহার দ্বারা উঁহাদের কাজ হইবে, এমন কি উঁহারা তাঁহাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

জোসেফ ক্রমশ যৌবনে দীপ্ত ও বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দৈহিক কান্তি দেখিয়া জুলেখা তাহার প্রেমে পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে নানা ছলে কৌশলে আয়ত্ত করিবার প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। অবশেষে নিভৃতে দরজা বন্ধ করিয়া প্রণয়িনী তাঁহার প্রেমভিক্ষা করিলে এক অপূর্ব আত্ম-সংবরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "খোদা আমাদের রক্ষা করুন—তাঁহার অপূর্ব দয়াতেই আমি এত সুখে প্রতিপালিত হয়েছি—ব্যভিচারী কখনও সুখী হতে পারে না।"

তিনি প্রণয়িনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিলেন খোদার দিকে চাহিয়া। ক্রুদ্ধা রমণী তাঁহাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া জেলে দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। তিনি বলিলেন, "প্রভো, এরা আমাকে যে কাজে প্ররোচনা দিচ্ছে তার চেয়ে কারাবরণ করা আমার কাছে ঢের ভাল; তুমি যদি এদের প্ররোচনা থেকে আমায় রক্ষা না কর, তা হলে বোধ হয় আমি এদের দিকে আসক্ত হয়ে বিপথগামী হব।" তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিপথগামী হন নাই।

এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে এবং সাহিত্যে আরও আছে। হিন্দু ধর্মেও সাহিত্যে যৌননিষ্ঠা বা সতীত্বের আদর্শকে সকলের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত রাখা হইয়াছে। সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা প্রভৃতির উজ্জ্বল আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই রাজপুত রমণীরা সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্ম আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, বহু হিন্দু রমণী সহমরণ বরণ করিয়াছেন, বিস্তর বিধবা আজীবন কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, ভীষ্ম প্রভৃতি সৎ পুরুষেরা ইহার মূল।

সতীত্ব ও পত্নীনিষ্ঠা

অপরদিকে আবার প্রাচীন ভারতে **স্বচ্ছন্দ বিহারেরও** পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন:

"তবে ধর্মার্থেই হউক আর কর্মার্থেই হউক, যে সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত, তথায় পারস্পরিক দাম্পত্যনিষ্ঠার কথা হাস্তকর। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় এই যে, বৈদিক যুগে শুধু পুরুষের দিক দিয়াই নয়, নারীর দিক দিয়াও অবাধ যৌন স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। কোন কোন অসভ্য সমাজে কুমারী অবস্থায় নারী স্বচ্ছন্দচারিণী; কিন্তু বিবাহের পরেই তাহাকে সতী হইতে হয়। আদিম ভারতীয় সমাজে নারীদের মধ্যে কৌমার ব্যভিচার ত চলিতই, বিবাহিত জীবনেও কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। **শুক্ল-যজুর্বেদে** ব্যবহৃত 'পুংশ্চলী' শব্দটি হইতে তখনকার কতক নারীর স্বভাব সম্বন্ধে সামাজিকগণের ধারণার অনেকখানি আভাস পাওয়া যায়। 'পুংশ্চলী'র অর্থ পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা কুলটা রমণী। **মহাভারতে** পাণ্ডু কুন্তীকে বলিতেছেন, 'ধর্মজ্ঞেরা ইহাই ধর্ম বলিয়া জানেন যে, প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করিবে না, অবশিষ্ট অন্যান্য সময়ে সে স্বচ্ছন্দচারিণী হইতে পারে, সাধুজনেরা এই প্রাচীন ধর্মের কীর্তন করিয়া থাকেন। ঋতুকাল বলিতে ঋতুর আরম্ভ হইতে ষোলদিন পর্যন্ত ধরা হইত। ব্যভিচারকে যে মহাপাতক তুল্য অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত না তাহার প্রমাণ অন্যত্র পাওয়া যায়। কানীনপুত্রত্ব স্বীকারও উহার আরেকটি অকাট্য প্রমাণ। (**মনুসংহিতার** মতে পুত্র দ্বাদশ প্রকারের। তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের অবিবাহিত অবস্থায় জাত সন্তান 'কানীন', গর্ভবতী কুমারীর বিবাহের পর জাত সন্তান '**সহোঢ়**'; বিধবার পুনরায় বিবাহের পর জাত '**পৌনর্ভব**', ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত

সন্তান 'পৌত্র')। তাহা ছাড়া নিয়োগ প্রথার সন্তানোৎপাদনও দৈহিক নিষ্ঠাচারের পরিচায়ক নহে। (স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী নিজপত্নীতে আপনার আদেশক্রমে অপর কর্তৃক জনিত পুত্রকে 'ক্ষেত্রজ' বলে)। এই সমস্তভাবে সন্তানের জন্মের উল্লেখ ও ইহাদেরও পুত্র বলিয়া স্বীকার করার তখনকার সামাজিক অবস্থা, রীতি ও উদারতা বুঝা যায়। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে এই কয় প্রকারের পুত্র পিতার ধনভাগী হয় না। (কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধিবদ্ধ বিধবা বিবাহ আইন অনুযায়ী পৌনর্ভব পুত্র এখন পিতার ধনভাগী হয়)। পঞ্চপাণ্ডবের মহাজননী কুন্তীর জীবন উভয় ব্যাপারেই বিস্ময়কর উদাহরণস্থল। কুমারী অবস্থায় তিনি কানীনপুত্র কর্ণের জন্মদান করিয়াছেন। বিবাহিত জীবনেও তাঁহার পুত্রদের একজনও স্বামীর ঔরসজাত নহেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কুন্তীর নিত্যস্মরণ মহাপাতকনাশী।* যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—,

স্ত্রী ন দুষ্যতি জারেণ নাগ্নির্দহনকর্মণা।
নাপো মূত্রপুরীষাভ্যাং ন দ্বিজো বেদকর্মণা ॥… …

অগ্নি যেমন দহনকর্মে দুষ্ট হয় না, মলমূত্রের স্পর্শে যেমন জল দুষ্ট হয় না, ধর্মকার্যব্যাপদেশে (হিংসাদি দ্বারা)* যেমন দ্বিজ দুষ্ট হয় না, তেমনি জার (অর্থাৎ প্রেমিকের মিলনের) দ্বারাও স্ত্রীর কোন দোষ হয় না। বস্তুতঃ অন্যত্র বলা হইয়াছে, স্ত্রীগণ স্বভাবপবিত্র, কোন কিছুতেই তাহাবা দূষিত হয় না। মাসে মাসে তাহাদের রজঃ সমস্ত দুষ্কৃতের অবসান ঘটায়—'মাসি মাসি রজস্তাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি।' অতএব 'ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধিঃ'। ঋতুর পুনরাবির্ভাবেই ব্যভিচারের দোষ কাটিয়া যায়। এই যুক্তিতেই প্রাচীন ভারতে দাম্পত্য ব্যভিচার সমাজে অনেক দিন পর্যন্ত চালু ছিল। মহাভারতের সময়েও উত্তর-কুরুপ্রদেশে এই প্রথা বর্তমান ছিল। আদিপর্বে পাণ্ডু বলিয়াছেন, উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু একদিন পিতৃ-সমক্ষেই স্বীয় জননীকে অন্য পুরুষ কর্তৃক আকর্ষিত হইতে দেখিয়া এই অশ্রদ্ধেয় প্রথার অবসান ঘটান।* প্রাচীন ভারতে

* "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা
পঞ্চকন্যা, স্মরেন্নিত্যম মহাপাতক নাশনং"—গ্রন্থকার।

* বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞে পশুবলি, ধর্মযুদ্ধ এবং আততায়ী হইতে নিজেকে অথবা নির্দোষ নিরস্ত্রকে রক্ষা করা প্রভৃতি দ্বারা।—গ্রন্থকার।

* দীর্ঘতমা মুনিও তাঁহার স্ত্রীকে অপরের ভোগ্যা জানিয়া সতীত্বের নিয়ম স্থাপন করেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে।

স্বচ্ছন্দবিহারের এই সকল নিদর্শন দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, তখনো সামাজিক বন্ধন তত দৃঢ় হয় নাই। তা ছাড়া দেহধর্মকে নিতান্তই দেহধর্ম হিসাবে তখন বিচার করা হইত। কিন্তু দেহসম্পর্ক মনকেও যে গভীরভাবে স্পর্শ করে, এবং ব্যভিচারমাত্রই যে সমানভাবে দৈহিক ও মানসিক অপরাধ, তাহার কথা চিন্তা করিলে কিছুতেই কোন বিবেকবান্ ব্যক্তি 'ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধিঃ' নীতি সুস্থ অবস্থায় উচ্চারণ করিতে পারিতেন না।"

এই যৌন স্বাধীনতার জন্য প্রতিক্রিয়ারও উল্লেখ করিয়া তিনি লিখেন: "পরবর্তীকালে সকল রকম ব্যভিচারই নিন্দার্হ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে নারীদের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা ক্রমশ বর্ধিত হওয়ায় স্ত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার জন্য সামাজিক অনুশাসকগণ তৎপর হইয়া উঠেন। সেই প্রতিক্রিয়াশীল যুগে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য রহিল না, পতির পুণ্যেই সতীর পুণ্য, পতিই পত্নীর একমাত্র দেবতা, পত্নী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইবেন এবং সর্বতোভাবে স্বামীর দাসানুদাসীবৎ আচরণ করিবেন, ইহাই হইল সেই যুগ এবং তৎপরবর্তী যুগসমূহের বিধান। ভারতে মুসলমান আমলে এই বিধান কঠোরতর হইয়াছিল। শুদ্ধান্তঃপুরিকারা অক্ষরে অক্ষরে অসূর্যম্পশ্যা হইলেন। তখন স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখদর্শন পর্যন্ত নিষিদ্ধ হইল; এমন কি স্বামী সম্পর্কে অন্ধত্বই পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিকীর্তিত হইতে লাগিল। মহাভারতে বলা হইয়াছে—

দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
স্ত্রীণাং আর্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥

স্বামী দুঃশীল বা যথেচ্ছাচারীই হউন, স্ত্রীর নিকট তিনিই পরম দেবতা। সেদিন সাড়ম্বরে পতিপ্রণামের মহামন্ত্র বিঘোষিত হইল—'ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্বাদেবাশ্রয়ায় স্বাহা।' কিন্তু এক পক্ষের রাশ আলগা হইলে অন্য পক্ষের বজ্র-আঁটুনি যে ফস্কা-গেরোতেই পর্যবসিত হইবে তাহা মানবের ইতিহাসে বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে অত্যন্ত কঠোর বিধান রচনা করিয়াছে সত্য, তথাপি এই উদার দেশ চিরকালই নারীজাতিকে চঞ্চলস্বভাব এবং বিশ্বাসহন্ত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে, এমন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন হেতু নাই। নারীচরিত্রকে যদি তাহারা নিন্দা করিয়া থাকে, তবে নরচরিত্রকেও তাহারা ক্ষমা করে নাই। স্ত্রীর দিক হইতে

ব্যভিচার যেমন নিন্দিত হইয়াছে, স্বামীর দিক হইতেও পরদারগমন তেমনি ধিক্কৃত হইয়াছে। বরং ব্যভিচারিণী স্ত্রীর প্রতি অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডদানেরই ব্যবস্থা ছিল। ব্যভিচারে স্ত্রীত্যাগের বিধান ছিল না। সেক্ষেত্রে পুরুষান্তর-সংসর্গ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টাই স্বামীর অগ্রে কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহাতে নারীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ও ক্ষমাশীলতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পরদাররত লম্পটের প্রতি শাস্তি কঠোরতর ছিল। মহাভারতে পরদারনিরত পুরুষকে উত্তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করাইয়া পোড়াইয়া মারবার ব্যবস্থা আছে। মনুও কঠিন শাস্তিবিধানের নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, **ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা** পরিণত যুগে পুরুষ বা নারী কাহারো পক্ষ হইতেই দাম্পত্য ব্যভিচার সমর্থিত হয় নাই। সর্বোপরি বাস্তবকে স্বীকার করিয়াও আদর্শটিকে সর্বদা সর্ব কলুষমুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। মনুসংহিতা এমন একখানি গ্রন্থ যাহাকে একই সময় অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল বলিয়া প্রমাণ করা মোটেই শক্ত নয়। সেই **মনুই** শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন, "স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি ব্যভিচার করিবেন না। সংক্ষেপে ইহাই তাঁহাদের পরম ধর্ম। বিধবা হইবার পর স্বামী ও স্ত্রী বিয়োগ প্রাপ্ত হইলেও যাহাতে কেহ কাহারও প্রতি ব্যভিচার না করেন, সে বিষয়েও তাঁহারা নিত্য যত্ন করিবেন।"

ইস্‌লাম ধর্মেও ছেলে ও মেয়ের **যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই** বিবাহ দিবার আদেশ-উপদেশ রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের ধৈর্যের মর্যাদা স্বীকার করিয়া এবং পুরুষের কামের তীব্রতা, বৈচিত্র্যপিপাসা ও কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়া ইহাও বলা হইয়াছে যে, যদি **বিবাহিত** যৌনসুখের পূর্ণ উপভোগের দরুন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতেই হয়, তাহা হইলে যেন চারিজনের বেশী একসঙ্গে রাখা না হয়। অবশ্য স্ত্রীলোকের আনুপাতিক আধিক্য, পূর্বকালে স্ত্রী-গ্রহণের অবাধ ক্ষমতা, বিবাহেতর যৌনমিলনের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন ইত্যাদি অন্যান্য কারণেও এই **সংযত ও সীমাবদ্ধ বিবাহ** স্বীকার করা হইয়াছিল। ইসলামে অন্যবিধ সম্মিলনকে শুধু অবৈধই করা হয় নাই, ইহার জন্য **অত্যন্ত কঠোর** শাস্তির ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। **যৌনসুখের বৈধ উপভোগ যে বাঞ্ছনীয়** তাহা ইসলামেও স্বীকৃত হইয়াছে; এমন কি স্বর্গেও যে পুরুষদের ঐরূপ অবাধ যৌনসুখ উপভোগের ব্যবস্থা থাকিবে তাহাও ঘোষিত হইয়াছে।

ধর্ম ও প্রথাগত যৌন কদাচার

পূর্বকালে ধর্মের নামে যে যৌন-অনাচার চলিত তাহার দৃষ্টান্তও সকল দেশেই দেখা যায়। ধর্মযাজকদের কুমারী উপভোগ, ধর্মের নামে স্ত্রীলোকদের দেবদাসী করিয়া লওয়া, সন্তানলাভের আশায় বিবাহিতা স্ত্রীলোকের মঠাধ্যক্ষের অঙ্কশায়িনী হওয়া ইত্যাদি প্রথার অবধি ছিল না। বস্তুত পুরুষের যৌন-উপভোগেরই নামান্তর ছিল এইরূপ তথাকথিত ধর্মানুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে বামাচারী তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, সহজিয়া, কর্তাভজা, কাঁচুলিয়া, বিন্দুসাধক প্রভৃতিদের সাধনপ্রণালী স্মরণ করা যাইতে পারে। ইহাদের সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দেখুন।

একশত বৎসর পূর্বেও মেদিনীপুর জেলায় 'গুরুপ্রসাদী' প্রথা ছিল। এবং পশ্চিম ভারতের 'বল্লভীকুল' বৈষ্ণবদের 'গুরুমহারাজা' সম্বন্ধেও নানা কাহিনী শোনা যায়। শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় এতাদৃশ একটি ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে গুরু শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া অন্দর মহলে ভক্তিমতী নারীদের সহিত বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি বাছা বাছা লীলা অভিনয় করিতেন।

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি কয়েকটি প্রবন্ধে কামবিকৃতির কতকগুলি বীভৎস দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সাময়িক পদস্খলন হইতে কতকগুলি গোষ্ঠীগত অনাচারের বীভৎসতা অনেক বেশী। অনেকগুলি বিকৃতাচার ধর্ম বা প্রথা নামে চলিয়া যাওয়ায় সমাজের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে উহাদের কিছু কিছু উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। শৈবদের মধ্যে নাকি গৌরীগরণ (গ্রহণ করন?) নামে একটা অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা অঋতুমতী বালিকাদের কৌমার্যভেদ ছাড়া আর কিছুই নহে।

সেনগুপ্ত মহাশয় এই প্রথা এবং অনুরূপ কয়েকটি বিকৃতাচারের বর্ণনা দিয়াছেন :

"দশমহাবিদ্যার প্রতীক রূপে দশটি অজাতঋতু বালিকাকে স্নান করিয়ে বিবস্ত্র বেশে ও বিস্রস্ত কেশে মৃত্তিকা নির্মিত ছোট ছোট বেদীতে বসানো হয় এবং ফুল বিল্বপত্র ও আতপ চাউল সহযোগে তাহাদের যোনিদেশের পুজা করা হয়। এইভাবে তাদের যোনিদেশে গৌরীপীঠের প্রতিষ্ঠা হলে শিবরূপী এক

ভৈরব তাদের কৌমার্য হরণ করেন। এই ভৈরবের উচ্ছ্রিত লিঙ্গকে দুধ এবং গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করা হয়—তারপর তিনি নির্মল চিত্তে শিব-মহিমায় সমাবিষ্ট হয়ে প্রত্যেকটি মহাবিদ্যায় গৌরীপীঠে শিব-প্রতীক সন্নিবিষ্ট করেন। সাধারণতঃ একজন ভৈরবের পক্ষে এতগুলি গৌরীর কৌমার্যভেদ সম্ভব নয় বলে তিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করেন অর্থাৎ তার প্রিয় অনুচরদের কারুর কারুর লিঙ্গদেশ স্পর্শ করে দেন, তখন একদিকে অপরিণত বালিকাদের আর্তনাদ, অন্যদিকে শিবানুচরদের সংকীর্তন শুরু হয়, আর তারি ভেতর 'গৌরীগরণ' অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই অনুষ্ঠানের রক্তে নিষিক্ত ন্যাকড়া 'সিদ্ধ বস্ত্র' রূপে সমাজে চলে—রোগ-বিনাশ, শত্রু-নিপাত, মামলা-জয়, পরীক্ষা-পাস ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রদ বিশ্বাসে অনেকে তা সংগ্রহ করে রাখেন, মাদুলীতে ধারণও করেন। কিন্তু জিনিসটা কি তা হয়ত অনেকেই জানেন না।

"উত্তর রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে এ অনুষ্ঠান চলিত আছে। শিবচতুর্দশীর রাত্রে অত্যন্ত গোপনে ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হয়। সাধারণতঃ দরিদ্র ঘরের মেয়েদের কিছু অর্থের বিনিময়ে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয় এজন্যে—আর বিকৃতাসক্তি-পরায়ণ দুষ্টেরা প্রতিনিধিত্ব পাবার লোভে এখানে এসে জড়ো হয়। এইভাবে একশো আটটি কুমারী ভেদ করতে পারেন যে ভৈরব, তিনি নাকি পুরোপুরি শিবের পদবী লাভ করেন। এরকম একাধিক শিবের অস্তিত্বের খবর আমি শুনেছি।

"বামাচারী শক্তিদের মধ্যেও এই রকম এবং আরো অনেক রকম বিশ্রী ব্যাপার প্রচলিত আছে। তাঁরা 'ক্রিয়া' নামে যে পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, তার আসল অর্থ হল, বিবসনা কালিকার প্রতিনিধিরূপিণী একটি কৃষ্ণাঙ্গী নারীকে সংগ্রহ করে মদ্যপানান্তে তার সঙ্গে অস্খলিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হওয়া। কৌল মণ্ডলীর আচার্য যিনি তিনিই এই অনুষ্ঠানে ভৈরবের ভূমিকা নেন এবং ভক্তমণ্ডলী গীত-বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠানটির সৌকর্য বিধান করেন। কিন্তু ধারক শক্তির ন্যূনতাবশত অনিবার্যভাবেই স্খলন হয়—কাজেই এক ভৈরবের পক্ষে সমগ্র লগ্নকাল কুম্ভক-সঙ্গমে লিপ্ত থাকা সম্ভব হয় না, ভক্তবৃন্দ তাই উপর্যুপরি সঙ্গমানুষ্ঠান করতে করতে অমাবস্যার আসর জমিয়ে রাখেন।

"অঘোর পন্থা, অশোক পন্থা, মার্গসাধন পন্থা, আরো নানা শ্রেণীর তন্ত্রাচার চলিত আছে, যা বিকৃত যৌনাসক্তির বীভৎস নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সব দলের এক ব্যক্তি একদা মৃতা নারী রমণের অপরাধে ধরা পড়েছিল—কোন অপরাধের ভাব না দেখিয়ে অম্লানবদনেই সে বললো যে, মৃতদেহে আর ইট-কাঠ-পাথরের প্রভেদ কি? পাঞ্চভৌতিক সত্তা যখন পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে, তখন দেহবস্তুর অন্তর্গত চক্ষুকর্ণের মতো যোনিও মৃত—সেই মৃত প্রত্যঙ্গে লোষ্ট্র নিক্ষেপও যা, শুক্রপাতনও তাই। তত্ত্ববিশ্লেষণ ছেড়ে, তাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করা হলে, সে বললে, ভূতসিদ্ধি লাভের উপায় হিসাবেই সে এই কার্য করে। এতে আমাদের সকলেরই কল্যাণ হবে। একটি মৃতাচারী তান্ত্রিক মেদিনীপুর জেলার কোন শালবনে নিক্ষিপ্ত এক মৃত যুবতীর ওপর মৈথুনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হচ্ছিল, এমন সময়ে কাষ্ঠাহরণকারী সাঁওতালরা দেখতে পেয়ে তাকে তাড়া করে। তারা বলে, মৃত মেয়েটিকে ভূতে সঙ্গম করছিল। তারপর মৃত শিশু ভক্ষণ নিরত সেই ব্যক্তি নিকটবর্তী এক গ্রাম্য শ্মশানে ধরা পড়ে। এ ছাড়া মৃত নারী গমনের বিবরণ আরো আছে আমার সংগ্রহে, এখানে আর বিশদালোচনা অনাবশ্যক। এ একটা বিশেষ তন্ত্রাচার এবং এর রূপক ব্যাখ্যাও সুবিদিত।

"বিকৃত তন্ত্রাচারের তালিকা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পাঁচজন কৃষ্ণকায় নারী থেকে যথাক্রমে ঋতু-শোণিত, মূত্র যোনি-স্রাব, নিষ্ঠীবন ও সঙ্গম-ক্লেদ সংগ্রহ করে, তার ন্যাকড়া পঞ্চপুষ্প নামে ব্যবহার করা—অর্থাৎ অঙ্গে ধারণ করা, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া, প্রদীপ জ্বালিয়ে যোনি ও লিঙ্গের আরতি করা ইত্যাদির বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করা গেছে। এ ছাড়া মূত্র পান, শুক্র সেবন, যোনি লেহন, পায়ু লেহন মুণ্ডিত যৌনকেশের ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র ললাটে ধারণ; এমনকি পশুমৈথুনও কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষে তন্ত্রাচাররূপে অনুষ্ঠান করে, তার সংবাদ পেয়েছি—স্বীকৃতিও আছে অল্পসল্প।

"এক শ্রেণীর শক্তি-সাধিকা আছে, যারা বাহ্যত পুংসংস্রব বর্জন করে চলে—এদের দেশজ নাম কারুণী—এদের মধ্যে একজন নারীই ভৈরব রূপে অন্যান্য নারীতে উপগত হয়; দলবদ্ধভাবে নারীতে নারীতে যোনি সংযোজন যোন্যবলেহন, শিবাকৃতি যে কোন জিনিস যোনিতে সংস্থাপন ইত্যাদি অনুষ্ঠানও এদের মধ্যে ব্যাপক। এই সম্প্রদায়ের আখড়া পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও আছে শোনা যায়, কিন্তু গৃহস্থ পরিবারের অন্তর্গত বাল্য বিধবাদের মধ্যে গোপনেই এর চলন বেশী। আবার শক্তিসম্পর্কহীন পুরুষাচারী তান্ত্রিকও আছে—যারা কোন অভিপ্রেত বালককেই ভৈরবীরূপে গ্রহণ ও রমণ করে। বহু

ভৈরবের দ্বারা উপক্রত এই রকম একটি বালক চিকিৎসার্থ কোন ডাক্তারের কাছে এসেছিল—বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ভৈরবদের হদিস সে বলে নি, তবে তাদের অভ্যাস ও অনুষ্ঠানাদির বিবরণ কিছুই গোপন করে নি। যারা মৃতদেহ খায়, মল-মূত্র-রক্ত-থুথু কিছুতেই যাদের ঘৃণা নেই, এমন একটা সম্প্রদায় যে যৌনানুষ্ঠানের ব্যাপারেও চরমতম বিকৃতির অনুগামী হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

"বৈষ্ণবদের মধ্যেও বহু রকমের যৌনবিকৃতি প্রচলিত আছে, যার খবর হয়ত কেউ কেউ অল্পবিস্তর রাখেন। গোপীভাবে ভজনার নামে পুরুষের কৃত্রিম স্তন ধারণ, শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডন, ঘাগরা ও অলঙ্কার পরিধান, মাসে মাসে কৃত্রিম ঋতুপালন ইত্যাদি কোন সম্প্রদায়ের ভেতর সাধনার অঙ্গ হিসাবেই চলিত আছে। এক আখড়ায়, এইরকম আটজনকে দেখেছিলাম, তাঁরা 'অষ্টসখী' নামে পরিচিত। ঘোমটা দিয়ে মেয়েলি সুরে কথা বলা, বা চলাফেরা ও ওঠাবসায় সার্থক নারীত্বের অভিনয় এঁদের ক্ষেত্রে এমনি সহজসাধ্য দেখেছিলাম যে গোড়াতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এঁরা হয়ত পুরুষত্ব-বর্জিত, নয় বিকৃত কামাসক্তিপরায়ণ। অনুসন্ধান নিষ্ফল হয় নি—জানা গেল যে নিজেরা ব্রজগোপী সেজে ছোট ছোট ছেলেকে রাখাল বালক-রূপে আয়ত্তে এনে, খাদ্যাদির দ্বারা প্রলুব্ধ করে এঁরা কেউ কেউ তাদের সঙ্গে সমমৈথুনে প্রবৃত্ত হন—কেউ কেউ নারীর বেশে নাবালিকাদের মধ্যে অবাধ প্রবেশের সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে কামানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। দু-তিনটি স্বীকৃতি থেকে জানতে পেরেছি যে সমমৈথুনের ব্যাপারে এঁরা অনেকেই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে, নিয়োজিত বালকদিগকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ান আর প্রত্যক্ষ মৈথুনে নাবালিকাদের কামাঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করেন—অথবা তাদের দিয়ে হস্তমৈথুন করিয়ে নেন—কেউ কেউ অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়াত্মক সঙ্গমও করেন। কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যাপারই নিষ্পন্ন হয় ধর্মাচরণের নামে—আর 'হরি হরি' 'রাধে রাধে' ধ্বনি সহকারেই অনুষ্ঠানে গাম্ভীর্য সঞ্চার করা হয়ে থাকে।

"বৈষ্ণবের 'কিশোরী ভজন' অনুষ্ঠানও অনেকটা শৈবদের গন্নণের মতো ব্যাপার—অক্ষতযোনি অনুদ্গতযৌনকেশা ব্রজ-কিশোরীদের (কৃষ্ণ, যাঁদের বস্ত্রহরণ করেছিলেন) প্রতীকরূপিণী কুমারীদের সংগ্রহ করে কৃষ্ণরূপী গোঁসাই তাদের কৌমার্য ভেদ করেন—তারপর কৃষ্ণের নামে উৎসর্গিত সেই কিশোরী অপরাপর ভক্তের সেব্যা হয়। এখানে মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, নাম-

সঙ্গীত হয়। কিঞ্চিৎ অর্ঘ্য মূল্যেই এই সব কিশোরী সংগৃহীত হয়—রসমার্গে দীক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তিপরায়ণ কোন কোন দরিদ্র অভিভাবক স্বেচ্ছায়ও কন্যাদের এখানে পাঠিয়ে থাকেন। সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রেম-চর্চিকা বা প্রেম-চর্চরী অনুষ্ঠানের বিষয়ও কিছু কিছু সংগ্রহ হয়েছে। খুব গোপনে কোন কোন আখড়ায় প্রচুর পরিমাণ ময়দা ঢেলে, তার ওপর রাধাকৃষ্ণ ব্রজলীলায় ব্যাপৃত হয়, তারপরে সেই ময়দার লুচি বানিয়ে ভক্তজনের মহোৎসব ও গান-কীর্তন হয়। এছাড়া বালগোপালরূপে বয়স্ক ভক্ত কর্তৃক যুবতীদের ক্রোড়ে আরোহণ, স্তন পান, অথবা নন্দকিশোররূপে কুমারীদের সঙ্গে দোল, রাস, ঝুলন এবং বস্ত্রহরণ ইত্যাদিরও অভিনয় হয়ে থাকে—আর সে সব কুমারী সংগৃহীত হয় গৃহস্থাঞ্চল থেকেই এবং অনেক স্থলেই কুমারী নামে তার ভেতর বিধবা, বিবাহিতা এমন কি বেশ্যাও থাকে। গোষ্ঠলীলারূপে পুংমৈথুনও চলে প্রচুর পরিমাণে।

"শাক্ত অঘোরীদের মতো বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যেও রকমারি ঘৃণ্যকারজনক ব্যাপার—যেমন, শুক্রপান, কুম্ভক মৈথুন, লিঙ্গারাধনা ইত্যাদি প্রচলিত আছে। তত্ত্ব সেই একই—পুরুষ-প্রকৃতি অভিন্ন মিলনে তুরীয়ানন্দ অনুভব এবং ঘৃণা লজ্জা ভয় প্রভৃতি বাস্তববোধকে অতিক্রম করে নিত্যসত্য নিরঞ্জনাবস্থা লাভ। কার্যত কিন্তু যৌন ব্যভিচারকেই এইভাবে ধর্মের নামাবলী চাপা দিয়ে উপভোগ করা হয়। আর উদ্দেশ্যপরায়ণ ভণ্ডেরা ভক্তবেশে এর ভেতর ঢুকে এই যথেচ্ছাচারের অংশীদার হয়।

"আউল, বাউল, দরবেশ, কর্তাভজা ইত্যাদি অন্যান্য সহজিয়াদের মধ্যেও এই রকম বা আরও অনেক রকম কদনুষ্ঠান চলিত আছে। পুরুষে পুরুষে ও নারীতে নারীতে সমমৈথুন, শুক্র-শোণিত পান, যোন্যবলেহন, যৌনাঙ্গ পূজা ইত্যাদি এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যেও পূজা-পদ্ধতির অনুষ্ঠান হিসাবেই স্বীকৃত ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শুক্র সংমিশ্রিত সরবৎকে এঁদের কোন কোন দল 'সুধা' বলেন, ঋতুসিক্ত ন্যাকড়াকে বলেন 'বস্ত্র' এবং তা-গুপিযন্ত্র বা একতারাতে সন্নিবিষ্ট করে রাখেন। অপরাজিতা ফুল যোনির প্রতীক বলে তাকে এঁরা 'টোটেম' হিসাবে ব্যবহার করেন—যোনি বা পায়ু সংস্পৃষ্ট ঝুমকো জবা ঠিক কি কারণে ব্যবহৃত হয় বলতে পারি না, তবে তা দিয়ে একাধিক 'করণ' হয় শুনেছি। আসলে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব যে কোন পর্যায়ের সহজিয়াই কতকগুলি আনুষ্ঠানিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই ধরনের যৌনাপচার করে থাকেন, এতে

মনে হয় আদিম মানুষের যৌনারাধনা নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে আজো অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছে, আর শাস্ত্রাদেশের বিকৃত ব্যাখ্যান দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। বস্তুত নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধান এদিক থেকে বেশী পাথেয় সঞ্চয় করে নি বলেই এর আদি সূত্রটি আবিষ্কার করা এখনও সহজ হয় নি—কিন্তু বাংলাদেশে যে এ-পথে গবেষণা চালানোর প্রয়োজন রয়েছে, তা আশা করি এই প্রবন্ধের পাঠক-পাঠিকা অনুধাবন করেছেন।

"ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নর-নারীদের কুৎসা-কীর্তন আমার উদ্দেশ্য নয়, একথা আশা করি বুঝিয়ে বলতে হবে না এবং যে কোন বৈষ্ণব বা শৈব বা শক্তিই যে এই সকল অনুষ্ঠানে লিপ্ত আছেন এমন কথাও আমি বলি নি—সত্যকার শুদ্ধচেতা, সদাচারী ও নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক অনেক আছেন, হয়ত সংখ্যায় তাঁরাই অধিক, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পেছনেই আছে এই শ্রেণীর এক-এক দল দুষ্কৃতকারী, যারা স্বল্পশিক্ষিত, দরিদ্র ও বিশ্বাসপ্রবণ নর-নারীকে ধর্মের জাল বিছিয়ে ধরে আনে ও ব্যভিচার এবং বিকৃতির পঙ্কে ডুবিয়ে দেয়। সভ্য সমাজের সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়েই যেমন চোর জুয়াচোর জালিয়াৎ গুণ্ডা প্রভৃতি লোকালয়ের শান্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে, এরাও ঠিক তেমনিভাবেই তার নৈতিক জীবনকে হৃতশ্রী ও কদভ্যাসতুষ্ট করে থাকে। তবে পার্থক্য এই যে, 'নীচের জগৎ' জনসাধারণের বিশ্বাস ও সহযোগিতায় লালিত হয়—তাই রাষ্ট্রের আইন এদের কোনদিন আয়ত্তে আনার সুযোগ পায় না।

"কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ধর্মাচারণে নিরত নরনারীই যে কেবল বিকৃত যৌনাচার করে, তা নয়। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মার্কা-মারা নয়, এমন অনেক দলও দেখা যায়, যারা ধর্মাচরণের নামে অনেক রকম অপচার করে থাকে—তুক-তাক, ঝাড়ফুঁক, গাছচালা, নলচালা, বশীকরণ, গর্ভপাত, অনেক কিছু ব্যাপারেই অজ্ঞ, জনসাধারণ তাদের শরণাপন্ন হয় এবং তারাও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার পূর্ণ মাত্রায় করে। এক অবধূত তাঁর উচ্ছ্রিত ও উন্মুক্তাগ্র জননেন্দ্রিয় দিয়ে ভারোত্তলন করে মহিলাদের নমস্য হয়ে উঠেছিলেন মুর্শিদাবাদে—পায়ু ও লিঙ্গের দ্বারা জলপান করে গ্রাম্য নরনারীকে অবাক করে দেওয়ার আর একটা ঘটনাও শুনেছি—ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম মৈথুনেও শুক্রপাত না হতে দেবার আস্ফালন করে, যে কোন নারীকে তা পরীক্ষা করে দেখতে আহ্বান করেছিলেন আর এক সিদ্ধপুরুষ এবং গ্রাম্য নারীরা বাবার বিভূতি পরীক্ষা করার মানসে এক গোয়াল ঘরে সমবেত হয়ে কোন এক

নষ্টা নারীকে এই কাজে নিয়োজিত করেছিল এবং শুনেছি বাবার আশ্চর্য ক্ষমতায় বিমোহিত হয়ে তাঁকে দেবতা বলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। বাবা নাকি বলেছিলেন, 'অতএব বুঝতে পারছো এ সম্ভম নয়,—প্রত্যক্ষদর্শী এই বিবরণ বলতে বলতে ভক্তিতে আর্দ্র হয়ে উঠেছিলেন।

"ত্রিপাদ দোষ থেকে এক মৃত তরুণীকে মুক্ত করার জন্যে এক সন্ন্যাসী তার যোনিতে শুক্রক্ষেপ করে মন্ত্রোচ্চারণ করে দিয়েছিলেন—আব বলেছিলেন যে এই মেয়ে তিন মাসেব মধ্যেই আত্মীয়-স্বজনের কারুর না কারুর গর্ভে সন্তান রূপে আবির্ভূত হবে। দর্শকদের বক্তব্য যে সত্য সত্যই তা হয়েছিল—সেই চোখ, সেই নাক ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের কোন কোন স্থানে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এবং মাদ্রাজে এক শ্রেণীব ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুমারী মেয়ের মৃত্যু হলে, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন না কোন যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় শুনেছি এবং সেই যুবক কর্তৃক মৃতাব যোনি স্পর্শ করিয়ে তবেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এঁরা বলেন, নইলে নাকি ঐ কুমারী কামাতুরা প্রেতিনীরূপে পরিবারস্থ যুবকদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়। মৃতাচারীরূপে কুখ্যাত এই রকম যুবককে দেখেছিলাম—তাকে দেখলেই পাগলা ধরনেব মনে হয়, কথাবার্তা অসম্বদ্ধ, চোখেব দৃষ্টি ও অনৈসর্গিক, জিনিসটা সে স্বীকার করেছিল, তবে গুছিয়ে কোন কথা বলতে পারে নি।

"এ ছাড়া পতি কর্তৃক গৃহীত হওয়ার জন্যে পরিত্যক্তাকে, সন্তান লাভের জন্যে বন্ধ্যাকে, জরায়ুঘটিত পীড়া থেকে মুক্ত করাব জন্যে রোগগ্রস্তাকে সাধু, পীর মুরশেদ মোহান্তের দয়া ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সমাজে। এই সমস্ত ব্যবস্থার অন্তর্ভেদ করলে দেখা যাবে, কলার মধ্যে একটি যোনিকেশ দিয়ে তা ভক্ষণ করতে দেওয়া হয়, কুল গাছ বা বেল গাছের সঙ্গে সাত পাক ঘুরিয়ে একটু ধূলো পড়া যোনির উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হয়, জীবজন্তুর মৈথুনক্লেদ মিশ্রিত আলোচাল চর্বণ করে ফেলে দিতে বলা হয়—অমাবস্যার রাত্রে মৃতপাত্রে মূত্র ত্যাগ করে সেই হাঁড়ি ঈশান কোণে ভূপ্রোথিত করতে বলা হয়, আরও অনেক কিছুই বলা হয়, যা কুল-মহিলারা জানেন এবং গোপনে আপন আপন বিপন্ন কন্যা বধূদের জন্যে সংগ্রহ করে দেন।

"মোটের উপর এ সবই যৌনাপচারের নিদর্শন এবং সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ নর নারীর বিচারে এগুলো উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উন্মত্ত যৌনাপচার সমাজজীবনের অন্তঃস্থলে ব্যাপকভাবে প্রবাহিত রয়েছে এবং সামাজিক

নরনারীর মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে, কাজেই এ সম্বন্ধে সকলেরই অবহিত হওয়া দরকার।”

সেনগুপ্ত মহাশয়ের সহিত আমিও একমত। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করিবার উপায়ই প্রকৃত যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা।

স্বামীর বিপত্নীক বৈধব্য-দশাও বিবাহেতর যৌনমিলনের জন্য অনেকটা দায়ী। ইচ্ছা করিয়া পুনর্বিবাহ না করা অনেকটা যৌনকামনা লাঘবেরই পরিচায়ক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকিলেও বা সমাজের বাধা —ব্যভিচারের ইন্ধন যোগাইয়া থাকে। বৈধব্য দশা, **বিশেষ করিয়া অল্প বয়সে বৈধব্য** দুঃসহ কষ্টদায়ক। হিন্দু সমাজের বিধবাদের মধ্যে হইতে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করিবার দৃষ্টান্তও বহু। বিধবা বিবাহের আন্দোলন জাতীয় কর্মসূচীর **সর্বপ্রধান কর্তব্যের** মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

বিভিন্ন মাপকাঠি

স্ত্রীলোকেব যৌননিষ্ঠার জন্য ‘সতী’ ও ‘সতীত্ব’ বা chaste এবং chastity শব্দ আছে, কিন্তু পুরুষের সতীত্ব প্রকাশের জন্য কোনও শব্দ ভাষায় না থাকার কারণ এই যে, সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যেই নারীর ও পুরুষের নীতিপালন ও সদাচার **দুইটি ভিন্ন মাপকাঠি** দিয়া মাপা হইয়াছে। পুরুষের সতীত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলেও অধিকাংশ দেশে ও কালে নারীর সতীত্বের ন্যায় উহাকে অত্যাবশ্যক বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। সেজন্য নারীর অসতীত্বকে যত কঠোর হস্তে দণ্ডিত করা হইয়াছে, পুরুষের অসতীত্বকে তেমন করা হয় নাই।

নারী ও পুরুষের মধ্যে সতীত্বের এই পার্থক্যের অনেকটা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। কারণ, মিলনের ফলাফল নারী পুরুষের মধ্যে স্বভাবতই পৃথক। পুরুষ মিলনের পরই মুক্ত কিন্তু নারীর **দায়িত্ব আরম্ভ হয় মাত্র।** পুরুষ ব্যভিচার করিলে সে স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গ করিল মাত্র। আর স্ত্রী ব্যভিচার করিলে সে ত স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গ করিলই, তদুপরি তাহার গর্ভে এমন সন্তানের জন্ম হইতে পারে, যে সন্তান তাহার বিবাহিত স্বামীর নহে। অথচ সে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। সুতরাং পিতৃত্বনির্ধারণের সুবিধার দিক হইতে প্রধানত স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা স্বীকার্য যে **পিতৃপ্রধান** পরিবার প্রথাই এই মনোভাবের জন্য দায়ী। পিতৃপ্রধানের স্থলে

যদি মাতৃপ্রধান পরিবারপ্রথাই প্রচলিত থাকিত, তবে নারীর সতীত্বের অতটা প্রয়োজন থাকিত না।

অবিবাহিত নারীর জন্য সতীত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অবস্থায় অত্যাবশুক মনে করা হইত। কারণ, অবিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করিয়া তাহার অসতীত্বকে গোপন রাখিয়া ধার্মিক সাজিয়া সমাজে চলাফেরা করিতে পারে, অবিবাহিতা নারী গর্ভসম্ভাবনার দরুন তাহা পারে না। কাজেই অবিবাহিতা নারী নিজের সতীত্ব রক্ষা করিতে (ভয় হইলেও) অধিকতর চেষ্টা করিত।

এইরূপে ক্রমশ নারীর দৈহিক বিশুদ্ধিকে অপর সমস্ত গুণের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কোন স্ত্রীলোক যদি মিষ্টভাষণ, সহৃদয়তা, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ, দয়া-দাক্ষিণ্য, বদান্যতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণশালিনী হয়, তথাপি পরপুরুষের সহিত তাহার দৈহিক সম্বন্ধের কথা প্রচার করা হইলে লোকচক্ষে, বিশেষত মেয়েদের কাছে, তাহার সমস্ত সদ্‌গুণ মূল্যহীন হইয়া যায় এবং সে অবজ্ঞেয় ও অস্পৃশ্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে বহু কলহপ্রিয়া, কটুভাষিণী. স্বার্থসর্বস্ব, চোর, মিথ্যাবাদিনী, প্রবঞ্চক, মিথ্যানিন্দারটনাকারিণী, সঙ্কীর্ণ ও নীচমনা স্ত্রীলোক, যাঁহাদের পদস্খলনের কথা জানাজানি হয় নাই, শুধু ঐ গৌরবে বুক ফুলাইয়া বিচরণ করেন ও প্রথমোক্তদের নিন্দায় পঞ্চমুখ ও লাঞ্ছনায় নির্মম হন।

স্বামীর অপর নারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে তীব্রতর ঈর্ষাশালিনী স্ত্রীলোকেরা, পতির যৌননিষ্ঠা তথা তাহার ভালবাসা বজায় রাখিবার এবং স্বৈরিণীদের কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য, পুরুষের সহিত নারীর ব্যবহারের অর্থাৎ তাহার দৈহিক বিশুদ্ধির ও সুনীতির আদর্শ ও মান অত্যন্ত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই নরনারীর সুনীতির মান ও আদর্শ দুই প্রকার (Double standard of morality) হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু যদি নারী ও পুরুষের সতীত্বকে প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠি দিয়াই মাপা হয়, তবে বর্তমান যুগে পুরুষের অসতীত্ব অপেক্ষা নারীর অসতীত্বকে অধিক নিন্দা করা যায় না। যে সমস্ত লোক নারী ও পুরুষের সতীত্বের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানিয়া এযাবৎ একই ধরনের অপরাধের জন্য পুরুষকে ক্ষমা ও নারীকে শাস্তিদান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা শুধু এই যুক্তিতেই তাহা করিয়াছেন যে, নারী গর্ভধারণ করে বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে এত অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, "স্রষ্টা পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, আমরা কি করিব?"

এই যুক্তি ও মতবাদ যদি সত্য ও আন্তরিক হয়, তবে বর্তমান যুগে যখন জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণ-প্রয়োগে নারী গর্ভধারণ না করিয়াও উপভোগ করিতে পারে, তখন অসতীত্বের জন্য নারীকে পুরুষের চেয়ে এক তিল বেশী নিন্দা করা যাইতে পারে না।

যৌননিষ্ঠা ও সতীত্বের পুরাতন আদর্শের প্রতি অধুনা এক অবজ্ঞা বিদ্বেষ ও বিদ্রোহভাবেরও সূচনা দেখা যাইতেছে। অনেকে উহাদের **অসারতা বা অনাবশ্যক আড়ম্বর** দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইযাছেন। এমন কি অনেকে ঠিক তাল সামলাইতে পারে নাই। একদল পণ্ডিতের অভিমত এই যে, **বয়ঃস্থা নর ও নারীর স্বেচ্ছাসম্পাদিত যৌনমিলনে অপরের নিন্দা বা স্তুতির কারণ থাকিতে পারে না।** Victor Marguerítte এই মতবাদকে 'Ton corps est a toi' অর্থাৎ **তোমার শরীর তোমার নিজের** এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমার নিজের দেহ অন্য কাহাকেও দান করিবার ক্ষমতা তোমার নিজের—ইহাতে অন্যের কিছু বলিবার নাই। তাই বয়ঃস্থ নর ও বয়ঃস্থা নারী যদি স্বেচ্ছায় পরস্পর উপগত হয় তাহা হইলে অপরের সেদিক হইতে দৃষ্টি অপসারণ করা ছাড়া অন্য কর্তব্য নাই।

এইরূপ মতবাদ শুধু মতবাদ হিসাবে মানিয়া লওয়া গেলেও বলিতে হইবে ইহা **পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ মাত্র।** মানুষের **স্বাধীনতা** বা **অধিকার** অনেক কিছুতেই আছে, কিন্তু আবার উহাদেব সঙ্গে সঙ্গে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রয়াসে তাহাকে নানারূপ **দায়িত্ব** স্বীকার করিতে হইতেছে। সুষ্ঠু সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে **অধিকার ও দায়িত্বের সামঞ্জস্য বিধানে।**

আমি যে-কোনও রাস্তায় যে-কোনও বেগে মোটর হাঁকাইয়া যাইতে পারি, ইহা আমার অধিকার। কিন্তু অপরেও সেই সেই রাস্তায় চলাফেরা করে ও করার অধিকারী, সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া অপরের সেই অধিকার সুবিধা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে অপরেরও ঐ স্বেচ্ছাচারিতার ফলযোগ আমাকেও করিতে হইবে।

অপর পক্ষে আবার নর ও নারী নিজেরাই কি করিলে কি হয় বা হইতে পারে তাহা সুধীবৃন্দ বা বিজ্ঞানীদের নিকট হইতে জানিতে চায়। শিশুকে যাছা-তাহা খাইয়া নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে দেওয়া যায় না; বয়ঃস্থ নর ও নারীকে অতদূর সংযত করা না গেলেও তাহাদের গতিপথের কোথাও

লুক্কায়িত বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও ; তাহাদিগকে অন্তত সে বিষয়ে অবহিত করা, হিতৈষীদের কর্তব্য। অবশ্য যতদূর সঠিকভাবে উপদেশ দেওয়া যায় ততই ভাল।

বিজ্ঞানের অভিমত **যৌননিষ্ঠা** বা **সতীত্ব** রক্ষার দিকে। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক কথা বিবেচ্য।

যৌননিষ্ঠার স্বরূপ বিশ্লেষণ

হ্যাভলক্ এলিস বলেন—আমরা যৌননিষ্ঠার আদর্শকে উহার অস্বাভাবিক রূপসমূহ হইতে নির্মমভাবে মুক্ত না করিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যদি উহা দ্বারা আমরা যৌনজীবনে শুধু অনশনব্রতীদের ক্রিয়াকলাপের অবসাদকর অনুকরণ বুঝি এবং ঐ প্রচেষ্টায় সমস্ত শক্তিক্ষয় করিয়া শুধু ভোগ হইতে নিবৃত্ত থাকা ছাড়া আর কোন মহত্তর লাভ না হয় তাহা হইলে উহা উপযুক্ত আদর্শ নহে। উহা যদি দুর্বলতাবশত একটি বাহ্যিক আচারের আনুগত্য হয়, যে প্রথা ভাঙিবার সাহস নাই তাহা হইলে উহা আদর্শ নহে। উহা যদি এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর চাপাইয়া দেওয়া নীতিবিধি মাত্র হয় তাহা হইলে উহা অবিচারমূলক এবং অপর শ্রেণীকে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে। উহা যদি স্বাভাবিক যৌন-আচরণ হইতে নিবৃত্তি হয় অথচ তৎস্থলে অধিকতর অস্বাভাবিক বা গোপন প্রণালীসমূহ অবলম্বিত হয় তাহা হইলে উহা অসত্য এবং ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি উহা দ্বারা কেবলমাত্র বাহিরে সমাজ-প্রথা মানিয়া চলামাত্র হয় কিন্তু অব্যক্ত কিছু (মহত্তর আদর্শ) স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে উহা ঘৃণার্হ প্রহসন মাত্র। যৌননিষ্ঠার এই সমস্ত রূপই গত দুই শতাব্দী ধরিয়া বহু মহাপ্রাণ ব্যক্তি জোরের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন। উপরোক্ত মন্তব্যে এলিস **যৌননিষ্ঠা ও সতীত্বের অসার, বিকৃত বা কৃত্রিম রূপের** উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলি আদর্শ যৌননিষ্ঠা নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে মাত্র।

প্রথমত **কেবলমাত্র নিবৃত্তিমূলক ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অনর্থক উপবাসীদের মত সারাজীবন আত্মদমন করিতে গিয়া কষ্ট পাওয়া ও অশান্তি ভোগ করা অকারণ ও বৃথা।**

ইহাতে লাভ কি? এইরূপ করিলে ব্যক্তির ও সমাজের কি উপকার

হইবে? ঐরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগীর সংখ্যা বাড়িলে জগতে মানববংশ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবে নাকি?

ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্য, রিপুদমন, সন্ন্যাস প্রভৃতি জগতের সকল দেশে সকল সমাজে সকল ধর্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বসিয়াছিল। এখনও উহাদের প্রভাব বিদূরিত হয় নাই। উহাদের প্রতিপত্তি অনেকটা কমিয়া গিয়া থাকিলেও প্রাচ্যদেশসমূহে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির অধিকাংশ নর ও নারীর, বিশেষত নারীদের, উহাদের প্রতি একটা সশ্রদ্ধ মনোভাব রহিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সদুদ্দেশ্য ও কুসংস্কার অন্যান্য জায়গার মত উহাদের মধ্যেও ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল এবং আজও মিশিয়া আছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে উহাদের মধ্যেও কতটুকু সত্য নিহিত আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

পূর্বকালে রিপুদমন এবং মনঃসংযম করিয়া ধর্মলাভ ও আত্মোন্নতি সাধন করা যায় এইরূপ বিশ্বাস প্রায় সার্বজনীন ছিল। মানুষের প্রবৃত্তিগুলিকে উন্নত ও পাশবিক—মোটামুটি এই দুইভাগে ভাগ করিয়া মনে করা হইত যে এই দুই শ্রেণী পরস্পরের বিরোধী, শরীরের তৃপ্তিসাধনে ভোগসুখে মন যায়, সুতরাং আত্মার অবনতি ঘটে, আত্মার উন্নতি করিতে হইলে শরীরে অবহেলা ও নির্যাতন ও ভোগবাসনা দমন আবশ্যক। দৈব ও যাদুতে বিশ্বাসবান্ প্রাচীন মানব স্থূলদৃষ্টিতে জাগরিত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক শুভাশুভের কারণপরম্পরা নির্ধারণ করিয়া বসিত। তাই রিপুদমনের বহুবিধ প্রক্রিয়া দেখা যায়। প্রধান প্রধান আচারের মধ্যে উপবাস, বিলাসিতা বর্জন ও দেহ সৌন্দর্যের অযত্ন—যথা উলঙ্গ অবস্থান, স্নানাদি পরিহার, চুল ও দাড়ি-গোঁফ না কাটা, সামান্য স্থূল বস্ত্র পরিধান, ছাই মাখা; শরীরের নির্যাতন—যথা, লৌহশলাকার উপরে অবস্থান, হেঁটমুণ্ডে, বহ্নিচক্রের মধ্যে বা জলমধ্যে অবস্থান, একাসনে ঊর্ধ্ববাহু হইয়া উপবেশন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল আচার-অনুষ্ঠান বহু পুরাতন হইলেও আজ পর্যন্ত নানা বেশে নানা দেশে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিতেছে।

ইহার মধ্যে **ব্রহ্মচর্য** বহুল উপকারী বলিয়া প্রাচীন লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এক ফোঁটা শুক্র ৪০ ফোঁটা রক্তের সমান, সুতরাং সামান্য বীর্যক্ষয়ও শরীর ও মনের অনিষ্ট করে এইরূপ **ভ্রান্ত** ধারণা ছিল।

কুমারীত্বেরও একটা বিশিষ্ট গুণ আছে মনে করা হইত। অনেক সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার যুদ্ধের অস্ত্রাদি কুমারীর হস্তে সমর্পণ করতেন। সে কুমারীত্ব হারাইলে সমস্ত অস্ত্র কলুষিত হইয়াছে ভাবিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত।*

এমন কি, খাদ্যশস্যের **প্রাচুর্যের** জন্য, যুদ্ধবিগ্রহে **সফলতার** জন্য, কোন নূতন অভিযানের **শুভাকাঙ্ক্ষায় যৌনসংযম** পালন করা হইতে।

কতক জাতির মধ্যে শস্যবপনের পূর্বে চারিদিন স্ত্রীসহবাস হইতে বিরত থাকিবার প্রথা ছিল। তাহারা মনে করিত, এইরূপ করিলে শস্যবপনের ঠিক সময়ে পুরামাত্রায় যৌনসম্ভোগ কবিতে পারিবে এবং তাহাদের নিজেদের প্রজননশক্তি শস্যে সঞ্চারিত হইয়া প্রচুব ফসল হইবে। নিকারাগুয়ার (Nicaragua) অধিবাসী ইণ্ডিয়ানবা আবার শস্য বপন হইতে শস্য আহরণ পর্যন্ত পূর্ণ সময়টায় স্ত্রী সহবাস হইতে বিবত থাকে এই ভাবিয়া যে, তাহাদের রক্ষিত প্রজনন ক্ষমতা শস্যে রূপান্তরিত হইবে।

ইহা ছাডা পবিবারে কাহাবও মৃত্যুর পরে, ধর্মীয় কোন ব্রতের সময়ে, অন্যান্য গুরুতর সমস্যার প্রাক্কালে এইরূপ সংযম পালনের প্রথা ছিল ও আছে। **হিন্দুশাস্ত্রে** পালনযোগ্য চতুর্বিধ আশ্রম—**ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ** ও **সন্ন্যাস**। শরীর ও মনেব উৎকর্ষ বিধান এবং ইন্দ্রিয় দমনে ইচ্ছাশক্তির বিবৃদ্ধিই প্রধানত **ব্রহ্মচর্যের** উদ্দেশ্য ছিল। এই অবস্থায় গুরুগৃহে বাস করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা ছিল। রাজপুত্র হইতে দরিদ্র পুত্র পর্যন্ত সকল ব্রহ্মচারীকেই গুরুর আজ্ঞা পালন, দুঃখে সহিষ্ণুতা ও সুখে স্থিরতা অভ্যাস, নিরামিষ ভোজন করিতে এবং ঊর্ধ্বরেতা হইতে হইত। **মনঃসংযম** আয়ত্ত করা একান্ত আবশ্যক ছিল। **দুর্নিবার কামরিপুকে সংগ্রামে পরাভূত করা আত্মবশ্য রাখাই** আশ্রমীদের প্রধান কর্তব্য ছিল।

যৌন সংযম প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে মৈথুনকে আট প্রকারে ভাগ করা হইয়াছে † যথা, স্মরণ (পরস্ত্রী বা পরপুরুষের লোভনীয় রূপে অথবা তাহাদের

* হিন্দুদের মধ্যে কুমারী-পূজা এবং রোমের ভেষ্টাল ভার্জিনদের কথা মনে করুন।

† স্মরণং কীর্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্প অধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ॥

সহিত যৌন-সম্পর্ক সম্বন্ধে চিন্তা করা), কীর্তন (তাহাদের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করা), কেলি (তাহাদের সহিত প্রেমক্রীড়া), প্রেক্ষণ (তাহাদের দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করা), গুহ্য ভাষণ (নির্জনে, গোপনে প্রণয় মধুর সম্ভোগ সম্পর্কীয় কথা বলা), সঙ্কল্প (দেহমিলন সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা), অধ্যবসায় (সেই উদ্দেশ্যে ক্রমাগত নিরলস চেষ্টা করা), ক্রিয়া নিষ্পত্তি (চেষ্টার সাফল্যের সুরতানন্দ লাভ)।

এই আশ্রমে অভ্যস্ত সংযম ও লব্ধ আত্মোন্নতি হইতেই পরবর্তী গার্হস্থ্যাশ্রমে সুখসমৃদ্ধি উদ্ভূত হইত এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। পরবর্তী আশ্রম **গার্হস্থ্য**। ইহাতে পত্নী পরিগ্রহ, সন্তান উৎপাদন ও পরিবার পালন ইত্যাদি কর্তব্য কার্য। *হিন্দু, বৌদ্ধ ও রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মে সাধু-সন্ন্যাসীরা চিরকুমার রহিয়া* গেলেও গোটা সমাজের জন্য **গার্হস্থ্য** আশ্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রে বালিকাদের সকাল সকাল বিবাহ দিবার যুক্তিসঙ্গত আদেশও আছে। তবে 'অষ্টমবর্ষে গৌরীদান' ভালর বাড়াবাড়ি। **বৌদ্ধধর্মে** পুরুষের পক্ষে যৌন সংযম পালন একটা মস্ত বড় আদেশ। ইহা জীবনের **প্রথম** ও **শেষ** দিকে কর্তব্য হইলেও, আস্তে আস্তে সারা জীবনেও উহা পালনীয়, এইরূপ ধারণা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া ধর্মযাজকদিগকে নারীর কুহকে পড়িবার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হইয়াছে। যে সকল ধর্ম এইরূপ কঠোর আত্মদমনে উৎসাহ দান করিয়াছে তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম অন্যতম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয় (ক্যাথলিক) চিরকুমার ও কুমারী ধর্মযাজকদের আচরণে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই আদর্শ নামমাত্রে পালিত হইলেও **ব্যভিচারের পরিমাণ খুব ব্যাপক ও জঘন্যই ছিল**।

খ্রীষ্টীয় ধর্মে মানুষের **অতি স্বাভাবিক** প্রবৃত্তিকে নোংরা, ঘৃণ্য ও হেয় মনে করা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকেরা বাড়াবাড়ি করিতে করিতে একেবারে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন; যৌন-অঙ্গসমূহের আলোচনা গর্হিত; উহাদের চরিতার্থতার বাসনা মানবীয় নহে, পাশবিক! **যীশুখ্রীষ্ট** নিজে যতটা বলেন নাই তার বহুগুণ বেশী বলিয়াছেন তাঁহার অনুগামী ধর্মযাজকেরা। **সেণ্ট্ অগস্টিন** এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পুরুষাঙ্গ মানুষের ইচ্ছাশক্তির বহির্ভূত, উহার উত্থানশক্তি ও নড়াচড়া লজ্জার বিষয়; তাই যাবতীয় যৌন-কার্যই ঘৃণার উপযুক্ত; ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টীয় ধর্মসমাজে অবিবাহিত ধর্মযাজক ও অবিবাহিতা ধর্মযাজিকা শ্রেণীর আবির্ভাব হইল। ইহারা বাস্তবজীবনে যাহাই

করুন না কেন, অপরকে উপদেশ দিবার বেলায় যৌনবৃত্তির অপযশে পঞ্চমুখ থাকিতেন।

তাই একদিকে যৌনকামনা যে পাপজনক, মানুষকে উহা পশুর সমশ্রেণীতে ফেলিয়া দেয়, উহার চরিতার্থতা ঘৃণা ও লজ্জার বিষয়, সুতরাং উহাকে সম্পূর্ণ ভাবে সংযত রাখিতে হইবে এইরূপ খ্রীষ্টীয় মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, অপর দিকে আবার যৌনসম্মিলন ব্যতিরেকে প্রজনন সম্ভব নয়, তাহাও অগত্যা স্বীকৃত হইয়াছে। এই উভয় দিকে সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া কেহ কেহ এই মতবাদে উপনীত হইয়াছে যে, যৌনসম্মিলন মোটামুটি ঘৃণ্য ও বর্জনীয়, কিন্তু মানসিক শান্তি ও সামাজিক পবিত্রতার খাতিরে উহার সাময়িক ব্যবস্থা করিলেই হইবে "It is better to marry than to burn"* অর্থাৎ বাসনার অগ্নিতে পুড়িবার অপেক্ষা বিবাহ করা ভাল।

তাই পুরুষ বিবাহ করিবে এবং পুত্রকন্যা উৎপাদন মানসেই শুধু মিলিত হইবে, আত্মতৃপ্তির জন্য নহে। এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করিলেও বিবাহিত জীবনে অতদূর সংযম পালন করা সম্ভব কিনা সন্দেহ। স্ত্রীর যৌনকামনা বলিয়া কোন কিছু আছে এই মতবাদে তাহা স্বীকৃত হয় না, সে মাতৃত্বের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য শুধু পাত্রী হিসাবে বীর্য গ্রহণ করে মাত্র। রাশিয়ার স্কোপ্ট্‌সি (Skoptsi) নামক এক খ্রীষ্টধর্ম সম্প্রদায়ের পুরুষেরা কামের তাড়না ও পাপের প্রলোভন হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্বহস্তে অণ্ডকোষদ্বয়, কেহ কেহ পুরুষাঙ্গও ছেদন করিয়া ফেলিত। নারীগণ তাহাদের বক্ষ, কেহ কেহ ভগ ও ভগাঙ্কুর কাটিয়া ফেলিত এবং কেহ বা ডিম্বাশয়দ্বয়ও কাটাইয়া লইত।

মনীষী হেকেল (Haeckel) তাঁহার "The Riddle of the Universe" পুস্তকে খ্রীষ্টীয় ধর্মের এই দিকটার সুতীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার মতে **যীশুখ্রীষ্টের মতবাদ পরকালমুখী**; অর্থাৎ তিনি মানব জীবনকে কদর্য ও ক্ষণস্থায়ী মনে করিয়া ভবিষ্যৎ অনাগত পরকালের ভাবনায় নিমজ্জিত ছিলেন। মানুষের পারিবারিক জীবনকে তুচ্ছ বা হেয় জ্ঞান করা, স্ত্রীলোকের কুহকে না পড়িবার উপদেশ দেওয়া, দাম্পত্য ব্যবহারকে কদর্য ও পাপজনক মনে করা ইত্যাদির ফলস্বরূপ বহু লোক চিরকুমার বা চির-কুমারী থাকিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ধর্মযাজকের দেখাদেখি বহু লোক

*বাইবেলের নব সুসমাচারের (New Testament এর) অন্তর্গত সেণ্ট পলের চিঠি।

ঐ রূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কিন্তু লজ্জার বিষয়, ধর্মযাজকদের মধ্যে যৌন আচরণ এত কদর্য ও বিকৃতভাবে দেখা দিয়াছিল যে, এইরূপ চিরকৌমার্য-ব্রত ভঙ্গ করিয়া উহাদের বিবাহ করিবার অনুমতি দিবার জন্য সুতীব্র গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। ধর্মযাজকদেব উপপত্নী রাখিবার প্রথাও জঘন্যভাবে দেখা দিয়াছিল। যে ধর্ম বৈঠকে তথাকথিত **অবিশ্বাসীদের** পুড়াইয়া মারা হইত, বিচারক ধর্মযাজকেরা তাহাতে বেশ্যা বা **উপপত্নী** লইয়া বসিতেন। অনেক পণ্ডিত মনে কবেন যে, এই সব মতবাদ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে যীশুখ্রীষ্টের জন্মেব পূর্বেই প্রচার করেন। যীশু ও তাঁহার শিষ্যেবা ঐগুলি ধর্মেব অঙ্গীভূত করিয়া লন।

প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতে এই ধর্মমতের কতকটা সংস্কার হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের পাদরীরা বিবাহ করিতে পারেন ও অবশ্য করিয়া থাকেন। **রোমান ক্যাথলিকেরা** এখনও পূর্বের মতেই আছেন। মোট কথা—প্রথমত কেহ বিবাহ না করিলেই যে **সম্পূর্ণ সৎ** বা **সতী** বলিয়া গণ্য হইবে, এমন নহে। উহার পরীক্ষা আচরণে। **ইসলাম ধর্মে** বৈবাগ্য বা চিরকৌমার্য-ব্রতের মত কিছুই অনুমোদিত হয় নাই। হযবত মোহম্মদ নিজে ও তাঁহার অনুচবেরা সকলেই পরিবার পালন করিতেন এবং পারিবারিক জীবনে পালন-যোগ্য বহু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

যৌন-উপবাস স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া পালন করাও অনেকাংশে অনর্থক ও ক্ষতিকর এবং প্রায় অসাধ্য। আমবা উহাকে **অনর্থক** বলি এই হেতু যে, মানুষ অন্য একদিক বিবেচনা করিয়া আবাব যৌননিষ্ঠার সাধনাও করিয়াছে। উহা এই: পূর্বকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যৌন-সম্মিলনে উভয়েরই বীর্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়, তাই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির দ্বারা যৌনবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিতে পারিলে নর ও নারী উভয়েই বীর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য লাভ করিতে পারে এবং অত্যধিক বা অলৌকিক মনোবল আয়ত্ত করা যায়। এই জন্য সকল দেশেই অল্পবিস্তর মুনি-ঋষি, ফকির-দরবেশ, যোগী যাদুকর ইত্যাদি লোকেরা কঠিন আত্মনিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করিয়া শক্তিলাভ করিয়াছেন এইরূপ বলিয়াছেন, বা করিতে পারা যায় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এ বিষয়ে **বিজ্ঞানের অভিমত** এই যে, পুরুষের বীর্য চিরদিন সঞ্চিত রাখিবার জিনিস নহে। ইহা ইচ্ছাপূর্বক স্খলন না করিলেও, স্বপ্নে বা প্রস্রাবের

সঙ্গে স্বতঃই নিঃসারিত হইয়া যায়। আবার যৌন-অঙ্গসমূহের কার্যপ্রণালী হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, শুক্রস্খলনের পরেই তাহার পুনঃসৃষ্টির ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইতর প্রাণীর মধ্যে ছাগল, হাঁস, মোরগ, চড়ুই পাখি যেমন অহরহ বার বার রেতঃস্খলন করিতে থাকে, তাহাতে মনে হওয়া উচিত, উহারা বীর্য-নিঃশেষের দরুন সঙ্গে সঙ্গেই মরিয়া যাইবে। কিন্তু উহাদের স্বাস্থ্য ও বল অটুট থাকে বলিয়াই মনে হয়।

অধিকাংশ আধুনিক ডাক্তারেরও অভিমত এই যে, **বহুদিনের জন্য রতি-বিরতি নর ও নারীর উভয়েরই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর।** বিশেষত স্বামী-স্ত্রী নানাভাবে নানাসময়ে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে থাকায় তাহাদের শরীর ও মনে উত্তেজনা সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হইয়া থাকে। উহা স্বাভাবিকভাবে প্রশমিত না হইলে, উভয়ের নানাপ্রকার স্নায়বিক ও যৌন-রোগ হয়। তাহাদের পক্ষে 'গায়ের জোরে' (মনের জোরে) ইন্দ্রিয় দমন যদি বা কতক সময়ের জন্য, লক্ষে এক দম্পতির মধ্যে সম্ভবপর হয়, তবু দম্পতির ব্রহ্মচর্য অবিবাহিত ব্রহ্মচারী নরনারী অপেক্ষা অধিক (শারীরিক ও মানসিক) অনিষ্টকর। অঙ্গ ও বৃত্তিসমূহের সুসমঞ্জস সংযত চালনা করাই প্রকৃতির অভিপ্রেত। উহাদের পরিমিত ব্যবহার শুভ ও কল্যাণকর।

ইন্দ্রিয় দমনের প্রবক্তরা যে উহাকে অলৌকিক শক্তির সহচর বলিয়া মনে করেন, এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। অবিবাহিত **যীশুখ্রীষ্ট, নিউটন, বেঠোফেন** এবং **কাণ্টের** কথা উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। যীশুখ্রীষ্টের যৌনজীবনের কথা জানিবার উপায় নাই, নিউটন একদিকে অপূর্ব মনীষা-সম্পন্ন হইলেও ব্যক্তিগত জীবনে অনেকটা অসম্পূর্ণ ছিলেন এবং অবশেষে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ পর্যন্ত দেখা গিয়াছিল, বেঠোফেনের জীবন অসুস্থ ও অশান্তিময় ছিল; কাণ্টের জীবনও সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ ছিল না।

পক্ষান্তরে অসংখ্য **বিবাহিত নেতা ও মনীষীর** কথা উল্লেখ করা যায়। হযরত মোহম্মদ, রাম, লক্ষণ, রাবণ, অর্জুন, ভীম, মুসা, সলোমন, সীজার, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, জিন্না, জগদীশচন্দ্র, আশুতোষ প্রমুখ মনীষীদের তালিকা করিয়া শেষ করা যায় না।

যৌননিষ্ঠার আদর্শকে যদি অন্তরের সহিত না চাহিয়া সমাজের ভয়ে উহা পালন করা হয়, তাহা হইলে উহা শ্রদ্ধার

অযোগ্য। দায়ে ঠেকিয়া শিষ্টের আচরণ হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঐরূপ আচরণের মূল্য অনেক বেশী।

স্ত্রীর সতীত্বের উপর পুরুষের জোর

যদি উহা এক শ্রেণীর মানুষ অপর শ্রেণীর লোকের উপরে নীতি হিসাবে চাপাইয়া দিয়া উহাদের বাধ্য করিবার প্রয়াস পায়, তাহা হইলে উহা **অত্যাচারমূলক অন্যায় মাত্র।**

স্ত্রীলোকেরা যে উচ্চ আদর্শে প্রণোদিত হইয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার আনকটা পুরুষ কর্তা বা নিয়ন্তা হিসাবে অথবা স্ত্রীলোককে পুরুষের সম্পত্তিবিশেষ মনে করিয়া, উহাদের উপরে চাপাইয়াছে।

কিন্তু পুরুষ নিজে যৌনস্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে নারীর চেয়ে অধিক। বহুবিবাহ, উপপত্নী গ্রহণ, বেশ্যাগমন, বিবাহেতর যৌনসম্ভোগ ইত্যাদিতে নারীকে পুরুষেব প্রয়োজন হয়, তাই নারীর নৈতিক অবনতির জন্য সে যেমন ক্রোধ ও হিংসা বোধ করে, তেমনি দায়িত্বও বহন করিতে হয়।

প্রাগ্‌বিবাহ সতীত্ব

পুরুষেব পক্ষে ব্রহ্মচর্য একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মোন্নতির ব্যবস্থামাত্র হইলেও নারীর পক্ষে পুরুষের ফরমায়েসমতই সতীত্বরক্ষার প্রয়োজন ছিল। **পুরুষ কর্তা,** নারীর **'স্বামী'** অর্থাৎ নাবী পুরুষের **সম্পত্তি-বিশেষ** বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় পুরুষ বলিয়াছে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব বজায় না বাখিলে চলিবে না। পুরুষেরা নববিবাহিতা কুমারীত্ব বরাবরই সর্বাগ্রে কামনা করিয়া আসিয়াছে। বিবাহের পূর্বে পুরুষ যাহাই করিয়া থাকুক, নারীকে সম্পূর্ণ যৌননিষ্ঠা পালন করিয়া আসিতেই হইবে, ইহা দৃঢ়ভাবে দাবি করে। শুধু তাহাই নহে, স্ত্রীর কৌমার্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা-ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে। উহার অধিকাংশই অদ্ভুত এবং অবৈজ্ঞানিক।

লিঙ্কলনের বিশপ ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার এলাকায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ন্যাসিনীদের স্তন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করিতেন। উহাতে দুধের সঞ্চার হইয়া থাকিলেই মনে করিতেন, স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে বা কৌমার্য হারাইয়াছে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি নগরীতে এক সদ্যোজাত শিশুকে জলের টবে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে ঐ নগরীর সমস্ত বয়স্কা কুমারী এবং দীর্ঘ-বিরহিণী সধবাদের স্তন পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। যাহার স্তনে দুগ্ধ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল।

গর্ভকালে বা সন্তান হইলে স্তনে দুধের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কৌমার্য হারাইলে ইহাতে দুধ অথবা অন্য কোন স্পষ্ট পরিবর্তন হয় না।

কর্ডঞ্চি (Cordonchi) মনে করিতেন, কুমারীর মূত্র অ-কুমারীর মূত্র অপেক্ষা বেশী পরিষ্কার। (পরিষ্কার-অপরিষ্কারের সঠিক মাত্রা কোথায়? নানা কারণে মূত্র ঘোলা হয়)।

রোমানদের মধ্যে বিবাহের প্রাক্কালে মেয়েদের গলার চারিদিকে সুতা জড়াইয়া সাক্ষীর সম্মুখে মাপিয়া রাখা হইত। বিবাহের পরদিন ঐ সুতা সাক্ষীর সম্মুখে আবার জড়াইয়া দেখা হইত। যদি উহা ছোট হইয়া পড়িত, তাহা হইলে মা বা ধাত্রী উৎফুল্ল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিত—"এখন আমার মেয়ে প্রকৃত নারীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" (সম্ভবতঃ প্রথমবারে টানিয়া এবং দ্বিতীয়বারে ঢিলাভাবে মাপা হইত)। ইটালী দেশের **ভার্জিল** (খ্রীঃ পূঃ ৭০—১৯)* একটি অদ্ভুত পরীক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তখনকার লোকের মতে, কুমারী স্ত্রীলোককে খুব দুষ্টপ্রকৃতির মৌমাছিও স্পর্শ করে না, কিন্তু যে কিশোরী সবেমাত্র কৌমার্য হারাইয়াছে তাহাকে যে কোনও মৌমাছি খুব হিংস্রভাবে আক্রমণ করে। (হায় কুসংস্কার! সতীত্বের অলৌকিক ক্ষমতায় ভ্রান্ত বিশ্বাস ও তাহার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফল)।

সতীচ্ছদের (Hymen) অবর্তমানতাকে অকৌমার্যের লক্ষণ মনে করা স্বাভাবিক; কিন্তু এ সম্বন্ধেও খুব নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা শক্ত। সতীচ্ছদ বর্তমান থাকিলেই যে বালিকা কুমারী, ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে উহা সহনশীল ও সম্প্রসারণশীল থাকে। এমন কি, সতীচ্ছদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও গনোরিয়া রোগ ও গর্ভাধান হইয়াছে, দুই-চারিটি ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে। **ম্যালফাভেল** বলিয়াছেন যে, তিনি অতিশয় ছোট এবং নিষ্কলঙ্ক বহু বালিকা দেখিয়াছেন, যাহাদের সতীচ্ছদ বর্তমান ছিল না। কাহারও কাহারও উহা খুব সহজে ছিন্ন হয়।

---

* ইনি সেকালের চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত ও আইনে অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু কবি হিসাবেই এঁর খ্যাতি সর্বাধিক। এঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাব্যের নাম ইনীড (Aeneid)।

মরক্কোতে এবং আরও অনেক মুসলমানপ্রধান দেশে ও **ইহুদী**-সমাজে একটি প্রথা থাকার কথা শুনা যায়। স্বামী-স্ত্রীর প্রথম রাত্রিকালের বিছানার চাদর অথবা রক্তসিক্ত এক টুকরা ন্যাকড়া একটি মেয়েমানুষের হাতে দেওয়া হয়। মেয়েমানুষটি ঐ চিহ্ন বহন করিয়া লইয়া গিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জানায় যে, বালিকাবধূ কুমারী ছিল। ইহার পরেই খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হয়। অন্যথায় নাকি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বধূকে কলুষিত বলিয়া ঘৃণাসহকারে বাপের বাড়ী ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

প্রাচীন **ইহুদীদের** মধ্যে সদ্যবিবাহিতা বধূর প্রথম সম্মিলনে রক্তপাত না হইলে তাহাকে পিতার দরজায় রাখিয়া শহরের সকল লোক মিলিয়া পাথর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিত। **চীনদেশেও** নাকি শ্বশুরবাড়ীতে এইরূপ রক্তপাতের চিহ্ন প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করা হইত। পরীক্ষা সফল হইলে হর্ষ, না হইলে বিষাদ ও বিবাদ উপস্থিত হইত। **প্যারিসে** নাকি মধুযামিনীর পর হইতে বধূ বিছানায় অন্ততঃপক্ষে চারিদিন শুইয়া থাকিত এবং এই অবস্থায় আত্মীয়স্বজন আসিয়া উহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া যাইত। ইহার অর্থ ছিল এই যে, কুমারী বধূ প্রথম যৌনসম্মিলনে কঠোর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ফলে উঠিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়াছে।

পশুপক্ষীর রক্তে ভিজানো স্পঞ্জ বা ন্যাকড়া রমণপথে রাখিয়া এবং কার্যকালে কষ্টের ভান করিয়া কুমারীত্বের প্রমাণ দেখাইবার ছলনাও অনেক ক্ষেত্রে করা হয়। আফ্রিকার **সুদান** প্রভৃতি দেশে ছোট মেয়েদের বৃহদোষ্ঠ দুইটি সেলাই করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা বিবাহের পূর্বে দেহ 'অপবিত্র' করিতে না পারে। বিবাহের পর স্বামী ঐ সেলাই কাটিয়া দেন। ploss and Bartels প্রণীত Woman গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সেলাই করা ও উহার কাটা অবস্থার আলাদা ফটো আছে। গত মহাযুদ্ধে একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি সুদানের রাজধানী আসমারায় গিয়াছিলেন। তিনি বছর দশকের একটি মেয়ে সেলাই করা অবস্থায় দেখিয়াছেন।

মানুষের প্রথার উদ্ভটতার সীমা নাই। কোথাও কোথাও আবার সতীচ্ছদ বিলোপ করার ভার অপরকে দেওয়া হয়। কারণ উহাকে ঘৃণ্য কাজ মনে করা হয় অথবা প্রথম সাক্ষাতেই বেদনা দিয়া স্ত্রীর বিরাগভাজন হইতে অনিচ্ছা থাকে। তাই স্বামী ধৈর্যধারণ করিয়া অপরকে দিয়া করাইয়া লয়।

কৌমার্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা ছাড়া বিবাহের পরেও স্বামী স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে

সতত সজাগ দৃষ্টি রাখিত। স্বামী যতই দুষ্কর্ম করুক, স্ত্রীকে সতীসাধ্বী থাকিতেই হইবে ইহা সে আশা করিত। শুধু আশাই নহে, উহার জন্য নানারকম অত্যাচারমূলক বিধিনিষেধের পরীক্ষার প্রবর্তনও করিয়াছে। যথা—পর্দাপ্রথা, ছোট মেয়েরও বোরখা, মোটা কাপড়ে ঢাকা পালকি, দীর্ঘ ঘোমটা, পরপুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা, আলাপ-পরিচয় বন্ধ করা, অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখা ইত্যাদি। এমনকি নারীকে পুরুষ সতীত্বরক্ষক কৌপীন-কোমর বন্ধ (girdle of chastity) পর্যন্ত পরাইয়া ছাড়িয়াছে। মধ্যযুগে ইউরোপে স্বামী প্রবাসে যাইবার কালে স্ত্রীকে চামড়া ও ধাতুনির্মিত ল্যাঙোটের মত এমন এক কোমরবন্ধ পরাইয়া কুলুপ লাগাইয়া দিয়া যাইত যাহাতে স্ত্রী ইচ্ছা করিলেও পরপুরুষের সঙ্গ করিতে পারিত না। তাহাতে মূত্র নির্গমনের জন্য কয়েকটি ছিদ্র থাকিত। কবরে শায়িত কঙ্কালের অঙ্গে এই জাঙ্গিয়া পাইয়া ইউরোপের কোন মিউজিয়ামে উহা রাখা হইয়াছে। ইহার ছবি পাইবেন ডাঃ নরম্যান হেয়ার সম্পাদিত ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে Sexual Reform Congress হয় তাহাতে পঠিত প্রবন্ধাবলীর পুস্তকে।

পর্দাপ্রথা

পুরুষ এই মনে করিত যে, নারীর সতীত্ব বজায় রাখিবার ভার **তাহার,** আর একটু সুযোগ পাইলেই তাহার পদস্খলন হইবে, তাই সে যে-সব ঈর্ষা ও স্বার্থপরতামূলক পীড়নের ব্যবস্থা করিয়াছে, **পর্দাপ্রথা** তাহার এক জলন্ত উদাহরণ। এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, **হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্মবিধি** অবরোধ প্রথার পৃষ্ঠপোষক। হিন্দুরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানদের আমলে নারী রক্ষার উপায় হিসাবে অথবা উহাদের অনুকরণে পর্দাপ্রথার অভিব্যক্তি হইয়াছে। মুসলমানদের অনেকে এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করেন যে, 'অসূর্যম্পশ্যা' কথাটি আমরা পাইয়াছি হিন্দুদের নিকট হইতে। হিন্দুরা বলেন যে, রাণী প্রভৃতি অভিজাতদের মধ্যেই পর্দা দেখা যাইত আর দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রভাব কম থাকায় সেখানে পর্দা নাই। **আরবের** রমণীরা বাজারে পর্যন্ত যাইতেন এবং এমন কি, যুদ্ধবিগ্রহেও যোগদান করিতেন। **মৌলানা আকরাম খান সাহেব** তাঁহার **'সমস্যা ও সমাধান'** নামক পুস্তকে পর্দাপ্রথার উৎপত্তি, উহার কতটুকু ইসলাম চাহে এবং কতটুকু

সমাজের অযথা বাড়াবাড়ি ইত্যাদি বিষয়ে সুদীর্ঘ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।

তথাপি আমার মনে হয়, হিন্দুধর্ম ও ইসলামে স্ত্রী জাতি পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিবে, পুরুষ উহাদিগকে রক্ষা ও ভরণপোষণ করিবে, নারী-জাতি বিনীত ও কতকটা অন্তরালে থাকিবে, এরূপ আদেশ ও উপদেশ রহিয়াছেই—এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। পূর্বকালের অনেক সমাজ-ব্যবস্থাও **সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত** ছিল শ্রদ্ধার সহিত আমরা ইহা ঘোষণা করিব।

ডাঃ ভি, আর, খানোলকার (V. R. Khanolkar) ১৯৩৬ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত **নিখিল ভারত জনসংখ্যা সম্মিলনীর পারিবারিক স্বাস্থ্য বিভাগের** (Family Hygiene Section of the All-India Population Conference) সভাপতি হিসাবে **'হিন্দু ভারতে বিবাহ'** (Marriage in Hindu India) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে গবেষণামূলক আলোচনা করিয়া তিনি বলেন—"আমি শুধু হিন্দুসমাজে অবরোধ-প্রথার সম্বন্ধে কিছু বলিব। সাধারণতঃ ইহা বিশ্বাস করা হইয়া থাকে যে, এই প্রথার সূচনা হইয়াছে পরবর্তী আর্যদের কালে এবং মুসলমানদের অভিযানের সময় হইতে। কিন্তু প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিলে এই অভিমত মানিয়া লওয়া যায় না। **ঋগ্বেদে** দেখা যায় যে, পুরুষদের সামাজিক মিলন ক্ষেত্রগুলিতে স্ত্রীলোকদিগকে বড় একটা মিশিতে দেখা যাইত না। তাহাদিগকে অবনতনেত্রে চলিতে, উপরের দিকে না চাহিতে, পুরুষের সমক্ষে দুই পা একত্র করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বলা হইত। অন্যত্র স্ত্রীলোককে শ্বশুরের সম্মুখে লজ্জানতা এবং অবগুণ্ঠিতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় যাহাতে মনে হওয়া উচিত যে, **স্ত্রীলোকদিগকে পৃথক বা অন্তরালে** রাখা আমাদের মধ্যে বহু পুরাতন একটি প্রথা। এই প্রথাই বোধ হয় মুসলমান রাজত্বকালে আরও কঠোরভাবে পালন করা হইয়াছে।

কোরানেও স্ত্রীলোককে অন্তরালে থাকিবার, অপর লোকের সঙ্গে পর্দার আড়াল হইতে কথা বলিবার ও শরীর আচ্ছাদিত রাখিবার আদেশ ও উপদেশ আছে।

এই সমস্ত উপদেশকে আমরা তৎকালের সমাজের **হিতসাধন উদ্দেশ্যে** সাধারণতঃ **বিনয়, নম্রতা, ভব্যতা** ইত্যাদি প্রকাশের প্রণালীস্বরূপ মনে

করিতে পারি। সমাজের সুশৃঙ্খলা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মনোভাবের সংস্কার হওয়ায় এখন আমাদের বিচার করিতে হইবে—**পর্দাপ্রথার সার্থকতা কতটুকু?**

পুরুষ স্বেচ্ছায় চলাফেরা করিবে কিন্তু নারীকে অভিভাবকের গোচরে চলাফেরা করিতে হইবে। নারীকে অন্তঃপুর প্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া সারাজীবন মানবচক্ষুর অন্তরালে, তাহার সীমাবদ্ধ কার্যক্ষেত্রের বাধা-নিষেধের বেড়াজালে কাটাইতে হইবে। উদ্দেশ্য? **সতীত্ব রক্ষা!** ফল? কয়েদীর মত জীবনধারণ! অস্বাস্থ্য, জ্ঞান ও আনন্দের খর্বতা এবং সর্বব্যাপারে পরনির্ভর হওয়া।

এইরূপ অবরোধ-প্রথায় যদি নারী বাধ্য হইয়া বা ধৈর্য ধরিয়া সতীত্বরক্ষাও করে, তাহা হইলেও উহার মহত্ত্ব ও মর্যাদা কতটুকু? **ঐ আসল গুণের গরিমা চেষ্টালভ্যতা** এবং অবৈধ ভোগের সুযোগ থাকা সত্বেও স্বেচ্ছাকৃত সংযম।

কয়েদীকে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া অপরাধ করিতে না দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু **কয়েদীর** উহাতে গৌরবের কিছু নাই, উহাতে **মনুষ্যত্বের** অবমাননা হয় মাত্র।

অবরোধ-প্রথার অন্য সহচর অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। জগৎকে দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিবার অধিকার **পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান ভাবে থাকা উচিত।** বহির্জগতের সংস্পর্শ ও সংঘাতে একাধারে নানা চিত্তবৃত্তির ও গুণের বিকাশ এবং নানা প্রকারে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ হয়।

পর্দাপ্রথা ভারতীয় নারীর অবমাননা এবং পুরুষের পরপীড়ন ও অধিকারমত্ততার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই প্রথার সংশোধন—নর ও নারীর সম্মিলিত কার্যসূচীর প্রথম অধ্যায় হওয়া উচিত।

নর ও নারীকে পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব ও পরমসহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে। পর্দাপ্রথা দূর করিলে ব্যভিচারের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে বলিয়া যাহারা ভয় করে তাহারা পর্দাপ্রথা-মুক্ত পাঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজের সহিত উত্তর ভারতের হিন্দুসমাজের নৈতিক অবস্থা তুলনা করিলেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। দক্ষিণ ভারতে ব্যভিচার উত্তর ভারতের অপেক্ষা কম বৈ বেশী নয়। *

দৈহিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও যৌননিষ্ঠা ও সতীত্বের একটি নিজ গুণ আছে। উহা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও মমতা-সৃষ্টি দ্বারা বিবাহ-

বন্ধনে একটা পবিত্র মাধুর্য আনিয়া দেয়। যৌনবোধ ও শ্রদ্ধার সংমিশ্রণে স্বতঃই প্রেম পূর্ণতা লাভ করে।

পুরুষের প্রাগ্‌বিবাহ ব্রহ্মচর্য

অধ্যাপক মিচেল্‌স্ তদীয় 'সেক্সুয়্যাল এথিকস্' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, (ইউরোপের) অনেক তরুণীই রমণে অভিজ্ঞ লোককেই স্বামীরূপে পাইতে চায়। তাহারা নাকি আনাড়ী সৎ পুরুষ অপেক্ষা কামচতুর পুরুষকে বেশী পছন্দ করে।

কিন্তু আমাদের ভারতীয় তরুণীদিগকে এই রকমের মনোবৃত্তিসম্পন্না বলিয়া আমরা মনে করি না। এদেশের অধিকাংশ তরুণী নিজেরা যেমন সতী থাকিতে চায়, তেমনই সৎ-যুবককেই তাহারা স্বামীরূপে পাইতে চায়। তাহারা চায় তাহাদের স্বামীরা যেন বিবাহের পূর্বে আর কোন নারীর প্রতি আসক্ত না হইয়া থাকে; অপর কোন কামিনীর দেহভোগ করিয়া নিজেকে কলঙ্কিত না করিয়া থাকে। অনেক পুরুষই জানেন না যে, বিধবাকে অপরের উচ্ছিষ্ট ভাবিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে পুরুষের যেরূপ ও যতটা আপত্তি, বিপত্নীক বিবাহ করিতে কুমারীদেরও ঠিক সেই কারণে ঐরূপ ও ততটাই আপত্তি।

প্রকৃত পালনযোগ্য যৌননিষ্ঠা

যৌননিষ্ঠার প্রকৃত পালনযোগ্য রূপ হইতেছে—**যৌনবৃত্তির ন্যায্য ও সুষ্ঠু ব্যবহার**। ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি মানুষের গৌরবের বিষয়। যৌন-আচরণ যতক্ষণ নিজের শরীরে ও মনে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ অপরের বলিবার কিছু থাকে না। অবশ্য ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক অনিষ্টের দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের। অপরে শুধু উপদেশ দিয়া যাইতে পারে।

দেহসম্মিলনে স্বয়ং কর্তা ছাড়াও অন্য একটি অংশীদারের দরকার হয়। সেই অংশীদার কে, তাহার যোগ্যতা, অপরের নিকট তাহার দায়িত্ব, তাহাদের মিলনের ফল, পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের উপর কিরূপ হইবে ইত্যাদির বিষয় পাত্র ও পাত্রীর পরিবার ও সমাজভুক্ত লোকেরা নিজেদের স্বার্থের জন্য অবশ্যই বিবেচনা করিবে। সে অধিকার তাহাদের আছে।

তাই শিশু বা অপরিণতবয়স্ক বালক-বালিকার দেহ কলুষিত করা **শুধু গর্হিতই নয়, কঠোর শাস্তির যোগ্য**। কারণ, ইহারা নিরুপায়, আত্মরক্ষায়

অপরাগ। ইহারা নিজেদের সুখ-সুবিধার ও ভাল-মন্দের উপযুক্ত বিচারক নহে। এমন কি ইহারা সম্মতি দিলেও সেই সম্মতি আইন ও সমাজের চক্ষে অগ্রাহ্য।

বয়স্ক যুবকযুবতী বা নরনারী বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ না হইয়াও গর্ভনিবারণের সম্যক্ উপায় অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছায় পরস্পরকে দেহদান করিলে এবং ভবিষ্যতে যদি কিছু ঘটে তাহার দায়িত্ব বহনে উভয়ে সমভাবে প্রস্তুত থাকিলে উহাদিগকে অভিশপ্ত বা পাপিষ্ঠ বলা যায় না।

নরম্যান হাইম্স এই মর্মে বলেন—"Sexual experience is a fundamental need of normal human nature. It is not necessarily a social evil provided the relations are ethical and considerate on both sides, and provided there is mutual affection and a willingness to bear any subsequent responsibilities together." অর্থাৎ রতিসম্ভোগ মানবপ্রকৃতির একটি মৌলিক প্রয়োজন। উভয়পক্ষের সম্বন্ধ যদি নীতিবিগর্হিত না হয়, যদি পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম থাকে এবং যদি পরস্পরে উহার ভবিষ্যৎ (ফলের) দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক (অর্থাৎ সন্তানদের যথোচিতভাবে লালন-পালনে সম্মত) থাকে, তাহা হইলে ইহাকে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর বলা চলে না।

এই নূতন মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তির দিক হইতে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার এবং সামাজিক মনোভাব ইহা মানিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করে এবং করিবে।

এই বিরুদ্ধভাবের কারণ বহুবিধ :

প্রথমতঃ—ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র এইরূপ অবাধ যৌন-উপভোগের বিরুদ্ধে অভিমত দিয়াছে। ঐরূপ ধর্ম বা নীতিজ্ঞানসম্পন্ন অথবা উহাদের প্রভাবাধীন নর ও নারীর সংখ্যা এখনও প্রায় সমাজেই বেশী।

দ্বিতীয়তঃ—ঐরূপ মনোভাবাপন্ন নর ও নারী এইরূপ মিলনে ব্রতী হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিধাভাব, অনুশোচনা ইত্যাদির দরুন মানসিক অশান্তি হইতে বাধ্য।

তৃতীয়তঃ—অবিবাহিতা বা বিধবা মেয়েদের পক্ষে গর্ভসঞ্চারের আশঙ্কা থাকে, ফলও বাস্তবিকই ভয়াবহ। সমাজ যে পর্যন্ত জারজ সন্তানদের প্রতি মনোভাব পরিবর্তন না করে, ততদিন পর্যন্ত যে যে পুরুষ বা নারী ঐরূপ

সন্তানের কারণ হয়, তাহারা সমাজে ঘৃণিত হইয়া থাকিবে এবং নারী ও তাহার অবৈধ সন্তানদের প্রতি বাস্তবিকই অন্যায় করিবে।

চতুর্থতঃ—যৌবনপ্রাপ্তির পরে নর ও নারীর যে যৌন-উপভোগের প্রবৃত্তি হয় ও থাকে তাহা সাময়িক গোপন চর্চায় প্রশমিত না হইয়া আরও বর্ধিত হয়। উহা অপেক্ষা **সকাল সকাল বিবাহ** করিয়া **সুষ্ঠু ও নিয়মিত যৌনজীবন** যাপন করা উভয়ের পক্ষে বেশী কল্যাণকর।

পঞ্চমতঃ—অসংযম বা যৌন-অনাচারের বিষময় ফলের **রতিজ রোগ-সমূহ** স্বভাবতই সবচেয়ে ভয়াবহ। ব্যভিচারী বা গণিকাগামী স্বামীদের দ্বারা সংক্রমিত তাহাদের স্ত্রীদের মধ্যে এই সব রোগ প্রায়ই দেখা যায়। কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ খুব শিক্ষিত, উচ্চশ্রেণীর, ভদ্র ও সচ্চরিত্র বলিয়া খ্যাত হইলেও তাঁহার যে কোন রতিজ রোগ নাই ইহা কখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং যথাকালে বিবাহিত (বিবাহের আগে যোগ্য ও বিশ্বাসী ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত হইলেই ভাল) সৎ স্বামী ও সতী স্ত্রী ছাড়া যে কোন অপর পুরুষের বা নারীর সহিত সহবাসে রতিজ রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ষষ্ঠতঃ—বিবাহিত দম্পতির বিবাহের যৌনমিলন একের প্রতি অপরের বিশ্বাসঘাতকতা। ইহাতে বিবাহিত জীবনে কলহ, অপ্রীতি, এমন কি বিচ্ছেদ হইবার কথা। তাহা ছাড়া বিবাহেতর যৌনমিলন ভয়, ভাবনা, অনুতাপ, অর্থনাশ প্রভৃতি জড়িত থাকায় **সম্পূর্ণ সুখকর** হইতে পারে না।

বস্তুত বিবাহেতর মিলন সত্যকার সুখদান করিতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ, সম্যক্‌রূপে আনন্দ পাইতে হইলে মিলন ভয়-ভাবনা বিরক্তি, ব্যস্ততা ও বিবেকের দংশন হইতে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বিবাহেতর যৌনমিলনের ঐ সমস্ত ত্রুটি থাকিবেই। মিলনে অনির্বচনীয় পুলক পাইতে হইলে উহাতে যে নিরুদ্বিগ্নতা ও প্রশান্তি অত্যাবশ্যক, গোপন মিলনে কদাচ তাহা থাকে না।

বিবাহিত জীবনকে সুখকর ও মাধুর্যময় করিবার জন্য যৌননিষ্ঠা পালন খুবই বাঞ্ছনীয়। **এই আদর্শকে কার্যতঃ পালনযোগ্য করিতে হইলে পূর্ববর্ণিত বিবাহেতর যৌনমিলনের কারণ সমূহের প্রতিবিধান সমাজকে করিতেই হইবে।**

কতিপয় সামাজিক সমস্যা ও উহাদের সমাধান

সমাজের যে হিতকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি উহার সম্মুখে **সমস্যাগুলির** উল্লেখ এবং **সমাধানের** উপায়সমূহের নির্দেশ না করিলে আমাদের কর্তব্যচ্যুতি হইবে বলিয়া মনে করি।

চরিত্র রক্ষার কতকগুলি সামাজিক উপায়

(১) **সকাল সকাল বিবাহ**—নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘদিন **সতীত্বরক্ষা বয়স্থ নর ও নারীর পক্ষে খুবই কঠিন।** ইহা ধর্মশাস্ত্রসমূহেও স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণত বয়সের পরেও দাম্পত্য জীবনে যৌনসুখের পূর্ণ উপভোগের জন্য অবিবাহিত অবস্থায় চরিত্র রক্ষা খুবই বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে। পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তির পর (অর্থাৎ ছেলেদের ২১-২২ ও মেয়েদের ১৮-১৯ বৎসর বয়সের পর) আর যুবতীদিগকে জবরদস্তি করিয়া কামের স্বাভাবিক চরিতার্থ হইতে বিরত রাখা উচিতও নহে, সম্ভবও নহে।

এই জন্যই হিন্দু ও মুসলমান ধর্মে **সকাল সকাল বিবাহ** দিবার নির্দেশ আছে। তাহাই এখন **বাল্যবিবাহে** পরিণত হইয়াছে বলিয়া সেজন্য ধর্মের দোষ দেওয়া চলে না, ইহা স্বামীদের সমাজের (লোকাচারের) দোষ। অজ্ঞতাবশতঃ ভালর বাড়াবাড়ি।

আমাদের দেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে এই **যৌবনপ্রাপ্তির পরবর্তী** ও **বিবাহের পূর্ববর্তী** কাল দীর্ঘতর ও সুতরাং অধিকতর অশান্তি ও অকল্যাণ জনক হইয়া পড়িয়াছে। এই মর্মে ডাঃ স্টোন বলেন,—"On one hand the social and economic conditions make early marriages impracticable and on the other, our ethical and religious standards prohibit sexual relations outside of wedlock. Thus a serious problem is created concerning one's sexual behaviour during the interval between the age of maturity and the age of marriage, a problem to which no socially sanctioned solution has yet been found"

অর্থাৎ—একদিকে সামাজিক ও আর্থিক কারণসমূহের জন্য সকাল সকাল বিবাহ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না; অপর দিকে আবার আমাদের নীতি ও ধর্ম বিবাহেতর মিলন নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তাই দেহের পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তি ও বিবাহকালের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত যৌন-আচরণ

সম্পর্কে এমন একটা জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে যাহার সমাজস্বীকৃত কোন সমাধান এখনও হইয়া উঠে নাই।

অবশ্য এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয় নাই তাহা নহে। সমাধানগুলি পরবর্তী পাঁচটি অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

(২) **আসঙ্গ বা পরীক্ষামূলক বিবাহ**—ডেনভারের বিচারপতি লিণ্ডসে (Lindsay) **আসঙ্গবিবাহ** বা Companionate Marriage প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহাকে Trial Marriage বা পরীক্ষাধীন বিবাহও বলে। উহার সমর্থনও বহু পণ্ডিত ও মনীষী করিয়া থাকেন।

আসঙ্গবিবাহে প্রবক্তাগণ উহার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই : পরস্পরের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া জন্মনিরোধের প্রতিশ্রুতিসহকারে দুইটি নারীপুরুষ আইনসঙ্গত উপায়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষাচ্ছলে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করার নাম **আসঙ্গবিবাহ**।

এই প্রথায় (১) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে না, (২) যাহাতে সন্তান উৎপন্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সর্বপ্রকারে পরস্পর পরস্পরের দেহ ও মনের উপযোগী কিনা তাহা যাচাই করা ও সেই সঙ্গে যৌনবৃত্তির তৃপ্তিসাধন এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য এখানেও যৌনসম্বন্ধে একনিষ্ঠতা বজায় রাখিতে হইবে। শর্ত এই যে, যদি দম্পতির যৌনমিলনে সকল প্রকার সাবধানতা সত্ত্বেও সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে সন্তান জন্মের সময় হইতেই উক্ত বিবাহ সাধারণ বিবাহ পরিণত হইবে এবং যতশীঘ্র সম্ভব প্রচলিত অনুষ্ঠানসহ বিবাহ করিতে হইবে। সন্তান জন্মগ্রহণ না করিলেও উভয়ের সম্মতিক্রমে যে কোনও সময়ে ঐ বিবাহ সাধারণ বিবাহে পরিণত করা যাইতে পারে, কিন্তু উভয়ের সম্মতি ব্যতিরেকে কদাচ তাহা হইবে না। ইহার উদ্দেশ্য—পাত্র পাত্রীর শরীর, মেজাজ, স্বভাব ও প্রকৃতি পরস্পরের উপযুক্ত এবং বিবাহ সুখের হইবে বুঝিতে পারিলে পাকাপাকিভাবে বিবাহ করা। কয়েক বৎসর যাবৎ বহুসংখ্যক নারীর মধ্যে পরীক্ষামূলক বিবাহ প্রচলিত থাকার পর, ইহার ফলাফল লক্ষ্য করার পূর্বে এই ব্যবস্থার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা সম্ভব নহে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তরুণতরুণীর মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস সৃষ্টির পক্ষে তাহাদের মধ্যে গোপনীয় যৌনমিলন হ্রাস করিবার, বিলম্বিত বিবাহ, তাড়াতাড়ি গান্ধর্ব বিবাহ ও অভিভাবকদের দেওয়া বিবাহের দোষসমূহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার

এবং বিশেষত বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা কমাইবার পক্ষে এই প্রথা অনেকটা কার্যকরী হইতে পারে।

আমাদের দেশে এ সমস্যা ছিল না ; অনুপযুক্ত বাল্য বিবাহের প্রথাই আমাদের সমস্যা ছিল। অধুনা পণপ্রথা, ব্যয়বাহুল্য, স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রচার, রজস্বলা হইবার পূর্বেই তাহার বিবাহ না দিলে ধর্মহানি হয়। হিন্দুদের স্মৃতিশাস্ত্রের এই অনুশাসনের প্রতি আস্থাহীনতা এবং তাহা না করায় জাতিচ্যুতি ও একঘরে হইবার আশঙ্কা আজকাল আর না থাকা ইত্যাদি মেয়েদের এবং পরিবার প্রতিপালনে উপযোগী যথেষ্ট উপার্জনে অক্ষমতা পুরুষদের বিবাহকাল পিছাইয়া দিয়াছে।

পণপ্রথা ও ব্যয়বাহুল্য আমাদের **স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ**। প্রচণ্ড আন্দোলন করিয়া এবং তাহা অপেক্ষা আইন করিয়া ইহাদের উচ্ছেদ সম্ভবপর। নিষ্ক্রিয়তার ফলভোগ সকলেই করিতেছে। পণলোভী বরেরও নিজের ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির বিবাহ দিবার সময় নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দুঃখের বিষয়, অমৃতলাল বসুর বিবাহ-বিভ্রাট, গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান' প্রভৃতি নাটকেব অভিনয়, কন্যাদায় পীডিত পিতামাতার বয়স্থা কন্যা স্নেহলতা প্রভৃতি কয়েকজনের আত্মহত্যার জন্য আন্দোলনের ফলেও বরপণ-প্রথা দূর হয় নাই। যথোচিত কড়া আইন না হইলে প্রতিকারের আশা নাই

অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবারবৃদ্ধির ভয় যুবকযুবতীকে বিবাহ হইতে বিরত রাখিতে পারে। যেখানে নিজেদেরই খোরাক-পোশাকের যোগাড় হইতে চাহে না, সেখানে বিবাহ করিলেই পুত্রকন্যা আসিতে থাকিবে, ইহা মস্ত বিড়ম্বনা। **জন্মনিয়ন্ত্রণের** পরিপক্ক জ্ঞান থাকিলে সন্তানলাভ **স্বেচ্ছা প্রণোদিত ও সামর্থ্য-নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিবে।**

(৩) **বিবাহিত জীবনকে সুখীকরণ**—সকাল সকাল বিবাহ হইলেই শুধু হইবে না। বিবাহিত জীবনকে সর্বপ্রকার সুখকর করিবার ইচ্ছা ও শক্তি দম্পতির থাকিবে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যৌনতৃপ্তি দিবে ; সহৃদয়তা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সুবিবেচনা, দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা ও ক্ষমা ইত্যাদি তাহাদের সংযম ও যৌন-নিষ্ঠার ভিত্তি হইবে। মন্ত্র পড়িলেই এইরূপ হইবে এমন আশা করা বৃথা। ইহার জন্য উভয়ের অবিরত আন্তরিক চেষ্টা করিতে হইবে। পরস্পরকে যৌন-তৃপ্তি দেওয়া সম্পর্কে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা আছে।

বিবাহিত জীবনকে সুখকর ও মাধুর্যময় করা দম্পতির জ্ঞান, সাধনা ও চেষ্টা সাপেক্ষ। এই পুস্তকের বক্তব্যই হইল **কি করিয়া এমন করা যায়।**

(৪) **দম্পতির একত্র বাস**—সুখী দম্পতির ও একত্র বাস প্রয়োজনীয়। দীর্ঘ বিরহ অশান্তিকর ও উভয়ের যৌননিষ্ঠা পালনের প্রতিবন্ধক। আমাদের মতে রাজা, বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত দীন-দরিদ্র কুলিমজুর পর্যন্ত যাহাতে স্ত্রীপরিবার সঙ্গে রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সমাজকে করিতে হইবে। অসংখ্য লোক চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি উপলক্ষে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপ অবস্থা উভয়েব যৌননিষ্ঠার ঘোর প্রতিবন্ধক। রেলকর্তৃপক্ষ কুলিদেব সস্ত্রীক বাসের ব্যবস্থা করিয়াছে। পুলিশ, সৈন্য প্রভৃতিদের জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। যুদ্ধরত সৈন্যদের ৩ হইতে ১২ মাস অন্তর ১ হইতে ৪ সপ্তাহের ছুটিতে বাড়ী আসিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। **সোভিয়েট ইউনিয়নের** মত কয়েদীদেব প্রতি ভাল আচরণ সম্পন্ন দেশেও মাসে ২-১ দিন বাড়ীতে কাটাইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। জেলেব ভিতব ও যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরের সৈন্য শিবিরগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক অতিথিশালা নির্মাণ করিয়া সেখানে কয়েদী ও সৈন্যদের ২-৪ দিন পরিবারের সহিত কাটাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। নিতান্ত সাময়িক বিরহ বা প্রবাস অবশ্য অন্য কথা। উহা বরং স্বামীস্ত্রীর পুনর্মিলন আরও মধুর করে।

(৫) **তালাকের অধিকার ও প্রথা**—তালাকের প্রথা থাকা চাই। দম্পতির আগ্রহ ও চেষ্টা সত্ত্বেও যদি বিরোধ বা অশান্তি দূর না করা যায় তবে উভয়ের অব্যাহতি লাভের পন্থা ও প্রথা থাকা চাই। **প্রথা থাকা চাই** এই জন্য যে, আইনত বা ব্যক্তিগতভাবে তালাকের অধিকার মানিয়া লওয়া এক কথা, আর ঐ অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করার রীতি থাকা অন্য কথা। কোন কোন সমাজে যে তালাকের প্রথা নাই বলিলেও চলে তাহা বলাই বাহুল্য।

(৬) **বৈধব্য দশার উচ্ছেদ**—বৈধব্য-দশার উচ্ছেদ করিতে হইবে। প্রত্যেক নরনারীর সারা জীবদ্দশায়ই একজন যৌনসহচর থাকিবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুরুষের স্ত্রী-বিয়োগের পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ যত সহজ, নারীরও অন্য স্বামী গ্রহণ তত সহজ করিতে হইবে। দাম্পত্যজীবনের যৌনসুখ উপভোগ করিবার পরে দীর্ঘদিন পুনর্বিবাহ না করিয়া চরিত্র রক্ষা করা অধিক কষ্টকর। পূর্বস্মৃতি নর ও নারীকে অধিকতর উদ্রিক্ত ও উত্তেজিত করিবে এবং পদস্খলনের আশঙ্কা ও বিপদও বাড়িতে থাকিবে।

বিধবা নারীদের দুরবস্থা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণে আঘাত করিয়াছিল; তিনি তাই তাহাদের দুর্দশা মোচন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সদুদ্দেশ্যে আরও বহু নেতা ও মনীষীর চেষ্টার দরকার আছে। হিন্দুসমাজের সমবেত চেষ্টা ছাড়া ইহার **প্রতিকার অসম্ভব।**

বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় একজন প্রতিনিধি কিছুকাল পূর্বে এই মর্মে এক বিল পেশ করিয়াছিলেন যে, **কোন হিন্দু মৃতদার এমন কোন মেয়ে বিবাহ করিবে না যে বিধবা নহে।** বিলটি উত্থাপন করিবার উপলক্ষে বক্তা বলিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশে (হিন্দু) মৃতদারের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কম হইবে না, ইহাদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক লোক আবার বিবাহ কবিবে। যদি শুধু বিধবা বিবাহ করে তাহা হইলে ১৫ হইতে ২৫ বৎসরের বিধবা প্রায় সকলেই পাত্রস্থ হইয়া যায়। **এই বিলটির দিকে হিন্দুসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।**

আলোচনার সারমর্ম

যৌননিষ্ঠা ও **সতীত্ব** সম্বন্ধে এই আলোচনার সারমর্ম হইল এই যে,

(১) যৌনবৃত্তি একটি প্রবল বৃত্তি।

(২) উহার সহিত মানববংশ বিস্তার সংশ্লিষ্ট।

(৩) উহার তৃপ্তি নারী ও পুরুষের শুধু সুখকরই নহে, স্বাস্থ্য ও শান্তিজনক এবং চিত্তবৃত্তি ও সদ্‌গুণ বিকাশের সহায়।

(৪) ঐরূপ তৃপ্তিতে সকলেরই ন্যায্য অধিকার।

(৫) এই অধিকার হইতে বয়স্ক নর ও নারীকে বঞ্চিত করা বা বঞ্চিত রাখা অন্যায় ও অত্যাচারবিশেষ।

(৬) ইহা হইতে স্বেচ্ছায় দীর্ঘদিন বিরত থাকা স্বাস্থ্য শান্তি ও কর্মদক্ষতার হানিকারক।

(৭) চিরকাল, এমনকি দীর্ঘকালও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন অত্যুত্তম স্বাস্থ্য এবং অসাধারণ বা অলৌকিক শারীরিক বল ও মানসিক ক্ষমতা (যথা—মেধা, স্মৃতি প্রভৃতি) প্রদান করে এবং সামান্য মাত্রও শুক্রপাত ক্ষতিকারক, সুতরাং বিবাহিতদেরও সহবাস যত কম হয় ততই ভাল এই ধারণা আধুনিক শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী ভ্রমাত্মক।

(৮) যেহেতু, বিবাহিত যৌনমিলনেই ঐ বৃত্তির নিয়মিত ও সুস্থ

পরিচালনা সম্ভবপর, সেইজন্য প্রত্যেক যৌবনপ্রাপ্ত নর ও নারীর সকাল সকাল বিবাহ করিবার ইচ্ছা, সুবিধা ও শক্তি থাকা চাই।*

(৯) নিতান্ত সাময়িক বিরহ বা প্রবাস ছাড়া প্রত্যেক দম্পতির একত্র জীবনযাপন বাঞ্ছনীয়।

(১০) নিতান্ত বিরক্তিহেতু গরমিলের কারণ হইলে আইনসঙ্গত বিবাহ বিচ্ছেদ সমাধা করিয়া উভয়কে বিবাহমুক্ত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা নূতন সঙ্গী বাছিয়া লইতে পারে।

(১১) একের মৃত্যুর পর অপরের পুনর্বিবাহ করিবার সমান অধিকার ও সুযোগ থাকা চাই।

(১২) দাম্পত্য জীবনকে পূর্ণভাবে সুখকর ও আনন্দময় করিতে হইবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সমাজ অবহিত ও সজাগ থাকিলে নর ও নারীর পক্ষে ভাল থাকা সম্ভবও হইবে, সহজও হইবে। তাহারা কিশোর-জীবনে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য অর্জন করিয়া পূর্ণতর উপভোগের আশায় নিষ্ঠা পালন করিয়া যাইবে, নিয়মিত ও পূর্ণ যৌন-উপভোগের সুযোগ-সুবিধা পাইয়া দম্পতি পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লইয়া দুর্নাম, অর্থনাশ, অশান্তি ও রতিজ রোগের আশঙ্কাপূর্ণ ব্যভিচারের ক্ষণিক সুখের জন্য লালায়িত হইবে না।

(৩২)

সৌন্দর্য চর্চা : দেহ ও প্রসাধন

যৌন প্রয়োজনের দিক হইতে সৌন্দর্যের স্থান এত উচ্চে যে, অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের নীতিবাদী লেখক কবেটও তদীয় 'যুবকগণের প্রতি উপদেশ' নামক গ্রন্থের 'প্রেমিকের প্রতি' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন, 'শারীরিক সৌন্দর্য চর্মের গুণমাত্র। 'গুণই সৌন্দর্য' 'শারীরিক সৌন্দর্য চক্ষুকেই শীতল করে, কিন্তু অন্তরকে দগ্ধ করে' ইত্যাদি প্রবাদবাক্য শারীরিক সৌন্দর্যবিহীনদের

* এঙ্গেলস কি বলেন—Real life has certainly its claims : in one case, that all who are hungry food should have work at such a rate of pay that they can eat ; in the other, that all who are of marriageable age should have the possibility of contracting marriage at the right time".

সান্ত্বনালাভের জন্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র। হ্যাভলক্ এলিস্ বলিয়াছেন, "দৈহিক সৌন্দর্য আমাদের যৌনজীবনের একমাত্র গুণ না হইলেও প্রধান প্রয়োজনীয় গুণ।" ডাঃ ফোরেল বলিয়াছেন, "দৈহিক আকর্ষণই যৌন-আকর্ষণের প্রধান উপাদান।" প্রাগ্ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডাঃ হেনরী কিশ্ও তদীয় "নারীর যৌনজীবন" নামক গ্রন্থে যৌনজীবনের সৌন্দর্যের, বিশেষ করিয়া নারীসৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছেন।

ডাঃ ফোরেল ও এলিস্ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, যৌনসৌন্দর্যজ্ঞান হইতে সাধারণ সৌন্দর্যজ্ঞানের প্রভেদ অনেকখানি ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ আমাদের চক্ষু ও সঙ্গে সঙ্গে মনকে আনন্দ দান করে। কিন্তু যৌন-সৌন্দর্য আমাদের চক্ষু ও মনের সঙ্গে দেহকেও চঞ্চল করিয়া তোলে। একটি ফুলের বা একটি স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য যেভাবে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানকে তৃপ্ত করিবে, একটি সুন্দর সুঠাম নারীদেহ আমাদিগকে শুধু সেই ধরনের আনন্দ দান করিবে না। ডাঃ ফোরেলের মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভূতি নিঃস্বার্থ, তাহাতে আসঙ্গ-লিপ্সা নাই, পরন্তু নরনারীর সৌন্দর্যবোধ আমাদের ভোগদখলের লিপ্সা আছে। হ্যাভলক এলিস্ আমাদের যৌনসৌন্দর্য-জ্ঞানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহা আমাদের যৌন-প্রয়োজনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে যৌনসৌন্দর্য-বোধের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পুরুষের চক্ষে সেই নারীই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, যাহার যৌন-অঙ্গসমূহ স্বাভাবিকভাবে অথবা কৃত্রিম উপায়ে দেহের অন্যান্য অঙ্গের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নারীর স্তন উন্নত অথবা তাহার নিতম্ব স্থূল কিংবা তাহার উরুদ্বয় সুডৌল হওয়ার মধ্যে সাধারণ বিচারে বিশেষ কোনও সৌন্দর্য থাকিবার কথা নহে। কিন্তু পুরুষের যৌন-প্রয়োজনীয়তার খাতিরে উহা সুন্দরের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ডাঃ কিশ বলিয়াছেন, নারীপুরুষ উভয়েরই সৌন্দর্যের প্রয়োজন থাকিলেও সৌন্দর্য প্রধানতঃ নারীরই অঙ্গভূষণ। ভবিষ্যতে পৃথিবীর নারীপ্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে যখন নারীর প্রয়োজনই সৌন্দর্যের মাপকাঠি হইবে, তখনকার কথা পৃথক ; কিন্তু বর্তমানে পুরুষের প্রয়োজনের খাতিরেই হউক, আর নিজস্ব গুণের দরুনই হউক, নারী-দেহই সৌন্দর্যের আদর্শ। এই নারী-সৌন্দর্যের জন্য অনাদিকাল হইতে পুরুষ তাহার ধন, মান, স্বার্থ, এমন কি প্রাণকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিয়া আসিতেছে।

সুতরাং যে নারী নিজের দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিল, সে পুরুষের মনোভাবকেই অশ্রদ্ধা করিল।

রূপসাধনা—ব্যায়াম ও প্রয়োজন

দৈহিক সৌন্দর্য প্রধানত প্রকৃতির দান। কিন্তু প্রকৃতির দেওয়া এই সৌন্দর্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করা ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও সাধনার উপর নির্ভর করে। দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষা করিতে হইলে দেহের মাংস দৃঢ়, চর্ম মসৃণ ও কোমল রাখিতে হইবে। তাহা হইলে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন, ব্যায়াম, সৎচিন্তা ও প্রসাধনের প্রয়োজন। চর্মের বর্ণ ও দেহের গঠন প্রকৃতির দান হইলেও প্রসাধন, ব্যায়াম, সৎ ও সুকুমার মনোবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা মানুষ উহার অনেক উন্নতিসাধন করিতে পারে।* এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, শারীরিক সৌন্দর্য স্বাস্থ্য ও মনোভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে প্রকৃতির দেওয়া সুন্দর দেহও অতি সত্বর বিশ্রী হইয়া যায়। পক্ষান্তরে সুন্দর স্বাস্থ্য, কান্তি ও লালিত্য দেহের অনেক গঠনত্রুটি ঢাকিতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও সবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অনেককে দেহ সুগঠিত করিতে দেখা গিয়াছে। স্নেহ ও প্রীতি, করুণা ও মমতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি, উদারতা ও সহানুভূতি—ইত্যাদি সদ্‌গুণবাজি-সম্বলিত মনোভাব মুখমণ্ডলকে দীপ্তি, লাবণ্য ও সুষমা মণ্ডিত করে।

ইংরেজীতে প্রচলিত একটি মূল্যবান্ কথার অর্থ: "পৃথিবীতে শ্রীহীন স্ত্রীলোক নাই; শুধু এমন কতিপয় স্ত্রীলোক আছে যাহারা নিজেদের সৌন্দর্য ফুটাইবার কায়দা জানে না।" কথাটি নিতান্ত মিথ্যা নহে। পুরুষের প্রশংসা ও প্রীতিলাভই যদি স্ত্রী-সৌন্দর্যের মাপকাঠি হয় তবে সত্য-সত্যই পৃথিবীতে বেশীসংখ্যক অসুন্দর স্ত্রীলোক পাওয়া যাইবে না। কারণ, নিজের দেহ সম্বন্ধে মনোযোগী হইলে সমস্ত স্ত্রীলোকই নিজেকে পুরুষের চক্ষে লোভনীয় করিয়া তুলিতে পারে।

আমরা শরীরের যত্ন লই না বা উপযুক্ত কর্ষণ করি না বলিয়া—অনেকেরই আয়তন অপরিমিত হইয়া পড়ে এবং কদর্য লাগে। পরিমিত আয়তন ও সুবিন্যস্ত

* শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'নারীর রূপসাধনা ও ব্যায়াম' এবং ডক্টর সুবিমল বসু প্রণীত 'রূপ চিন্তা' দেখুন।

দেহ অপরের নয়নরঞ্জক ও নিজের স্বাস্থ্যনিয়ামক। অত্যধিক স্থূলতা বা কৃশতা উভয়ই পীড়াদায়ক চেষ্টা করিলে উভয় অবস্থারই প্রতিকার সম্ভবপর।

স্থূলতার প্রতিকার

শরীরের মেদাধিক্য কমাইবার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণীয়।

(১) ভাত, রুটি, আলু, চিনি, মিষ্টান্ন, কেক, চকোলেট, জ্যাম, জেলী, ঘি, তেল, মাখন প্রভৃতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাইলে চর্বি হয়। অতিরিক্ত চর্বি কমাইতে চাহিলে কিছুকাল এই সব একেবারে ছাড়িতে হইবে, নতুবা ধীরে ধীরে কমাইতে হইবে। শুধু দুধ যতই পান করা যাউক না কেন, তাহাতে চর্বি বাড়িবে না। কিছু ফল খাওয়া ভাল। চায়ের সহিত দুধ ও চিনি না খাইয়া শুধু স্যাকারিন ব্যবহার করা ভাল। ডাল, শিম, চর্বিহীন পাতলা মাছ, ডিম প্রভৃতি প্রোটিনযুক্ত খাদ্য অল্প পরিমাণে খাইয়া তাহার সহিত পালং ও লেটুশ, বাঁধাকপি প্রভৃতি শাকপাতা বেশী করিয়া খাওয়া ভাল। বিলাতী বেগুন, কমলালেবু প্রভৃতি খাইয়া ভিটামিন ও ধাতব লবণগুলি গ্রহণ করা কর্তব্য।

(২) পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা। বসিয়া থাকিলে রক্ত-চলাচলে ব্যাঘাত হয় ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় না। ইহাতে মেদবৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্কের পরিশ্রমও করিতে হইবে।

(৩) মদ ছাড়িতে হইবে, কারণ মদ সঞ্চিত চর্বিকে সহজে খরচ হইতে দেয় না, সেই জন্য মদ্যপানে মানুষ মোটা হয়।

(৪) প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে স্নান।

(৫) সর্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা।

ঔষধ সেবনে রোগা হইবার চেষ্টা বিপজ্জনক। নির্ণালী গ্রন্থি ঘটিত ঔষধাবলী ঐ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার পরীক্ষাধীনে থাকিয়া তবেই সেবন করা যায়।

কৃশতার প্রতিকার

কৃশতার প্রতিকারের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী যথাসম্ভব গ্রহণীয়: (১) স্থূলতার প্রতিকারের জন্য যে সব খাদ্য গ্রহণে নিষেধ করা হইয়াছে। উল্লিখিত সেই সারবান্ খাদ্যগুলি খুব বেশী পরিমাণে খাওয়া। তাহা ছাড়া বাদাম, পেস্তা ও খেজুর খাওয়া প্রত্যহ অন্ততঃ দেড়সের দুগ্ধ পান করা।

(২) আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা। অল্প পরিশ্রম করা। (৩) মনের সুখে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করা। মানসিক উদ্বেগ, অশান্তি পরিহার করা। নিদ্রার পরিমাণ বাড়ানো। (৪) সর্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা। (৫) উপযুক্ত খেলাধূলা ও ব্যায়াম করা।

ব্যায়াম ও খেলাধূলা

আমাদের দেশে খেলাধূলা ও ব্যায়ামের চর্চা অনেক কম। পুরুষেরা সামান্য সুযোগ সুবিধা পাইলেও মেয়েরা প্রায়ই ঘরে সংসার কর্মে আবদ্ধ থাকে। এইজন্য মেয়েদের শরীর অনেক ক্ষেত্রে ভাঙিয়া পড়ে। এই পুস্তকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। ঘরে থাকিয়াও যে সামান্য অবসরে কতকটা শরীর চর্চা করিতে পারা যায় তাহাই বুঝাইবার জন্য সামান্য কয়েক রকম 'ঘরোয়া' ব্যায়ামের কথা বলা হইল। প্রথমোক্ত ব্যায়ামগুলি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবতী এবং স্থূলকায়াদের জন্য প্রয়োজনীয়। শেষোক্ত চারটি কৃশকায়াদের জন্য।

সারা শরীরের ব্যায়াম—(ক) পদদ্বয় যথেষ্ট ফাঁক করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান। দুই পাশে দুই হাত, কাঁধের বরাবর (সমতলে, ছড়াইয়া দিন। শরীরের ঊর্ধ্বাংশ (ধড) বামদিকে নিম্নাংশের সমকোণে কোমর হইতে ঘুরাইয়া দিন। হাত ছড়ানো অবস্থাতেই নীচে ঝুঁকিয়া পড়ুন। ঐ অবস্থাতেই কোমর হইতে শরীর ঘুরাইয়া দিন, উঠুন, অপর পাশে আবার ঝুঁকিয়া পড়ুন। ঝুঁকিবার সময় নিশ্বাস ফেলিবেন ও শরীর উপরে উঠিবার (সোজা করিবার) সময় শ্বাস টানিবেন। পাচ-সাত বার করুন।

(খ) পা যথেষ্ট ফাঁক করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া হাত দুইটি মাথার উপরে (ও একটু মাথার পিছনে) সোজা তুলুন। এইবার হাত দুইটি ঐভাবে মাথার একটু পিছনেই রাখিয়া ও হাঁটু একটুও না মুড়িয়া, অঙ্গুলির ডগা দিয়া মেঝে ছুঁইবার চেষ্টা করুন। প্রথম প্রথম ছুঁইতে না পারিলে বেশী কষ্ট করিয়া চেষ্টা করিবেন না। ক্রমশ বেশী ঝুঁকিতে ও শেষে মেঝে ছুঁইতে পারিবেন। পাচ সাতবার এইভাবে ঝুঁকিবেন ও পরে সোজা হইয়া দাঁড়াইবেন।

(গ) চিত হইয়া শয়ন করুন। হাতের তেলো মাথার নীচে ও কনুই দুটি মেঝেতে স্পর্শ করিয়া রাখুন। এইবার শ্বাস টানিতে টানিতে, পা দুইটি সোজা ও শক্ত রাখিয়া ও পায়ের অঙ্গুলিগুলি সম্মুখে বাড়াইয়া ধীরে ধীরে পা দুইটি যতদূর পারেন উপরে ও মাথার দিকে তুলন। (কিছুদিন অভ্যাসের পর পা

দুইটি মাথার ওপারে মেঝেতে ছোঁয়াইতে পারিবেন।) এইবার ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে, আস্তে আস্তে পা মেঝের উপর নামান।

কোমরের ঠিক উপরের মেদাধিক্য কমাইতে—যেখানে বেশী চর্বি সঞ্চিত থাকে সেইখানের পেশীর ব্যায়াম করা উচিত। অধিকাংশ মধ্যবয়সী নারীর প্রায়ই কোমরের ঠিক উপরে চর্বি জমা হয়। তাহার জন্য এই দুইটি ব্যায়াম খুব ভাল :—(ক) দুই পা জুড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান। মাথার উপর হাত দুইটি মুখোমুখিভাবে তুলিয়া তাহাদের অঙ্গুলি পরস্পরের সহিত ছোঁয়ান। যতদূর পারেন বামদিকে ঝুঁকিয়া পড়ুন। আবার পূর্বের মত সোজা হইয়া দাঁড়ান। একবার দক্ষিণদিকে ঐভাবে হেলিয়া পড়ুন। আবার সোজা হইয়া দাঁড়ান। পেট সমানভাবে ও পিঠ ভিতরদিকে বাঁকাইয়া পাঁচ-সাত বার প্রত্যেক দিকে করুন। (খ) পদদ্বয় ঈষৎ ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া হাত মাথার উপর তুলিয়া, দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জড়াইয়া লউন। কোমর হইতে শরীরের ঊর্ধ্বাংশে যতটা পারেন বামদিকে ঘুরাইয়া দিন। এবার ঐভাবে দক্ষিণদিকে ঘুরিয়া যান। প্রত্যেক দিকে এইভাবে পাঁচ-সাতবার ঘুরুন।

তলপেট কমাইবার জন্য—(ক) চিত হইয়া শুইয়া, হস্তদ্বয় মাথার উপর তুলিয়া কিছু ধরুন। হাঁটু মোটে না মুড়িয়া, পদদ্বয় মেঝে হইতে প্রায় একফুট তুলুন। এবার ধীরে ধীরে পা নামান, কিন্তু গোড়ালি যেন মেঝে স্পর্শ না করে। এইভাবে পর পর দশ-বারো বার পা ওঠা-নামা করুন।

(খ) চিত হইয়া শুইয়া, পা দু'টি কোন আলমারী প্রভৃতি আসবাবের নীচে আটকাইয়া (অথবা কেহ ধরিয়া) রাখিয়া, শরীরের ঊর্ধ্বাংশে ধীরে ধীরে তুলিয়া উঠিয়া বসুন। এবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়ুন। পাঁচ-সাত বার এইরূপ করুন।

(গ) সোজা হইয়া দাঁড়ান, স্কন্ধদ্বয় পশ্চাৎদিকে ঠেলিয়া পেট ভিতরদিকে টানিয়া (আকুঞ্চিত করিয়া), দুই উরুর পার্শ্বের উপর হস্ত দুইটি রাখুন। এইবার, কুড়িবার পর পর পেটের পেশীগুলি ঐভাবে আকুঞ্চিত ও শিথিল করুন। দিনের মধ্যে যখনই সুবিধা হয় তখনই এই ব্যায়াম করুন। করিতে করিতে পেটকে ভিতরদিকে টানিয়া (আকুঞ্চিত অবস্থায়) রাখা অভ্যাসে দাঁড়াইবে। তখন কুৎসিতভাবে পেট উঁচু থাকা আপনিই ঠিক হইয়া আসিবে।

নিতম্বের মেদাধিক্য কমাইবার জন্য—(ক) চিত হইয়া শয়ন করুন। হাত দুইটি শরীরের পার্শ্ব হইতে একটু দূরে শয্যা বা মেঝের উপর থাকিবে।

বাম পদ তুলিয়া, দক্ষিণ দিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ পদের উপর দিয়া লইয়া গিয়া তাহার গোড়ালি দ্বারা মেঝে স্পর্শ করুন। এবার তাহাকে পূর্ববৎ সোজা রাখুন ও ঐভাবে দক্ষিণ পদের গোড়ালি দিয়া বামদিকের মেঝে স্পর্শ করুন। দশ-বারো বার এইরূপ করিবেন।

(খ) সোজা হইয়া দাঁড়ান। গোড়ালি দুইটি স্পর্শ করিয়া, দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কিছু তফাতে, প্রায় অর্ধ-সমকোণে (অর্থাৎ ৪৫° ডিগ্রীতে) রাখুন ও দুই উরুর পার্শ্বে হস্ত দুইটি রাখুন। গোড়ালি দুইটি একত্র রাখিয়াই পদাঙ্গুলিগুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়ান। এইবার ধীরে ধীরে জানু দুইটি মুড়িয়া অর্ধেক-বসিবার ভঙ্গীতে নীচু হউন। আবার সোজাভাবে দাঁড়ান। দশ-বারো বার করিবেন।

কৃশকায়াদের জন্য—নিম্নলিখিত ব্যায়ামগুলি করিলেই যে শরীরে চর্বি সঞ্চিত হইতে থাকিবে তাহা নয়, পরন্তু সমস্ত শরীরের পুষ্টি হইবে, খাদ্য ভাল হজম হইবে, পেশীগুলি বৃহৎ ও কঠিন হইবে, সুতরাং ওজন বাড়িবে। শ্বাসের ব্যায়াম ছাড়া অপরগুলি প্রথমে ১০ মিনিট মাত্র করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ বাড়াইয়া ২০ মিনিট পর্যন্ত করা যাইবে।

(১) **শ্বাসের ব্যায়াম**—(প্রাণায়ম)—খোলা বাতাসে (অথবা শীত বা বর্ষার দিনে খোলা জানালার সম্মুখে) দাঁড়াইয়া মুখ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। প্রথমে সিকি মিমিট ধরিয়া শ্বাস টানিবেন ও সিকি মিনিট করিয়া ফেলিবেন। অভ্যাস করিতে করিতে এই টানা ছাড়ার সময় বাড়াইবেন।

(২) সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, কোমরের পিছনে এক হস্তের তালু চিতভাবে রাখুন। তাহার উপর অপর হস্তের তালুর পিঠটি রাখুন। অর্থাৎ দ্বিতীয় হস্তের তালু চিতভাবে প্রথম হস্তের তালুর উপর থাকিবে। চিবুকটি বুকের উপর নামান এবং কনুই দুইটি সম্মুখের দিকে আনিবার চেষ্টা করুন। ধীরে ধীরে, জোরের সহিত, কনুই দুইটি পিঠের দিকে লইয়া যান এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে মাথাটি তুলুন, আর গভীরভাবে শ্বাস লউন। পাঁচ-সাত বার করুন।

(৩) ডনের মত মেঝের উপর উপুড় হইয়া শয়ন করুন। হস্তদ্বয় কনুই-এর কাছ হইতে মুড়িয়া তাহাদের তালু নীচের দিকে করিয়া বুকের পাশে রাখুন। এইবার পদাঙ্গুলি হস্ততালুদ্বয়ের উপর ভর দিয়া, সমস্ত শরীর, কঠিন ও সোজা রাখিয়া ধীরে ধীরে তুলুন। তাহার পর ধীরে ধীরে প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসুন। প্রথম দিন একবার মাত্র করিবেন। ২-৪ দিন পর পর এক-একটি বাড়াইয়া চারি-পাঁচটি পর্যন্ত করুন, যদি ক্লান্তিবোধ না হয়।

(৪) কোমরের পিছনে হস্ত দুইটি রাখিয়া ও বাহু দুইটি সম্মুখ দিকে আগাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান। হস্ত দুইটি শরীরের সহিত জোরে ঘষিয়া, পায়ের পিছন দিয়া, যতদূর পারেন নীচের দিকে লইয়া যান। জানু না মুড়িয়া হস্ত দুইটি পায়ের সম্মুখে, ঈষৎ ভিতরদিকে, আনয়ন করুন। ধীরে ধীরে শরীর পিছনে হেলিয়া, পূর্বের মতই জোরে ঘষিয়া, হস্ত দুইটি তলপেট, উপরের পেট ও বুক অবধি আনয়ন করুন। তাহার পর আবার হস্তদ্বয় পিছনে রাখুন ও পিঠের দিক হইতে তাহাদের নীচে আনয়ন করুন। ঐ সঙ্গে শরীর ধীরে ধীরে সম্মুখে হেলিয়া পড়িবে। হস্তদ্বয় নীচে যাইবার সময় নিশ্বাস ফেলিবেন ও উপরে উঠিবার সময় শ্বাস লইবেন। ৩-৪ বার করুন।

স্বাস্থ্যবিধি

সামান্য চেষ্টাতেই নারী তাহার দেহ ও মনে সৌন্দর্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে পারে। তাহার জন্য প্রয়োজন :

(১) সর্বদা প্রফুল্লতা বজায় রাখা। ইহা শারীরিক শ্রীবর্ধক।

(২) পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিমিত আহার করা। উদরাময় নারীদেহের পরম শত্রু।

(৩) যথাসম্ভব উন্মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ। ভ্রমণের মত উপকারী ব্যায়াম আর নাই।

(৪) আবশ্যকতম প্রতিদিন প্রায় আট ঘণ্টা নিদ্রা। অনিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

(৫) শারীরিক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ না হওয়া। পরিশ্রম দেহকে সুগঠিত করে এবং চর্মকে লালিত্য ও মসৃণতা দান করে।

(৬) প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া এবং রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে প্রসাধন করা। এই অভ্যাস সৌন্দর্যবর্ধক।

(৭) শরীর সোজা ও মস্তক উন্নত করিয়া চলাফেরা করা। ইহা শরীরের দৃঢ়তা রক্ষা করে।

প্রসাধন

দেহের বর্ণের সহিত সৌন্দর্যের সম্পর্ক থাকিলেও বর্ণই সৌন্দর্যের প্রধান মাপকাঠি নয়। তাই দেখা যায় অনেক গৌরবর্ণ নারী দেখিতে আদৌ সুশ্রী

নয়—অথচ অনেক কৃষ্ণকায়ার মধ্যেও আবার চিত্তহারী সৌন্দর্য দৃষ্ট হয়। সৌন্দর্যের জন্য আসল প্রয়োজন—দেহের গড়ন, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য, মসৃণতা ও কোমলতা। প্রসাধনই চর্মকে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে এবং দেহকে সুন্দর ও লাবণ্যময় করিয়া তোলে। এই প্রসাধনের বিষয়েই এবার আলোচনা করিতেছি। দেহের গড়ন ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে।

বর্ণ ও চর্ম

যদিও দেহের জন্মগত বর্ণের পরিবর্তন এখনও মানুষের সাধ্যাতীত, কিন্তু রূপচর্চার মাধ্যমে দেহের ঔজ্জ্বল্য আনয়ন মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। বহু প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে দেহচর্চার বিবিধ প্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে **কাঁচা হলুদ** ও **সরিষা বাটিয়া** স্নানের পূর্বে গায়ে মাখা একটি বহুল প্রচলিত রীতি। পালপার্বণে এবং বিবাহের পূর্বে কনের **'গায়ে হলুদের'** রীতি এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বেসন, ময়দা, ছোলার ভূষি ইত্যাদি, শুকনা কমলা লেবুর খোসা গুঁড়া করিয়া কিংবা মসুরীর ডাল বাটা সরিষার তৈল সহযোগে উত্তমরূপে গায়ে মাখিয়া কিছুক্ষণ পরে স্নান করিলে চর্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত এক বা একাধিক দ্রব্যের সহিত হলুদ গুঁড়া মিশ্রণও উৎকৃষ্টতর ফলদায়ক। দুধের সর বাটা, ঘোল, টকদই ইত্যাদিও বহুল প্রচলিত। গ্রীষ্মকালে গায়ে ও মুখে ঘোল কিংবা টকদই মাখা ঘামাচির প্রতিষেধক।

চর্মের দোষ—কাহারও কাহারও গাত্রচর্ম শুষ্ক এবং খসখসে, আবার কাহারও কাহারও অধিক তৈলাক্ত। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চর্ম এমন হওয়া প্রয়োজন—যাহা শুষ্কও নয়, বেশী তৈলাক্তও নয়। চর্মের সর্বাপেক্ষা বড় দোষ ঢিলা হওয়া ও কুঁচকাইয়া যাওয়া। ইহার কারণ—শরীরের পুষ্টিহীনতা ও বার্ধক্য। প্রোটিন ও পুষ্টিকর খাদ্যই চর্মের কোষ গঠন করে; চর্মের টানভাব ও সজীবতা আনয়ন করে। ইহার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তাজা সব্জী, ফলমূল ইত্যাদি খাওয়া আবশ্যক।

যাহাদের গাত্রচর্ম শুষ্ক তাহাদের বেশী সাবান ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহা চর্মের তৈল-ভাগ দূর করিয়া চর্মকে আরও শুষ্ক করিয়া তোলে। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে সাবান কিংবা গ্লিসারিন-সাবান ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

মুখমণ্ডল

প্রসাধনের প্রধান অঙ্গই হইতেছে মুখমণ্ডল। কারণ মুখশ্রীর উপরই মানুষের সৌন্দর্য প্রধানত নির্ভরশীল। এজন্য স্নো-ক্রীম-পাউডারের প্রচলন আজকাল দেশের সর্বত্র সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

গাত্রচর্মের জন্য যে সকল ব্যবস্থার কথা ইতিপূর্বে বলা হইল, মুখ-চর্মের ব্যাপারেও তাহা প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিতেছি।

শুষ্ক চর্ম—শুষ্ক চর্মে সাবান ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। সাবানের বদলে **'ক্লেনসিং ক্রীম'** দ্বারা মুখমণ্ডল পরিষ্কার করা যায়। প্রথমে জল দিয়া মুখ, ঘাড় ও হস্ত ধৌত করিয়া 'ক্লেনসিং ক্রীম, লাগাইতে হয়, তারপরে ভিজা তোয়ালে নিংড়াইয়া ফেলিয়া তাহা দ্বারা ঘষিলেই সমস্ত ময়লা উঠিয়া আসে এবং চর্মের শুষ্কতা দূর হইয়া যায়। ইহা ছাড়া **দুধের সর বাটা** দ্বারাও এই প্রক্রিয়ায় চর্ম পরিষ্কার করা চলে।

তৈলাক্ত চর্ম—চর্মের তৈলাক্ত ভাব দূর করিবার জন্য একটি প্রকৃষ্ট পন্থা রহিয়াছে। প্রথমে সাবান দ্বারা মুখমণ্ডল ভাল করিয়া ধুইয়া **কোয়াকার ওট্‌স্** সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় মুখে লাগাইতে হইবে। মুখে লাগানো ওট্‌স্ শুকাইয়া যাইবার পর মুখ ধুইয়া ফেলিবেন। ইহাতে চর্মের অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব নষ্ট হইবে। বেসন, ময়দা, কমলালেবুর খোসা, মসুরী ডাল, ছোলার ভূষি ইত্যাদি এক্ষেত্রেও কার্যকরী।

মুখের দাগ—রৌদ্র কিংবা আগুনের আঁচ লাগিয়া অনেক সময়ে মুখে পোড়া পোড়া দাগ পড়িয়া যায়। ইহার জন্য একটা পাকা টম্যাটো দুই টুকরা করিয়া মুখে ঘষিতে হইবে। তার পরে ভিজা মুখ শুকাইয়া যাইবার পর জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। টম্যাটোর বদলে শসা দ্বারাও এই কাজ চলে।

দুধের সর, ময়দা ও সরিষার তৈল মিশাইয়া মুখে মাখিলেও কোনরকম দাগ থাকে না। টাটকা দুধের ফেনা অথবা ডাবের জল ব্যবহার করিলে বসন্তের দাগ মিলাইয়া যায়।

হর্মোন ক্রীম—চর্মকে মসৃণ ও কোমল করিয়া ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়াইয়া তোলা হর্মোনের একটি কাজ। হর্মোন ক্রীমের সঙ্গে হর্মোন্স এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ইহা চর্মকোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চর্মকে উজ্জ্বল ও সতেজ করিয়া তোলে।

ইষ্ট্ প্যাক—ইহা এক রকমের সাদা পাউডার। ইহা ব্যবহারের পূর্বে গরম জলের বাষ্প দিয়া মুখমণ্ডল ঈষৎ ভিজাইয়া লইতে হয়। গরম জলে ইষ্ট্ প্যাক্ সামান্য গুলিয়া মুখে ও ঘাড়ে লাগাইতে হয়। ১৫ মিনিট পরে ইহা যখন শুকাইয়া যাইবে তখন ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে মুখের কুঁচকানো ভাব এবং বার্ধক্যের রেখা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়।

প্লাস্টিক সার্জারি—যাহাদের চর্ম ঢিলা এবং বয়সের জন্য যাহাদের চর্ম কুঁচকাইয়া যায় তাহাদের জন্যই এই পদ্ধতির প্রচলন। ইহাতে চর্মের একটি অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। ইহার ফলে চেহারায় নবযৌবন আসে এবং ১৫-২০ বৎসর পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হয়। পাশ্চাত্য দেশে এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ইহা দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে।

ব্যায়াম—মুখের চর্মকোষ এবং পেশীকে পুষ্ট করিবার জন্য উপরোক্ত সব পদ্ধতি ছাড়াও অপর যে স্বাভাবিক পদ্ধতি রহিয়াছে তাহা হইল মুখের ব্যায়াম। মুখে ও ঘাড়ে হাত না লাগাইয়া দণ্ডায়মান কিংবা উপবিষ্ট অবস্থায় ইহা করা আবশ্যক। শ্বাস বন্ধ করতঃ নানারকম মুখভঙ্গি করিয়া, হাঁ করিয়া, ঘাড় ও চোয়াল এদিক-ওদিক মোচড়াইয়া ইহা করিতে হয়। ইহাতে চর্মে টান পড়ে এবং পেশী সঞ্চালিত হয়। রীতিমত এরূপ করিলে মুখের গঠনে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে এবং চর্মের ঢিলাভাব দূর হইয়া যায়। চিবুক, নাক, চোখ ইত্যাদিতেও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে।

বয়স ব্রণ—সাধারণতঃ ১৩-১৪ বৎসর বয়স হইতে বালক-বালিকাদের শরীরে ব্রণ বাহির হয়। কোনও চিকিৎসা না হইলেও ঐগুলি প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে অথবা বিবাহের পর আপনা হইতেই সারিয়া যায়। সুতরাং ইহা প্রধানতঃ কুমারীদেরই সমস্যা, কারণ এগুলি সুন্দরকে কুৎসিত করিয়া তোলে এবং বিবাহের বাজারে তাহাদের মূল্য কমাইয়া দেয়। গাল, কপাল ও চিবুকে সাধারণতঃ ইহা হয়। তাহা ছাড়া বুকে পিঠে এবং বাহুর উপরের অংশেও হইতে পারে।

ইহার কারণ—অধিক শ্বেতসার (carbohydrate) পূর্ণ খাদ্য (যথা—চাউল, গম, আলু, চিনি প্রভৃতি) গ্রহণ, রক্তহীনতা, পেটের গোলমাল (যথা—কোষ্ঠকাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য, বদহজম, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া), ব্যায়াম ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করা এবং আয়োডাইড (iodide) যথা, কোনও কোনও তথাকথিত রক্ত পরিষ্কারকারী পেটেন্ট ঔষধ ও ব্রোমাইড ঘটিত ঔষধাদি সেবন। মাত্রা

বা পিতার প্রথম যৌবনে ব্রণ বাহির হইয়া থাকিলে সন্তানদের হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অপর কোন উদ্ভেদকে বয়ঃব্রণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। (১) ঔষধাদি, বিশেষতঃ আয়োডাইড ও ব্রোমাইডের ইনজেক্‌শনের জন্য উদ্ভেদ। মনে রাখিবেন যে, এইগুলি খাইলে ব্রণ বৃদ্ধি পায়। (২) ক্লোরিন (chlorine) আল্‌কাতরা (tar) ও পেট্রোলের (mineral oil) সম্পর্কিত কর্মিবৃন্দের ব্রণের মত দেখিতে একপ্রকার উদ্ভেদ। (৩) গরমির (উপদংশ বা সিফিলিসের) দ্বিতীয় অবস্থায় উদ্ভেদ। (৪) Dermal leishmaniaর সংক্রমণ বশতঃ মুখের উদ্ভেদ। ব্রণের উপর হইতে চাঁচিয়া ইহা পাইলে ভ্রম ধরা পড়ে।

ব্রণ সারাইবার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজন:

(১) খোলা বাতাসে ব্যায়াম করা নিতান্ত আবশ্যক।

(২) চর্বি ও শক্তি উৎপাদনকারী শ্বেতসার-প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলি কমাইয়া মাংসবৃদ্ধিকারী প্রোটিন-যুক্ত খাদ্য (যথা—মাছ, মাংস, ডিম, পনীর, সয়াবীন, ডাল প্রভৃতি), টাটকা শাকসব্জী ফল ও ভিটামিনসম্পন্ন খাদ্যাদি গ্রহণ। বেশী মিষ্টান্ন, তৈল, ঘৃত, চর্বি, অধিক মসলা দেওয়া খাদ্য, খুব গরম অথবা খুব ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ নিষিদ্ধ।

(৩) অজীর্ণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি না খাইয়া উত্তমরূপে চর্বন করা।

(৪) অম্ল (acidity) অজীর্ণ বা কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে তাহার চিকিৎসা।

(৫) নর বা নারীর যৌনগ্রন্থির রস, যথা প্রত্যহ দুইটি Androstin-এর বটিকা অথবা প্রত্যহ ৩ হইতে ৫ মিলিগ্রাম stiboestrol-এর বটিকা সেবন উপকারী।

(৬) রক্তহীনতা (anemia) থাকিলে জন্তুর যকৃতের সারাংশ ও লৌহ-ঘটিত ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করান।

স্থানীয় চিকিৎসা—(১) ব্রণগ্রস্তদের চর্মে তেলাভাব থাকে। এইজন্য দিনে ২-৩ বার সাবান ও গরম জল দ্বারা মুখমণ্ডল ধৌত করিতে হইবে এবং মুখের প্রসাধন করিবার পূর্বে স্পিরিটে সমান পরিমাণ জল মিশাইয়া তাহা দিয়া বদনমণ্ডল পরিষ্কার করিবেন। পরে পাউডার কিংবা স্নো লাগাইতে পারেন, কিন্তু ক্রীম লাগাইবেন না।

(২) তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া ব্রণগুলি ভাতুরী (comedones) বাহির করিয়া ফেলিবেন।

(৩) পুঁজপূর্ণ ব্রণগুলি গভীর মূল স্ফোটকগুলি খুব সরু ডগাওয়ালা ছুরি দ্বারা চিরিয়া দিতে হইবে, নতুবা তাহাদের দাগ থাকিয়া যাইবে।

(৪) লাগাইবার জন্য নিম্নক্ত লোশনগুলি ভাল :—

(ক) Sulphur ppt. 2% in lotis calamina (B. P.)

(খ) Zinc sulphate gr. 22. Potassium Sulphurate gr. 20. Acetone dr. li., Acqua—camphorae ad. 1 oz.

(৫) লাগাইবার মলম—6 to 12% of Resorcin and sulphur is Lassar's paste.

(৬) Erythema dose of ultra violet light therapy.

(৭) দুই সপ্তাহ পর পর ৩-৪ বার ১০০ হইতে ২০০ ইউনিট একস্-রে লাগান।

ঠোঁট—ঠোঁটের সৌন্দর্যের জন্য লিপষ্টিক ব্যবহার পাশ্চাত্য দেশে প্রায় সার্বজনীন। এদেশেও শহরাঞ্চলে আধুনিকাদের মধ্যে ইহা প্রসার লাভ করিতেছে। লিপষ্টিকের অত্যধিক ঔজ্জ্বল্য অনেকের চোখেই বিসদৃশ ঠেকে। তাই ইহার স্বাভাবিক ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত।

আমাদের দেশে পান খাইয়া ঠোঁট রঙীন করার প্রথা আছে। ইহা মন্দ নয়। এতদ্ব্যতীত লৌহযুক্ত খাবার (যথা—বেগুন, কাঁচকলা, বীট, মোচা, ডুমুর, খেজুর, মধু ইত্যাদি) গ্রহণ করিলে ঠোঁটের স্বাভাবিক আভা ফুটিয়া উঠে। শুষ্ক ঠোঁটে খাঁটি ঘি গরম করিয়া লাগাইলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

চোখ—মুখের সৌন্দর্যের সহিত চোখের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। টানাটানা দীর্ঘায়ত 'কালো হরিণ চোখ'ই মানুষের মন হরণ করে। রাস্তার ধুলাবালি ও ধোঁয়া চোখের সৌন্দর্য নষ্ট করে। এ জন্য মাঝে মাঝে 'আই লোশন' কিংবা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। নুন জল দিয়া চোখ পরিষ্কার করাও ভাল।

কোষ্ঠকাঠিন্য, রাতজাগা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ইত্যাদির ফলে চোখের সৌন্দর্য বর্ধন করে। তাই তাহারও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। নিয়মিত আঁচড়াইলে এবং ক্যাষ্টর অয়েল লাগাইলে ভুরু কাল ও টানাটানা হয়। ভেসেলিনও লাগানো যায়।

কাজল ও সুর্মার প্রচলন আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র, ইহা চোখের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল।

দাঁত

দাঁতও সৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ। তাই দাঁতের যত্ন নেওয়া আমাদের অন্যতম কর্তব্য। দাঁতের জন্য প্রয়োজন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আইওডিন, লৌহ ও ভিটামিন 'ডি'। সেইজন্য আমাদের খাদ্য তালিকায় নিম্নোক্ত খাদ্য সমূহ প্রয়োজনীয়।

১। ক্যালসিয়াম যুক্ত—বাদাম, ডাল, ফুলকপি, ডাঁটা, নটে ও পালং শাক, ডিমের কুসুম, চিংড়ি ও রুই মাছ, চুনো মাছের কাঁটা এবং চুনসহ পান।

২। ফসফরাসযুক্ত—আলু, পটল, মানকচু, পেঁয়াজ, উচ্ছে, ঢেঁড়স, গাজর, পুঁই, ছানা।

লৌহ যুক্ত—শুকনা ডাল, শুকনা ফল, কাঁচা মটরশুঁটি, বাঁধাকপি, শাকসব্জী, আটা, চাল, ছানা, মুরগীর মাংস, গুড়, শটি ইত্যাদি।

৪। ভিটামিন 'ডি'—মাংসের চর্বি, দুধ, মাখন, ডিম, মাছের তেল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

৫। আইওডিনের জন্য সামুদ্রিক মাছ।

তামাক, পান, দোক্তা, জর্দা, লৌহযুক্ত জল ইত্যাদিতে এবং পেটের অসুখ থাকিলে দাঁত কালো হয়। এজন্য সোডি বাইকারব কিংবা পাতিলেবুর রস দিয়া একটু মাজিলে দাঁত খুব পরিষ্কার হয়। জলের সামান্য ডেটল মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

সরিষার তৈল সহযোগে লবন দিয়া দাঁত মাজাও খুবই ভাল।

স্তনের যত্ন

স্তন নারীর সৌন্দর্যের জন্য এবং ইহার স্পর্শন, মর্দন ও চুম্বন নর ও নারীর আনন্দলাভের জন্য, বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সন্তানবতীদের ত কথাই নাই। নিঃসন্তান বিবাহিতাদের, এমনকি কুমারীদের মধ্যেও যাঁহারা স্থূলাঙ্গী, স্বাস্থ্য-হীনা অথবা ব্যায়ামবিমুখ তাঁহাদেরও অচিরেই (বিংশতি বৎসর বয়সের অনেক পূর্বেই) ইহা পতিত হয়। এমন কোনও নির্ভরযোগ্য ঔষধ নাই যাহা ব্যবহারে

ইহা দীর্ঘকাল কঠিন ও উন্নত থাকে, অথবা শিথিল বক্ষ আবার দৃঢ় ও সুন্দর হইয়া যায়। তবে কতকগুলি প্রক্রিয়া অবলম্বনে স্তনের দৃঢ়তা বজায় রাখা এবং ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব। তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

স্থূলতা ও কৃশতার প্রতিকারে যাহা বলা হইয়াছে এখানেও তাহা খাটে। তবে শারীরিক ব্যায়াম স্তনের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী নয়, কারণ—স্তন প্রধানত মাংসপেশী দ্বারা গঠিত নয়।

ঠাণ্ডা জলে স্নান করা সকল দিক দিয়া উপকারী। ইহাতে স্তনের কোষ-সমূহ উত্তেজনা পায় ও শক্ত হয়। স্নানের পূর্বে গরম জলে বক্ষ ধৌত করিয়া এবং কয়েক মিনিট ঈষদুষ্ণ জলের তাপ লাগাইয়া স্নান করিলে স্তন উন্নত হয়। স্নানের সময় সাঁতারও ইহাকে উন্নত করে। স্থূল স্তন ছোট করিবার জন্য নিচের দিক হইতে উপরের দিকে ম্যাসেজ করা উচিত।

প্লাষ্টিক সার্জারি (Plastic Surgery) দ্বারা শিথিল স্তনকে দৃঢ় ও উন্নত করা সম্ভব। ভারতে অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজগুলির হাসপাতালে বিনা খরচে ইহা করানো যায়। আজকাল 'ব্রেষ্ট পাম্প' ব্যবহারেও সুফল পাওয়া যাইতেছে। তবে সর্বাপেক্ষা যাহা অধিক প্রয়োজন, তাহা হইতেছে জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করা।

চুলের যত্ন

খাদ্য—চুলের মূলদেশেই তাহার প্রাণ। তাহাকে পুষ্ট করার জন্য (পূর্ব কথিত) স্বাস্থ্যবিধিসমূহ পালন, পুষ্টিকারক খাদ্য গ্রহণ, প্রচুর জলপান এবং লেবু প্রভৃতি ফল ভক্ষণ ভাল।

মাথার চামড়া—উভয় হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি দিয়া ইহাকে চাপিয়া, প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায়, পাঁচ মিনিট ধরিয়া, সমস্তদিকে, প্রায় সিকি ইঞ্চি নড়াইলে, তাহাতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি হয়, সুতরাং চুলের মূলদেশ পুষ্ট হইবে। রগ ও মাথার চাঁদি বিশেষভাবে মালিশ করিতে হইবে কারণ উক্ত স্থান হইতেই চুল উঠা আরম্ভ হয়। চুলের গোড়া ধরিয়া টানা তাহাদের বৃদ্ধির সহায়ক।

চিরুনি ও ব্রাশ—উক্ত উদ্দেশ্যে, শক্ত কুঁচির ব্রাশ দ্বারা প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর, স্নানের পর ও বৈকালে, প্রথমে অল্পক্ষণ বেশ জোরে জোরে আঁচড়াইতে হইবে, পরে সারা মাথায় তাহা দ্বারা ঘষিতে হইবে, যতক্ষণ না চামড়াটি লাল হইয়া উঠে ও সড়সড় করে। তাহার পর, ভোঁতা ও ফাঁকা

ফাঁকা সমগ্র আস্ত দাঁতওয়ালা চিরুনি দ্বারা বেশ জোরে জোরে আঁচড়াইতে হইবে। ব্রাশ ও চিরুনি সযত্নে পরিষ্কার রাখিতে হয়।

ইহার ফলে (১) চুলের স্বাভাবিক তৈল সমস্ত চুলের ডগা অবধি লাগিয়া যায়, (২) সুতরাং চুলের, তথা কবরীর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, (৩) উক্ত তৈল চুলকে বাতাস ও আঘাত হইতে রক্ষা করে, (৪) বুরুশ দেওয়ার ফলে চুলে নবজীবন সঞ্চার হয় এবং সেগুলি চকচক করে এবং (৫) তাহা হইতে স্থির বিদ্যুৎ (Static electricity) উৎপন্ন হয়।

চুল শুষ্ক বা ভঙ্গপ্রবণ হইলে—পরিষ্কার রেড়ির ও জলপাই-এ (অলিভ) তৈল সমানভাবে মিশাইয়া অল্প গরম করিয়া মালিশ করিয়া, গরমজলে ডুবাইয়া নিংড়ানো তোয়ালে দ্বারা মাথা কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবেন। তাহাতে লোমকূপ-গুলির মুখ খুলিয়া তাহার ভিতর তৈল প্রবেশ করিবে। পরে মাথা ধুইবেন। মাসে দুইবার শ্যাম্পু করিবেন। স্নানের পরে আঁচড়াইয়া এবং শুকাইয়া বাঁধিয়া রাখিবেন। শুষ্ক কেশ অধিকক্ষণ খোলা রাখিলে ইহা ফাটিয়া যায় এবং কিছুদিন পরে ভাঙিয়া যায়। বর্ষার সময় একদিন অন্তর চুল ভিজাইলে ভাল।

চুলে স্বাভাবিক তৈলাক্ত ভাব অধিক হইলে, বিশেষত চুল সরু ও সোজা হইলে, সপ্তাহে ২-১ বার, অথবা ময়লা হইলে, তখনই, ক্ষার ও লবণহীন ভাল জল এবং চর্বিসম্পন্ন উত্তম সাবান বা রিঠা দিয়া ধৌত করিবেন। রিঠার জল চক্ষুতে লাগিলে বিশেষ জ্বালা করে। সাবধান। সাবান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। যদি ইহার ফলে কেশ অধিক শুষ্ক হইয়া যায় তাহা হইলে অল্প ভেসেলিন বা তৈল মাখিবেন। যাহার কেশ শুষ্ক তাহার এক বা দুই মাসে একবার ধৌত করাই যথেষ্ট।

কেশ শুষ্ক করা—যথাসম্ভব কম ঘষিবেন। শুষ্ক এবং অল্প উত্তপ্ত তোয়ালের উপর কেশ ছড়াইয়া রাখিয়া তাহাতে সূর্যের, ল্যাম্পের বা অগ্নির উত্তাপ লাগাইবেন। বায়ু উত্তপ্ত থাকিলে পাখা চালাইলে কেশ খুব শীঘ্র শুষ্ক হয়।

কেশ কুঞ্চিত করা—(ক) উত্তপ্ত চিমটা দ্বারা। উহা অত্যুত্তপ্ত হইলে কেশের শীর্ষদেশ পুড়িয়া ও ফাটিয়া যায়। (খ) সিক্ত কেশে কিছু জড়াইয়া—ভিজা চুল, ধাতব পিন, চর্মের টুকরা ক্যার্লিং পেপারে জড়াইয়া রাখা বেশ নিরাপদ এবং তাহার ফলে স্বাভাবিক কুঞ্চন দেখায়। যাঁহাদের কেশ বেশ মজবুত এবং সামান্ত স্বাভাবিক কুঞ্চিতভাবে আছে তাঁহারা কেশ ভিজাইয়া,

চিরুনি দ্বারা ঠিকভাবে আটকাইয়া রাখিলে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তাহার তরঙ্গায়িত ভাব থাকে।

উকুন—মাথায় উকুন হইলে, (ক) সাবান জলের সহিত সামান্য কেরোসিন মিশাইয়া (খ) ফিনাইল জলে গুলিয়া, (গ) জলে অথবা এ্যাসিটোনে (acitone-এ) ডি. ডি. টি. (D. D. T.) মিশাইয়া কিংবা পাইরেথ্রাম তৈল (Pyrethrum oil) লাগাইবেন। যদি দেখা যায় যে, ডি. ডি. টি. ব্যবহারের ফলে চুল উঠিতেছে তাহা হইলে তাহার পরিবর্তে শেষোক্তটি ব্যবহার করিতে পারেন।

তৈল ব্যবহার—খাঁটি নারিকেলের, জলপাইয়ের, পরিষ্কার করা রেড়ির (ডাক্তারখানায় প্রাপ্তব্য), সিসম (Sesame) বা বাদামের তেল, সকালে, বিকালে, অন্তত পাঁচ মিনিট, সমস্ত চুলের গোড়ায়, অঙ্গুলিগুলির প্রান্তদেশ দিয়া ঘষিতে হইবে। চুলগুলির শীর্ষ দেশেও লাগাইতে হইবে। মালিশের প্রণালী পূর্বে বলা হইয়াছে। মেথি ভাজিয়া তৈলে মিশাইলে চুল ভাল থাকে। তৈল সুগন্ধ করিতে হইলে চন্দনের গুঁড়া মিশাইবেন।

বেসন ও খইল অথবা মুসুর ডাল বাটিয়া তদ্দ্বারা মাথা ঘষা ভাল।

চুল ওঠা—কতকগুলি চুল স্বভাবতই প্রত্যহ উঠিয়া যায়। যদি অধিক চুল উঠিতে থাকে তবে অবশ্য ঠিকমত চিকিৎসা করানো উচিত।

চুল উঠার কারণ—জ্বরে, আমাশয় প্রভৃতি কোনও কঠিন, তরুণ (acute) রোগ, ভাবনা চিন্তা, হঠাৎ ভয় পাওয়া, চক্ষুরোগের জন্য কোনও বস্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিতে অথবা পড়িতে চক্ষুতে জোর পড়িলে, সিফিলিসের (উপদংশ বা গরমির) দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা, এরূপ আঁট ও গরম টুপি পরা যাহাতে বাতাস খেলিবার মত ছিদ্র নাই, খুস্কি প্রভৃতি।

চুল উঠা আধুনিক চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা—(ক) চুলের গোড়ায় মালিশ ঃ

(১) Bepanthen Liquid, Roche & Co, (২) Cantheridine Hair oil, (৩) এক ভাগ Bayer & Co,-র Mitigal এবং ছয় ভাগ Lime Juice Glycerene মিশাইয়া অথবা (৪) Halo Shampoo দ্বারা এবং (৫) মস্তক মুণ্ডন করাইয়া আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি লাগানো।

(খ) কোনও বিশ্বাসযোগ্য ভাল কোম্পানীর Vitamin B Complex এবং Multivitamin Tablet সেবন। ভিটামিনযুক্ত ভোজ্যসমূহ, যথা—

মাছ, মাংস, ডিম, টম্যাটো, গাজর প্রভৃতি নানা তরকারী, কাঁচা ও পাকা ফল ইত্যাদি খাওয়া।

(গ) তেল, ঘি, মাখন প্রভৃতি স্নেহ জাতীয় পদার্থ অথবা চিনি, অধিক পরিমাণে খাওয়া অনুচিত।

চুল উঠার দেশীয় ভেষজ—(ক) কাটা পিঁয়াজ, (খ) জবাফুলের গোড়া, (সবুজ অংশ বাদ দিয়া) (গ) এক পোয়া খাঁটি নারিকেল তৈলে অর্ধ পোয়া মেথি ভিজাইয়া, ৫-৬ দিন রৌদ্রে রাখিয়া এবং খাঁটি নারিকেল তৈল ও জবাকুসুম তৈল সমান ভাগে মিশাইয়া মস্তকে ঘর্ষণ করা।

আধ পোয়া শুষ্ক আমলকী, ২-৩ দিন জলে ভিজাইয়া পরে (বিনা জলে) শিলে বাটিয়া এক পোয়া ভাল নারিকেল তৈলের সহিত মিশাইয়া, প্রাতে চুল ধুইয়া, বৈকালে উহার গোড়ায় ঘষিয়া ঘষিয়া মাখিয়া খোঁপা বাঁধিবেন। পরদিন মস্তক ধুইবেন না। তাহার পরের দিন আবার উক্ত দ্রব্য ঐভাবে ব্যবহার করিবেন। এইভাবে ২-১ মাস চলিবে। মহাভৃঙ্গরাজ পত্রের অথবা পিঁয়াজের রস মাখাও উপকারী।

খুস্কি—ইহা মাথার এখানে সেখানে খানিক খানিক, অথবা অনেকটায় ঢিলা আঁশের মত বস্তু। ইহা খুবই ছোঁয়াচে। কারণ—একপ্রকার কীটাণু (germ); ইহারা মস্তকের উপরের স্তরে থাকে; আঁট ও ছিদ্রহীন হ্যাট ব্যবহার করিলে, অতিরিক্ত গরম ও চাপের ফলে; মাথার রক্ত চলাচল না হওয়া, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যচূর্ণ দিয়া প্রস্তুত রুটি প্রভৃতি খাদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার ইত্যাদি। ইহার ফলে চুল শুষ্ক হইয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে চুল উঠা আরম্ভ হয়। টাকও হইতে পারে।

বারংবার মস্তক ধৌত করা। উত্তমরূপে চুল ব্রাশ করা, তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া, অথবা আলকাতরা বা পারাঘটিত তরল ঔষধ (লোশন) বা মলম সাবধানে ব্যবহার করা ইত্যাদিই ইহার প্রতিকার।

একদিন আধ পোয়া কাঁচা দুধ মস্তকে মাখিয়া পরিষ্কার শুভ্র-বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাহা বাঁধিবেন। এক ঘণ্টা পরে, ভাল সাবান, শ্যাম্পু বা রিঠার দ্বারা উত্তম-রূপে ধুইবেন। এক সপ্তাহ পরে যদি দেখা যায় যে খুস্কি আছে তাহা হইলে আবার একদিন ঐরূপ করিবেন।

অন্যান্য কর্তব্য—(১) মাঝে মাঝে সিঁথির স্থান পরিবর্তন করা আবশ্যক। নতুবা সিঁথির দুইধার চুল উঠিতে উঠিতে চওড়া হইয়া যায় এবং বিশ্রী দেখায়।

(২) বিশ্বাসভাজন ভাল কোম্পানীর সিঁদুরই ব্যবহার করা উচিত। মন্দ সিঁদুরে চুল উঠিতে ও মাথায় ঘা হইতে পারে। (৩) রাত্রে শয়নের পূর্বে চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা করিয়া শোওয়া উচিত। সমগ্র মস্তকটি পাতলা কাপড় অথবা জাল দিয়া ঢাকিলে, বালিশের ঘর্ষণে চুল নষ্ট হয় না। (৪) চুলের ফিতা পরিষ্কার থাকা, (৫) সর্বদা পালিশ কাঁটাই ব্যবহার করা, (৬) প্রথমে হস্ত দ্বারা চুলের জট ছাড়াইয়া পরে চিরুনি ব্যবহার করা উচিত। (৭) চুল ঈষৎ তৈলাক্ত ও জলহীন থাকা এবং তাহাতে পরিমিত রৌদ্র, আলো ও বাতাস লাগা আবশ্যক। (৮) মাঝারিরূপ টান করিয়াই চুল বাঁধা ভাল। (৯) রেশমী বা সুতী খোপনা (ট্যাসেল) ব্যবহার অনুচিত। এগুলি চুলের তৈল শুষিয়া লওয়ায় চুলের শীর্ষদেশ রুক্ষ হইয়া ফাটিয়া যায়। (১০) শুষ্ক চুলে স্পিরিটঘটিত লোশন ব্যবহার অনুচিত। ইহাতে চুলের ডগা ফাটিয়া যায় অথবা সেগুলি ভাঙিয়া যায়। চুল খুব বেশী তেলা হইলে তবেই ঐ সমস্ত ব্যবহার করা চলে। (১১) চুলের জন্য অন্যতম কর্তব্য মন ও মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা। অধিক চিন্তা ও উত্তেজনা চুল ও মস্তিষ্কের পক্ষে ক্ষতিকর।

চুল বাঁধায় সৌন্দর্য—লম্বা চুলে—বেণী করিয়া ঝুলাইয়া দিবেন। ছোট চুলে—বেণী না করাই ভাল, বিশেষত লম্বা মেয়েদের। অল্প চুল হইলে বেণী করিয়া লম্বা খোঁপা করিতে পারেন। অধিক চুলে—এই কবরী সুশোভন নয়। ঘাড় ছোট হইলে এই কবরী একটু উপরে করিবেন। ঘাড় লম্বা হইলে নীচে করিবেন। উচ্চে কবরী করিতে হইলে চুল পাকাইয়া গোল খোঁপা করিবেন কিংবা রোল (roll) করিয়াও করিতে পারেন। কপাল চওড়া হইলে চুল একটু ফাঁপাইয়া ও নামাইয়া আঁচড়াইবেন। কপাল ছোট হইলে চুল উল্টাইয়া আঁচড়াইবেন।

প্রমাণপঞ্জী (১)

এই পুস্তক প্রণয়নে যে অসংখ্য পুস্তক, পুস্তিকা, সাময়িক পত্রিকা, সংবাদপত্র, হস্তলিপি ইত্যাদি হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া দুরূহ। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার অধ্যয়নের জন্য আমি নিম্নে কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তকের উল্লেখ করিলাম। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষভাগে আরও বহু পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা পাইবেন।

† চিহ্নিত পুস্তকগুলি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার বিশেষ উপকারে আসিবে না। এইগুলিতে হয় একটু জটিল ধরনের আলোচনা করা হইয়াছে, না হয় কতকগুলি উক্তি বা বিবৃতি হইতে তথ্য আহরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলির আবার ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলেও আধুনিক উপযোগিতা নাই। *চিহ্নিত পুস্তকগুলি কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী, বড়দেরও।

Standard Publishers Ltd., Dacca Stadium, Messers D. B. Taraporevela & Sons Ltd., Hornby Road, Pombay, ও The Pakistan Co-operative Book Society Ltd., Chittagong এ পুস্তকগুলির কতক পাওয়া যায়।

---

* Sex Knowledge for Boys and Adolescents— Pillay.

* Sex Knowledge for Girls and Adolescents— Pillay.

Sex Education of Children— Dennett.

Introduction to Sex Education— Richmond.

* A Talk with Boys about Themselves— Edward Bruce Kirk.

* A Talk with girls about Themselves— Edward Bruce Kirk.

Sex Education—Bristol Education. Society.

Sex Problems and Youth— T. F. Tucker

Sex Education & National Health— Hartley.

Text-book of Sex Education— Gallichan.

Teaching of Sex Hygiene in Public Schools— E. B. Lorry.

New Patterns in Sex Teaching— F. B. Strain.

An Introduction to Sex Education —F. B. Strain.

* Knowledge A young Man Should Have— Phillip & Murray

* Bady Buds— Ellis Ethelmer.

* The Human Flowers— Ellis Ethelmer,

* Healthy Boyhood—Arthur Truby.

* Adolescence— Stanely Hall.

* What Every Man should Know— Heaton.

* Sex Knowledge for Young Women— Gair.

The Practice of Sex Education— Chesser.

Sex Education— Bibby.

What Every Mother Should Tell— M. Sanger.

Parents and Sex Education— Gruenberg.

* Introduction to Sexual Hygiene— Buschke & Jacobson
*Hopes & Helps for the young of Both Sexes— Weaver.
* What a Young Girl Ought to Know— Mrs. Wood Allen
The Adolescent Girl— Blanchard
* What a Young Wife Ought to Know— Mrs. Drake.
Rennie Macandrew on Sex Instruction—
* Elements of Sexology— Norman Haire.
* Almost Fourteen— M. A. Warren.
Sex Education & the Parent— Thomson & others.
Youth— E. S. Chesser.
Youth and Sex—Dorothy Bromley.
* Being Born— F. B. Strain.
* Where did I come From Mother ?— A. M. Gordon.
* How I was born— C. P. Bryan
* How we are born— Mrs. N. J.
How Life is Handed on—C. Blibby.
What the Public should know— about Child Birth—W. M. Gossett.
* Approaching Manhood— Macandrew.
* Approaching Womanhood— Macandrew.
* Preparing for Womanhood— E. R. Lowry.
Sexology— Ed. by Wallins.
* Life and Its Begining— Helen Webb.
* The Wonper of Life— Mary Tudor Pole.
* What is Sex— Helena Wright.
Sexual Truths— Robinson.
Sex and Life— Robie W. F.
Sex Problems in India— Phadke.
The Sexual Life of the Child— Moll.
Sex in Every day Life— Griffith
Sex in Practical Life—Kalyan, S. P.
Sex and the Young—Marie Stopes
Song of Life— Margaret Morley.
The Story of life—Ellice Hopking.
Sex love— Herbeits.
Youth, Sex & Life— Cox.
Outline of Zoology— J. A. Thomson
Biology of Everyman—
An Outline of Modern Knowledge —Ed. W. Rose.
The Science of Life— H. G. Wells & others.
† Sexual Behaviour in the human Male (1948) and
† Sexual Behaviour in the Human Female (1953)—Dr. Kinsey & others.
Encyclopædia of Sexual Knowledge Vol. 1—Ed. by Norman Haire.
Encyclopædia of Sexual Knowledge Vol. 2.— Wily. A. & others.
Encyclopædia of Sex— Victor Robinson.
Encyclopædia of Sex—G. R. Scott.
Encyclopædia of Sex & love Technique— Macandrew.
The Psychology of Sex—H. Ellis.
Marriage Manual— Dr. & Dr. (Mrs.) Stone.
Outline of Sex—W. D. Birdwood.
The Sex Foctor in Human Life— T. N. Galloway
† The Natural Philosophy of love— Gourmont.
† Kama Sutra— Vatsyayana
† Anaanga Ranga— Kalayanmalla.
† The Perfumed Garden—Nefzaui.
The Organism as whole— Leob.
The Geneties Sexuality in Animals. —E. Creed.
† Sexual Anatomy and physiology— Bernard & Allen.

Know Thy Body within us— The wonders Medicus
Practical anatomy—Cunningham.
Anatomy— Gray.
† Human Sex Anatomy—Dickinson.
An Introduction to Sex Physiology— Marshall.
Physiology of Sex— Kenneth Walker.
Psychologist looks at Sex— H. L. Phillip.
Clinical Endoorinology of tne Female—Mazer and Goldstcin.
Sex & Internal Secretions— Ed. by Allen Edgar.
Women's Periodicity— Mary Chadwick.
Eduoation in Sexual Physiology and Hygiene— P. Zenner.
The Chemistry of Hormones— Harrow.
Psychology of Sex Relations— Theoder Reilk.
Biological aetions of Sex Hormones— Harold Burrows.
* Woman, Vols. I, II & III— Ploss & Bartel.
Love—Problems of Adolescence— Butterfield.
Love & Friendship—Jane Austen.
† Love and Marriage—Ellen Key.
The Development of the Sexual Impulses— Kyrle.
Love and Marriage— Hall.
Psychology of Sex— Gallichan.
Sex in Man and Animals— Baker, gohn.
Three Contributions to the Theory of Sex— Freud.
The Art of Courtship & Marriage— Gallichan.
Temperament of Sex— Walter Heaton.
The Meaning of Love—Solovyev.
† The New Horizon in Love & Life— Mrs. H. Ellis.
Crossed in Love— A Physician.
A Little Philosophy of Love— Grace Rhys.
The Evolution of Love—E. Lucka.
Love and Thought in Animals and Men— Serge Vornoff.
The Old Love and the New— W. Walter.
Love in the Machine Age— Dell.
The Lover's Manual— Ovid
Essays of Love and Virtue— H. Ellis.
More Essays of Love and Virtue— H. Ellis.
† The Art of Love— Ovid.
Art of Love— Robie
Love's Coming of Age— Edward Carpenter.
Love— B. S. Talmey.
Man & Woman— H. Ellis.
Sex in Human Relationship— Hirschfeld
The Opposite Sexes— Dr. Adlof Heilborne.
Sex Science— J. H. Greer
Modern Light on Sex— Douglas White.
Revelation of Sex Mysteries— R. Thurber.
Problems of the Sexes— Jean Finot.
The Sexual Life of Woman— Kisch.
The Singe Woman— Dickinson.
Women and Men— Scheinfeld.
Modern Women and Men Yarros. R. S.
Psychology of Women Dentsch, Helen.
Women Holtby.
Woman's Sex Life Macfadden.
The Sexual Life of Man Placzec.

Woman from Bondage to Freedom— R. H. Bell
Womanhood and Health— C. M. Murrell.
Straight Talks to Women— Marry Scharlieb.
Sexual Aberrations— Stekel
† Psychopathia Sexualis— Kraft Ebbing.
Sexual Anomalies and Perversions... Hirschfeld.
The Common Sense of Nudism— G. R. Scott.
Prostitution : a Survey & a Challenge—Hall, Gladys Mary.
Riddle of the woman— Tenenbaum.
Prostitution in Europe— Flexner Abraham.
The Red light— Macandrew
Veneral Diseases— Lees, David.
Venereal Diseases— Lt. Col. K. K. Chatterji.
History of Prostitution— G. R. Scott.
Hygiene of Sex—Maxvon Gruber.
† Mcdern Clinical Syphilology— Stokes, John. H.
Gonorrhoea in the Male and Female— Pelouze.
Marriage and Syphilis— G. M. Kathsaions.
Veneral Disease— Scott.
Male Disorders of Sex— Walker.
Diseases and Disorders of Sex and Reproduction in the Male— Dr. A. P. Pillay
Maladjustments of Sex— R. V. Storer.
Sexual Disorders and Diseases— Hingoravi.
Disorders of the Sexual Functions in the Male and Female—Huhner.
Diseases of Women— Hermann and Maxwell.
The Sexual Life of Our Times— Block.
Far Eastern Sex Life—G. R. Scott.
The Science of Sex Control— I. W. Conway
Sex Life and Sex Ethics—Guyon.
Sex and Morality— Partington.
History of Modern Morals— Hodann, Max.
Sex in Civilization— Ed. by V. F. Calverston and another.
The Pivot of Civilization— Margaret Sanger.
Modern Views on Sex— Denham. Mary.
Sex in Prison— Fishman, J. F.
The Revolt of Modern Youth— Lindsey.
The Sex Life Unmarried Adult— Wile Iras.
Sexual Ethics— Michels.
Lovers Morality— J. Fischer.
Man and the Morals—R. V. Storer.
The Companioate Marriage— Lindsey.
Sex and Sex worship—O. A. Wall.
Phallic Worship— Campbell.
Phallic Worship— Howard
Phallic Worship— G. R. Scott.
The History of Human Marriage— Westermark.
Short History of Marriage— Westermark.
Intelligent Man's Guide to Marriage and Celibacy— J. W. Tanner.
Marriage and—Morals— Bertrand Russel.
† The Physiology of Marriage— Balzac.
Marriage— Norman Haire
Fit or Unfit for Marriage— Velde.
Adolescence and Marriage— R. V. Storer

Marriage— Groves.
Preparation for Marriage—Groves
Preparation for Marriage—Walker.
Courtship by post—Macandrew.
All About Sex, Love and Happy Marriage—Past and Present— Margaret Cole.
† The Book of Marriage— Keyserling
The Outline of Marriage— E. S. P. Haynos.
The Fifteen Joys of Marriage— La Sale.
Modern Marriage— Popenoe.
Marriage Before and After— Edited by Paul Popenoe.
Sex Marriage and Family— Thureman Rice.
The Marriage Reader—Edited by S. G. and E. B. Kling.
Marriage in the Modern Manner— Ira. S. Wile.
Why Not Get Married ?— H. A. Kalish.
How to Marry the Perfect Man— Hallen Gordon.
Why Marry ?— J. L. Williams
Curiosities of Matrimony— David Ainsworth.
Marriage in My time— Marie Stopes.
The Evolution of Modern Marriage— Muller' Lyer, F.
Wither Women— Rege.
† My Confessional— H. Ellis
Friendship, Love Affairs and Marriage— Macandrew
The Choice of a Mate—Ludovici.
The Woman a man Marries— V. C. Pedersen.
মাতৃমঙ্গল—আবুল হাসানাৎ
বিবাহের পরে—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য
সমাজ ও যৌনসমস্যা— নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
যৌন-জিজ্ঞাসা— দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
Right Marriage—Barry and others.
Towards Sex Freedom—Clephane.
Sex Relations of Mankind— Montegazza.
Sex in Relation to Society— H. Ellis.
The Sexual Life of the Savages— Malinowski
Sex and Repression in savage Society— Malinowski
The Wey of All Women—Harding.
Scientific Curiosities of Sex Life— Mehta.
Scientific Curiosities of Love Life and Marriage— Mehta.
The Father in primitive Psychology— Malinowski.
Youth and Sex Life— Cox.
Sex and the Social Order— G. H. Seward
† Sex Life and Faith— Landaw.
The Laws of Sex— E. H. Hooker.
Sex Freedom and Social Control— C. W. Margold
The Future of Sex Relationships— R. D. Pomerai.
Sex Morality Past, Present and Future—Robinson and Jacobi.
The Art of Talkingia Wife— Mantegazza.
World League of Sexual Reform— Reports of International Congresses 1921, 28, 29, 30.
The Sexual Crises— G M. Hess.
The Sexes Here and Hereafter— W. H. Holcombe.
The art of Courtship and Marriage —Gallichan.
নরনারীর যৌনবোধ— নৃপেন্দ্রকুমার বসু
বিয়ের আগে ও পরে— ঐ
প্রেম ও কাম-বিজ্ঞান— ঐ
নারী বিপথে যায় কেন ? ঐ
ফ্রয়েডের ভালবাসা— ঐ

"If anyone is able to convict me of error or deed, I will gladly change For I seek the truth by which no man was ever injured. The injury lies in remaining constant to self-deception and ignorance."

—Marcus Aurelius

প্রশ্নমালা

(প্রথম খণ্ড)

এই পুস্তকে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আরও গবেষণা-কার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের জন্য এই প্রশ্নমালা তৈয়ারী করা হইল।

যাঁহাদের উত্তর নির্ভুল ও বহুলতথ্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাদিগকে পরবর্তী সংস্করণের একখানা পুস্তক বা তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে আমার অন্য কোনও পুস্তক বিনামূল্যে অথবা সমুচিত আর্থিক পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

আশা করি, পাঠক-পাঠিকারা এই পুস্তকে আলোচিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত নানা তথ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বিতরণে আমাকে সাহায্য করিবেন। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যে তথ্যাদির সন্ধান পাওয়া যায় তাহা সযত্নে সুবিন্যস্ত এবং সুশৃঙ্খল করিতে পারিলেই কোন একটা বিজ্ঞান-শাখা গড়িয়া তুলিতে পারা যায়।

প্রশ্নমালার উত্তরাবলী নিম্ন ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

আবুল হাসানাৎ

রিটায়ার্ড আই. জি পুলিস, ৩১ তোপখানা রোড, ঢাকা—২।

অনুগ্রহপূর্বক ক্রমিক প্রশ্নমালার সংখ্যানুযায়ী উত্তর দিবেন। প্রশ্নমালার বাহিরেও অতিরিক্ত মন্তব্য সাদরে গৃহীত হইবে। যে সব বিষয় সম্বন্ধে আপনার সঠিক ধারণা আছে এবং যাহা আপনার স্পষ্ট স্মরণ আছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিবেন। সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আন্দাজী কিছু লিখিবেন না। স্ত্রীর অকপট বিবরণী লইয়া স্বামীও লিখিতে পারেন। সেইরূপ বন্ধু বা বান্ধবীর উত্তরও লিখিয়া পাঠাইতে পারেন।

উত্তরসমূহ খুব গোপনীয় মনে করা হইবে। নাম, ঠিকানা কিংবা উত্তরদানকারীর পরিচয় পাওয়া যায় এরূপ কোন তথ্য প্রকাশ করা হইবে না।

উত্তরের প্রথমাংশ এমনভাবে লিখিবেন যেন প্রশ্নটি না পড়িয়াও উত্তরটি কোন্ বিষয়ে লেখা তাহা বুঝা যায়।

সাক্ষীর স্বরূপ

১। নাম—বিশেষ আপত্তি থাকিলে কাল্পনিক নাম লেখা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত নাম দেওয়া ভাল।

২। ঠিকানা।

৩। ধর্মমত।

৪। শিক্ষা।

৫। স্ত্রী না পুরুষ।

৬। আপনার ও আপনার স্ত্রীর/স্বামীর শারীরিক গঠন অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট, মাঝারি অথবা শীর্ণকায়।

৭। আপনার ও আপনার স্ত্রীর/স্বামীর স্বাস্থ্য (ভাল, মাঝারি কিংবা খারাপ)।

৮। আপনার ও আপনার স্ত্রীর/স্বামীর দীর্ঘস্থায়ী এবং সহজাত ব্যাধি-সমূহ—যদি কিছু থাকে।

৯। আর্থিক অবস্থা (ভাল, মাঝারি অথবা খারাপ)।

১০। জাতি।

১১। অবিবাহিত, বিবাহিত, মৃতদার অথবা বিধবা।

১২। পেশা বা উপজীবিকা—বর্তমান ও অতীত।

১৩। আমিষ না নিরামিষ-ভোজী।

১৪। গায়ের লোম—কম, মাঝারি, না বেশী।

১৫। বয়স।

যৌনজ্ঞান

১৬। শৈশবে ও কৈশোরে যৌনবিষয়ে আপনার ধারণা কিরূপ ছিল?

১৭। ঐ ঐ সময়ে ছেলেমেয়ে হওয়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল।

১৮। যৌনবিষয়ে আপনার কৌতূহল প্রথম কোন বয়সে ও কি ভাবে জাগে? কি ভাবে তাহা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? সে চেষ্টার পরিণতি কি হইল?

১৯। বাল্যকালে আপনার কি দেখিয়া, শুনিয়া, শিখিয়া বা পড়িয়া যৌন-বিষয়ে জ্ঞান হয়? কোথায়, কাহার কাছে বা কি কি বহি পড়িয়া উহা হয়?

২০। কি ভাবে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন বা সঙ্গীরা আপনার ঐরূপ কৌতূহল নিবৃত্তি করিতেন?

২১। স্বপ্নদোষ বা ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার সময়ে আপনার যৌনবিষয়ে জ্ঞানের পরিমাণ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

২২। এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে আশা করি। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন ও লিখুন—বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-আত্মীয়া এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে যৌনবিষয়ে প্রধান প্রধান ভুল ধারণা ও সাধারণ কুসংস্কার কি কি ছিল ও আছে?

২৩। ভূত, প্রেত, জিন ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া ও উহার প্রতিকারোপায়ের কথা শুনিয়া থাকিলে তাহা লিখুন।

২৪। বাল্যে ও কৈশোরে নিজের ও বিপরীতলিঙ্গের যৌন-অঙ্গসমূহের সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান কিরূপ ছিল?

২৫। এই পুস্তক পড়িবার পূর্বে অন্যান্য কি কি পুস্তক পড়িয়া যৌনজ্ঞান লাভ করিয়াছেন?

২৬। ঐ সকল পুস্তকে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত যৌন-আলোচনার পরিমাণ কতটুকু আছে বলিয়া আপনার এখন মনে হয়?

২৭। এই পুস্তক পাঠে যৌনজীবন সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন কি? করিয়া থাকিলে উহা সামান্য না প্রভূত? না করিয়া থাকিলে, পুস্তকের কি কি দোষত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার জন্য? বর্তমান সংস্করণকে কি করিয়া আপনাদের আরও উপযোগী, উপকারী এবং মনোমত করিয়া সংশোধিত বা পরিবর্ধিত করা যায়?

২৮। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আপনার যৌনজীবনে উপকার পাইয়াছেন কি? কি পরিমাণে? না পাইয়া থাকিলে কি কারণে?

২৯। এই পুস্তকে উল্লিখিত পুস্তকসমূহের কি কি পুস্তক পাঠ করিয়াছেন? এই পুস্তকের তুলনায় উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে ও নিকৃষ্টতা কিসে নির্দেশ করুন। কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবেন না।

যৌন-ইন্দ্রিয়সমূহ

৩০। ৫ম অধ্যায়ে যৌন-অঙ্গসমূহের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছেন। নিজের ও অপরের যৌন-অঙ্গসমূহের কি কি অস্বাভাবিকতা দেখিয়াছেন বা আছে বলিয়া শুনিয়াছেন ?

যৌনবোধ

৩১। কোন্ বয়সে প্রথমে আপনার যৌনবোধ জাগিয়াছিল? উহার ফলে আপনার যৌন-আচরণ কি দাঁড়াইয়াছিল ?

৩২। (ক) স্বপ্নদোষ বা ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার পূর্বে আপনার স্বাভাবিক যৌন বাসনা তীব্র না ক্ষীণ ছিল? (খ) তীব্রতা বা ক্ষীণতার কারণ কি ছিল বলিয়া মনে করেন? (গ) কি কি কারণে বিশেষ উত্তেজনা হইত? (ঘ) উত্তেজনার নিবৃত্তি কি ভাবে হইত? (ঙ) অনুত্তেজিত অবস্থায়ও কুচিন্তা মনে আসিত কি ?

৩৩। কোন্ বয়সে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রথম তীব্র বা ক্ষীণভাবে যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন? যাহাদের প্রতি উহার পরে আকৃষ্ট হন তাহাদের পরিচয় ও ঘটনার বিবরণ লিখুন।

৩৪। আপনার শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আপনার যৌন-অনুভূতি বিশেষভাবে বিরাজমান? আপনার যৌনপ্রদেশগুলি (৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অনুভূতির তীব্রতা অনুযায়ী তালিকাবদ্ধ করুন।

৩৫। অশ্লীল ছবি বা পশুপক্ষীর মিলনদৃশ্য দেখিলে আপনার ভাল লাগে না বিরক্তি বা ঘৃণার উদ্রেক হয়? অশ্লীল কথাবার্তা বা গান শুনিতে ?

৩৬। আপনার প্রতি অপরে যৌন-আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন বলিয়া জানিয়াছেন কি? করিয়া থাকিলে আপনার প্রতি সে বা তাহারা কিরূপ আচরণ করিয়াছেন ?

৩৭। বাল্যে বা কৈশোরে অপর ব্যক্তির সহিত 'ভালবাসা'র আদান-প্রদান হইয়াছে কি? হইয়া থাকিলে, কি ভাবে? উহা প্রণয় বা প্রেমের পর্যায় উঠিয়াছে কি? ঐরূপ সম্বন্ধের বিশদ বিবরণ দিন।

৩৮। স্বপ্নদোষ বা ঋতুস্রাব কোন্ বয়সে প্রথম আরম্ভ হয়? উহাতে আপনার মনে কিরূপ ভাব উপস্থিত হয় ?

৩৯। স্বপ্নদোষ বা ঋতুস্রাব আরম্ভ হইবার পর হইতে বিবাহের পূর্বে পর্যন্ত যৌনবোধের তীব্রতা কতটা অনুভব করিয়াছেন বা করিতেছেন ?

৪০। ধনী ও দরিদ্র এবং উহাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনবোধ ও আচরণজনিত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? করিয়া থাকিলে কি ভাবের ?

৪১। যৌন-অঙ্গসমূহের খুব অস্বাভাবিক আকৃতিভেদ কোনও স্থলে লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? কি প্রকারে ? সে স্থলে যৌনবোধের কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা হইয়াছিল কি ?

৪২। ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত নর ও নারীর রতি প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

৪২। ঋতুস্রাবের পূর্বে, মধ্যে বা পরে কিংবা দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী কোনও বিশেষ কালে আপনার স্ত্রীর বাসনার তারতম্য লক্ষ্য করেন কি ? করিলে কতটা বা কিরূপ লিখুন।

৪৪। পূর্ণিমা, অমাবস্যা বা চন্দ্রমাসের অন্য কোনও বিশেষ কালে ঐরূপ কোনও তারতম্য বোধ হয় কি ? কিরূপ ও কখন লিখুন।

৪৫। গর্ভের কোন্ কোন্ মাসে আপনার স্ত্রী/আপনি বাসনা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছেন ?

যৌন-আচরণ ও সংস্পর্শ

৪৬। বাল্যকালে যে সকল চুম্বন, চোষণ, চিমটি কাটা সুড়সুড়ি দেওয়া আলিঙ্গন, জড়াজড়ি, হুড়াহুড়ি ইত্যাদি বালসুলভ যৌনক্রীড়া করিয়াছেন তাহার বিবরণ দিন।

৪৭। বাল্যে বা কৈশোরে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আপনাকে অপরের কামপাত্র/পাত্রী হইতে হইয়াছে কি ? কি ভাবে ও কি কি কার্যকলাপে তাহার বিবরণ দিন।

৪৮। সর্বপ্রথম আপনি কি ভাবে স্বেচ্ছায় যৌনবাসনা তৃপ্তি করেন ? প্রক্রিয়াটি কি ভাবে শিখেন বা আবিষ্কার করেন ?

৪৯। (ক) স্বয়ংমৈথুনের কি কি প্রক্রিয়া আপনি অবলম্বন করিয়াছেন ? (খ) উহাদের প্রারম্ভ, পরিমাণ, পরিণতি ইত্যাদির কথা লিখুন। (গ) এখনও কোন কোনটির অভ্যাস আছে কি ? (ঘ) না থাকিলে কি করিয়া পরিত্যাগ করিলেন ?

৫০। হস্তমৈথুনের আরম্ভ, প্রকোপ, পরিমাণ, ফলাফল, প্রতিকারের উপায়, অভ্যাস পরিত্যাগের চেষ্টা ইত্যাদিরও **সবিস্তার ও সঠিক** বিবরণ দিন।

৫১। (ক) আপনার কখন স্বপ্নদোষ প্রথম আরম্ভ হয়? (খ) উহার পর হইতে কি পরিমাণে হইয়াছে বা হইতেছে? (গ) উহাতে পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধের স্বপ্ন দেখিতেন বা দেখেন? (ঘ) কারণ বা নিয়ম লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

৫২। স্বপ্নদোষকে রোগ মনে করিয়া ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন কি? হইয়া থাকিলে কোনও প্রতিকার বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? কাহার পরামর্শে, কি ব্যবস্থা ও ফলাফল?

৫৩। অপর ব্যক্তির সহিত সত্যকার যৌন-সংস্পর্শ কখন প্রথম আরম্ভ হয়? ঘটনার পাত্র/পাত্রী, প্রক্রিয়া ও উভয়ের মনে প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে বিবরণ দিন। আপনার না অপর ব্যক্তির সকর্মকতায় উহা ঘটে—না আপোসে?

৫৪। সমমৈথুন ঘটিয়া থাকিলে সকর্মক বা অকর্মক ভাবে, কতজনের সহিত, কি পরিমাণ ঘটিয়াছে? কোন্ কোন্ ভাবে পরস্পরের দেহ সম্ভোগ করা হইয়াছে? অপর নরনারীর জীবনের এইরূপ সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা লিখুন।

৫৫। কোনও **বস্তুবিশেষের** অথবা সমলিঙ্গ বা বিপরীতলিঙ্গ ব্যক্তির কোন অঙ্গ বা কোন ব্যবহৃত দ্রব্যের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ অনুভব করিয়াছেন কি? অপরকে করিতে দেখিয়াছেন? কি ভাবে ও কেন লিখুন।

৫৬। পশুমৈথুনের কোনও বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা থাকিলে উহার বিবরণ দিন।

৫৭। শিশু বা বালক-বালিকা মৈথুনের কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা থাকিলে উহার বর্ণনা দিন।

৫৮। ধর্ষণেচ্ছা বা ধর্ষিত হইবার প্রবৃত্তির কোনও বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা থাকিলে উহার বিবরণ দিন।

৫৯। প্রদর্শন বা দর্শন-বাতিকের কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা থাকিলে উহার বর্ণনা দিন।

৬০। নরনারীর নগ্ন হইয়া একত্রে খেলা, স্নান, কাজ প্রভৃতি করিবার বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা থাকিলে উহার বিবরণ দিন।

৬১। ১৫শ অধ্যায়ে 'যৌনবোধের বিকাশের ধারা' শীর্ষক কতকগুলি এদেশের ওদেশের বিবৃতি নেওয়া হইয়াছে। আপনার বন্ধু-বান্ধবীর ঐ বাস্তব ও সঠিক ইতিহাস লিখিয়া পাঠান।

৬২। নানাপ্রকার যৌন কদাচার হইতে বাঁচিবার উপায় ও উপদেশ যাহা ১৬শ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে তাহা পালন করিয়াছেন বা করিয়া দেখিবেন কি? ফলাফল জানাইবেন।

৬৩। প্রথম বিপরীতলিঙ্গ সংস্পর্শে ঘটনার বয়স, পরিবেশ ইত্যাদির বর্ণনা করুন। ইহার পরে আরও সংস্পর্শের পাত্র-পাত্রী, সুযোগ, ফলাফল সম্বন্ধে বিবরণ দিন।

৬৪। বিবাহেতর যৌন-মিলনের প্রসার আপনার পরিচিতদের মধ্যে কতটা? বাস্তব দৃষ্টান্তের বিবরণ দিন।

৬৫। ধর্মগত যৌন কদাচারের বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা থাকিলে উহার বিবরণ দিন।

৬৬। আপনি কখনও গণিকা-গমন করিয়াছেন কি? করিয়া থাকিলে ঘটনা, ফলাফল, রোগ-সংক্রমণের কথা লিখুন।

৬৭। পরিচিতদের ঐরূপ বিবরণ দিন।

৬৮। বালকবেশ্যার দৃষ্টান্ত জানা থাকিলে লিখুন।

৬৯। পতিতারা কি কি উপায়ে গর্ভ এড়াইবার চেষ্টা করে জানা থাকিলে লিখুন।

৭০। (ক) পরিচিতদের মধ্যে মদ্যপানের প্রসার কিরূপ? অত্যধিক মদ্যপানের বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা থাকিলে লিখুন।

যৌন-ব্যাধি ও রতিজ রোগ

৭১। আপনার/স্ত্রীর প্রমেহ (গনোরিয়া) সফ্‌ট শ্যাঙ্কার বা উপদংশ (সিফিলিস) হইয়া থাকিলে কিরূপে হইল ও উহার চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন বা করিতেছেন লিখুন।

৭২। রতিজ রোগ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়সমূহ অবলম্বন করিয়া থাকিলে কি উপায় এবং কি ফলাফল লিখুন।

৭৩। পরিচিতদের মধ্যে রতিজ রোগসমূহের প্রকোপ কতটা?

৭৪। (ক) ৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য যৌনরোগের মধ্যে কোন্‌গুলি আপনার/স্ত্রীর মধ্যে আছে। (খ) প্রতিকারের কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন?

৭৫। (ক) ঋতুস্রাব সম্বন্ধে কি কি অনিয়ম আপনি/স্ত্রীর লক্ষ্য করেন?

(খ) পরিচিতা নারীদের মধ্যে কি কি অনিয়ম বেশী দেখা যায়?

যৌননিষ্ঠা

৭৬। স্বপ্নদোষ বা ঋতুস্রাবের পর হইতে বিবাহ পর্যন্ত যৌননিষ্ঠা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? কিসের প্রভাবে তাহা করিয়াছেন—ধর্মের প্রভাবে? গুরুজনের উপদেশে? যৌনবোধের তীব্রতার অভাবে? সুযোগের অভাবে? শারীরিক ও মানসিক শক্তিবৃদ্ধির আশায়? অভিভাবকের কঠোর শাসনভীতিতে? গর্ভের ভয়ে? রোগ সংক্রমণের ভয়ে? ধর্মগ্রন্থ বা নীতিমূলক পুস্তকের প্রভাবে?

৭৭। এই সংযমাভ্যাসের দরুন আপনার মনে অশান্তি বা বিদ্রোহভাব দেখা দিয়াছে কি?

৭৮। সংযমাভ্যাসের ফলাফল কি দাঁড়াইয়াছিল?

৭৯। (ক) আপনি কি চিরকুমার/কুমারী? (খ) এইরূপ হইবার বা থাকিবার কারণ কি? (গ) কামাবেগ কখনও হয় না কি? (ঘ) হইলে কি করেন? (ঙ) পরিচিত-পরিচিতাদের মধ্যে চিরকুমার/কুমারী থাকিলে তাহাদের সম্বন্ধে জানিয়া লিখুন।

৮০। একটানা আত্মদমনে অপারগ হইয়া থাকিলে কখন কখন কি ভাবে অসমর্থ হইতেন?

৮১। নানা উপায়ে যৌন-উপভোগ করিয়া থাকিলে একটানা কতদিন পর্যন্ত উপভোগ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন?

৮২। আপনার পরিচিতা বিধবাদের ও অপর নারীদের মধ্যে পদস্খলনের বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা থাকিলে লিখুন।

বিবাহ

৮৩। বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

৮৪। বিবাহের উদ্ভট কোনও প্রণালীর কথা জানিলে লিখুন।

৮৫। বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি ও প্রথা থাকা বা না থাকা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

৮৬। আপনি কি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী না বিরোধী? কারণ সহ লিখুন।

৮৭। বিবাহের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কিছু বলিবার থাকিলে লিখুন।

৮৮। বিবাহ করিবার ইচ্ছা আপনার কখন জাগে ও কি ভাবে?

৮৯। উহার সম্বন্ধে আপনার মনোভাব, ধারণা, অভিরুচি ইত্যাদি কিরূপ ছিল?

৯০। আপনার মত লইবার বা অভিরুচি পূরণ করিবার কতদূর চেষ্টা করা হইয়াছিল?

৯১। পাত্র/পাত্রীকে পূর্বেই দেখিবার বা উহার সহিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল কি? কি ভাবে?

৯২। (ক) বিবাহ আপনাদের কোন্ বয়সে সংঘটিত হয়? (খ) বিবাহের প্রাক্কালে ও অব্যবহিত পরে উভয়ের মনোভাব কি হয়?

৯৩। উভয় পক্ষের খরচাদি কি হয়? এড়াইবার বা ব্যয়সঙ্কোচের কি চেষ্টা করা হইয়াছিল?

৯৪। ২৬শ অধ্যায়ে বর্ণিত বিবাহে বিবেচ্য ও কর্তব্য বিষয় সমূহের কি কি পালিত ও কি কি অবহেলিত হইয়াছিল?

৯৫। বংশ, রক্ত, কুল, ধর্ম, কোষ্ঠীবিচার, শুভাশুভ লগ্নবিচারের দিকে আপনার অত্যধিক ঝোঁক ছিল কি? এই পুস্তক পড়িবার পরে উহা কমিয়াছে কি?

৯৬। এই পুস্তকের জাতি-ধর্ম দেশ নির্বিশেষে বিরাট মানবসমাজে অবাধ বিবাহ-প্রচলন করিয়া জাতিবৈষম্য, ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণতা দূরীকরণের প্রস্তাব প্রসঙ্গে আপনার সুচিন্তিত অভিমত কি?*

---

* এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে সংযোজিত প্রশ্নমালার দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নমালার উত্তর

(১)

পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির ও উত্তরদানে পথনির্দেশ করিবার জন্য একজন সুশিক্ষিত সদ্বিবেচক অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বিবরণী এখানে উদ্ধৃত করা হইল। ইহার সত্যকথন সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই অবকাশ, নাই। ইহার গভীর জ্ঞান, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং অকপট বর্ণন এই পুস্তকে আলোচিত বহু বিষয়ে আলোকপাত করিবে।

সাক্ষীর স্বরূপ

(১) অমলচন্দ্র দত্ত। (২) এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ (৩) নামে হিন্দু, বাঁধা মত বা গোঁড়ামী নাই। (৪) ম্যাট্রিক পাস, আজীবন ছাত্র। (৫) পুরুষ। (৬) শরীরের গঠন হৃষ্টপুষ্ট। (৭) স্বাস্থ্য ভাল। (৮) স্ত্রীর হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়ানি আছে, নিজের চোখের নিকট-দৃষ্টি ও astigmatism আছে। (৯) আর্থিক অবস্থা মাঝারি। (১০) জাতি কায়স্থ। (১১) বিবাহিত। (১২) পেশা—বরাবর কেরানীগিরি। (১৩) আমিষ-ভোজী। (১০) গায়ে লোম-মাঝারি। (১৫) বয়স ৬০।

যৌনজ্ঞান

(১৬) শৈশব ও কৈশোরে যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে, স্কুলের সাথীদের কাছে শুনিয়া, অস্পষ্ট ধারণা ছিল। ঐ বিষয়ে কথাবার্তা গোপনীয় এই বোধ ছিল অথচ আনন্দদায়কও ছিল। স্ত্রী-পুরুষের সহবাস হয় জানা ছিল, কি ভাবে হয় জানিতাম না। বড় মেয়েদের শরীরের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে জানিবার স্বাভাবিক কৌতূহল ছিল।

(১৭) খুব ছোট বেলায় সন্তানের জন্ম কি ভাবে হয় জানা ছিল না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিনা মনে নাই। তিনি বলিতেন, আমরা তাঁহার পেটে ছিলাম ও পেট কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ তলপেটের দাগগুলি দেখাইতেন। বড় হইয়া স্কুলে অন্য ছেলেদের কাছে শুনিয়া ক্রমশ দৈহিক মিলন ও সন্তান-জন্ম সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান হইল।

(১৮) যৌন বিষয়ে কৌতূহল প্রথমে কি ভাবে জাগে মনে নাই।

(১৯) বাল্যকালের যৌনজ্ঞান প্রথমে সঙ্গীদের মুখে শুনিয়া, পরে পড়িয়া হয়। সে সময়ের এ বিষয়ে পড়ার বই :—কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রীর "কামশাস্ত্র" (আতঙ্কনিগ্রহ বটিকার বিজ্ঞাপন, সেইজন্য হস্তমৈথুনের কুফল খুব বাড়াইয়া বলা,) 'জীবন-রক্ষক' (বিজ্ঞাপন না হইলেও ঐ বিষয়ে ঐরূপ অত্যুক্তিপূর্ণ ভয় দেখান, অবশ্য সদুদ্দেশ্যে) ধীরেন্দ্রনাথ পালের নারীদেহ-তত্ত্ব "যুবতী, জননী ও প্রসূতির প্রতি উপদেশ" (১০৮৪ এ প্রকাশিত, এখনও আছে) ও নরনারীতত্ত্ব, 'চিকিৎসা সম্মিলন' ও চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান ও সমীরণ মাসিক পত্রদ্বয়, 'সচিত্র গুপ্তগৃহ' ও কবিরাজী বিজ্ঞাপনের বইগুলি। বলা বাহুল্য এগুলির বেশীর ভাগই অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারপূর্ণ।

পঞ্চম শ্রেণীর একজন বালক শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ক্লাসে হস্তমৈথুন করিয়া দেখাইয়াছিল।

(২০) পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন নিজ হইতে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে কিছুই করেন নাই। এই বিষয়টি খারাপ এই জ্ঞান থাকায় জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় নাই। এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আত্মরতির কুফল সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন ও সাবধান করিতেন। চোখের কোলে কালি কেন? ইত্যাদি বলিয়া অমূলক সন্দেহে মাঝে মাঝে ধমকাইতেন। আমার ছোটবেলা হইতে মোটা-সোটা গড়ন আর আমার দুই বছরের বড় ভাইয়ের রোগা গড়ন ছিল (এখন আমার চেয়েও মোটা)। কাজেই তিনিই ঐ সবজান্তা হিতৈষী বড়ভাই-এর কাছে বেশী বকুনি খাইতেন। আমার এক আত্মীয় তাঁর ১৪-১৫ বছর বয়সে আমার দ্বারা (তখন ৯-১০) হস্তমৈথুন করাইয়াছিলেন। তাঁহাকে ঐ সময় তাঁহার চেয়ে প্রায় দুই বছরের বড় নিদ্রিতা ভগিনীর গাত্র স্পর্শ করিতে দেখিয়াছি। সঙ্গীরা মুখে তাহাদের অস্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণাগুলি শিখাইত।

(২১) স্বপ্নদোষ আরম্ভ হইবার সময় যৌনজ্ঞানের পরিমাণ ও প্রকৃতি ১৬ ও ১৭ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে। নিদ্রাস্খলন (স্বপ্নদোষ অথবা নৈশস্খলন অপেক্ষা এই শব্দটি ঠিক মনে হয়, কারণ দিবাভাগেও বিনা স্বপ্নেও নিদ্রাবস্থায় স্খলন হয়) হইবার পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে ওরূপ হয়, আর শুক্রক্ষয় হয় বলিয়া উহা বলক্ষয়কারী।

(২২) যৌন-বিষয়ে জনসমাজে বিস্তর ভ্রান্ত ধারণা ছিল ও আছে যথা :—(ক) শুক্রস্খলন হইলেই বিশেষ শারীরিক ক্ষতি হয়।

(খ) মেয়েদের মূত্রপথ ও প্রসবপথ (ও রমণপথ) একই। এই ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় তুলসীদাসের একটি দোহায় যাহার অর্থ এই যে 'পুত' ও 'মুত' একই পথ হইতে আসে। যে সংকাজ করে সেই 'পুত' নতুবা 'মুত'।

(গ) সন্তান না জন্মিলে সেটা শুধু স্ত্রীরই দৈহিক ক্রটির জন্য।

(ঘ) **হস্তমৈথুনের** ফলে হাঁপানী, যক্ষা, ধ্বজভঙ্গ, উন্মত্ততা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি হয়।

(ঙ) **ব্রহ্মচর্যের** ফলে খুব ভাল স্বাস্থ্য, দীর্ঘ আয়ু, মেধা ও স্মৃতিশক্তি লাভ হয়।

(চ) নিজের স্ত্রীর সহিত সহবাস যত কম হয় বল, স্বাস্থ্য ও মানসিক ক্ষমতা রক্ষা ও উন্নতির জন্য ততই ভাল। "মাসে এক, বছরে বার এর মত কমাতে পার।" কলিকাতা মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের বসাক এণ্ড সন্স প্রকাশিত 'গার্হস্থ্য-কোষ' গ্রন্থের 'ইন্দ্রিয় পরিচালন, ঋতু ও গর্ভ, অধ্যায় দেখুন। বলা বাহুল্য ঐ সকল পুস্তকও অবৈজ্ঞানিক।

(ছ) স্ত্রীলোকের কাম পুরুষের অষ্টগুণ, তবে লজ্জা আবার ষোলগুণ, তাই সে পুরুষেব মত এ বিষয়ে অগ্রণী নয়।

(জ) যতই দীর্ঘকাল যাবৎ ও বার বার সঙ্গম করিবে, নারী ততই সুখী ও বশীভূত হইবে।

(ঝ) পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীলোকের শোণিতে সন্তানের জন্ম হয় (আয়ুর্বেদের মত)।

(ঞ) **বন্ধ্যাত্বের** কারণ শুক্রে কীটের সংখ্যার অল্পতা।

(ট) ঋতুর প্রথম দিন হইতে গণনা করিয়া যুগ্ম দিনের মিলনে পুত্র এ অযুগ্ম (বিজোড়) দিনের মিলনে কন্যা হয় (আয়ুর্বেদের সুশ্রুতের মত)।

(ঠ) 'দীর্ঘদন্ত কদাচ মুখ দীর্ঘদন্তী কদাচ অসতী।'

(ড) **অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নানা লক্ষণ,** তিল, জড়ুল প্রভৃতির দ্বারা ঐভাবে **সতী ও অসতী, কামুক কামুকী বা স্বল্পকামী নির্ণয়ের** নানা কাজে (অর্থাৎ বহুক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ ও তাহার ফল লেখা ও শতক অনুপাত বাহির করিয়া প্রকাশিত করার প্রমাণ বিহীন) উপদেশ যে কোন সামুদ্রিক শাস্ত্রের পুস্তকে পাওয়া যায়। যথা—উপরোক্ত (চ) সংখ্যক কথায় উল্লিখিত বসাক কোং প্রকাশিত 'গার্হস্থ্যকোষ'-এর সামুদ্রিক অধ্যায় পাঠে জনসাধারণের অনেকের মধ্যে ঐরূপ ধারণা বর্তমান।

(ঢ) দিনে বিপরীতভাবে, পাশ হইতে এবং ঋতুকালে সুরতে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

(ণ) উপদংশ (সিফিলিস) কখনও আরোগ্য হয় না।

(ত) কুমারী বা গর্দভীগমনে প্রমেহ (গনোরিয়া) রোগ সারে।

(থ) উপরোক্ত (চ) সংখ্যক কথায় উল্লিখিত কোম্পানীর প্রকাশিত 'যৌনপথে' পুস্তকে আরও অনেক জনসমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য ঐ পুস্তক বাজারে বহুপ্রচলিত হইলেও তথ্যের দিক দিয়া অবৈজ্ঞানিক।

(দ) গর্ভ হইবার পর গর্ভিণীকে ভাল ও বেশী খাইতে দিলে কন্যা এবং খারাপ ও কম দিলে পুত্র হয়। [মহেশ ভট্টাচার্য কোং প্রকাশিত (হোমিও) 'পারিবারিক চিকিৎসা'র 'গর্ভিণী রোগ' অধ্যায়ের গোড়ায় এই কথা লেখা আছে এবং পর পর সংস্করণে ইহার পুনরাবৃত্তি হইয়া চলিয়াছে যদিও ২০ বছরেরও আগে, ইঁদুরদের উপর পরীক্ষা দ্বারা এই মত ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। Experimental Zoology দেখুন।] এই মতের ঠিক বিপরীত মতও আছে ; তাহাও ভুল।

(ধ) শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষে মিলনে, স্ত্রীর মাথা ঐ সময়ে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে থাকিলে, ঋতুর প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে হইলে পুত্র বা কন্যা হয়।

(ন) ডান দিকের অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ হইতে আগত শুক্রকীট ও ডিম্ব হইতে পুত্র ও বাম দিক হইতে কন্যা জন্মে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনার পুস্তকগুলিতে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাগুলি খণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

ভূতগ্রস্তাদের (আসলে মদনপীড়িতাদের) কাহিনী

(২৩) (ক) ছোটবেলায় আমাদের পাড়ার এক বাঙালী বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার (১৭/১৮) ভূতে পাওয়ার কথা শুনিয়াছিলাম। সে অপর যুবকে আসক্ত ছিল। সে নাকি আবেশের সময় ইংরাজী ও হিন্দিও বলিত। একজন বাঙালী যুবককে নাকি ধাক্কা দিয়া প্রায় ফেলিয়া দিয়াছিল। প্রায় এক সপ্তাহকাল নিত্য সন্ধ্যায় আবেশ হইতে। আমি ছোট বলিয়া বড় ভাইরা আমাকে সেখানে যাইতে দেন নাই।

(খ) একজন বাঙালী যুবার মুখে তাহার জীবনের এইরূপ রোগিণীর ওঝাগিরির দুইটি কাহিনী শুনিয়া তাহারই কাছে বসিয়া যেমন লিখিয়া

লইয়াছি (ও তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছি) তাহা অবিকল নীচে নকল করিয়া দিলাম। তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়।

'তখন আমার বয়স ২৬। একজন উকিলের ছেলে আমার বন্ধু ছিল। তার মুখে শুনলাম যে তার বোনকে ভূতে ধরেছে। আমি ভূত তাড়াতে পারি, এই কথা তাহাকে বলায়, সে বাড়ীতে বলে। তখন মেয়েটির পিসী আমায় ডাকালেন। মেয়েটির বয়স ১৭; সুশ্রী। তার স্বামীর বয়স ৪২, তিনি বিদেশে চাকুরী করেন। তখনও সে স্বামীর ঘর করে নি। সে শাড়ী খুলে ফেলত ও ব্লাউজ ছিঁড়ত। আমি গিয়ে দরুদ পড়ে তার গায়ে ফুঁ দিতে লাগলাম। পড়ে সরষের তেল, ঐভাবে পড়ে তার নাকে ও কানে দিলাম ও জল পড়ে তাকে খাওয়াতে বললাম। এইভাবে তিনদিন ঝাড়া হল। পরে বললাম যে, এভাবে না। একটি ঘর ভাল করে নিকিয়ে তাতে একটি মাদুর রাখতে হবে। সেখানে ধূপ ধূনা ও লোবান জ্বালিয়ে ওকে ঝাড়তে হবে। সেখানে যেন কেউ না থাকে। কেউ উঁকি দিলে মন্ত্র খাটবে না। সেই ঘরে ৫-১০ মিনিট জোরে জোরে দোয়া পড়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি বল, সত্য সত্য তোমার কি হয়েছে?" সে বললে, "দাদা! আপনার কাছে মিথ্যা কি বলব, আমার কিছুই হয় নি।" তখন তার শরীরে হাত পড়লে বলল, "খুব ভাল লাগছে।" এর পরে তার সঙ্গে আমার সংসর্গ হল। পরে প্রায় ২০ মিনিট জোরে জোরে মন্ত্র পড়ি। আবার সংসর্গ হয়। এইভাবে প্রত্যহ ২-৩ বার সংসর্গ হল। পরে তাকে (সেই ঘরে) বললাম, "আর পাগলামি কোরো না। জিজ্ঞাসা করলে বোলো, বেশ ভাল আছি।" পাড়ার ছেলেদের আমার উপর সন্দেহ হওয়াতে তাদের বাড়ী যাওয়া ছাড়লাম। এক বছর পরে তার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে দেখা করলাম। দেখলাম তার চেহারা (শাশুড়ীর অত্যাচারে) খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। সে বললে, "কতদিন আর সহ্য করব? আপনি আমায় নিজের বাড়ী নিয়ে চলুন।" "ভগবানকে ডাক" ইত্যাদি সান্ত্বনা দিয়ে চলে এলাম...

বীরভূম জেলায়...গ্রামে আমি ২৮ বছর বয়সে ফুফার বাড়ী গিয়েছিলাম। পাড়ায় একটি মেয়ে, কালো, কিন্তু মুখশ্রী খুব ভাল, বয়স ১৬-১৭, তার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। তার বয়স ৩০-৩২। তার বাপের মুখে শুনলাম যে, একদিন রাত্রে সে বাহ্য করতে মাঠে গিয়েছিল, সঙ্গে

তার মা ও শাশুড়ি ছিলেন। বসে থাকতে থাকতে সে 'ঐ' মা তালগাছের উপর পাগড়ী-বাঁধা ভূত' বলে পড়ে যায়। অন্যেরা দৌড়ে গিয়ে খবর দেওয়াতে তার স্বামী এসে তুলে নিয়ে যায়। ২-৪ জন ওঝা ঝাড়ফুঁক করায় কোন ফল হয় নি। আমি গিয়ে ঝাড়ফুঁক করলাম। সে কখনও আমায় লাল চোখ দেখায়, কখনও মারবার জন্য হাত তোলে। তিনদিন ঐ ভাবে ঝেড়ে বললাম, "তিন দিন রোজ একটা মুরগী জবাই করে তার রক্ত একটা বাটিতে নিয়ে, মন্ত্রপূত করে, আলাদা একা ঘরে তার মাথায় ঢালতে হবে। সে ঘরের আশেপাশেও কেউ থাকলে মন্ত্র খাটবে না। এ ভূত নয় খবিশজিন!" পরদিন মোরগ নিজে জবাই করে, তার রক্ত নিয়ে পরিষ্কার ঘরে, তার মাথায় দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি হয়েছে ঠিক করে বল, নতুবা এই লঙ্কা পুড়িয়ে তোমার নাকে তার ধোঁয়া দেব।" সে আমার গলা ধরে বললে, "ভাইজী। আমার কিছুই হয় নি।" "তবে এমন করছ কেন?" সে চুপ করে রইলো। তার মনের গতিক বুঝে তার সঙ্গে সংসর্গ করলাম। তিন দিন এইরূপ হল। শেষ দিন জিজ্ঞাসা করলাম, "শুনেছি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর বনে না, ঝগড়া হয় কেন?" "তার অঙ্গ খুব ছোট; ধারণশক্তি ক্ষীণ তাই বনে না।" পরদিন তার মা মাসীকে বললাম যে, ওকে তাবিজ দেব, তিন দিন তাকে সেই আলাদা ঘরে বসিয়ে ধূপ-ধুনা ও লোবানের ধোঁয়ার উপর তাবিজ ১৭ বার ঘোরাতে হবে। মেয়েকে একটু ভাল দেখে তারা রাজী হল। তিন দিন আবার ঐভাবেই সংসর্গ হল। তারপর তাকে বললাম, "আর পাগলামি কোরো না। সুযোগ পেলে অন্য লোকের সঙ্গে কোরো। রোজ রোজ আমি ঝাড়লে লোকে সন্দেহ করতে পারে।" সে রাজী হল। তার মা মেয়েকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে দেখে মানতের ৩।/০ শিরনির জন্য আমায় দেন। ঐ টাকার বাতাসা কিনে, পীর সাহেবের নামে ফাতেহা পড়ে ছেলেদের বিতরণ করা হল। (এখানে মনে রাখা দরকার যে, স্বামীর সঙ্গলাভের অভাব বা স্বামী কাছে থাকা সত্ত্বেও দাম্পত্য অপ্রীতির দরুন কামপীড়িতা নারীদের এইরূপ ভান করিবার দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায়। তাহা ছাড়া সত্য সত্যই অহেতুক ভয় পাওয়ার দরুন বা ভূত জিন আছে এবং অপরকে পাইয়া বসে, আমাকেও পাইয়াছে এইরূপ ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেলে আত্মসম্মোহনজনিত বিকৃতি হওয়া অসম্ভব নয়। এইরূপ হইলে পীর সাধুদের দোয়া, তাবিজ বা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করিলে

সারিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়। ভূত, প্রেত, জিন যে শুধু কাল্পনিক তাহা আমি প্রথম অধ্যায়েই বলিয়াছি।—লেখক)

(২৪) বলা বাহুল্য, যৌনবিজ্ঞানের আধুনিক বই পড়িবার পূর্বে চোখে যেটুকু দেখা যায় তার অধিক নিজের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না। মেয়েদের গোপনাঙ্গ দেখিবার খুব কৌতূহল ছিল। কিন্তু ধাত্রীবিদ্যার ইংরেজী বড় বইতে ছবি দেখার আগে তাহার দৃশ্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান ছিল না। কেহ ভগাঙ্কুর, আলাদা মূত্রপথ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু বলে নাই।' বই পড়িয়া জানিতে পারি।

(২৫) এই পুস্তক পড়িবার পূর্বেও অন্তত পঞ্চাশখানি প্রামাণিক বই পড়িয়াছি। বাংলা বইয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের নিম্নলিখিত বইগুলি পড়িয়াছিলাম:—নরনারীর যৌনবোধ, কাম ও প্রেম-বিজ্ঞান, একান্ত গোপনীয়, যৌবনের যাদুপুরী, জন্মশাসন, যৌনবিশ্বকোষ (তিনখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে)। এইগুলি ছাড়া বোম্বাইয়ের ডাক্তার পিলের সম্পাদিত উচুদরের ত্রৈমাসিক পত্রিকা Marriage Hygiene ৭-৮খানি।

(২৬) ঐ সকল পুস্তকে প্রকৃতি বিজ্ঞানসম্মত যৌন-আলোচনা অনেক পরিমাণে করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

(২৭) এই পুস্তক পাঠে যৌন-জীবন সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানলাভ করিয়াছি। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য উভয় প্রথায় বিবাহের পাত্রপাত্রী-নির্বাচনের দোষ-গুণ, সুবিধা ও অসুবিধা আর দম্পতির ভাব-ভালবাসা বজায় রাখা এবং ঝগড়া বিবাদ অশান্তি না হওয়ার জন্য নানা পরামর্শ ও উপদেশ যেমন এই পুস্তকে আছে তেমন অপর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

তবে এই পুস্তকের প্রমাণপঞ্জীতে এবং আমার তালিকায়* উল্লিখিত বই গুলির মধ্যে যতগুলি যথাসাধ্য যোগাড় হয় তাহাদের সমস্ত দরকারী ও চিত্তাকর্ষক তথ্য, যুক্তি, উপদেশ, সংখ্যা, দৃষ্টান্ত, মতামত, কাহিনী প্রভৃতি যত্নপূর্বক চয়ন করিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত করিলে; যতদূর সম্ভব খারাপ শোনায় এমন শব্দগুলি (যথা—কাম, লিঙ্গ, যোনি, মৈথুন, রতিক্রিয়া, বেশ্যা প্রভৃতি) বর্জন করিলে (অর্থাৎ কোথাও ইহাদের পরিবর্তে জনসমাজে কম

*পত্রলেখক তাঁহার পঠিত পুস্তকগুলির তালিকা দিয়াছেন। ইহার অধিকাংশই প্রমাণ পঞ্জীতে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বাহুল্যবোধে এখানে দেওয়া হইল না।

প্রচলিত, সুতরাং কম শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহার, কোথাও সর্বনাম ব্যবহার, কোথাও ইশারা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলে, কোথাও বা যেখানে বাদ দিয়ে অর্থবোধে অসুবিধা না হয় সেখানে একদম বাদ দিলে) এবং প্রচলিত, সহজ ও খাটি বাংলা শব্দ থাকা সত্ত্বেও, যাহারা ইংরেজীতে বা সংস্কৃতে বিশেষ অভিজ্ঞ নয় তাহাদের অবোধ্য বাংলায় অপ্রচলিত, বা অসাবধান ও অবিবেচক লেখকদেরই ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দ, শব্দাবলী বা বাক্যরীতির হুবহু অনুবাদ এবং দুরূহ সংস্কৃত শব্দ পরিত্যাগ করিলে এই পুস্তক হইতে আরও জ্ঞান ও আনন্দ লাভ হইবে এবং ইহা একদিকে মার্জিতরুচিসম্পন্ন পাঠকদের (বিশেষত মহিলাদের) অপর দিকে ইংরেজী ও সংস্কৃতে কম শিক্ষিতদের এবং উচ্চ শিক্ষিতদেরও—ফলত সকল শ্রেণীর কাছেই আদরণীয় হইবে।

[গ্রন্থকার এই সকল উপদেশের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ; উপদেশগুলি যতদূর সম্ভব পালন করাও হইবে। তবে গ্রন্থকারের নিবেদন এই :—

(১) বাস্তবিক পক্ষে এই পুস্তকখানি প্রতি সংস্করণই যে আরও তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করা হইতেছে তাহা পাঠক-পাঠিকাবা লক্ষ্য করিলেই বুঝিবেন। এমন কি তিন মাসের পরেই যে সংস্করণ বাহির হইতেছে তাহাও সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ; পূর্বকার পুনর্মুদ্রণ মাত্র নয়।

(২) মার্জিত রুচির কথা অবশ্যই বিবেচ্য ; তবে ইহা ধর্মপুস্তক নহে 'যৌনবিজ্ঞান'-এরই পুস্তক এবং পাঠক-পাঠিকা সঠিক নির্দেশ এবং নির্ভুল উপদেশ প্রত্যাশা করেন। সেই হেতু কতকটা অকপটতা ও স্পষ্টবাদিতাও প্রয়োজন—এ কথা আমি ২ ও ৩ অধ্যায়েই নিবেদন করিয়াছি।

সুখের বিষয় এ পর্যন্ত এই শ্রেণীর বহির মধ্যে এই গ্রন্থের আলোচনা সুরুচিসম্মত এ অভিমত সারা বাংলা হইতেই পাইয়া আসিতেছি।

(৩) ভাষা সম্বন্ধে ইহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ ইচ্ছুক। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তাহার প্রয়াস পাইব। গ্রন্থকার।]

(২৮) হাঁ, এই পুস্তকপাঠে যৌন জীবনে অনেক উপকার পাইয়াছি।

(২৯) এই পুস্তকে উল্লিখিত যে যে পুস্তক পাঠ করিয়াছি অতগুলি পুস্তক একত্রে ধরিয়া তাহাদের সমষ্টির সহিত এই বইয়ের তুলনা সম্ভব নয়।

এই সংস্করণের প্রমাণপঞ্জীর বইগুলি তাহাদের নামের আদ্য অক্ষর অনুযায়ী সাজানো এবং শব্দ ও বিষয় নির্ঘণ্ট আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত। (আদ্য অক্ষর ক্রমে বহি সাজানোর বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। সাধারণত

পাঠক-পাঠিকা নির্ঘণ্ট লইয়া বড় বেশী ঘাঁটাঘাঁটিও করেন না; তবে দরকার পড়িলে বিষয়-বিশেষ খুঁজিয়া বাহির করিতে সুবিধা নিশ্চয়ই হয়।

—গ্রন্থকার

যৌন-ইন্দ্রিয়সমূহ

(৩০) অস্বাভাবিকতা—একটি হাসপাতালে একটি বছর খানেকের মেয়েকে নিশ্ছিদ্র সতীচ্ছদের জন্য আনিয়াছিল দেখিয়াছি। ইরাকে অধিকাংশ পুরুষের, এদেশের পুরুষ অপেক্ষা পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হয় এরূপ একাধিক সাক্ষ্য পাইয়াছি, যদিও তাহারা (পাঠানদের মত) আমাদের অপেক্ষা দীর্ঘাকার নয়। এদেশের চেয়ে সেখানকার মেয়েদের অল্প বয়সে স্তনোদগম হয়। এমন কি তিনটি বছর পাঁচেকের মেয়ের স্তন উঠিতে দেখিয়াছি, পোশাকের উপরেই।

যৌনবোধ

(৩১) যৌনবোধ জাগে বছর ১৪ বয়সে। তখন প্রথম সংসর্গ হয় এই ভাবে: আমার যখন ১৪ বছর বয়স তখন একটি গৌরী ১০-১১ বছরের অনাত্মীয়া বলিকা তার গৌরাঙ্গিণী যুবতী মাতা (২৭-২৮) ও গৌরবর্ণ অবিবাহিত যুবক খুড়ার (৩০-৩২) সহিত আমাদের বাড়ী থাকিত। ক্লাসের এক ছেলে বলিয়াছিল যে, যখন ঐ বলিকারা তাদের প্রতিবেশী ছিল, তখন তাহার সহিত সে সংসর্গ করিয়াছে। একদিন গ্রীষ্মকালের দুপুরে, যখন সকলে নীচের তলায় (ঠাণ্ডা বলিয়া) ঘুমাইতেছিল তখন তাহাকে দোতলায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহার সহিত আলাপ করি। সে সসঙ্কোচে আলাপ করে। পরে উত্তেজিত হইয়া বন্ধুর প্রদত্ত শিক্ষা মতে সংসর্গ করি। ঐ ভাবে পর পর কয়েকদিন হয়। কিছুদিন পরে আমার জ্বর হয়। ধারণা হইল যে ঐ পাপ (?) এর জন্য ভগবান শাস্তি দিলেন।

শুনিয়াছিলাম তাহার মাতার সহিত তাহার খুড়ার অবৈধ সম্পর্ক আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে, রাত্রে তাহাকে নিদ্রিত ভাবিয়া তাহার মাকে সে খুড়ার কাছে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছে।

(৩২) (ক) স্বপ্নদোষ আরম্ভ হইবার পূর্বে বাসনা মাঝারি রকম ছিল। (খ) কারণের কথা মনে নাই। (গ) আরও কম বয়সে একজন অধিক বয়সী সঙ্গীর সাহচর্যে নারীবক্ষ সম্বন্ধে মন আকৃষ্ট হয়। সঙ্গীটি স্ত্রীলোক-

দেখিলেই তাহার বক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিত। নারীবক্ষ দেখিলে সামান্য উত্তেজনা হইত। (ঘ) উত্তেজনার নিবৃত্তি হইত না। (ঙ) অনুত্তেজিত অবস্থাতেও কখনও কখনও কুচিন্তা আসিত।

(৩৩) (ক) লালসার বশবর্তী হইয়া (ভালবাসিয়া নয়) বছর ১৪ বয়সে, একটি মেয়ের প্রতি ক্ষীণভাবে আকর্ষণ বোধ করি। ৩১নং উত্তর দেখুন।

(খ) পরে ঐ বয়সে একজন সুন্দর সহপাঠীর প্রতি আকৃষ্ট হই ও তাহাকে প্রেম নিবেদন করিয়া ইংরেজীতে এক কবিতা লিখি সে আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা না বলিলে দুঃখ এবং অপরের সহিত হাসি-গল্প করিলে হিংসা হইত। তার তরফ হইতে আমার প্রতি কোন বিশেষ ভাব ছিল না। একতরফা প্রণয়। 'কামগন্ধহীন' এই অর্থে যে, তাহার দেহ উপভোগের বাসনা ছিল না।

(গ) প্রায় ১৬ বছর বয়সে আর একজন সমবয়সী সুন্দর বালকের প্রতি আকৃষ্ট হই। এখানেও আকর্ষণ একতরফা, তাহার একপাটি চটি বুকের উপর লইয়া একদিন শুইয়াছিলাম।

(ঘ) বছর ২৩-২৪এর সময়ে, আমার বছর ১৫ বয়সের সুন্দরী বৌদিদির প্রতি আকৃষ্ট হই। একদিন তাঁহাকে পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করি। কোন আপত্তি না দেখিয়া সাহস বাড়ে। ৩-৪ দিন সংসর্গ হইয়াছিল। মার কাছে তিনি মেঝেতে শোওয়ায় সে ঘরে শুইয়া গড়াইয়া যাই।

(ঙ) বছর ২২-২৩এর সময় এক নিম্নজাতীয়া তরুণী (১৭) সম্বন্ধে নিন্দা শুনি। তার সঙ্গে আলাপ ছিল না। ২-৪ দিন পরে একদিন বৈকালে তার সঙ্গে পথে দেখা। শুধু বলিলাম 'চলো'। সে রাজী হইল। সংক্ষিপ্ততম কোর্টশিপ। একটি বাড়ী তৈয়ার হইতেছিল, তাহার ছাদে সংসর্গ হইল।

(চ) বছর ২৪-২৫এর সময় কাশীতে একজনের বাড়ীতে অতিথি হই। সেখানকার সুশ্রী তরুণী (১৭-১৮) চাকরাণীর প্রতি আকৃষ্ট হই। নির্জনে গাত্রস্পর্শ করায় আপত্তি হয় না। মন্দির পরিক্রমা করার সময় আরও আলাপ হয়। একদিন দুপুরের প্রস্তাবে সে বলে আট আনা লইবে। রাজী হইয়া পয়সা আনি। সে একটি নির্জন ঘরে লইয়া যায়। এখানেই পয়সা গুনিয়া লইল।

(ছ) নিজের বাড়ীতে একটি বিধবা আধাবয়সী চাকরাণী ২-৪ কথাতেই রাজী হয়। পয়সা দিতে হয় নাই।

(জ) ৫১-৫২ বয়সে একজন প্রায় ৪০ বছরের বিধবার সহিত আলাপ ও সংসর্গ হয়। উহার ঋতু বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া গর্ভের আশঙ্কা ছিল না।

(ঝ) ৩০-৩২ বয়সে স্ত্রী হইতে দূরে থাকার সময় এক সুন্দর তরুণের প্রতি একতরফা আকর্ষণ জন্মে।

(৩৪) একমাত্র যৌন-অনুভূতির স্থান পুরুষাঙ্গ-মুণ্ডের অগ্রভাগ।

(৩৫) হাঁ, অশ্লীল ছবি বা পশুপক্ষীর মিলনদৃশ্য দেখিতে এবং অশ্লীল কথাবার্তা বা গান শুনিতে ভাল লাগে।

(৩৬) আমার প্রতি কেহ যৌন-আকর্ষণ বোধ করিয়াছে বলিয়া জানি না।

(৩৭) বাল্যে বা কৈশোরে ভালবাসার 'প্রদান' হইয়াছে, 'আদান' আর হয় নাই। ৩৩নং প্রশ্নের উত্তর (খ) ও (গ) সংখ্যক ঘটনা দেখুন।

(৩৮) স্বপ্নদোষ আরম্ভ হয় ১৪-১৫ বৎসর বয়সে। ইহার কথা আগে শুনিয়াছিলাম। শারীরিক ক্ষতি হইতেছে ভাবিয়া দুঃখ হইত।

(৩৯) স্বপ্নদোষ আরম্ভ হইবার পর ও বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বাসনার তীব্রতা বেশ অনুভব করিতাম।

(৪০) ধনী ও দরিদ্র এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনবোধ ও আচরণজনিত পার্থক্য লক্ষ্য করি নাই।

(৪১) ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন। একজন বাঙালীর অঙ্গ সাধারণ লোকের অপেক্ষা দীর্ঘ ও স্থূল দেখিয়াছি। তাহার শরীরও সাধারণের অপেক্ষা লম্বা ও স্থূল। তাহার মুখে তাহার ব্যভিচারের অনেক কাহিনী শুনিয়াছি। কামপাত্রীর বয়স বা রূপ না থাকিলেও তাহার চলে। পক্ষান্তরে একজন বেঁটে বেশ ছোট অঙ্গবিশিষ্ট লোকের কাছে তাহার বাল্যকাল হইতেই কামপ্রবণতার অনেক কাহিনী শুনিয়াছি।

(৪২) ভারতীয় পণ্ডিতদের নরনারীর চারি শ্রেণী কাল্পনিক। ঐ বিষয়ে আপনার মন্তব্য ঠিক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শ্রেণীবিভাগেও কোনই কৃতিত্ব নাই। কতক নরনারী বেশী, কতক কম কামুক, এ কথা সবাই জানে। একটা নাম দিলেই বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ হয় না। 'শিরাপ্রধান পুরুষ'-এর মানে বোঝা যায় না। যাহাদের বাসনা কম তাহারা অপর সব বিষয়ে ভাল লোক,

যাহাদের বেশী তাহারা বেশী ভোগী ও সব রকমে মন্দ লোক এই ভুল প্রায় সব দেশেই সেকালের পণ্ডিতেরা করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, যৌন-আবেগ বড় মন্দ জিনিস, নোংরা, জঘন্য, অশ্লীল, পাপের মূল ও নরকের দ্বার।

(৪৩) ঋতুস্রাবের মধ্যে ও পরে স্ত্রীর মাঝারি রকম বাসনার উদয় লক্ষ্য করিয়াছি।

(৪৪) তিথি অনুযায়ী তাঁহার বাসনার তারতম্য লক্ষ্য করি নাই।

(৪৫) গর্ভের কোন্ মাসে বাসনার হ্রাস বৃদ্ধি হয় লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া (বা মনে) রাখি নাই। শেষের দিকে কম হয়।

যৌন-আচরণ ও সংস্পর্শ

(৪৬) বছর পাঁচেকের সময় একটি প্রায় সমবয়সী মেয়ে নির্জন ঘরে আমায় তাহার উপর (কাপড় পরিয়াই) শুইতে বলে। পরে অন্য মেয়েদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছি।

(৪৭) বছর ১০-১১র একটি মেয়ে আমার (তখন ১৮) গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জড়াইয়া ধরে। বছর ১০-১১র সময় একটি কিছু বড় মেয়ে খেলার সাথী ছিল। তাহার সঙ্গ ও আদর ভাল লাগিত। বলা বাহুল্য, ঐ সব ভালই লাগিত। ১৫ বৎসর বয়সে আমি ও একজন সমবয়সী সহপাঠী পরস্পরের দেহ ভোগ করি।

(৪৮) ৩১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত ঘটনাটি দেখুন।

(৪৯) ও (৫০) (ক) আত্মরতির প্রক্রিয়া সাধারণত পুরুষদের যেমন হয় তাই। (খ) আরম্ভ সম্ভবত ১১-১২ বয়সে পায়খানায়। শুক্রস্খলন হয় নাই। প্রকোপ বা পরিমাণ—মাঝে মাঝে—সপ্তাহে ২-১ বার। পরিণতি বা ফলাফল উল্লেখযোগ্য কিছুই না। (গ) এখন ঐ অভ্যাস নাই। (ঘ) পূর্বে উল্লিখিত 'কামশাস্ত্র', 'জীবন-রক্ষক', 'সচিত্র গুপ্তগৃহ' প্রভৃতি পড়িয়াও বন্ধুদের কাছে শুনিয়া উহা যে শরীরের অনিষ্টকারক এই জ্ঞান জন্মিয়াছিল। অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ'-এর কাম অধ্যায়ে উহা দমনের কার্যকরী উপায়গুলি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। ঐ সব অবলম্বনে, প্রবল সঙ্কল্প সহায়ে নিজেকে নিরস্ত করা, কুচিন্তা মনে আসিবামাত্র নিজের গালে চড় মারা প্রভৃতি এবং এইরূপে বছর ১৫ বয়সেই ঐ অভ্যাস ছাড়িয়া যায়।

(৫১) (ক) স্বপ্নদোষ প্রথমে আরম্ভ হয় ১৪-১৫ বৎসর বয়সে। (খ) মাঝে মাঝে হইত; এখনও (সন্তান-সন্ততিপূর্ণ বাড়ীতে গৃহকর্মে আকণ্ঠ মজ্জিতা স্ত্রীর সহিত একত্রে শয়নে সুযোগ বেশীদিন না পাইলে) কখনও কখনও হয়। (গ) পরিচিত অপরিচিত উভয়প্রকার ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। বিনা স্বপ্নেও অনেকবার স্খলন হইয়াছে। (ঘ) কোন কারণ বা নিয়ম ভাবিয়া পাই না। মাছ মাংস, ডিম প্রভৃতি খাওয়ার ফলে, নানা কারণে কামোত্তেজনা হওয়া সত্ত্বেও হয় নাই, আবার কোন উত্তেজক কারণ বিনাও হইয়াছে।

(৫২) ইহাকে রোগ ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছি। রাত্রে শুইবার আগে প্রস্রাব করিয়াছি ও অণ্ডকোষের উপর কিছুক্ষণ জলের ধারা দিয়াছি। কলিকাতায় কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের স্বপ্নদোষের ঔষধের সঙ্গে যে ছাপা ব্যবস্থাপত্র থাকে তাহাতে এই উপায়ের সন্ধান পাই। ফলাফল ঠিক বলিতে পারি না, কারণ কখনও বেশী হয় নাই। বড়দের নিকট হইতে কোন উপদেশ পাই নাই।

(৫৩) যৌন-সংস্পর্শ সম্বন্ধে ৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

(৫৪) সমমৈথুন সম্বন্ধে ৪৭নং উত্তর দেখুন।

(৫৫) আমার নারীর স্তনের প্রতি ও এক বন্ধুর তাহাদের চুলের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণ আছে। উভয়ক্ষেত্রে চেহারা ভাল অথবা কম বয়স না হইলেও আসক্তি কম হয় না।

(৫৬) একজন লোক ভেড়ীর সহিত সংসর্গ করিয়া ধরা পড়িয়াছিল জানি। কুকুরদের উত্তেজনার (ঋতু নয় এমন) সময়ে পরীক্ষাচ্ছলে বছর ৫০ বয়সে এক কুক্কুরীর অঙ্গের উপর সুড়সুড়ি দেওয়ায় সে বেশ উত্তেজিত হইয়া পড়ে। সুযোগ থাকিলে পরীক্ষাচ্ছলে সংসর্গ করিতাম।

(৫৭) ৪-৫ বৎসরের একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, প্রথমে এক ১৫-১৬ বছরের চাকর, পরে এক দরজী (যে বাড়ীতে কাজ করিতে আসিত), পুরুষের অঙ্গ দেখিতে ও নাড়িতে উহাকে শিক্ষা দেয়। এখন তাহার বয়স প্রায় ১০। কখনও তাহার কৌতূহল আছে। সে অন্য সব বিষয়ে স্বাভাবিক, বুদ্ধিমতী, কাজের মেয়ে। অপরের অপেক্ষা বেশী কামুকী বলিয়া মনে হয় না। স্বাভাবিক কৌতূহল প্রবল ও বাল্যের কুশিক্ষার জন্য এইরূপ হইয়াছে বোধ হয়। কৌতূহলবশত ও নীতিজ্ঞান (শাসন ও সংস্কারের অভাবে) না থাকতে অনেক ছোট মেয়েই এরূপ যৌন-ক্রীড়ায় সহজেই রাজী হয়। আর একটি (১০-১১) বছরের মেয়ে আমার (৩০-৩২) স্নানের সময় উঁকি দিত।

(৫৮) ধর্ষণেচ্ছা বা ধর্ষিত হইবার ইচ্ছার কোন দৃষ্টান্ত জানি না। তবে ধর্ষণেচ্ছায় ৪-৫টি বিভিন্ন ধাপ বা মাত্রা আছে। (Dr Talmey-র 'Love'-এর ২৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

এক বন্ধু পর পর তিন বিবাহ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কাজের সময় তিনি উন্মত্তভাবে দাপাদাপি করেন ও স্ত্রীকে খুব চাপ প্রভৃতি দেন। স্ত্রীরা যে সেটা অপছন্দ করিতেন এমন শুনি নাই। (তাঁর শেষ দুই স্ত্রী আমাকে সব কথা অসঙ্কোচে বলিতেন ও বলেন।) তৃতীয়া ঐ সব পছন্দ করেন শুনিয়াছি।

(৫৯) কলিকাতার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি (M A) যৌন-বিষয় সম্বন্ধে লেখককে নিজ কাহিনী (প্রায় ৩০ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ কাগজে) লিখিয়া পাঠান তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে গণিকালয়ে লইয়া যায় এবং শিক্ষা ও দীক্ষাদান মানসে তাঁহার সামনেই সংসর্গ করে। সম্ভবত এই ঘটনা হইতে তাঁহার দর্শন-বাতিকের সৃষ্টি হয়। তিনি সেই মেয়েটির অনুমতি লইয়া পাশের ঘরে বসিয়া থাকিতেন ও দ্বারের ছিদ্রপথে অপরদের লীলা দেখিয়া নিজের সুরত অপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিতেন। পরে নিজের স্ত্রীকে মদ্যপান অভ্যাস করান (বেশী জেদ করার দরকার হয় নাই) এবং বিদেশ হইতে চিঠিতে স্ত্রীকে অপর একজন (উভয়ের পরিচিত) পুরুষের সহিত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেন ও পীড়াপীড়ি করেন। ইনি অনুমান করেন যে সম্ভবত স্ত্রীরও কতকটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্ত্রী লেখেন যে, 'তুমি যখন এত জেদ করছ তখন অগত্যা তাই করব'। পরে যখন দম্পতি একত্র হইলেন তখন স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া পাশের ঘর হইতে স্ত্রীর ও সেই লোকটির নানাভাবের উপভোগের দৃশ্য বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। ইনি এমনভাবে বাড়ী তৈয়ারী করেন যে, মেয়েদের স্নানের সময় তাহাদের দেখা যায়, এবং প্রত্যেক ঘরে রাত্রে মৃদু বিজলী বাতি জ্বলে ও বাহির থেকে কৌশলে ভিতরের খাট দেখা যায়। তিনি রাত্রে প্রত্যেক ঘরের দৃশ্য ও দিনে স্নানরতা আত্মীয়াদের বিবস্ত্র মূর্তি উপভোগ করিতেন। এবিষয়ে কোন বয়স বা সম্বন্ধের বাছ-বিচার ছিল না।

Dr Talmey-র 'Love' এর ২২৩ হইতে ২২৫ পৃষ্ঠায় এই বিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ও একটি সত্য ঘটনা দেওয়া আছে। দম্পতির ঘরে আড়ি প্যাতা, পরের প্রেমপত্র ও উপন্যাস পাঠ প্রভৃতি এই বাতিকের মৃদু প্রকাশ।

(৬০) এক ঘরে নগ্ন হইয়া থাকা বা শোয়া আমার বেশ লাগে। চীনা জাপানী ও ইউরোপীয় পুরুষেরা নগ্নভাবে স্নান করে দেখিয়াছি।

সুলেখক Julian Strange তাঁহার Adventures In Nakedness পুস্তকে যে সকল ইউরোপীয় ক্লাবের বিবরণ দিয়াছেন, যেখানে নরনারী বিবস্ত্র হইয়া খেলাধূলা, কাজকর্ম, স্নানাদি করে, এ দেশে সেরূপ কোন দল বা সমিতির কথা জানি না। পাটনায় এরূপ একটি ক্লাব স্থাপিত হওয়ার কথা কাগজে দেখিয়াছিলাম।

(৬১) নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার কথা পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছি। অপরের জীবনের কয়েকটি ঘটনা লিখিতেছি:—

(ক) প্রৌঢ় রূপবান ভ্রাতা (৪০), বিধবা ভগ্নী (৩০) ও ছোট ভাগিনেয়ী ৮) একত্রে বাস করিতেন। ভ্রাতা বিবাহিত, কিন্তু স্ত্রীকে আনিতেন না। আসিলে তাঁহার দুর্ব্যবহারে শীঘ্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন। স্ত্রী লক্ষ্মী। ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

(খ) নবম শ্রেণীর ছাত্রী (১৬) মামাতো ভাইয়ের (২০) দ্বারা গর্ভবতী হওয়ায় দিল্লীতে আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া বোঝা নামাইয়া আসে।

(গ) পূর্বের এক প্রশ্নের উত্তরে ১০-১২ বছরের মেয়ের কথা লিখিয়াছি। সে দুই সন্তান লইয়া বিধবা হয়। পরে একজন ভ্রাতৃবধূ তাহাকে এক ভগিনাপতির সহিত একত্রশায়ী দেখিতে পান।

(ঘ) যুবা ভাশুরপুত্র (২৪) সুন্দরী তরুণী (২৫) সধবার কাকীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে (একত্র নির্জন ঘরেও) বহুক্ষণ মেলামেশায় ভালমানুষ কাকা কোন আপত্তি করেন নাই। কাকা বিদেশে থাকায় সে একদিন গল্পে গল্পে রাত বারটা হইয়াছে বলিয়া সেই ঘরে রাত্রিবাস করে। কাকীর এক ছোট ছেলে অন্য আত্মীয়দের বলিয়াছে যে অমুককে প্যাণ্ট খুলিতে দেখিয়াছে। অপর সব সন্তান বেশ ফর্সা। শেষ পুত্রের বর্ণ ভাশুরপুত্রের বর্ণের মতো কালো। তবু সে বিদেশে ভাশুরপুত্রের কাছে ২-১ সন্তান লইয়া, স্বামী ও তিনটি সন্তান ছাড়িয়া হাওয়া বদলাইবার অছিলায় আসে। ভাশুরপুত্র সুন্দরীর সহিত বিবাহিত। স্ত্রী সব দেখিয়া অসুখী।

(ঙ) আমার সম্পর্কে দুইজন অবিবাহিতা গৌরাঙ্গী শালী ২৫-২৬ ও ১৮-১৯) আমাদের বাড়ী থাকিত। আমার ২১-২২ বৎসরের অবিবাহিত ছেলের সঙ্গে ছোটটির ও ১৬-১৭ বছরের (বেশী প্রিয়দর্শন) ছেলেটির সঙ্গে দুজনেরই,

বিশেষত বড়টির, বেশ ঘনিষ্ঠতা দেখা গেল। এ বিষয়ে ঐ মেয়েদের বরং বেশী অগ্রসর বোধ হইল। ছোটটি আমার ছোট ছেলের কাঁধে হাত দিয়া আছে, আমায় দেখিয়া নামাইয়া লইল। ছোট মেয়েটি নিজেই নামমাত্র একখানি বই হাতে করিয়া বড়টির ছোট নির্জন পড়ার ঘরে তাহার কাছে প্রত্যহ বসিত। ছেলের পড়ার ক্ষতি হইবে বলাতেও নিবৃত্ত হয় নাই। মনে হয় তাহার ফেল হওয়ার অন্যতম কারণ ঐ আগুনের সান্নিধ্য এবং গল্প-আলাপ প্রভৃতি।

(চ) এবার কয়েকজনের মুখে তাহাদের কাহিনী শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে যেমন লিখিয়াছি সেগুলি সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই লেখার সাধু ভাষার সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য তাহাদের কথা ভাষাকে সাধুভাষায় পরিবর্তিত করিতে হইল।

অবিবাহিত কায়স্থ যুবক (২০) তিলি জাতীয় মনিবের বাড়ী থাকিয়া তাহার দোকানে কাজ করিত। মনিবের দুই ভগিনী বয়স ১২ ও ৯। বড়টি তাহার ভাল চুল দেখিয়া আকৃষ্টা হয় (পরে স্বীকার করিয়াছে) এবং ছেলেটি তাহাকে কাতুকুতু, কানে ফুঁ ও গায়ে হলুদ দেওয়া প্রভৃতি খেলার জন্য ক্রমশ ভাব জমে। নির্জনে বড়টিকে কোলে বসাইয়া আদর করা হইত। সে জিজ্ঞাসা করিত অপর নারীদের মত কেন তাহার স্তন বড় নয়, কবে হইবে? এই সময়ে উভয়ের সংসর্গ চলে। সাবালিকা হইবার পরে মেয়েটিরই বেশী আগ্রহে মায়ের জানা সত্ত্বেও উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করিত। মা গর্ভনিবারক কোনও বিজ্ঞাপিত ঔষধ আনিয়া মেয়েকে তিন মাস পর পর খাওয়াইতেন। ছোট ভগ্নী পাহারা দিত। পরে ধরা পড়ায় যুবকটিকে বিদায় দেওয়া হয়। মেয়েটি বিদায়ের সময়ে খুব কান্নাকাটি করে।

(ছ) উক্ত যুবক যখন ১৩-১৪ বছরের তখন একটি ১০-১১ বছরের বালিকার সহিত তাহার যৌন সম্পর্ক ছিল। যখন মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে ও বয়স ১৬ বৎসর, তখন তাহাদের বাড়ী যায়। তাহার স্বামী চাকরির জন্য রাত্রে বাহিরে গিয়াছিলেন। রাত্রে একই ঘরে শয়ন করায় অন্ধকারে উহার সম্মতিতে সংসর্গ ঘটে।

অতীতের সংস্কারের প্রবল প্রভাব

(জ) উক্ত যুবক বলিয়াছে: এক বাড়ীর মেয়েরা চাঁদনী রাত্রে লুকোচুরি খেলিতেছিল। একজন বিবাহিতা মহিলার সম্পর্কে ভাশুর, তাঁহাকে দুবিধা

পাইয়া নির্জনে জড়াইয়া ধরে। তাহার মনে এরূপ ঘৃণা লজ্জা হয় যে তাহার ফলে তিনি মারা যান। মরিবার পূর্বে ঐ কথা কোন আত্মীয়াকে বলেন। ভাশুরকে শাস্তি দিয়া একঘরে করা হয়। পরে তিনি পাপ স্বীকার করেন।

ইংরেজ কুমারীর রক্ষিত বাঙালী ড্রাইভার

(ঝ) হরেন (১৮) সুশ্রী, শ্যামবর্ণ; কলিকাতায় সাইকেলের দোকানে কাজ করিত। একজন ফিরিঙ্গী ছেলে বাইসিক্‌ল সারাইলে তাহাদের বাড়ী গিয়া টাকা চাওয়াতে তাহার ভগিনী লিলি (১৭) আসিয়া টাকা দিল। পরে মেয়েটি অনেকবার দোকানে আসাতে উভয়ে বেশ ভাব হইল। হরেন একদিন লিলিকে সিনেমায় লইয়া গেল। পরে একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাইবার সময় লিলি তাহাকে ট্যাক্সির মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। তখন চুম্বনের আদান প্রদান হইল; বাগানে নামিয়াও হইল। তিনমাস এইভাবে চুম্বনাদি চলিল। মোটর-চালনার লাইসেন্স পাওয়ায় লিলিদের বাড়ীতে হরেনের ড্রাইভারের চাকরি হইল। লিলির পিতা কলিকাতার এক বড় সদাগরী অফিসের বড় সাহেব। একদিন লিলি হরেনের থাকার গুদামঘরে দিনমানে আসিল এবং সেইখানেই সংসর্গ হইল। বেহারা সন্দেহ করায় হরেনের চাকরি ছাড়িতে হইল। লিলি Whiteaway-এ উপরে Victoria Chambers-এ, মাসিক ১১৫৲ ভাড়ায়, মিলনের জন্য, একটা ঘর ভাড়া করিল। হরেনকে মাসিক ৫০৲ হইতে ৮০৲ দিত, লেখাপড়া করিতে উৎসাহ দিত। হরেন বেনেপুকুর রোডে ৬৲ টাকায় একটি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত। লিলি সেই ঠিকানায় মিলনের তারিখ ও সময় জানাইত অস্বাক্ষরিত চিঠিতে। দেখা হইলে প্রথমে প্রণয়-লীলা ও পরে মিলন হইত। গর্ভ-নিবারণের ব্যবস্থা লিলিই কিছু করিত। লিলি বোম্বাই গিয়া দোকানে বা নার্সের কাজ করার প্রস্তাব করিল। ধরা পড়ার ভয়ে হরেন রাজী হইল না। একদিন ১৫,০০০ টাকা ও দুইটি হীরার আংটি আনিয়া লিলি বলিল, "আজই বোম্বাই চল।" টাকা দেখিয়া যুবকের দারুণ ভয় হইল, বলিল "তোমার পিতা মোকদ্দমা করিবেন। টাকা অল্পদিনে ফুরাইয়া যাইবে।" লিলি রাগ করিল। কয়েকদিন পরে লিলি অভিযোগ করিল, "জানি শুধু স্বার্থের জন্য আস।" বিবাদ হইল। তখন বেনেপুকুরের জন্ নামে এক ফিরিঙ্গীর বাড়ীতে হরেন খরচ দিয়া থাকিত।

আফিম খাওয়া—অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই। লিলির জন্য মন খারাপ। একদিন হরেন সারাদিন সুরাপান করিল। চারিটি দোকান হইতে মোট আট আনার আফিম কিনিয়া, সরিষার তৈলের সহিত গুলিয়া ইডেন গার্ডেনে বসিয়া খাইল। মুখে খুব তিক্তবোধ হইল। মালাই বরফ খাওয়াতে তাও তিক্তবোধ হইল। ১৫ মিনিট বেঞ্চে শুইয়া থাকিয়াও মৃত্যু আসিল না। বমি হইল। রিকশা করিয়া বাড়ী গেল। দুই সপ্তাহ শরীর খুব খারাপ ছিল। দিন কুড়ি পরে লিলি আসিল। জনকে হরেন বলিল, "উহাকে যাইতে বল, নতুবা আমিই চলিয়া যাইব।" লিলি চলিয়া গেল।

লিলির বদান্যতা। মাসখানেক পরে হরেন ভাগ্যপরীক্ষা করিতে বোম্বাই গেল। কয়েকমাস পরে অনেক দুঃখ পাইবার পর লিলিকে কষ্ট জানাইতে সে ৫০৲ পাঠাইল। দিন পনর পরে আবার টাকা চাইতে ৪০৲ পাঠাইল ও লিখিল, 'কেন ফিরিতেছ না? ১১৬।৶০ ধার আছে লেখাতে তাহাও পাঠাইল। রেলভাড়া চাওয়ায়, ভাড়া জমা দিয়া পাস পাঠাইল। কলিকাতায় আসিয়া হেষ্টিংসএ ১০৲ ভাড়ায় একটি ঘর লওয়া হইল। লিলির মা বাবার সহিত দেখা করিল। ফিরিবার সময় লিলি টেনিস্ গ্রাউণ্ডের কাছে কখন কোথায় দেখা হইবে বলিয়া দিল। পরে মিলনোদ্দেশ্যে ওয়াছেল মোল্লার দোকানের উপরতলায় ৬৫৲ টাকার ঘর ভাড়া করা হইল। লিলির বাড়ীর এক মালী উহাদের সম্পর্কের কথা জানিত। তাহার মুখ বন্ধ রাখিবার জন্য তাহাকে মাসে ১৫৲ টাকা দেওয়া হইত। তাহার সাহায্যে বাড়ীর ভিতর মিলন হইত। একবার লিলির পিতা তাহার ঘরে আসায় হরেনকে কাপড়ের আলমারীর মধ্যে লুকাইয়া সে দরজা খোলে।

বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা—লিলির নিষ্ঠা। এক মুসলমান বন্ধু লিলি ঘটিত ব্যাপার শুনিয়া আলাপ করাইয়া দিতে বলে, হরেন রাজী হয় নাই। একদিন লিলি ট্যাক্সি করিয়া আসাতে তাহার সহিত সে গায়ে পড়িয়া আলাপ করে এবং পরেও ভাব জমাইবার চেষ্টা করিত। একবার ডাকপিয়নের নিকট হইতে হরেনকে লিলির লেখা চিঠি হরেনকে দিবে বলিয়া চাহিয়া লয়। মিলনের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় এইরূপে জানিতে পারিয়া, সেদিন সেখানে বিশ্রাম করিবে বলিয়া মিলনকুঞ্জের চাবি চাহিয়া লয়। লিলি আসিলে তাহাকে বলে, হরেনের অসুখ করিয়াছে। সে কুপ্রস্তাব করায় লিলি তাহাকে ভর্ৎসনা ও অপমান করিয়া চলিয়া আসে। অনেক দিন লিলির চিঠি না পাইয়া হরেন

এক সন্ধ্যায় তাহার বাড়ী গেল। কাছাকাছি যাইতে ৩-৪ জন লোক (সম্ভবত সেই বন্ধুর নিযুক্ত গুণ্ডা) "কাঁহা যাতা হ্যায়, হিঁয়া আয়েগা তো মার খায়েগা।" বলিয়া তাহাকে মারিতে আরম্ভ করে। দৌড়াইয়া চলমান বাসে উঠিয়া পড়ে। কিছুদিন পরে দিনের বেলা তাহার বাড়ী গিয়া সেই মালীর মারফতে খবর দেওয়ায়, কাছের চৌমাথায় অপেক্ষা করিতে বলে। সাক্ষাতে সব কথা হয়।

গণিকার প্রণয়—মাস ছয়েকের পরে ল্যান্সডাউন রোড ও মনোহরপুকুর রোডের মোড়ে হরেন (২২) এক চলতি হোটেল কিনিল। হোটেলের একমাছ-সরবরাহকারী কানাই একদিন আড়ালে বলিল, "ভাল মাল আছে।" "বেশী টাকা খরচ করিতে পারিব না।" "আমি দিব।" ২০৲ দিল। নিয়ে গেল চেতলায়।

প্রথম সাক্ষাৎ। গণিকাপাড়া। এক বাড়ীর সামনে ৪-৫ জন মেয়ে সাজিয়া বসিয়া আছে। সন্ধ্যা ৮টা। হরেন কানাইকে বলিল, "তুমি যাও, আমি বাহিরে থাকি। রমা বলিল, গরীবের ঘরে আসিতে কি আপত্তি আছে?" "না"। খাটের পাশে বসিল। চা ও পান আসিল। হরেন বলিল, "চা খাই না।" রমা বলিল, "কেন, এ পাড়ায় চা খাইতে ঘৃণা বোধ হইতেছে?" "না!" "পান?" "খাই না।" "কেন, কিনিতে দেখিলাম!" "এই পাড়ার রীতি বলিয়া।" দেখা গেল—রমা, সুন্দরী। বয়স ১৮। কানাই বলিল, "বীয়ার খাবেন?" "না" রমা বলিল, "খাবেন?" "না।" কিছু জেদাজেদির পর তিন বোতল আসিল। কোমরে টাকা ছিল তাই মদ খাইতে ভয় হইতেছিল। পীড়াপীড়িতে এক গেলাস খাইল। আরও জেদ করায়, আর এক গেলাস খাইল। নেশা হইল "নাম কি?" "সকলে রমা বলে।" "বাড়ী কোথায়?" "কপালে এই ছিল।"

"আমার সে ক্ষমতা বা ইচ্ছা নাই যে, টাকা দিয়া রূপ কিনিব। কানাই পারে। শুনিয়াছি, সব বেশ্যাই বলে যে, তারা ভদ্রঘরের। মিথ্যা কেন বলে জানি না।" রমা যেন অসন্তুষ্ট হইল। কানাই বলিল, "আপনাকে এখানে থাকিতে হইবে।" রমা খাটে বসিয়া পান সাজিতেছিল। তাহাকে ভাল লাগিতেছিল। কানাই আসায় কথা বন্ধ হইল। হরেন বলিল, "যাব।" রমা "কেন থাকবেন না?" "বলেছি তো রূপ কেনবার পয়সা নেই।" "পয়সাই কি সব?" "আপনাদের তো এই ব্যবসা।" রমা কাঁদিতে লাগিল। কাছে আসিল। পিঠে হাত দিয়া হরেন বলিল, "আমি বোকা, এখানকার আদব-

কায়দা জানি না।" "না, না, দোষ হয় নি। পুরুষ যদি শত ভুল করে তার ক্ষমা হয়, কিন্তু মেয়েরা একবার ভুল করিলেই ঘর-সংসার ছাড়িতে হয়। হরেন রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছিয়া দিল। জড়াইয়া চুম্বন করিল। "আপনাকে আজ থাকতেই হবে।" "পরের চাকরি, কি করে থাকব?" "মিথ্যা কথা হোটেল আছে জানি।" আরও বীয়ার, মাংস ও লুচি আসিল। কানাই এক থালায়, ওরা দুইজন এক থালায়। লজ্জায় গলা দিয়া খাবার নামে না। কানাই বলে, "বৌদি দাদাকে খাওয়ান।" হরেন খাইল না দেখিয়া রমাও খাইল না। সারারাত গল্প ও ৪-৫ বার সংসর্গ হইল।

রমার পূর্বকথা—মাতাল অত্যাচারী স্বামী—প্রথম প্রণয়। রমার মুখে শোনা গেল যে, ১১-১২ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী মাতাল, মারধর করিত। দিনের বেলা জড়াজড়ি করিত। তাহার ভয় হইত ও খারাপ লাগিত। সংসর্গ করিতে দিত না বলিয়া মার খাইত। একদিন তাহার পিতা জামাই-বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখেই মারিল। ঝগড়া হইল। তিনি বাড়ী ফিরিয়া মেয়েকে আনিতে চাহিলেন, পাঠাইল না। আদালত বলিল, "মেয়ে সাবালক (১৬ বৎসর) না হওয়া পর্যন্ত বাপের কাছে থাকিবে।" তিনি বুঝাইলেন, "সেখানে আর যাসনি, জানবি বিধবা হয়েছিস।" বছর দুই পরে তিনি মারা গেলেন। ১৭-১৮ বৎসর বয়সে, পুকুরে জল আনিতে যাইতে রাম নামে একটি ছেলের সঙ্গে ভাব হয়। গ্রামে নিন্দ রটে। বড় ভাই (হরি) মারে। পাড়ার মেয়েরা মেলামেশা বন্ধ করিল। মা অপর পাড়ায় নিজের ভাইয়ের বাড়ী পাঠাইলেন। একজন বুড়ীর মারফত কথা চলিত ও কখন কখন দেখা হইত। দিদিমা জানিতে পারিয়া মার কাছে ফেরত পাঠাইলেন।

পলায়ন। রাম কলিকাতা যাইবার পরামর্শ দিল। স্থির হইল, (মাইল খানেক দূরের) স্টেশনে রাত্রি সাড়ে তিনটায় দেখা হইবে। রমা সেখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। গ্রামের একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছে?" "কলিকাতায় মামার বাড়ী।" "আমিও কলিকাতা যাব।" পথে সব বলিল। ছেলেটি তাহাকে মনোহরপুকুর রোডে এক প্রাইভেট বারাঙ্গনার বাড়ী রাখে। বাড়ীউলির অনুরোধও ঐ পথ ধরিতে রাজী হয় না। কোন লোক আসিলে ভয়ে পলাইয়া যাইত। একদিন কতকগুলি দুষ্ট লোক তাহাকে ধরিয়া ল্যান্সডাউন রোডে লইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে একজন লুকাইয়া খাইতে দিত। সে বলিল, "এখানে থাকলে তোমায় মেরে ফেলবে। আমার

সঙ্গে চল।" রাত্রে পায়খানায় দেওয়ালের উপর উঠাইয়া, বাহির করিয়া কালীঘাটে 'খোকার হোটেল'-এ রাখিল। মনোহরপুকুরের গুণ্ডারা জানিতে পারিয়া সেই হোটেল আক্রমণ করিল। সেই রাত্রে, যে তাহাকে হোটেলে রাখিয়াছিল সে খোকাকে না বলিয়া, রমাকে বাহির করিয়া চেতলায় স্বর্ণ বাড়ীউলির কাছে রাখে।

রক্ষিতা। স্বর্ণ বলে, "লাইসেন্স না লইয়া রশিদ নামে এক ভদ্রলোক (৩০০৲।৩৫০৲ মাহিনা) তোমায় রাখিতে চান। তাঁহার পিতা ও স্ত্রী-পুত্র আছে।" রাজী হইল। সে তাহাকে পতিতা-পল্লীতে রাখিল। নিজের বাড়ীতেও লইয়া গিয়াছিল। তাহার স্ত্রী রাগ বা হিংসা দেখায় নাই। তিনি বলিলেন, "আমি বললে শোনে না, তুমি মদ খেতে বারণ কোরো।" এইভাবে মা আটকে গেল। বাড়ীউলির ভয়ে মাঝে মাঝে অন্য লোকও বসাইত। বাড়ীউলিই সব টাকা লইত। রশিদ পরে তাহাকে পায়া বাড়ীউলির কাছে রাখিল। তিন-চার মাস পরে রশিদের সঙ্গে ঝগড়া হইল। যে তাহাকে খোকার হোটেলে রাখিয়াছিল সে ও মাছওয়ালা কানাই বন্ধু। রমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া কানাই বলিল, আরও ভাল লোক আনিয়া দিবে। তাই হরেনকে লইয়া গেল।

পরদিন প্রাতে। হরেন সকালে তাহার বালিশের নীচে ১০৲ টাকার নোট রাখিয়া আসিল। রমা—"কবে আসবেন?" "কাল আসতে পারব না, মাঝে মাঝে আসব।" কানাই আসিয়া বলিত, "আপনাকে ডাকিয়াছে।" ৬-৭ দিন পরে রমা কানাইয়ের সহিত ট্যাক্সি করিয়া হরেনের হোটেলে আসিয়া হাজির। হরেন বলিল তাহাকে লেকের ধারে লইয়া যাইতে। দেখা হইলে রমা বলিল, "নমস্কার।" "নমস্কার, কি ব্যাপার বলুন তো? কেন এসেছেন?" "খুব লোক তো? আসবেন বলে এলেন না!" রোজ যাব তো বলিনি।" "আজ যাবেন না?" "না, আমার অত টাকা নেই। এই ১০৲ নিন, আর এখানে আসবেন না।" অনেক জেদ করাতে অল্পক্ষণের জন্য যাইতে রাজী হইল।

রমার ত্যাগ। খানিক থাকিয়া বলিল, "আর আসব না, টাকা নেই।" "টাকা লাগবে না।" গাড়ীভাড়া, সিগারেট প্রভৃতি তো লাগবে।" রমা ৫৲ ও এক টিন সিগারেট দিয়া বলিল, "এই নিন ট্যাক্সি ভাড়া।" কানাই বলিল, "নিন্ না, ঠিক আছে।" পরদিন রাত ১০টায় রিক্‌শা করিয়া গেল।

রাত্রে থাকা হইল। রমা প্রত্যহ ৫৲ ও সিগারেট দিত। হরেন ভাবে, কেন টাকা দেয়! জমাইয়া রাখে। মাস আড়াই পরে রমার চাকর হোটেলে আসিয়া বলিল, সে ২৲ চাহিয়াছে। "কেন রে?" "বাজারের টাকা ছিল না, তাই চাইতে বলেছেন। শোনা গেল, গহনা বন্ধক দিয়াছে ও গতকল্য বাজার হয় নাই। কানাইকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, "কি বলব আপনার জন্ম সব বন্ধক দিয়াছে। আমি লজ্জায় বলিনি।" সে রাত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "শুনলাম গহনা বন্ধক দিয়েছ, সত্যি?" "হাঁ" এখন আমায় টাকা কি করে দেবে?" পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন, আমি আর টাকা দিতে পারব না। কিন্তু আপনি না এলে মারা যাব।" হরেন রোজ যাইত ও বাজার খরচের জন্ম ২৲ টাকা বা ২॥৹ দিত। ১০-১২ দিন পরে বাড়ীউলি আলাদা ডাকিয়া বলিল, "শুনলুম আপনার জন্ম সব টাকা নষ্ট করেছে। রাস্তায় যায় না। তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে এর সব বিহিত করুন।" রমাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বাড়ীউলির সঙ্গে ঝগড়া করিল, "আমার বাবুকে কেন বলবে, আমি টাকা দেব।" "গহনা কত টাকা বন্ধক দিয়েছ?" "২৫০৲ টাকায়।" "ভাড়া বাকী কত?" "৫০৲ টাকা।" রমা লইতে অস্বীকার করিলেও সেদিনই ভাড়ার টাকা দিল। পরদিন তাহার সহিত নিকটস্থ পোদ্দারের দোকানে গিয়া, গহনা ছাড়াইল। রমার সম্মতিতে, নিজের হোটেলে আনিয়া রাখিল।

কৃত্রিম কলহ। মাসখানেক পরে ঝগড়া হইল। "খবরদার, আর তুমি আমার হোটেলে যেও না, আমিও আর আসব না।" "যাও তোমার মত অনেক লোক দেখেছি।" হরেনের এমন রাগ হইল যে, গুলী করিতে ইচ্ছা হইল। মাসখানেক গেল, সে আর আসে না, হরেনও আর থাকিতে পারে না। এক দুপুরে গহনা ফেরত দেবার অছিলায় গিয়া দেখে একজন মেয়ের সহিত খুব হাসি-গল্প করিতেছে। রাগ হইল। কাছে গিয়া মুখের উপর গহনা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "আর জীবনে তোমার কাছে আসব না।" "যাও, যাও, তোমার মত অনেক দেখেছি।" ১০-১৫ দিন তাহার কোন খবর না পাইয়া, তাহাকে জব্দ করিবার জন্ম, তাহার ঘরের পাশের ঘর ভাড়া লইয়া সেখানে মদ খাওয়া এবং অন্ম মেয়েদের সহিত আড্ডা দেওয়া আরম্ভ করিল। একদিন বেশী মদ খাওয়াতে বাড়ীউলি রমাকে বলিল, "যা, মদ খেয়ে সব নষ্ট করছে।" "ভয় করে, ভারী রাগী, মারবে।"

সেবায় সন্ধি। রাত্রি দেড়টায় ঘুম ভাঙিতে হরেন দেখিল যে, রমার বিছানায় শুইয়া আর সে পাশে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া উঠিতে চাহিলে বলিল, "শুয়ে থাক" জড়াইয়া ধরিল। ছেড়ে দাও শরীর দুর্বল।" সে পার্শ্বে শয়ন করে। সন্ধি হইল।

পুলিসের হাঙ্গামায় ভুল বোঝা। রাত তিনটায় পুলিসের হানা হইল। "কি কাজ কর?" "হোটেল আছে।" রমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। সেও নিজ হইতে কিছু বলিল।না যে চেনা লোক,। থানায় কথায় প্রমাণ পাইয়া ছাড়িয়া দিল। মনে হইল হয়ত রমাই ফাঁসাইয়াছে। পরদিন বেলা ১টায় তাহার কাছে গিয়া খুব গালাগালি দিল। "আমি কিছু জানি না, ভয়ে কিছু বলি নি।" আবার পাশের ঘরে রোজ মদ খাওয়া আরম্ভ হইল। কিন্তু মন মানে না। সেও লোক পাঠায়, তাহারা বলে, "তোমার জন্য খুব দুঃখ করে।"

মান, অভিমান, গর্ব ও জেদ বিসর্জনেই সন্ধি ও শান্তি। একদিন যখন সুরাপান করিতেছিল, তখন আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ক্ষমা কর, আমি এ সব কিছু জানি না।" "ভদ্র মেয়ে জেনে বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু বেশ্যাকে বিশ্বাস নেই।" সে কাপড় জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে "চলে যাও" বলিয়া মারিল। কাঁদিতে লাগিল। তাহার সহিত তাহার ঘরে গেল। সন্ধি হইল। কিছুদিন পরে পাশের ঘর ছাড়িয়া তাহার ঘরে সব জিনিস আনা হইল। তাহাকে এখন বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিতে পারে না। খরচের জন্য টাকা দেয়। দর্শনী হিসাবে নয়। তাহার ও নিজের টাকা আলাদা এই ধারণা গিয়াছে।

অর্থহীন উপপতির জন্য গণিকাবৃত্তি ও স্বাধীনতা বিসর্জন। কিছুদিন পরে রাত্রি ১২ টায় ট্যাক্সি করিয়া রমা হোটেলে আসিল। "আমি আর সেখানে থাকব না, অনেক গণ্ডগোল হয়ে গেছে।" "এখন এই রাতে কোথায় থাকবে? এখন যাও, কাল ব্যবস্থা হবে।" "না, সেখানে আর যাব না।" কাছের এক বন্ধুর রক্ষিতার কাছে রাখা হইল। পরদিন তাহার জিনিসপত্র ও গহনা আনার কথা বলাতে বলিল, "আর ও রাস্তার কোন জিনিস চাই না, ঐ রাস্তার উপর ঘৃণা ধরে গেছে! আমায় যদি ভাল রাস্তায় রাখতে পার তা'হলেই ভাল।" হরেন ভাবিল, তাহার স্কন্ধে ভর করিয়া তাহাকে শেষ করিবার এটি একটি চাল। পরদিন গৃহস্থপাড়ায় বাড়ী ভাড়া

করিয়া তাহাকে রাখা হইল। সবার কাছে তাহার নূতন ঠিকানা গোপন রাখা হইল, পাছে কেহ আসিয়া উৎপাত করে। কেহ আসিলে দেখা করিতে নিষেধ ছিল। তাই পরিচয় নিয়া অপর লোক আসিতে পারে না।

মা ও ভাইয়ের আসা ও সাহায্য লওয়া—নিজগ্রামে গিয়া দেখা করা। চেতলায় থাকার সময় একদিন কালীঘাটের পথে তাহার মাতার সহিত দেখা হওয়াতে তাঁহাকে রমা বাড়ীতে আনে। তিনি সেই দিনই চলিয়া যান। তাহার যে বড়ভাই, গ্রামে, চরিত্রদোষ সন্দেহ করিয়া মারিয়াছিল, সে এখানে দেখা করিতে আসিয়াছিল। নিষেধমত দেখা করে নাই। তাহার মা দুই-চার বার তাহার কাছে আসিয়াছিলেন। সেও একবার গ্রামে গিয়া বাড়ীর লোকদের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। এবার সে আবার যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। "সঙ্গে চল, নইলে যাব না, একা কি করে দুই-তিন দিন তোমায় ছেড়ে থাকব?" গ্রামের একটি নিম্নজাতীয় গরীব বিধবার (যাহার বাড়ীতে থাকিয়া ইতিপূর্বে নিজ পরিবারের লোকদের সহিত দেখা করিয়াছিল) বাড়ী যাওয়া হইল। মা (৪০), ছোট বোন (১৫) ও বড় ভাই আসিয়া দেখা করিলেন। মাকে অর্থসাহায্য করা হইল। মাসখানেক পরে সেই বড়ভাই চাকরির চেষ্টায় কলিকাতা আসিয়া রমার কাছে ১৫-১৬ দিন থাকিল। হরেনের দেওয়া হারমোনিয়াম লইল।

স্বামীর আসা—গ্রহণের প্রস্তাব। রমার স্বামী অন্য বিবাহ করিয়াছেন। তিনি একদিন তাহার নিকট আসিলেন। তখন রমা ব্যবসা করে। বাহিরে বেড়াইয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া দেখিলেন ঘরে লোক আছে। বলিলেন, "ওকে তাড়িয়ে দাও, আমি টাকা দেব। "কোথা থেকে দেবে?" তার কাছে টাকা নাই জানিয়াছিল। সে লোক যাওয়ার পর তিনি রাত্রিবাস করিলেন; বলিলেন "আমার সঙ্গে চল।" "তোমার নূতন বৌ-এর কি হবে?" "তাকে তাড়িয়ে দেব।" "না, সে হয় না।" পরদিন হরেন জিজ্ঞাসা করিল, "সংসর্গ হল? তোর তো স্বামী।" "যাও, এ সব কি বাজে কথা?" "তা হলে হয়েছে?" "ধ্যেৎ, ঝাঁটা মারি ওর কপালে।"

উপপতির দুরবস্থায় আবার ব্যবসায়ে নামা—দেখাশোনার অভাবে হোটেলের ক্ষতি হইতে লাগিল দেখিয়া হরেন হোটেল তুলিয়া দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বাধ্য হইয়া রমাকে আবার ব্যবসায়ে নামাইতে হইল। রমা কিন্তু সহজে রাজী হয় নাই। নিজেদের কোনদিন একবেলা কোনদিন

দুইবেলা ছাতু খাওয়া হইত। সারাদিন চাকুরী খুঁজিয়া রাত্রি ১১টায় রমার কাছে গিয়া হরেনের খাওয়া হইত। হরেনের ছোট ভাইয়ের কয়েকদিন যাবৎ জ্বর শুনিয়া, হরেনের নিষেধ সত্ত্বেও রমা সেখানে গিয়া ফল ও টাকা দিল। ভাইকে হাসপাতালে পাঠাইবার পর হরেনের দুই বেলাই রমার বাড়ীতে আহার হইত। চাকুরী খুঁজিয়া বেলা ২-৩ টাতে ফিরিলে সে অভুক্ত। এই ভাবে অনেক চেষ্টায় দুই মাস পরে হরেনের চাকুরী হইল।

রমার সত্ত্বগুণ, ভালবাসা ও ত্যাগ। কোন কোন বারে হরেনের মার খাইয়া রমা অন্য মেয়ের বাড়ী লুকাইয়া থাকিত, খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার মারিত, পলাইয়াছিল বলিয়া। অপর মেয়েরা তাহাকে বলে, "পয়সা দেয় না, কেন মার খাস?" হরেনের নিন্দা করিলে রমা খুব ঝগড়া করে তাই তাহারা আর ওসব বলে না। মারামারি হইলে আর আসে না। রাত্রে হরেন থাকিলে অন্য লোক রাখে না, যদিও হরেন রাখিতে বলে, কারণ সে নিজে পয়সা দিতে পারে না। তবে অপরেব প্রতি তাহার ভালবাসা দেখিলে হিংসা হয়। হরেনের অপরের প্রতি অনুরক্তি দেখিলে রমারও হিংসা হয়। হরেনের বন্ধুরা টাকা দিলে নেয় না।

[হরেন, লিলি ও রমার যৌন-আকর্ষণ, যৌন-আচরণ, ভাগ্যবিপর্যয়, ছাড়াছাড়ি, সংসর্গ, ত্যাগ-ভালবাসা ইত্যাদির কাহিনী—বাস্তব জীবনের একটি মর্মান্তিক আলেখ্য।—গ্রন্থকার।]

(৬২) যৌন কদাচার হইতে বাঁচিবার উপায় ও উপদেশগুলি বেশ ভাল। আন্তরিকতার সহিত ঐ ভাবে চেষ্টা করিলে সুফল পাওয়ারই সম্ভাবনা; তবে আমার ঐ সবগুলির কোনটি নাই বলিয়া উপদেশগুলি পরীক্ষার কথা উঠে না।

(৬৩) প্রথম বিপরীতলিঙ্গ সংস্পর্শের বিবরণ ৩১নং প্রশ্নের উত্তরে দিয়াছি। পরবর্তী সংস্পর্শের বিবরণ ৩৩নং প্রশ্নের উত্তরে দেখুন।

(৬৪) পুরুষের মধ্যে বিবাহেতর যৌন-মিলন প্রায় সার্বজনীন।

(৬৫) ধর্মগত যৌন কদাচারের বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখি নাই। "ধর্মানন্দ প্রবন্ধাবলী"তে আছে যে, গুজরাটে বল্লভাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা বিবাহিতা কন্যাকে প্রথমবার জামাতার কাছে পাঠাইবার আগে গুরুর কাছে পাঠাইয়া 'প্রসাদ' করাইয়া লন। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে শুনিয়াছি বিবাহের পর পুরোহিত 'প্রথম রাত্রির অধিকার' (Right of the first night) ভোগ করেন। উপরে উল্লিখিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'গুরু মহারাজ'রা ভক্তদের অন্দরমহলে গিয়া 'রাসলীলা' 'বস্ত্রহরণ' প্রভৃতি অনুকরণ করেন।

তাঁহাদের গুরু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে তনু-মন-ধন অর্পণ করাই পুণ্যকর্ম। শুনিয়াছি, লক্ষ্ণৌর শিয়া মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর নরনারী 'ঈদ যদিদ্' এর দিন কোন বড় বাড়ীতে একত্রিত হয়। সন্ধ্যাবেলা স্ত্রীলোকদের কাঁচুলী একটি ঘড়ার মধ্যে রাখা হয় পরে পুরুষেরা (লটারীর মত) এক একটি বডিস তুলিয়া লয়। যাহার হাতে যাহার জামা আসে সে তাহার (যে কোন সম্পর্কের হউক না কেন) সহিত রাত্রিযাপন করে।

(৬৬) গণিকাগমন করি নাই।

(৬৭) পরিচিতদের মধ্যে গণিকাগমনেরও সঠিক বিবরণ জানি না।

(৬৮) অর্থ প্রভৃতির বিনিময়ে দেহ ব্যবহার করিতে দেয় এমন বালক সব জায়গাতেই আছে, তবে আলাদা ঘর লইয়া সম্পূর্ণভাবে ও খোলাখুলি এই ব্যবসা করে এমন দৃষ্টান্ত জানা নাই।

(৬৯) পতিতারা কোন্ উপায়ে গর্ভনিবারণ বা উহার চেষ্টা করে জানা নাই।

(৭০) (ক) পরিচিতদের মধ্যে মদ্যপানেব প্রসার কমই। (খ) এক ব্যক্তি বিষয়ের লোভে তাহার পিতাকে গলা টিপিয়া মারে। সে আগেও মদ্যপান করিত। (হয়ত সেই বিভীষিকা দেখিত বলিয়া) তাহার পর দিনরাত শুধু সুরাপান করিত। ২-৩ বার ঐ অবস্থায় মর মর হইয়া, শেষে মারা যায়।

যৌনব্যাধি ও রতিজ রোগ

(৭১) আমার বা আমার স্ত্রীর রতিজ রোগ হয় নাই।

(৭২) প্রতিষেধক ব্যবহার করি নাই।

(৭৩) পরিচিতদের মধ্যে রতিজ রোগের প্রকোপ কমই বোধ হয়।

(৭৪) আমাদের ঐ সব যৌন রোগের কোনটি নাই।

(৭৫) ঋতুস্রাবের বিশেষ গোলযোগ আমার স্ত্রীর নাই। সম্ভবত ঋতু-সংহারের বয়স (৪৫)' হওয়াতে বেশী হয় ও বেশীদিন থাকে। পরিচিতাদের মধ্যে অপর রোগ অপেক্ষা বাধক বেশী দেখা যায়, তারপর শ্বেতপ্রদর।

যৌননিষ্ঠা

(৭৬) স্বপ্নদোষ আরম্ভ হইবার পর যৌননিষ্ঠা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রভাব: (১) অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ'; (২) কোন

কোন ধর্মবন্ধু ; (৩) শারীরিক ও মানসিক শক্তি রক্ষার আশা। প্রথম যৌবনে কুস্তি ও নানাপ্রকার ব্যায়াম করিয়াছি। খুব কড়া শাসন ছিল, কিন্তু তাহার ফলে কোন উপকার হয় নাই।

(৭৭) স্বেচ্ছাকৃত সংযমে অশান্তি বা বিদ্রোহ ভাব হইবার কথা নয়।

(৭৮) সংযম অভ্যাসের ফলে শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যলাভ ও মনে শান্তিলাভ করিয়াছি। প্রথম যৌবনের সংযমের কঠোরতা পরবর্তী যুগে ছিল না—অনাবশ্যক-বোধে।

(৭৯) চিরকুমারীদের প্রশ্ন করার সুবিধা নাই। চিরকুমাররা আত্মরতি তো করেনই, সুবিধামত বালক বা নারীসম্ভোগ করেন। লক্ষ্ণৌয়ের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পর পর দুইজন স্বামীজীর নারীঘটিত কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র হয়। বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বদলী করেন। এরূপ না হওয়াই আশ্চর্য।

(৮০) ২৮ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছে। তাহার পূর্বে ২-৪ বার মাত্র নারী সম্ভোগ হইয়াছে। তাহা ইচ্ছাপূর্বক, অপারগ হইয়া নয়। বেশী কষ্ট হইত বলিয়া মনে পড়ে না।

(৮১) উপরের উত্তর দেখুন। একটানা কয় বৎসর সম্পূর্ণ যৌন-উপবাস করিতে হইয়াছিল বলা শক্ত, তবে কয়েক বৎসর অবশ্যই।

(৮২) প্রায় ৪০ বৎসর বয়সের একটি বিধবার সহিত আমার সম্পর্কের কথা পূর্বে লিখিয়াছি। সুন্দরী যুবতী বিধবার সহিত রূপবান অবিবাহিত যুবক দেবরের সম্পর্কের কথা জানি। দুই কন্যার মাতা, গৌরাঙ্গী, তম্বী, যুবতী বিধবাকে সম্পর্কে ভগিনীপতির সহিত মিলিত অবস্থায় তাহার ভ্রাতৃবধূর দেখিয়া ফেলার কথা জানি। বাল্যকালে এক বিধবা (৩০), ভাইয়ের সহিত বিবাদ হওয়াতে, আমাদের পাশের বাড়ীতে এক ১০-১১ বছরের কন্যা ও ৫-৬ বৎসরের পুত্রসহ থাকিতেন। আমাদের সহিতও বিবাদ হওয়াতে যখন আমরা যাইতাম না, তখন একজন বাঙালী আসিতেন, সম্ভবত অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার দ্বারা তিনি গর্ভবতী হইয়া একটি সন্তান প্রসব করেন। প্রসবের পর সন্তান মারা যায়, তিনিও আফিম খাইয়া মরেন।

কয়েক সন্তানের জননী প্রায় ৪০ বছরের বাঙালী বিধবা মুসলমান টাঙ্গা-ওয়ালার (যে বাজার করিবার জন্য বাড়ীতে আসিত) সহিত গৃহত্যাগ করেন।

বিবাহ

(৮৩) কামতৃপ্তি ও সাংসারিক সুবিধার জন্য বিবাহের ইচ্ছা আমার ২৪-২৫ বৎসর বয়সে জাগে। স্ত্রী শিক্ষিতা সুরূপা ও স্বাস্থ্যবতী হইবে এ ইচ্ছা ছিল।

(৮৪) আমাদের দেশে উদ্ভট ও অনাবশ্যক বিবাহ প্রণালীর অভাব নাই। সকল সমাজেই অল্পবিস্তর আছে। এগুলি কঠোরভাবে কমাইয়া ফেলা উচিত।

(৮৫) বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি এবং শুধু অনুমতিই নয়—সাধারণ রীতি ও প্রথা থাকা নিশ্চয়ই উচিত।

(৮৬) বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে খুব জোর প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজে হওয়া উচিত। বহু বিধবাই প্রবৃত্তির তাড়নায় পদস্খলিত হইয়া পড়ে। উহাদের দোষ কি?

(৮৭) বিবাহের উপকারিতার কথা আপনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শুধু বিবাহ করিলেই চলিবে না, বিবাহকে সর্বাঙ্গীন সুখী ও মধুর করিতে হইবে। আপনার পুস্তকগুলির সার্থকতাই হইবে এই দিকে।

(৮৮) বাল্যে ও কৈশোরেই যৌন-বিষয়ে কতকটা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম উল্লেখ করিয়াছি। বিবাহ করিবার ইচ্ছাও সকাল সকালই জাগ্রত হয়। কৈশোরেই যৌন-সংসর্গও হইয়াছিল লিখিয়াছি। বিবাহ হইলে নিরবচ্ছিন্ন উপভোগের সুযোগ হইবে এই জন্যই বিবাহ-বাসনা জাগে।

(৮৯) বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনোভাব, ধারণা ও অভিরুচি উন্নত ধরনেরই ছিল—যেমনটা ঐ বয়সে হইয়া থাকে। নববধূ রূপে সংসার আলোকিত করিবে, গুণে সকলকে মোহিত করিবে, প্রেমে আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিবে, সংসার সুচারুরূপে চালাইবে ইত্যাদি।

(৯০) আমার মত লইবার বা অভিরুচি পূরণ করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তখন পুরাতনীদের প্রভাব। আমার সকল আশা-ভরসা চুকাইয়া দিয়া মা বেড়াইতে গিয়া একটি ১১ বৎসর বয়স্কা অল্পশিক্ষিতা মেয়েকে আমার হইয়া একেবারে পছন্দই করিয়া আসিলেন।

৯১) পাত্রীর সহিত আলাপ-আলোচনা দূরে থাকুক তাহাকে পূর্বে দেখিবারও সুযোগ হইল না। মা-ই দেখাশুনা আলাপ-আলোচনা করিয়া পছন্দ করিলেন। শুধু একদিনের আলাপই যথেষ্ট মনে করিলেন।

(৯২) (ক) আমার বিবাহ ২৮ বৎসরে হয়। স্ত্রী তখন ১১ বৎসরের বালিকা। বয়সের সামঞ্জস্য হয় নাই। (খ) আমার আশা-ভরসা, উচ্চ আদর্শ

সব চুকিয়া গেল। স্ত্রীর মনোভাব কি হইল জানি না, বোধ হয় বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট ধারণাই ছিল না।

(৯৩) খরচ উভয় পক্ষেই খুব সংক্ষেপ করা হয়। আমাদের ২০০।৩০০ এবং অপর পক্ষের ৫০০।৬০০ টাকার বেশী লাগে নাই বলিয়াই মনে হয়।

(৯৪) দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিবাহে বিবেচ্য ও কর্তব্য বিষয়গুলি পালন করিবার মত জ্ঞান, অবসর ও সুযোগ হইল কোথায়? বিবেচ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমার এত কথা জানাও ছিল না। রূপের বিবেচনা মা-ই করিয়াছিলেন। মোটের উপর চলনসই। গুণের বিচারের অবসর হয় নাই। বংশ ভাল। আর্থিক অবস্থা উভয় পক্ষেরই চলনসই। বয়স স্ত্রীর উপযুক্তের চেয়ে কম ছিল। মানসিক উপযুক্ততাও আশানুরূপ ছিল না। খরচাদি অতিরিক্ত কোনও পক্ষেরই হয় নাই। কুসংস্কার-মূলক অনুষ্ঠানাদি বিবাহে একেবারে হয় নাই বলিতে পারি না। গুরুজনের আশীর্বাদ, তিথি-নক্ষত্র পালন ইত্যাদি যে আমাদের কোনও মতে বিবাহিত জীবনযাত্রার সাহায্য করিয়াছে এ কথা বলিতে পারি না।

প্রিয় জীবনসঙ্গিনীর কটু আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম শুধু এই আলোচনায় সত্যকথনের তাগিদে। কিন্তু আমি নিজেই কি সমালোচনার বাহিরে? আমার স্ত্রীই যদি শিক্ষিতা, কৃষ্টিসম্পন্না হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইতেন তাহা হইলে তাঁহারও যে স্বামী হিসাবে পাইবার যোগ্য পাত্র আমা অপেক্ষা শ্রেয় হইত না তাহা কে বলিতে পারে?

(৯৫) বংশ, রক্ত, কুল, ধর্ম, কোষ্ঠী ও শুভলগ্নের প্রতি আমার বিশ্বাস কোন কালে ছিল না, যাহাদের আছে তাহাদের এই পুস্তক পড়িয়া কমিলেও একেবারে দূরীভূত হইবে না। "Superstion dies hard."

(৯৬) জাতিধর্ম-নির্বিশেষে শুধু বিদ্যা, বুদ্ধি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মতামত, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, আত্মীয়-পোষণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেকটা সাম্য এবং ভাল স্বাস্থ্য, বর্ণ, চেহারা, গড়ন ও স্বভাব দেখিয়া বিবাহের আমি পক্ষপাতী। বিবাহে জাতি-ধর্মের বিচার না করিলে আপনিই ঐ সব বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ কমিবে।

উপসংহার

ব্যভিচার প্রায় সার্বজনীন; আবশ্যক—উদারতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রণালীর প্রসার। কেহ যেন মনে করেন না যে, এই উত্তরগুলিতে যাঁহাদের কথা বলা

হইয়াছে তাঁহারা জনসাধারণ অপেক্ষা বেশী কামুক দুর্বৃত্ত! যৌন-আবেগ ক্ষুধাতৃষ্ণার মতই স্বাভাবিক। প্রকৃতি তাহার ক্ষেত্রের সীমা নির্দেশ করে নাই। অমুক অমুক সম্পর্কে বা অবস্থায় দৈহিক মিলন হইবে না, ইহা মানুষের গড়া নিয়ম। বিভিন্ন দেশে, যুগে ও সমাজে এইরূপ নিয়ম ভিন্ন প্রকার। মানুষের তৈয়ারী নিয়মের উপর প্রকৃতির নিয়ম সদাই জয়ী হইয়া থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে ইহার মাত্রা কম বা বেশী হইয়া থাকে মাত্র।

যাহাদের গোপনীয় ব্যাপারসমূহ আমরা জানিতে পারি না তাহাদের "ভাল" মনে করি! বলবতী প্রবৃত্তির কাছে মানুষ কত দুর্বল ইহা চিন্তা করিয়া অপরদের (এমন কি নিজের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতির) তথাকথিত স্খলন-পতন সম্বন্ধে উদার ভাব ও ক্ষমা অবলম্বন করা উচিত। আর অবৈধ সম্পর্কের ফলে গর্ভ হওয়াতে যাহাতে এখনকার মত নারীর আত্মহত্যা, গৃহত্যাগ, ধর্মত্যাগ, ভিক্ষা বা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন অথবা বিপজ্জনক গর্ভপাত বা ভ্রূণহত্যা না করিতে হয় সেজন্য গর্ভ নিবারণের উপায়সমূহের বহুল প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আপনার মতই যৌনবিজ্ঞানের তথ্যাহরণে আমিও আজীবন তৎপর রহিয়াছি! যৌনবিজ্ঞান আমাদের সান্ত্বনা দিয়াছে, বহু অমঙ্গলের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। যে ভুল পিতামাতা করিয়াছেন অন্তত সে ভুল আমরা করিব না এ ভরসা আছে। আমরা জীবনের প্রান্তে। আমাদের তিক্ত-মধুর জীবন কোনও মতে কাটিয়াই গেল। এখন শুধু আশা করি, আপনার বিতরিত যৌনজ্ঞানচ্ছটায় তরুণ-তরুণীদের জীবন আলোকিত হউক, বিবাহে তাহাদের বিচার নির্ভুল হউক, বিবাহিত জীবনে তাহাদের শান্তি, সুখ, প্রেম অবাধ ও অক্ষুণ্ণ হউক।

প্রশ্নমালার উত্তর

(২)

একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা তাঁহার নিজ জীবনের কাহিনী ও প্রচুর অভিজ্ঞতা অকপটে একজন ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করিয়াছেন এবং উত্তরগুলি সেই ডাক্তার (ইনি ডাক্তার সেন নহেন, 'ডাক্তার বন্ধু') কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর উক্ত ভদ্রমহিলা লিখিতভাবে

দিয়াছেন। ভদ্রমহিলার সম্পূর্ণ বিবৃতি এবং উদাহরণগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। এই ভদ্রমহিলা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রশ্নমালারও উত্তর দিয়াছেন এবং উক্ত খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বাক্ষীর স্বরূপ

(১) মল্লিকা রায়চৌধুরী—বর্তমানে সেন। (২) ভবানীপুর, কলিকাতা। (৩) হিন্দু—খ্রীষ্টান। (৪) সাধারণ শিক্ষা—উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর মান (Class VIII Standard) পর্যন্ত। জুনিয়ার নার্সিং ও ধাত্রী-বিদ্যার ডিপ্লোমা প্রাপ্ত (Registered Nurse & Midwife)। (৫) স্ত্রী। (৬) আমি মাঝারি। আমার প্রথম স্বামী শীর্ণকায় ছিলেন, শেষের দিকে মোটা। বর্তমান স্বামী বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। (৭) স্বাস্থ্য আমার ও আমার দুই স্বামীরই মোটামুটি ভাল। (৮) আমার ক্রনিক স্যালপিঞ্জাইটিস* আছে। স্বামীর কোন দীর্ঘস্থায়ী বা সহজাত ব্যাধি নাই। (৯) আর্থিক অবস্থা মাঝারি। (১০) বাঙালী। (১১) বিবাহিতা। (১২) পেশা অতীতে ছিল হাসপাতালে নার্সের চাকুরী। বর্তমানে স্বাধীনভাবে শুশ্রূষাকারিণী ও ধাত্রীর কাজ (Professional Nurse & Midwife) করিয়া থাকি। (১৩) আমিষভোজী। (১৪) গায়ের লোম মাঝারি। (১৫) বয়স ৩২ বৎসর।

(১৬) আমি বাল্যকাল হইতেই মিশনারীদের নিকট প্রতিপালিত। যৌনজ্ঞান লাভের আবহাওয়া সেখানে খুবই কম। ১২-১৩ বৎসর বয়সের পূর্বে কোন জ্ঞানই ছিল না। ঐ বয়সে সঙ্গিনীদের নিকট শুনিয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলন সম্বন্ধে কিছু কিছু অস্পষ্ট ধারণা হয়। ঐ বয়সেই একজন বিবাহিতা মহিলার (২৪) নিকট শুনিয়া অধিকতর জ্ঞানলাভ হয়।

(১৭) শৈশবে ছেলেমেয়ে হওয়া সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। ১২-১৩ বৎসরের সময় একটি মেয়ের নিকট শুনি যে, মেয়েদের প্রস্রাবের স্থান দিয়া ছেলে হয় ('প্রস্রাবের স্থান' বলিতে সে সমগ্র ভগাংশ বুঝাইয়াছিল)।

(১৮) যৌনবিষয়ে দৈহিক অভিজ্ঞতা (পুরুষ-সহবাস) লাভের পূর্বে এ বিষয়ে কোন কৌতূহল ছিল না, কাজেই কৌতূহল নিবৃত্তির কোন প্রশ্ন উঠে না।

---

* Chronic Salpingitis—ডিম্ববাহী (নলের Fallopian tube) এর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ। ইহা বন্ধ্যাত্বের একটি কারণ, অথচ এই ভদ্রমহিলা অনেকগুলি গর্ভধারণ করিয়াছেন। ইহার কারণ, ইহার একদিককার ডিম্ববাহী নলই ব্যাধিগ্রস্ত, অপরটি সুস্থই আছে। —ডাক্তার

(১৯) **বাল্যকালে যৌনজ্ঞান** কেবলমাত্র শুনিয়াই হইয়াছিল। ১৬নং প্রশ্নের উত্তরে যে বিবাহিতা মহিলার উল্লেখ করিয়াছি, তিনি আমাদের মিশনেই থাকিতেন। বিবাহের পর স্বামীর সহিত চলিয়া যান। কয়েক মাস পরে মিশনে বেড়াইতে আসিয়া পুরাতন বন্ধুদের নিকট আমাদের উপস্থিতিতেই সবিস্তারে তাঁহার যৌন-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়েই নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারি।

(২০) পূর্বেই বলিয়াছি যৌনবিষয়ে কখনও কোন কৌতূহল বোধ করি নাই। কাহাকেও এ সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশ্ন করি নাই।

(২১) ১২-১৩ **বৎসর বয়সে প্রথম ঋতুস্রাব** হয়। সে সময়ে যৌন-জ্ঞানের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছি।

(২২) **যৌনবিষয়ে** অনেকেব মধ্যেই, বিশেষ করিয়া মেয়েদের মধ্যে, বহু ভ্রান্ত **ধারণা ও কুসংস্কারের ছড়াছড়ি** দেখিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যৌনবিজ্ঞান সম্পর্কীয় কয়েকটি সুপ্রচলিত বহিতেও এইরূপ ভ্রান্ত মত ও কুসংস্কার প্রচার করা হইতেছে দেখিতেছি। প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা, যাহা আমার গোচরে আসিয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। আমার নিজের জ্ঞান অতি সামান্য এবং পড়াশুনাও বেশী নাই—অনেক ভ্রান্ত ধারণাও ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারি না তাহা না হইলে আরও অনেক বেশী উদাহরণ দিতে পারিতাম।

(ক) শীর্ণকায় পুরুষমাত্রেরই লিঙ্গ বৃহদাকৃতি এবং তাহারা সঙ্গমে খুব পটু হয়। হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ ঠিক বিপরীত।

মন্তব্য—কতক ক্ষেত্রে এই ধারণা সত্য হইলেও **ইহা কখনও সাধারণ নিয়ম হইতে পারে না।** আমার নিজের অভিজ্ঞতায় কিন্তু এ বিষয়ের সমর্থন পাই। আমার প্রথম স্বামী শেষের দিকে কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ও বেঁটে ছিলেন। দ্বিতীয় স্বামীর (ডাঃ সেন) শীর্ণকায় ও লম্বা। আমার প্রথম স্বামী অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গ অধিকতর স্থূল ও লম্বা এবং তাঁহার রতিক্ষমতা (ধারণশক্তিও) অনেক বেশী।*

(খ) সব পুরুষমানুষই দীর্ঘাঙ্গী ও তন্বী স্ত্রীলোক পছন্দ করে।

মন্তব্য—এ ধারণারও কোন অর্থ নাই। আমার প্রথম স্বামীরই ত অভিমত এই

* ইহার প্রথম স্বামীর লিঙ্গ খর্ব ছিল। শেষের দিকে তিনি যদিও মোটা ছিলেন পূর্বে ত শীর্ণকায়ই ছিলেন এবং তখনও অঙ্গ খর্ব ছিল। তাঁহার "রতিকাল স্থায়িত্ব কম ছিল বটে,

ছিল যে, মোটা ও খর্বকায়া স্ত্রীলোকের সহিত রমণে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়।

(গ) "পুরুষের মূত্র বাহির হয় পুরুষাঙ্গের মধ্যপথ দিয়া এবং বীর্য বাহির হয় দুইধারের পথ দিয়া।" (ভুল ধারণা)।

(ঘ) "মস্তিষ্ক বলিতে যাহা বুঝায় সেই জিনিস মেরুদণ্ডের সংলগ্ন পথ দ্বারা উত্তেজনা হওয়া মাত্র বীর্য আকারে আসিয়া অণ্ডকোষে জমা হয় এবং পরে সময়মত ক্ষরণ হয়।" (ভুল ধারণা)।

(ঙ) "শুক্লপক্ষে বামদিকের অণ্ডকোষে অধিক বীর্য সঞ্চিত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষে ডানদিকের অণ্ডকোষে অধিক বীর্য সঞ্চিত হয়।" (ভুল ধারণা)।

(চ) ঋতুকালে সহবাস করিলে জরায়ুসংক্রান্ত রোগ হয়। দিবাভাগে সহবাসও বিশেষ অনিষ্টকর।

মন্তব্য—আমার নিজের ঋতুস্রাবকালে সহবাস হইয়াছে এবং দিবাভাগে সহবাস ত একরূপ নিয়মিত ব্যাপার ছিল। কোন অনিষ্ট হয় নাই।

(ছ) পুরুষ নীচে ও স্ত্রী উপরে থাকিয়া বিহার করিলে পুরুষের পাথুরী বা মূত্ররোগ দেখা দেয়, এবং স্ত্রীলোকের গর্ভজ সন্তান বিকলাঙ্গ হয়।

মন্তব্য—আমি বহুবার এরূপভাবে সহবাস করিয়াছি। স্বামীর কোন রোগ হয় নাই। কোন সন্তানই বিকলাঙ্গ হয় নাই।*

(জ) যৌনমিলনের একমাত্র নিয়ম স্ত্রী উত্তানভাবে নিশ্চল হইয়া শুইয়া থাকিবে, স্বামী উপর হইতে মিলিত হইবে এবং সম্পূর্ণ সকর্মক অংশ গ্রহণ করিবে। স্বামীর স্খলন হইয়া গেলেই বিযুক্ত হইয়া একেবারে পাশ ফিরিয়া (স্বামী হইতে যতটা দূরে সম্ভব) শুইতে হইবে। অন্যভাবে সহবাস হওয়া পাপ ও নানাবিধ স্ত্রীরোগের কারণ।

মন্তব্য—আমার ত অসংখ্যবার অন্যভাবে সহবাস হইয়াছে। পাপ হইয়াছে কিনা জানি না, তবে ইহার জন্য কোন রোগ হয় নাই।

---

* কিন্তু রতিক্ষমতা যথেষ্ট"—স্ত্রীর সহিত নিয়মিত সহবাস চলিত, তৎসত্ত্বেও বিবাহেতর যৌন মিলনে রীতিমত অভ্যস্ত ছিলেন। ভদ্রমহিলার উক্তি হইতে জানা যায় যে "একরাত্রে একাধিক সঙ্গমে" (৪-৫ বার পর্যন্ত) স্বামীর চটক পক্ষীর ন্যায় পটুটা ছিল। (২২) (প) মন্তব্য দেখুন। দেখা যাইতেছে যে অঙ্গের ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলার স্বামীর যৌনবাসনা ও রতিক্ষমতা সাধারণ পুরুষ অপেক্ষা বেশী ছিল।—ডাক্তার।

* (উত্তরদাত্রীর ঋতুস্রাবকালীন, দিবাভাগে সাধারণ আসন ভিন্ন অন্য আসনে এবং সকর্মকতা সহকারে (স্বামীদের সহিত) সহবাসের পূর্ণ বিবরণ ২য় খণ্ডের প্রশ্নমালা উত্তরে (৫১) (ক) ৫৪ ৬০, ৬৮ প্রভৃতি উত্তর বর্ণিত হইয়াছে।)

(ঝ) ঋতুর প্রথমদিন হইতে গণনা করিয়া জোড় দিনের সহবাসে গর্ভ হইলে পুত্রসন্তান, বিজোড় দিনে গর্ভাধান হইলে কন্যাসন্তান হয়। (ভুল ধারণা)

(ঞ) পুরুষের রতিক্ষমতা বেশী থাকিলে কন্যা এবং স্ত্রীর কাম বেশী হইলে পুত্র হয়। (ভুল ধারণা)

(ট) "যৌনমিলন কালে স্ত্রী অত্যধিক উত্তেজিত হইয়া পড়িলে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ একেবারে জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করে।" (ভুল ধারণা)

(ঠ) "কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভ হওয়ার পরও ঋতু দেখা দেয়। ইহাতে গর্ভিণী মনে করে যে, তাহার গর্ভ হয় নাই এবং পূর্বের ন্যায় আবার সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতেই পুনরায় গর্ভ হইয়া যমজ সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে।" (ভুল ধারণা)

(ড) পুত্রসন্তান গর্ভের ডানদিকে এবং কন্যাসন্তান বামদিকে থাকে। (ভুল)

(ঢ) "মাসে এক বছরে বারো, এর যত কমাতে পারো।" (ভুল)

(ণ) স্বপ্নদোষ বা স্বয়ংমৈথুন অত্যন্ত লজ্জাজনক ও ক্ষতিকর ব্যাপার। এই সমস্ত রোধ করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা উচিত। (ভুল)

(ত) মস্তিষ্কই বীর্য [উপরের (ঘ) দেখুন], অতএব রতিক্রিয়া (অথবা শুক্রক্ষয়) যত কম হইবে পুরুষের পক্ষে ততই মঙ্গল। (ভুল)

(থ) দম্পতি যদি নিঃসন্তান হয়, তবে সম্পূর্ণ দোষ স্ত্রীর অর্থাৎ স্ত্রীই বন্ধ্যা। পুরুষ নির্দোষ।* (ভুল)

(দ) স্ত্রীলোকের মুখের "হাঁ" যত বড় তাহার যোনিনালী তত গভীর ও যোনিমুখ তত প্রশস্ত। (ভুল)

(ধ) খড়মপেয়ে মেয়ে অসতী হয়। (ভুল)

(ন) পুরুষের লিঙ্গে তিল থাকিলে সে অত্যন্ত কামুক হয়। (ভুল)

(প) নারীকে বশ করিতে হইলে পুনঃপুনঃ সঙ্গম করা দরকার। (ভুল)

মন্তব্য—মিলনের পৌনঃপুনিকতায় প্রথম স্বামীর সহিত খুব কম লোকেরই তুলনা হয়। প্রথম অবস্থায় এক এক রাত্রে তিনি একবার মিলনের অল্প

* এই প্রসঙ্গে আমার একটি বিশেষভাবে জানিত উদাহরণ দিতেছি। পরবর্তী ৮২নং প্রশ্নের উত্তরে (গ) উদাহরণে যে বিধবার কথা বলা হইয়াছে, ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইঁহার বিবাহের পর ৫ বৎসর পার হইয়া গেলেও কোন সন্তানাদি হইল না দেখিয়া স্বামী ও আত্মীয় পরিচিত সকলে ইহাকে বন্ধ্যা সাব্যস্ত করেন এবং স্বামীর পুনর্বিবাহের উদ্যোগে আয়োজন চলিতে থাকে। হঠাৎ স্বামীর মৃত্যু হয়। ইনি যে বন্ধ্যা নহেন, স্বামীই বন্ধ্যা ছিলেন তাহার প্রমাণ বিধবা হইবার অনেক পরে দারোগা ভগ্নীপতি দ্বারা ইঁহার গর্ভসঞ্চার—উত্তরদাত্রী।

পরেই যেরূপভাবে পুনরায় সঙ্গম আরম্ভ করিতেন, তাহাতে চড়াই পাখার কথা মনে পড়িয়া যাইত। পর পর ৪-৫ বার মিলন ত অনেক রাত্রেই হইয়াছে। অপর পক্ষে বর্তমান স্বামী ডাঃ সেনের সহিত গড়পড়তায় সপ্তাহে ২ বার মিলন হইত কিনা সন্দেহ (অবশ্য প্রত্যহ মিলনের সুযোগও ছিল না)। প্রথম স্বামীর সহিত ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়াই থাকিত, কিন্তু ডাক্তার সেনের কাছে কুক্কুরীর ন্যায় বশীভূতা থাকি।

(ফ) কুমারী সংসর্গ করিলে গনোরিয়া সারিয়া যায়। ('মারাত্মক ভুল)

(ব) গর্ভধারণ বন্ধ করিতে হইলে ঋতু আরম্ভের ২-৩ দিন পূর্ব হইতে ঋতু শেষে অন্তত ১৬ দিন পর্যন্ত স্বামী সহবাস একেবারেই নিষেধ, **কারণ এই সময় জরায়ুর মুখ খোলা থাকে।** অন্য সময় ভয় নাই। (মস্ত ভুল)

(ভ) স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য খুব কম হইলে কন্যা বেশী হয়। (ভুল)

(ম) গর্ভিণী স্ত্রীলোকের নাভি হইতে কামাদ্রি পর্যন্ত যে কালো রেখা থাকে উহার উপরের অংশ নাভির মধ্যস্থলের ঠিক নীচে অথবা বামদিকে থাকিলে পুত্রসন্তান এবং দক্ষিণ দিকে থাকিলে কন্যাসন্তান জন্মে। (ভুল)

(২৩) ভূতপ্রেত, জিন দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকা নাই।

(২৪) আমার প্রথম ঋতুদর্শনের সময় হইতে বাহির হইতে নিজেদের অঙ্গ যাহা দেখা যায় সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণাই ছিল। ঐ সময়ে ১৬-১৭ বৎসরের একটি মেয়ের কাপড় ছাড়িবার সময় তাহার যৌনকেশ দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করি। তাহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে সে বলে, "বয়সকালে সকলেরই এ রকম হয়, তোরও হবে।" স্ত্রীলোকের পেটের ভিতর হজমের নাড়ী (Intestines) ছাড়াও একটি ছেলে হইবার নাড়ী আছে, এইরূপ শুনিয়াছিলাম।

ছোট ছেলেদের অঙ্গ যেরূপ দেখিতাম, পুরুষের যৌন অঙ্গ সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক ধারণা ছিল না।

(২৫) এই পুস্তকে পড়িবার পূর্বে পড়িয়াছি—১। বহুলপ্রচারিত 'যৌবন-পথে'; ২। সুচারু রায় প্রণীত 'যৌনকথা ও জন্মশাসন'; ৩। বর্তমান গ্রন্থকার প্রণীত 'মাতৃমঙ্গল, জন্মবিজ্ঞান ও সুসন্তানলাভ' এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ—মত ও পথ (সহজ ও সুলভ সংস্করণ)'।

(২৬) শেষোক্ত পুস্তক দুইখানিতে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই ভিত্তি এবং জনসাধারণের মধ্যে, কুসংস্কার ও শোচনীয় অজ্ঞতা দূর করিয়া,

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারই এই পুস্তক দুটির উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য যে বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে এবং হইতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার নিজেরই ত, এমন কি আমার বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়েও, এই পুস্তক দুইখানি হইতে অনেক সাহায্য হইয়াছে। 'যৌবনপথে' এবং 'যৌনকথা ও জন্মশাসন' পুস্তক দুইটি হইতে সামান্যই যৌনজ্ঞান লাভ হইয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত যৌন-আলোচনা নাই বলিলেই হয়—তথ্যে ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সুচারু রায় নিজেকে ২০ বৎসরের অভিজ্ঞা ধাত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, অথচ তিনি এরূপ সমস্ত ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন যাহা শরীরতত্ত্ব ও শারীর বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান যাহার নাই সেও লিখিবে না। ২২নং প্রশ্নের উত্তরের (গ), (ঘ), (ঙ), (ট) এইগুলি উক্ত সুচারু রায় প্রণীত 'যৌন-কথা ও জন্মশাসন' হইতেই উদ্ধৃত। আবার অনেক ভুল তথ্য খুব জোরের সহিত বলা হইয়াছে, যেমন—"অনেকে আবাব এই অণ্ডকোষ-দ্বয়কে বীর্য-উৎপাদক যন্ত্র মনে করে। ইহাও ভুল।" এই পুস্তকেই জন্মশাসনের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে আয়ুর্বেদীয় ও হেকিমীশাস্ত্রমতে সেবনের ঔষধ কতকগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এগুলি ফলপ্রদ বলিয়া ঘোষণাও করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের প্রচার বন্ধ হওয়া উচিত। এই সব পুস্তকের প্রকাশকরা পুস্তক জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে পুস্তকের সহিত কেহ বা নগ্ন নারীচিত্রের এ্যালবাম বিনামূল্যে দেওয়া হয় বলিয়া ঘোষণা করেন, কেহ বা পুস্তকের মধ্যেই নগ্ন নারীচিত্র সন্নিবেশিত করেন, এবং বিজ্ঞাপনেব জোরে প্রচাব কবেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ভাল যৌনবিজ্ঞানের পুস্তক কেহ কিনিয়া পড়ে না, কিন্তু 'যৌবনপথে' এবং এই শ্রেণীর আরও কয়েকখানি পুস্তক আশ্চর্যরকম বহুল প্রচারিত।

(২৭) এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া বাস্তবিকই অনেক কিছু নূতন জ্ঞানলাভ হইয়াছে। বহিটির শেষের চারিটি অধ্যায় যেন রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ, বিশেষত দশম (এই সংস্করণের ১৯ শ) অধ্যায়ের শেষে যে সারমর্ম দেওয়া হইয়াছে উহার সমস্তটুকুই প্রত্যেক সংসারী ও সামাজিক মানুষের মানিয়া লওয়া উচিত। আমার মনে হয় এই পুস্তকখানি জনসাধরেণের পক্ষে একটু কঠিন হইয়াছে। বহু বিষয়ে যে সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং নানা প্রকার মতবাদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলি বাদ দিয়া ঠিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া সহজ ভাষায় যদি একখানা পুস্তক বাহির করা যায়, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে অধিকতর কার্যকরী হইবে।

(২৮) আমার যৌনজীবন ত শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে এই পুস্তক-পাঠে এবং নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহা দিয়া যদি পরিচিত-পরিচিতাদের মধ্যে একজনেরও যৌনজীবনের অসামঞ্জস্য দূর করিতে পারি তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

(২৯) এই পুস্তকে উল্লিখিত কোন পুস্তকই পাঠ করি নাই।

যৌন-ইন্দ্রিয়সমূহ

(৩০) নিজের **যৌন-অঙ্গের** কোন **অস্বাভাবিকতা** নাই। নার্সের ও ধাত্রীর কাজ করিতে করিতে বহু স্ত্রী-অঙ্গ দেখিতে হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতা হইতে ধারণা হইয়াছে যে, শরীরের গঠন বা আকারের সহিত স্ত্রী-অঙ্গের আকৃতি, গভীরতা ও গঠনের কোন সম্পর্ক নাই। দীর্ঘাঙ্গী সুগঠনা স্ত্রীলোকের যেমন ক্ষুদ্রাকৃতি, চাপা ও অগভীব ভগ দেখিয়াছি, তেমনই শীর্ণা ও খর্বকায়া স্ত্রীলোকের সুগঠিত, বৃহৎ ও গভীর স্ত্রী-অঙ্গ দেখিয়াছি। এগুলিকে অস্বাভাবিক বলা ঠিক হইবে না, কারণ স্ত্রীলোকের চেহারার সহিত তাহার ভগের আকৃতির এই সামঞ্জস্যহীনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে।

(ক) একটি যুবতীর (২২) অস্বাভাবিক লম্বা ভগাঙ্কুর দেখিয়াছিলাম। (পরবর্তী ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন)।

(খ) স্বামী সহবাসে অভ্যস্তা একটি বিবাহিতা মেয়ের (২৭) অক্ষত সতীচ্ছদ দেখিয়া অবাক হই। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখি তাহার সতীচ্ছদ অত্যন্ত সম্প্রসারণশীল। আমাব হাতের দুইটি অঙ্গুলী অতি সহজেই প্রবেশ করিল, আঙ্গুল বাহির করিতেই সতীচ্ছদ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

(গ) আর একটি মেয়ে (১৭-১৮) লঘুভগোষ্ঠ এত বড় ছিল যে, ভগের ফাটলে বাহিরে ঝুলিয়া থাকিত।

(ঘ একবার একটি মেয়েকে দেখিবার ডাক পড়ে। মেয়েটির বয়স ১৮ বৎসর। এই পর্যন্ত প্রথম ঋতুদর্শন হয় নাই। ৪ বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। স্বামী সহবাসে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে বলিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহে না। ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, তাহার যোনিনালী অগভীর ও অপ্রশস্ত, জরায়ু ক্ষুদ্রাকৃতি এবং স্তনও অপরিণত।*

* মেয়েটির যৌন-অঙ্গসমূহের, শিশু-সুলভ অবস্থা না হইলেও; খুবই অপরিণত অবস্থা ছিল। হরমোন (Hormone) চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসা আরম্ভের ৩ মাসের মধ্যে প্রথম রজোদর্শন হয় পঞ্চম মাস হইতে ঋতুস্রাব নিয়মিত আরম্ভ হয়। এই সময় তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো হয়। ইহার বৎসর খানেকের মধ্যেই সে গর্ভবতী হয়। —ডাক্তার।

(ঙ) একটি ইউরোপীয় মহিলার (২৬-২৭) যৌনকেশের অস্বাভাবিক বিরলতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাঁহাব কামাদ্রির উপর সামান্য কয়েকগাছি ছোট ছোট ও পাতলা কেশ ভিন্ন ভগদেশে আর কোথাও কোন কেশ ছিল না। অথচ ইহার শারীরিক গঠন ও অঙ্গসমূহের পরিণতি এবং দাম্পত্য-জীবন স্বাভাবিকই ছিল।

(চ) একটি ৬-৭ বৎসরের বালকের প্রায় বয়স্ক পুরুষের ন্যায় বৃহৎ পুরুষাঙ্গ দেখিয়াছিলাম।

(ছ) অল্প দিন পূর্বে একটি মহিলাকে (৩০-৩২) দেখিতে যাই। তিনি বলেন যে, তাঁহার এক মেয়ের প্রসবদ্বার নাই, কি করা যায়? পরীক্ষা করিয়া মনে হইল মেয়েটির (৮) শক্ত ও নিশ্ছিদ্র সতীচ্ছদ তাহার যোনিমুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অপারেশনের উপদেশ দিলাম।

যৌনবোধ

(৩১) ১৯ বৎসর বয়সে নিয়মিত পুরুষ সহবাস আরম্ভেব পূর্বে সেরূপ কিছু **যৌনবোধ** ছিল না। **স্বেচ্ছাকৃত যৌন-আচরণও** কিছু ছিল না। যদিও নিয়মিত যৌনমিলন চলিত, আমার দিক হইতে তাহার জন্য কোনরূপ চেষ্টা বা আগ্রহ প্রদর্শন ছিল না।

(৩২) আমার **ঋতুস্রাব আরম্ভের পূর্বে** কোন **যৌনবাসনা** ছিল না বা কোনরূপ উত্তেজনা হইত না। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ সংসর্গে প্রথম চরমানন্দ লাভের পূর্বে পর্যন্ত কোন যৌনবাসনাই ছিল না।

(৩৩) ১৭ বৎসর বয়সে প্রথম একজন পুরুষের প্রতি **যৌন আকর্ষণ অনুভব** করি। বিবরণ—(ক) ঐ বয়সে যে হাসপাতালে ট্রেনিংয়ে ছিলাম সেখানকার একজন চোখের ডাক্তারের (২৮-২৯) সহিত আলাপে আলাপে প্রণয় জন্মে। ৩-৪ মাস তাঁহার সহিত পূর্বরাগ (courtship) চলে, পরে বিবাহ স্থির (engagement) হয়। তাঁহার চাকুরী পাকা হইলেই বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির হয়। প্রতি রবিবারে গীর্জায় যাওয়া-আসার সময় ভিন্ন **নির্জনে সাক্ষাতের** সুযোগ কমই হইত। নির্জনে একত্র হইলেই চুম্বন-আলিঙ্গন ত করিতই, শেষের দিকে বক্ষ-প্রচাপনও শুরু হয়; বিবাহ স্থির বলিয়া ইহাতে কোন বাধা দিতাম না। এ সমস্ত **ভালই লাগিত**। তিনি ইহার বেশী অগ্রসর হইবার চেষ্টা কখনও করেন নাই, আমারও যৌনমিলনের বিন্দুমাত্র কল্পনাও কখন মনে আসিত না। এমন কি বিবাহ হইলে যে তাঁহার সহিত

ঘনিষ্ঠ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে এ চিন্তাও কখনও মনে আসে নাই। অথচ তাঁহার প্রতি যে যৌন-আকর্ষণ ছিল তাহার প্রমাণ, তাঁহার সঙ্গ পাইতে খুব ইচ্ছা হইত এবং তাঁহার আদর-সোহাগ চুম্বন-আলিঙ্গন প্রভৃতি খুব ভাল লাগিত—বিবাহ সম্ভব হয় নাই, কিছুদিন পরে ঘটনাচক্রে আমাকে বাধ্য হইয়া অন্যত্র যাইতে হয়। তাহার সহিত আর কোন প্রকারের যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নাই।

পরবর্তী যৌন-আকর্ষণ-অনুভবের পাত্র ও ঘটনার বিবরণ নীচে পর পর দেওয়া হইল—

(খ) আমার স্বামীর বিবাহের তিন মাস পূর্বে হইতেই যৌন-মিলন আরম্ভ হয় [৩১ নং এর ৩৬ নং এর (ঙ) এবং ৫৩ নংপ্রশ্নের উত্তর দেখুন]। প্রথম কয়েকদিন পর পর মিলনে যখন সত্যকার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম, তখন হইতে তাঁহার প্রতি আমি (১৯) কিছুটা যৌন আকর্ষণ অনুভব করিতাম।

(গ) বিবাহ এবং প্রথম সন্তানের জন্মের পর মফস্বল শহরে এক হাস-পাতাল কাজ করিবার সময় সেখানকার এক ডাক্তারের ছেলের (২৩) প্রতি আমি (২১) সামান্য আকৃষ্ট হই। ছেলেটি প্রিয়দর্শন ও স্বাস্থ্যবান ছিল—তাহার সুন্দর চেহারার জন্যই তাহার প্রতি আকর্ষণ বোধ করিতাম। সে নানাভাবে আমার সহিত আলাপের চেষ্টা করিত এবং আমাকে দেখিলেই ইশারা-ইঙ্গিত করিত। আমি দুই একদিন তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিয়াছিলাম। ইহাতে তাহার সাহস হয় এবং একদিন নির্জনে আমাকে পাইয়া জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করে। তাহাতে কিছু না বলাতে সাহস বাড়ে এবং একদিন বক্ষে হস্তার্পণের চেষ্টা করে। তাহাতে বাধা দিই এবং চুম্বন-আলিঙ্গনের বেশী অগ্রসর হইতে কখনও দিই নাই। এইরূপ কতদিন চলিত বলা যায় না, কিন্তু একদিনকার একটি ঘটনায় তাহার প্রতি আকর্ষণ ঘৃণায় পরিণত হয়। ঘটনাটি এই—

হাসপাতাল সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে তাহাদের কিছু আসবাবপত্র ছিল। সে মাঝে মাঝে সেইগুলি দেখাশুনা করিবার অজুহাতে সেই ঘরে আসিত। ঐ ঘরটিই আমাদের দেখা-সাক্ষাতের স্থান ছিল। একদিন ডিউটিতে থাকাকালীন তাহাকে ঐ ঘরে জানালা দিয়া দেখিতে পাইয়া একটি ছুতা করিয়া সেদিকে গেলাম। ঘরে ঢুকিতেই দেখি সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হস্তমৈথুন

করিতেছে। আমাকে দেখিয়া লজ্জা পাওয়া বা নিবৃত্ত হওয়া দূরের কথা, এই বলিয়া আমার সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিল যে, সে আমার সহিত মিলনে জন্য ব্যাকুল এবং আমাকে না পাওয়াতেই ঐভাবে উত্তেজনার শান্তি করে। আমার ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং তখন হইতে সর্বপ্রকারে তাহাকে পরিহার করিয়া চলিতাম।

(ঘ) সত্যকার **তীব্র যৌন-আকর্ষণ** এবং প্রকৃত আপনঢালা প্রেম অনুভব করি একজন ডাক্তারের প্রতি, আমার ২৪ বৎসর বয়সে। এই কাহিনীতে তাঁহাকে ডাঃ সেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তিনি (৩৪ ৩৫) ছিলেন নিঃসন্তান ও মৃতদার—কলিকাতায়ই প্র্যাকটিস করিতেন। আমার ডবল নিউমোনিয়া হয়, তখন আমার বাসায় একটি ঝি ও দুইটি শিশুসন্তান ভিন্ন আর কেহ ছিল না, স্বামী বিদেশে ছিলেন ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে। হাসপাতালের পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া ডাঃ সেনকে ডাকিয়া পাঠাই। ডাঃ সেন সমস্ত দেখিয়া যাবতীয় ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। তাঁহার অক্লান্ত সেবা-যত্ন ও চিকিৎসায় সে যাত্রা আমার জীবনরক্ষা হয়। অসুখের বাড়াবাড়ির সময় মাঝে মাঝে মনে হইত ডাঃ সেন যাহা করিতেছেন কিছু দিয়াই ইহার প্রতিদান সম্ভব নহে। **এই কৃতজ্ঞাবোধ ক্রমে ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়।** আমার অসুখ ভাল হইবার পরও আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে ডাঃ সেন প্রত্যহই আসিতেন এবং অনেকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব করিতেন, এ সময় আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই তাহাকে বলি এবং তাঁহার বিষয়ও অনেক জানিতে পারি—জানিতে পারি যে পুনর্বিবাহের ইচ্ছা তাঁহার হয় না, স্ত্রীর স্মৃতি তিনি ভুলিতে পারেন না, অথচ বিবাহেতর যৌনমিলনকে আন্তরিক ঘৃণা করেন, ফলে কামাবেগ হইলে অত্যন্ত কষ্ট পান। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি তাঁহার কষ্ট আমি দূর করিব। শরীর কিছু সবল হইবার পর একদিন, দ্বিপ্রহরে ডাঃ সেনের বাসায় যাই। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া নানাভাবে প্ররোচিত করার পর তিনি আমাকে গ্রহণ করেন। **স্বেচ্ছায় ভালবাসিয়া দেহদান** আমার জীবনে এই প্রথম। বরাবরই আমার নীতিজ্ঞান ও সতীত্ব-বোধ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু এক্ষেত্রে **বিবাহেতর যৌনমিলনেও নিজেকে অসতী বলিয়া কখনও মনে হয় নাই।** পরে ডাঃ সেন আমাকে বিবাহ-সূত্রে গ্রহণ করিয়া ধন্য করিয়াছেন। তিনিই আমার বর্তমান স্বামী [৬৩ নং প্রশ্নের উত্তরে (খ) দেখুন]।

(৩৪) আমার সর্বাপেক্ষা প্রবল যৌন-অনুভূতির স্থান—(১) ভগাঙ্কুর এবং (২) ভেষ্টিবিউল (Vestibule)।* তাহার পর অনুভূতির তীব্রতা অনুযায়ী যথাক্রমে—(৩) স্তনবৃন্ত ও স্তন, (৪) ঠোঁট, (৫) ভগদেশ ও যৌনি-পথ, (৬) তলপেট ও কুঁচকী, (৭) উরু ও নিতম্ব এবং (৮) কপোল।

(ক) প্রসঙ্গক্রমে পরিচিতা এক ভদ্রমহিলায় * যৌনপ্রদেশগুলিও অনুভূতির তীব্রতা অনুযায়ী লিখিতেছি।—(১) ভগাঙ্কুর, (২) ক্ষুদ্রোষ্ঠ, (৩) যোনি-নালী ও যোনিমুখ, (৪) কামাদ্রি ও বৃহদোষ্ঠ (৫) স্তন ও স্তনবৃন্ত, (৬) জিহ্বা (৭) ওষ্ঠ ও কপোল এবং (৮) বগল তলপেট, উরু ও নিতম্ব।

(৩৫) উত্তেজনার সময় অশ্লীল ছবি দেখিতে বা অশ্লীল কথাবার্তা শুনিতে ভাল লাগে, অন্য সময়ে ভাল লাগে না। পশুপক্ষীর মিলনদৃশ্য দেখিতে ভালও লাগে না ঘৃণাও হয় না।

(৩৬) অনেকেই আমার প্রতি যৌন-আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। আমি যদিও কৃষ্ণাঙ্গী তবু আমার মুখ সুশ্রী সুন্দর, দেহ সুগঠিত ও কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট বলিয়াই অনেকে মনে করেন। দুইটি সন্তানের জন্মের পরও নাকি প্রায় ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার স্তন সু-উন্নত ছিল। অনেকের মুখেই শুনিয়াছি আমার চেহারা নাকি যৌন-উত্তেজক (Sex-appealing)। বোধ হয় সেই জন্যই জীবনে যত পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি প্রায় সকলেই আমার প্রতি যৌন-আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন এরূপ প্রমাণ পাইয়াছি। কেবল কি পুরুষই? নারীরও আমার প্রতি যৌন-আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। সবগুলির উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নহে, পর্যায়ক্রমে কয়েকটিমাত্র দিব।

(ক) একজন ইউরোপীয় সিস্টার (২৪) আমার (১৬) প্রতি তীব্র যৌন-আকর্ষণ অনুভব করিতেন। কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহার সহিত সমঃমৈথুনে

---

* Vestibule of the vagina—ভগোষ্ঠদ্বয়ের ফাঁকে স্থানটি। ইহা সম্মুখে উপরে ভগাঙ্কুর, দুইপার্শ্বে ক্ষুদ্রোষ্ঠ এবং নিম্ন-পশ্চাতে যোনিমুখ দ্বারা বেষ্টিত। এইস্থানে মধ্যস্থলে মূত্রদ্বার (Urinary meatus) অবস্থিত।—ডাক্তার।

আমার এই জায়গায় যৌন-অনুভূতি যে এত প্রবল ইহার প্রমাণ আনিতে পারি ডাঃ সেনের শৃঙ্গারকালীন।—উত্তরদাত্রী।

* এই ভদ্রমহিলার নিকট হইতেও তথ্য পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী ৫৫নং প্রশ্নের উত্তরে (চ) এবং ৬০নং প্রশ্নের উত্তরে (গ) উদাহরণে; এই পুস্তকের ২য় খণ্ডের প্রশ্নমালার উত্তরে (৪৫, ৪৭, ৫১, ৫৮ ইত্যাদি) এবং [illegible] প্রশ্নমালার উত্তরে এই ভদ্রমহিলার অভিজ্ঞতার বিবরণ ও নিজ বিবৃতি দেখুন।

অংশগ্রহণ করিতে হয়—প্রকৃতপক্ষে আমাকে তাঁহার নির্দেশমত তাহার তৃপ্তিসাধন করিয়া দিতে হইত। (পরবর্তী ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।)

(খ) জনৈক চোখের ডাক্তার। [৩৩নং প্রশ্নের উত্তরে (ক) দেখুন।]

(গ) মিশন হাসপাতালের একজন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার (৪৫) আমার (১৮) প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে আরম্ভ করেন। তাহার মতলব বুঝিতে পারিয়া সাবধান হই। কিন্তু একদিন সুযোগ পাইয়া তিনি নির্জনে আমাকে চাপিয়া ধরেন ও মিলিত হইবার উপক্রম করেন। ছাড়া পাইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে থাকি। হঠাৎ তাঁহার বীর্যপাত হইয়া যায় এবং আমি রেহাই পাই। আর একদিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। সেদিন আমাকে এরূপ অতর্কিতে আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, এবার আর আত্মরক্ষা করিতে পারিব না ভাবিয়া ভয় হয়। পরে এই মনে করিয়া সাহস হইল যে, কিছুক্ষণ কোনরকমে বাধা দিতে পারিলেই তাঁহার আর কোন ক্ষমতা থাকিবে না, হইলও ঠিক তাহাই। তাহার পর হইতে তিনি আর কোনদিন আমাকে বিরক্ত করেন নাই।

(ঘ) ঐ হাসপাতালেই একজন বাঙালী ডাক্তার (৩০) কয়েকবার আমার নিকট কু-প্রস্তাব করেন। একদিন সুযোগ পাইয়া আমার (১৮) হাত চাপিয়া ধরিতেই খুব গালাগালি দিই। সেই দিন হইতে তিনি নিরস্ত হন।

(ঙ) অপর এক হাসপাতালে কাজ করিবার সময় একটি রোগিণীর আত্মীয় (৩১-৩২) ছলে ছুতায় আমার (১৯) সহিত আলাপ আরম্ভ করেন। রোগিণী প্রায় দুইমাস হাসপাতালে ছিল, এই দুই মাসের মধ্যে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার ব্যবহারে ও কথাবার্তায় তাঁহাকে খুব সুন্দর স্বভাবের ও স্বচ্চরিত্র লোক বলিয়া আমার ধারণা হয়। আমাকে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারেন না, আমার কথাবার্তা শুনিতে ও আমাকে দেখিতে তাঁহার খুব ভাল লাগে, আমাকে তিনি খুব ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন ইত্যাদি সর্বদাই বলিতেন এবং নানাপ্রকার কাল্পনিক দুঃখের কাহিনী (তখন অবশ্য এগুলিকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতাম) বলিয়া আমার সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার রোগিণী হাসপাতাল হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও তাঁহার যাতায়াত চলিতে থাকে। তাঁহার অভিসন্ধি আমি কোনদিনই বুঝিতে পারি নাই, ফলে আমিও তাঁহাকে কিছুটা ভালবাসিয়া ফেলি। গোপনে প্রায়ই রাত্রে আমার ঘরে আসিতেন ও প্রণয় নিবেদন করিতেন। একঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। এই সময় চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে

আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম ইহাতে বাধা দিতাম, তাহাতে বড় কাতর হইয়া পড়িতেন। প্রচুর সুযোগ পাইয়াও—রাত্রে পাশাপাশি একশয্যায় শুইয়া কতদিন গল্পগুজব করিয়াছি—কোনদিন মিলনের উপক্রম করেন নাই বা ঘুণাক্ষরেও সে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার উপর অসম্ভব বিশ্বাস জন্মে বলিয়া তাঁহার আদর সোহাগ প্রভৃতিতে আর বাধা দিতাম না। প্রায় ৬ মাস এইরূপ চলে, এই ৬ মাস কাল আমার ঘনিষ্ঠ দৈহিক সংস্পর্শ পাইয়াও মিলিত হইবার চেষ্টা কখনও করেন নাই।* এইরূপে আমার মনে যে বিশ্বাস ও প্রণয়ের উৎপত্তি হইল তাহার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করিলেন। এক রাত্রে পনোন্মত্ত অবস্থায় আসিয়া আমার ঋতুস্রাবের মধ্যে বলপ্রয়োগে আমার কৌমার্য হরণ করিলেন—বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল (পরবর্তী ৫৩নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন)। পরে ইহার সহিতই আমার বিবাহ হয়। ইনিই আমার প্রথম স্বামী ছিলেন।

(চ) বিবাহের অল্প কিছুদিন পূর্বে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য এক ভদ্র পরিবারে আশ্রয় লই। ঐ বাড়ীর একটি ১৭-১৮ বছরের ছেলে প্রায়ই আমার কাছে কাছে ঘুরিত এবং ছলে ছুতায় আমার স্পর্শলাভের চেষ্টা করিত। পরীক্ষা করিবার মানসে একদিন মাথা ধরিয়াছে বলিয়া তাহাকে আমার মাথা টিপিয়া দিতে বলি। সে সানন্দে আমার পাশে বসিয়া মাথা টিপিতে আরম্ভ করে, মাঝে মাঝে তাহার এক হাত যেন অসাবধানেই আমার বক্ষের দিকে নামিয়া আসিতেছিল। আড়চোখে তাকাইয়া দেখি, সে এক দৃষ্টে আমার আবৃত বক্ষের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহাকে আর প্রশ্রয় দিই নাই, সেও বেশী অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই।

(ছ) ৬৩নং প্রশ্নের উত্তরে (গ) দেখুন।

(জ) মফস্বল শহরের এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রীকে দেখাবার অজুহাতে প্রায়ই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং গাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার হাবভাব ভাল বোধ হইত না বলিয়া শেষের দিকে গাড়ী পাঠাইলেও আর যাইতাম না। একদিন তাঁহার স্ত্রীর প্রসববেদনা উঠিয়াছে বলিয়া আমাকে জরুরী কল দেন। আমি তৎক্ষণাৎ গিয়া হাজির হই। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়া কোথাও কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া

* এই আপাত প্রতীয়মান সংযমের রহস্য ৫৩ নং উত্তরের পাদটীকায় দেখুন।

ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় অতর্কিতে আসিয়া তিনি পিছন হইতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কুপ্রস্তাব করেন এবং স্বীকৃত না হইলে আমার মুক্তি নাই, কেহ আমাকে রক্ষা করিতে আসিবে না ইহাও জানান—বাড়ীর সকলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া কাকুতি মিনতি আরম্ভ করি এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিব, এখন আমার ঋতুস্রাব চলিতেছে এই সব বলিয়া নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করি। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন এবং কয়েকদিন পর আবার তাঁহার নিকট আসিব, এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া কিছুক্ষণ চুম্বন-আলিঙ্গনের পর ছাড়িয়া দেন। ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁহার সম্মুখীন হই নাই।

(ঝ) এক পুলিসের দারোগার স্ত্রীর প্রসবকার্যের জন্য এবং তাহার পূর্বে ও পরে কয়েকদিন যাইতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় ইনি একপ্রকার তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাতেই তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন—স্ত্রীকে উদাসীন বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, "পুরুষমানুষ ওসব করবেই, বাধা দিয়ে ত কোন লাভ নেই। তার যা করবার বাইরে বাইরে করবেই, মাঝখান থেকে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি, তাই আমি কিছু বলি না।" যাই হোক্, দারোগাবাবুকে আর বেশী অগ্রসর হইবার সুযোগ দিই নাই।

(ঞ) উক্ত শহরেরই এক অবস্থাপন্ন মুসলমান ভদ্রলোকের (৩৫-৩৭) স্ত্রীর অসুখে সেবার জন্য কয়েকদিন তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হয়। অর্থ, বস্ত্র ও অলঙ্কারের প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে তাঁহার 'সাময়িক স্ত্রী' বানাইতে চাহেন। "ওসব বললে আর আসব না আর ডাক্তারবাবুকে সব বলে দেব" বলাতে নিরস্ত হন।

(ট) স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণের প্রথম অবস্থায় এক ডাক্তারবাবুর (৫০-৫২) সহিত পরিচয় হয়। কয়েকবার রোগী দেখাইতে তিনি আমাকে (২৩-২৪) তাঁহার গাড়ী করিয়া লইয়া যান। গাড়ীর মধ্যে সুযোগ পাইলেই বলপূর্বক আমার বক্ষে হস্তার্পণ করিতেন। লোকলজ্জার ভয়ে চীৎকার করিতে পারিতাম না। তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া দিব, আমার স্বামীকে জানাইব প্রভৃতি কথায় তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। তিনি মোটেই ভয় পাইতেন না। পরে বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত যাওয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহাতে অবশ্য আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, কারণ তাঁহার মধ্যস্থতায় বহু কাজ পাইতাম।

(ঠ) আমার জীবনে যত পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাহার মধ্যে উল্লেখ-

যোগ্য ব্যক্তিরূপ একজনের কথাই বলা চলে। ধনী যুবক (২৮-৩০), কার্যসূত্রে পরিচয়; পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। বহু বিপদে-আপদে ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অযাচিতভাবে সাহায্য করিয়াছেন; তাহার সুযোগ লইবার চেষ্টা কখনও করেন নাই। বহু সুযোগ পাওয়া সত্বেও আমার সহিত কোনরূপ যৌন-আচরণের চেষ্টাও তাঁহার কখনও দেখি নাই। অথচ নিঃসংকোচে প্রকাশ্যেই বলিতেন যে আমাকে তাঁহার খুব ভাল লাগে। আমার স্বামী সন্দেহ করিতেন যে ইঁহার সহিত আমার যৌন-সম্পর্ক আছে, অথচ প্রকাশ্যে ইঁহার খুব খোশামোদ করিতেন স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ইনি আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, মনের দিক দিয়া খুবই নিকটসম্পর্ক ছিল—অসংকোচে সব মনের কথার আদান-প্রদান হইত। ইনি স্বীকার করিতেন যে, আমার প্রতি তাঁহার যৌন-আকর্ষণ আছে। কিন্তু যৌন-আকর্ষণ থাকিলেই যে যৌন-আচরণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাঁহার স্ত্রীর সতীত্ব যেমন তিনি চাহেন. তেমনই তাঁহারও স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকা উচিত, তাঁহার স্ত্রীর মধ্যেই তাঁহার জন্য পূর্ণতৃপ্তি রহিয়াছে ইত্যাদি বলিতেন। ইঁহার স্ত্রীও ইঁহাকে খুব বিশ্বাস করিতেন, আমাদের ঘনিষ্ঠতার বিষয় সম্পূর্ণ জানিয়াও কখনও মিথ্যা সন্দেহ করেন নাই, অথচ আমার স্বামী সন্দেহ করিতেন। যে নিজে চরিত্রহীন সে সকলকেই নিজের মত ভাবে। ইঁহার সহিত এখনও পত্রালাপ চলে, কালে ভদ্রে সাক্ষাৎ হয়—ঠিক একই প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় আছে।

(৩৭) ১৬ বৎসর বয়সের পূর্বে কোনপ্রকার ভালবাসার আদান-প্রদান হয় নাই। ঐ বয়সে এক সিস্টার [৬৩নং প্রশ্নের উত্তরে (ক) এবং ৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন] আমাকে ভালবাসেন। অল্প কিছুদিন পরে একজন চোখের ডাক্তারের সহিত প্রেমের আদান-প্রদান হয়। [৩৩(ক) উত্তর]।

(৩৮) ১২-১৩ বয়সে প্রথম ঋতুস্রাব হয়। হঠাৎ রক্ত দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। ইহা নিশ্চয়ই কোন অসুখ এই ধারণা হয়। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না দেখিয়া মিশনের একটি বয়স্থা মেয়েকে বলাতে সে সব বুঝাইয়া দেয় এবং প্যাড ইত্যাদি লইবার ব্যবস্থা শিখাইয়া দেয়।

(৩৯) ৩১নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন। বিবাহের তিন মাস পূর্ব হইতে নিয়মিত সম্ভোগ হইত। উহাতে যখন হইতে পুলকলাভ করিতে লাগিলাম তাহার পূর্ব পর্যন্ত যৌনবোধের তীব্রতা মোটেই ছিল না।

(৪০) ধনী-দরিদ্র ও তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি পার্থক্য

আছে তাহা আমার পক্ষে বলা কঠিন। তবে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহা হইতে হয়ত কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। ধনীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই বালক-বালিকা হইতে যুবক-যুবতীর মধ্যে পর্যন্ত ন্যাকামী, ছিনালী, যখন তখন অঙ্গ স্পর্শ করা (ইহাতে কোন সম্পর্ক বিচারও দেখি না), নির্জনে আলাপের সুযোগ পাওয়া এবং তাহার সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি খুবই বেশী। দরিদ্রের মধ্যে এ সমস্তের সুযোগ, অবসর বা প্রবৃত্তি কম বলিয়াই বোধ হয়। অনেক বড়লোকের বাড়ীতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে ব্যভিচারের স্রোত বহিয়া যাইতে দেখিয়াছি।

কোন কোন পরিবারে ইহাও দেখিয়াছি যে, পুরুষেরা সবাই চরিত্রহীন, মেয়েরা বাধ্য হইয়া সতী এবং পুরুষের চরিত্রহীনতা দোষের বিষয় বলিয়া মনে করে না। গরীবদের মধ্যে এতটা দেখি নাই।

(৪১) ৩০নং প্রশ্নের উত্তরে (ক) উদাহরণে যে যুবতীর (২২) কথা বলা হইয়াছে **যৌন-অঙ্গের অস্বাভাবিক আকৃতি-ভেদের সহিত যৌনবোধের সম্পর্ক** সম্বন্ধে এই একটি উদাহরণই জানা আছে। এই দীর্ঘভগাঙ্কুর বিশিষ্ট যুবতী এতই কামাতুরা ছিল যে, শুধু স্বামী-সহবাসে তাহার তৃপ্তি হইত না, অথচ তাহার মুখেই শুনিয়াছি যে তাহার স্বামী প্রতিদিনই এক বা একাধিকবার মিলিত হইতেন এবং প্রতিদিনই তাহার চরমপুলকলাভ হইত। মেয়েটি গোপনে স্বয়ংমৈথুন করিত।*

(৪২) নরনারীর রতিপ্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগের কোন অর্থই দেখি না।

(৪৩) ঋতুস্রাবের ঠিক পর পরই ৪-৫ দিন (শেষদিন হইতে গণনা করিয়া) যৌনবাসনা সামান্য বেশী হইত। ঐ কয়েক দিনের মধ্যে সহবাস হইলে আনন্দ অন্য সময়ের তুলনায় বেশী হইত এবং অল্প সময়েই চরম-পুলকলাভ ঘটিত। তবে এই সময়ে সহবাস না হইলেও বিশেষ কোন কষ্ট হইত না।

(৪৪) তিথি অনুযায়ী বাসনার তারতম্য কিছু লক্ষ্য করি নাই।

(৪৫) গর্ভকালে প্রথম ৪-৫ মাস বাদে কোনবারই সহবাস হইত না বা কোন ইচ্ছাও বোধ করিতাম না। প্রথম ৪-৫ মাসও যে বিশেষ কামাবেগ

* যুবতীর তীব্র যৌনবাসনার বিষয় ২য় খণ্ডের প্রশ্নমালার উত্তরে [৫৭ (খ)] আরও বলা হইয়াছে।

হইত তাহা নহে—স্বামী তাঁহার ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত উপগত হইতেন, কখনও ভাল লাগিত, কখনও ভাল লাগিত না।

(ক) পরিচিতা এক ভদ্রমহিলার [৩৪ (ক) দেখুন] বিবরণও এই প্রসঙ্গে জানানো উচিত মনে করিতেছি। ইহার গর্ভকালে সুতীব্র কামনার উদয় হইত। গর্ভকালে প্রথম হইতে প্রসবের আগের রাত্রি পর্যন্ত সম্ভোগ হইত। প্রতিমিলনেই অসাধারণ পুলকলাভ করিতেন এবং আঙ্গিক মিলন সংস্থাপনের মুহূর্ত হইতে শেষ পর্যন্ত সমানভাবে ক্রিয়া উপভোগ করিতেন।

যৌন-আচরণ ও সংস্পর্শ

(৪৬) **বাল্যকালে** খেলার সাথীদের (সবই মেয়ে) সঙ্গে জড়াজড়ি, হুড়াহুড়ি, চিমটি কাটা ইত্যাদি করিয়াছি বটে, কিন্তু **যৌনক্রীড়া** হিসাবে ধরা যায় এ রকম কিছু ত মনে পড়ে না।

(৪৭) ১৬ বৎসর বয়সের পূর্বে আমাকে কাহারও কামপাত্রী হইতে হয় নাই। ঐ সময়ে আমাকে সমমৈথুনে অংশগ্রহণ করিতে হয় (৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন)।

(৪৮) **স্বেচ্ছায় যৌনবাসনা** তৃপ্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই।

(৪৯ ও ৫০) **স্বয়ংমৈথুন** কখনও করি নাই।

(৫১ ও ৫২) **স্বপ্নদোষের** প্রশ্ন উঠে না।

(৫৩) ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তরে (ঙ) দেখুন। আমার জীবনের প্রথম যৌন-মিলন ধর্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে রাত্রে তিনি (ভাবী স্বামী) যখন ঘরে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বিনাবাক্যব্যয়ে আমাকে ঠেলিয়া শয্যায় লইয়া গেলেন প্রথমটা খুবই অবাক হই, কারণ এরূপ আচরণ তাঁহার কখনও দেখি নাই। ভুরভুর করিয়া মুখ দিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছে, তাহার মদ্যপানের বিষয় কখনও জানিতাম না। কিন্তু তখনও তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝি নাই। তাঁহার এরূপ আচরণের কারণ কি প্রশ্ন করাতে কোন উত্তর না দিয়া হঠাৎ যখন আমাকে বিবস্ত্রা করিবার উপক্রম করেন তখন তাঁহার মতলব বুঝিতে পারিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করি। তাঁহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে করিতে একথাও তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমার ঋতুস্রাব হইতেছে। তাঁহার প্রতি, তাঁহার পূর্ব আচরণের জন্য এবং এতদিনের ঘনিষ্ঠতার ফলে, সত্যই কিছুটা ভালবাসা জন্মিয়াছিল। ধরা পড়িলে তিনি ভীষণ শাস্তি পাইবেন

শুধু এই ভয় হওয়াতেই চীৎকার দূরের কথা, বেশী ধস্তাধস্তিও (খাটের উপর ধস্তাধস্তিতে আওয়াজ হয় বলিয়া) করিতে পারি নাই। সর্ব উপায়ে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি তখন কামোন্মত্ত এবং আমার সর্বনাশের মতলব লইয়াই আসিয়াছেন। ধস্তাধস্তি করিলে বেশী কষ্ট হয় বলিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিলাম। কিন্তু সে কী কষ্ট—কতক্ষণ পরে মনে নাই, বোধ হয় সতীচ্ছদ ছিন্ন হইবার পর এবং ঋতুরক্তের পিচ্ছিলতার জন্য শেষের দিকে কষ্ট কিছুটা কম হইল। তাঁহার কার্যসিদ্ধি করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এইরূপে ধর্ষিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আমি যাহাকে বলে 'অক্ষতযোনি কুমারী (Virgo intacta) তাহাই ছিলাম। আমার কৌমার্য গেল কিনা—বিবাহের পূর্বেই এবং পাশবিক অত্যাচারের ফলে—এই কথা ভাবি আর বুক যেন ভাঙিয়া যায়। একাকী শুইয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া সে রাত্রি শেষ হইল। আমার সতীত্ববোধ এত প্রবল যে, ভাবিলাম যে, কুমারীধর্ম হরণ করিয়াছে সে বদমাইশ হউক আর যাহাই হউক না কেন, যে প্রকারেই হউক ইহার সহিতই বিবাহিতা হইতে হইবে, নতুবা ধর্মে পতিতা হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা আত্মহত্যাই শ্রেয়।

৪-৫ দিন পর তিনি পুনরায় আসিলেন। আসিয়াই খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং এমন ভাব দেখাইলেন যে তিনি খুব অনুতপ্ত। ছয় মাসের মধ্যে কত সুযোগ পাইয়াও ত কিছু করেন নাই,* একদিন বুদ্ধির দোষে মদ খাইয়া আসিয়া একটা কুকার্য করিয়া ফেলিয়াছেন, আমাকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন ; আমি যদি তাঁহার মত অযোগ্যকে গ্রহণ করি তবে আমাকে বিবাহ করিয়া ধন্য হইবেন ইত্যাদি বলিয়া আমার মনের গ্লানি একেবারেই ঘুচাইয়া দিলেন। তাহার পর পাশাপাশি শুইয়া ভবিষ্যৎ বিবাহের কথাবার্তা ও আদর-সোহাগ চলিতে লাগিল। ক্রমে তিনি রমণোপক্রম করাতে প্রথমটা যদিও ক্ষীণভাবে বাধা দিই, কিন্তু তখন আমার প্রকৃত মনোভাব ছিল এই, যাহা হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে ; একদিন হওয়াও যা পাঁচদিন হওয়াও তাহাই, আর বিবাহ ত হইবেই। সেরাত্রে

* কিছু যে করেন নাই তাহাও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইহার জন্য তাঁহাকে মোটেই সংযম অভ্যাস করিতে হয় নাই। আমার নিকট হইতে যে উত্তেজনা লইয়া যাইতেন তাহা নিবৃত্তির জন্য কামপাত্রীর তাঁহার অভাব ছিল না। তখন এসব কিছুই জানিতাম না ; জানিলে কি আজ আমার এই অবস্থা হয়।—উত্তরদাত্রী।

পর পর ৪ বার সঙ্গম হয়। যতদূর মনে পড়ে প্রচুর স্নেহার প্রয়োগ সত্ত্বেও প্রথমবার কষ্ট পাইয়াছিলাম, পরে চতুর্থবার সামান্য আনন্দ পাই। আমার মনের প্রতিক্রিয়াতে লিখিলাম, তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে তখন ভুল বুঝিয়াছিলাম; সত্যকার মনোভাব ছিল এই—ছলে, বলে ও কৌশলে নারীসম্ভোগের যে ধারা তিনি চালাইয়াছেন, আমাকে দিয়াও সে বাসনা তাঁহার পূর্ণ হইল, এইবার কিছুদিন ভাঁওতা দিয়া উপভোগের পর কাটিয়া পড়িবেন। বিবাহ অবশ্য তিনি আমাকে করেন, কিন্তু সে মোটেই স্বেচ্ছায় নহে, বাধ্য হইয়া।

তিন মাস এইরূপ চলে। ৩-৪ দিন পর পর আসিতেন প্রায় সারারাত থাকিতেন. প্রতি রাত্রেই একাধিক মিলন হইত (২ হইতে ৫ বার)। যতবার তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিতাম তিনি একটা না একটা অজুহাত দেখাইয়া দিন পিছাইতেন (আশ্চর্য এই যে তাঁহার প্রত্যেকটি অজুহাত বিশ্বাস করিতাম; বড় বোকা ছিলাম)। শেষে গর্ভবতী হইয়া পড়িলাম. তাহার পর নানা ঘটনার মধ্য দিয়া বিবাহ হয়। কয়েকমাস পরে জানিতে পারি যে, আমার স্বামী দেবতাটি পূর্বেই বিবাহিত, প্রথম স্ত্রী ও সন্তানাদি বর্তমান, অথচ আমি জানিতাম তিনি কুমার!

(৫৪) জীবনে একজনের সহিতই সমমৈথুনে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। [৩৬নং প্রশ্নের উত্তরে (ক) দেখুন]। আমি যদিও সকর্মক অংশই গ্রহণ করিতাম, কিন্তু সমগ্র ক্রিয়াটি অপরপক্ষের তৃপ্তি সাধনের জন্য তাঁহার নির্দেশ মতই হইত।

আমার বয়স তখন ১৬ বৎসর। উক্ত সিস্টার একরাত্রে তাঁহার ঘরে আমাকে ডাকিয়া লইয়া নানা কথায় যৌন-অঙ্গের পরিচ্ছন্নতার বিষয় উত্থাপন করেন এবং যৌনকেশ মুণ্ডনের বিষয় বলেন। পরে নিজের মুণ্ডিত অঙ্গ আমাকে দেখাইয়া স্বহস্তে আমার অঙ্গ পরিষ্কৃত করিয়া দেন।* তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন; আমার মত চমৎকার মেয়ে আর দেখেন নাই; পুরুষমানুষ বড় স্বার্থপর, সেইজন্য বিবাহ করা উচিত নহে; পুরুষের নিকট যে আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে, ভালবাসার পাত্র মেয়ে হইলে তাহার নিকট হইতেও সেই আনন্দই পাওয়া যায়; এই ধরনের অনেক কথা বলিতে ও আমাকে আদর

* উক্ত সিস্টার ৪-৫ দিন পর পরই এই ভদ্রমহিলার যৌনকেশ মুণ্ডন করিয়া দিতেন। ক্রমে ইহাই তাঁহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং এখন পর্যন্ত তিনি ৬ হইতে ৯ দিন পর পরই স্বহস্তে মুণ্ডন করিয়া থাকেন।—ডাক্তার।

করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে আমাকে বক্ষের উপর লইয়া শয্যার শয়ন করিলেন। লজ্জায়, ভয়ে, কৌতূহলে ও ঘৃণায় তখন আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। তিনি যে নির্দেশ দিতেছেন তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিতেও সাহস পাইতেছি না, আবার ভাবিতেছি কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইব। নির্দেশ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নানা কামক্রীড়া এবং সর্বশেষে হাতে রবারের দস্তানা (Surgon's gloves) পরিয়া দুইটি অঙ্গুলি দিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে হইল। সেদিন প্রায় দেড়ঘণ্টা—দুই ঘণ্টা ধরিয়া সমগ্র ক্রিয়াটি চলিয়াছিল।

ইহার পর হইতে আমাদের মাসিকের কয়েকদিন এবং সাময়িক অসুখ-বিসুখের সময় ভিন্ন প্রতি রাত্রে তাঁহাকে এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় তৃপ্ত করিতে হইত। ইহা ভিন্ন সময়বিশেষে ওষ্ঠেও কপালে দংশন, উরু, তলপেট ও নিতম্বে সুড়সুড়ি প্রয়োগ প্রভৃতিও চলিত। আমার লজ্জা ও ঘৃণা ক্রমেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি আমার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে, আমাকে কাহারও সহিত মিশিতে দিতে চাহিতেন না, কাহারও সহিত কথা বলিতে দেখিলেই ঈর্ষান্বিতা হইয়া পড়িতেন। কিছুদিন পর মাঝে মাঝে উত্তেজনা বোধ করিতাম, কিন্তু ঠিক কি ধরনের উত্তেজনা বুঝিতে পারিতাম না—অঙ্গ সিক্ত হইত এবং কখনও কখনও রাত্রে ঘুম আসিত না। প্রায় এক বৎসরকাল এইরূপ চলে। এই সময়েই চোখের ডাক্তারের সহিত বিবাহ স্থির হয়। আমার পূর্বরাগের বিবরণ জানিতে পারিয়া সিস্টার আমাকে অত্যন্ত গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করেন এবং যাহাতে এন্‌গেজমেণ্ট ভাঙিয়া যায় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন—এমনই ছিল তাঁহার প্রবল ঈর্ষা। কতকগুলি কারণে পরে বাধ্য হইয়া অন্যত্র যাইতে হয় এবং এইখানেই আমার সমমৈথুন ব্যাপারের ইতি হয়।

অপরের সমমৈথুন সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনাই জানি। একটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি: দুইটি নার্সকে সর্বদা একত্র থাকিতে দেখিতাম। তাহারা এক ঘরেই শুইত। সিস্টারের সহিত পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকাতে সন্দেহ হয় এবং লক্ষ্য রাখিতে থাকি। আমার সন্দেহই ঠিক—তাহারা সমমৈথুনী। তাহারা পালা করিয়া একজন আর একজনের উপর শুইত এবং উপরের জন সকর্মক হইত। তাহাদের কখনও ভগদেশে হস্তার্পণ করিতে দেখি নাই—ইহাতে মনে হয় তাহারা পরস্পরের অঙ্গের সহিত অঙ্গ ঘর্ষণেই তৃপ্তি পাইত।

বেশী উদাহরণ দিবার কোন সার্থকতা নাই। কারণ, আমার নিজ অভিজ্ঞ-

তার সমমৈথুনের দৃষ্টান্ত যাহা জানি, সবগুলির প্রক্রিয়া প্রায় একই। সিস্টারকে আমি যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় তৃপ্ত করিতাম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুইটি মেয়ে পরস্পর পরস্পরকে সেই সমস্ত প্রক্রিয়াতেই তৃপ্ত করে, দেখিয়াছি। উপরের উদাহরণটি একটি ব্যতিক্রম এই হিসাবে যে, কেহই কাহারও ভগ স্পর্শ করিত না। অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম অবশ্য অন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, যেমন মিশনের দুটি টিচারকে দেখিয়াছি তাহারা পরস্পর পরস্পরের ভগোষ্ঠ ও ভগাঙ্কুর মর্দন করিয়া এবং অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া চরম-পুলক আনয়ন করিত। তাহারা চুম্বন, দংশন ও মর্দনাদি যে করিত না তাহা নহে, তবে তাহাদের কামক্রীড়ায় ঐ সমস্তের প্রাধান্য বিশেষ ছিল না।

আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, মিশনের টিচারদের মধ্যে এবং প্রায় সব হাসপাতালেরই নার্সেস কোয়ার্টার্সের (অবিবাহিতা বা পুরুষ-সংসর্গে অনভ্যস্তা) নার্সদিগের মধ্যে সমমৈথুনের প্রসার প্রায় সার্বজনীন, ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, তবে খুবই কম। দুইটি মেয়ের মধ্যে গভীর প্রেম একত্র শয়ন, একত্র স্নান, একজনকে তৃতীয় কাহারও সহিত মিশিতে দেখিলেই অপরের ঈর্ষা (যেমন আমাকে কাহারও সহিত কথা বলিতে দেখিলেই সিস্টার ঈর্ষান্বিতা হইয়া পড়িতেন), এ সমস্ত সর্বদাই দেখা যাইত।

শুনিয়াছি, পুরুষদের সমমৈথুনে একজন সকর্মক অংশ গ্রহণ করে (Sodomite) এবং অপরে অকর্মক থাকে (Catamite), অর্থাৎ একজন তৃপ্তিলাভ করে, অপরে তৃপ্তি দেয়। * মেয়েদের সমমৈথুনে সাধারণতঃ উভয়েই তৃপ্তি চাহে—হয় উভয়েই সকর্মক হয় অথবা পর্যায়ক্রমে একজন সকর্মক ও একজন অকর্মক হয়। আমার অভিজ্ঞতায় মাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে একজন তৃপ্তিলাভ করিত এবং অপরে তৃপ্তি দিত, কিন্তু আত্মতৃপ্তি চাহিত না। একটি উদাহরণ ত আমি ও সিস্টার। অপর দৃষ্টান্তের একজনের বয়স ২৪-২৫ এবং অপরটির বয়স ১০-১১ বৎসর মাত্র। বড়টিকে ছোটটি নানা প্রক্রিয়ায় তৃপ্ত করিত এবং বড়টি তাহাকে খেলনা, টফি প্রভৃতি দিয়া খুশী রাখিত। এই উদাহরণটিকেও ব্যতিক্রম বলা হয়ত ঠিক হইবে না, কারণ ঐ ছোট মেয়েটি যে বড় হইয়া তৃপ্তি চাহিবে না—কে বলিতে পারে?

* একথা আংশিকভাবে সত্য মাত্র। পুরুষদের মধ্যেও পর্যায়ক্রমে একজন সকর্মক ও অপরজন অকর্মক হইয়া উভয়ে তৃপ্তিলাভ করে। কেবলমাত্র মনিব-চাকর, বয়স্ক বালক অথবা স্থায়ী বৈকল্পিক অকর্মক পুরুষের বেলায় একতরফা তৃপ্তি হয়।—গ্রন্থকার।

মেয়েদের সমমৈথুনের বিষয় বলিলাম। * পুরুষের সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু নাই [৬১ (ক) উত্তরে ডাঃ সেনের কাহিনীতে পুরুষের সমমৈথুন সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যাইবে]।

(৫৫) (ক) আমি একমাত্র ডাঃ সেনের নগ্নরূপ দেখিতে ও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে খুব ভালবাসিতাম ও আনন্দ বোধ করিতাম। সাধারণতঃ পুরুষাঙ্গ দর্শনে আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়। † বিবাহিত জীবনে আমার প্রথম স্বামীর অঙ্গ ৪-৫ দিনও দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ, তাহাও স্বেচ্ছায় নহে। কিন্তু বর্তমান স্বামী ডাঃ সেনের অঙ্গের প্রতি আমার অসাধারণ আকর্ষণ রহিয়াছে।

(খ) ডাঃ সেন সুগঠিত নারীবক্ষের প্রতি বরাবরই খুব আকর্ষণ আছে বলেন। আমার প্রতি ব্যবহারেও তাঁহার উক্তির সত্যতার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রথম দিন শেষ পর্যন্ত তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত বক্ষে না দাঁড়াইলে তিনি রাজী হইতেন কিনা সন্দেহ। (পরবর্তী ৬৩ (খ) দেখুন।) যখনই তাঁহার সহিত একত্র হইয়াছি, আমার স্তনদ্বয় লইয়া যে কত কি করিতেন বলিয়া শেষ করা যায় না।

(গ) আমার প্রথম স্বামীর দেখিয়াছি আমার ভগদেশের প্রতি আকর্ষণ। যখন তখনই দর্শন ও স্পর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। প্রায়ই ক্রিয়ার পূর্বে ঐ স্থানে চুম্বন-লেহনাদি করিতেন। ইহাতে আমার অত্যন্ত ঘৃণা হইত বলিয়া এসব তাঁহাকে করিতে দিতাম না।

* ভারতীয় নারীদের মধ্যে সমমৈথুন ও আত্মমৈথুনের প্রসার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের অসুবিধা অনেক। প্রচলিত পুস্তকগুলিতে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না এবং আমি বিশেষ চেষ্টার ফলে কয়েকজন মহিলার যৌনজীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও স্ত্রীলোকের স্বয়ংমৈথুনের সম্বন্ধে একটিমাত্র বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টান্তও জানিতে পারি নাই (দুই-একটি সমমৈথুনের দৃষ্টান্ত গোচরে আসিয়াছে বটে। এই ভদ্রমহিলাকে সেই জন্ত উভয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রশ্ন করি এবং সমমৈথুন সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁহার মন্তব্যসহ লিপিবদ্ধ করিলাম। দুঃখের বিষয়, মেয়েদের স্বয়ংমৈথুন সম্বন্ধে তাঁহার কোনই অভিজ্ঞতা নাই এবং একটি ব্যতীত দৃষ্টান্ত জানা নাই (৪১নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন)—ডাক্তার।

† এই বিষয়ে একটি উদাহরণস্বরূপ ৬৩ (গ) এর শেষ অংশ দেখুন।

এই ঘটনাটি তিনি অনেকের কাছে গল্প করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করে নাই বলিয়া আমাকে প্রথমে ব্যাপারটা বলেন নাই। পরে পুনঃপুনঃ প্রশ্নে ইহা তাঁহার নিকট শুনিতে পাই। আমি ইহা অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখি না।—ডাক্তার।

(ঘ) একটি আশ্চর্য ঘটনা মনে পড়িতেছে।* এক ভদ্রমহিলার শ্বেতপ্রদরের জন্য ডুশ দিতে অনেকদিন ধরিয়া তাঁহার কাছে যাতায়াতে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার গলায় পেণ্ডাণ্ট (pendant) পরা দেখিলে নাকি তাঁহার স্বামী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না। অসুস্থতা বা কোনপ্রকার অসুবিধাই গ্রাহ্য করেন না, মিলিত হইতেই হয়। ইহার জন্য তাঁহাকে (স্ত্রী) অনেকবার খুব লজ্জায় পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার স্বামী কিন্তু খুব ধীর, স্থির সদ্বিবেচক লোক, বিশেষ যে কামপ্রবণ তাহাও নহে। মাঝে মাঝে তিনি যে কেন এমন রতি-উন্মত্ত হইয়া উঠেন ইহা স্ত্রী কিছুতেই বুঝিতে পারিতেন না; স্বামীও ঠিক বলিতে পারিতেন না। পরে আবিষ্কার করেন যে, পেণ্ডাণ্টই ইহার মূল এবং তদবধি পেণ্ডাণ্ট পরা পরিত্যাগ করেন।

আবার ঐ পেণ্ডাণ্টকে অস্ত্র হিসাবেও ব্যবহার করিয়াছেন। একবারকার একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা তিনি বলেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর স্বামী যেদিন বাড়ী আসিলেন তখন তাহার ঋতুস্রাব চলিতেছে। স্বামী ইহা জানিতে পারিয়া রাত্রে স্বতন্ত্র শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এদিকে দীর্ঘ বিরতির পর স্বামীকে নিকটে পাইয়া সেদিন তাঁহার খুব ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু জানেন যে মাসিকের মধ্যে মিলিত হইতে তাঁহার স্বামী কিছুতেই রাজী হইবেন না। তখন তিনি পেণ্ডাণ্ট পরিয়া শয়ন করিলেন এবং গভীর রাত্রে তাঁহার খুব মাথা ধরিয়াছে বলিয়া স্বামীকে নিজ শয্যায় ডাকেন। স্বামী আসিয়া মাথা টিপিতে টিপিতে পেণ্ডাণ্ট লক্ষ্য করেন। আর কিছু বলিতে হইল না—স্বামীর সব বুদ্ধিবিবেচনা কোথায় চলিয়া গেল। পরে স্বামী অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঋতুর মধ্যে সহবাসের ফলে পাছে তাঁহার কোন জরায়ু সংক্রান্ত ব্যাধি হয় এইজন্য অনেকদিন পর্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন।

(ঙ) এক মেয়ের (১৮-১৯) দুই উরুর ভিতরের দিকে অনেকগুলি গোল গোল কালশিরা দেখিয়া তাহাকে উহার উৎপত্তির সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। সে বলে তাহার স্বামী প্রতি যৌনমিলনের আগে তাহার উরুতে চুম্বন করিয়া থাকেন। উত্তেজনার মুহূর্তে অনেক সময় এরূপ চোষণ করেন যে ঐরূপ কালশিরা পড়িয়া যায়।

(চ) পরিচিতা ভদ্রমহিলা [৩১ (ক) দেখুন] বলেন যে, তাঁহার স্বামী

* এক্ষেত্রে পেণ্ডাণ্টটি একটি Fetich-এ পরিণত হইয়াছে।—গ্রন্থকার

স্ত্রী-অঙ্গের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণ অনুভব করেন। প্রতি যৌন-মিলনের পূর্বে ত বটেই, অন্য সময়েও সুযোগ হইলেই ভগদেশে হস্তার্পণে ও মুখ-প্রয়োগে যাহা কিছু সম্ভব খুব তৃপ্তি ও আগ্রহের সহিত করিয়া থাকেন। স্ত্রীর সর্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণ স্বামীর অণ্ডকোষের থলির (Scrotum) প্রতি—যদিও স্বামীর শিশ্নাগ্র ইনি মুখমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা একান্তভাবেই স্বামীর তৃপ্তির জন্য * আর স্বামীর অণ্ডকোষের থলি দর্শন, স্পর্শন ও মর্দন করেন মুখ্যত নিজ তৃপ্তির জন্য।

(৫৬) পশু-মৈথুনের বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা নাই। তবে এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে পারি। হাসপাতালের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অবিবাহিতা মেট্রনের (৩৭-৩৮) একটি মাঝারি আকারের কুকুর ছিল। কখনও কখনও দেখিতাম তিনি হয়ত দাঁড়াইয়া কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন, কুকুরটি হঠাৎ লাফাইয়া সম্মুখের দুইপা দিয়া তাঁহার একপা জড়াইয়া ধরিয়া কটি আন্দোলন শুরু করিল এবং তিনি ধমক দিয়া তাহাকে নামাইয়া দিলেন। নার্স'রা বলাবলি করিত, ঐ কুকুর দিয়াই তাঁহার পুরুষের অভাব মিটিয়া থাকে।

(৫৭) শিশু-বালিকা মৈথুনের বাস্তব দৃষ্টান্ত ঃ একবার হাসপাতালে একটি ৪ বৎসরের মেয়েকে লইয়া আসে। সে গনোরিয়া-ঘটিত চক্ষু ও যোনি-প্রদাহে (Gonorrhoeal ophthalmia & vulvo-vaginitis) আক্রান্ত হইয়াছে। যতদূর শোনা গেল তাহাতে যে চাকরটি উহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইত উহা তাহারই কীর্তি বলিয়া মনে হইল। চাকরটি পলাতক।

(৫৮) ধর্ষণেচ্ছা বা ধর্ষিত হইবার প্রবৃত্তির কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা নাই। আমার নিজের সম্বন্ধে ইহাই বলিতে পারি যে, শৃঙ্গার ও মিলনকালে ডাঃ সেনের নিকট বলপ্রয়োগ, সজোর ক্রিয়া ও ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ কামনা করি। তিনি আমার বক্ষে যে শৃঙ্গার-প্রয়োগ করেন তাহা কখনই মৃদুভাবে করেন না; তাঁহার বলপ্রয়োগের ফলে অনেক সময় স্তনে কালশিরা পড়িয়া যায় এবং দুই-তিন দিন পর্যন্ত ব্যথা থাকে। কিন্তু উত্তেজনার সময় তাঁহার সমস্ত বলপ্রয়োগ ও সজোর ক্রিয়া খুবই ভাল লাগে। (৫৫ নং উত্তরে (খ) দেখুন।)

(৫৯) প্রদর্শন বা দর্শন-বাতিকের কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা নাই।

* বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে।

(৬০) নর-নারীর নগ্ন হইয়া একত্র খেলা, স্নান, কাজ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত :

(ক) হাসপাতালের কয়েকজন নার্সকে একত্র বাথরুমে ঢুকিয়া স্নান করিতে দেখিয়াছি।

(খ) ডাঃ সেন একলা এক ঘরে, তাঁহার পূর্ব স্ত্রীর সাক্ষাতে ও শেষের দিকে আমার সাক্ষাতেও নগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন।

(গ) 'পরিচিতা ভদ্রমহিলা'র [৩৪ (ক) দেখুন] নিকট শুনিয়াছি তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়াই সহবাস করেন। শুধু তাহাই নহে, বিবাহের ২-৩ মাস পরে একদিন তাঁহার স্বামী দিবাভাগে তাঁহার নগ্নরূপ দেখেন (এই প্রথম বার), তাহার পর হইতে এ পর্যন্ত (বিবাহের ৮ম বৎসর—২টি সন্তান) যখনই তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে নির্জনে একত্র হন, সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়াই অবস্থান করেন। তাঁহার এই কথাগুলি স্পষ্ট মনে আছে—"স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে পুরো অসভ্য না হলে ত অর্ধেক আনন্দই মাটি।"

(ব্যক্তিগত রুচিরই ইহা নিদর্শন। ইহাতে উভয়েরই আনন্দ হইলে আপত্তি নাই। তবে সাধারণ দম্পতির পক্ষে কেবলমাত্র বিহারকাল ব্যতীত অন্য সময়ে শালীনতা বজায় রাখাই ভাল। Familiarity breeds contempt—অর্থাৎ বেজায় নগ্ন মেলামেশায় আবার অনাদর ও ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে।—গ্রন্থকার।)

(৬১) ডাঃ সেনের বাল্যকালের কাহিনী সবই শুনিয়াছি। কাজেই তাহার যৌনবোধ বিকাশের খানিকটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতে পারিব। অপর কাহারও সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাসযোগ্য এবং ধারাবাহিক বিবরণ জানা নাই। 'যৌনবোধ বিকাশের ধারা' বলিলে ধারাবাহিক বিবরণই দেওয়া দরকার।

(ক) ডাঃ সেন তাঁহার ৫ বৎসর বয়সে এক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া তাহার পিতামাতাকে ক্রিয়ারত দেখেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তিনি জাগিয়াছেন টের পাইয়া পিতা ধমক দিয়া তাঁহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য করেন। এই ঘটনা তাঁহার মনে গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। এখনও নাকি তিনি পরিষ্কার সেই দৃশ্য স্মরণ করিতে পারেন, অথচ বাল্যের কত ঘটনার স্মৃতিই ত মনে নাই। ১০-১১ বছর বয়স পর্যন্ত গরুর উপর ষাঁড় উঠিতে দেখিলে মনে করিতেন মানুষে যেমন ঘোড়ায় চড়ে ইহাও বোধ হয় সেই প্রকার ব্যাপারই—একটি গরুর পিঠে আর একটি গরু 'ঘোড়ায়

চড়িতেছে'। ঐ বয়সে বা কিছু পরে কুকুরের সঙ্গমদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার এক সঙ্গীকে (১৪-১৫) কুকুরটি কেন কটি-আন্দোলন করিতেছে এই প্রশ্ন করেন। সে ব্যাপারটা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয় এবং মানুষের মধ্যেও যে ঐরূপ হয় ইহা বলে। এইবার তিনি গরুর উপর ষাঁড় ওঠা যে 'ঘোড়ায় চড়া নহে এবং ৫ বৎসর বয়সে পিতামাতার যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত রহস্য কি, তাহা বুঝিতে পারেন। এই সময়েই তাঁহার যৌনবিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং ১২-১৩ বৎসর বয়সেই সঙ্গী সাথীদের নিকট হইতে স্ত্রী-পুরুষের মিলন বিষয়ে অনেক কিছু জ্ঞানলাভ করেন। এই সময় পশুপক্ষীর মিলন-দৃশ্য খুব আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার এই আগ্রহ সমানভাবে এখনও পর্যন্ত বর্তমান আছে। স্ত্রী-পুরুষের মিলন যে সন্তান হয় এবং স্ত্রী-অঙ্গ দিয়াই যে প্রসব হয় এ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান তখনই হইয়াছে। তবে সেই সময় কতকগুলি অদ্ভুত-ধারণা ছিল:—(১) মিলনের সময় শুধু লিঙ্গাগ্রটুকুই ভগের ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে। সমগ্র ফাটলটিকেই যোনিমুখ বলিয়া ধারণা ছিল। (২) শিশ্নাগ্র-আবরক চর্মের ভিতর শিশ্নাগ্রের খাঁজে যে বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত ময়লা জন্মে উহা যোনির মধ্য দিয়া স্ত্রীলোকের পেটের মধ্যে গেলে গর্ভ হয়; (৩) যতক্ষণ পর্যন্ত যোনি দিয়া সাদামত কিছু (?) না বাহির হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গম চালাইতে হয়। পুরুষের বীর্যপাতেই যে সুরতের শেষ এ সম্বন্ধে কোন ধারণা তখন ছিল না।

প্রায় ১৪ বৎসর বয়সে একদিন চুলকাইবার কালে পুলকের সহিত তাঁহার জীবনের প্রথম বীর্যক্ষরণ হইল। তদবধি হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হন। ২৪-২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহ আত্মমৈথুন করিতেন—ইহাতে শরীর বা মনের কোন ক্ষতি হয় নাই।* ২৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, বিবাহের পর এই অভ্যাস কমিতে কমিতে ২ বৎসরের মধ্যে একেবারেই চলিয়া যায়। তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত যাহাতে যৌননিষ্ঠা বজায় রাখা যায় তজ্জন্য কলারূপে স্বয়ংমৈথুনের চর্চা করিতেন এবং স্বয়ংমৈথুনের নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

* ক্ষতি না হইবার কারণ ছিল। ১৫ বৎসর বয়সে স্কুলে পড়িবার সময় প্রথম একটি যৌন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বাংলা বই পাঠ করিবার সুযোগ পান। উহাতে কৌতূহলের উদ্রেক হল এবং ১৯ বৎসর বয়সে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার পূর্বেই চেষ্টা করিয়া হ্যাভলক এলিস, মেরী ষ্টোপস, নৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতির কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়া ফেলেন। কাজেই হস্তমৈথুনের তথাকথিত কুফল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ছিল না।—উত্তরদাত্রী।

আত্মরতি আরম্ভের বৎসরখানেক পরে তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁহাকে সমমৈথুনের বিষয় বলে এ বিষয়ে তাহার নিজ অভিজ্ঞতা এরূপ সরস ভাবে বর্ণনা করে যে উহাতে তাঁহার আগ্রহ হয়। তাঁহার বন্ধুই ব্যবস্থা করিয়া একটি সুদর্শন বালকের (সমবয়স্ক) সহিত একদিন তাঁহাকে এক নির্জন স্থানে একত্র করে। ঐ বালকটি অকর্মক অংশ গ্রহণে অভ্যস্ত ছিল। সে যখন তাঁহাকে ক্রিয়ারম্ভের আমন্ত্রণ জানাইল তখন তাঁহার এরূপ ঘৃণাবোধ হইল যে, কিছুতেই ঐ কাজে প্রবৃত্তি হইল না। ঐ বালকটি তখন মুখপ্রয়োগে তাঁহার উত্তেজনা ঘটাইল এবং পারস্পরিক হস্তমৈথুনে সেদিনকার ব্যাপার শেষ হইল। ঘৃণাবোধের জন্য তিনি কোনদিন সমমৈথুনে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে পূর্বোক্ত বন্ধুর সহিত পারস্পরিক হস্তমৈথুন চলিত। ঐ বন্ধুটি শুধু যে স্বয়ংমৈথুনে ও সমমৈথুনেই অভ্যস্ত ছিল তাহাই নহে, সে নারী-সংসর্গেও কিছুটা অভ্যস্ত ছিল। তাহার নিকট হইতে নারীর যৌন অঙ্গ সম্বন্ধে তিনি ধারণা পান। ঐ সময় হইতেই বয়স্থা মেয়েদের অঙ্গ, বিশেষতঃ স্তনের প্রতি তাঁহার কৌতূহল ও আকর্ষণ জন্মে—সুযোগ পাইলেই লুকাইয়া লুকাইয়া নারী-বক্ষ দর্শনের চেষ্টা করিতেন এবং কাহারও সুগঠিত স্তন দেখিতে পাইলে উত্তেজনা বোধ করিতেন। তখন আত্মমৈথুনে উত্তেজনাব নিবৃত্তি করিতে হইত। সুগঠিত নারীবক্ষের প্রতি (পতিত বা কুদৃশ্য স্তনের প্রতি নহে) তাঁহার এই আকর্ষণ তখন হইতেই বর্তমান আছে। [৫৫ (খ) দেখুন]

এই সময় হইতেই তাঁহার (১৪-১৫) নারী সংসর্গের খুব ইচ্ছা হইত, সুযোগও পাইয়াছিলেন।—একটি ১১-১২ বৎসরের মেয়ের সহিত খুব ভাব হয়, চুম্বন-আলিঙ্গন ও অঙ্গে হস্তপ্রয়োগ প্রভৃতি হইত। অপর একটি বিবাহিতা মেয়ে (১৭-১৮) তাঁহাকে যৌনমিলনে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রেও চুম্বন-আলিঙ্গনাদি চলিত। উভয় ক্ষেত্রেই সাহসের অভাবে সংসর্গ হয় নাই। ইহাদের সংস্পর্শে যে উত্তেজনা লাভ করিতেন, স্বয়ংমৈথুনে তাহার নিবৃত্তি করিতে হইত। কয়েক বৎসরের মধ্যে পুস্তক-পাঠে যৌন শাস্ত্রে ও জন্মশাসন বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করেন। সেই সঙ্গে প্রবল নীতিজ্ঞান ও সংযম জন্মে, ফলে নারীমহলে প্রচুর প্রতিষ্ঠা এবং উপভোগের বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কখনও বিবাহেতর যৌনমিলন করেন নাই।

বিবাহের পর তিনি যৌন-অনভিজ্ঞা স্ত্রীকে (১৬) ধৈর্যসহকারে শিক্ষা দিয়া মনের মত করিয়া তৈয়ারী করিয়া লইয়া দাম্পত্যজীবনে বাস্তবিকই সুখী

হইয়াছিলেন। উভয়ের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহের পর হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের পর স্ত্রীর (২০) গর্ভাধান হয়। গর্ভবতী অবস্থায় আকস্মিক কারণে তাঁহার (২৯) স্ত্রী মারা যান। তাঁহার জীবনে একমাত্র আমিই তাঁহাকে বিবাহেতর যৌনমিলনে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলাম। আমার ন্যায় তিনিও ইহার জন্য কখনও অনুতপ্ত হন নাই বা নিজেকে নীতিভ্রষ্ট মনে করেন নাই, কারণ তিনিও আমাকে খুব ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে তিনি আমাকে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা দিয়া সম্মানিতা করিয়াছেন।

(খ) আমার সপত্নী-পুত্র (১৭-১৮) (পূর্ব স্বামীর) ৩-৪ বৎসর ধরিয়া আত্মমৈথুনে অভ্যস্ত হইয়াছে এরূপ প্রমাণ পাইয়াছি। তাহার সমবয়সী একটি পাড়ার মেয়ের সহিত কিছুদিন হইতে খুব ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিতেছি। নানা লোকে নানা কথা বলে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে জানা নাই। তবে মনে হয় তাহারা আঙ্গিক মিলনের স্তর পর্যন্ত পৌছায় নাই।

(গ) সুন্দরী নব-বিবাহিতা কাকীমা (১৮-১৯) সুযোগ পাইলেই নির্জন কক্ষে ভাশুরপুত্রকে (৮) নগ্নবক্ষে চাপিয়া শয়ন করিত এবং তাহাকে দিয়া মর্দন ও চোষণ করাইয়া লইত। ভাশুরপুত্র (বর্তমান বয়স ৩০-এর উপর, বিবাহিত) বলে যে, সে ইহা দোষের মনে করিত না, মাতৃস্তন্য পানের অনুরূপ ভাবিত, তবে ইহা তাহার খুব ভাল লাগিত। কাকীমা অবশ্য অনেকক্ষণ মর্দন-চোষণাদির পর তাহাকে সজোরে বক্ষে চাপিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিত এবং অল্পক্ষণ পরে আলিঙ্গন শিথিল করিয়া দিয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিত।*

(ঘ) পরবর্তী সংস্পর্শের বিবরণের জন্য ৩৩নং উত্তরে (ঘ) দেখুন।

(৬২) আমার কোন যৌন কদাচার কখনও ছিল না বা নাই।

(৬৩) (ক) ৫৩নং প্রশ্নের উত্তরে প্রথম পুরুষ-সংসর্গের বিবরণ দেখুন।

প্রথম যেদিন দ্বিপ্রহরে ডাঃ সেনের বাড়ীতে যাই, তিনি সাদরে এবং সযত্নে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার কষ্ট যতটা পারি দূর করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি, তিনি নানাভাবে আমাকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন। যত কষ্টই তাঁহার হউক, তিনি অবৈধ সংসর্গে রাজী নহেন, সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হইয়া কিছু করা উচিত নহে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আরও নানা উপায় আছে, এই সমস্ত বলিয়া আমাকে বুঝাইতে

* সম্ভবত এই মর্দন-চোষণেই কাকীমার চরম তৃপ্তিলাভ ঘটিত।—উত্তরদাত্রী।

লাগিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে প্ররোচিত করিবার চেষ্টাই করিতে লাগিলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা এইরূপ আমার তাঁহাকে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা এবং তাঁহার আমাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা চলে। শেষ পর্যন্ত তাঁহার সম্মুখে যখন অনাবৃত বক্ষে দাঁড়াইলাম তখন তাঁহার সংযমের বাঁধ ভাঙিল। সেদিন গিয়াছিলাম তাঁহাকে আনন্দ দিতে, কিন্তু নিজে যে আনন্দ পাইলাম তাহা অভূতপূর্ব—পূর্ব স্বামী-সহবাসে তাহা কোনদিনই পাই নাই। ইহার পর হইতে সুযোগ পাইলেই তাঁহার ওখানে যাইতাম এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে কখনও কখনও আমার বাসায় ডাকিয়া পাঠাইতাম। **গড়পড়তায় সপ্তাহে দুইদিন** তাঁহার সহিত মিলন হইত। ডাঃ সেন শৃঙ্গারে অসাধারণ পারদর্শী, রতিক্ষমতাও তাঁহার বেশী। কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, শৃঙ্গারের আরম্ভ হইতে তাঁহার শুক্রস্খলন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রতিবারই ২ হইতে ৪ বার চরমপুলক লাভ করিতাম। সমগ্র ক্রিয়াটি (শৃঙ্গার ও আঙ্গিক মিলন) এক ঘণ্টা হইতে দেড় ঘণ্টা চলিত।* তাঁহার প্রতি আমার এরূপ তীব্র যৌন-আকর্ষণ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার চুম্বন-আলিঙ্গন পাইলেই আমি একেবারে রতি-উন্মত্তা হইয়া পড়িতাম এবং অল্পক্ষণ শৃঙ্গার প্রয়োগেই প্রথম চরমতৃপ্তিলাভ হইয়া যাইত।* অসুখের পর এই সময় আমার এত দ্রুত **স্বাস্থ্যোন্নতি** হইতেছিল যে, সকলেই আশ্চর্য হইত। আমার মনে হয় **সত্যকার ভালবাসার পাত্রের** সহিত **তৃপ্তিকর যৌনমিলন স্ত্রী-লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির** একটি **প্রধান সহায়**,† কিন্তু আমাদের দেশে ঘরে ঘরে এই জিনিসটির অভাব। কয়েক মাস পরে আমার স্বামী সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন এবং এরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে ডাঃ সেনের সম্মান রক্ষার্থে আমাকে তাঁহার বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিতে হয়। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর এখন ডাঃ সেনই আমার বর্তমান স্বামী ও প্রণয়ী।

(৬৪) আমার পরিচিত পুরুষদের অধিকাংশের **মধ্যেই বিবাহেতর যৌনমিলনের প্রসার** আছে। বহুর মধ্যে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিব।

* নারীই এক্ষেত্রে সকর্মক প্রণয়িনী বলিয়া তাহার একাধিকবার চরমপুলকলাভ হইত।

† পুরুষের শুক্রশোষণে নারীর স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, ডাঃ মেরী স্টোপসের এই মত ভদ্রমহিলা স্বীকার করেন না। দীর্ঘকাল স্বামী সহবাসে অঙ্গমধ্যে বীর্যগ্রহণেও তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ছাড়া উন্নতি হয় নাই, অথচ ডাঃ সেন যদিও প্রায়ই ব্যবহার করিতেন তথাপি তৃপ্তিদায়ক সঙ্গমারম্ভের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হয় ও কর্মে উৎসাহ জন্মে—ডাক্তার।

(ক) প্রথমেই আমার প্রথম স্বামীর কথা। সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না। ছলে, বলে, কৌশলে সম্ভোগ করিতেন—বয়স, সৌন্দর্য বা সম্পর্কের কোন বাছ-বিচার ছিল না।

(১) আমার সহিত প্রথম তিন মাস মিলনই ত তাঁহার বিবাহেতর যৌন-মিলন। তিনি যে বিবাহিত সে কথা তখন সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন।

(২) প্রথম সন্তানের জন্মের কিছু পূর্ব হইতে আমার এক দিদি কয়েক মাস (২৪)* আমার নিকট ছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহরে (স্বামীর তখন বাড়িতে থাকিবার কথা নহে) দিদির ঘরের দরজা বন্ধ ও ভিতর হইতে মাঝে মাঝে চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে দেখিয়া দরজার জোড়ের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখি দিদির সহিত স্বামী সঙ্গমে রত। সুরতে দিদির সক্রিয় সহ-যোগিতা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা গেল ইহাই প্রথমদিন নহে, অনেকদিন হইতেই (বোধ হয় আমার আঁতুড়ের সময় হইতেই) এরূপ চলিতেছে। ঘুণাক্ষরেও এরূপ সন্দেহ করিতে পারি নাই, কারণ যেদিন ঐ দৃশ্য দেখি সে সময় (প্রসবের ১ মাস পর হইতেই) আমার সহিত স্বামীর নিয়মিত সহবাস চলিতেছে। স্বামীর চরিত্রহীনতার এই প্রথম চাক্ষুষ প্রামণ পাইলাম—অসহ্য মানসিক কষ্ট। কাহাকেও কিছু বলিলাম না। পরদিন ভোরে শিশু-সন্তান ফেলিয়া একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করি—উদ্দেশ্য ছিল, কোনও নার্সিং ইউনিয়ন বা অন্য কোনও স্থানে নিজের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া শিশু-সন্তানকে কাছে লইয়া যাইব। কিন্তু স্বামীর কূটকৌশলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে বাধ্য হইয়া আবার তাঁহার গৃহেই ফিরিতে হইল। এই প্রথম। ইহার পর আরও কয়েকবার স্বামীর পরনারীগমনের চাক্ষুষ প্রমাণ (এবং অসংখ্য বার অন্য প্রমাণ) পাইয়াছি এবং আরও দুইবার গৃহত্যাগ করি।

*আমার এই দিদির ২০-২১ বৎসর বয়সে এক রেলওয়ে কর্মচারীর সহিত বিবাহ হয়। মত্তপ ও বেশ্যাসক্ত স্বামীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দিদি স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রবাস করেন। এক স্কুলে চাকরি পাইয়াছে—একক জীবন, তাহাতেই চলিয়া যায়। ৬-৭ মাস স্বামীসঙ্গ করিয়াছেন, সন্তানাদি নাই। দিদির স্বামী তাঁহাকে ফিরাইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। দিদির এই একক জীবন-যাপন সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোনদিন কোন দুর্নাম শুনি নাই। আমার স্বামী ক্ষমতাবান পুরুষ বটে কোথাও ব্যর্থমনোরথ হয় নাই। দিদির ও আমার মুখশ্রী প্রায়ই একই তবে আমি কৃষ্ণাঙ্গী, দিদি গৌরাঙ্গী এবং আমি দৈর্ঘ্য প্রস্থে মধ্যমাকৃতি, দিদি বেঁটে ও কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া। দিদির চেহারার বর্ণনা দিলাম এই জন্য যে আমার স্বামীর পছন্দের সহিত ঘটনাচক্রে দিদির চেহারা মিলিয়া গিয়াছিল [২২ (খ) এর নীচে মন্তব্য দেখুন।]—উত্তরদাত্রী।

(৩) আমার বিবাহের বহুপূর্ব হইতেই এক বন্ধুপত্নীর (কুৎসিত-দর্শনা বর্তমান বয়স ৩৫-৩৬, চারিটি সন্তানের জননী) সহিত স্বামীর নিয়মিত যৌন-সম্পর্ক ছিল। স্বামী অর্থ সাহায্য করেন, বন্ধু সব কিছু দেখিয়াও দেখেন না। আমার সহিত যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হইবার পূর্বে আমার নিকট হইতে যে উত্তেজনা লইয়া আসিতেন প্রধানত এই বন্ধুপত্নীর দ্বারাই তাহার নিবৃত্তি ঘটিত। বন্ধু-কন্যার (২০) অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছে, কুমারী (Virgin) অবস্থায় বিবাহ সম্ভব হয় নাই—আমার স্বামী কমপক্ষে এক বৎসর ইহাকে উপভোগ করিয়াছে। মাতা ও কন্যা একসঙ্গে—কী প্রবৃত্তি!

(৪) আমার স্বামী কিছুদিন এক বৃদ্ধের সেক্রেটারী ছিলেন। পুত্র-কন্যা পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী, পুত্রবধূ, আশ্রিত প্রভৃতিতে বৃদ্ধের সুবৃহৎ পরিবার। এই পরিবারের সম্পর্কে নির্বিচারে ব্যভিচারের স্রোত বহিয়া যাইত। বৃদ্ধের এক অবিবাহিতা, চলনসই চেহারার পৌত্রীকে (২২) স্বামী সুযোগ-সুবিধামত প্রায়ই উপভোগ করিতেন। মেয়েটি অত্যন্ত কামপ্রবণা ছিল—বাড়ীর অনেকের এমন কি চাকরবাকরের সহিতও সে যৌনসম্পর্ক স্থাপিত করিয়াছিল। আমাব স্বামী মাঝে মাঝে ইহার নিকট হইতে, বোধ হয় ইহাকে আনন্দদানের পুরস্কার-স্বরূপ অর্থাদি পাইতেন।

(খ) উক্ত ধনী বৃদ্ধের এক পুত্রবধূদের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে তাহার (বয়স ২৪-২৫—৩টি সন্তান) সহিত দেখা করিতে গিয়া অসময়ে তাহাব ঘরের দরজা বন্ধ দেখিয়া কৌতূহলবশে জানালাব খড়খড়ি তুলিতেই এক বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়িল। বধূটি তাহার এক অবিবাহিত দেবরের (২৮-২৯) সহিত ক্রিয়ারত; পাশেই খাটের উপর তাহার দেড় কি দুই বৎসরের পুত্র খেলা করিতেছে।

(গ) পূর্ব উদাহরণের ঐ দেবরটিকে তাহার এক সুশ্রী অবিবাহিতা ভাগিনেয়ীকে (১৬) কোলে বসাইয়া চুম্বন-মর্দনাদি করিতে দেখিয়াছি।

(ঘ) একটি দুঃস্থ ভদ্রঘরের অবিবাহিত মেয়ে (১৮) ধাত্রীর কাজ শিখিবে বলিয়া আমার বাড়িতেই থাকিত। সেই সময় আমার এক বিবাহিত দেবরও (৩০) আমার বাড়িতে থাকিয়া এক কারখানায় কাজ করিত—তাহার স্ত্রী বাপের বাড়িতে ছিল। একদিন রাত্রে মেয়েটিকে শয্যাত্যাগ করিতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করি (কিছুদিন হইতেই দেবরের সহিত তাহার ইশারা-ইঙ্গিত ও গোপনে কথা বলা লক্ষ্য করিতেছিলাম), দেখিলাম সে আমার দেবরের

কক্ষে প্রবেশ করিল। পরদিনই দেবরকে এবং পরে স্বামীর হাবভাব দেখিয়া মেয়েটিকেও বাড়ী হইতে বিদায় দিই।

(ঙ) বিবাহিত যুবক (২৬-২৭), কলিকাতায় দাদার বাড়ীতে থাকিয়া চাকুরী করিত—স্ত্রী দেশেই থাকিত। দাদার দুই অবিবাহিতা কন্যার (১৯ ও ১৭) সহিত যুবকের যৌনসম্পর্কে স্থাপিত হয়। কাকা যখন একজনের সহিত মিলিত হইত, অপরজন পাহারা দিত। বড়টি গর্ভবতী হইয়া পড়াতে মা সব টের পাইয়া যান—কাকা পলায়ন করে। এক প্রসবাগারে গিয়া যথাসময়ে এক কন্যাসন্তান হয়, তাহাকে লইয়া বাড়ীতে আসে। শুনিয়াছিলাম, শিশুটিকে কোন অনাথ-আশ্রমে দিয়া মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইবে।

(চ) দুই ভ্রাতা, জমিদার, বয়স ৪০ ও ৩৫, বিবাহিত। বড়জনের ৪টি সন্তান, ছোটটি নিঃসন্তান। দুইজনই দুশ্চরিত্র। ছোট ভাইয়েরও তবুও কিছুটা রুচি আছে, বড় ভাইয়ের কোন বাছ-বিচার নাই। বড় ভাইয়ের সিফিলিস ও গনোরিয়া দুইই হয়, সময়মত চিকিৎসাদ্বারা রোগ মুক্ত হয়; স্ত্রীকে সংক্রমিত করে নাই। ছোট ভাই একটি চীনা মেয়ের সংসর্গে গনোরিয়াগ্রস্ত হয়। সাধারণতঃ বিবাহেতর যৌনমিলনে সে কনডম ব্যবহার করিত, এক্ষেত্রে সাবধান হইতে পারে নাই এবং স্ত্রীকে সংক্রমিত করে। অল্পদিনের ঘটনা, স্ত্রী এই প্রথমবার গর্ভবতী। উভয়ে পেনিসিলিন চিকিৎসায় রোগমুক্ত হয়।

(৬৫) ধর্মগত যৌন-কদাচারের দৃষ্টান্ত জানা নাই।

(৬৬) এই প্রশ্নটি (গণিকাগমন সম্পর্কীয়) কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য।

(৬৭) ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তরের (চ) দেখুন। এই দুই ভাইয়ের বড়জন গণিকাগমন করিত; সিফিলিস ও গনোরিয়া উভয় প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়।

(৬৮) বালক বেশ্যার দৃষ্টান্ত জানি না।

(৬৯) পতিতারা কি কি উপায়ে গর্ভ এড়াইবার চেষ্টা করে জানি না।

(৭০) (ক) পরিচিতদের মধ্যে মদ্যপানের প্রসার বেশী নহে।

(১) আমার স্বামী পূর্বে মাঝে মাঝে মদ্যপান করিতেন।

(২) জমিদার দুই ভ্রাতার বড়জন নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত।

(৩) ৬০নং প্রশ্নের উত্তরে (গ) উদাহরণে যে দম্পতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা মাঝে মাঝে একত্র মদ্যপান করিতেন। একদিন মাত্রা

বেশী হইয়া যাওয়াতে স্ত্রী বমি করিয়া ভাসাইয়া দেন। তদবধি নিয়মিত মদ্যপান বন্ধ হইয়াছে—কদাচিৎ কখনও অল্পমাত্রায় পান করেন। বিশেষত্ব এই যে, স্বামী কখনও বাহিরে একাকী বা বন্ধুবান্ধবের সংসর্গে মদ্যপান করেন না, যখনই করেন স্ত্রীর সহিত একত্রে করেন।

(খ) অত্যধিক মদ্যপানের বাস্তব দৃষ্টান্ত জানা নাই।

যৌনব্যাধি

(৭১) আমার স্বামীর যৌনব্যাধি কখনও হয় নাই।

(৭৩) পরিচিত নারী-পুরুষের মধ্যে বাহির হইতে যতটা বোধ হয় **রতিজ রোগের প্রসার** তদপেক্ষা **অনেক বেশী।** আমার বৃত্তির জন্য বহু গোপনীয় ব্যাপার জানিবার সুযোগ-সুবিধা হইয়াছে। যে সমস্ত ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলাকে কোন দিক দিয়াই সন্দেহ করা চলে না, তাদের মধ্যেও সিফিলিস বা গনোরিয়ার অস্তিত্ব দেখিয়াছি। **সত্যের খাতিরে** এখানে একটা কথা বলিব। সকলেরই ধারণা স্ত্রীরা সর্বদাই নিরপরাধ, স্বামীরাই বাহির হইতে ব্যাধি লইয়া আসেন এবং স্ত্রীকে সংক্রমিত করেন। **অধিকাংশ ক্ষেত্রেই** ইহা সত্য বটে, কিন্তু ইহার বিপরীত ব্যাপারও সম্ভব। নববধূর সহবাসে সচ্চরিত্র নিষ্ঠাবান স্বামী* **গনোরিয়াগ্রস্ত** হইয়াছেন এরূপ উদাহরণও জানি।

(৭৪) (ক) (১) আমার পূর্ব স্বামীর অঙ্গ ছোট ছিল ; তবে বোধ হয় ইহা অস্বাভাবিক নহে।

(২) আমার পূর্বস্বামীর বীর্যধারণ-ক্ষমতা কম ; শেষ কয়েক বৎসর খুবই কমিয়া গিয়াছিল।

(৩) গর্ভকালের শেষভাগে প্রতিবারই আমার সামান্য শ্বেতপ্রদর দেখা দিত—অন্য সময় শ্বেতপ্রদর থাকে না।

(৪) কয়েকমাস হইল আমার দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময় বাড়িয়া যাইতেছে (Oligomenorrhoea)।

(৫) (ক) পূর্ব স্বামীর সংসর্গে আমি একেবারেই রতিজড় হইয়া পড়িয়াছিলাম—কোন সময়ই বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও বোধ করিতাম না। তিনি তাঁহার ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে উপগত হইয়া বাসনা চরিতার্থ

* স্ত্রী ভিন্ন আর কোন নারীর সংস্পর্শে কখনও আসেন নাই।

করিতেন, আমি ক্রিয়াটি কোনপ্রকারে সহ্য করিতাম মাত্র (উপায় কি ? তাঁহার কামাবেগের সময় সম্মতি না দিলে বলপ্রয়োগেও তাঁহার কুণ্ঠা বোধ হইত না)। আমি কোন আনন্দও পাইতাম না। ডাঃ সেনের সংসর্গে আনন্দের অবধি নাই। ক্ষমতা ফিরিয়া পাই। (নারীর পুলকলাভ ও রতিক্ষমতা যে আপেক্ষিক ইহা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ব্যবহার ও মানসিক আকর্ষণ-ভেদে নারী রতিজড় ও রতিক্ষম প্রায়ই হইয়া থাকে।—গ্রন্থকার।)

(খ) (১) প্রতিকারের কোন প্রশ্ন উঠে না। পূর্ব স্বামীর অঙ্গের এ ক্ষুদ্রত্ব স্বাভাবিক।

(২) পূর্ব স্বামীর বীর্যধারণশক্তি অভাবের প্রতিকারের কোন চেষ্টাই হয় নাই। কারণ তাঁহার নিজের তৃপ্তি হইলেই হইল। অতৃপ্তি লইয়া সারারাত আমি বিনিদ্র-রজনী যাপন করিলেও তাঁহার কিছু আসিয়া যাইত না। আগে মাঝে মাঝে ইহার জন্য কষ্টবোধ করিয়াছি, কিন্তু শেষে কোন কষ্টই ছিল না যেহেতু যৌনবাসনাই কমিয়া গিয়াছিল। ডাঃ সেনের বীর্যধারণশক্তি ভাল।

(৩) ডাক্তারের মতে গর্ভের শেষের দিকে সামান্য শ্বেতপ্রদর অস্বাভাবিক কিছু নহে। মাঝে মাঝে ডেটল (Dettol) লোশন দ্বারা ডুস লওয়া ভিন্ন আর কিছু করিবার পরামর্শ দেন নাই। আর কিছু করিবার প্রয়োজনও হয় নাই।

(৪) দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়-বৃদ্ধি (Oligomenorrhoea) অল্পদিন হইল লক্ষ্য করিতেছি।

(৫) সাময়িক রতিজড়তা আমার শাপে বর হইয়াছিল। কারণ উপরে (২) বর্ণিত হইয়াছে।

(৭৫) (ক) পূর্বপ্রশ্নের উত্তরে (ক) (৪) দেখুন। ঋতুস্রাব সম্বন্ধে অন্য কোন অনিয়ম লক্ষ্য করি নাই।

(খ) পরিচিতা নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী দেখি ডিসমেনোরিয়া (Dysmenorrhoea),[১] তাহার চেয়ে কম ক্ষেত্রে হাইপোমেনোরিয়া (Hypomenorrhoea),[২] গর্ভবিহীন পিরিওডিক্যাল অ্যামেনোরিয়া (Periodical amenorrhoea),[৩] এবং মাত্র একটি ক্ষেত্রে দেখিয়াছি মেনোরাজিয়া (Menorrhagia)[৪]।

১ ঋতুকালীন বা ঋতু পূর্বে বেদনা, বাধক। ২ ঋতুস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া।
৩ সাময়িক ঋতুবন্ধ। হয়ত ২।৩।৪ মাস মাসিক হইল না। আবার নিয়মিত শুরু হইল।
৪ অতিরিক্ত পরিমাণে দীর্ঘদিন ধরিয়া ঋতুস্রাব। —ডাক্তার।

যৌননিষ্ঠা

(৭৬) ঋতুস্রাবের পর হইতে বিবাহ পর্যন্ত যৌননিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই। সুযোগের অভাব ছিল না এবং কোন ভয়ে ভীত হইয়া যে যৌননিষ্ঠা পালন করিয়াছি তাহাও নহে। **যৌনবাসনা ছিল না** বলিলেই হয় এবং সহজাত সংস্কারের মত **নীতিজ্ঞান** বরাবরই খুব **প্রবল**। যৌননিষ্ঠা বজায় রাখিতে গিয়া বহু পুরুষ হইতে **আত্মরক্ষা** করিতে হইয়াছে।

(৭৭) **সংযমাভ্যাস** ত জোর করিয়া করিতে হয় নাই—**অশান্তি** বা **বিদ্রোহভাব** দেখা দিবে কেন?

(৭৮) **সংযমাভ্যাসের ফল** এই হইয়াছে যে যৌননিষ্ঠা ও মনের শান্তি বজায় রহিয়াছে, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করিয়া বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই (অবাঞ্ছিত গর্ভ হওয়াব ফলেই ধর্ষণকারীর সহিত বিবাহিত হইয়া সারা জীবনটাই নষ্ট হইয়া গেল), এবং যৌনব্যাধির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি।

(৭৯) পরিচিতদের মধ্যে একজনই আছেন **চিরকুমার**। পারিবারিক কারণে বিবাহ করা সম্ভব হয় নাই—এখন সে সমস্ত কারণ দূরীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু বয়স বেশী হইয়াছে (৪৫) বলিয়া নিজে বিবাহ না করিয়া ছোট ভাইয়ের বিবাহ দিয়াছেন। ভদ্রলোক সচ্চরিত্র, নারী সহবাস বা বালক মৈথুন কখনই করেন নাই। কামাবেগ হয় কিনা এবং হইলে কি করেন জানা নাই।

পরিচিতাদের মধ্যে **চিরকুমারী** কয়েকজন ছিলেম বা আছেন। একজন বা দুইজন **পুরুষের** প্রতি **ঘৃণাবশতঃ** বিবাহ করেন নাই। বাকী কয়েক-জনের বিবাহের ইচ্ছা থাকিলেও অর্থের, রূপের বা উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বিবাহ হয় নাই। ইহাদের মধ্যে দুইজনের (একজন শিক্ষয়িত্রী অপরে লেডী ডাক্তার) কোন কামাবেগ হয় কিনা এবং হইলে আত্মরতি করেন কিনা চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই (পুরুষ সংসর্গ বা সমমৈথুন যে করেন না এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই)। বাকী কয়জনের কেহ বা সমমৈথুনী দুই-একজন (খুব সম্ভব) আত্মমৈথুনী, অবশিষ্ট কয়েকজন এক বা **একাধিক পুরুষ সংসর্গে অভ্যস্তা**।

(৮০) **আত্মদমনের চেষ্টা** কখনও করিতে হয় নাই।

(৮১) **যৌন-উপভোগের একটানা** ৬-৭ মাস **বিরত থাকিতে**

হইয়াছে এবং তাহাতে কোন কষ্ট হয় নাই। আরও বেশী বিরত থাকা সম্ভব হইত কিনা স্বামীর জন্য তাহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ কখনও হয় নাই।

(৮২) আমার পরিচিতা **বিধবা ও অপর নারীদের** মধ্যে পদস্খলনের দৃষ্টান্ত অনেক জানা আছে। সন্দেহাতীতভাবে সত্য দৃষ্টান্ত কয়েকটি উল্লেখ করিলাম।

(ক) ৬৪নং প্রশ্নের উত্তরে দৃষ্টান্তগুলি দেখুন।

(খ) আমাদের সহকর্মিনী ও পরিচিতা **বহু নার্সেরই,** প্রলোভনে পড়িয়া বুদ্ধির দোষে অথবা যৌনবাসনাপূরণের জন্য **পদস্খলন** হয়। চালাক ও ভাগ্যবতী কয়েকজন ব্যতীত সকলেই এক বা একাধিকবার গর্ভবতী হইয়া পড়ে। দুই-তিনজন তাহারই সুযোগে (গর্ভোৎপাত্তিকারীর সহিত) বিবাহিতা হয়, বাকী কয়জন গর্ভপাত করায়। একটি মেয়ে কিছুতেই গর্ভপাত করাইতে রাজী হইল না (মেয়েটি ধর্ষিতা হইয়াছিল, এমনই ইহার দুর্ভাগ্য যে, ঐ একদিনেই গর্ভ সঞ্চার হইয়া যায়)। শেষ পর্যন্ত ইহাকে চাকরি ছাড়িতে হয়; আমি আশ্রয় দিই। যথাসময়ে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়াছে, কন্যা একটু বড় হইলেই কোন নার্সের ইউনিয়নে ভর্তি হইয়া জীবিকার্জন করিতে পারিবে এই আশায় সে আসে।

(গ) এক পুলিস কর্মচারীর স্ত্রীর গুরুতর পীড়ায় শুশ্রূষার জন্য কিছুদিন ধরিয়া যাইতে হয়। ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করিবার জন্য স্ত্রীর বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে আনানো হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পরও ছেলেমেয়েদের ভার লইয়া তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হয়—আমার সহিত যথেষ্ট আলাপ হয় এবং তাঁহার জীবনের সব ঘটনা জানিতে পারি।* কয়েক মাসের মধ্যেই দারোগাবাবু (৩৫-৩৬) কর্তৃক তিনি (৩০) গর্ভবতী হইয়া পড়েন। দেশীয় ধাইয়ের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটানো হয়। দারোগাবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের পর ইনি বিদায় নেন।

(ঘ) স্কুল মাস্টার। তাঁহার সুন্দরী, বিধবা বৌদিদির সহিত মিলিত অবস্থায় স্ত্রী দেখিয়া ফেলেন এবং ইহা লইয়া স্বামীকে গঞ্জনা দেন। তাহাতে বিপরীত ফল হইল। আগে গোপন-মিলন হইত, এখন স্ত্রীর সহিত ঝগড়া হইলে স্ত্রীর সাক্ষাতে বৌদিদির কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করেন। দুইটি সন্তানের জন্মের পর স্ত্রীর স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে, স্বামীকে বহুবার আর যাহাতে ছেলেপুলে না হয় এরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে বলিয়াও

* ২২ (ঢ) উত্তরের পাদটীকা দেখুন।

ফল হয় নাই, তৃতীয়বার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। অথচ বৌদিদির বালিশের তলায় রবারের খাপ পাওয়া গিয়াছে। (উদাহরণটি করুণ! অবিবেচক পুরুষ! —গ্রন্থকার।)

(ঙ) লেডি ডাক্তার, অবিবাহিতা। গর্ভবতী হইয়া পড়েন। ২-৩ জন পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল; কাহার দ্বারা গর্ভোৎপত্তি হইল নিজেই স্থির করিতে পারেন নাই। নিজে নিজে দেশীয় গাছগাছড়ার সাহায্যে গর্ভপাত করাইতে গিয়া **অসম্পূর্ণ গর্ভপাত** (Incomplete abortion) এর ফলে রক্তস্রাব এবং সংক্রমণ হওয়াতে **জীবন বিপন্ন** হয়। পরে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় কোনরূপে জীবন রক্ষা হয়।

(চ) পরিচিত এক বাড়ির গৃহিণী (৩৪-৩৫) ও কন্যাকে (১৮-১৯) কয়েক বৎসর ধরিয়া রীতিমত দেহের ব্যবসা চালাইতে দেখিয়াছি। গৃহকর্তার রোজগার যৎসামান্য। যুদ্ধের বাজারে অনাহার ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্ত্রী ও কন্যার দেহ-উৎকোচে বড় বড় অফিসার ও কনট্রাক্টরদের হাত করেন। এখন অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে। কন্যা গর্ভবতী হইয়া পড়ে, গোপন করিয়া এক প্রফেসর যুবকের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। শ্বশুরবাড়ির কেহ বুঝিতে পারে নাই; প্রসব হইলে মনে করিয়াছিল পূর্ণ সময়ের পূর্বেই প্রসব হইয়াছে। প্রসব আমিই করাইয়াছিলাম এবং মেয়েটির সকাতর অনুরোধে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকের ঐ ধারণা জোরের সহিত সমর্থন করি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করি স্বামীকে সে ফাঁকি দিল কি করিয়া? সে বলে যে, স্বামীর সহিত প্রথম কয়েকদিন মিলনে এরূপ সুনিপুণ-ভাবে লজ্জা, ভয় ও বেদনা প্রাপ্তির অভিনয় করিয়াছিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে অক্ষতযোনি কুমারী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতেই পারেন নাই।

এক্ষেত্রে মেয়েটির ও ধাত্রীর সত্যগোপনে সুফলই হইয়াছে।—গ্রন্থকার।

(ছ) বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম কংগ্রেসকর্মী দাদা জেলে যাওয়াতে বিধবা মাতা ও স্কুলের ছাত্র ভাইয়ের সম্পূর্ণ ভার পড়ে সুশ্রী, তন্বী, কুমারী মেয়ের (২২-২৩) উপর। বাড়ি বাড়ি সেলাই ও গান-বাজনা শিখাইয়া কোন প্রকারে আধপেটা অন্নের সংস্থান হয়। একা একা যাতায়াত করিতে হয়, দাদার বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য পরিচিত যুবকদের সহিত সর্বদাই সাক্ষাৎ হয়; সকলেই অযাচিত সাহায্য করিতে চায়—মতলব অস্পষ্ট। বিবাহ করিতে কেহই অগ্রসর হয় না, সকলেরই উদ্দেশ্য কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া দেহ

উপভোগ করা, অবশ্য অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিনিময়ে। কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাতেই সম্মতি দিতে হয়। এখন আর কোন কষ্ট নাই। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কিছু কিছু শিখিয়া লইয়াছে—তাহার ভ্যানিটি ব্যাগে ২-৪টি সস্তা দামের ফ্রেঞ্চ ক্যাপ ও এক কৌটা ভেসিলিন (veseline) সর্বদাই থাকে। তৎসত্ত্বেও **তিন বৎসরের মধ্যে দুইবার গর্ভপাত** করাইতে হইয়াছে। দাদা জেল হইতে বাহির হইয়া ভগ্নীর ব্যাপার দেখিয়া স্বতন্ত্র বাস করেন। বোন বলে দাদার জন্যই ত আমার এই অবস্থা!

(দারিদ্র্য যে অনেক ক্ষেত্রেই পদস্খলন ঘটায় ইহা তাহার একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ। দাদার পরিবারের ভার বহন করিতে গিয়াই ত মেয়েটির এই বিপত্তি। অথচ সমাজ নারীকে কোনমতেই রেহাই দেয় না!—গ্রন্থকার।)

(জ) গৃহকর্তা (৩৫-৩৬), শেয়ার মার্কেটের দালাল, বর্তমানে মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত, ঘরে সুরূপা স্ত্রী (২৬-২৭)। বাড়িতে স্ত্রী ভিন্ন আরও দুইজন আছে—গৃহকর্তার বালবিধবা যুবতী মাসী (২৪) ও কলেজের ছাত্রী কুমারী ভগিনী (১৮-১৯)। সন্তানাদি নাই। স্বামী বাড়িতে বিশেষ থাকেন না। স্ত্রীর সহিত সম্পর্কও বিশেষ নাই। স্বামীর বন্ধু যাতায়াত করে, প্রয়োজনে অর্থ সাহায্যও করে। অল্প চেষ্টায়ই বন্ধুপত্নীকে উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। মাসী সব দেখিয়া শুনিয়া এ সুযোগ ছাড়িল না—নিজ যৌনবাসনা পূরণের জন্য একপ্রকার স্বেচ্ছায় বন্ধুকে দেহদান করে। গৃহকর্তার ভগিনী একদিন অসময়ে কলেজ হইতে ফিরিয়া বৌদিদির সহিত দাদার বন্ধুকে মিলিত অবস্থায় দেখিতে পায়। বন্ধুকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না, এই সুযোগে বন্ধুর যাতায়াত বন্ধ করিবে মনে করিয়া দাদাকে সব বলিয়া দিবে, ভয় দেখায়। ফলে তাহার মুখবন্ধ করিবার জন্য সেই রাত্রেই মাসী ও বৌদিদির সাহায্যে বন্ধু বলপ্রয়োগে তাহার কৌমার্য নষ্ট করে। তদবধি মাঝে মাঝে তাহাকে উপভোগ করিত বটে, কিন্তু তাহার বাধাদানের জন্য তাহার সহিত সংসর্গ কম হইত। বন্ধুপত্নী ও মাসীর সহিত নিয়মিত ভোগ চলিত এবং মাসীকে অন্য বন্ধুবান্ধবদের ভোগ করিতে দিয়া অর্থোপার্জনও হইত। ভগ্নীকে দিয়াও ঐ ভাবে অর্থোপার্জন করাইবার চেষ্টা চলে, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই।

(ঝ) স্বামী যুবতী স্ত্রীর (২০-২২) **দেহপণ্যে অর্থোপার্জন করিত।** স্বচক্ষে স্বামীকে টাকা গুণিয়া লইয়া বন্ধুকে (?) স্ত্রীর কক্ষে রাখিয়া বাহিরে আসিতে দেখিয়াছি। আমার বাসার একটি ঘর হইতে অপর পারে তাহাদের

শয়নকক্ষের প্রায় সমস্তটুকুই পর্দার ফাঁক দিয়া দেখা যাইত। আলো জ্বালিয়াই সব হইত। নিজ কক্ষের আলো নিভাইয়া অন্ধকারে জানালায় দাঁড়াইয়া সবই দেখিতে পাইতাম। স্ত্রীর পূর্ণগর্ভ অবস্থায়ও রেহাই পাইত না, আবার স্বামীকেও তৃপ্ত করিতে হইত। কি স্বামীর সহিত, কি অপরের সহিত, স্ত্রীকে কখনও মিলনে সহযোগিতা করিতে দেখি নাই—সমগ্র সুরতকাল নিশ্চল হইয়া থাকিত। বধূটিকে মাঝে মাঝে কাঁদিতে দেখিতাম। (অসহায়া নারী!)

(ঞ) রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালী দরিদ্র পিতা, অর্থের অভাবে একমাত্র কন্যার (২৫-২৬) বিবাহ দিতে পারেন নাই—কন্যাও কুৎসিতা। শেষে এক জঘন্য উপায় অবলম্বন করেন। দুই-চারিজন ধনী যুবকের সহিত ক্রমে ক্রমে কন্যার আলাপ করাইয়া দেন। কন্যার সহিত নির্জনকক্ষে আলাপের সুযোগ করিয়া দিতেন। নিজে ও স্ত্রী (কন্যার মাতা) ভুলিয়াও সেদিকে যাইতেন না। এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, কিছুদিন ধরিয়া একজন যুবক যাতায়াত করিত। কৌশলে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আবার অপর একজন যুবকের সহিত কন্যার পরিচয় করাইয়া দিতেন। উদ্দেশ্য কন্যার গর্ভোৎপত্তি ঘটিলেই চাপে ফেলিয়া গর্ভসঞ্চারকারীকে বিবাহে বাধ্য করিবেন। মাসের পর মাস এইরূপ চলে—কন্যা পর পর ৪-৫ জন কর্তৃক উপভুক্তা হইল, কিন্তু শাড়ী-গহনা, প্রসাধন দ্রব্যের প্রাচুর্য ঘটিল বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল না। শেষে এক বাঙালী মিলিটারী কর্মচারী (৩০) ফাঁদে পা দেয় এবং কন্যা গর্ভবতী হয়। মামলার ভয় দেখাইয়া উক্ত কর্মচারীকে বিবাহে বাধ্য করা হয়। বিবাহের তিন মাস পরে একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রেঙ্গুনে বম্বিং (Bombing)-এর সময় জামাতা বহু অর্থ ব্যয়ে স্ত্রী, পুত্র ও শ্বশুর-শাশুড়ীকে এরোপ্লেনে ঢাকায় পাঠাইয়া দেয় এবং নিজে (জাপানীদের হাতে ব্রহ্মদেশের পতনের পর) অতিকষ্টে পায়ে হাঁটিয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসে।

(ট) উক্ত মিলিটারী কর্মচারীর নিজের দুই ভগ্নীরও ঐ উপায়েই বিবাহ হয়। ভগ্নিগণ একরূপ পিতামাতার জ্ঞাতসারেই স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইত। বিনাশ্রমে ও বিনাব্যয়ে যদি কন্যাদের বিবাহ দেওয়া যায় মন্দ কি; এই ভাবিয়া পিতামাতা (লোকে বলে, তাঁহাদের বিবাহও নাকি ঐ ভাবেই হইয়াছিল) কিছু দেখিয়াও দেখে না। বড় ভগ্নী ১৯-২০ বৎসর বয়সে প্রাইভেট টিউটর কর্তৃক গর্ভিণী হইয়া তাঁহার সহিত বিবাহিতা হয়। দ্বিতীয়া ভগ্নী ২৫-২৬ বৎসর বয়সে কয়েকজন সঙ্গীত-শিক্ষকের এবং 'অমুকদা'র সহিত ঘনিষ্ঠতার পর, এক

মোটর মেকানিককে দেহদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত বিবাহিতা হয়। বিবাহের ঠিক ২৭২ দিন পরে একটি সন্তানের জন্ম হয়। আমিই প্রসব করাইয়াছিলাম (গর্ভোৎপত্তি যে বিবাহের পূর্বেই হইয়াছে জোর করিয়া বলা মুশকিল)। তৃতীয়ার বর্তমান বয়স (২৪) ; প্রণয়লীলা চলিতেছে এখনও বিবাহ হয় নাই। চতুর্থী (২০-২২) পড়াশুনায় ভাল ; আই. এস সি পরীক্ষা দিয়াছে। শুনিতেছি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবে, বিবাহ করিবে না। (বিবাহ হওয়াও মুশকিল—একেবারেই কুৎসিতা, তবে, 'যৌবনে কুকুরী ধন্যা'।) ইহার এক **অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা** ইহার স্তন মর্দন করিতেছে এ দৃশ্য ২-৪ দিন দেখা গিয়াছে।

এই সমস্ত উদাহরণ এই পর্যন্তই থাক। দৃষ্টান্ত যদিও আরও জানা আছে, কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা বেশী লিপিবদ্ধ করিবার সার্থকতা আছে কি ?

বিবাহ

(৮৩) প্রত্যেক সুস্থ পুরুষ ও নারীর, সমাজে বাস করিতে হইলে এবং **শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা** বজায় রাখিতে হইলে, **বিবাহ অবশ্যই করা কর্তব্য**। অতি দরিদ্রও যাহাতে বিবাহ করিতে পারে, কুৎসিতারও যাহাতে বিবাহ হয় ; স্বাস্থ্যহীন বা রোগগ্রস্ত নারীপুরুষের যাহাতে বিবাহের পূর্বে স্বাস্থ্যলাভ ও রোগমুক্তি ঘটিতে পারে ; স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই যাহাতে আর্থিক স্বাধীনতা থাকে এবং **বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভবপর হয়**, প্রত্যেক সমাজে ও রাষ্ট্রে এইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত। (গ্রন্থকার উত্তরদাত্রীর সহিত সম্পূর্ণ একমত।)

(৮৪) বিবাহের উদ্ভট কোনও প্রণালীর কথা জানা নাই।

(৮৫) **বিবাহ-বিচ্ছেদের** অনুমতি ও প্রথা সকলের মধ্যেই থাকা অবশ্য প্রয়োজন। আমার জীবনী যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা অন্ততঃ সকলেই আমার এই মত সমর্থন করিবেন। আমি ভুক্তভোগী। বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে হয়, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি ও প্রথা থাকিলে আমি প্রথম স্বামীর অবিবেচনা ও চরিত্রহীনতার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াও ঘর ছাড়িয়া আবার ফিরিতাম না! কবে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়া বসিতাম। অথবা প্রথম সন্তানটি লইয়া একক জীবনযাপন করিতে পারিতাম—তাহাতে নিজের ভরণপোষণ ও সন্তানপালন বেশ ভালভাবেই চলিয়া যাইত এবং এতগুলি গর্ভগ্রহণের (প্রতিটি

গর্ভই অবাঞ্ছিত) দায় হইতে বাঁচিতাম। কতবার এরূপ স্বামীর ঘর আর করিব না মনে করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া গিয়াছি—স্বামীর কূটকৌশল এবং ছেলেমেয়েদের মায়ায় আবার তাঁহার ঘরে ফিরিতে হইয়াছে [৬৪ (ক) (২) দেখুন] এবং ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার সন্তান আবার গর্ভে ধারণ করিতে হইয়াছে। রক্ষা এই যে তিনি মরিয়া গিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন! তাঁহার আত্মার সদগতি কামনা করি।

(৮৬) আমি **বিধবা বিবাহের** পক্ষপাতী। সে সমস্ত বিধবা পুনরায় বিবাহে ইচ্ছুক, জোর করিয়া তাহাদের উপর যৌনসংযম চাপাইয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই। **বিধবা-বিবাহের** আইন অবশ্য আছে কিন্তু আইন থাকা এক কথা আর **প্রথা থাকা** অন্য কথা। শুনিতেছি, একটা নাকি আইন হইতেছে যাহাতে কোন বিপত্নীককে পুনরায় বিবাহ করিতে হইলে বিধবাকেই বিবাহ করিতে হইবে—এ আইন মন্দের ভাল। অনেক বিধবা রিপুদমনে অসমর্থ হইয়া চরিত্র হারায়, আবার বিধবারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গলগ্রহ বলিয়া অনেকে তাঁহাদের উপর বলপ্রয়োগের সুবিধা পায়।

(৮৭) **বিবাহের উপকারিতা ও অপকারিতা** সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমার কী যোগ্যতা আছে? তবুও যাহা মনে আসে এইরূপ দুই-চারটি কথা বলিতেছি।

আমার মনে হয়, বিবাহের উপকারিতার সহিত তুলনা করিলে অপকারিতা (অসুবিধা ?) সামান্য আছে। অপকারিতা যেটুকু আছে তাহাও ব্যক্তিগত সমষ্টিগত ও রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা দ্বারা, সম্পূর্ণ না হোক, বহুলাংশে দূর করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, স্বামী-স্ত্রী **উভয়ের আসনকৌশল ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান, আর্থিক স্বাধীনতা এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার** (তাই বলিয়া স্বেচ্ছাচার নহে) এই কয়টি জিনিস থাকিলেই ত **বহু অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা** পাওয়া যায়।

(৮৮) ১৬-১৭ বৎসর বয়সে আমার **প্রথম বিবাহে ইচ্ছা** জাগে প্রেমে পড়িয়া [৩৩নং প্রশ্নের উত্তর (ক) দেখুন]।

(৮৯) একজন ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসিয়া, সেবা-যত্ন ও সর্বপ্রকারে আত্মদানে তাহাকে সুখী করিয়া এবং **তাহার ভালবাসা পাইয়া** জীবন কাটাইয়া দিবার যে আনন্দ তাহাই পাইবার জন্য **বিবাহে আগ্রহ** হইত।

(৯০) আমার **বিবাহে মত বা অভিরুচির** কোন প্রশ্নই উঠে নাই

বাধ্য হইয়া গর্ভবতী অবস্থায় বিবাহ করিতে হয় [৩৬নং প্রশ্নের উত্তরে (ঙ) এবং ৫৩নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন]।

(২১) প্রথম **পাত্রের সহিত পূর্ব পরিচয়** ও অন্যান্য বিবরণের জন্য ৩৬নং প্রশ্নের উত্তরে (ঙ) এবং ৫৩নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

(২২) **বিবাহের সময় আমার বয়স** ১৯ বৎসর বা কিছু বেশী, আমার স্বামীর বয়স ছিল ৩২ বৎসর।

(২৩) খরচাদি যৎসামান্য হইয়াছিল। •বিবাহ কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়।

(২৪) যে ভাবে আমাব বিবাহ-সংস্কার হয় তাহাতে আরও বিবেচ্য ও কর্তব্য বিষয় বলিয়া কিছু ছিল না! গর্ভে সন্তান ধরিয়াছি, সে যাহাতে পিতৃ পরিচয় দিতে পারে এবং আমাকে অসতী হইতে না হয়, ইহাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ছিল।

(২৫) খ্রীষ্টান মিশনারীদের নিকট পালিতা হইয়াছি; কাজেই **বিবাহে বংশ রক্ত, কুল প্রভৃতি** বিচারের কোন ঝোঁকই ছিল না।

(২৬) জাতি, ধর্ম প্রভৃতি বিচাব না করিয়া স্বাস্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, বয়স, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতিই বিবাহে বিচার্য হওয়া উচিত। গ্রন্থকাব এ সত্যেরই প্রচার করিয়াছেন।

উপসংহার

প্রধানতঃ ডাক্তাব বন্ধুব (ডাঃ সেনেব নহে) নির্বন্ধাতিশয্যে আমাব জীবনের গোপন-কাহিনী এবং অভিজ্ঞতা নির্লজ্জের ন্যায় অকপটে বিবৃত করিলাম। কিছুই গোপন করি নাই, সত্যকে বিকৃত করি নাই। এই বিবৃতি দান একেবারে 'অনুরোধে ঢেঁকি গেলা' নহে আমার নিজেরও একটু উদ্দেশ্য আছে। আমার উদ্দেশ্য, আমার কাহিনীতে যে শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ নিজ নিজ জীবনে গ্রহণ করিবেন এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগাইয়া অন্ততঃ আমার প্রথম জীবনের দুর্ভাগ্য যাহাতে কাহারও না হয় সেই চেষ্টাটুকুও ত করিতে পারিবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিলে:

(১) নার্স ও লেডি-ডাক্তারের বৃত্তির বিপদ সম্বন্ধে আমার সমব্যবসায়িনী-গণ অবহিত হইবেন। [নার্স ও লেডি ডাক্তার এদেশে কম হউক এ কথা বলা উচিত নহে। তবে সমাজের ও ডাক্তারদের আরও সুনীতিমূলক পরিস্থিতি

সৃষ্টি করিতে হইবে।—গ্রন্থকার।] প্রেম ও বিবাহে তাঁহাদের অধিকার আছে—পুরুষকে পরিহার করিতে হইবে তাহা নহে। কিন্তু প্রণয়ীকে যতই সচ্চরিত্র, সুবিবেচক ও গুণসম্পন্ন মনে হউক না কেন, **বিবাহ পূর্ব যৌনমিলন সর্বপ্রযত্নে পরিহার করিবেন।**

(২) তবে মানুষমাত্রেরই ভুল হইতে পারে। ভুলক্রমে বা অন্য কারণেও পদস্খলন হইতে পারে। তাই, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের বিপজ্জনক গর্ভপাতের জারজ-সন্তানের এবং অবাঞ্ছিত পুরুষের সহিত বিবাহের হার্ত হইতে বাঁচিবার জন্য **প্রত্যেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি সম্বন্ধে সুশিক্ষিতা** হইবেন।

বাঙালী স্ত্রী, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সর্বভাবে স্বামীর তৃপ্তির জন্য আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত। প্রতিদিন স্বামীর নিকট হইতে একটু ভালবাসা ও সহানুভূতি ভিন্ন আর কিছুই ত তাঁহারা প্রত্যাশা করেন না, সেটুকুও তাঁহারা (স্ত্রীরা) পাইবার অধিকারিণী নহেন ?

[উত্তরদাত্রী প্রথম স্বামী হইতে যে অবহেলা পাইয়াছেন সে তুলনায় ডাঃ সেন হইতে প্রচুর সমাদর ও দায়িত্বশীলতার প্রমাণ পান নাই কি ? সকল নারী যেমন সমান নন, পুরুষের মধ্যেও অনেকে সদ্‌গুণান্বিত ও সমুন্নত।—গ্রন্থকার।]

পরিশেষে বর্তমান গ্রন্থকার, ডাক্তার-বন্ধু ও অপর যাঁহারা জনসাধারণের ও সমাজের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর একটি বিষয়ের প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আমার অন্তরের সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাইতেছি।

বর্ণসূচী

(প্রথম খণ্ড)

অকাল মাতৃত্ব—৪৩৪-৩৫
অগ্রচ্ছদা—৯৫, ৫০১
অনঙ্গরঙ্গ—১৯
অণ্ডকোষ—৮৮, ৯৩, ৯৫ ১১১, ৪৯৮
অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি—১০৭, ১৩২, ২৪৫, ৫০৩
অযৌন প্রজনন—১০৪
অস্কার ওয়াইল্ড—২৩৬
আত্মরতি—২০৯-১০, ২১৪
আত্মীয় গমন—৪২৪
আত্মীয় সম্ভোগ—১৯৩
আদর্শ বিবাহ—৪৪৬
আব (Tumour)—৫০৯, ৫১৭
আবু আল সিনা—২৩
আমেরিকা—৩০৫, ৩১০, ৩১২, ২৩৫, ৪৮৪, ৪৯৫
আরব ও আরবী—২২, ১০১, ১৮২, ১৮৭, ২৩৬, ৪৩১
অ্যারিস্টটল—২০, ২৩৪
আসন্ন বিবাহ—৫৫০
আয়ুর্বেদ—২২৪, ২৩১, ৪৯৭
ইউনানী—২২৪, ২৩১, ৪৯৭
ইদিপাস উন্মায়ু (Œdipus Complex) —৩৫৮
ইভান ব্লখ—৩৩০
ইলমে ফিরাসৎ—৪৩১
ইলেক্ট্রা কম্প্লেক্স—৩৫৮
ইসলাম—২৪, ৩৯, ২৩৬, ৩০২, ৩২১, ৩৮৯, ৩৯৪, ৩৯৮, ৪২২, ৪৩৩, ৪৩৭, ৪৩৯, ৫২২, ৫৩৮
ইহুদী—২৩৬, ৩০২, ৩২১, ৩৮১
ইয়ুং—৩৫৯
ইমাম গাজ্জালী—২৩
ঋতুস্রাব—৪০, ৬৮, ৮৩, ১০১-৩, ১০৯-১০, ১৭৬-৭৮, ১৮৮-৯১, ৪৬৭, ৫১১
এডলার—৩৫৯
এমিবা—৮০
এহিয়া-উল-উলুম—২৩
ওভিড—২১-২২
ওয়েষ্টার মার্ক—২৬, ৭১, ৩৮৮
কনফুসিয়াস—৪২
কল্যাণমল্ল—১৯, ৭১, ১৮৭
কামক্রীড়া—১৫৮, ৩০০, ৩০৩, ৩১৪
কামতৃপ্তি—১৬৩, ২৭০
কামদমন—৩৭৩, ৪৭১
কামাগ্নি—৯৭, ১৮৪
কিনষে—৩২-৩৫, ১০৩, ১৩০, ১৫৬, ১৬৪, ১৭৬, ১৯৮-৯৯, ২১১, ২১৪,

২১৮, ২২৮, ২৩৮, ২৫৫, ২৫৯, ২৭০, ৩০১, ৩০৩, ৩০৯, ৩১২, ৩১৪, ৩৪১
কিমিয়া-ই-সাদৎ—২৩
কিমিয়ায়ে ইশরাৎ—২৪
কুমারী প্রজনন—৪২
কোক শাস্ত্র—২৪
কোকা পণ্ডিত—১৯, ৪৬, ৭০, ১৬৫, ১৭৩, ১৮৭
কোরআন—২৪, ১০১, ৫১৮, ৫৪৪
কোর্টশিপ—৭৩, ৩১২, ৩১৬, ৪১২
ক্যানসার—৫১০
গনোরিয়া—৩৩৬, ৪৭৬, ৪৮০, ৪৯২, ৫০০, ৫০৫
গর্ভাধান—৮৯, ১২৯
গিগোলো—৩৩৫
গৌরীগরণ—৫২৩
চরমপুলক—২১৫, ২১৮-১৯, ২২৮-২৯
জন্মনিয়ন্ত্রণ—২৮-৩০, ৭১, ৩১৬, ৩৩৭-৩৯, ৪৭০
জরায়ু—৮৫, ৯৯, ১০৬, ১২৩, ১২৯, ১৮৬, ৩৩৭, ৫০৭, ৫১০
জীবকোষ—৭৯-৮০
ডিম্ব—৪৫, ৪৯, ৮২-৮৯, ১০৬
ডিম্বকোষ—৮১, ৮৪-৮৯, ৯৯, ১০২, ১০৫, ১০৯
ডিম্ববাহী নল (ফ্যালোপিয়ান)—৮৫, ৮৮, ৯৯, ১০৬
ডিম্বস্ফোটন—৮৩-৮৬, ১০১
তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ—৩৭১, ৩৯৪, ৪১৭, ৫৫২
ত্বকচ্ছেদ—৪৬১, ৫০২
দর্শন প্রবৃত্তি—২৭০
দলগত বিবাহ—৩২৩, ৩৮৪
দাম্পত্য জীবন—৪১৫, ৪২৬, ৪৪০, ৪৪৩
নগ্নবাদী বা নগ্নতা চর্চা—২৬৯, ২৭২, ২৭৬
নারীর সমমৈথুন—১৫৬
পণপ্রথা—৩৮৮, ৪৩৯, ৪৪৫, ৫৫১
পর্দাপ্রথা—৩০৪, ৩১৭, ৫৪৩
পশুগমন বা পশুমৈথুন—২৫৮, ২৬০-৬২
পুরুষ বেশ্যা—২৪৩
পুংমৈথুন—২৩৬, ৩৩৫
পেটিং (Petting)—৩৩
পেনিসিলিন—৪৬১, ৪৮২, ৪৯০
প্রতীকানুরাগ—২৫৭
প্রষ্টেট গ্রন্থি—৯৩, ৯৬, ৫০২
প্রদর্শন বাতিক—২৬৫-৭০
প্রেম—১৩১-৪৩, ৪১৪
বন্ধ্যাত্ব—২০, ৩৩৬, ৪৮১, ৫০৫
বহু বিবাহ—৩২১, ৩৭০, ৩৮০
বহুমূত্র—৫০৩, ৫১৫
বাইবেল—৪০, ২৩৬, ৪৮৪
বাৎস্যায়ন—১৯, ৭০, ১৬৫, ১৭৩, ১৮৭
বাল্যবিবাহ—২৯৯, ৩১৭, ৪৩৩, ৪৪৪
বিধবা বিবাহ—৩৯৭
বিন্দুসাধক—৫২৩
বিবাহ—৭২, ২৯৯, ৬৬৭, ৪১৩
বিবাহ বিচ্ছেদ—৩৯৪
বিবাহেত্তর যৌনমিলন—৩০৭, ৩১৮,

৩২২, ৫৪৮
বেশ্যা—৩৩০, ৩৩৩
বৈদিক যুগ—৪২৩
বৌদ্ধ—৪৩, ৩৮২, ৪৪৬, ৫৩৬
বৃহদোষ্ঠ—৯৭-৯৮, ১৯৩
ব্রহ্মচর্য—১৭৭, ৩৭৩, ৫৩৪, ৫৪৬
ভগ, ভগদেশ, ভগাঙ্কুর—৯৭, ৯৮, ১২৩, ১৮৪, ১৯৩, ২১৬, ২৩৪, ২৯৫
ভ্রূণ—৮৮, ৯০
মনস্তত্ত্ব—৩৫১
যোনি—৯৭
যৌনক্রীড়া—৪৭৩
যৌনতৃপ্তি—১৩৬, ৩১৬, ৩১৮, ৪০৩,
যৌননিষ্ঠা—৩০৮, ৩১৭, ৫১৭, ৫৩২-৩৩, ৫৪৬,
যৌনবিকৃতি—২৬, ২৪৪, ২৫৩, ২৫৭, ২৫৯
যৌনবৈপরীত্য—২৫৩, ২৫৬
যৌনবোধ—১৭, ১১২-২১, ১২৫-৩২, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৭২, ১৭৪, ১৮৭, ১৯২, ১৯৯, ২১৩, ২২১, ৩০৮, ৩৫৭, ৩৬১
যৌনমিলন—১১৩, ১৫১, ২৮৬, ২৯৯, ৩০৭, ৩৭৬, ৫৩২
যৌন যথেচ্ছাচার—৩৮, ১৬২, ৩৫৯, ৩৭৭, ৪০৩
যৌন লজ্জা—৩৬১
যৌন সাড়া—১৫৬-৫৯
যৌন স্বাস্থ্য—৪৬০, ৪৬৬
রতি উন্মত্ততা—৫১৫
রতিক্রিয়া—যৌনমিলন দেখুন
রতি জড়তা—২৭, ৫১৫
রতিজ রোগ—৩১৫, ৪৭৫, ৪৯১, ৪৯৫
রতিশাস্ত্র—৪৬
লঘ্‌যত্নেচ্ছা—২৪, ১৭২
লিঙ্গ—৯৩, ১০৬
লিঙ্গপূজা—১১৭, ২৬৮
শিশুগমন—২৬২
শুক্র—৯৪-৯৬, ৩৩৭, ৪৫২, ৫০৪
শুক্রকীট—৪৫, ৮১, ৮৩-৮৯, ১০৬, ১২৯, ৩৩৭, ৫০০
শুক্রস্খলন—৩৯, ১৫২, ২২২-৩১, ২৫৯
শৃঙ্গার—১৩০, ১৬৩
শ্বেতপ্রদর—৫০৬
সতীচ্ছদ—৪১, ৪২, ৯৯-১০০, ২১৪, ৫০৫, ৫৪১
সতীত্ব—৯৯, ৫১৭, ৫১৯, ৫৩২-৩৩, ৫৪০
সতীদাহ—৩৯৬, ৪৩৪
সফ্‌ট শ্যাঙ্কার—৪৭৬, ৪৮৩
সমকাম—১৭৪, ২৩৪, ২৪২
সমমৈথুন—১৩৬, ২১৩, ২৩৪, ২৮৮, ২৯৩, ৩০৮, ৪৬৪, ৫২৬
স্যার্দা আইন—১৮১, ৩১৭
সিফিলিস—৩৩৬, ৪২৬, ৪৬২, ৪৮৪ ৪৯২
স্তন—১০০, ১০৩, ১৭৬, ২১৭, ৩০১, ৫৪০
স্বপ্নদোষ—২২৪, ১৯৯, ২২২-২৮, ২৩১, ২৮৫, ৪৫৭

স্বয়ং মৈথুন—৩৩, ২০০, ২১৩, ৩০৮
হরমোন—৯৬, ১০৭, ১১০, ৪৮১, ৫১৪
হস্তমৈথুন—১৭৪, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৯, ২০১, ২১০, ২১৫, ২৭৮, ২৮৯, ২৯১, ২৯৪, ৪৫৫
হিন্দু বিবাহ আইন—৩২০, ৩৮২, ৩৯৬, ৪১৭
হিস্টিরিয়া—৩৫১, ৪২৬, ৫১১

দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সূচী

(১) জন্মনিয়ন্ত্রণ—কি এবং কেন

(২) জন্মনিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সময়—সন্তানলাভের আদর্শ সংখ্যা ও বয়স

(৩) জন্মনিয়ন্ত্রণের ভ্রান্ত মত ও অনিশ্চিত পথ

(৪) জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক প্রণালীসমূহ

(৫) নারীজীবনের উর্বর ও নিরাপদ সময়—জন্মপ্রকরণে ও গর্ভ-নিবারণে উহাদের ব্যবহারিক মূল্য

(৬) কৃত্রিম গর্ভপাত—অবৈধ গর্ভসঞ্চার—জারজ সন্তান

(৭) দম্পতির রতিজীবন

(৮) মিলনের বিভিন্ন স্তর

(৯) মিলনে বাধা-নিষেধ

(১০) মিলনে বিধিব্যবস্থা

(১১) মিলনে আসনকলা

(১২) দাম্পত্যমিলনে প্রধান প্রধান সমস্যা—নারীর তৃপ্তিসাধন

(১৩) রতিসাধনা

(১৪) ঔষধ প্রয়োগে রতিশক্তি বর্ধন

(১৫) অঙ্গের পরিমাপ ও কার্যকরিতা

(১৬) রতিশক্তি সাধনায় শারীরিক ও মানসিক কৌশল

(১৭) রতি কৌশল সম্পর্কে মতামত ও তথ্য

(১৮) রতিক্ষমতার বিশৃঙ্খলা

(১৯) রতি কৌশলে পুনরাবৃত্তি

(২০) প্রাণতত্ত্ব ও জন্মবিজ্ঞান

(২১) জীবকোষ ও জননেন্দ্রিয়সমূহ

(২২) ঋতুস্রাব

(২৩) গর্ভসঞ্চার

(২৪) ভ্রূণের ক্রমবর্ধন

(২৫) গর্ভ লক্ষণসমূহ
(২৬) গর্ভাবস্থায় বিধিনিষেধ
(২৭) প্রসব
(২৮) প্রসবকালীন কর্তব্য
(২৯) গর্ভপাত—প্রসবের বাধা—যমজ সন্তান
(৩০) বংশক্রমের রহস্য
(৩১) ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভ
(৩২) বংশানুক্রম-রহস্য উদ্ঘাটনে মানব জাতির লাভ
(৩৩) সুসন্তান লাভের উপায়
(৩৪) দাম্পত্যপ্রীতি ঘনীভূত ও স্থায়ী করিবার নানাবিধ উপায় ও উপকরণ
(৩৫) পুরুষ সম্বন্ধে নারীর জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য
(৩৬) পুরুষের জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য
(৩৭) সমাজ ও যৌনবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ—কতিপয় সামাজিক সমস্যা ও তাহার সমাধান
প্রমাণ পঞ্জী (দ্বিতীয় খণ্ড)
প্রশ্নমালা (দ্বিতীয় খণ্ড)
প্রশ্নমালার উত্তর (দ্বিতীয় খণ্ড)
বর্ণসূচী (দ্বিতীয় খণ্ড)